

বনফুল

রচনাবলী ১৩

বনফুল রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬০

সম্পাদনা ঃ
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র ভূঁঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

উপন্যাস

মহারাণী

• এক •

মহারাণী ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ একটু বিব্রত বোধ করলেন। যদিও তিনি জমিদার বাড়ির বেতনভুক ভৃত্য নন তবু তাঁকে যেতে হবে। বেতনভুক ভৃত্যেরা মাঝে মাঝে মনিবের আদেশ অমান্য করে, কিন্তু কাব্যতীর্থের তা করবার উপায় নেই, তাঁকে যেতেই হবে, কারণ তিনি মনে মনে জানেন যে মহারাণীর কেনা গোলাম তিনি। দাসখৎটা তিনি কবে লিখে দিয়েছিলেন, কেন লিখে দিয়েছিলেন, কি শর্তে বা কি মূল্যের পরিবর্তে লিখে দিয়েছিলেন তা কেবল তিনিই জানেন। অনেকদিন আগে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, যার কথা বাইরের লোকে ঘুণাক্ষরেও জানে না, যা উপেক্ষা করলে কোন ক্ষতি নেই, তা শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে আজও দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। মহারাণী ডাকলে তাঁকে যেতেই হবে, তিনি না গিয়ে পারেন না।

নটবর চাকর ডাকতে এসেছিল। তাকে তিনি বললেন, "তুমি যাও, আমি আসছি একটু পরে।"

নটবর চলে যাবার পর দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আর একটু বিব্রত হলেন তিনি। প্রথম, এই ঠাণ্ডায় স্নান করতে হবে। মহারাণীর কাছে অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া যায় না। অনেকদিন আগে একবার স্নান না ক'রে মহারাণীর কাছে তিনি গিয়েছিলেন। মহারাণী তাঁর দিকে একনজর চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "তোমার অভ্যন্তরটা খুব শুচি তা আমি জানি, কিন্তু বাইরেটা তা ব'লে অপরিষ্কার থাকাটা কি ভালো? ব্রাহ্মণের তো বাহ্যোভ্যন্তর শুচি হওযাটাই বাঞ্ছনীয় শুনেছি!" এর পর থেকে অস্নাত অবস্থায় মহারাণীর সম্মুখীন হতে সাহস করেন নি তিনি কখনও। সুতরাং যদিও তাঁর বাতের ব্যথাটা বেড়েছে তবু ওই ঠাণ্ডা পুকুরের জলেই অন্তত একটা ডুব দিয়ে নিতে হবে তাঁকে। দ্বিতীয় সমস্যা, গৃহিণী। তিনি যেই শুনবেন মহারাণীর দরবারে ডাক পড়েছে অমনি তাঁর মুখে মেঘ ঘনিয়ে আসবে। অথচ আসা উচিত নয়। ওই মহারাণীর দৌলতেই যে তাঁদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলছে একথা কে না জানে। অবশ্য, তিনি যে ব্রহ্মত্র ভোগ করছেন তা গালুটির জমিদারবাবুরা দিয়েছেন, কিন্তু মহারাণীর ইঙ্গিতেই যে দিয়েছেন একথা মহারাণী গোপন রাখতে চাইলেও গোপন থাকেনি, অন্তত তাঁর কাছে থাকেনি। গালুটি স্টেটের ম্যানেজার কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে। তাঁর গৃহিণী সর্বমঙ্গলাও কথাটা জানেন। সর্বমঙ্গলাকে কত উপহারও দিয়েছে মহারাণী। সর্বদা উপকার করবার জন্য ব্যস্ত। আইনত সর্বমঙ্গলার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। কিন্তু মহারাণীর নাম শুনলেই তাঁর মুখ ভার হয়ে ওঠে। শ্রীহর্ষ মাঝে মাঝে ভেবেছেন মহারাণী নিজেই অনায়াসে তাঁকে একশ' বিঘে জমি দিতে পারত, গালুটির

বাবুদের জমিদারির তিনগুণ জমিদারি তার, কিন্তু, সে তা দেয়নি! কেন দেয়নি? তার সঙ্গে সম্পর্কটা যাতে অনুগ্রহের ছোঁয়াচ লেগে মলিন না হয়ে যায় সেইজন্য? কিন্তু অনুগ্রহই তো করেছেন, সেটা না হয় বর্ষিত হয়েছে গালুটির বড়বাবু মহেন্দ্রনাথের হাত দিয়ে। এভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কি দরকার ছিল, মাঝে মাঝে একথা ভাবেন শ্রীহর্ষ। মহেন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন একথা। কিন্তু বহুকাল পূর্বের কথা এসব, বিস্মৃতির তলায় চাপা প'ড়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত আছে মহারাণীর চরিত্রের রহস্য। সে রহস্য আজও অনেকেরই কাছে রহস্যই থেকে গেছে, হয়তো আপনাদের কাছেও থাকবে। কিন্তু তার আভাস পেতে হলেও আগের ঘটনা-পরম্পরা জানা চাই। সেই-গুলোই আগে বলি। শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ ততক্ষণ স্নান ক'রে তৈরি হোন।

● দুই ●

একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, গল্পটি একালের না, সেকালের সিপাহীবিদ্রোহ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তার জের তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটেনি। জনসাধারণের মতামত এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদলের মতে সিপাহীরা বীর, ওরা ইংরেজদের উচ্ছেদ ক'রে দেশের স্বাধীনতা আনতে চায়। আর একদলের ধারণা স্বাধীনতার ব্যাপারটা ছুতো, হয়তো দু'একজনের এ উচ্চ আদর্শ থাকতে পারে, অধিকাংশই ডাকাত। দেশকে বিশৃঙ্খল ক'রে দিয়ে লুটতরাজ করাই ওদের উদ্দেশ্য, মাৎস্যন্যায়ের যুগে একবার যেমন হয়েছিল। মহারাণীর বাবা সমুদ্রবিলাস চৌধুরী ছিলেন দ্বিতীয় দলের লোক। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল দেশী লোকের হাতে আবার যদি শাসনভার ফিরে আসে তাহলে ভদ্রলোকদের দুর্গতির আর অন্ত থাকবে না। তাই এই ব্যাপারে তিনি ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, যারা ইংরেজদের সাহায্য করেনি তাদের যথাসাধ্য শাসনও করেছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে শোনা যায় বিশ্বদেব শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ পলাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের আশ্রয় দিয়েছিল বলে' তাকে সপরিবারে নিজের জমিদারি থেকে উৎখাত করেছিলেন তিনি। সাহেবদের ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছিলেন তার পিছনে। গোরার গুলিতে বিশ্বদেবের বড় ছেলে সূর্যদেব মারা যায়। তার স্ত্রীকেও নাকি গোরারা ধর্ষণ করেছিল। বিশ্বদেব ছোট ছেলে শঙ্করদেবকে নিয়ে দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। কথিত আছে সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমুদ্রবিলাসের নাকি পুত্রসন্তান হয়নি। বিশ্বদেব অভিশাপ দিয়েছিল চৌধুরীবংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। মহারাণীর জন্মের পরেই মহারাণীর মা মারা গেলেন। সমুদ্রবিলাস আরও দুবার বিয়ে করেছিলেন কিন্তু আর কোনও সন্তান

হয়নি। সেকালের এক সাহেব ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা ক'রে বলেছিলেন সন্তানের জন্য আপনি আর বিয়ে করবেন না, কারণ আর আপনার সন্তান হবে না। তিনি এর কারণ নির্ণয় করেছিলেন গণোরিয়া! তাঁর ছোট ভাই পারুবাবু (পুরো নাম, পর্বতবিলাস) বিয়েই করেননি। সাহেব ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করেননি তিনি, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ব্রহ্মশাপে। তিনি বলতেন গণোরিয়া কার নেই, ভদ্রলোক মাত্রেরই আছে, সেটা বংশলোপের কারণ হ'লে এদেশে কারও বংশ থাকত না। ওটা কারণ নয়, উপলক্ষ। এই ব'লে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক বলতেন—

সুখান্তে শুষ্কিতা গাভী, দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিত
যশান্তে চপলা ভার্য্যা, কুলান্তে বৈরী ব্রাহ্মণঃ।

সুখের দিন যখন শেষ হয় তখন গাইয়ের দুধ শুকিয়ে যায়, দুঃখের অন্ত হয় পুত্র পণ্ডিত হ'লে। ভার্যা চপলা হ'লে মানুষের সুনাম নষ্ট হয়, আর কুল নষ্ট হয় ব্রহ্মশাপে। আমাদের ব্রহ্মশাপ লেগেছে। সুতরাং বিয়ে ক'রে আর ভদ্রকন্যাদের বিপন্ন করবার দরকার কি। আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। আমরণ কুমার থেকে তাই করেছিলেন তিনি। জপ তপ নিয়েই থাকতেন। এক তান্ত্রিক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। লোক বলত তিনি শব-সাধনাও করেছেন। আর একটা কাজও করতেন তিনি, বছরের মধ্যে প্রায় ছ'মাস পাহাড়ে পাহাড়ে কাটাতেন। পর্বতবিলাস নামের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এ ঝোঁক হয়েছিল না, পর্বতের নির্জনতায় জপ তপ করবার সুবিধে হবে বলেই তিনি পাহাড়ে ঘুরতেন, তা কেউ জানে না।

সমুদ্রবিলাস যখন মারা গেলেন তখন মহারাণীর বয়স ষোলো। সেকালের নিয়ম অনুসারে ন'বছর বয়স থেকেই মহারাণীকে কোনও সৎপাত্রের হাতে সম্প্রদান করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েকটি কারণে তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। প্রথমত, পাত্র নির্বাচন ব্যাপারে অনেকদিন মনঃস্থির করতে পারেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত দুটি পাত্রকে তিনি নির্বাচন করেন। প্রথম পাত্রটি গ্রামেরই। তাঁর বাল্যবন্ধু ভবভূতি ভট্টাচার্যের একমাত্র পুত্র শ্রীহর্ষ। ভালো বংশ, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে নিখুঁত, লেখাপড়ায় তীক্ষ্ণধী, আচার ব্যবহারে বিনয়ী, জামাই করবার মতো ছেলে। মহারাণীর ছেলে-বেলার সঙ্গীও। বাল্যবন্ধুর ছেলে ব'লে বাড়িতে তার অবাধ গতি-বিধি ছিল। সুতরাং তাঁর এটা ভাবা অন্যায় হয়নি যে শ্রীহর্ষের সঙ্গে বিয়ে হ'লে মহারাণীর আনন্দই হবে। তাছাড়া মনে মনে সমুদ্রবিলাসের আর একটা মতলব ছিল—শ্রীহর্ষকে শেষ পর্যন্ত ঘরজামাই করা। ভবভূতি ভট্টাচার্যের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, এত বড় জমিদারের একমাত্র মেয়েকে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত মর্যাদায় রাখবার সামর্থ্য যে তাঁর নেই, একথা সমুবাবু জানতেন। কিন্তু তাঁর ওই মতলবটি ছিল ব'লে এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাননি। ভবভূতির কাছে এ প্রস্তাব করতে তিনি খোলাখুলি-

ভাবে যা বললেন তাতে একটু দ'মে গেলেন সমুদ্রবিলাস। কথাটা শুনে ভবভূতি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন, তারপর হেসে বললেন, "দেখ ভাই, আমি হেলে সাপ, বড় জোর একটা ব্যাঙ গিলতে পারি, কিন্তু হাতী গিলবার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি বাল্যবন্ধু, তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা হলে আমি সুখীই হতাম,—কিন্তু—"

এই কিন্তুর জটটা খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সমুদ্রবিলাস। কিন্তু খোলেনি। অতি সাবধানে ইঙ্গিতটা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। হেসে বললেন, "আমার মেয়ে জামাইই তো বিষয়ের মালিক হবে শেষ পর্যন্ত। অভাব তোমাদের থাকবে না।"

ভবভূতিও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন।

"সেটা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমার নিজের একটা সাধ-আহ্লাদ আছে তো। আমিও তো পুত্রবধূ নিয়ে ঘর করতে চাই। তোমার মহারাণী পুকুর থেকে জলও আনতে পারবে না, আমাকে দু'মুঠো রান্না করেও দিতে পারবে না, গরুর জাবও দিতে পারবে না। শ্রীহর্ষের মা সারাজীবন ওই কাজ করেছে, এখনও করছে। আমার ইচ্ছে শ্রীহর্ষের বউ এসে এবার ওর হাত থেকে সংসারের ভার নিক। তোমার মহারাণী হয়তো সে ভার নিতে চাইবে, অন্তত চেষ্টা করবে, ও মেয়ে খুব ভালো, কিন্তু ও পারবে না। ও ময়ূরকে নাচাতে পারবে, কিন্তু বাসন মাজতে পারবে না। আমি ওকে দেখছি তো। আমাদের ঘরে ওসব মেয়ে বেমানান। তুমি বরং গালুটির বড়বাবুর বড় ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে দেখ না। মহেন্দ্র ছেলে ভাল—"

"সে কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে মেয়ে আমার ঘরেই থাকত। তাছাড়া শ্রীহর্ষকে আমার বেশী পছন্দ। তুমি তোমার যে সাধ-আহ্লাদের কথা বললে তার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হবে না। তোমার বা তোমার স্ত্রীর যদি আপত্তি না থাকে রাঁধুনী, ঝি, চাকর রেখে দিতে পারি। পাঁচার মা তো সঙ্গে যাবেই। মহারাণীকে ও মানুষ করেছে, ওকে ছেড়ে ও থাকতে পারবে না।"

ভবভূতি ভট্টাচার্য মাথা হেঁট ক'রে নিজের প্রশস্ত টাকে বার কয়েক হাত বুলিয়ে শেষে বললেন, "আমি সাধ-আহ্লাদ বলতে যা বুঝি, তা তোমার ঝি-চাকর দিয়ে মিটতে পারে না কখনও। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে আমার—"

আবার টাকে হাত বুলোলেন তিনি।

"কি কথা ?"

"এটা ঠিক যে তোমার মেয়েকে বিয়ে করলে তার ভবিষ্যতের ভাবনা আর থাকবে না। নিজের সাধ-আহ্লাদের জন্য তার এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নষ্ট করাটা ঘোর স্বার্থপরতা হবে বোধহয়। হঠাৎ মনে হ'ল কথাটা। ভেবে দেখি। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর, শ্রীহর্ষকেই জিগ্যেস কর। সে যদি আপত্তি না করে আমি আর আপত্তি করব না।"

"বিয়ের ব্যাপারে ছেলের মত নেওয়াটা—"

সমুদ্রবিলাস বাক্যটি শেষ করলেন না, কিন্তু তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হ'ল না ভবভূতির। তিনি মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন সমুদ্রবিলাস ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

ভবভূতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ক্ষতি কি—"

বলেই উঠে গেলেন তিনি।

সমুদ্রবিলাস নিজে কিন্তু কথাটা বলতে পারেননি শ্রীহর্ষকে। তিনি অনুরোধ করলেন প্রিয় বয়স্য রসরাজকে, তিনি যেন কথাটা পাড়েন তার কাছে। সেকালে বড় বড় জমিদারদের দরবারে 'বয়স্য' নামধেয় যে সব পার্শ্বচরেরা থাকতেন তাঁরা সবাই নিছক চাটুকারই ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু ছিলেন, সুরসিকও হতেন অনেকে। তাঁরা জমিদারদের অনুগৃহীত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁরাই একমাত্র লোক ছিলেন যাঁরা জমিদারদের মুখের উপর স্পষ্ট কথা শোনাতে পারতেন।

অনুরোধটি শুনে রসরাজ বললেন, "দেখুন হুজুর, আমি পাচন খেলে যদি আপনার হজম শক্তি বাড়ত তাহলে তা আমি খেতাম, তেতো হলেও খেতাম। কিন্তু ভব পুরুতের ছেলের কাছে এ প্রস্তাবটি করলে আপনার মান বাড়বে না, আমারও মাথা হেঁট হয়ে যাবে। তবে আপনার যখন হুকুম, তখন খবরটা আমি জোগাড় করে দেব।" তিনি ভার দিলেন হীরু নাপিতকে। সমাজের সর্বস্তরে হীরু নাপিতের যাতায়াত। কিন্তু মনোমত ফল ফলল না। হীরু নাপিত যে ভাষায়, যে ভঙ্গীতে এবং যে পরিবেশে সংবাদটা শ্রীহর্ষকে বলল তা একটু অন্যরকম হ'লে কি হ'ত বলা যায় না।

একদিন হাটের মাঝখানে একমুখ হেসে শ্রীহর্ষকে সম্বোধন ক'রে হীরু বলে বসল—"ও দাদাঠাকুর, শোন, শোন, তোমার বরাত যে ফিরে গেল গো—"

শ্রীহর্ষের বয়স তখন বছর কুড়ি। আসন্ন যৌবনের ঈষৎ উদ্ধত দীপ্ত শ্রী চোখে মুখে। টোলে মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর খ্যাতি ছিল এবং তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা নিরঞ্জনের ঈর্ষ্যাও ছিল তাঁর উপর সেই জন্য। শুধু সেই জন্য নয় সমুদ্রবিলাসদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতাও ইন্ধন জুগিয়েছিল সে ঈর্ষ্যার আগুনে।

শ্রীহর্ষ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "বরাত ফিরে গেল? কি রকম?"

"রাজাবাহাদুর তোমাকে ঘরজামাই করতে চাইছেন যে গো। ভারী মনে ধরেছে তোমাকে—। তখন যেন এই গরীব হীরুকে ভুলে যেওনি।"

নিরঞ্জন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হো হো করে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল সে।

"এ আর নতুন কথা কি শোনালে, হীরু। এ তো আমরা জানতামই যে মধুসূদন শেষকালে 'মেধো' হবে। আসল খবরটাই তো তুমি বললে না, মনে ধরেছে কার, রাজাবাহাদুরের, না আর কারও—"

শ্রীহর্ষের মুখখানা লাল হয়ে উঠল, তারপর চোখ দিয়ে ছুটে বেরুল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্থিরকণ্ঠে কিন্তু উত্তর দিলেন তিনি।

"কারো ঘরজামাই আমি হব না"—বলেই সেখান থেকে চলে গেলেন। কিছুদূর গিয়েই কিন্তু থেমে যেতে হ'ল তাঁকে। ব্যাপারটার অন্য দিকটা চোখে পড়ল। ঘরজামাই না হ'লে যে মহারাণী চিরকালের মতো অপরের হয়ে যাবে। তখন একবার দেখাও যে হবে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর সোজা মহারাণীর কাছে গেলেন। দেউড়ি পেরিয়ে বৈঠকখানা মহল, সেখানে ঘোর রবে পাশা খেলা চল্‌ছিল। বৈঠকখানা মহল পার হয়ে বিশাল প্রাঙ্গণ, তার এক'দিকে নাট-মন্দির আর এক'দিকে সারি সারি তিনটি মন্দির—কালীর, সিংহবাহিনীর এবং দুর্গার, পশ্চিম প্রান্তে বিরাট অতিথিশালা। তারপর ফুলের বাগান। ফুলের বাগান পেরিয়ে তবে অন্দরমহল। সে-ও বিরাট। আগেই বলেছি অন্দরমহলে শ্রীহর্ষের অবাধ গতি ছিল, যদিও সেটা অনেকে সুদৃষ্টিতে দেখত না। বিশেষ ক'রে মেয়েরা, মেয়েরও অভাব ছিল না। আত্মীয়-স্বজনদের বহু পরিবার আশ্রয় পেয়েছিল সমুদ্রবিলাসের অন্দরমহলে। একপাল পায়রার মতো দিনরাত বক্‌বকম্ করত তারা।

তাঁদেরই একজন, শান্ত পিসি, শ্রীহর্ষের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আজ এমন অসময়ে যে?"

"মহারাণীর সঙ্গে দরকার আছে একটু। সে কোথা?"

"সে খিড়কির বাগানে আছে বোধহয় কোথাও। অনেকক্ষণ দেখিনি—"

খিড়কির বাগানের দিকে শ্রীহর্ষ যখন চলে গেলেন তখন শান্ত পিসি তাঁর দেখন-হাসির দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "মরণ আর কি! বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করছে ছোঁড়া—"

শান্ত পিসির দেখন-হাসি শুকী (শুকতারা) সমুদ্রবিলাসের অনুগৃহীতা ছিলেন। কোন্ আইন অনুসারে তিনি সমুদ্রবিলাসকে ঠাকুরপো বলতেন তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ। তাঁর রূপ ছিল এবং সেইটেই সম্ভবত ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী।

তিনি মুচকি হেসে বললেন, "আসল খবরটি তুমি জান না দেখছি, তাই উল্টো উপমা দিয়ে বসলে। শ্রীহর্ষই চাঁদ, আমাদের দুলালী হয়তো সে চাঁদের রোহিনী হবে। ঠাকুরপো শুনছি বিয়ের কথা পেড়েছেন।"

সমুদ্রবিলাসের তৃতীয় গৃহিণীর দূর সম্পর্কের মাসী, থলথলে মোটা আর কুচকুচে কালো, কাত্যায়নী বসেছিলেন কাছে। এ সংবাদ শুনে গালে হাত দিয়ে ঘাড়টি কাৎ ক'রে বললেন, "তাই এত বাড় বেড়েছে আজকাল"। অনেকেই কিছু একটা সন্দেহ করছিল অনেক দিন থেকে। দেখন-হাসির মুখে এ সংবাদ শুনে ঘসা কাচটা স্বচ্ছ হয়ে গেল হঠাৎ যেন।

খিড়কির বাগান ছোটখাটো বাগান নয়। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমির উপর

তা বিস্তৃত। ফুলের গাছ তো আছেই, ছোটখাটো পুকুরও আছে একটা। সেই পুকুর পারে গন্ধরাজের ঝোপের আড়ালে মহারাণীকে দেখতে পেলেন শ্রীহর্ষ। শ্রীহর্ষকে দেখেই ছুটে এল সে, আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত।

"কার্তিককে রঘু পিঠে চড়তে দিয়েছে, দেখবে এস। শিগ্‌গির এস, এখুনি নেবে পালাবে।"

কার্তিক মহারাণীর পোষা বাঁদর, আর রঘু পোষা ময়ূর।

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন সত্যিই কার্তিককে পিঠে নিয়ে রঘু ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "কম বেগ পেতে হয়েছে এজন্যে আমাকে—"

এইটেই মহারাণীর বৈশিষ্ট্য। সাধারণত যা সম্ভব হয় না, সাধারণত যা কেউ করে না তাই করবার দিকেই ওর ঝোঁক বেশী। ও উচ্ছের পায়েস বানিয়েছে, বট গাছকে ছোট মাটির টবে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাঘের বাচ্ছা আর গরুর বাচ্ছাকে জল খাইয়েছে একঘাটে, অবশ্য দুটোই পোষা। যে বেদের কাছ থেকে মহারাণী বাঁদরটা কিনেছিল সেই ওর নাম রেখেছিল কার্তিক। নাম শুনেই মহারাণীর খেয়াল হ'ল ময়ূরের পিঠে ওকে চড়াতে হবে। কাজটা দুঃসাধ্য। কার্তিক রঘু দুজনেই এতে নারাজ। কিন্তু মহারাণীর জেদও কম নয়, কলা-কৌশলও নানারকম। অনুরোধ উপরোধ যখন ব্যর্থ হ'ল তখন শুরু হ'ল জবরদস্তি। রঘুর পা ডানা বেঁধে কার্তিককে জোর ক'রে চড়িয়ে দেওয়া হ'ত তার পিঠে, কার্তিকেরও হাত পা বাঁধা। পিঠের সঙ্গে বেঁধেই দেওয়া হ'ত তাকে। কিছুদিন এই ভাবে চলবার পর রঘু আর কার্তিক দুজনেই বুঝল যে তাদের আপত্তি আর টিকবে না। মনিবটা বড্ড বেশী রকম জেদী। কার্তিক এও অনুভব করল রঘুর পিঠে চড়তে খুব খারাপও লাগে না, বরং গাছের ডালের চেয়ে ওর পিঠ বেশী মোলায়েম। রঘুও দেখলে খারাপ একটু লাগছে বটে কিন্তু যত খারাপ লাগবে আশঙ্কা হয়েছিল তত খারাপ নয়, তাছাড়া মনিবের যখন অত ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত কার্তিককে পিঠে চড়তে দিয়েছিল সে। রঘু দুর্দমনীয় পুরুষ ময়ূর। বাগানের সমস্ত সাপ ধ্বংস করেছিল, বিশ্বম্ভর ষাঁড়টা পর্যন্ত তার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। একদিন তার পিঠে চড়ে মাথার ঠিক মাঝখানটিতে এমন ঠোকর দিয়েছিল যে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়েছিল তাকে। মহারাণী ওর রঘু নাম রেখেছিল শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, রঘু ডাকাতকে স্মরণ ক'রে। এই রঘুর পিঠে কার্তিককে চড়ানো কৃতিত্বের কথা নয়। শ্রীহর্ষ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ময়ূরবাহন কার্তিকের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মহারাণী ছাড়া এ আর কেউ পারত না মনে হ'ল তাঁর।

"অসাধ্য সাধন করেছ সত্যি"—তারপর একটু থেমে একটু ইতঃস্তত ক'রে নিজের কথাটা পাড়লেন।

"কিন্তু আমি যে একটা মুশকিলে পড়ে গেছি, সেটার কিছু করতে পার—?"

"কিসের মুশকিল ?"

শ্রীহর্ষ সব খুলে বললেন। শুনে মহারাণীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল সে।

"হাসছ যে?"

"এতে আর মুশকিলটা কি। ঘরজামাই হ'তে না চাও, হয়ো না।"

"কিন্তু—"

ইতস্তত ক'রে থেমে গেলেন শ্রীহর্ষ। বলতে পারলেন না যে যদিও তিনি ঘরজামাই হ'তে রাজী নন কিন্তু অন্য জায়গায় বিয়ে হ'লে মহারাণী যে চিরকালের মতো অপরের হয়ে যাবে এই নিদারুণ সত্যের সঙ্গেও আপোষ করতে রাজি নন তিনি। কিন্তু এত কথা তাঁর মুখ দিয়ে সেদিন বেরুল না! দু'জনের ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে কেটেছে, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে না এ কথা কারও অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু কেতাবী ভাষায় যাকে প্রেমালাপ বলে ত কোনওদিন হয় নি তাদের মধ্যে।

মহারাণী হাসিমুখে চেয়ে ছিল তাঁর মুখের দিকে।

"কিন্তু কি?"

যে কথাটা স্পষ্টভাবে অকপটে বললে সমস্যাটার জট খুলে যেত, সে কথাটা কিন্তু শ্রীহর্ষ বললেন না, বলতে পারলেন না। সমস্যাটার অপর দিকটা উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস পেলেন বরং।

"আজ প্রস্তাবটা হীরু নাপিতের মারফত এসেছে, কিন্তু কাল যদি তোমার বাবা নিজেই এ কথা আমাকে বলেন তখন কি ক'রে আমি তাঁর মুখের উপর 'না' বলব?"

"বোলো না, চুপ ক'রে থেকো—"

এর বেশী আর কথাটা এগোয়নি সেদিন। মহারাণীর অন্যমনস্কতার সুযোগে কার্তিক রঘুর পিঠ থেকে নেবে পালিয়েছিল আর রঘু পেখম মেলে নাচছিল তার নবাগতা প্রেয়সী ময়ূরীটির সামনে। মহারাণী তার নাম রেখেছিল নবমী, কারণ এর আগে আরও আটজন এসেছিল।

"নবমীকে দেখলেই রঘু নাচে আজকাল। ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না—"

এরপরই পোকা-ওলা জিতু এসে পড়ল পাখীদের খাওয়াবার জন্য। মহারাণীর পশু-পাখী পোষবার খুব শখ। পাখী তো নানারকম ছিলই, পশুও ছিল অনেক রকম, সিংহ, বাঘ, শেয়াল এমন কি উদ্‌বেরাল, সজারু পর্যন্ত। পোকা-ওলা জিতু ওস্তাদ ছিল এসব বিষয়ে। এর জন্য নিষ্কর জমি ভোগ করত সে অনেকখানি। জিতু এসে পড়াতে কথাটা আর এগোল না। সমস্যার সমাধান হ'ল না। একটু পরে চলে আসতে হ'ল শ্রীহর্ষকে।

সমুদ্রবিলাস পরদিনই খবর পেলেন রসরাজের কাছ থেকে।

রসরাজ রসিকতা ক'রে বললেন, "হুজুর, শৃগালটি মলত্যাগ করবার জন্য পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন। হীরু নাপিতকে দিয়ে পেড়েছিলাম কথাটা, হীরু বললে তিনি শৃঙ্গ থেকে নামবেন না। হ'ল ত?"

কথাটা শুনে হঠাৎ রোখ চ'ড়ে গিয়েছিল সমুদ্রবিলাসের। ওইটুকু ছেলের এত বড় স্পর্ধা! ডেকে পাঠালেন তাঁকে। সমুদ্রবিলাসের সম্মুখীন হয়ে শ্রীহর্ষ কিন্তু নিজের মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারলেন না। বাল্যকাল থেকে যাঁকে সম্ভ্রম ক'রে এসেছেন, যিনি পিতৃবন্ধু, যিনি মহারাণীর বাবা তাঁর মুখের উপর তিনি বলতে পারলেন না যে আমি মহারাণীকে বিয়ে ক'রে আপনার ঘর-জামাই হ'তে পারব না। মহারাণীকে পাওয়ার জন্যে তার সমস্ত সত্তা বহুদিন থেকে উন্মুক্ত হয়েই ছিল, হাটের মাঝখানে, বিশেষত জ্ঞাতি-শত্রু নিরঞ্জনের সামনে হীরু কথাটা অমন বিশ্রীভাবে পেড়েছিল বলেই তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, তা না হ'লে মহারাণীকে বিয়ে না করবার কল্পনাও করতে পারতেন না তিনি। সমুদ্রবিলাসকে সম্মতি জানিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি তখন তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি হেঁটে যাচ্ছেন না, উড়ে যাচ্ছেন, যেন তাঁর দু'খানা পাখা গজিয়েছে, এখনই হয়তো আকাশে উড়ে ইন্দ্রধনুলোকের ইন্দ্রত্ব পদে সমাসীন হবেন।

·· সব যখন ঠিক, তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল একটা।

মহারাণী সমুদ্রবিলাসকে জানিয়ে দিল সে শ্রীহর্ষকে বিয়ে করবে না।

"কেন?"

'ওকে পছন্দ নয় আমার।"

মেয়ের মুখে এরকম স্বাধীন মতামত শুনবেন প্রত্যাশা করেননি সমুদ্রবিলাস। রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। তার উল্টো ধারণাই ছিল বরাবর। তিনি ভেবেছিলেন মহারাণী শ্রীহর্ষকে ভালোবাসে, বিয়ে হ'লে দুজনেই সুখী হবে, তিনিও নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু এ কি বলছে মহারাণী!

একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, "ঝগড়া হয়েছে নাকি!"

"ঝগড়া কেন হ'তে যাবে। সাত চড়ে কথা কয় না, ওরকম লোকের সঙ্গে ঝগড়া হ'তে পারে নাকি কারও?"

"তোদের দুজনের ছেলেবেলা থেকে এত ভাব, বিয়ে করতে আপত্তি করছিস কেন। খুব ভালো ছেলে শ্রীহর্ষ।"

ঘাড় বেঁকিয়ে মহারাণী বললে, "না, ওকে আমার পছন্দ নয়।"

অপরের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা রাখতেন না সেকালের জমিদারেরা, তাঁদের পছন্দ অনুসারেই চলতে হ'ত সকলকে। কিন্তু একমাত্র মেয়ের অপছন্দকে তুচ্ছ করতে সাহস করলেন না সমুদ্রবিলাস।

"এমন সুপাত্রটিকে নাকচ ক'রে দিচ্ছিস, কি নিয়ে থাকবি সারাজীবন?"

এর উত্তর না দিয়ে মুচকি হেসে মহারাণী চলে গেল অন্দরমহলে।

তারপর দেখা গেল সে তার নতুন-কেনা পাহাড়ী ঘোড়া পবনের পিঠে চ'ড়ে বেরিয়েছে হাওয়া খেতে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে আরও দুটো পাহাড়ী ঘোড়ায়

দুজন হাবসি খোজা ঘোড়সোয়ার। অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী তারা, মহারাণীকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে। মহারাণী যখন বেরোয় তখন রক্ষক হিসাবে সঙ্গেও চলে তারা। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের আদর্শটা সেকালের অভিজাতবংশীয় মেয়েদের মধ্যে চলতি হয়েছিল কিছুদিন। সমুদ্রবিলাস এটা তেমন পছন্দ করতেন না, কিন্তু মেয়ের আবদার রক্ষা করতে হয়েছিল। মেয়ে যখন ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে গেল তখন তার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন তিনি, তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

দিন কয়েক আগে পর্বতবিলাস আবু পাহাড় থেকে ফিরেছিলেন। পরামর্শ করবার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালেন তিনি। সব কথা খুলে বললেন তাঁকে। সব শুনে পবর্ত-বিলাস বললেন, "ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করো না দাদা। বরং ও যাতে আর পাঁচ রকম ব্যাপারে মেতে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা কর। চিড়িয়াখানা আর বাগান নিয়ে ওর খানিকটা সময় কাটছে বটে, ঘোড়ায় চড়তেও বেশ শিখেছে, কিন্তু আমার মনে হয় ওসব বেশীদিন ভাল লাগবে না ওর। নওলকিশোর বা জামন বাইজীর কাছে গান শিখতে শুরু করুক। গানে যদি মেতে যেতে পারে তাহলে আর ভাবনা নেই, ওই নিয়েই সারাজীবন মশগুল হয়ে থাকতে পারবে। আর গান যদি না ভালো লাগে তাহলে মন্তর নিক। আমাদের ভব-দাই দিতে পারেন, একজন উঁচু দরের সাধক উনি, যদিও বাইরে কোন প্রকাশ নেই।"

রক্তাম্বর-পরিহিত ত্রিপুণ্ড্রক-লাঞ্ছিত-ললাট পর্বতের দিকে চেয়ে রইলেন সমুদ্রবিলাস ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে। তারপর বললেন, "এসব উদ্ভট খেয়াল তোমার মাথায় আসছে কেন ? মেয়েকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করাই প্রত্যেক পিতার কর্তব্য। শ্রীহর্ষের সঙ্গে বিয়ে হ'লে ভাল হ'ত, ওকে ঘর-জামাই করতে পারতাম। কিন্তু মহারাণীর ওকে পছন্দ নয়। মুশকিলে পড়েছি তাই। ওর বয়স চোদ্দ পেরিয়ে গেল, গৌরীদান তো হ'লই না, এখন পূর্ব-পুরুষরা নরকস্থ হচ্ছেন। কিন্তু করি কি, আমি অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছি, কিন্তু মনোমত পাত্র জুটছে না। ভাল ঘরের কোন ছেলেই ঘরজামাই হতে চায় না। রংড়ার কুলেশ বাঁড়ুয্যে, বেদগ্রামের ভরত গাঙ্গুলী, সনজার নৃপতিমোহন, প্রত্যেকেরই ভাল ছেলে আছে, বিষয়ের লোভে প্রত্যেকেই বিয়ে দিতে রাজিও আছে, কিন্তু ঘরজামাই হ'তে চাচ্ছে না কেউ। অথচ মহারাণী আমার একমাত্র মেয়ে ওকে আমি দূরে পাঠাতে পারব না।"

"সবই বুঝলাম"—ঈষৎ হেসে উত্তর দিলেন পর্বতবিলাস—"কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ দাদা --"

"কি কথা ?"

"বিশ্বদেব শর্মার অভিশাপটা। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর অভিশাপ ফলবে। তাই আমার মনে হয় মহারাণী যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তা হলেই সেটা যথেষ্ট সৌভাগ্য

ব'লে মেনে নেওয়া উচিত আমাদের। বিয়ের পরই ও যদি বিধবা হয়, কিম্বা মৃতবৎসা হয় তাহলে সেটা আরও দুঃখের হবে—"

"তুমি ব্রহ্মশাপে বিশ্বাস কর ?"

"করি। বিন্ধ্যাচলে বিশ্বদেবের সঙ্গে আর একবার দেখা হয়েছিল আমার। তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। আমাকে দেখে তিনি আবার অভিশাপ দিলেন। আমরা মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে বাস করছি। এর মধ্যে বাইরের লোককে টেনে আনা অনুচিত মনে করি আমি।"

"তোমার মত শুনলুম, কিন্তু মহারাণীর আমি বিয়ে দেব। গালুটির বড় তরফের ভালো ছেলে আছে একটি। যদিও সে-ও ঘরজামাই হতে চাইবে না, কিন্তু ওরা পাশের গ্রামেই থাকে, ওইখানেই কথাটা পাড়তে চাই। ছেলেটির নাম মহেন্দ্রনাথ। আমার ইচ্ছে তুমিই গিয়ে কথাটা পাড়।"

"আমার মত আপনাকে বললাম। কিন্তু আপনার আদেশ আমি পালন করব। পরশু যাব।"

"পরশু কেন, কালই যাও না।"

"পরশু সর্ব-সিদ্ধা ত্রয়োদশী, কাল দিনটা ভাল নয়।"

পর্বতবিলাস চলে যাবার পর সমুদ্রবিলাস নিরুপায় ক্ষোভে অর্ধস্বগতোক্তি করলেন —"মত, মত, মত, সবাই মত্-বাজ হয়ে উঠেছে আজকাল, এমন কি ওই একরত্তি মেয়েটা পর্যন্ত—এই হো—"

কাউকে ডাকতে হলে "এই হো—" ব'লে চীৎকার করে উঠতেন তিনি।

দেউড়ির সিপাহী ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"নাচঘর ঠিক কর—"

জীমন বাইজী আজকাল বুড়ো হয়ে গেছে। তার মেয়ে দীনাই আজকাল মনোরঞ্জন করে সমুদ্রবিলাসের। সে অবাক হ'ল একটু। দুপুর বেলা গানের আসর বসবে'কি ! কিন্তু রাজাসাহেবের যখন হুকুম তখন বসল। দীনা হাতের বাজুর দোলক দুলিয়ে লীলাভরে হাত তুলে তান ধরল মেঘমল্লারে। গান শেষ হয়ে গেলে সিরাজীর পাত্রটা নামিয়ে রেখে সমুদ্রবিলাস জিগ্যেস করলেন, "এ সময় মেঘমল্লার গাইলে কেন দীনা ? দুপুরে সারং শোনাতো ভালো।"

দীনা মুচকি হেসে অপাঙ্গে চেয়ে উত্তর দিল, "যা গরম, মেঘেরই দরকার এখন—"

সমুদ্রবিলাস বুঝলেন এটা দীনা বাইজীর বিদ্রূপ দুপুরে আসর বসানো হয়েছে ব'লে। চোখ-দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর, তা থেকে উপচে পড়তে লাগল হাসি।

"ও, গরম লাগছে না কি ! এই হো—"

দ্বারপ্রান্তে চাকর এসে দাঁড়াতেই তিনি হাত দিয়ে ইশারা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন পানীয় চাই। বিলিতি মদ আর শরবৎ এল। আসতে একটু দেরী হ'ল, কারণ

সেকালে বরফের তত চলন হয়নি, ঠাণ্ডা করবার জন্যে মদের বোতল পাঁকে পুঁতে রাখতে হ'ত। চাকর পাশের ঘরে সব-সরঞ্জাম রেখে এল, দীনা বাইজী সেইখানেই উঠে গেল।

···সমুদ্রবিলাসের বাবরি ছিল, চাপ চাপ দাড়ি আর গোঁফও ছিল। কিছুক্ষণ পরে মদ খেয়ে তিনি যখন স্তিমিত লোচনে বসে রইলেন, মনে হ'তে লাগল একটা সিংহ ঢুলছে।

সর্বসিদ্ধা ত্রয়োদশীর দিন সকালে তুরুক সোয়ার ইয়াকুব আলি অশ্বারোহণে সদর নায়েবের একটি চিঠি নিয়ে গালুটির বড় তরফের হুজুরকে সেলাম করতে গেল। পত্রে লেখা ছিল ছোটবাবু বিকেলবেলা দেখা করতে যাবেন। পর্বতবিলাস বিকেলে গেলেন সুসজ্জিত হাতীতে চ'ড়ে। গালুটির বড় তরফ রাজেন্দ্রনাথ প্রত্যুদ্গমন ক'রে সমুচিত অভ্যর্থনা করলেন তাঁর। তাঁকে নিজের খাস বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। সাধারণ কুশল প্রশ্নাদির পর পর্বতবিলাস প্রস্তাবটি পাড়লেন অবশেষে, রাজেন্দ্রনাথ ঘাড় কাৎ ক'রে শুনলেন সেটি। কিছুক্ষণ ঘাড় কাৎ ক'রেই রইলেন, তারপর বললেন, "এ তো খুব আনন্দের কথা। আমাদের স্টেট পাশাপাশি, বন্ধুত্বও আছে, সেটা যদি আত্মীয়তায় পরিণত হয় তাহলে তার চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে। কিন্তু একটি শর্ত আছে, ও মেয়েকে ঘোড়ায় চড়া ছাড়তে হবে। ঝাঁসির রাণীকে পুত্রবধূ করা নিরাপদও নয়, সুখেরও নয়।"

পর্বতবিলাসের মুখভাব যেমন সম্ভ্রমপূর্ণ ছিল তেমনই রইল মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না; কিন্তু সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাতসারেই, চোখের দৃষ্টিতে খেলে গেল এক ঝলক বিদ্যুৎ। তিনি যখন কথা কইলেন, তখন বেশ শান্তকণ্ঠে সবিনয়েই বললেন, "আচ্ছা, আপনি যা বললেন তা দাদাকে বলব।"

বৈঠকখানা মহল পেরিয়ে যখন পর্বতবিলাস হাতীতে চড়তে যাচ্ছেন তখন আর একটি ঘটনা ঘটল। পাশেই ছিল ফুলের বাগান, অনেকগুলি ছোট ছোট কুঞ্জ ছিল সেখানে; নানারকম শৌখীন লতা দিয়ে ঘেরা, ফুলে ফুলে ভরা। মাধবী কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল দরবারের গায়িকার কন্যা বেদানা। তন্বী ষোড়শী, নীল শাড়ি নীল ওড়না, চোখে সুর্মার সূক্ষ্ম টান, মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি। সে এগিয়ে এসে সেলাম ক'রে বললে—"বড়কুমার-সাহেবের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন হুজুর?"

"হ্যাঁ—"

একটু ইতস্তত ক'রে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। তারপর সেলাম ক'রে মৃদুগতিতে চলে গেল। পর্বতবিলাস বুঝলেন এ-ও একটি প্রচ্ছন্ন শর্ত। তিনি ফিরে এসে দাদাকে যথাযথ বললেন সব। গুম হয়ে রইলেন সমুদ্রবিলাস। কয়েকদিন গুম হয়েই রইলেন। তারপর তিনি যা করলেন তা সম্ভবত তিনি কখনও করেননি জীবনে। মহারাণীকে একদিন আড়ালে ডেকে বললেন, "আমার একটা অনুরোধ রাখবি?"

"কি ?"

"ঘোড়ায় চড়াটা ছেড়ে দে তুই—"

"হঠাৎ একথা বলছ কেন ?"

"লোকে নিন্দে করছে। তাছাড়া তোর আমি বিয়ে দিতে চাই, ঘোড়সোয়ার মেয়েকে কে বউ ক'রে নিয়ে যাবে বল্।"

"আবার কার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে ?"

"গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে।"

"সম্বন্ধ আগে পাকা হোক তারপর দেখা যাবে।"

"ঘোড়ায় চড়া না ছাড়লে সম্বন্ধ পাকা হবে না।"

"ও, তাই বুঝি। আচ্ছা—"

"শুনলাম তুই ছাতে বাগান করছিস ?"

"হ্যাঁ। কিশোরীকাকা যে মেয়েটিকে এনেছেন তাকে একটা কাজ দিতে হবে তো—"

"ওই বাগান টাগান নিয়েই থাক। ঘোড়ায় চড়া ছেড়ে দে—"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা"র অর্থ সমুদ্রবিলাস বুঝলেন সম্মতি, কিন্তু মহারাণীর মনে ছিল অন্য অর্থ। সে মুখে বলেছিল 'আচ্ছা', কিন্তু মনে মনে বলেছিল, 'আচ্ছা দেখে নেব।'

মহারাণীর বিয়ে নিয়ে পর্বতবিলাস আর মাথা ঘামালেন না। কিছুদিন আগে মন্দার পাহাড়ের এক সাধুর খবর পেয়েছিলেন, সেইখানেই চলে গেলেন তিনি। রাজেন্দ্রনাথকে এবার পত্র লিখলেন সমুদ্রবিলাস স্বয়ং। ম্যানেজার কিশোরীমোহন নিয়ে গেলেন সেটি।

চিঠিতে ভদ্র ভণিতার পর তিনি লিখলেন—"শ্রীমান পারুর মুখে সমস্ত অবগত হইয়াছি। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত। অশ্বারোহণ ব্যাপারে তাহাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছি, সে-ও রাজি হইয়াছে। এবার শ্রীমান শ্রীমতীর যোটক বিচারের ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়। এ বিষয়ে একটু ত্বরা করিতে চাহি, কারণ শরীর অসমর্থ হইয়াছে, কখন কি হয় বলা যায় না। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে মেয়েটিকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারি। আশা করি আপনি বিবেচনা করত যাহাতে আমি ত্বরায় দায়মুক্ত হইতে পারি সে ব্যবস্থা করিবেন।"

বেদানার কথাও পর্বতবিলাস বলেছিলেন অগ্রজকে, কিন্তু সেটার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না সমুদ্রবিলাস। তাঁর মতে ওটা পৌরুষেরই লক্ষণ। যৌবন-কালে অমন দু'একটা লীলা-সঙ্গিনী থাকতই সব বড়লোকদের, তার জন্য বিয়ে আটকাত না কারও। নিজের জীবনের মাপকাঠিতেই সমুদ্রবিলাস বিচার করতেন অপরকে।

রাজেন্দ্রনাথ পত্র পেয়ে খুশী হলেন। ত্বরা করতেও ত্রুটি করলেন না, কারণ তিনি জানতেন বিয়েটা হয়ে গেলেই অত বড় সম্পত্তিটা তাঁরই ছেলের হবে শেষ পর্যন্ত। তাঁর পুরোহিত মশায় এলেন একদিন ঘটা ক'রে, নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে বিচার করলেন কোষ্টিটি এবং রায় দিলেন রাজ-যোটক হয়েছে। এ বিয়ে হবেই, হওয়া উচিতও।

কিন্তু হ'ল না। না হওয়ার কারণটা কি তা কেউ জানে না। পুরাতন ভৃত্য শম্ভু যা বলত তা খুব রহস্যময়! সে বলত, হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো ক'রে সবুজ কিংখাবের বোরখা-ঢাকা এক পালকি এল একদিন সন্ধেবেলা। সঙ্গে বরকন্দাজ এসেছিল। সে বললে, গালুটির বাবুদের বাড়ি থেকে 'জেনানা' এসেছে মহারাণীর সঙ্গে আলাপ করবেন বলে। সমুদ্রবিলাস হুকুম দিলেন, পালকি অন্দরমহলে নিয়ে যাও। অন্দরমহলে পালকি থেকে যিনি নাবলেন, শম্ভুর মতে, তিনি মানুষ নন পরী, কেবল ডানা দুটি ছিল না। শম্ভু বলে সেই পরীর কলা-কৌশলেই নাকি বিয়ে হ'ল না শেষ পর্যন্ত। কারণ সে আসার পর থেকেই একটা না একটা বাগড়া লাগতে লাগল। প্রথম বাগড়া লাগল, আর একজন জ্যোতিষী এসে বললেন যোটক বিচার ঠিক হয়নি। সমুদ্রবিলাস আমল দিলেন না তাকে। তারপর বাগড়া লাগল আশীর্বাদের দিন নিয়ে। কিন্তু আশীর্বাদের দিন-স্থির হ'ল যখন, তখন আসল বাগড়াটি লাগল। এর কারণ যে কি, মূল যে কোথায় তা জানা যায়নি। আশীর্বাদের ঠিক আগে গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়েছিলেন, আর ফিরলেন না। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন তা নির্ণীত হ'ল না অনেকদিন পর্যন্ত। খোঁজাখুঁজির ত্রুটি হ'ল না অবশ্য, কিন্তু তখনকার দিনে পথঘাট সুগম ছিল না, তার-বেতার সংবাদ-পত্রেরও প্রাচুর্য ছিল না এত। লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে চিঠি লিখে লিখে খোঁজখবর করতে হ'ত। রাজেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছ'মাসের আগে কুমারের কোন খবর পাওয়া গেল না। ছ'মাস পরে মহেন্দ্রনাথ নিজেই ফিরে এলেন, কিন্তু বিয়ে হ'ল না, কারণ সমুদ্রবিলাস ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ নিজের অন্তর্ধানের যে কারণ সবাইকে বলেছিলেন তা অদ্ভুত শোনাবে আজকাল। তিনি বললেন, ঘোড়ায় চ'ড়ে তিনি শিকার করতে গিয়েছিলেন, জঙ্গলে ডাকাতের হাতে পড়েন, তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক দুর্গম অরণ্যে বন্দী ক'রে রাখে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে এইভাবে কিছুদিন আটকে রেখে পরে ক্রমশ তাদের দল-ভুক্ত ক'রে নেওয়া। তাঁর মতো লোককে নিজেদের দলে টানতে পারলে সব দিক থেকে সুবিধা হ'ত না কি তাদের। এ কল্পনা উদ্ভটও ছিল না সেকালে। অনেক জমিদারের ছেলে আগে ডাকাতি করত। মহেন্দ্রনাথ বললেন অনেক রকম ফন্দি-ফিকির ক'রে তবে পালিয়ে আসতে পেরেছেন তিনি। এজন্য একজন ডাকাতকে তাঁর বহুমূল্য কমল-হীরের আংটিটা নাকি ঘুস দিতে হয়েছে। একথা কেউ অবিশ্বাস করেনি, কারণ এটা অবিশ্বাস্য ছিল না সেকালে। কিন্তু সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুজনিত কালাশৌচ কেটে যাবার পরও মহেন্দ্রনাথ আর বিয়ে করতে

চাইলেন না কেন তার ঠিক হদিসটা পাওয়া যায়নি। তিনি অজুহাত দেখালেন ডাকাতদের নজর তাঁর উপর একবার যখন পড়েছে তখন সহজে তারা তাঁকে নিস্তার দেবে না। এ অবস্থায় একজন ভদ্রকন্যাকে বিয়ে ক'রে বিপন্ন করার কোনও মানে হয় না। সে যুগের পক্ষে এরকম আচরণ অপ্রত্যাশিত, কারণ ভদ্রকন্যাদের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা সেকালে বিশেষ কেউ করত না, পটাপট বিয়ে করাটাই রেওয়াজ ছিল সে যুগে। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু বিয়ে করতে চাইলেন না। তাঁর মত-পরিবর্তনের চেষ্টাও অনেক হয়েছিল। রাজেন্দ্রনাথ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করবারও ভয় দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। রাজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেখা গেল বেদানার সঙ্গে তাঁর প্রণয়টা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে, প্রকাশ্যভাবে 'বেদানা মহল' তৈরি ক'রে সানন্দে বাস করছেন মহেন্দ্রনাথ। ডাকাতের দলও তাঁকে দলভুক্ত করতে চেষ্টা করেছে এ কথাও আর শোনা যায়নি।

এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষদর্শীটির নাম পলটু। মহারাণীর ঘোড়ার সহিস। সে মহেন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের যে কারণ বলত তা বেশ রহস্যঘন। সে বলত অবশ্য চুপি চুপি চাকরবাকর মহলে। কথাটা সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর আগে প্রকাশও পায়নি, পলটুই প্রকাশ করেনি। পলটু বলত যেদিন গালুটি থেকে কিংখাব-ঢাকা পালকি এল তার চারদিন পরেই ছিল পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমার দিন গভীর রাত্রে মহারাণী নাকি একা ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়েছিল। পলটুও জানতে পারত না, কিন্তু ঘোড়ার জিন-লাগাম ছিল সাজ-ঘরে আর তার চাবি থাকত পলটুর কাছে। তাই তাকে জাগাতে হয়েছিল। মহারাণীর সাজ-সজ্জা দেখে পলটু তো অবাক। মেয়েছেলে ব'লে চেনবার জো নেই, ঠিক যেন রাজপুত্র। বেরিয়ে যাবার আগে মহারাণী তর্জনী আস্ফালন করে পলটুকে বলে গেল, বাবা যেন ঘুণাক্ষরে না জানতে পারেন যে আমি এমনভাবে বেরিয়ে গেছি। সমুদ্রবিলাস যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পলটু কথাটা কাউকে বলেনি। কিন্তু আর একটা কাজ করেছিল সে। মহারাণীর অনুসরণ করেছিল আর একটা ঘোড়ায় চ'ড়ে। শুধু কৌতূহল নয়, আশঙ্কা-মিশ্রিত বাৎসল্যও এ কার্যে প্রণোদিত করেছিল তাকে। মহারাণীকে জন্মাতে দেখেছিল সে, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষও করেছিল। অবাক হয়ে ভেবেছিল সে—এত রাত্রে মেয়েটা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে একলা এমন ক'রে। মানা করলে তো শুনবে না, পিছু পিছু যাওয়াই ভাল। গ্রামের দক্ষিণ দিকের খোলা মাঠটাতেই মহারাণী প্রায় যেত ঘোড়াটাকে নিয়ে। পলটু সেইদিকেই গেল। আর একটু দেরি হ'লে মহারাণীকে আর সে দেখতে পেত না। কারণ, সে যখন মাঠের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখনই দেখতে পেল মহারাণীর ঘোড়া মাঠ পেরিয়ে প্রকাণ্ড আমবাগানটায় ঢুকছে! আমবাগানের ওপারে দিগন্তবিস্তৃত আর একটা মাঠ আছে। আমবাগানের কাছাকাছি এসেই পলটু নামল ঘোড়া থেকে। তার সন্দেহ হ'ল এই বাগানের ভিতর ব্যাপার আছে কিছু।

ঘোড়াটা একটা গাছে বেঁধে পদব্রজে অগ্রসর হ'ল সে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় কিছুদূর গিয়েই সে বুঝতে পারল তার অনুমান মিথ্যা নয়, আর একজন অশ্বারোহী রয়েছেন, গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথ। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এগিয়ে খুব কাছাকাছি এসে আড়ি পেতে রইল পলটু। যা শুনল তাতে চমৎকৃত হয়ে গেল সে। চাকর-বাকর মহলে এই চমকপ্রদ ব্যাপারের যা বর্ণনা করত সে তা গুছিয়ে লিখলে এইরকম দাঁড়ায়।

মহারাণী মহেন্দ্রনাথের কাছে আত্মপরিচয় দেয়নি। কথাবার্তা থেকে পলটুর মনে হয়েছিল সে নিজেকে মহারাণীর দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ বলছিলেন, "বেদানা যে মহারাণীর সঙ্গে দেখা করেছে তা আমি জানি। বেদানাকে অবশ্য আমি ত্যাগ করব না, কিন্তু তা ব'লে আপনার বোনকে বিয়ে করবার লোভও তো আমি ত্যাগ করতে পারছি না।"

"কেন?"

"কেন তা কি সব সময় খুলে বলা যায়?"

"মহারাণী একটা কথা বিশেষ ক'রে আপনাকে বলতে ব'লে দিয়েছে। বলেছে বিষয়ের জন্য আপনি যদি তাকে বিয়ে করতে উৎসুক হ'য়ে থাকেন তাহলে বিয়ে না করলেও চলবে। বিষয়ের প্রতি মহারাণীর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। সে যখন বিষয়ের মালিক হবে তখন নিজের ভরণ-পোষণের মতো সামান্য সামান্য কিছু রেখে বাকিটা আপনাকেই দান ক'রে দেবে।"

মহেন্দ্রনাথ হেসে বাম গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিলেন একবার। তারপর বললেন, "আমি তার দান নেব কেন। তাকে ব'লে দেবেন আমি বিষয়ের লোভে তাকে বিয়ে করতে চাইছি না। আমি লোক মুখে তার অনেক গুণের কথা শুনেছি। সাধারণত বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এমন রূপগুণের সমন্বয় নাকি দেখা যায় না। তিনি লেখাপড়া জানেন, গান বাজনা জানেন, শুনেছি তিনি সাহসী এবং সুরসিকা। এমন রূপসী গুণবতী যদি আমার সহধর্মিনী হন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

"কিন্তু তিনি বেদানাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—"

"কিন্তু ওসব প্রতিশ্রুতির কি কোনও মূল্য থাকা উচিত? বেদানা সামান্য একজন বাইজীর মেয়ে, তার জন্যে আমি কি—"

"মহারাণীর মতে বাইজীর মেয়ে হলেও সে মানুষ। সে আপনাকে ভালবাসে, তার সুখের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার ইচ্ছে মহারাণীর নেই। তাই মহারাণীর অনুরোধ আপনি এ বিয়েটা ভেঙে দিন। মহারাণী নিজেই ভেঙে দিতে পারত কিন্তু কিছুদিন আগে সে একটা সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে, বারবার বাবার মুখের উপর না বলতে তার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"আমিই বা আমার বাবার মুখের উপর 'না' বলি কি ক'রে। তাছাড়া আমি তাঁকে মত দিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি যদি ভেঙে দিতে ইচ্ছে করেন অনায়াসে তা পারেন। মহারাণী বলেছে পুরুষ মানুষে না পারে এমন কাজ নেই। সে একটা সহজ উপায়ও ব'লে দিয়েছে।"

"কি উপায় ?"

"আপনি কিছুদিনের জন্ত দেশ-ভ্রমণ ক'রে আসুন না, কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়ুন বাড়ি থেকে। আপনি অন্তর্ধান করলে আপনাকে খোঁজবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই, বিয়ের কথাটা চাপা পড়ে যাবে।"

"কিন্তু আমি তা করব না। কারণ মহারাণীকে আমি চাই।"

"জোর ক'রে তাকে বিয়ে করবার চেষ্টা যদি করেন তাহলে কিছুতেই তাকে পাবেন না। সে হয়তো আত্মহত্যা ক'রে বসবে, কিন্তু তার এ অনুরোধটা যদি রাখেন তাহলে বরং পেন্তে পারবেন তাকে। মনে মনে চিরকাল ও আপনারই থাকবে। আর আপনি যদি কিছুতে ওর অনুরোধ না রাখতে চান তাহলে আর একটা কথা ও বলেছে, জানিনা এতে আপনি সম্মত হবেন কি না।"

"কি কথা ?"

"সে বলেছে ঘোড়-দৌড়ে আপনি যদি আমাকে হারাতে পারেন তাহলে সে আপনাকে বিয়ে করবে যদি বেদানা অনুমতি দেয়।"

"আপনাকে হারাতে হবে ? মহারাণী নিজেই শুনেছি ভাল ঘোড়সোয়ার। বাজিটা তার সঙ্গে হ'লে আরও খুশি হতাম।"

'কিন্তু সে আমাকেই পাঠিয়েছে।"

"বেশ চলুন, দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে।"

বাগানের ওপারে যে মাঠটা আছে সেইটেতে তখন শুরু হ'ল ঘোড়-দৌড়। পলটু বলে, একবার নয়, তিন তিনবার তাকে হারিয়ে দিলে মহারাণী। তারপর পিরাণের পকেট থেকে একছড়া হীরের হার বার করে মহারাণী মহেন্দ্রনাথকে বললে—"মহারাণী আমাকে এই হারটা দিয়ে বলেছিল যদি হেরে যাও তাহলে এটা দিয়ে এস মহেন্দ্রনাথকে, আর যদি জেত তাহলে তাঁকে অনুরোধ কোরো প্রতিশ্রুতির চিহ্ন স্বরূপ তিনি যেন কিছু একটা দিয়ে দেন।"

মহেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হাত থেকে নিজের আংটিটা খুলে দিলেন তাকে। বললেন, "মহারাণীর আদেশ আমি পালন করব। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে করবার চেষ্টা আর আমি করব না। কিন্তু আমারও একটা অনুরোধ আছে তাঁকে বোলো—"

"বলুন, নিশ্চয় বলব।"

"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"দেখা ক'রে কি হবে ?"

"তাঁকে মুখোমুখি দেখবার একটা কৌতূহল আছে।"

"সে কৌতূহল মিটলে তবে বিয়েটা ভেঙে দেবেন ?"

"হ্যাঁ।"

মাটিতে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ।

হঠাৎ মহারাণী পবনের পিঠে লাফিয়ে চড়ল এবং মহেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বলল, "কৌতূহলটা তাহলে মিটিয়ে ফেলুন। আমিই মহারাণী।"

পরমুহূর্তেই লাগামের ইশারায় পবনের মুখ ঘুরল, বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল সে। মহেন্দ্রনাথ কিছুদূর পর্যন্ত তার অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু নাগাল পাননি।

পলটুর এই গল্প কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানি না। কিন্তু গল্পটা চালু হয়েছিল খুব। পলটু যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে হলপ করে বলত যে সে একবর্ণ অতিরঞ্জিত ক'রে বলেনি। গল্পটা মহারাণীর কানেও গিয়েছিল, শুনে একটু মুচকি হেসেছিল শুধু সে, পলটুকে ভৎ'সনা করেনি।

সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর পর বিয়ের কথাটা চাপাই পড়ে গেল কিছুদিন। কিন্তু বছর দুই পরে তৃতীয় প্রস্তাবও এসেছিল একটা, এবং আশ্চর্যের বিষয় এবার প্রস্তাবটা এনেছিলেন পর্বতবিলাস স্বয়ং। পর্বতবিলাস ছিলেন তখন সুলতানগঞ্জের গৈবীনাথ পাহাড়ে। তিনি একটি পত্রে প্রস্তাবটি পাঠিয়েছিলেন মহারাণীকে। পত্রটি বহন ক'রে আনেন এক সৌম্যদর্শন দীর্ঘকায় যুবক। তিনি অবশ্য সোজা আসেননি, কিম্বা নগণ্য পত্রবাহকরূপেও আসেননি, বেশ সমারোহ সহকারে এসেছিলেন তিনি, সঙ্গে লোকজন ছিল অনেক, পাশের গ্রামে এসেছিলেন প্রথমে। তিনি পর্বতবিলাসের যে পত্রটি এনেছিলেন সেটি আধুনিক সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করলে এইরূপ দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকা সহায়

মোকাম সুলতানগঞ্জ
বিহার

অসংখ্য আশীর্বাদান্তে নিবেদনমেতং,

মা, মহারাণী, মা কালীর অনুগ্রহে আশা করি তোমরা মঙ্গলমত আছ। একটি বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে তোমাকে এই পত্রটি লিখিতেছি। তাগিদটি আমার বিবেক-প্রসূত বলিয়াই আমার নিকট ইহা উপেক্ষণীয় নহে, তাই এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। তুমি বিশেষ চিন্তা করিয়া তবে যথাকর্তব্য স্থির করিবে। ব্যাপারটি তোমার বিবাহ-বিষয়ক। দাদা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন একাধিকবার তিনি তোমার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তখন আমিই তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম বিবাহ না দেওয়াই উচিত, কারণ তুমি বোধ হয় জান আমরা ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত, তাই তখন আমার মনে হইয়াছিল, বিবাহ দিলে তুমি শান্তি পাইবে না, হয়তো অমঙ্গলই হইবে। ঘটনাচক্রে

দাদার জীবদ্দশায় বিবাহ হয়ও নাই। ওই ব্রহ্মশাপের জন্যই আমি কৌমার্যব্রত পালন করিতেছি। কিন্তু একটি আইনের কথা আমার মনে ছিল না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পূর্বে একটি আইন করিয়াছিলেন যে অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে রাজা-মহারাজাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। এখন শুনিতেছি এই আইন নাকি জমিদারদের সম্বন্ধেও বলবৎ হইবে। ইহাও শুনিতেছি অপুত্রক জমিদারদের সম্পত্তি সরকার তাঁহার অনুগৃহীত লোকদের দিবেন। আমাদের বংশের ঘোর শত্রু ছাগলা-পাড়ার জমিদার রটাইয়া বেড়াইতেছে যে আমাদের জমিদারি সে-ই নাকি শেষ পর্যন্ত ভোগ করিবে, কালেক্টার সাহেব তাঁহাকে নাকি একথা বলিয়াছেন। ইহার পর সে আমাদের কালী-মন্দির হইতে দক্ষিণাকালীর বিগ্রহ সরাইয়া সেই স্থানেই নাকি নাড়ুগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিবে, সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে থাকিবে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আমাদের সম্পত্তি পাইলে সে কি কি করিবে তাহা ইতিমধ্যেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। কালনেমির লঙ্কা ভাগের গল্প মনে পড়ে। হয়তো ইহা গুজব মাত্র। কিন্তু এ কথাটা আমার এখন মনে হইতেছে আমাদের বংশরক্ষার চেষ্টাটা অন্তত করা উচিত, চেষ্টা করিয়া যদি কৃতকার্য না হওয়া যায় তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইন্দ্রজিৎ রায়ের বংশধরেরা আমাদের পূর্ব পুরুষের ভিটায় বসবাস করিয়া মা কালীর মন্দিরে নাড়ু-গোপাল স্থাপন করিয়াছে এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। সুতরাং বংশরক্ষার চেষ্টা করিতেই হইবে, ফলাফল অবশ্য মায়ের হাতে। আমার নিজের আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, আমার বয়সও হইয়াছে, তাছাড়া মায়ের সেবায় আমি বহুদিন পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাকেই বিবাহ করিতে হইবে। দাদা বাঁচিয়া থাকিলে কোথাও না কোথাও তোমার বিবাহ দিতেনই। নানা দিক হইতে ভাবিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে অভিভাবক হিসাবে যদি তোমার বিবাহের জন্য চেষ্টিত না হই, দাদার পরলোকগত আত্মা শান্তি পাইবেন না, আমারও কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। তাই আমি তোমার জন্য একটি সৎপাত্রের সন্ধান করিতেছিলাম, মায়ের কৃপায় একটি সৎপাত্র পাইয়াছি। তান্ত্রিক ষোড়শীনাথ একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট একদিন শুনিলাম কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি ব্রাহ্মণ যুবকের কর-কোষ্ঠি বিচার করিয়াছিলেন, তাহার কর-কোষ্ঠিতে নাকি শত-পুত্র হইবার চিহ্ন আছে। কথাটা শুনিয়াই আমার মনে হয় এই পাত্রের সহিত যদি তোমার বিবাহ দিতে পারিতাম তাহা হইলে ইহার ভাগ্য প্রভাবে হয়তো আমাদের বংশরক্ষা হইতে পারিত, হয়তো ব্রহ্মশাপও কাটিয়া যাইত। তখন কিন্তু যুবকটির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ষোড়শীনাথও তাহার সঠিক সংবাদ আর দিতে পারেন নাই। জনৈক কন্যার পিতার অনুরোধে যোটক বিচারের জন্য ইহার কর-কোষ্ঠি দেখিয়াছিলেন, পাত্রটির অপাঘাত-মৃত্যু যোগ থাকায় কন্যার পিতা বিবাহ দিতে অসম্মত হইয়াছেন, ইহার বেশী আর কোন সংবাদ তিনি জানেন না। কিন্তু মহামায়ার এমনই বিচিত্র যোগাযোগ পাত্রটির পুনরায়

নাগাল পাইলাম, শুধু তাহাই নহে, সে নিজেই আসিয়া বিবাহের প্রস্তাবও করিল। গত সূর্যগ্রহণের সময় তুমি বোধহয় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলে, তখন গঙ্গার ঘাটে সে তোমাকে দেখিয়াছিল। তাহার পর সে তোমার খোঁজ লইয়া অবশেষে আমার কাছে আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা তোমাকে বিবাহ করে। তাহার পিতামাতা কেহই জীবিত নাই, সে নিজেই নিজের অভিভাবক। জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমাদের পালটি ঘর। এ সংবাদ অবশ্য তাহারই মুখে শুনিয়াছি, সবিশেষ খোঁজ করি নাই। বিহার প্রদেশের ডিহি দরিয়াপুর গ্রামে ইহার নিবাস। জমিদারি আছে। তাহাকে তান্ত্রিক ষোড়শীনাথের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তিনিই আমাকে গোপনে বলিলেন, এই সেই যুবক যাহার শতপুত্রের পিতা হওয়ার যোগ আছে। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, অনুভব করিলাম হয়তো ইহা মহামায়ারই ইঙ্গিত।

কিন্তু ইহার সহিত বিবাহ বিষয়ে শেষ কথা বলিবার পূর্বে তোমার অভিমত লওয়া প্রয়োজন। তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছ, দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে তোমার একটা মতামত আছে। আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতে চাহি না। এই সব বিবেচনা করিয়া স্বয়ং পাত্রকেই তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। এই পত্র তাঁহার হাতেই পাঠাইলাম। ইনি শুনিয়াছি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ইঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিও।

তুমি অন্তরাল হইতে ইঁহাকে দেখিয়া এবং প্রয়োজন হইলে আলাপ করিয়া আমাকে জানাইও ইঁহাকে তোমার পছন্দ হইল কি না। এই ব্যক্তি শতপুত্রের পিতা হইবে তান্ত্রিক ষোড়শীনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে অত্যন্ত আশান্বিত করিয়াছে। বংশরক্ষা ছাড়াও আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের ওই প্রকাণ্ড বাড়িতে তুমি দাস-দাসী লইয়া একা থাক, তোমার পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই, ইহা বড়ই দৃষ্টিকটু। মিথ্যা করিয়াও কেহ যদি তোমার নামে কলঙ্ক রটায় তাহা আমাদের বংশের মান লাঘব করিবে। যাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইতেছি তিনি সুস্থ, সমর্থ, বলিষ্ঠ পুরুষ। আপাতদৃষ্টিতে তোমার যোগ্য পাত্র বলিয়াই মনে হয়। তোমার সহিত বিবাহ হইলে ইনি ডিহি দরিয়াপুরের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তোমার নিকটেই থাকিবেন এ প্রতিশ্রুতিও আমাকে দিয়াছেন। সবদিক বিবেচনা করিয়া তুমি আমাকে উত্তর দিও। তোমার সম্মতি পাইবার পর আমি ইঁহার বংশ প্রভৃতির সবিশেষ সন্ধান লইব। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক শ্রীপর্বতবিলাস চৌধুরী।

মহারাণীর পাণিপ্রার্থী যুবক উদয়প্রতাপ সরাসরি মহারাণীর বাড়িতে আসেননি, একথা আগেই বলেছি। তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে প্রথমে উঠেছিলেন দাউদপুরের সরাইখানায়। তিনি এসেছিলেন সুসজ্জিত পালকিতে, সঙ্গীরা

অশ্বারোহণে। প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে এল কয়েকখানা গরুর গাড়ি তাঁবু আর তৈজসপত্র বোঝাই ক'রে। গরুর গাড়ির সঙ্গে এল আসাসোটাধারী বরকন্দাজের দল। দাউদপুরের মাঠেই সারি সারি তাঁবু পড়ল কয়েকখানা। বেশ সমারোহ সহকারে ডিহি দরিয়াপুরের জমিদার উদয়প্রতাপ রায় নিজেকে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করলেন মহারাণীর বাড়ির কাছে। রটে গেল তিনি শিকার করবার জন্মে এসেছেন। একটা নেকড়ে বাঘও মারা পড়ল তাঁর গুলিতে। দেখতে দেখতে চারিদিকে বেশ নাম-ডাক হয়ে গেল তাঁর। ঞ অঞ্চলে নিজেকে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর তবে তিনি পর্বতবিলাসের চিঠিখানি পাঠালেন মহারাণীকে। চিঠিখানি এল একটি সুদৃশ্য পালকিতে চ'ড়ে এক রূপসী বাঁদীর মারফতে। পালকির পিছনে এল নানারকম উপঢৌকন। ফুল-ফলের ডালি, মালা কত রকমের, তাছাড়া অনেক রকম মিষ্টান্ন।

মহারাণী তখন নিজের বাগানে সিংহটার সঙ্গে খেলা করছিল। এই সিংহটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ মহারাণীর জীবনে এটিও একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অতি শিশু বয়স থেকে মহারাণী পুষেছে একে, বেশ পোষও মেনেছে। একসঙ্গে দু'জনে শোয় পর্যন্ত এক বিছানায়। এক আর্মানি সাহেবের কাছ থেকে অনেক দাম দিয়ে সে কিনেছিল একে। আর্মানি সাহেব বলেছিল, এটি হচ্ছে আসল আফ্রিকান সিংহের বাচ্ছা। যদি ঠিক মতো পালন করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যিই ও পশুরাজ। সিংহটির সঙ্গে আর্মানি সাহেব একটি কাফ্রি মেয়েকেও বিক্রি ক'রে গিয়েছিল মহারাণীর কাছে। সেকালে লুকিয়ে চুরিয়ে, অনেক সময় প্রকাশ্য ভাবেও, তখন মানুষ বিক্রি হ'ত; মেয়েটার সম্বন্ধে যে কাহিনী আর্মানি সাহেব বলেছিল তা রূপকথার মতো বিস্ময়কর। ওর বাবা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে নানারকম পশু ধ'রে বিক্রি করত। সিংহিনীর কাছ থেকে তার বাচ্ছা কেড়ে আনাই তার বিশেষত্ব ছিল একটা। কারণও ছিল এর। ওর একমাত্র ছেলেকে এক সিংহ মেরে ফেলেছিল। তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য এই দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছিল সে। প্রথম প্রথম সিংহের বাচ্ছা ধ'রে আছড়ে সে মেরেই ফেলত সেগুলোকে। তারপর তার দেখা হয় এই আর্মানি বণিকের সঙ্গে। সে বাচ্ছাগুলোকে মারতে দিত না, কিনে নিত ভাল দাম দিয়ে। এই বাচ্ছাটা কেনার কিছুদিন পরেই লোকটা মারা যায়। তাকেও সিংহের হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। তখনকার লোকেরা এ বিষয়ে যে গল্পটা বলে তা অদ্ভুত। সিংহেরা নাকি এক চাঁদনী রাত্তে মরুভূমির মধ্যে সভা ক'রে জেহাদ ঘোষণা করেছিল লোকটার বিরুদ্ধে। তাদের গর্জনে আকাশ, বাতাস এমনকি চন্দ্র তারা পর্যন্ত কম্পমান হ'য়ে উঠেছিল। তার পরদিন দিবা দ্বিপ্রহরে তারা যা করল তা অভূতপূর্ব। দল বেঁধে গ্রামের ভিতরে এসে লোকটার ঘরে ঢুকে তুলে নিয়ে গেল তাকে। গ্রামসুদ্ধ লোক মার মার শব্দে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এই মা মরা মেয়েটাও সেই ঘরে ছিল, কিন্তু ওকে কিছু বলেনি সিংহরা। আর্মানি সাহেব তার জ্ঞাতিদের কাছ থেকে

মেয়েটাকেও কিনে নেন। তাঁর সঙ্গেই মেয়েটি আছে বরাবর, ও-ই সিংহ-শিশুটির পরিচর্যা করে, এ বিষয়ে ওর বিশেষ দক্ষতা আছে। মহারাণী সিংহের বাচ্ছার সঙ্গে তার পরিচারিকা ম'টেসাকেও কিনে নিয়েছিল। আর্মানি সাহেব সিংহের বাচ্ছার নাম রেখেছিলেন আলেকজাণ্ডার আর ওই জুলু মেয়েটার ইবনি। মহারাণী নাম বদলে দিয়েছিল। সিংহের বাচ্ছার নাম হ'ল মহারাজ আর ইবনির নাম হ'ল কষ্টি। কষ্টি বাংলা শিখেছিল, বুঝতে পারত, কিন্তু বলতে পারত না।

কষ্টিই উদয়প্রতাপের বাঁদীকে নিয়ে এল মহারাণীর কাছে। বাঁদী আভূমি প্রণত হয়ে পর্বতবিলাসের চিঠিখানি মহারাণীকে দিল এবং ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল সিংহটার দিকে। সিংহটাও ঘাড় উঁচু ক'রে নির্নিমেষে দেখছিল এই আগন্তুককে, তার গলার ভিতর থেকে গরগর গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছিল একটা।

"ছিঃ, ও কি অসভ্যতা—"

মহারাণী ছোট একটি চাপড় মেরে তারপর গলা জড়িয়ে চুমু খেলো তার গালে।

মহারাজ প্রশমিত হ'ল। খুশীও হ'ল। মহারাণীর কোলের উপর দুই থাবা তুলে দিয়ে মাথাটা ঘসতে লাগল তার বুকে। মহারাণী তখন ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন বাঁদীর দিকে।

"কার চিঠি?"

"আপনার কাকার। আমার মনিব নিয়ে এসেছেন।"

"কে তোমার মনিব।"

"উদয়প্রতাপ রায়।"

"ও, দাউদপুরেরর মাঠে যাঁর তাঁবু পড়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মহারাণী চিঠিখানি পড়লো আগাগোড়া। তারপর বলল, "আচ্ছা, তোমার মনিবকে আসতে বোলো এখানে। পরদার আড়াল থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করব আমি।"

তার পরদিনই এসেছিলেন উদয়প্রতাপ। অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করেনি মহারাণী। স্বর্ণখচিত আসনে বসতে দিয়েছিল তাঁকে, ভোজ্য এবং পানীয় পরিবেশিত হয়েছিল সোনার বাসনে। যে ঘরে তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছিল তার নিকষ-কৃষ্ণ মেঝের উপর আলপনায় যে ছবিটি চিত্রিত ছিল তা দেখে একটু চমক লেগেছিল উদয়প্রতাপের. হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল এটা কি মহারাণীর কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত? সারা মেঝে জুড়ে একটা বিরাট সাপের সঙ্গে এক বিরাট ময়ূরের যুদ্ধের ছবি আঁকার মানে কি! ছবির অঙ্কনকুশলতায় কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আতর এবং গোলাপজলের গন্ধ আমোদিত ক'রে রেখেছিল সারা ঘরটাকে। অলিন্দে, বাতায়নে, দেওয়ালে দুলছিল

নানা বর্ণের অসংখ্য ফুলের মালা। ঘরের দুধারে দুটো দাঁড়ে বসে গা দোলাচ্ছিল দুটো অপরূপ কাকাতুয়া।

আহারাদি শেষ হবার পর রত্নালঙ্কৃত একটি পানের বাটা হাতে ক'রে ঢুকল মহারাণীর খাস পরিচারিকা শৌরসেনী। নম্র নমস্কার ক'রে পানের বাটাটি উদয়প্রতাপের সামনে নামিয়ে বলল, "ওই পরদার আড়ালে মা এসে বসেছেন। আপনি যা বলবেন বলুন—" এই বলে' আবার নমস্কার ক'রে সে চলে গেল। সুসজ্জিত আরও দুটি পরিচারিকা, রঞ্জাবতী আর মোহিনী আগে থেকেই পিছনে দাঁড়িয়েছিল চামর হাতে নিয়ে।

উদয়প্রতাপ তাদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরাও যাও, আমি যা বলব তা গোপনীয়।"

তারাও বাইরে চ'লে গেল। দ্বারে বিলম্বিত উজ্জ্বল চিক্কণ রেশমের পরদার ওপারে শোনা গেল অলঙ্কারের নিক্কণ। উদয়প্রতাপ প্রত্যাশা ভ'রে চাইলেন সেদিকে। অলঙ্কারের নিক্কণ আর একবার শোনা গেল, কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

উদয়প্রতাপ তখন নিজেই কথা শুরু করলেন।

"আপনার কাকা বলেছিলেন চিঠির উত্তর নিয়ে যেতে। সে উত্তর কখন পাব?"

"উত্তর আমি পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে।"

"আমি কি কিছুই জানতে পারব না?"

"কি জানতে চান বলুন।"

"কি জানতে চাই তা কি আপনার অজানা আছে। যে আশা ক'রে এতদূর এসেছি তা কি পূর্ণ হবে না?"

পরদার ওপার থেকে কয়েক মুহূর্ত কোন উত্তর এল না। পরদাটা দুলে উঠল শুধু একবার। তারপর মহারাণীর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল। "আমি ঠিক করেছি, বিয়ে করব না।"

"সে কি! এমন অস্বাভাবিক সঙ্কল্প কেন?"

"আমি তো ঠিক স্বাভাবিক নই। সকলে সাধারণত যা করে আমি তা করতে ভালবাসি না।"

"কি রকম?"

"এই ধরুন, সাধারণ নিয়ম অনুসারে যদি চলতুম তাহলে আমাকে গঙ্গার ঘাটে দেখতেই পেতেন না আপনি। জমিদারের বাড়ির বৌ-ঝিরা সাধারণত বোরখা-ঢাকা পালকি চ'ড়ে গঙ্গাস্নানে যায়, গঙ্গায় নামবার আগে গঙ্গার ঘাট থেকে জল পর্যন্ত দুধারে কানাত পড়ে। আমি সেদিন খোলাখুলি ভাবেই গিয়েছিলাম—"

"সেই জন্যেই তো মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম সেদিন। আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি অসাধারণ। নিজের মুখে বলা শোভা পায় না, আমিও ঠিক সাধারণ লোক নই, তাই—"

"আপনার সব পরিচয় আমি জানি। আপনাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে আমার অন্দরমহলে আছে, তার কাছ থেকে সব শুনলাম।"

"কে বলুন তো ?"

"সে নিজেকে গোপন রাখতে চায়।"

কথাটা শুনে চুপ ক'রে গেলেন উদয়প্রতাপ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরব হয়েই রইলেন খানিকক্ষণ।

"আমার বাসনা চরিতার্থ হবার কোন আশা নেই তাহলে ?"

"আমাকে ক্ষমা করুন, বিবাহ করবার ইচ্ছে আমার নেই।"

উদয়প্রতাপের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। চোখের কোণে এক ঝলক বহ্নিও চকমক ক'রে উঠল। জীবনে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করেছেন তিনি, অনেক দুর্ধর্ষ শত্রুর মাথা লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ের কাছে, সামান্য একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবেন না কি ! কিন্তু এটাও তিনি অনুভব করলেন, শক্তির হুঙ্কার বা বীরত্বের আস্ফালন বেমানান হবে এখন। মৃদু হেসে তাই তিনি যা করলেন, তা ঠিক অভিনয় নয়, মহারাণীর জন্য সত্যই উতলা হয়ে উঠেছিল তাঁর হৃদয়, কোমল গদগদ কণ্ঠে বললেন, "আমি মিনতি করছি।"

পরদার ওপার থেকে উত্তর এল, "আমিও মিনতি করছি, ক্ষমা করুন আমাকে।"

হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল উদয়প্রতাপের। নেপথ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে না কি ? কোন প্রণয়ী ? কিন্তু তখনই তাঁর মনে হ'ল এখন এ প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই এখানে। খোঁজ করতে হবে। নীরবতা ঘনিয়ে এল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সহসা পরদার দিকে চেয়ে উদয়প্রতাপ বললেন, "হতাশ হয়েই ফিরতে হবে তাহলে ?"

"আবার বলছি ক্ষমা করুন আমাকে।"

এবার আর আত্ম-সম্বরণ করতে পারলেন না উদয়প্রতাপ।

বললেন, "ভিক্ষে ক'রে যা আজ পেলাম না, আশা রইল দাবীর জোরে তা একদিন নিয়ে যাব। চললুম—"

উঠে গেলেন তিনি। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হ'ল ক্ষণকালের জন্য। পরদার ওপারে যেন বজ্রপাত হ'ল। গর্জন ক'রে উঠল মহারাজ। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন না ক'রে চ'লে গেলেন উদয়প্রতাপ।

এরপর আর বিবাহের প্রস্তাব আসেনি। তার সম্ভাবনাটুকুও রহিত হয়ে গেল। খবর এল পর্বতবিলাস কামাখ্যা পাহাড়ে মারা গেছেন। শোচনীয় সে মৃত্যু। কি এক তান্ত্রিক সাধনা করছিলেন সেখানে, হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যান। উন্মাদ অবস্থায় লাফিয়ে পড়েছিলেন পাহাড় থেকে।

মহারাণী যথাকালে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হ'ল। এরপর মহারাণী-চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য দেখা গেল, তাতে অনেকে বিস্মিত হ'ল অনেকে আবার সাধুবাদও করতে লাগল। অন্দরমহলের পুরাতন পুরুষ ভৃত্যেরা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন কোন

পরিবর্তন বোঝা যায়নি, কিন্তু তারা যখন একে একে মারা যেতে লাগল তখন তাদের বদলে আর কোনও পুরুষ নিযুক্ত হ'ল না, নিযুক্ত হ'ল নারী। বাইরের মহলে অবশ্য পুরুষ চাকর না থাকলে চলে না। বরকন্দাজ, বেয়ারা, সহিসের কাজ মেয়েদের দ্বারা হয় না। তারা রইল। কিন্তু রইল বাইরের মহলে। হাতীর বুড়ো মাহুত রহিমের মৃত্যুর পর একজন মাদ্রাজী মেয়ে-মাহুতও জুটে গেল মহারাণীর। রহিমের জায়গায় সে-ই বাহাল হ'ল। অর্থাৎ অন্দরমহলে বিনা অনুমতিতে কোন পুরুষের আর প্রবেশাধিকার রইল না। অবশ্য দুটি পুরুষ ছাড়া। একজন শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থ, আর একজন গালুটির বড়বাবু মহেন্দ্রনাথ। মহারাণীর আমন্ত্রণে এঁরা প্রায় আসতেন অন্দরমহলে। অন্দর-মহলের খিড়কি বাগানে কিন্তু প্রবর্তিত হ'ল বিপরীত নিয়ম, সেখান থেকে স্ত্রী-পশুগুলি অপসারিত হ'তে লাগল একে একে। ময়ূরী আর একটাও রইল না। বাঘ সিংহ একটা করেই ছিল এবং দুটোই ছিল পুরুষ। শেয়াল সজারু উদ্‌বিড়াল মরে যাবার পর আর কেনা হ'ল না। পাখী খরগোস রইল অবশ্য। পুরুষ পাখী পুরুষ খরগোস। কিন্তু বাঘ সিংহ আর ময়ূর এই তিনটে জানোয়ারই বেশী প্রিয় হয়ে উঠল মহারাণীর। কার্তিক আর রঘু মারা গিয়েছিল কিছুদিন আগে। নূতন বাঁদর আর কেনা হয়নি, নূতন ময়ূর কিন্তু এসেছিল, পুরুষ ময়ূর। বাঘ সিংহ আর ময়ূরের জন্য আলাদা আলাদা মহলও করিয়ে দিল মহারাণী। এদের মহলে আর কেউ যেতে পেত না। কষ্টি শুধু যেত পরিষ্কার করবার জন্য, এদের বাকী সেবা যত্ন মহারাণী নিজেই করত—খেতে দিত, খেলা করত, এমন কি গল্পও করত এদের সঙ্গে। মহারাণীর অধিকাংশ সময়ই কাটত এদের নিয়ে। শৌরসেনী মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যেত, এদের কাছে যাবার আগে বিশেষ রকম প্রসাধনও করত মহারাণী। এক একটা মহলে একদিন, কখনও বা উপর্যুপরি দু'তিন দিন যেত সে। গিয়ে অনেকক্ষণ থাকত। আর সে সময় হ'ত এক অদ্ভুত কাণ্ড। অন্য মহল দুটোতে শুরু হ'ত গর্জন আর চীৎকার। মনে হ'ত যেন ঈর্ষা আর ক্ষোভের জ্বালায় ছটফট করছে ওরা। সিংহটা কম চেঁচাত, তার উপেক্ষার ভাব ছিল একটু, কিন্তু ময়ূর আর বাঘ ক্ষেপে উঠত যেন। প্রত্যেক মহল থেকে প্রত্যেক মহলের ভিতর পর্যন্ত দেখা যেত। এই সব চীৎকার চেঁচামেচি নিবারণের জন্য পরদার ব্যবস্থা করেছিল মহারাণী। যে মহলে মহারাণী ঢুকত সে মহলের চারিদিকে পরদা ফেলে দেওয়া হ'ত। এতেও কিন্তু মনোমত ফল হয়নি। একটা মহলে লুকিয়ে ঢুকলেও অন্য মহলের অধিবাসীরা টের পেয়ে যেত, আর প্রতিবাদও জানাত তার-স্বরে। ফলে খিড়কি বাগানের বায়ু-মণ্ডল ময়ূরের কেকায়, বাঘের গর্জনে এবং সিংহের মন্দ্র-নিনাদে স্পন্দিত হ'ত প্রায় প্রতিদিন। বাইরের আশ-পাশের লোকেরা ভয় পেত, অবাক হ'ত। নানারকম গুজব রটেছিল এই নিয়ে। কিন্তু ঠিক খবরটি কেউ জানত না, কারণ জানবার উপায় ছিল না। বাইরে থেকে অন্দরমহলে আসতে পেত না কেউ, অন্দরমহলবাসিনীরাও বাইরে যেত না, খিড়কির বাগানে যাবারও অনুমতি ছিল না তাদের। সুতরাং তারাও

ঠিক খবরটি জানত না। খবরটি জানত শুধু কৃষ্ণাঙ্গিনী কষ্টি। কিন্তু সে বাংলা বুঝত, কিন্তু বলতে পারত না। তাছাড়া সে ভাল ক'রে মিশতেও পারত না কারো সঙ্গে। বাগানের এক প্রান্তে যেখানে হেলে-পড়া আমগাছটাকে কেন্দ্র ক'রে ঝোপ জঙ্গল গজিয়েছিল সেইখানে একটা ছোট ঘর বানিয়ে একা একা থাকত সে. তার একমাত্র কাজ ছিল মহারাণীর সামনে দাঁড়িয়ে ময়ূর. বাঘ আর সিংহের ঘরগুলো পরিষ্কার করা আর মহারাণীর খেয়াল-খুশী মতো সং সাজা। মহারাণী কখনও তাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখত, কখনও বলত চোখ বুজে জিব বার ক'রে বসে থাকতে, কখনও দুহাত তুলিয়ে বসিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে জুলু ভাষায় কঙ্গো দেশের গান গাইত সে একা গাছের উপর বসে। কারও সঙ্গে মিশত না, তাই যা সে জানত তা বাইরে প্রচার করবার সুযোগ ছিল না।···আর একটি কাজও করেছিল মহারাণী। শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল। ওই খিড়কির বাগানের একধারেই হয়েছিল মন্দিরটি। সুদূর রাজপুতানা থেকে এসেছিল শ্বেতপাথরের প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গটি। মিস্ত্রী মজুরও এসেছিল রাজপুতানা থেকে। এর জন্যে কোনও পুরোহিত বাহাল হয়নি। মহারাণী নিজেই পুজো করত, এমন কি মন্দিরও পরিষ্কার করত সে নিজেই। চন্দন-গোলা জল দিয়ে মুছত ঘরের মেঝে। স্বহস্তে ঘি মাখন চন্দন মাখাত শিবলিঙ্গে, তারপর দুধে স্নান করাত তাকে। এই নিয়েও অনেকক্ষণ সময় কাটত তার। যারা বাইরে থেকে পশুদের চীৎকার শুনত তাদের মধ্যে যারা কল্পনা-কুশল তাদের ধারণা হয়েছিল এই চীৎকারের কারণ ওই শিবলিঙ্গ। তারা কল্পনা করত মহারাণীর সঙ্গে ওই পশুরাও বন্দনা করছে পশুপতিকে নিজ নিজ ভাষায়। সেইজন্য পশুদের চীৎকার উঠলেই দেখা যেত বাইরে অনেকে নমস্কার করছে।

পশুরা কেন চীৎকার করে তা কষ্টি অবশ্য জানত। কিন্তু সে এর অর্থ করেছিল নিজের সংস্কার অনুসারে। সে মহারাণীকে সাধারণ মানবী ব'লে মনেই করত না। আফ্রিকার আদিবাসিনী সে, তার সংস্কার তাকে ব'লে দিয়েছিল এই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা তন্বীটি সেই জাতের মেয়ে যে জাতের ছিল এলোকেশী টকুমা। টকুমাকে সে ভোলেনি। গভীর অরণ্যবাসিনী টকুমা থাকত সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হয়ে, বেবুন শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দোল খেত বনস্পতির ডালে ডালে। তার কুঞ্চিত আলুলায়িত কৃষ্ণ চিকুরে সাধারণ তেল পড়ত না কখনও, তবু কিন্তু রুক্ষ ছিল না তা, চুলে সাপের চর্বি মাখাত সে। সে যখন দোল খেত তার চুলের গোছা দেখে মনে হ'ত একগোছা সর্পশিশু যেন ফণা তুলে দুলছে তার পিঠের উপর। তার কাছে ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে যেত অনেকে। তার বাবা একবার গিয়েছিল, কষ্টিও সঙ্গে ছিল। তার কাছে যেতে হলে একটা নেউল নিয়ে যেতে হ'ত। সেই নেউলটির গলা কেটে সে টাঙিয়ে দিত অগ্নিকুণ্ডের উপর। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ত অগ্নিকুণ্ডে, ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে শব্দ হ'ত, ধোঁয়া উঠত কুণ্ডলী পাকিয়ে। সেই ধোঁয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত টকুমা। কখনও হাসত হি হি ক'রে, ফুঁপিয়ে কাঁদত কখনও, কখনও আবার দু'হাত তুলে নাচত। আচ্ছন্নের মতো হ'য়ে যেত

খানিকক্ষণ, সেই অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করত সে। যা বলত তা ফ'লে যেত। সে ব'লে দিয়েছিল তার বাবা প্রাণ হারাবে সিংহের কবলে, ব'লে দিয়েছিল তার জীবন কাটবে সমুদ্রপথে এক বিদেশিনী শক্তিময়ী নারীর অধীনে। সব ফ'লে গেছে। কষ্টির দৃঢ় বিশ্বাস মহারাণীও টকুমার মতো শক্তিশালিনী। সে স্বচক্ষে দেখেছে টকুমার মতো মহারাণীও সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে থাকে, বিশেষ ক'রে যখন সে পশুদের কাছে যায়। ওই পশুদের সে বশ করেছে যে শক্তি বলে তা সাধারণ স্ত্রীলোকের থাকতে পারে না। ময়ূর বাঘ আর সিংহকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড করে মহারাণী যা অদ্ভুত। অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে কষ্টি। মহারাণীর সামনে ময়ূরটা যখন পেখম তুলে নৃত্য করে তখন মনে হয় মহারাণী যেন মানবী নয় ময়ূরী। আবার বাঘের ঘরে তাকে মনে হয় বাঘিনী। প্রকাণ্ড বাঘটা তার কাঁধের উপর সামনের দুই থাবা রেখে তাকে যেন আদর করতে চায়। মহারাণীর ঘাড়ে মাথা রেখে যে অস্ফুট শব্দ সে করতে থাকে তা ঠিক যেন প্রেমালাপের মতো শোনায়। সিংহটাকে অবশ্য অত চাপল্য প্রকাশ করতে দেখেনি কষ্টি, কিন্তু মহারাণী যখন সিংহের পিঠের উপর চ'ড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তখন মনে হয় তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে, কেশরগুলো ফুলে ওঠে, জ্বল জ্বল করতে থাকে চোখের দৃষ্টি, পুচ্ছের আন্দোলন দেখে মনে হয়, এই বুঝি আত্মসংযম হারাল সে। কিন্তু হারায় না। গম্ভীর হয়ে সহ্য করে সে মহারাণীর উচ্ছ্বসিত সোহাগ-অত্যাচার। মাঝে মাঝে কেবল মৃদু গর্জন করে, মনে হয় মেঘ ডাকছে বহু দূরে। পশুরাজ নিজের শালীনতা হারায়নি, অসংযত হয়নি কখনও। বাঘের মতো পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে আলিঙ্গন করবার চেষ্টা করেনি মহারাণীকে, কোন অশোভন প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়নি তার আচরণে। কিন্তু সিংহের এই উপেক্ষা মহারাণীর যেন পছন্দ হ'ত না। মহারাণী চাইত ময়ূর আর বাঘের মতো সে-ও উতলা হ'য়ে উঠুক। কিন্তু সে হ'ত না। কেশর ফুলিয়ে ব'সে থাকত চুপ ক'রে। কষ্টির বিশ্বাস এজন্য অভিমান হ'ত মহারাণীর। রাগ ক'রে উপর্যুপরি দু'তিন দিন সে যেত না সিংহের মহলে। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আদর করত ময়ূরকে, চুমু খেত বাঘের গালে। সিংহ ঘাড় ফিরিয়ে দেখত সব, মাঝে মাঝে গর্জন করেও উঠত। কিন্তু মহারাণী ফিরে এলে আবার গম্ভীর হয়ে বসে থাকত একধারে। কেশর ফুলিয়ে ল্যাজ নাড়ত খালি। প্রগল্‌ভ হয়ে উঠত না কখনও। মহারাণীর আর একটা আচরণে বিস্মিত হয়েছিল কষ্টি। প্রতি অমাবস্যায় মহারাণী বাইরের কালীমন্দিরে পুজো দিতে যেত। একদিন কষ্টিও গিয়েছিল। কালীপ্রতিমা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। করালবদনা ভীষণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা প্রতিমার সামনে মহারাণীকে প্রণতা দেখে তার মনে হয়েছিল এই দেবতাই বোধহয় মহারাণীর শক্তির উৎস। এই দেবতাকে সে-ও মনে মনে ভক্তি করতে শুরু করেছিল। একদিন মহারাণী দেখে অবাক হয়ে গেল একটা ঝোপের আড়ালে কষ্টি মা কালীর মতো উলঙ্গিনী হয়ে হাত তুলে জিব বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মা কালীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ওরকম করেছিল সম্ভবত।

ইঙ্গিত ছিল এতে। ফলে এই দাঁড়িয়েছিল সে যদিও তারা মহারাণীর অর্থেই প্রতি-পালিত হ'ত কিন্তু মহারাণীকে ভালবাসত না কেউ। মহারাণী নিজের চারদিকে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যার মধ্যে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। নানা লোকে নানা কথা ভাবত। কষ্টি মনে করত মহারাণী অতি-মানবী, পাঁচরি মা ভাবত সময়ে বিয়ে হ'ল না বলেই ও অমন মন-মরা হয়ে একা একা থাকে, আর বাকী সকলের ধারণা ছিল ও অহঙ্কারী। এত বড় বিষয়ের অধিশ্বরী হয়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, সাধারণ মানুষকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।

মহারাণীর এই রহস্যময় জীবনযাত্রার আসল হেতুটা বোধহয় জানতেন শ্রীহর্ষ, সবটা জানতেন না, আভাসে কিছুটা জানতেন। তিনি মনে করতেন তাঁর সঙ্গে মহারাণীর যে সামাজিক বন্ধনটা হব-হব করেও শেষ পর্যন্ত হ'ল না, অথচ যা হয়নি বলেই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে, সেইটেই বোধহয় আসল কারণ। অথচ কি-ই বা করতে পারতেন তিনি এর চেয়ে বেশী। চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি।

শ্রীহর্ষ যখন টোলের পাঠ সমাপ্ত ক'রে সসম্মানে কাব্যতীর্থ হলেন তখন ভবভূতি ভট্টাচার্য ছেলের বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। ভাল বংশ, ভাল ছেলে, নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। সর্বমঙ্গলাকে তিনি পছন্দ ক'রে এলেন। আশীর্বাদ ক'রে পাকা কথা দেওয়ার আগে তাঁর মনে হ'ল ছেলে সাবালক হয়েছে, তার মতটা নেওয়া উচিত।

মত নিতে গিয়ে কিন্তু বিপদে প'ড়ে গেলেন তিনি।

শ্রীহর্ষ বললেন, "আমি বিয়ে করব না।"

"বিয়ে করবে না। আমার একমাত্র ছেলে তুমি, বিয়ে করবে না মানে ?"

এ প্রশ্নে একটু হকচকিয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। তারপর আমতা আমতা ক'রে বললেন, "এ বিষয়ে আমি এখনও মন-স্থির করতে পারিনি। আমাকে মন-স্থির করবার জন্যে কিছু সময় দিন। মনে হচ্ছে এখন বিয়ে করলে আমি অসুখী হব।"

ভবভূতি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তার চোখে মুখে একটা উদভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে প্রথমে বিস্মিত হলেন, তারপর মনে হ'ল ও কিছু একটা লুকোতে চেষ্টা করছে, কিসের জন্য অমন ক'রে আছে ও! তারপর সহসা বুঝতে পারলেন।

"বিশেষ কোন মেয়েকে পছন্দ হয়েছে না কি তোমার ?"

আনত নয়নে চুপ ক'রে রইলেন শ্রীহর্ষ কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মৃদুকণ্ঠে উত্তরটা দিলেন তির্যকভাবে।

"মহারাণী ছাড়া আর কোনও মেয়ের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠতা হয়নি আমার।"

"মহারাণীকে বিয়ে করতে চাও ?"

শ্রীহর্ষ চুপ ক'রে রইলেন।

ভবভূতি বললেন, "আমার আপত্তি নেই। সমুদ্র যখন এ প্রস্তাব করেছিল আমি আপত্তি করিনি। তুমিই আপত্তি করেছিলে, তারপর শুনেছি মহারাণীও আপত্তি করেছিল। এখন তোমাদের দুজনের মত যদি বদলে থাকে আমি দাঁড়িয়ে বিয়ে দেব, নিজের স্বার্থের জন্য তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায় হব না। কিন্তু একথাটাও আমি বলে দিচ্ছি পিতৃ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে আমি কিম্বা তোমার মা পুত্রবধূর বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারব না।"

"তা থাকবেন কেন, এ প্রশ্ন উঠছে কি ক'রে?"

"তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে। দাসখৎ লিখে দিতে হবে একেবারে। মহারাণী আমাদের বাড়িতে আসবে না। এলেও মানাবে না।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীহর্ষ।

ভবভূতি বললেন, "মহারাণীর সঙ্গে এ বিষয়ে তুমি কথা ব'লে দেখতে পার, তোমার অমতে কিছু করতে চাই না।"

বিবাহের প্রস্তাব ভেঙে যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত শ্রীহর্ষ মহারাণীর কাছে যাননি। সমুদ্রবিলাস যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন যাওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মহারাণীর কথা এক মুহূর্ত ভুলতে পারেননি তিনি। অদর্শনটা যেন আরও নিবিড় ক'রে তুলেছিল তাঁর অনুভূতিকে। তিনি বুঝতে পারেননি মহারাণী কেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বাল্যকাল থেকে মহারাণীর সঙ্গে মিশে যে ধারণাটা তাঁর মনে গ'ড়ে উঠেছিল, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অনেক জ্যোৎস্না রাতের স্মৃতি, অনেক ফুলের গন্ধ, অনেক মান-অভিমান, আবদারের মাধুর্য। কত ছোট-খাটো-খুঁটি-নাটি-খেয়াল-খুশীর রত্ন-কণিকা, যে ধারণার মধ্যে বিরহের কোন সম্ভাবনাও ছায়াপাত করেনি কোনদিন, সেই স্বপ্নময় ধারণাটা প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাতে হঠাৎ যখন বদলে গেল, তখন কষ্ট পেয়েছিলেন শ্রীহর্ষ, কিন্তু একেবারে হতাশ হননি। ভেবেছিলেন ওটা মহারাণীর ক্ষণিকের খেয়াল হয়তো। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যখন শুনলেন গালুটির বড়কুমার মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাণীর সম্বন্ধ হচ্ছে, নিজের চোখে যখন দেখলেন স্বয়ং পর্বতবিলাস সুসজ্জিত হাতীর পিঠে চ'ড়ে গালুটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এই জন্য, তখন মনে মনে এতদিন যেটাকে সোনা ব'লে ভেবেছিলেন সেটা পিতলে পরিণত হয়ে গেল হঠাৎ। গালুটির বড় তরফ যে এ বিবাহ দিতে উৎসুক সে খবরও পেয়েছিলেন শ্রীহর্ষ মহেন্দ্রনাথের আকস্মিক অন্তর্ধানের জন্য বিবাহটা কিন্তু স্থগিত হয়ে গেল। শ্রীহর্ষ ভাবলেন মহেন্দ্রনাথ যেদিন ফিরে আসবেন সেইদিনই বিবাহটা হবে। স্বপ্নের আকাশচুম্বী প্রাসাদটা সম্পূর্ণরূপে চুরমার হয়ে যাবে সেদিন। ইতিমধ্যে সমুদ্রবিলাস মারা গেলেন। তার কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথও ফিরে এলেন, কালাশৌচ কেটে গেল, শ্রীহর্ষ প্রতিদিনই আশা করতে লাগলেন এইবার বিয়ের বাজনা বেজে উঠবে, কিন্তু বাজল না। তারপর অসম্ভবই যেন

সম্ভব হ'ল একদিন, যে সোনাটা পিতল হয়ে গিয়েছিল তাতেই আবার সোনালি রং ধরল। মহারাণীর এক দাসী এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল তাঁকে। ছোট চিঠি।

"অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। একেবারে ভুলে গেলে না কি। কাব্য চর্চা করার ফাঁকে যদি ইচ্ছে হয়, এস একদিন।"

তখনও শ্রীহর্ষ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। তার পরদিনই অনধ্যায় ছিল। দাসীকে ব'লে দিলেন, বলে দিও, কাল দুপুরে যাব। তখন বর্ষাকাল। দুপুরেও রাত্রির মায়া নেমেছে, আকাশে থমথম করছে মেঘ, স্নিগ্ধ কোমল হয়ে এসেছে সূর্যালোক, অঞ্জন পরেছে আকাশ বাতাস।···মহারাণী ছিল নিজের মহলে দ্বিতলের অলিন্দে। দাসী সেইখানে নিয়ে গেল শ্রীহর্ষকে। শ্রীহর্ষের মনে হ'ল তিনি যেন কুবেরের অলকা-পুরীতে এসেছেন। প্রতি বাতায়নে দুলছে কদম্ব মালিকা, প্রতি বাতায়নের নীচে সুদৃশ্য ধূপাধার থেকে বিকিরিত হচ্ছে চন্দন-গুগ্‌গুলের সুরভি, অলিন্দের মাঝখানে এক বিরাট শ্বেতমর্মরের পুষ্পাধারে রয়েছে কেয়ার গুচ্ছ, অবগুণ্ঠিত পিঞ্জরের ভিতরে থেকে শিস দিচ্ছে শ্যামা। সুদীর্ঘ অলিন্দের একপ্রান্তে নীল মখমলের চুমকি-খচিত আসনে ব'সে শৌরসেনী মালা গাঁথছে, আর এক প্রান্তে মহারাণী ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে একটা ফুলের দোলনায়, বিরাট একটা আয়নার সামনে। আয়নার কাচটা নীল, নীল অথচ স্বচ্ছ, মনে হচ্ছে নীল মেঘের উপর দুলছে যেন মহারাণী। শ্রীহর্ষ অবাক হয়ে গেলেন, একটু অসহায়ও বোধ করলেন। যে মহারাণীকে তিনি জানতেন এ তো সে নয়, এ যে সত্যিই মহারাণী, সম্রাজ্ঞী! এর নাগাল কি পাবেন তিনি?

শ্রীহর্ষকে দেখেই দোলনা থেকে মহারাণী নেমে এল।

"কি আশ্চর্য, কত বদলে গেছ তুমি, এত ঘন দাড়ি হয়েছে তোমার, এমন বাবরি। ভীড়ের মধ্যে দেখলে চিনতে পারতাম না। মহারাজের মতো অনেকটা দেখতে হয়েছে তোমাকে।"

"মহারাজ কে?"

"আমার পোষা সিংহটা। বস, বস, কোথায় বসাই তোমাকে—"

ব্যস্ত হয়ে উঠল মহারাণী। শৌরসেনী ঘরের ভেতর থেকে মীনা-কাজ-করা রূপোর চৌকি এনে দিলে একটা। এনে দিয়ে আবার যেমন মালা গাঁথছিল, তেমনি গাঁথতে লাগল।

শ্রীহর্ষ বললেন, "তুমি বসবে না?"

"এই যে বসছি।"

দোলনায় গিয়ে উঠল মহারাণী, শ্রীহর্ষ সসঙ্কোচে বসলেন রূপোর চৌকিতে।

"আমাকে ডেকেছিলে কেন, কোন দরকার আছে?"

"দরকার আর কি, অনেকদিন দেখিনি তাই।"

মহারাণী দুলতে লাগল ধীরে ধীরে। আয়নার প্রতিবিম্বটাও দুলতে লাগল। শ্রীহর্ষ

এতক্ষণ মহারাণীর দিকে চেয়ে দেখতে পারেননি ভালো ক'রে। এইবার চাইলেন। দেখলেন মহারাণী তার দিকেই নির্নিমেষে চেয়ে আছে, জলজল করছে চোখ দুটো, যেন দুটো মণি জলছে। চোখোচোখি হ'তেই মহারাণী বলল, "মনে আছে ছেলেবেলার সেই দোলনাটাকে? শিরিষ গাছটা ম'রে গেছে, কিন্তু দোলনাটা আছে এখনও। এইটেই সেই দোলনাটা, সেইটেকেই ফুল দিয়ে সাজিয়েছি। দুলব একটু?"

"দোল।"

স'া ক'রে দোলনাটা সামনে দিয়ে চ'লে গেল অলিন্দের আর এক প্রান্তে। মহারাণীর ওড়নার সুরভিত প্রান্তটুকু শ্রীহর্ষের ললাট স্পর্শ ক'রে গেল। অপর প্রান্তে গিয়ে মহারাণী শৌরসেনীকে বলল, "শরবৎ নিয়ে আয়—"

কয়েকবার দোলনাটা আনাগোনা করল শ্রীহর্ষের চোখের সামনে দিয়ে। প্রতিবারই ওড়নার স্পর্শ লাগল। শ্রীহর্ষ নিজের হাস্যকর পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছিলেন, তবু তাঁর ভালো লাগছিল, তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে দোলনা থামিয়ে নেমে এল মহারাণী।

"জান, আমি যখন দোলনায় দুলি তখন সবাই দেখতে পায় সেটা। যখন দোলনায় থাকি না, তখনও আমার দোলনা থামে না, সেটা কিন্তু দেখতে পায় না কেউ।"

"সেটা কি রকম?"

"মনে মনে দুলি। অনবরত দুলছি। তুমিও এককালে দুলতে। এখন বোধহয় থেমে গেছ, জানি না ঠিক।"

"থামা যায় কি? সারা বিশ্বটাই যে দুলছে।"

শৌরসেনী আরও দু'জন দাসীর সঙ্গে এল ফল, মিষ্টান্ন আর শরবৎ নিয়ে।

এরপর অতি সাধারণ সুরেই চলতে লাগল কথাবার্তা।

হঠাৎ কিন্তু বেসুরো হয়ে গেল শেষকালে।

যাওয়ার সময় মহারাণী বলল, "আবার এস, যখন খুশি এস—"

"যখনই ডাকবে তখনই সাড়া পাবে।"

"ডাকতে হবে?"

এর উত্তরে শ্রীহর্ষ কিছু বললেন না, স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন শুধু। মহারাণী অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হ'ল সহসা।

"আচ্ছা, তুমি তো অনেক ভাল ভাল কাব্য পড়েছ, না?"

"পড়েছি কিছু কিছু।"

"আমাকে প'ড়ে শোনাবে? শুধু শোনালেই হবে না, মানেও বলে দিতে হবে। সংস্কৃত ভুলে গেছি, সেই কবে পড়েছিলাম।"

"বেশ। বর্ষাকালে মেঘদূত জমবে ভাল।"

"কাল থেকেই শুরু কর তাহলে।"

"কাল থেকেই ?"

"হ্যাঁ কাল থেকেই।"

চুপ ক'রে রইলেন শ্রীহর্ষ।

"চুপ ক'রে আছ কেন, বল কাল থেকেই আসব।"

আদেশের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল মহারাণীর কণ্ঠে।

"কাল থেকে পারব না। জরুরি কাজ আছে কয়েকটা। আসব কয়েক দিন পরে।"

মহারাণীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নীচের ঠোঁটটা থর থর ক'রে কেঁপে উঠল।

"আসতে হবে না তোমাকে।"

হঠাৎ ঘরের ভিতর চ'লে গেল মহারাণী।

দ্বার বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

বিস্মিত শ্রীহর্ষ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে চলে গেলেন। এই কথাটিই ভাবতে ভাবতে গেলেন, "কতদিন পরে মহারাণীকে আজ প্রথম দেখলাম। বাইরেটা বদলেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এখনও ঠিক তেমনি অভিমানী আছে দেখছি। একটুও বদলায়নি—" সমস্ত মনটা মাধুর্যে ভরে গেল তাঁর।

দিন কয়েক পরে এক মেঘ-স্নিগ্ধ প্রভাতে মেঘদূত নিয়ে আবার যেতে হয়েছিল শ্রীহর্ষকে। মহারাণীর চিঠি নিয়ে আবার দাসী গিয়েছিল তাঁর কাছে। শ্রীহর্ষ অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন চিঠিখানার দিকে।

"কই, মেঘদূত নিয়ে তুমি তো এলে না। বর্ষা শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন মহারাণী খিড়কির বাগানের পশ্চিম প্রান্তে এক দূর্বা-শ্যামল প্রাঙ্গণে অনেক শাদা খরগোস পরিবৃত হয়ে বসে আছে। শৌরসেনীও রয়েছে সেখানে। খরগোসেরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

"এইখানে বসে শুনবে ?"

"কেন, এখানে হবে না ?"

"তুমি তো ব্যস্ত আছ দেখছি খরগোস নিয়ে, মেঘদূতে মন দিতে পারবে ?"

"খুব। পড়তেই আরম্ভ কর না। তুমি পড়বে আর আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকব, সেটা কি ভালো দেখাবে, তা আমি পারবও না।"

শৌরসেনী একটি আসন পেতে দিল ঘাসের উপর। আরম্ভ হ'ল মেঘদূত-পাঠ। শ্রীহর্ষের মনে হতে লাগল মহারাণী শুনছে না মন দিয়ে। শ্রীহর্ষ যখন পড়ছিল তখন সে কখনও একটা খরগোসকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছিল, কখনও বা আর একটার মুখে ঘাস তুলে দিচ্ছিল, কখনও বা উঠে গিয়ে ধ'রে আনছিল আর একটাকে। শ্রীহর্ষ বিরক্ত হচ্ছিলেন মনে মনে, কিন্তু প'ড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি প্রমাণ পেলেন মহারাণী শুনছে। পূর্ব-মেঘের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করছিলেন তিনি—"তুমি পবন-পথে আরূঢ় হ'লে পথিক বধূগণ আশ্বস্ত হবে, কপাল থেকে অলকদাম সরিয়ে তোমাকে

বিশ্বাস ভরে দি   করবে। তাদের আশা হবে এইবার তাদের স্বামীদের প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে, ...   ণ তারা আর দেশ পর্যটন করতে পারবে না। আমার মতো যে পরাধীন নয়, সে   তোমাকে আকাশে সমুদিত দেখে বিরহ-বিধুরা জায়াকে উপেক্ষা করতে পারে ?"

"পদবী মানে কি পথ ?"

"হ্যাঁ।"

একটা খরগোসকে বুক চেপে ধ'রে মহারাণী বলল, "তোমার কখনও হয়েছে ও রকম ?"

"কি রকম ?"

"মেঘ দেখে বিরহ-বিধুরা প্রিয়াকে মনে পড়েছে ?"

"কালিদাস তো প্রিয়ার কথা লেখেননি। লিখেছেন বিরহ-বিধুরা জায়াং। আমার তো জায়া হয়নি এখনও।"

"ও, জায়া আর প্রিয়া বুঝি এক নয় ? আমারই ভুল হয়েছিল, পড়।"

শ্রীহর্ষ পড়তে লাগলেন, মহারাণী অধর দংশন ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুনতে লাগল। এই ঘটনাটা শ্রীহর্ষের মনে আঁকা হয়ে আছে এখনও। উপর্যুপরি কয়েকদিনই চলেছিল মেঘদূত-পাঠ। উত্তর-মেঘ পড়ার সময় মুচকি হেসে মহারাণী আবার জিজ্ঞাসা করেছিল—"আচ্ছা, কালিদাস যাঁর বিরহের ছবি এঁকেছেন তিনি কি কখনও বিয়ে করা গেরস্থ ঘরের বউ হতে পারেন ? ময়লা কাপড় প'রে, রুক্ষ চুলে, কোলে বীণা নিয়ে যিনি নির্বাসিত যক্ষের নাম-গান করছেন, চোখের জলে বীণার তার পিছল হয়ে যাচ্ছে তবু যিনি মূর্ছনা তোলবার প্রয়াস পাচ্ছেন, যিনি দুঃখে শীর্ণা হয়ে এক-কাতে শুয়ে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন, যিনি এত কাণ্ড করছেন তাঁকে কি গেরস্থের বউ ব'লে মনে হয় ? আমার বিশ্বাস উনি যক্ষ-প্রিয়া, যক্ষ-জায়া নন—"

"তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ?"

মহারাণীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল সে।

এ ছবিটাও ভোলেননি শ্রীহর্ষ। আরও অনেক ছবি আঁকা আছে তাঁর মনে। মেঘদূত-পর্বের পর আরও অনেকবার মহারাণী আমন্ত্রণ করেছে তাঁকে। অনেক স্বর্ণোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর, অনেক বর্ণ-বিচিত্র সন্ধ্যা কাটিয়েছেন তিনি মহারাণীর সঙ্গে; একটা কথা বারবার মনে হয়েছে যদিও—মহারাণী একেবারে একা দেখা করে না কেন, কাছে-পিঠে হয় শৌরসেনী, না হয় আর কেউ থাকে কেন—? তাই বিবাহ-প্রসঙ্গ আর কোনদিন ওঠেনি, মহারাণী নিজে তোলেনি, তিনিও তুলতে সাহস পাননি। তিনি ভাবতেন বাধাটা আপনি একদিন স'রে যাবে, কিন্তু সরেনি। তবু এই সব দিনের স্মৃতিগুলি দুর্লভ সম্পদের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে তাঁর মনে। মনে আছে বিয়ের কথাটা

বলব বলব করেও তিনি বলতে পারেননি। তাঁর সমস্ত অন্তর কানায় কানায় ভ'রে উঠেছিল বার বার, উপচেও পড়েছিল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, গদগদ ভাষায়, ছোটোখাটো নানা অসম্বৃত অসংলগ্নতায়, কিন্তু মুখ ফুটে তিনি বলতে পারেননি কিছু। মহারাণীর ভাব-ভঙ্গীতেও প্রশ্রয়ের কোন ইশারা ছিল না। তাই তাঁর বাবা যখন তাঁকে এ বিষয়ে মহারাণীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে বললেন তখন শ্রীহর্ষ বিপন্ন হলেন একটু। কি বলবেন গিয়ে? কি ভাবে পাড়বেন কথাটা?

...নির্জন নদীতীরে গিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যার বর্ণ-সমারোহ ম্লান হয়ে এল ক্রমশঃ, শুক্লা পঞ্চমীর শশীকলা স্পষ্টতর হ'ল, টিট্টিভের কল-কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠল ওপারের চর। শ্রীহর্ষ উঠে পড়লেন। মন-স্থির করে ফেলেছিলেন তিনি। সোজা চলে গেলেন মহারাণীর কাছে। সোজা কিন্তু পৌঁছতে পারলেন না।

মহলে নূতন যে নৈশ-প্রহরীটা বহাল হয়েছিল সে শ্রীহর্ষকে চিনত না, সে পথ-রোধ ক'রে দাঁড়াল। বললে, "অন্দরমহলে যেতে মানা আছে। আপনার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে খবর পাঠিয়ে দিতে পারি।" একটা অদৃশ্য হস্ত যেন সজোরে চপেটাঘাত করল শ্রীহর্ষের গণ্ডদেশে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, কিন্তু ফিরে আসতে পারলেন না। আর একটা অদৃশ্য হস্ত প্রবলতর আকর্ষণে টানছিল তাঁকে অন্দরমহলের দিকে। প্রহরীকে বললেন, "ভিতরে খবর পাঠাও, শ্রীহর্ষ এসেছে।" খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন দাসী এসে নিয়ে গেল তাঁকে ভিতরে। অন্দরমহলের এলাকায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঘটনা ঘটল—সিংহটার গর্জন শোনা গেল। শ্রীহর্ষের মনে হ'ল কে যেন বজ্রকণ্ঠে ব'লে উঠল—খবরদার। দাসী তাকে মহারাণীর মহলে নিয়ে গিয়ে নীচের একটা ঘরে বসিয়ে বলল, "আপনি এখানে বসুন, রাণীমা খিড়কির বাগানে আছেন। আমি খবর দিচ্ছি।"

একটু পরেই মহারাণী এল।

"বিনা নিমন্ত্রণেই যে আজ ব্রাহ্মণ এসে হাজির। ব্যাপার কি?"

"একটু কথা ছিল তোমার সঙ্গে।"

"ছাতে চল তাহলে। এখানে বড় গরম।"

মহারাণীর দ্বিতলের ছাদটি মনোরম। এখান থেকে নব-প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরটি, এমন কি, শ্বেত পাথরের শিব-লিঙ্গটি পর্যন্ত দেখা যায়। সমস্ত ছাদ জুড়ে প্রকাণ্ড বাগান, নানারকম গামলায় নানারকম ফুলের গাছ। এ বাগানের মালিনী রত্নাবতীও এ বাগানের শোভা। ছিপছিপে দোহারা গড়ন, ধপধপে ফরসা রং, পিঠে দোদুল্যমান ভুজঙ্গ-নিন্দিত বেণী, বেণীতে জড়ানো বেলফুলের মালা। বঙ্কিম গ্রীবা, বঙ্কিম চাহনি, চাহনিতে মাদকতা মাখানো। একে কেন্দ্র ক'রেও নানা গুজব মহারাণীর অন্দরমহলে। মোনার মা বলেন, রত্নাবতী রোজ রাতে দারোয়ানের সঙ্গে ষড় ক'রে

বাইরে যায়, ওর নাগর নাকি পালকি পাঠায় ওর জন্যে, পালকিটি রোজ রাত্রে নাকি অপেক্ষা করে গ্রামের বাইরে দত্তদের আমবাগানের অন্ধকারে। সিন্ধুবালার দলের লোকরা আবার অন্য কথা বলে। সব গুজব ভিত্তিহীনও নয়। অনেকের মতে আবার রঙ্গাবতী নাকি মহারাণীর দূতী, মহারাণীর খবর নিয়ে যায় মহেন্দ্রনাথের কাছে।

রঙ্গাবতী ছাদে গোলাপ জল ছিটোচ্ছিল।

মহারাণীর আদেশে দুটি বসবার আসন এনে দিয়ে আবার গোলাপজল ছিটোতে লাগল। চন্দনকাঠের হালকা আসন দুটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। ওর উপর বসতে সঙ্কোচ হ'তে লাগল।

"দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।"

বসতে হ'ল।

"কিছু খাবে ?"

"না।"

রঙ্গাবতীর দিকে চেয়ে শ্রীহর্ষ তারপর ইতস্তত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "যা বলতে এসেছি তা একা তোমাকেই বলতে চাই। ওকে যেতে বল—"

"রঙ্গা তুই নীচে যা—"

যাওয়ার আগে রঙ্গাবতী শ্রীহর্ষের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গেল একটা। কিন্তু নীচে গেল না। সিঁড়িতে কান পেতে রইল।

"কি গোপনীয় কথা তোমার ?"

"বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন।"

"তা তো করবেনই, অমন ঘন দাড়ি হয়েছে তোমার, আর বিয়ে না দিলে চলে ? এই তোমার গোপনীয় কথা !"

মহারাণীর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শ্রীহর্ষ এটা প্রত্যাশা করেননি, তিনি ভেবেছিলেন খবরটা শুনে মহারাণীর মুখ ম্লান হয়ে যাবে। হাসি দেখে বিব্রতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"মেয়েটি কেমন ?"

"জানি না। নন্দীগ্রামের বিধুভূষণ ন্যায়রত্নের মেয়ে।"

"কোন্‌টি। তাঁর তো অনেকগুলি মেয়ে।"

"মেজ মেয়ে।"

"সর্বমঙ্গলা ? চমৎকার মেয়ে। তাকে আমি দেখেছি। চিন্তার কোনও কারণ নেই তোমার।"

"তুমি কোথায় দেখলে ?"

"বাবার শ্রাদ্ধের সময় ন্যায়রত্নমশায়ের বাড়ির সবাই এসেছিলেন যে। অনেক মেয়ে এসেছিল তো, তার মধ্যে ওই মেয়েটিই সবার চোখে পড়েছিল। ও যদি তোমার

জায়া হয়, তাহলে তুমিও ভবিষ্যতে, মেঘদূতের মতো কাব্য লিখে ফেলতে পারবে একটা—"

শ্রীহর্ষ নীরব হয়ে রইলেন।

"অমন মুখ গোমড়া ক'রে আছ কেন ?"

"বাবাকে বলেছি এখন বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।"

"সে কি! অনিচ্ছের কারণ ?"

মুচকি হেসে শ্রীহর্ষ বললেন, "একজনের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি।"

"কে সে সৌভাগ্যবতী ?"

"তা কি তুমি জানো না ?"

"যার কথা আমি জানি সে তোমাকে বিয়ে করবে না।"

শ্রীহর্ষের মুখটা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। মহারাণীর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুকাল, তারপর বললেন, "লুকোচুরি থাক, আমাকে তুমি চাও না ?"

মহারাণীর চোখের দৃষ্টিতে মাণিক্যদ্যুতি ঝলমল ক'রে উঠল যেন।

"তোমাকে পেলে আমি বর্তে যাব। কিন্তু আমি জানি তোমাকে আমি পাব না। তুমি আমার নাগালের বাইরে।"

"বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"তোমার আর আমার মাঝখানে অনেক দুস্তর বাধা। তোমার আত্মসম্মান, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার বংশমর্যাদা, তোমার বাবা, তোমার মা এসব ডিঙিয়ে তুমিও আমার কাছে আসতে পারবে না, আমিও তোমার কাছে যেতে পারব না।"

"এর কোনটাই তো বাধা বলে মনে হচ্ছে না আমার।"

"কিন্তু আমি জানি ওগুলো বাধা। আমি তোমাকে পুরোপুরি পেতে চাই। তুমি আমাকে ভালবাসনি শ্রীহর্ষ। ভালবাসলে আমার কথার মানে বুঝতে অসুবিধা হ'ত না তোমার। হীরুর মুখে প্রথম যখন বিয়ের প্রস্তাব শুনেছিলে তখনই সেই মুহূর্তে হাটের মাঝখানে আত্মহারা হয়ে পড়নি তুমি। ঘরজামাই হ'লে লোকে কি বলবে এ কথাই সব চেয়ে আগে মনে হয়েছিল তোমার। যদি ভালবাসতে তোমার মনে হ'ত আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু তা তোমার হয়নি।"

"কিন্তু সেইদিনই তো তোমার কাছে এসেছিলাম আমি।"

"এসেছিলে, কিন্তু তোমার হাব-ভাবে সেই সুরটি ঠিক বাজেনি। বরং মনে হয়েছিল বিপদে প'ড়ে আমার কাছে তুমি এসেছ, যদি আমি তোমাকে ঘরজামাই হওয়ার বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। আমি তোমাকে উদ্ধার করেওছিলাম। ঘরজামাই হওয়ার কলঙ্ক তোমার মহিমাকে স্পর্শ করেনি।"

"কিন্তু আমি তো তোমার বাবার অনুরোধে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম।"

"ঘাড়ে দশটা মাথা না থাকলে সমুদ্রবিলাসের অনুরোধ উপেক্ষা করা যেত না। তোমার মাত্র একটি মাথা ছিল। তুমি রাজি হয়েছিলে ভয়ে কিম্বা চক্ষুলজ্জায়। দেখ, শ্রীহর্ষ আমাকে তুমি যত বোকা মনে কর, তত বোকা আমি নই। আমাকে হয়তো একটু আধটু ভালবাস তুমি। কিন্তু এতটা বাস না যে আমার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন করতে পার।"

"সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হবে কেন?"

"হবে। আমার ভালবাসা সর্বগ্রাসী। আমার যে স্বামী হবে আমার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আমিও যার স্ত্রী হব, আমি চাইব সে-ও আমাকে গ্রাস করুক। তার মধ্যে আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলব।"

মহারাণীর মুখে-চোখে প্রলুব্ধ ভাব ফুটে উঠল একটা। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হ'ল, অধর কাঁপতে লাগল। নির্নিমেষে শ্রীহর্ষের দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হ'ল কোনও শ্বাপদ যেন লোলুপ দৃষ্টিতে শিকারের দিকে চেয়ে আছে।

"তোমার কথা বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"পারছ না, কারণ আমি যেমনভাবে তোমাকে ভালবেসেছি তুমি আমাকে সেরকম ভাবে বাসনি। সে যে কি জিনিস তা কল্পনা করাও শক্ত তোমার পক্ষে।"

এইবার শ্রীহর্ষ যেন ধরবার ছোঁবার মতো কিছু পেলেন।

"সত্যি আমাকে ভালবেসেছ? তাহলে আমাকে নাও। আমি নিজেকে দেবার জন্যেই তো এসেছি তোমার কাছে। এতদিন বিরহের চিত্রকূটে ছিলাম—"

"ওটা টোলে-পড়া কাব্যতীর্থের কথা হ'ল। তোমার চোখ-মুখ সে কথা বলছে না। তাছাড়া আমার দিক থেকে আর একটা কথাও বলবার আছে। তোমার আত্ম-অভিমানকে, তোমার চরিত্রকে, তোমার বাবা-মাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার মতো ছেলেকে নষ্ট করতে আমার বিবেকে বাধছে।"

"তোমাকে বিয়ে করলে আমি নষ্ট হয়ে যাব!"

"একেবারে। তোমার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না। আমার হাতের পুতুল হয়ে যেতে হবে।"

"ধর, তাতেই যদি আমি রাজি হই।"

মহারাণীর দৃষ্টি থেকে হাসি পিছলে পড়তে লাগল।

"হিমালয় যদি আমার মুঠোর মধ্যে ধরা দিতে রাজি হয় আমি কি তা বিশ্বাস করব, না তাকে মুঠোয় ধরতে পারব? না, শ্রীহর্ষ, তা হয় না। তোমাকে পেলে আমি বর্তে যেতাম কিন্তু তোমাকে আমি পাব না। তুমি অনেক বড়, অনেক উঁচু—"

এই বলে মহারাণী অদ্ভুত কাণ্ড করলে একটা। হঠাৎ প্রণাম করল শ্রীহর্ষকে। প্রণাম করেই চলে গেল। শ্রীহর্ষ খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলেন, কিন্তু মহারাণী আর এল না। মহারাণী নিজের ঘরে খিল বন্ধ ক'রে কাঁদছিল। সে কান্না কেউ দেখেনি।

এর কিছুদিন পরেই সর্বমঙ্গলার সঙ্গে শ্রীহর্ষের বিয়ে হয়ে গেল। মহারাণীর জেদে এবং খরচে বিয়েতে জাঁকজমক হয়েছিল খুব। রোশন-চৌকি, গোরার বাজনা, আলো আর বাজির প্রাচুর্যে সচকিত হয়ে উঠেছিল ও অঞ্চল। যারা জানত না তারা ভেবেছিল মহারাণীরই বিয়ে হচ্ছে বুঝি। ভবভূতি ভট্টাচার্য মহারাণীকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। বাল্যবন্ধুর মেয়ে, খুব জেদি। তাছাড়া এটাও তিনি অনুভব করেছিলেন যে শ্রীহর্ষকে মহারাণীই ফিরিয়ে দিয়েছে। সে যদি ইচ্ছে করত শ্রীহর্ষকে বেঁধে রাখতে পারত তার প্রাসাদে। মহারাণী সর্বমঙ্গলাকে বহুমূল্য কাপড় অলঙ্কারের সঙ্গে নিজের একটি ছবিও উপহার দিয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরে গালুটির বড় তরফের মালিক তার বাবার নামে একটি টোল স্থাপন করতে ইচ্ছুক হলেন এবং শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে নির্বাচন করলেন সে টোলের অধ্যাপক রূপে। শ্রীহর্ষ এ ভার নিতে যখন সম্মত হলেন তখন তাঁকে একশত বিঘা নিষ্কর জমিও দান করলেন তিনি।

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাণীর সম্পর্কটাও বিচিত্র রকম জটিল অথচ মধুর হয়ে উঠেছিল। যা হ'তে পারত, সবাই যা ধ'রে নিয়েছিল হয়ে গেছে, তা কিন্তু হয়নি। শিবলিঙ্গটি ফাঁপা ছিল না, রঙ্গাবতীর অনুমান এবং রঙ্গাবতী-কর্তৃক প্রচারিত গুজবেরও ভিত্তি ছিল না কোনও। মহেন্দ্রনাথকে বিয়ে করবে ব'লে শ্রীহর্ষকে প্রত্যাখ্যান করেনি মহারাণী। সেদিক দিয়ে মহেন্দ্রনাথকে মহারাণী কোনও প্রশ্রয়ই দেয়নি। কিন্তু এই প্রশ্রয় না দেওয়ার কোন প্রমাণ বাইরের লোক পায়নি। বাইরের লোকের চোখে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত করবার কোন আগ্রহও ছিল না মহারাণীর। বরং মনে হ'ত বাইরের লোকের এই ভুল ভাবটাকে যে যেন উপভোগই করছে হারুণ-অল-রশিদী কায়দায়। সে সত্যি যা নয় সবাই যে তাকে তাই ভাবছে এতে অদ্ভুত ধরনের একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করত সে। এই ভেবে সে আনন্দ পেত যে একা একা সে এমন একটা জগতে আছে যেখানে কল্পনার সাহায্যেও প্রবেশ করতে পারছে না কেউ। তার নাগাল পেতে গিয়ে বারবার ভুল রাস্তায় গিয়ে মিথ্যা গুজবের গোলক-ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোকার মতো।

মহেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, প্রকাশ্যভাবেই আসতেন, কখনও অশ্বারোহণে কখনও হস্তী-পৃষ্ঠে। মহারাণীর খাস গোল-বৈঠকে বসতেন তিনি। একাই বসতেন। কাছে বা দূরে শৌরসেনী-রঙ্গাবতীরা থাকত না। মহারাণীর সঙ্গে আলাপও হ'ত, কিন্তু মহারাণী কখনও মহেন্দ্রনাথের সামনে বেরয়নি। বৃহৎ বৃত্তাকার বসবার ঘরটিতে কুড়িটি দরজা ছিল, আর প্রত্যেক দরজার সামনে ছিল বড় বড় ভারী পরদা। ঠিক বাইরে বৃত্তাকার দালানও ছিল একটি। সেখানেও বসবার জায়গা ছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন ঘরে বসতেন মহারাণী তখন থাকত দালানে। দু'জনের কথাবার্তার মাঝখানে দুলত কুড়িটা পরদা। মহারাণী কখন যে কোন পরদার অন্তরালে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তা অনেক সময় বুঝতে

পারতেন না মহেন্দ্রনাথ। অনেক সময় ধাঁধা লাগত। কখনও মনে হ'ত মহারাণী তাঁর পিছনে রয়েছে, কখনও মনে হ'ত সামনে, কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে। হয়তো মহারাণী ইচ্ছে করেই এই ধাঁধা সৃষ্টি ক'রে মজা দেখত, কিম্বা হয়তো মহেন্দ্রনাথেরই মনের ভুল এটা। আলাপের এই অভিনব পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার আগে দু'জনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল অবশ্য। তার মানে, এর আর একটা প্রাক্ পর্বও ছিল।

•

মহেন্দ্রনাথ যখন নিজের বিষয়ের মালিক হয়ে বসলেন তখন দিনকতক মশগুল হয়ে রইলেন বেদানাকে নিয়ে। বিদেশ থেকে কারিকর শিল্পীরা এসে নির্মাণ করতে লাগল বেদনা-মহল। তাঁর ময়ুরপখীগুলি নানা সাজে সেজে ভেসে বেড়াতে লাগল বধূসরা নদীর জ্যোৎস্নাকুল স্বচ্ছ ধারায় তরঙ্গ-শিহরণ তুলে তুলে। বেদানার কিংখাবে-ঢাকা পালকি মাঝে মাঝে ঢুকত এসে মহারাণীর অন্দরমহলে। গোল-বৈঠকে গানের আসর বসত। দীনা বাইজী তখনও বেঁচে ছিল। সে যা পেন্‌সন্ পেত তাতে অন্যত্র গিয়েও সে সুখে বাস করতে পারত। কিন্তু মালিকের দরবার ছেড়ে সে যেতে চায়নি। নিজের মহলে একবেলা স্বপাক নিরামিষ আহার ক'রে হিন্দু বিধবার মতো জীবন যাপন করত সে। সঙ্গীত-চর্চাও ছাড়েনি। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায়, কখনও বা দ্বিপ্রহরে তার সুর-লহরী ভেসে বেড়াত আকাশে বাতাসে, মনে হ'ত দীনা বাইজী অতীতের দিনগুলি স্মরণ ক'রে যেন কাঁদছে। সমুদ্রবিলাসের স্মৃতি-মন্দিরে দীনা বাইজীই রোজ সুরের প্রদীপ জালিয়ে রাখত। বেদানার পালকি এলে দীনা বাইজীর ডাক পড়ত গোল-বৈঠকে। গানের আসর জমে উঠত সেখানে। সুর উপচে পড়ত যেন চারিদিকে। ময়ূরেরাও বাগানে পেখম তুলে নাচত, চঞ্চল হয়ে উঠত বুলবুলির দল, গিট্‌কিরি দিয়ে দিয়ে সঙ্গত করত তারা, পাহাড়ি ময়নার কণ্ঠে সুর ফুটত। বেদানা নাচত, তবলায় সঙ্গত করত মোহিনী, সেতার বাজাত রত্নাবতী, দীনা বাইজী একধারে বসে স্তিমিত-লোচনে তানপুরায় ঝঙ্কার দিতে দিতে স্বপ্ন দেখত সেই সব দিনের যা আর ফিরবে না।

.. এই ভাবেই চলছিল, এমন সময় নূতন ধরনের ঘটনা ঘটল একটা। মহারাণীর ভালো জাতের নানা রকম পায়রা ছিল। শখ মিটে গিয়েছিল ব'লে কিছুদিন আগে সেগুলো দিয়ে দিয়েছিল সে এক পাখী-ওলাকে। তারই একটা পায়রা একদিন উড়ে এসে বসল মহারাণীর অলিন্দের আলিসায়। দুধের মতো ধপধপে শাদা রং, টুকটুকে লাল চোখ দুটি চুনীর মতো। মনে হ'ল পুরনো মনিব মহারাণীকে চিনেছে সে, ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে দেখল খানিকক্ষণ, তারপর সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এল একটু। মহারাণী হাত বাড়াতেই সে একেবারে উড়ে এসে কাঁধে বসল। তারপরই মহারাণী দেখতে পেল আসল জিনিসটি। পায়রাটির পায়ের গোছে রঙীন কাগজ বাঁধা রয়েছে একটি। মহারাণী চেয়ে দেখল চারদিকে, চেয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। কেউ ছিল না। পায়রাটাকে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। তারপর তার পা থেকে খুলে নিল

কাগজটা। দেখল শুধু রঙীন নয়, সুগন্ধীও, আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে। মহেন্দ্র-নাথের চিঠি। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কিছুতেই ভুলতে পারছি না। গেলে দেখা হবে কি? এক পাখী-ওলা এসেছিল বাড়ীতে, তার কাছে শুনলাম এ পায়রাটি আপনারই ছিল একদিন। তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে আপনার কাছেই ফেরত পাঠালাম আবার। আশা আছে এ পুরাতন মনিবের কাছে ফিরে যাবে। উত্তর যদি দেন, লোক মারফত পাঠাবেন। উত্তরের আশায় রইলাম।"

উত্তর গিয়েছিল হাতীর পিঠে মাদ্রাজিনী মাহুতের হাতে।

মহারাণী লিখেছিল, "এলে খুব আনন্দিত হব। আমাদের ম্যানেজারকে খবর দিয়ে আসবেন। এলে কথাবার্তা হবে।"

দিন সাতেক পরে যথারীতি খবর পাঠিয়ে আইন কানুন বাঁচিয়ে মহেন্দ্রনাথ এলেন একদিন। শৌরসেনী এসে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল তাঁকে অন্দরমহলের গোলবৈঠকে। সেকালের নিয়ম অনুসারে পানের বাটা, আতর দান, গোলাপ পাশ সামনে সাজিয়ে দিয়ে শৌরসেনী মৃদু কণ্ঠে ব'লে গেল—"মা পরদার ওপারে এসেছেন। আপনি আলাপ করুন।"

মহারাণীই প্রথমে কথা কইল।

"নমস্কার। বেদানার মুখে আপনার প্রায়ই খবর পাই। আজ কষ্ট ক'রে এসেছেন, এ আমার পরম ভাগ্য।"

"আমার কাছেও বেদানা আপনার কথা রোজ বলে। আমাদের দুজনের মধ্যে বেদানাই তো সেতু। কিন্তু সে সেতুর উপর দিয়ে অশরীরী-আমরা যাতায়াত করেছি এতদিন ধরে। আজ আশা ক'রে এসেছিলাম সশরীরে সাক্ষাৎ হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মহারাণী।

তারপর বলল, "সম্ভব হ'লে হ'ত, কিন্তু তা যে সম্ভব নয় তা আপনিও জানেন।"

"নয় কেন? পরদাটা সরিয়ে দিলেই তো হয়।"

"যেদিন সম্ভব হবে সেদিন পরদা আপনি সরে যাবে।"

"বাধাটা কি?"

"কিন্তু সেতুই বাধা।"

"কিন্তু বেদানাকে আমি জিগ্যেস করেছি, তার আপত্তি নেই।"

"সেকথা আমাকেও সে বলেছে। কিন্তু আমি তার মনের কথা জানি।"

নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর হঠাৎ মহেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"আপনার দাসীরা আশেপাশে আছে না কি কেউ। এসব আলোচনা বাইরে জানাজানি হবে না তো?"

"না, দাসীরা কেউ নেই আশেপাশে। সবাইকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"কিন্তু খসখস কি একটা আওয়াজ পাচ্ছি যেন ?"

"আমার পোষা সিংহটা বসে আছে আমার পাশে।"

"সিংহ ? কি সর্বনাশ, কিছু বলবে না তো। ছাড়া আছে, না বাঁধা আছে—"

"ছাড়াই আছে। ও বুঝতে পারে কে শত্রু কে বন্ধু। আপনাকে কিছু বলবে না।"

মহেন্দ্র আবার বসে পড়লেন। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল পরদাটা সরিয়ে দিতে।

"সিংহকে পাশে নিয়ে বসে আছেন! অদ্ভুত আপনার শখ তো। আপনার সাহসকেও বলিহারি যাই।"

"মহারাজ জবাব দাও।"

মৃদু গর্জন শোনা গেল পরদার ওপারে। মনে হ'ল সিংহ যেন গম্ভীর কণ্ঠে হাসল একটু। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন পরদাটার দিকে।

মহারাণী সহসা অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হ'ল।

"ওসব কথা থাক। অন্য আর একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি আমি। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, সামনা-সামনিই বলি যদি অনুমতি দেন। ভাবছিলাম চিঠি লিখব।"

"কি বলুন। আপনাকে অদেয় আমার কিছু নেই। সাধ্যাতীত না হ'লে নিশ্চয়ই আপনার আদেশ পালন করব।"

"আমার বিষয়ের ভারটা তাহলে আপনি নিন। ও গুরুভার বহন করবার শক্তি আমার নেই।"

"ওটা আপনি বিনয় ক'রে বলছেন। যিনি সিংহকে স্বচ্ছন্দে পাশে বসিয়ে রাখতে পারেন তাঁর শক্তিতে সন্দেহ করি কি ক'রে।"

"ওই সিংহের জন্তই আমার সমস্ত শক্তি আর সময় খরচ হয়ে যায়। বিষয়ের খোঁজ খবর নেবার মতো উদ্বৃত্ত আর কিছু থাকে না। কিশোরীকাকা মাঝে মাঝে এসে কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে যান, আমি না দেখেই সই করে দি—"

"দেখলেই পারেন।"

"একবার দেখেছিলাম, বুঝতে পারিনি।"

মহেন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন।

"বিষয়ের ভার আমি নিতে পারি। কিন্তু আইনত সে অধিকার দিতে হবে আমাকে।"

"দেব।"

"বিশেষ ক'রে আমাকে এ ভার নিতে বলছেন কেন ? আমার চেয়ে বিচক্ষণ লোক ঢের আছেন। আপনাদের ম্যানেজার কিশোরীবাবুও বেশ পাকা লোক।"

"আপনি জানেন না বোধহয়, আমার দুই সৎ মা এখনও জীবিতা আছেন। তাঁদের দলও আছে। খবর পেয়েছি কিশোরীকাকা একটা দলে যোগ দিয়েছেন।"

"এ জানবার পরও আপনি না দেখে কাগজে সই করেছেন ?"

"না, জানবার পর আর করিনি। কিন্তু কি করব তা-ও ঠিক করতে পারছিলাম না, এমন সময় আপনার কথা মনে হ'ল !"

"তা মনে হ'ল কেন ?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল মহারাণী। মহেন্দ্রনাথের মনে হ'ল হাসির মৃদু গিটকিরি যেন শোনা গেল একটা।

"আপনার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আপনিই তো সব দেখা-শোনা করতেন। তাই বোধ হয় মনে হয়েছে কথাটা।"

"পরের কাজটা আগেই করিয়ে নিতে চান বুঝি। আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এতকাল ধরে যে আশা আমি ক'রে আছি তার সম্ভাবনা কি লুপ্ত হয়ে গেল একেবারে ?"

"ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে। তবে আমি জানি আপনি মহৎ লোক, স্বার্থ-সিদ্ধির আশা না থাকলেও আপনি আমার এ উপকারটি করবেন।"

"নিশ্চয় করব, আর স্বার্থের খাতিরেই করব। আর কিছু না হোক এই উপলক্ষে আপনার দরবারে বারবার এসে আমার আর্জি পেশ করবার সুযোগ তো পাব। আচ্ছা, সামনাসামনি কি কোনদিনই দেখা হবে না ?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "না —"

"লোকনিন্দাকে ভয় করেন ?"

এই ছোট প্রশ্নের উত্তরে মহারাণী যে এমনভাবে এত কথা বলবে তা মহেন্দ্রনাথ আশা করেননি। মহারাণীর কণ্ঠস্বরে বেশ একটু আবেগও লক্ষ্য করলেন তিনি।

মহারাণী বলল, "না। ভয় নিজেকে। বেদানাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি নিজের অসংযমের জন্য যদি তা ভাঙতে হয় তাহলে সেটা মর্মান্তিক হবে আমার পক্ষে। এত মর্মান্তিক হবে যে তারপর আমি আর বাঁচব না। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যিই আমার কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়। তাই আমি সাবধানে থাকতে চাই।"

কথাগুলো বানানো মেকি কথা মনে হ'ল না মহেন্দ্রনাথের। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন এই আত্মগোপনের আসল হেতুটা কি ? তাঁর রক্ষিতা বেদানার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটাই কি সত্যি এত বড় হয়ে উঠেছে ওর কাছে।

ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, "বেদানাকে আমিও ভালবাসি। তাকে ত্যাগ করবার বাসনাও আমার নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক একটা রক্ষিতাকে নিয়ে জীবন কাটানো যাবে না, বিয়ে আমাকে করতেই হবে। বেদানাই আমাকে রোজ অনুরোধ করছে বিয়ে করতে।"

"করুন তাহলে। আপনার পাত্রীর অভাব হবে না।"

"ছোট তরফ, মানে আমার কাকা রোজই একটি ক'রে সম্বন্ধ আনছেন। আর আমি রোজই তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

"বিয়ে যখন করবেনই ঠিক করেছেন তখন ওদের ভিতর থেকে একজনকে বেছে নিচ্ছেন না কেন?"

"এর উত্তর তো আপনার অজানা নেই।"

"তা নেই। কিন্তু আমার বক্তব্যটা আমি আশা করি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি।"

"বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। আপনি 'হাঁ' বলছেন কি 'না' বলছেন তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আর যতটুকু পেরেছি তা-ও আমি স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত নই। আমার কি মনে হচ্ছে বলব?"

"বলুন—"

"আমার মনে হচ্ছে ওটা আপনার নারী-সুলভ ছলনা, আমার আগ্রহের গভীরতা হয়তো মাপছেন। তাতে আমার আপত্তি নেই, আমার বিশ্বাস আছে পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব। আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

"আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু তবু আপনাকে একটা কথা বলছি। আমার সম্বন্ধে আপনার বর্তমান মনোভাব বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকুক এটা কি আপনি চান না?"

"চাই বইকি। নিশ্চয় চাই।"

"তাহলে আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন কেন। আমাদের দু'জনের মাঝখানে এই পরদার আড়ালটুকু যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই তো তা অটুট থাকবে। দিন দিন আরও মধুর, আরও রঙীন হবে হয়তো। সেইটেই কি বেশী বাঞ্ছনীয় নয়? বিয়ে ক'রে সব চুকিয়ে দেওয়া কি ভালো?"

"আপনি যা বললেন তা খুব উঁচুদরের সূক্ষ্ম কাব্য। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা একটু স্থূল রসের চর্চা না করলে তৃপ্তি পাই কি?"

"সে তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে অনেক উপকরণ জুটবে আপনার। জুটেওছে হয়তো। আমার রুচি একটু অন্যরকম। আমি ওই শস্তা উপকরণের দলে গিয়ে ভীড় বাড়াতে চাই না। আপনার মনের কোণে একটু ঠাঁই যদি থাকে তাহলেই আমি কৃতার্থ হব।"

"চিরকালই তাহলে ওই পরদা ঝুলতে থাকবে।"

"তেমন ঝড় যদি আসে, পরদা কেন, আমি সুদ্ধ উড়ে যাব। কিন্তু সে অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভর ক'রে তো কোন হিসাব করা চলে না। আপাতত আমার উপর আপনার অনুগ্রহদৃষ্টি থাকলেই যথেষ্ট মনে করব আমি।"

মহেন্দ্রনাথের ভ্রূযুগল কপালের উপর উঠে গেল।

"ঝড়টা কি রকম ঝড় হবে? আধ্যাত্মিক?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। তবে মানসিক নিশ্চয়ই।"

"আমার মনে ঝড় তো অনেকদিন থেকেই উঠেছে।"

"আমার মনে ওঠেনি।"

"আপনার মনে ঝড় তোলবার জন্যে কি করতে হবে?"

একটু থেমে মহারাণী বললে, "এ প্রসঙ্গ এখন থাক। আমার পক্ষে যেটা বেশী দরকারী সেই কথাই বলুন। আমার বিষয়ের ভার নেবেন তো?"

"নেব। কাল আমার ম্যানেজার একটা কাগজ নিয়ে আসবে তাতে সই ক'রে দেবেন। সেটা আদালতে পাঠাতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ল একটা। নানাসাহেবের নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি বইকি। ইংরেজরা তো তাঁকে ধরতে পারেনি, শুনেছি তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

"ঠিক শুনেছেন। আমাদের কালেক্টার সাহেব তাঁর চেহারার বর্ণনা দিয়ে একটা নোটিস পাঠিয়েছেন। লিখেছেন কেউ যদি নানাসাহেবকে ধরিয়ে দিতে পারে গভর্নমেণ্ট তাঁকে পুরস্কৃত করবেন, রাজ সরকারে আরও নানারকম সুবিধা ক'রে দেবেন। আপনার দফতরেও হয়তো নোটিসটা এসেছে। নি-খরচায় সরকারের সুনজরে পড়বার মস্ত সুযোগ এটা। আর সরকারের সুনজরে থাকলে বিষয়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকবে না।"

কথাটা শুনে মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইল মহারাণী। তারপর বলল, "একটা গোপন কথা কি নির্ভয়ে আপনাকে বলতে পারি?"

"নিশ্চয় বলতে পারেন।"

"নানাসাহেব যদি আমার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন আমি কক্‌খনো তাঁকে ধরিয়ে দেব না। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ যেদিন এখানে পৌঁছল সে দিন আমি সারারাত্রি ঘুমতে পারিনি।"

"আপনার বাবা কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন করতেন না।"

"তা জানি। অনেক বিষয়েই বাবার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না। এ বিষয়েও ছিল না, যদিও মুখ ফুটে তাঁকে সে কথা বলবার সাহস হয়নি। অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন তো। আপনি যদি নানাসাহেবকে মুঠোর মধ্যে পান ধরিয়ে দেবেন নাকি?"

"একথা শোনাবার পর আমিও নির্ভয়ে বলতে পারি কক্‌খনো দেব না। কিন্তু দেখবেন বাইরে যেন কিছুতেই না প্রকাশ পায় একথা। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতির সামান্য প্রমাণ পেলেও গভর্নমেণ্ট নির্দয়ভাবে শাস্তি দিচ্ছে। দুজন জমিদারের ফাঁসি হয়েছে। অনেকের বিষয় বাজেয়াপ্ত হয়েছে।"

"আমার বিষয়ের ভার তো আপনিই নিলেন। রাখতে পারেন থাকবে না রাখতে পারেন থাকবে না।"

"এ কথাটা কিন্তু গোপন থাকে যেন।"

"থাকবে।"

"বেশ, আজ তাহলে উঠলুম। উঠতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু দরবার আছে। আজ অনেক গুলি প্রজা আসবে। আবার কবে আসব ?"

সেদিন মহেন্দ্রনাথ চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে নিয়ে মহারাণীও খিড়কির বাগানে চ'লে গেল, আর এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যে কষ্টিরও তাক লেগে গেল সে সব দেখে। মহারাণী মহারাজের মহলে গিয়ে প্রথমে তাকে খুব আদর করল খানিকক্ষণ। মহারাজ প্রথমটা খুশী হয়েছিল, কিন্তু বেশী ঘাঁটাঘাঁটি পছন্দ করত না সে। মহারাণী তার পিঠে ব'সে গলা জড়িয়ে যখন বারবার আদর করতে লাগল তখন আপত্তি করল সে—ঘাড় ফিরিয়ে ঘ্যাঁউ করে উঠল। এতে মহারাণী ক্ষেপে গেল যেন। সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে গেল, নাসার অগ্রভাগে কম্পন জাগল।

"কি, এত বড় আস্পর্ধা, আপত্তি জানানো হচ্ছে। মজা দেখাচ্ছি—" চাবুকটা বার ক'রে সপাসপ বসিয়ে দিলে ঘা কতক তার পিঠে। অমন প্রবল পরাক্রান্ত পশুরাজ, কিন্তু এই চাবুকটাকে তার বড় ভয়। চাবুক খেয়ে একেবারে কাচুমাচু হয়ে পড়ল,—যেন সিংহ নয়, কুকুর।

"আমার পায়ের উপর মাথা রাখ্—"

এ আদেশ কিন্তু পালন করল না মহারাজ।

"রাখ্, রাখ্ বলছি—"

আবার পড়ল কয়েক ঘা। মহারাজের কেশর ফুলে উঠল, ল্যাজ আছড়াতে লাগল সে মাটির উপর, কিন্তু পায়ের উপর মাথা সে রাখলে না।

"শ্রীহর্ষের মতন আত্মসম্মানী হয়েছেন! রাখ্ আমার পায়ে মাথা। রাখতেই হবে তোকে—"

জোর ক'রে তার মাথাটা টেনে পায়ের উপর গুঁজড়ে ধ'রে রইল মহারাণী। মহারাজ কোন আপত্তি করল না এতে। কিন্তু মহারাণী যেই মাথাটা ছেড়ে দিলে অমনি মাথা তুলে ঘ্যাঁউ ঘ্যাঁউ ক'রে গর্জন করলে দুবার।

যেন বলল, "কি করছ তুমি এসব,—ভাল লাগছে না।"

"হাত জোড় ক'রে থাক।"

মহারাণী তার সামনের থাবা দুটো জোড় ক'রে ধ'রে রইল। কিন্তু ছেড়ে দেওয়া মাত্রই মহারাজের যুক্ত থাবা বিযুক্ত হয়ে গেল আবার। "যা তোর কাছে থাকব না আমি, ওর কাছে যাচ্ছি।"

মহারাণী ছুটে চলে গেল বাঘের মহলে। বাঘটা আগে থেকেই গজরাচ্ছিল, ময়ূরটাও নাচছিল পেখম মেলে তীক্ষ্ণ কেকারব তুলে। বাঘের মহলে যেতেই এক লাফে এগিয়ে এল বাঘটা। তারপর যেমন তার অভ্যাস সামনের থাবা দুটো তুলে দিল মহারাণীর

কাঁধে। মহারাণী দু'হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরল তার। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হ'ল, একটা নয়, অনেকগুলো।

মহারাজ দাঁড়িয়ে উঠে গর্জন করছে।

মহারাণী কিন্তু এমন ভাব করলে যেন শুনতে পায়নি, ভ্রূক্ষেপও করলে না। বাঘকে খানিকক্ষণ আদর ক'রে গেল সে ময়ূরের ঘরে। ময়ূরের সঙ্গে নাচল খানিকক্ষণ। আবার গর্জন করল মহারাজ, শেষকালে লাফিয়ে পড়ল লোহার গরাদের উপর, মনে হ'ল এখুনি বুঝি সব ভেঙে চুরে বেরিয়ে আসবে। মহারাণীর তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেকক্ষণ ওদের ঘরে কাটিয়ে তারপর মহারাণী আবার এসে ঢুকল মহারাজের মহলে। মহারাজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সম্ভবত একধারে বসেছিল সামনের থাবা দুটোর উপর মুখ রেখে। মহারাণী যখন ঢুকল, তখন আড়চোখে সে চেয়ে দেখল একবার, উঠে এল না, মনে হ'ল অভিমান ক'রে বসে আছে। মহারাজের মহলে কাঠের একটা বড় গুঁড়ি ছিল। মহারাণী তার উপর উঠে বসল পা দুলিয়ে। টুকটুকে আলতা-রাঙা পা দুটিতে রোদ প'ড়ে ঝকমক ক'রে উঠল রূপোর গুঞ্জরি-পঞ্চম।

"আয়, উঠে আয়। ইস্, মান ক'রে ব'সে আছেন!"

জিব বার ক'রে, নাক কুঁচকে, ঠোঁট উল্টে ভেংচি কাটল মহারাণী।

"আয় উঠে আয়—"

মহারাজ উঠে এল।

"পায়ের উপর মাথা রাখ্, রাখ্, বলছি।"

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাজ। মাথা তার নত হ'ল না।

মহারাণী তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যা করল তা অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত। কেঁদে ফেলল।

উঠে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগল—"তুইও এমন করছিস? তুইও শ্রীহর হয়ে যাবি?—"

মহারাজের গলা থেকে গর গর ক'রে একটা শব্দ হ'তে লাগল। মনে হ'ল এর উত্তরে সে গদ গদ কণ্ঠে কি যেন বলছে। কিন্তু সে শব্দ ডুবে গেল ময়ূরের মুহুর্মুহু কেকায় আর বাঘের গগন-বিদারী গর্জনে। মনে হ'ল মহারাণীর অন্তরের আলোড়নই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ওদের কণ্ঠে। মহারাণী হঠাৎ আবার দুহাত দিয়ে চেপে ধরল মহারাজের মুণ্ডটা বুকের উপর। পশুমহলের পূর্বদিকে সারি সারি নাগলিঙ্গম গাছ ছিল কয়েকটা। সেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কষ্টি দেখছিল সব। সে তাড়াতাড়ি গাছের একটা কচি ডাল ভেঙে তিনবার কামড়ে সেটা মাটিতে ফেলে দিলে তারপর তিনবার থুতু ফেললে তার উপর। তারপর মহারাণীর দিকে চেয়ে তিনবার মাথা নাড়লে ধীরে ধীরে। এটা ওর একটা তুক্, মহারাণীর মঙ্গলের জন্য। সিংহের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ওর ভাল লাগছিল না। কঙ্গো দেশের মেয়ে সে। যে সব সিংহের

কেশর কালো তাদের প্রকৃতি ভাল করেই জানা আছে তার। মহারাণীর জন্ম তার ভয় হ'ল হঠাৎ।

সেদিন আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল যার খবর কেউ রাখেনি।

মহারাণী যদিও সেদিন মহেন্দ্রনাথকে বললে যে দাসীদের সে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাঁর কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ হবার আশঙ্কা নেই, কিন্তু মহারাণী জানত না যে রঙ্গাবতী নীচে যায় নি, ছাতে চ'লে গিয়েছিল, তারপর নেবে এসেছিল চুপি-সাড়ে। সব শুনেছিল সে। মহারাণীর কাছে যখনই বাইরের কোন পুরুষ আসত তখনই সজাগ হয়ে উঠত রঙ্গাবতীর সমস্ত কৌতূহল। এর কারণ ছিল। দরিদ্রের মেয়ে রঙ্গাবতী, তার ডাক নাম ছিল কুড়োনী। তাকে এক মেলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন কিশোরী-মোহন, তিনি কুড়োনী নাম দিয়েছিলেন তার। অপরূপ সুন্দরী ছিল কিন্তু। একদিন তাকে দেখে মহারাণীর পছন্দ হ'ল খুব, কিশোরীকাকার কাছ থেকে চেয়ে নিলে তাকে। রূপের জোরে কুড়োনী আশ্রয় পেলে অন্দরে তারপর মহারাণীর ছাতবাগানের মালিনী হ'ল সে। রঙ্গাবতী নামকরণ মহারাণীরই। সমবয়সী ছিল ব'লে সখীর মতোই ব্যবহার করত তার সঙ্গে মহারাণী। রঙ্গাবতী যখন যৌবনে উত্তীর্ণ হ'ল তখন তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল অন্দর মহলের সবাই। ক্রমে ক্রমে এই ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে সে-ও কিছু কম নয়। তেমন সুযোগ যদি এসে পড়ে, মানে, তেমন বড়লোকের নজরে সে যদি পড়ে যায় তাহলে রূপের তরী ভাসিয়ে ঐশ্বর্যের সাগরে পাড়ি জমানো অসম্ভব হবে না তার পক্ষে। কিন্তু মহারাণীর আইন অনুসারে বাইরের কোন পুরুষের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না অন্তঃপুরে। তাই যখনই মহারাণীর আমন্ত্রণে কোনও গণ্যমান্য পুরুষের অভ্যাগম হ'ত, রঙ্গাবতী কোন না কোন উপায়ে আড়াল থেকে লক্ষ্য করত তাদের হাব-ভাব, শুনত তাদের আলোচনা, নানা ছুতোয় চেষ্টা করত তাদের সামনে যেতে। এতে তির্যকভাবে একটু যেন তৃপ্তি হ'ত তার। সাধারণ মেয়ে হ'লে এসব কথা অন্দরমহলের আর পাঁচজনের কাছে গল্প ক'রে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করত। কিন্তু রঙ্গাবতী সে ধরনের মেয়ে ছিল না। যা শুনত, যা দেখত নিজের মনের পেটিকায় চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিত সব। চিন্তা করত, সুযোগ খুঁজত, কখন কোন সংবাদটি তার কাজে লাগবে। একটিমাত্র লোক ছিল যার কাছে মন খুলত সে, ম্যানেজার কিশোরীমোহন। মহারাণীর অনুমতি নিয়ে অন্দরমহলের পালকিটায় চ'ড়ে সে মাঝে মাঝে কিশোরীমোহনের বাড়িতে যেত দেখা করতে। কিশোরীমোহনই রঙ্গাবতীকে এনে দিয়েছিলেন, রঙ্গাবতী কিশোরী-মোহনকে দাদু বলত, তাই মহারাণী এতে আপত্তির কিছু দেখেনি। রঙ্গাবতী পালকী ক'রে বেরিয়ে যেত মাঝে মাঝে। আর এই কারণেই তাকে কেন্দ্র ক'রে নানা গুজব গুঞ্জিত হ'ত অন্দরমহলে।

সেদিন মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার একটু পরেই রঙ্গাবতী মহারাণীর কামরায় এল

কিশোরী দাদুর বাড়িতে যাবার জন্ত অনুমতি নিতে। এসে দেখল মহারাণী ঘরে নেই। শৌরসেনী ছিল, সে বলল, "মা সিংহের মহলে আছেন, শব্দ শুনচিস না?"

ও মহলে কারও যাবার হুকুম নেই, সুতরাং রঞ্জাবতীকে অপেক্ষা করতে হ'ল। কিছুক্ষণ পরে মহারাণী যখন নিজের কামরায় ফিরল তখন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল রঞ্জাবতী। চোখ দুটো লাল, বুকের কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, খোঁপা এলিয়ে পড়েছে, ঘন ঘন নিশ্বাস বইছে।

রঞ্জাবতীকে দেখে মহারাণী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

"কিছু বলবি না কি, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?"

"অনেকদিন দাদুর কাছে যাইনি, যদি বলেন, একটু ঘুরে আসি।"

"যা।"

রঞ্জাবতী চলে গেল।

একটু পরে কিশোরীমোহন দু'টি সাংঘাতিক খবর জানতে পারলেন সেদিন। প্রথম, সমস্ত বিষয়ের ভার মহেন্দ্রনাথ নেবেন। দ্বিতীয়, পলাতক নানাসাহেবের উপর এদের দুজনেরই গভীর সহানুভূতি আছে। প্রথম খবরটি শুনে তিনি হতাশ হলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খবরটি তাঁর আহত-আশা-তরুতে জল-সিঞ্চন করল। মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ভয় করতেন কিশোরীমোহন। মহেন্দ্রনাথ যদি স্টেটের ভার নেন তাহলে সেখানে যে কোন রকম ডালই গলবে না এ তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন। সমুদ্রবিলাসের তৃতীয়-পক্ষ কুসুমের একটা কাকা খাড়া ক'রে বিষয়টা ভাগাভাগি করবার যে মতলব তিনি ফেঁদেছিলেন তা বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল সহসা।

কিশোরীমোহনের এ মনোভাবের মূল সন্ধান করতে হ'লে তাঁর অতীত জীবনের পরিচয় নিতে হয়। কিশোরীমোহন সমুদ্রবিলাসের স্টেটের অতি পুরাতন কর্মচারী। এই রোগা কালো খর্বাকৃতি নাকসর্বস্ব লোকটি সামান্য গোমস্তা থেকে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হয়েছিল। সমুদ্রবিলাসের অনুগ্রহেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এজন্য তিনি সমুদ্রবিলাসের প্রতি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করেননি কখনও। সমুদ্রবিলাসের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর। এর কারণ ছিল। সামান্য গোমস্তা থেকে ম্যানেজার হওয়ার জন্য যে মূল্য তিনি দিয়েছিলেন তার বিনিময়ে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরও যদি তিনি হতেন তাহলেও তাঁর মনে হ'ত দাম উশুল হয়নি। বহুকাল আগেকার সে সব কথা এখনও মনে জল জল করছে তাঁর, কখনও ভুলবেন না।...

...সমুদ্রবিলাস তখন যুবক, সবে জমিদারীর মালিক হয়েছেন। কিশোরীমোহনের যে গ্রামে বাস তার পাশেই বিল আছে একটা। সেই বিলে সদ্য-কেনা বন্দুকটা নিয়ে পাখী শিকার করতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু শিকার ক'রে বসলেন অন্য জিনিস। হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে এল, ঝড় উঠল, তারপর নামল শিলা-বৃষ্টি। সমুদ্রবিলাস ছুটতে ছুটতে এসে সামনেই যে বাড়িটা পেলেন, তাতেই ঢুকে পড়লেন। সেটা যে কিশোরীমোহনের

বাড়ি সেটা তিনি পরে জানতে পেরেছিলেন। কিশোরীমোহনের যুবতী স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না। তার পরদিন কিশোরীমোহনকে নিজের খাশ কামরায় ডেকে সমুদ্রবিলাস বললেন, "দেখ কিশোরী, কাল শিলাবৃষ্টিতে বড় নাকাল হয়েছিলাম। তুমি বোধহয় জান না, তোমার বাড়িতে গিয়েই আশ্রয় নিলাম শেষটা। সেখানে একটি সুন্দরী বউ দেখলাম। সে কে?"

"আমার বউ!"

"ও। তুমি তাহলে আর একটা বিয়ে কর। ওকে আমারই চাই—" বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন কিশোরীমোহন। তখন তিনি অতি দরিদ্র। সমুদ্রবিলাসের স্টেটে দু'টাকা মাইনের মুহুরি। ভাঙা পর্ণকুটিরে বাস করেন। সমুদ্রবিলাসের এ দাবীর বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস হ'ল না তাঁর। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সমুদ্রবিলাস তার মুখের দিকে একনজর চেয়ে বললেন, "ইচ্ছে করলে জোর ক'রে আমি কেড়ে নিতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না। তুমি যদি রাজি না হও, জবরদস্তি করব না আমি। আর যদি রাজি হও এর বদলে যা চাও তাই দেব। তোমার কুঁড়ে ঘর আর থাকবে না, পাকা বাড়ি করিয়ে দেব। জোত-জমি দেব, স্টেটের চাকরিতে উন্নতি ক'রে ভবিষ্যতে তোমাকে ম্যানেজার পর্যন্ত করব।"

কিশোরী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"আচ্ছা, এখন যাও, ভেবে কাল উত্তর দিও।"

তার পরদিন কিশোরীমোহনের সম্মতি পেয়ে সমুদ্রবিলাস সন্ধ্যার সময় অশ্বারোহণে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। কামুকের বাসনা কিন্তু চরিতার্থ হয়নি। সুভাষিনী কোথায় যে ছুটে বেরিয়ে গেল তা বোঝা গেল না অন্ধকারে। ফিরে আসতে হ'ল সমুদ্রবিলাসকে। দু'দিন পরে চণ্ডীতলার পাতকুয়া থেকে পাওয়া গেল সুভাষিনীর মৃতদেহটা।

সমুদ্রবিলাস তাঁর প্রতিশ্রুতি কিন্তু পালন করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। কিশোরীমোহনকে পাকা বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রচুর জোত-জমি দিয়েছিলেন। পুরাতন নায়েব ধর্মরাজ সেন মারা যাবার পর তাকে নায়েব ক'রে দিয়েছিলেন। পিতা অম্বরবিলাসের আমলের ম্যানেজার শশীকান্ত রায় যখন পেন্সন নিয়ে বারাণসী বাস করতে গেলেন তখন কিশোরীমোহনকেই ম্যানেজার পদে বাহাল করলেন সমুদ্রবিলাস। কিশোরীমোহন কিন্তু সমুদ্রবিলাসকে কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। সারাজীবন তীব্র ঘৃণা পোষণ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। সমুদ্রবিলাস যদি বলাৎকার করতেন তাহলে বোধ হয় এত ঘৃণা করতেন না তাঁকে তিনি। কিন্তু তিনি যে মূল্য দিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করতে পেরেছিলেন এইটেই কাঁটার মতো বিঁধে ছিল তাঁর বুকে। কিন্তু সমুদ্রবিলাসের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেননি তিনি, ইশারায় ইঙ্গিতেও কিছু করবার সাহস হয়নি তাঁর। তিনি এটা নিঃসংশয়ে জানতেন বিশ্বাসঘাতকতার সামান্যতম আভাস পেলেও আর রক্ষা থাকবে না। একেবারে গুলি ক'রে বসবেন সমুদ্রবিলাস। তাই মনের মধ্যে ঘৃণার

তুষানল জ্বেলে বাইরে ভিজে বেরালের মতো কালযাপন করেছেন তিনি সমুদ্রবিলাসের জীবদ্দশায়। মহারাণীর উপরও তাই বিন্দুমাত্র স্নেহ ছিল না তাঁর। ওর নানা রকমের বেয়াড়াপনায় মনে মনে রেগে খুন হয়ে যেতেন কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতেন না, বলবার সাহস হ'ত না, হেসে হেসে সায় দিয়ে যেতে হ'ত। কারণ তিনি জানতেন ছোট হ'লে কি হবে ও জাত-সাপের বাচ্ছা, সমুদ্রবিলাসেরই মেয়ে, নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্যে হেন কাজ নেই যা ও করতে পারে না। এক কথায় তাঁকে তাড়িয়েও দিতে পারে। কিন্তু মনে মনে প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষুধিত হয়ে ছিলেন তিনি। বস্তুত, সেই সুযোগের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। কুসুমবালার দাবীটার জন্যে একটা জাল উইল করবারও মতলব ছিল তাঁর। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ যদি বিষয়ের ভার নেন তাহলেই তো সব আশা নির্মূল হ'ল। তাঁর চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত হবে, খুব বুদ্ধিমান চৌকষ ছেলে।

কিশোরীমোহন আর বিয়ে করেননি। সাহস হয়নি। ভেবেছিলেন ওই কুড়োনো মেয়েটাকেই মানুষ করবেন, নাতনী সম্পর্ক পাতালেন তার সঙ্গে। কিন্তু তাতেও বাদ সাধল ওই মহারাণী, ওর রূপ দেখে চেয়ে বসল ওকে। তিনি 'না' বলতে পারলেন না। তবে এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। রঙ্গাবতী শুধু মহারাণীর বাগানের মালিনীই নয়, মহারাণীর অন্দরমহলে সে কিশোরীমোহনের চরও। মাঝে মাঝে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে অন্দরমহলের সব খবর সে তাঁকে দিয়ে যেত।

খবর দুটি শুনে কিশোরীমোহন নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, বাঁ হাতের তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে নাকের বড় বড় চুলগুলি টানতে লাগলেন। এটি তাঁর মুদ্রা-দোষ। তিনি বুঝলেন কুসুমকুমারীর দাবী নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। মহেন্দ্রনাথ যদি বিষয়ের ভার নেন তাহলে ওদিক দিয়ে মহারাণীর কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু নানাসাহেবের খবরটা ক্ষুরধার তরবারির মতো। ওই তরবারিটি যদি ভালো ক'রে শান দিয়ে কালেক্টার সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া যায় তাহলে তার এক কোপে মহারাণী মহেন্দ্রনাথ দুজনেই কাটা পড়বে। কিন্তু ওর মধ্যেও একটা কথা আছে। সায়েবরা সাধারণত কান পাতলা হয় না, প্রমাণ দিতে না পারলে একথা বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ। সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যাপারে সমুদ্রবিলাস যে ইংরেজদের বন্ধু ছিলেন একথা সবাই জানে, ইংরেজদের দফ তরেও লেখা আছে সে কথা, তাছাড়া নিমগাঁয়ের বিশ্বদেব শর্মাকে উৎখাত করতে তিনিই গিয়েছিলেন লোকজন নিয়ে, নিজে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে গ্রামছাড়া করেছিলেন তাকে, তারপর পুলিশের দারোগাকে খবর দিয়েছিলেন। সবাই জানে একথা। সেই সমুদ্রবিলাসের মেয়ে নানাসাহেবকে শ্রদ্ধা করে, একথা কালেক্টার চট ক'রে বিশ্বাস করবে কি!

রঙ্গাবতীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ইদানীং বাইরের কোন অচেনা লোক কি অন্দর মহলে ঢুকেছিল?"

"ইদানীং ঢোকেনি। অনেকদিন আগে পারুবাবুর চিঠি নিয়ে কে একজন উদয়প্রতাপ রায় এসেছিল, তুমিও তো জান। দাউদপুরের মাঠে তাঁবু পড়েছিল তার—"

"হঁ্যা, মনে পড়েছে। তবে লোকটাকে আমি দেখিনি। সদরে যেতে হয়েছিল সেদিন। কি রকম দেখতে বল তো?"

"বেশ সুপুরুষ। গোঁফ আছে। একটু কাটখোট্টা গোছের।"

"কি জন্যে এসেছিল?"

ফিক্ করে হেসে ফেললে রঞ্জাবতী।

"মহারাণীকে বিয়ে করতে। কিন্তু মহারাণী রাজি হয়নি।"

"তারপর কি হ'ল।"

"কি আর হবে, চলে গেল। তবে ব'লে গেছে আবার আসবে—"

"হুঁ।"

নাকের চুল টানতে লাগলেন কিশোরীমোহন। নাকের চুল টানতে টানতে রঞ্জাবতীর দিকেই চেয়েছিলেন তিনি। অন্যমনস্কভাবেই চেয়েছিলেন। হঠাৎ ভ্রুকুটা কুঁচকে গেল তাঁর, রঞ্জাবতীকে যেন নূতন দৃষ্টিতে দেখলেন। একটু আগে নানাসাহেবের খবরটা শুনে তলোয়ারের কথা মনে হয়েছিল, এখন রঞ্জাবতীকে দেখে আর একটা উপমা মনে হ'ল। শিখা। মনে হ'ল সীতার জন্য স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়েছিল, দ্রৌপদীর জন্য কুরুবংশ। তাঁর জীবনটাও পুড়ে গেছে সুভাষিনীর রূপের জন্য। এই মেয়েটাকে কাজে লাগালে এও একটা অগ্নিকাণ্ড যে না করতে পারে তা নয়। পারে, খুব পারে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, মহেন্দ্রনাথের সামনে বেরিয়েছিলি কখনও?"

"না। মহারাণী তাঁর ত্রিসীমানায় কাউকে থাকতে দেয়নি। আমি লুকিয়ে আড়ি পেতে শুনেছি এসব।"

"হুঁ।"

আবার নাকের চুল টানতে লাগলেন কিশোরীমোহন।

নেপথ্যে যে এমন একটা বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল তা মহারাণী টের পায়নি। এসব দিকে তার মনও ছিল না, সে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে। তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা রাহুর মতো যে সূর্যকে গিলতে চেয়েছিল সে সূর্য তার আকাশ থেকে অনেক আগে স'রে গেছে, সে নিজেই জোর ক'রে সরিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে এখন সে-সূর্যের মহিমা দেখছে সে অন্য আকাশে। ভাবছে, যে আকাশেই থাকুক, সূর্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

বিয়ে হবার পর দেড় বৎসর কেটে গেল, শ্রীহর্ষ একবারও আসেনি। সে-ও আর

নিমন্ত্রণ করেনি তাকে। সে কি নিজে মনে ক'রে আসতে পারত না একবার ? যে লোক মুখে অত প্রেম জানাত, বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে এতটা বদলে গেল সে! মিছে কথা বলত, বানিয়ে বানিয়ে কাব্যকথা আওড়াতো কেবল। ভালোবাসেনি। ভালোবাসলে নিজেকে বিলিয়ে দিত, লুটিয়ে দিত, ভাসিয়ে দিত, দেওয়াল টপ্‌কে সুড়ঙ্গ কেটে আসত, কুলমান জলাঞ্জলি দিত, কলঙ্ককে অলঙ্কার মনে করত, আমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কৃতার্থ হ'ত। নিদারুণ ক্ষোভে, অপমানে, আক্রোশে পুড়ছিল মহারাণীর অন্তরটা। তাকে এমন ক'রে তুচ্ছ করবে শ্রীহর্ষ ? ইস, সামান্য একটা টোলের পণ্ডিত, তার ভারী তো আত্মসম্মান। প্রেমের তুলনায় আত্মসম্মানের কি মূল্য আছে ? প্রেম যদি সোনা হয় আত্মসম্মান পিতল, প্রেম যদি সাগর হয় আত্মসম্মান ডোবা! যেদিন হাট থেকে শ্রীহর্ষ প্রথম ছুটে এসেছিল তার কাছে সেদিনের কথা মনে পড়ে মহারাণীর। পাছে, ঘরজামাই হ'তে হয়, সেই ভয়েই অস্থির। না, ওর আর মুখ-দর্শন করবে না সে। কিছুতেই না।

এ প্রতিজ্ঞা কিন্তু টিকল না।

দু'দিন পরেই শৌরসেনী গেল নিমন্ত্রণ লিপি নিয়ে।

"অনেকদিন দেখিনি। একবারও কি মনে পড়ে না। এস বিকেলে।"

শ্রীহর্ষ কিন্তু নূতন জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন একটা—আবিষ্কার করেছিলেন মহারাণী তাঁকে যে মুক্তি দিয়েছে তার মূল্য কত। মহারাণী সম্বন্ধে তাঁর মোহ যে সম্পূর্ণ অপনোদিত হয়েছিল তা নয়, কিন্তু এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মহারাণীকে বিয়ে করলে তাঁকে দাসখৎই লিখে দিতে হ'ত। তাঁর ছোট মাটির ঘরে সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে তিনি যে সুখস্বর্গ গ'ড়ে তুলছিলেন সমুদ্রবিলাসের প্রাসাদে তা তিনি পারতেন না। বিয়ের বছরখানেক পরে বাবা মা দু'জনেই মারা যান। এক সঙ্গে একদিনে মারা গেলেন উভয়েই। এরকম আশ্চর্য কাণ্ড সচরাচর ঘটে না। তাঁর মা আগেই বলেছিলেন বৈধব্য-যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারবেন না, স্বামী আগে মারা গেলে সহমৃতা হবেন। সে মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখতে হয়নি তাঁকে। একবছর পুত্রবধূর সেবা যত্ন ভোগ ক'রে তাঁরা সংসারটি ভাল ক'রে গুছিয়ে দিয়ে তবে তাঁরা চলে গেলেন। সংসারে অভাব-অনটন অনেক ছিল। ভবভূতি ভট্টাচার্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে বৈষয়িক উন্নতি করতে পারেননি তেমন তবু শ্রীহর্ষকে যে সংসারে তিনি প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছিলেন তা সুখের সংসার ছিল। শ্রীহর্ষ এ-ও বুঝেছিলেন যে মহারাণী জোর ক'রে ফাঁদটা সরিয়ে না নিলে তিনিও এতদিন তার বাঘ-সিংহের মতো একটা খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকতেন। এই সত্যটা আবিষ্কার করার পর থেকে মহারাণীর সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা তিনি পোষণ করতে লাগলেন তা অবর্ণনীয়। এর পর থেকেই সম্ভবত তিনি মনে মনে মহারাণীর কেনা-গোলাম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই মনোভাবের মোল জানাই যে কৃতজ্ঞতা তা মনে

করলেও ভুল হবে, তিনি এটাকে কৃতজ্ঞতা বলেই ধ'রে নিয়েছিলেন, সর্বমঙ্গলা কিন্তু ভুল করেনি। শ্রীহর্ষের কথা-বার্তা থেকে সে টের পেয়েছিল যে শ্রীহর্ষের ছেলেবেলার সঙ্গিনী মহারাণীর রাজত্ব শুধু তার জমিদারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

...অনেকদিন পরে চিঠি পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। অবাক হয়ে গেলেন নিজের মনের দিকে চেয়ে, অন্তরের গহনলোকে কে যেন এই আমন্ত্রণটুকুর জন্য পথ চেয়ে বসে ছিল। ছোট্ট চিঠিটা পেয়ে তার হৃদয়ের স্পন্দন বেগ এমন বেড়ে গেল কেন! যেটাকে ভস্মস্তূপ মনে হচ্ছিল, একটা দমকা হাওয়া যেন সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, বেরিয়ে পড়ল প্রচ্ছন্ন আগুনটা।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর সহসা স্থির করলেন, লুকিয়ে যাবেন না, সর্বমঙ্গলাকে বলেই যাবেন।

সর্বমঙ্গলা মেয়েটি রূপসী তো বটেই, বুদ্ধিমতীও। একটু চাপা স্বভাবের, কথা কম বলে, কিন্তু যেটুকু বলে বেশ বাগিয়ে বলে। খবরটা শুনে সে চুপ ক'রে রইল, তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল একটু।

"হাসছ যে—। যাব না?"

"যাবে বই কি। ছেলে-বেলার সই ডেকেছে, না গেলে কি চলে।"

"তবে অমন ক'রে হাসলে যে।"

"হাসলাম মনের দুঃখে, নিজের কপালের কথা ভেবে। তোমার সঙ্গে আমাকেও যদি নেমন্তন্ন করত, রাজবাড়ীতে দুটো ভালোমন্দ জিনিস খেয়ে আসতাম।"

"বেশ তো চল না। তুমি গেলে মহারাণী খুব খুশী হবে।"

"হবে না। হ'লে নেমন্তন্ন করত। তাছাড়া আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে ওকে। শুনছি ও নাকি আজকাল সিংহটার পিঠে চ'ড়ে বেড়ায়।"

"তাই নাকি। শুনিনি তো।"

সর্বমঙ্গলা আর কিছু বলল না, মুচকি হেসে চলে গেল।

শ্রীহর্ষ গিয়ে দেখলেন অন্দরমহলের দরজার কাছে শৌরসেনী দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে বলল, "আপনার জন্তই দাঁড়িয়ে রয়েছি। মা খিড়কির বাগানে আছেন, আপনি সেইখানেই যান। রাস্তাটা চেনেন তো, আমাদের ওখানে যাবার হুকুম নেই।"

"রাস্তা চিনি।"

খিড়কির বাগানে গিয়ে শ্রীহর্ষ যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সর্বমঙ্গলা ঠিকই বলেছে তো, মহারাণী সত্যিই সিংহটার পিঠে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে! আশ্চর্য হলেন, কিন্তু মুগ্ধও হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। মনে হ'ল অপরূপ! জগদ্ধাত্রী যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীহর্ষ একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন নির্বাক হয়ে। অনেকদিন মহারাণীকে দেখেননি তিনি, এমন অপ্রত্যাশিত মহিমময়ী মূর্তিতে দেখতে পাবেন তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। মুগ্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। দেখলেন

মহারাণী শুধু সিংহটার পিঠে চড়েই বেড়াচ্ছে না ঝুঁকে ঝুঁকে আদরও করছে তাকে। পাশের পশুমহল থেকে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক আর বাঘের গর্জন। হঠাৎ মহারাণী দেখতে পেলেন শ্রীহর্ষকে।

"আরে, কতক্ষণ এসেছ তুমি। ডাকনি কেন। দাঁড়াও মহারাজকে রেখে আসি। এক্ষুণি আসছি। কষ্টি, কোথা গেলি তুই—"

সিংহের পিঠে চড়েই মহারাণী পশু-মহলের দিকে চলে গেল। একটু পরেই শোনা গেল সিংহের গর্জন। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সে। 'চল ছাতে যাই—"

"তোমাকে দেখে সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেছি আজ। সিংহের পিঠে চ'ড়ে বেড়াচ্ছ! এ কি কাণ্ড!"

"কোন মানুষ তো আমাকে আমল দিলে না, তাই ওদের নিয়েই আছি। মহারাজ আমাকে ভালবাসে খুব। তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে। যা বলি তাই করে—"

মহারাণী কথাটা বললে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে মনে মনে সন্দেহ ছিল তার। সে জানত মহারাজ তাকে সহ্য করে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেনি। কিন্তু সে কথা শ্রীহর্ষকে বলবে কেন, নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইত না।

ছাতে রত্নাবতী দাঁড়িয়ে ছিল সেজেগুজে।

"শ্রীহর্ষের জন্যে কিছু খাবার ব্যবস্থা কর; আর ফুলের তোড়া তৈরি করে দে কয়েকটা ভাল করে। সর্বমঙ্গলাকে পাঠাব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রত্নাবতী নেবে গেল।

শ্রীহর্ষ হেসে বললেন, "গরীবের কুঁড়ে ঘরে ফুলের তোড়া বৃথা পাঠাবে। আমার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় আর সর্বমঙ্গলার কাটে রান্নাঘরে আর সুতো কেটে। যে পরিবেশে ফুলের তোড়া মানায় সে পরিবেশ আমার বাড়ীতে নেই।"

মহারাণীর মুখে একটা ছায়া নামল, কিন্তু সেটা ঢাকবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে। তারপর সোজা চলে গেল একটা পুষ্পিত জুঁই ঝাড়ের দিকে। শ্রীহর্ষের জীবনের একটা দিক সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল তার কাছে। তার মনে হ'ল শ্রীহর্ষ যদি তাকে বিয়ে করত তাহলে তার দারিদ্র্য ঘুচে যেত। শ্রীহর্ষ তো বিয়ে করতে চেয়েছিল, সেই করেনি। মহারাণীর মনে হ'ল ওর এ দারিদ্র্যের জন্য আমিই দায়ী। জুঁই ফুল তুলতে তুলতে এই কথাটাই মনে হ'তে লাগল তার ঘুরে ফিরে।

…একমুঠো জুঁই ফুল তুলে এনে বললে, "নাও।"

দু'হাত পেতে ফুলগুলি নিলেন শ্রীহর্ষ।

"তোমাকে আজ কেন ডেকেছি জান?"

"[redacted] আমিও সেকথা জিগ্যেস করব ভাবছিলুম। কেন বল তো—"

"নিজের মানের দায়ে।"

সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা গল্প বানিয়ে তুলে'ছিল মহারাণী জুঁই ফুল তুলতে তুলতে।

"মানের দায়ে ? কি রকম।"

"মহেন্দ্রনাথ এসেছিলেন কয়েকদিন আগে। তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁর বাবার নামে এখানে একটা ভাল টোল হোক আর তুমি সে টোলের ভার নাও। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি তোমাকে রাজি করাব। রাজি হবে তো—"

"আমারই চেয়ে যোগ্যতর লোক রয়েছেন নীলকণ্ঠ বাচস্পতি মশায়। তিনি ভার নিলে টোলের গৌরব অনেক বেশী হবে।"

"কিন্তু মহেন্দ্রনাথের ঝোঁক তোমার উপর। আর আমি তাঁকে কথা দিয়েছি। রাজি হবে তো—"

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল মহারাণী।

"ভেবে দেখি—"

"না, ভাবতে দেব না আমি, এখুনি 'হাঁ' বলতে হবে। আচ্ছা, আমার কথার কি মূল্য নেই তোমার কাছে! মহেন্দ্রনাথ উপকারী বন্ধু একজন, সমস্ত বিষয়ের ভার নিয়েছেন, সমস্ত ঝক্কি পোয়াচ্ছেন। তাঁর এ সামান্য শখটুকু মেটাতে দেবে না তুমি! আর আমি তাকে কথা দিয়েছি!'

মহারাণীর কণ্ঠস্বরে উত্তাপের আভাস পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। তারপর হেসে বললেন, "বেশ, তোমার যখন অত জেদ তাই হবে।"

এরপর মহারাণী যা করল তা-ও অদ্ভুত। হঠাৎ পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "জুঁই ফুলগুলো আমার খোঁপায় গুঁজে দাও।"

শ্রীহর্ষের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল একটা। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। ছেলেবেলায় এমনি ক'রে অনেকবার ফুল পরিয়ে দিয়েছেন তার খোঁপায়। কিন্তু তখন তো সর্বমঙ্গলা ছিল না। ফুল-পরানো শেষ ক'রেই তিনি উঠে পড়লেন, বিবেক দংশন করতে লাগল।

"আমি এবার যাই—"

"এত তাড়াতাড়ি যাবে ? কিছু তো খেলে না।"

"না, খাবার ইচ্ছে নেই এখন।"

"সর্বমঙ্গলার জন্য ফুল নিয়ে যাও। তোড়া বাঁধতে বললাম যে—"

"পাঠিয়ে দিও।"

যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। ভাবতে ভাবতে গেলেন খোঁপায় ফুল-গোঁজার কথাটা সর্বমঙ্গলাকে বলবেন কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেননি।

.. মহারাণী প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়েছিল তাঁর প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে। রম্ভাবতী খাবার আনতে সম্বিত ফিরে পেল সে। ধমকে উঠল তাকে। "এত দেরি কেন ? শ্রীহর্ষ তো চলে গেল—"

দাঁড়িয়ে রইল রম্ভাবতী ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায়।

"দে আমাকে—"

থালাটা তার হাত থেকে নিয়ে মহারাণী চলে যাচ্ছিল খিড়কির বাগানের দিকে।

"ফুলের তোড়া তৈরি করব?"

"না, আর করতে হবে না। মালা গাঁথা আছে?"

"আছে—"

"তাই দে তাহলে।"

মালা আর খাবারের থালা নিয়ে মহারাণী সোজা চলে গেল সিংহের মহলে। কষ্টি সবিস্ময়ে দেখল মহারাণী সিংহের গলায় মালা পরিয়ে জোর করে তাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে। মহারাজ কিছুতেই খাবে না, মহারাণীও না-ছোড়। কষ্টি আবার ধীরে ধীরে মাথা নাড়লে তিনবার।

এসব তার ভাল মনে হচ্ছিল না মোটেই।

সেইদিনই একটু পরে চিঠি নিয়ে লোক গেল মহেন্দ্রনাথের কাছে। মহারাণী কখনও বড় চিঠি লেখে না। চিঠিতে ভণিতাও থাকে না কোন। মুক্তোর মতো অক্ষরে সোজা মনের ভাব ব্যক্ত করাই তার স্বভাব। চিঠি গেল —"বৈষয়িক প্রয়োজনে একবার দেখা করতে চাই। দয়া ক'রে যদি আসেন বাধিত হব।"

মহেন্দ্রনাথ চিঠিখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। মহারাণীর বিষয়ের সব খবরই তো তাঁর নখ দর্পণে, কোনরকম গোলমালের কথা তো কানে যায়নি, তবে হঠাৎ কি এমন বৈষয়িক প্রয়োজন ঘটল? চিঠিখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য স্মরণ ক'রে তিনি তৎক্ষণাৎ হাতী কসতে বললেন। নিজের প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারাণী তাঁকে এই প্রথম চিঠি লিখেছে। চিঠি লিখে এমন ভাবে আর কখনও যেতে বলেনি তাঁকে। তিনিই বারবার গিয়ে বসেছেন গোল বৈঠকে, কখনও সত্যকার বৈষয়িক প্রয়োজনে, কখনও বা সেই ওজুহাতে। আজ মহারাণীর এ ডাক কেন? গোল বৈঠকের পরদা আজ সরে যাবে না কি! একটু সাজ-সজ্জা করেই গেলেন তিনি সেদিন।

মহারাণীর খাস চাকরাণী শৌরসেনী যথাস্থানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। সে তাঁকে গোল-বৈঠকে নিয়ে গিয়ে যথারীতি খাতির করে বসালো। একটু পরেই পরদার ওপারে শোনা গেল অলঙ্কারের শিঞ্জিনী।

"নমস্কার। প্রথমেই ক্ষমা চাইছি, আপনাকে কষ্ট দিলুম ব'লে।"

"এরকম কষ্ট পাবার জন্যেই তো উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি রোজ। প্রয়োজনের কথাটা আগে বলুন শুনি। আমি যতদূর জানি, আপনার সম্পত্তি ঠিক আছে—"

"আমার সম্পত্তি ঠিক থাক বা না থাক সেজন্য আমার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। আমি আপনাকে ডেকেছি অন্য একটা প্রয়োজনে।"

মহেন্দ্রনাথের বুকটা দুরু দুরু ক'রে উঠল। কিন্তু চুপ করে রইলেন তিনি।

"আপনার কাছে একটা ভিক্ষা আছে।"

"কি বলুন। আগেই তো বলেছি আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।"

"আপনি আমাদের গ্রামের শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থকে চেনেন কি?"

'খুব। মস্ত পণ্ডিত লোক তিনি।"

'আপনি জানেন কি না জানিনা, ওঁর সঙ্গে আমার একবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আমি বিয়ে করতে রাজি হইনি। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আজ উনিই এ বিষয়ের মালিক হতেন। এখন শুনছি দারিদ্র্যের চাপে বড় কষ্টে আছেন তিনি। তাই আমার ইচ্ছে তাঁকে একটা টোল ক'রে দেওয়া আর সেই সঙ্গে একশ' বিঘা নিষ্কর জমি ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করা।"

"উত্তম প্রস্তাব। এ তো অতি সহজেই হতে পারে।"

"যত সহজে ভাবছেন তত সহজে নয়। শ্রীহর্ষ যদি শোনে যে আমি তার দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য তাকে দয়া ক'রে এই সব দিচ্ছি তাহলে সে কিছু নেবে না। দানটা করবেন আপনি, জমিও আপনার জমিদারী থেকেই দিতে হবে, এর জন্যে যা মূল্য লাগে তা আমি দেব।"

"এই তো আমার প্রতি অবিচার ক'রে বসলেন। আমি কি এতই অধম যে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে এই সামান্য দানটুকু ক'রে পুণ্যার্জন করবার অধিকার আমার নেই? এর জন্যে দাম নিতে হবে!"

"কিন্তু আপনার আর্থিক ক্ষতি করবার কি অধিকার আছে আমার বলুন। এমনিই আপনি আমার জন্যে যা করছেন তার তুলনা নেই।"

"আপনার যে কি অধিকার আছে তা আপনি জানেন তো। আপনার এ আদেশ পালন ক'রে কৃতার্থ হব আমি।"

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন মহেন্দ্রনাথ অন্দর থেকে বেরুচ্ছিলেন তখন ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। পাশের একটা দরজা দিয়ে ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেল কে যেন। দেখতে পেলেন শুধু বেল ফুলের মালা-জড়ানো দোদুল্যমান বেণীটি, গৌরবর্ণ নিটোল মুখের পাশটুকু, আর নীলাম্বরী শাড়ির জরি-ঝলমল উড়ন্ত আঁচলখানা। মহারাণী কি? মহারাণীকে আবছা-ভাবে দেখেছিলেন তিনি অনেকদিন আগে, এখন সামনা-সামনি দেখলেও চিনতে পারবেন না বোধহয়। শৌরসেনী আলো ধ'রে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মহেন্দ্রনাথ যখন দাঁড়িয়ে পড়লেন, তখন সে-ও দাঁড়াল। মহেন্দ্রনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে একবার, দেখলেন তার মুখ ভাব-লেশহীন, আনত-নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। শৌরসেনীর স্বভাবই এই। তাকে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করলেন না তিনি। কিন্তু তাঁর মানস-পটে এই সন্ত্রস্তা সহসা অন্তর্হিতা তরুণীর ছবিটি আঁকা হয়ে গেল, চোখের সামনে দুলতে লাগল বেণীটি, সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, সে গন্ধ তাঁর বুকের ভিতর বাসা

বাঁধল। মহেন্দ্রনাথের চিত্ত নূতন নারী-সঙ্গ লাভের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে অনেকদিন থেকে। তৃতীয় সন্তান হবার পর থেকে বেদানার শরীর ভেঙে পড়েছে। যে বনে একদা যে রঙের নেশা চোখে লেগেছিল তা ফিকে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। কর্তব্যবোধেই বেদানাকে তিনি ত্যাগ করেননি। তার নামে বিষয় লিখে দিয়েছিলেন, তার ও তার সন্তানদের ঐহিক সুখ-সুবিধার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু ভালবাসার সে জাদু আর নেই। এখন কচিৎ তিনি বেদানা-মহলে যান। তিনি ইচ্ছে করলে অনায়াসে বিয়ে করতে পারতেন, নূতন প্রণয়িনী জোটাতে পারতেন, কিন্তু তিনি কিছুই করেননি, কারণ তিনি আশা ক'রে আছেন মহারাণীকে পাবেন। ওই দুর্জয়িনীকে জয় করতেই হবে যেমন ক'রে হোক, এই তাঁর পণ। তাই নিজের চরিত্র-মহিমাকে যতদূর সম্ভব শুভ্র, সমুজ্জ্বল এবং সমুন্নত ক'রে রেখেছেন। সেদিক দিয়ে মহারাণী যেন কোন খুঁত ধরতে না পারে, আপনিই যেন সে আকৃষ্ট হয় তাঁর দিকে। সেদিন যেতে যেতে বার বার তাঁর মনে হ'তে লাগল কে ওই রূপসী মেয়েটি, ওই কি মহারাণী? কিন্তু না, মেয়েটি মহারাণী নয়, রঞ্জাবতী। কিশোরীমোহনের ইঙ্গিতে রঞ্জাবতী মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, ভেবেছিল একাই বুঝি বেরুবেন তিনি অন্দরমহলের পথ দিয়ে। সঙ্গে শৌরসেনী থাকবে তা তার খেয়াল ছিল না। মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর মহারাণী খানিকক্ষণ ছাদে একা বসে রইল। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মধ্য-গগনে, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল সে। হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড হ'ল, চাঁদের যেন ঘন কুঞ্চিত দাড়ি গজাল, তারপর বাবরি, তারপর চোখ নাক মুখ— চাঁদ? না, শ্রীহর্ষ।

সেদিকে চেয়ে মহারাণী মনে মনে বলছিল, সত্যিই কি সুন্দর তুমি। কিন্তু কত দূরে আছ, কিছুতেই তোমার নাগাল পাচ্ছি না।

মাসখানেকের মধ্যেই মহা সমারোহে টোল প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

ও অঞ্চলের মান্যগণ্য পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হয়ে সভা করলেন, জয়-কামনা করলেন অধ্যাপক শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থের, সাধুবাদ করলেন জমিদার মহেন্দ্রনাথের বদান্যতার। উৎসব যখন শেষ হয়ে গেল, পণ্ডিতের দল যখন বিদায় নিলেন একে একে, মহারাণীর জন্য অনেকক্ষণ বৃথা অপেক্ষা ক'রে মহেন্দ্রনাথও যখন হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে চ'লে গেলেন, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ আশা ক'রে এসেছিলেন এই উপলক্ষে মহারাণীর সঙ্গে হয়তো আলাপ হবে। কিন্তু মহারাণী এল না। ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন মহেন্দ্রনাথ।

সেদিনও পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। হঠাৎ হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো শব্দে সচকিত হয়ে উঠল শ্রীহর্ষের নব-নির্মিত চতুষ্পাঠীর বিস্তৃত প্রাঙ্গন, তারপর মনে হ'ল খানিকটা জমাট জ্যোৎস্না যেন এসে থামল সেখানে। মহারাণীর বিয়ের জন্য সমুদ্রবিলাস একদা

আগা-গোড়া রূপোর পাত দিয়ে মুড়ে যে পালকিটি করিয়েছিলেন, যা এতদিন অনাদৃত হয়ে একটা ঘরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল সেই পালকিটি সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না বিকিরণ করতে করতে এসে দাঁড়াল শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থের দ্বারে।

শ্রীহর্ষ বাড়ির ভিতরে ছিলেন, শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। তিনিও মনে মনে প্রতীক্ষা করছিলেন মহারাণীর।

বরকন্দাজ সেলাম ক'রে নিবেদন করল, "রাণীমা এসেছেন।"

মহারাণী বেরিয়ে এলেন পালকির ভিতর থেকে।

অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীহর্ষ ডাকলেন, "ওগো, এদিকে এস। দেখ, কে এসেছে। শুনছ—"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শ্রীহর্ষ।

"ওগো'কে বাইরে আর না-ই ডাকলে। চল, আমরাই ভিতরে যাই।"

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন শ্রীহর্ষ।

সর্বমঙ্গলাও এসে দাঁড়িয়েছিল দ্বার-প্রান্তে।

পালকির সর্বাঙ্গ থেকে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হচ্ছিল। তার চোখ ধেঁধে গেল।

মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"ওটা কি!"

মহারাণী হেসে উত্তর দিলে—"রূপোর পালকি। লক্ষ্ণৌ থেকে কারিগর আনিয়ে বাবা শখ ক'রে করেছিলেন ওটা। বিয়ের পর প্রথম ওইটেতে চ'ড়ে শ্বশুর বাড়ি যাব ব'লে। কিন্তু বিয়ে তো অদৃষ্টে নেই, এতদিন ওটা বোরখা-ঢাকা পড়ে ছিল একটা ঘরে। আজ ইচ্ছে হ'ল ওইটে চড়েই তোমাদের কাছে যাই—"

"আসুন, কি ভাগ্যি আমাদের।"

"সত্যই তুমি ভাগ্যবতী।"

তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে মহারাণী একজন বরকন্দাজকে আদেশ করল—"পালকির ভিতর যে বাক্সটা আছে, ভিতরে দিয়ে যাও সেটা।"

আবলুশ কাঠের উপর সোনার কাজকরা একটা বড় বাক্স দিয়ে গেল জাফর।

"ওটা কি?"

শ্রীহর্ষ জিগ্যেস করলেন সভয়ে।

"বলছি, ঘরের ভিতরে চল। শোবার ঘর কোন্‌টা তোমাদের?"

"এই যে—"

শ্রীহর্ষ আর সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে সে ওদের শয়নকক্ষেই ঢুকল। অনাড়ম্বর কিন্তু পরিচ্ছন্ন দুটি বিছানা ছিল ঘরের দুধারে।

সর্বমঙ্গলা আর মহারাণী একটা খাটে বসল। শ্রীহর্ষ সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমিও বস ওই খাটটাতে।"

শ্রীহর্ষ বসতেই মহারাণী বলল, "এইবার আমার দরখাস্তটি পেশ করি অধ্যাপক

মশায়ের কাছে। তোমার নতুন টোলে আমিও ভরতি হ'তে এসেছি। তোমার কাছে কাব্য পড়ব—"

শ্রীহর্ষ একটু বিস্মিত এবং বিব্রত হলেন।

মুখে অবশ্য বললেন, "বেশ তো—"

সর্বমঙ্গলা মুচকি হাসতে লাগলেন, কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল যে তার মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল হঠাৎ। শ্রীহর্ষও লক্ষ্য করলেন সেটা। হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠল মহারাণী।

"কি বোকা তোমরা দুজনেই। সত্যি বিশ্বাস করলে যে আমি এখানে এসে কুশাসনে ব'সে কাব্য পড়ব? ছেলেবেলায় মাধব পণ্ডিতের কাছে অনেক পড়েছি, আর পড়বার সাধ নেই। আমি এসেছি অন্য কাজে, সর্বমঙ্গলার কাছে।"

"আমার কাছে? কি বলুন।"

"বল, আমায় হতাশ করবে না।"

"সে সাধ্য কি আছে আমার!"

"ওই যে বাক্সটা এনেছি ওতে কিছু গয়না আছে। আমার বিয়ের জন্য বাবা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে তো হ'ল না। যে লোক আমার গায়ে গয়না দেখে খুশী হ'ত সে তো নাগালের বাইরে চলে গেল। তাই ভাবছি গয়নাগুলো আজ তোমাকেই পরিয়ে দেব। শ্রীহর্ষ দেখে খুশী হবে, আর শ্রীহর্ষ যদি খুশী হয় তাহলে আর বাকি রইল কি—"

মহারাণীর চোখ থেকে হাসি উপছে পড়তে লাগল।

সর্বমঙ্গলা ব'সে রইল নত-নেত্রে।

শ্রীহর্ষ বললেন, "এমনিই তো তোমার কাছে অনেক ঋণে ঋণী আছি। আবার বোঝা বাড়াচ্ছ কেন?"

"আমার বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিচ্ছি। আর কাকে দেব বল। বাধা দিও না তুমি।"

মহারাণীর চোখ দুটো তখনও হাসছিল, কিন্তু গলার স্বরে বাজল মিনতির সুর।

"আমি এত সব দামী জিনিস রাখব কোথায়?"

"সে ব্যবস্থাও হবে।"

...সর্বমঙ্গলাকে গয়নাগুলি পরিয়ে সেদিন মহারাণী যখন ফিরল তখন রাত্রির তৃতীয় যাম প্রায় শেষ হচ্ছে। পূর্ণচন্দ্র হেলে পড়েছে পশ্চিম গগনে। একটা ফিঙে পাখীর তীব্র মধুর সুরে জ্যোৎস্না কাঁপছে।

দু'দিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটল। অবাক হয়ে গেল কষ্টি, কারণ সে-ই ছিল এ দৃশ্যের একমাত্র দর্শক। একটা তেঁতুল গাছে উঠে সে তেঁতুল পাতা চিবুচ্ছিল বসে বসে। তার বন্য স্বভাব ঘোচেনি। প্রায়ই গাছের উপর উঠে বসে থাকত সে। আর

তেঁতুল পাতা ছিল তার প্রিয় খাদ্য। হঠাৎ দেখতে পেলে মহারাণী সিংহের মহলে ঢুকেছে। সিংহটা গম্ভীর হয়ে বসেছিল, মহারাণীকে দেখে সে ল্যাজটি মাটিতে আছড়াল দু'একবার, আর কিছু করল না।

"এগিয়ে আয় এদিকে।"

সিংহ এগিয়ে এল কিন্তু অনিচ্ছাসহকারে।

"পায়ে মাথা রাখ।"

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল মহারাজ। মাথা সে কিছুতেই নত করবে না।

"হাত জোড় কর।"

তা-ও করল না সে।

মহারাণী তখন অধীরভাবে চড়ল তার পিঠের উপর, জড়িয়ে ধরল তার গলা। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা গর্জন করতে শুরু করল পাশের মহলে, ময়ূরের তীক্ষ্ণ কেকাও চিরে দিতে লাগল আকাশকে। রোজ যেমন হয়, সেদিনও তাই হ'তে লাগল। মহারাজ কিন্তু একটুও বিচলিত হ'ল না। তার গাম্ভীর্য রোজ যেমন অটুট থাকে সেদিনও তেমনি রইল।

"শুনচিস, দেখচিস ওরা কি করছে। ওদের কাছে শেখ, আয় দেখবি। দেখ্ ওরা কেমন ক'রে আমাকে আদর করে।"

তারপর যা করল মহারাণী তাতে শিউরে উঠল কষ্টি।

সিংহটাকে টানতে টানতে সে তাকে নিয়ে গেল বাঘের ঘরে। তারপর সেখানে নিয়ে এল ময়ূরটাকেও। তারপর মহারাণী উন্মাদের মতো নাচতে লাগল তাদের সামনে। কষ্টির মনে পড়ল টাকুমাকে, সে-ও অমনি ক'রে নাচত। ময়ূরটাও নাচতে লাগল। বাঘটা মহারাণীর কাঁধে থাবা তুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল বারবার।

মহারাজ একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল গম্ভীর হয়ে।

"দেখ দেখ্ দেখ তুই⋯"

পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল মহারাণী। মনে হ'ল যেন আর্তনাদ করছে। ঠিক এর পরেই বজ্রপাত হ'ল। মহারাজের বজ্রনির্ঘোষে কেঁপে উঠল চতুর্দিক। সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ময়ূরটার উপর এবং নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল তাকে। তারপর লাফিয়ে পড়ল বাঘটার উপর। মহারাণী চীৎকার ক'রে স'রে গেল একধারে। বাঘ আর সিংহের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তুমুল যুদ্ধ। গর্জনে সমস্ত খিড়কির বাগানটা কাঁপতে লাগল মুহুর্মুহু। বাঘটাও কম শক্তিশালী ছিল না, প্রতিদ্বন্দ্বীকে নাগালের মধ্যে পেয়ে সে-ও প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু প্রাণটা গেল তার শেষ পর্যন্ত। মহারাজই জিতল। থাবা দিয়ে বাঘের গলা আর বুক চিরে ফেললে সে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

"আমাকেও মেরে ফেল তুই, আমাকেও খেয়ে ফেল।"

মহারাণী তার পিছু পিছু ছুটে এসে শুয়ে পড়ল তাকে জড়িয়ে। মহারাজ কিছু বললে না। ধীরে ধীরে ল্যাজ নাড়তে লাগল শুধু, তার গলা থেকে বেরুতে লাগল গরগর-গরগর শব্দ।

কষ্টি তেঁতুলগাছের উপরে বসেই আবার মাথা নাড়লে তিনবার।

আর এক কাণ্ড হ'ল।

মহারাণী যখন সিংহের মহলে তখন মহেন্দ্রনাথের পালকি এসে ঢুকল বাইরের সিংহদরজায়। মহেন্দ্রনাথ আসবার পূর্বে সাধারণত খবর দিয়ে আসতেন। কিন্তু সেদিন আর খবর পাঠাবার সময় হয়নি, সম্ভবত খবর পাঠানো দরকারও মনে করেননি তিনি। তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন ম্যানেজার কিশোরীমোহনের ঘরে। যদিও তিনি মহারাণীর বিষয়ের ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু কিশোরীমোহনকে ম্যানেজারি-পদ থেকে অপসারিত করেননি। আপাতদৃষ্টিতে সব বিষয়ের ভারই কিশোরীমোহনের উপর ছিল. কিন্তু কিশোরীমোহন জানতেন চাবিকাঠি মহেন্দ্রনাথের হাতে আছে। এতে তিনি মনে মনে জ্বলছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করবার উপায় ছিল না, সাহসও ছিল না। যখন একা থাকতেন তখন নাকের চুল টানতে টানতে চিন্তা করতেন কি ক'রে এর প্রতিকার করা যায়। কিন্তু কোন উপায়ই মাথায় আসত না।

মহেন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"বসুন, বসুন। আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। কালেক্টার সাহেব খবর পাঠিয়েছেন নানাসাহেব নাকি এই অঞ্চলেই লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে. আমরা যেন অচেনা লোক দেখলেই তাকে ধরে থানায় পাঠিয়ে দিই। আপনি আপনার স্টেটের মহলে মহলে খবরটা জারি ক'রে দিন। নানাসাহেবকে ধরে দিতে পারলে সরকারে আমাদের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যাবে মহারাণীকেও খবরটা বলে যাব. ভিতরে একবার খবর পাঠান।"

"যে আজ্ঞে।"

কিশোরী নিজেই উঠে বাইরে গেলেন। অন্দরমহলে খবর পাঠাবার বিশেষ পদ্ধতি ছিল। বাহির মহল যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে একটা ঘরের ভিতর দড়ি টাঙানো থাকত। সেই দড়ি টানলেই অন্দরমহলে ঘণ্টা বেজে উঠত। তখন একজন দাসী এসে অন্দরমহলের কপাট খুলে খবর নিত কি চাই। তার মারফতই খবর পাঠাতে হ'ত।

…দাসী গিয়ে যখন মহারাণীর মহলে খবর দিল তখনও মহারাণী সিংহের মহল থেকে ফেরেনি। সে মহলে কারও যাবার হুকুম ছিল না। তাই শৌরসেনী বলল, "ওঁকে পাঠিয়ে দাও, উনি এসে বসুন, রাণীমা খিড়কির বাগানে আছেন, এখুনি আসবেন।" মহেন্দ্রনাথকে শৌরসেনী যথারীতি অভ্যর্থনা করে পরদা-ঘেরা গোল বৈঠকে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর গেল পশু-মহলের দিকে, যদি কষ্টির দেখা পায়, খবরটা পাঠাতে পারবে। কষ্টি কিন্তু তখন তেতুল গাছের পত্রপল্লবান্তরে আত্মগোপন

ক'রে বসেছিল। তাকে দেখতে না পেয়ে পশু-মহলের কাছাকাছি অপেক্ষা করতে লাগল শৌরসেনী, আর ভাবতে লাগল ওখানে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে আজ। এদিকে গোল-বৈঠকে তার এক নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। মহেন্দ্রনাথ যখন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন তখন রঙ্গাবতী ধীরে ধীরে পরদা সরিয়ে ভিতরে সন্তর্পণে উঁকি দিল একবার। চোখাচোখি হয়ে গেল মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে। মহেন্দ্রনাথও উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। ওই নীলাম্বরী, ওই ফুলের-মালা-জড়ানো সর্পিল বেণী তো তিনি দেখেছেন আর একদিন।

"শুনুন—"

ক্ষণকাল আনত-নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল রঙ্গাবতী, তারপর সরমশঙ্কিত ধীর পদক্ষেপে ভিতরে এসে ঢুকল। মহেন্দ্রনাথের সন্দেহমাত্র হ'ল না এই রূপসী মহারাণী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে।

সাগ্রহে তার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

"আজ যে এ সৌভাগ্য হবে তা আসবার সময় কল্পনাও করতে পারিনি।"

রঙ্গাবতীর মাথা আর একটু নত হ'ল।

আর একটু এগিয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ।

"দুটি খুব গুরুতর প্রয়োজনে হঠাৎ আসতে হ'ল আজ। খবর দেবার সময় পাইনি। কালেক্টার সাহেব খবর পাঠিয়েছেন যে তাদের চর নাকি সন্ধান এনেছে নানাসাহেব এই অঞ্চলেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছে, আমরা যেন তাকে ধরবার সমুচিত চেষ্টা করি। আমি বাইরে দামামা পিটিয়ে আমাদের জমিদারীতে একথা ঘোষণা করে দিয়েছি, কিশোরীবাবুকেও বলে গেলাম তাই করতে। এসব করতেই হবে লোক-দেখানো। কিন্তু সত্যিই আমরা চাই না যে নানাসাহেবের মতো বীর ইংরেজের হাতে ধরা পড়ুক। খবর পেয়েছি নানাসাহেব দু'এক জায়গায় নাকি অন্দরমহলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই আপনাকে বলতে এলাম যদি আপনার অন্দরে এসে পড়েন—"

রঙ্গাবতী মৃদুকণ্ঠে বললে, "আমাকে আপনি ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।"

অভিভূত হয়ে পড়লেন মহেন্দ্রনাথ।

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "এই কথা শোনবার প্রত্যাশাতেই তো এতকাল কাটিয়েছি। বেশ, তাই হোক তাহলে। তোমাকে বলে যাচ্ছি নানাসাহেব হঠাৎ যদি তোমার অন্দরে এসে পড়েন, তাঁকে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থাটা কোরো। আমার সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয়, খবর পাঠিও।"

রঙ্গাবতী চুপ ক'রে রইল।

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে মহেন্দ্রনাথ বললেন, "আমার দ্বিতীয় খবরটি খুব মর্মান্তিক। বেদানা কাল রাত্রে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এই চিঠিখানা লিখে রেখে গেছে। পড়ছি শোন।" মহেন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন।

মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রবল প্রতাপেষু—

অসংখ্য প্রণামান্তে দাসীর বিনীত নিবেদন, পাখী অনেকদিন পূর্বেই উড়িয়া গিয়াছে জানিতাম, কিন্তু তবু আশা করিয়াছিলাম হয়তো সে আবার আসিয়া তাহার সোনার খাঁচাটিতে ঢুকিবে। সেই আশাতেই অনেকদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু সে আর আসিল না। ইহাও বুঝিয়াছি আর আসিবে না। তাই স্থির করিলাম আপনার সুখের পথে কণ্টক হইয়া আর আমি থাকিব না। ফুলের পাপড়ি অনেকদিন আগেই ঝরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা আছে তাহা কেবল কাঁটা। আমি আপনার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা অমূল্য সম্পদ, তাহাতেই আমি কৃতার্থ, তাহা লইয়াই বাকি জীবনটা কাটিয়া যাইবে। আপনার কৃপায় আমার আর্থিক অভাবও নাই। তাই আমি আমার ছেলেমেয়েদের লইয়া চলিলাম। যদি উহাদের মানুষ করিতে পারি, উহাদের পিতৃত্ব আপনি যদি ভবিষ্যতে স্বীকার করেন, উহারা আপনার কাছে ফিরিয়া আসিবে। আমি চলিলাম। শেষ অনুরোধ, আমাকে আর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন না। আমার অসংখ্য প্রণাম লউন। ইতি বেদানা।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন মহেন্দ্রনাথ।

"চিঠিটা তোমার কাছেই রেখে দাও। বিশ্বাস কর এ চিঠি সে নিজেই লিখেছে, আমি তাকে দিয়ে লেখাইনি।"

চিঠি হাতে করে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে রইল রঙ্গাবতী।

আর একটু অপেক্ষা করে মহেন্দ্রনাথ বললেন, "বেদানাই আমাদের মিলনের বাধা ছিল। সে যখন স্বেচ্ছায় স'রে গেল তখন আমি আশা করতে পারি কি—"

রঙ্গাবতী মাথা নত করল আবার।

মহেন্দ্রনাথ আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, আবেগভরে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন।

·· মহেন্দ্রনাথ গোলঘর থেকে যখন বেরিয়ে গেলেন তখন বাইরের দালানে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। নীচে নেবে দেখলেন শৌরসেনী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিতে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির কাছে। তার সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি জানতেও পারলেন না, যে মহারাণী পরদার আড়াল থেকে সব দেখেছিল সব শুনেছিল। শুধু যে সেই দিনই জানতে পারলেন না তা নয়, অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারেননি।

তার পরদিনই মহারাণী তাঁকে যে চিঠি পাঠিয়েছিল তা প'ড়ে তাঁর সামান্য একটু খটকা লেগেছিল অবশ্য। চিঠিতে সাক্ষাতের উল্লেখমাত্র ছিল না। মহারাণী যা লিখেছিল তা-ও একটু অদ্ভুত ঠেকল তাঁর কাছে। মহারাণী লিখেছিল, "একটি ভালো ছুতোর মিস্ত্রি চাই! আমাদের অনেকগুলো পালকি বে-মেরামত হয়ে প'ড়ে আছে। সেগুলোকে নিজের সামনে নিজের পছন্দ অনুসারে মেরামত করাব। মিস্ত্রিটি বিশ্বাসী

হওয়া চাই, বোবা হলে আরও ভালো হয়।" বোবা মিস্ত্রী অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে একটি বিশ্বাসী লোককেই পাঠিয়েছিলেন মহেন্দ্রনাথ। যথাসময়ে খিড়কি-বাগানের পশ্চিম-প্রান্তের খালি জায়গাটায় সারি সারি কুড়িটি পালকি জমা হ'ল এবং মহারাণীর তত্ত্বাবধানে সুবল মিস্ত্রী সেগুলি মেরামত করতে লাগল। ওই নিয়েই মেতে রইল মহারাণী কিছুদিন।

মুশকিলে পড়ে গেল রঙ্গাবতী। সেদিন মহেন্দ্রনাথ চলে যাবার পরই মহারাণীর ঘরে ডাক পড়ল তার।

ঘরে ঢুকতেই মহারাণী তাকে বললে, "তুমি ছিলে কুড়োনী, হয়েছ রঙ্গাবতী। আরও কিছু হবার ইচ্ছে আছে না কি? যদি থাকে আমি আপত্তি করব না, বেদান-মহল খালি হয়ে গেছে, স্বচ্ছন্দে তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পার। বড় কুমারকে খবর দিলেই তিনি পালকি পাঠিয়ে দেবেন—"

রঙ্গাবতী নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল মহারাণীর দিকে। তার চোখ দুটো বাঘিনীর চোখের মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল। কিন্তু রঙ্গাবতী বুদ্ধিমতী মেয়ে, তার চোখের ভাষা যাই হোক মুখের ভাষায় যা বেরুল তা উত্তাপহীন। বরং অশ্রুর আভাসই যেন পাওয়া গেল তাতে।

"আমার দোষ হয়েছে, আমাকে মাপ করুন। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না"—তারপর একটু থেমে বললে, "বিশ্বাস করুন, বড় কুমার নিজেই আমাকে ডেকেছিলেন। তাই—"

তার কথা শেষ করতে দিলে না মহারাণী।

"পুরুষ জাতটাই ওইরকম। ওদের পাগলামি থেকে বাঁচতে হলে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হয় এ বুদ্ধি যে তোমার নেই তা বিশ্বাস হয় না। যাই হোক আমার কাছে যদি থাকতে চাও তাহলে ছাত থেকে নাবতে পাবে না। ওই ছাতের ঘরেই তোমার সব ব্যবস্থা করে নাও। ছাতের বাগান নিয়েই তুমি থাকো। নীচে আর তোমাকে যেন না দেখি—"

পরদিন থেকে রঙ্গাবতী প্রায় বন্দিনী হয়েই রইল ছাতের ঘরে। তার জন্য আলাদা একটি দাসীও নিযুক্ত হ'ল, আপাতদৃষ্টিতে রঙ্গাবতীর ফাই-ফরমাস খাটবার জন্য, কিন্তু তার আসল কাজ হ'ল রঙ্গাবতীর উপর কড়া নজর রাখা।

মহেন্দ্রনাথ এদিকে ক্রমশ বিস্মিত এবং অধীর হয়ে উঠছিলেন। রোজই প্রত্যাশা করছিলেন মহারাণীর ডাক আসবে। কিন্তু এক পক্ষ কেটে গেল কোন খবর পর্যন্ত এল না। বিনা নিমন্ত্রণে আবার যাওয়াটা শোভন হবে কি না, গেলেও কি ওজুহাতে যাবেন এই সবই চিন্তা করছিলেন তিনি, এমন সময় কালেক্টার সাহেবের কাছ থেকে জরুরি এক তলব এল, ছুটতে হ'ল সদরে।

কালেক্টার আরও কয়েকজন জমিদারকেও ডেকেছিলেন। সাহেব বললেন, তিনি

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছেন যে নানাসাহেব এই অঞ্চলেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছেন। তাকে ধরতেই হবে যেমন ক'রে হোক। এর জন্যে তিনি ফৌজ আনিয়ে রেখেছেন, খবর পাঠালেই যে কোন জমিদার সে ফৌজের সাহায্য পেতে পারবেন। আর যিনি তাকে ধ'রে দিতে পারবেন তিনি রাজাবাহাদুর খেতাব তো পাবেনই, রাজোচিত সম্মানও পাবেন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে। মহারাণীর প্রতিভূ হিসেবে কিশোরীমোহনও ছিলেন সেখানে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল খবরটা তিনি যেন নির্বিকার ভাবেই শুনছেন। কিন্তু মনে মনে তিনি মোটেই নির্বিকার ছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন রঙ্গাবতী তাঁকে যে খবরটা দিয়েছে এই সুযোগে সেটা কালেক্টার সাহেবের কর্ণগোচর করলে কেমন হয়। সাহেব এখন এই নিয়ে যে রকম ক্ষেপেছে হয়তো টোপটা গিলতেও পারে। অনেক ভেবে চিন্তে কথাটা বলাই সাব্যস্ত করলেন তিনি শেষ পর্যন্ত। একটু কৌশল করতে হ'ল। সব জমিদাররা যখন একে একে বিদায় নিলেন, তখন তাঁদের দেখিয়ে তাঁদের সঙ্গে গেলেন তিনি কিছুদূর। তারপর একটা গ্রামে নিজেদের একটা কাছারিতে ঢুকে পড়লেন। সেখানে বিশ্রাম করলেন একটু। তারপর সন্ধ্যার দিকে অন্ধকারে আত্মগোপন করে ফিরে গেলেন কালেক্টার সাহেবের বাংলোয়। বাংলোয় পৌঁছতে রাতই হয়ে গেল একটু। চাপরাশিকে বখশিস দিতে হ'ল খবরটা দেবার জন্য। বলে পাঠালেন মহারাণীর চৌধুরাণী ম্যানেজার জরুরি দরকারে একবার দেখা করতে চাইছেন। দেখা হ'ল। কিন্তু কিশোরীমোহনের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল। অত কথা গুছিয়ে বলবার মতো ইংরেজি জ্ঞান তাঁর ছিল না। তাই কথাটা তিনি সরাসরি কালেক্টার সাহেবের কর্ণগোচর করতে পারলেন না। সাহেব একজন দো-ভাষীকে ডাকলেন। এ সম্ভাবনাটার কথা আগে মনে হয়নি তাঁর। দো-ভাষী রাঘব সিংহের জবানীতেই অবশেষে বক্তব্যটা নিবেদন করতে হ'ল তাঁকে। কালেক্টার সাহেব খবরটা শুনে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ধন্যবাদ দিয়ে বললেন খবরটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, তবে এদেশে সবই সম্ভব। যাই হোক, কিশোরীমোহন তাঁর সংবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্যে যদি গভর্নমেন্টের সাহায্য চান সর্বপ্রকার সাহায্য পাবেন। ফৌজ চাইলে ফৌজও পাবেন। কিশোরীমোহন সেলাম ক'রে চলে এলেন।...রাত অনেক হয়েছিল, একা পালকির মধ্যে বসে ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন তিনি। হঠাৎ ধাবমান অশ্বের পদশব্দে চমকে উঠলেন। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে মাঠ ভেঙে ছুটে চলেছে। প্রকাণ্ড পাগড়ী, এছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পেলেন না।

অশ্বারোহীর নাম রাঘব সিংহ।

— পালকি-সারানো ব্যাপার নিয়ে মহারাণী মেতেছিল, তার অন্য কারণ যাই থাক একটা কারণ সে নিজেকে ভুলে থাকতে চাইছিল। মহেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ বাহুপাশে

সেদিন রত্নাবতীকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত মন বিকল হয়ে গিয়েছিল যেন। অহেতুকভাবে তার কেবলি মনে হচ্ছিল মহেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এটা সে সুনিশ্চিত ভাবেই জানত যে মহেন্দ্রনাথকে সে কখনও বিয়ে করবে না, লম্পটের লালসার খোরাক হবার প্রবৃত্তি নেই তার কোনকালে। কিন্তু তবু মনে মনে সে মহেন্দ্রনাথকে নিজের সম্পত্তি ব'লে গণ্য ক'রে রেখেছিল। মহেন্দ্রনাথ যে তারই কৃপাকণা আহরণ করবার জন্যে ভিক্ষুকের মতো দিনের পর দিন হাত পেতে বসে আছে এই ধারণাটাকে সে মনে মনে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছিল, উপভোগও করছিল। শ্রীহর্ষকেই সে ভালোবেসেছিল, কিন্তু পায়নি তাকে, সে দুর্লভ ব'লে তাকে পাবার চেষ্টাও করেনি, নাগালের মধ্যে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ সে বুঝেছিল যে যেমন ক'রে তাকে পেতে চায় তেমন ক'রে তাকে পাওয়া যাবে না, তার অহঙ্কৃত কামনার অনলে সে নিজের সমগ্র সত্তাকে ইন্ধনরূপে সমর্পণ করতে পারবে না, কারণ সে আত্মসম্মানী, সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দু'দিনের জন্যে উতলা হয়েছিল বটে, কিন্তু দু'দিনেই মোহ কেটে যেত তার। আর তারপর লাঞ্ছিত অর্ধ-দগ্ধ মহত্ত্বের আর্তনাদে বিষময় হয়ে উঠত সব। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ ওর মতো দুর্লভ নন, বরং ঠিক উলটো। মহেন্দ্রনাথ ভোগী, কামনার খর-স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর বিন্দু-মাত্র আপত্তি নেই, এতটুকু দ্বিধা নেই, পড়েছেনও একাধিকবার, আবার পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন। মহারাণী তাঁকে প্রশ্রয় দেবে না, কিন্তু তবু তিনি যে তাঁকে ত্যাগ ক'রে আর একজনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এ-ও সে সহ্য করতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল—আমি সারাজীবন বঞ্চিতই থেকে গেলাম। যেমন ক'রে চেয়েছিলাম তেমন ক'রে কাউকেই পেলাম না। শ্রীহর্ষ অতি পবিত্র, মহেন্দ্রনাথ উচ্ছিষ্ট, সম্পূর্ণরূপে আমার কেউ হল না। একটা মৌন হাহাকারে ভ'রে উঠেছিল তার বুক। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মহারাজ। তার কাছেই যাচ্ছিল বারবার। তার পিঠে চড়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা একা, তাকে অজস্র আদর ক'রে, সম্পূর্ণরূপে পদানত ক'রে তার বলিষ্ঠ সিংহ-মহিমাকে পরিণত করবার চেষ্টা করছিল মেষ-সুলভ বশ্যতায়। সে চেষ্টাও সফল হচ্ছিল না সব সময়।

হঠাৎ সে সর্বমঙ্গলার কাছে গেল আবার। কেন গেল তা বলা শক্ত। যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। সর্বমঙ্গলা কত সুখে আছে তাই দেখবার জন্য হয়তো গেল। যে ক্ষুধিত সে অপরকে খেতে দেখলে তির্যকভাবে যে তৃপ্তিলাভ করে সেই তৃপ্তি লাভ করবার জন্যেই গেল হয়তো। কিম্বা হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর আহরণ করবার জন্যে গেল—আমি যাকে আয়ত্তাতীত মনে করেছিলাম সর্বমঙ্গলা কি তাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েছে? হিমালয় কি হস্তামলক হয়েছে তার?

মাদ্রাজিনী-মাহুত-চালিত হস্তী শ্রীহর্ষের বাড়ির সামনে গিয়ে যখন থামল তখন সর্বমঙ্গলা রান্নাঘরে ছিল। হাতীর ঘণ্টার শব্দে সে তাড়াতাড়ি জানলা খুলে দেখতে গেল কে এসেছে। জানলাটা কিন্তু এত এঁটে গিয়েছিল, খুলতে পারলে না সে।

সামান্ত একটু ফাঁক হ'ল, তাই দিয়ে যা সে দেখতে পেলে তাতে শিউরে উঠল। তার মনে হ'ল যেন প্রকাণ্ড একটা কালো সাপ ফণা তুলে রয়েছে। হাতীর বাঁকানো শুঁড়টাই শুধু চোখে পড়েছিল তার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরকন্দাজের সাড়া পাওয়া গেল বাইরের দরজায়।

"রাণীমা এসেছেন—"

সর্বমঙ্গলা তাড়াতাড়ি একটা গামছা দিয়ে হাতটা মুছতে লাগল। হাতে মশলা লেগেছিল। মহারাণীর গলার স্বর শোনা গেল তারপর।

"কি গো, তোমাদের সব খবর কি।"

সর্বমঙ্গলা হাসিমুখে বললে, "আসুন। উনি কিন্তু বাড়ি নেই।"

"আমি তোমার কাছেই এসেছি। তোমার খবর নিতেই এলুম। আমার কথা তো ভুলেও মনে কর না একবারও।"

কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সর্বমঙ্গলা।

"খবর সব ভালো তো?"

"ভালই।"

"কি করছিলে?"

"রান্নাঘরে ছিলাম।"

"রান্নায় বাধা দিলাম না কি। তাহলে তো ব্রাহ্মণের খাওয়া হবে না।"

"রান্না হয়ে গেছে। পোস্তটা চড়িয়ে এসেছি, হয়ে গেছে, নাবিয়ে আসি—"

"চল দেখি কি কি রান্না করেছ।"

অকৃত্রিম কৌতূহল ভরে সর্বমঙ্গলার পিছু পিছু গেল মহারাণী। সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে সে।

পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটি। অনেক তরকারি করেছে সর্বমঙ্গলা। শাকভাজা, উচ্ছে ভাজা, সুকতো, মোচার ঘণ্ট, পোস্ত, ডাল। তাছাড়া বাসী মাছের টকও আছে।

"ভাত রান্না করনি?"

"উনি এলে চড়িয়ে দেব। ঠাণ্ডা ভাত ভালবাসেন না উনি। কখন যে ফিরবেন, ফিরবেন কিনা তারও তো ঠিক নেই।"

"কোথা গেছে শ্রীহর্ষ?"

"রহিমগঞ্জে।"

"সেখানে কেন?"

"আমার দূর সম্পর্কের এক ননদ মারা গেছে।"

"তাই না কি! কি হয়েছিল?"

"গলায় দড়ি দিয়েছে।"

"সে কি! কেন?"

"স্বামী আবার বিয়ে করেছে বলে।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

সর্বমঙ্গলা পোস্তটা নাবিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখলে। তারপর হাত ধুয়ে বললে, "চলুন, ওঘরে যাই—"

এই শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদটা ছায়া ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল মহারাণীর মনে। এর আগে অনেক মৃত্যুর সংবাদ শুনেছে সে। মৃত্যুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে তার। বাবার মৃত্যুই স্বচক্ষে দেখেছে সে। সেই কথাই মনে পড়ল আবার। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে সমুদ্রবিলাসের চোখ দুটো লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখের মণি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, মরবার আগে সর্বগ্রাসী দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন পৃথিবীকে শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছিলেন। কোন ওষুধ খাননি, গঙ্গাজলও না, কেবল মদ, মদ আর মদ। বিশেষ কোনও কথাও বলতেন না, নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন কেবল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে একবার "এই হো—" বলে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন, চাকর, বাকররা ছুটে এসেছিল, কিন্তু তাদের কোন হুকুম দেননি আর। দীনা বাইজী কাছে বসেছিল, তাকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন গান গাইতে। দীনা বাইজী বেহাগ আলাপ করতে লাগল, বেহাগ শুনতে শুনতেই মৃত্যু হ'ল তাঁর। ...শান্ত পিসীর মৃত্যুও দেখেছিল মহারাণী। শান্ত পিসী কেমন যেন আস্তে আস্তে ফুরিয়ে গেলেন। জীবনের শিখা একটু একটু ক'রে কমতে কমতে ধীরে ধীরে নিবে গেল।...আজকের এই মৃত্যু-সংবাদটা একটা বিশেষ রূপে যেন অভিভূত করল তাকে। শোক নয়, দুঃখ নয়, শ্রীহর্ষের দূর-সম্পর্কের যে বোন ছিল তা সে জানতও না, কিন্তু স্বামী আবার বিয়ে করেছে বলে যে অভাগিনী গলায় দড়ি দিয়ে প্রতিবাদ ক'রে গেল, তার অশরীরী অদেখা চেহারাটা যেন ছায়া ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার মনে।

শোবার ঘরে এসে তাই সর্বমঙ্গলাকে যা সে বলল তাতে সর্বমঙ্গলা অবাক হয়ে গেল একটু।

"নমস্য লোক তোমার ওই ননদ।"

"আপনি চিনতেন না কি তাঁকে?"

"না। অমানুষ স্বামীর সঙ্গ এমনভাবে ত্যাগ করতে পেরেছে বলেই নমস্য বলছি তাকে। মরবে তো সবাই একদিন, কিন্তু নিজের মান বাঁচাবার জন্যে যে মরতে পারে সেই তো নমস্য। পদ্মিনীর কথা শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"ওরা সব একজাতের। আহা, আমিও যদি অমন ভাবে মরবার সুযোগ পাই—"

কথাটা শুনে অবাক হ'ল সর্বমঙ্গলা। মহারাণীর সম্বন্ধে তার যে ধারণা এতদিন ছিল সেটা হঠাৎ যেন বদলে গেল।

মহারাণী আবার বলল, "কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই সব জিনিস হয় না। ভাগ্য থাকা চাই।"

সর্বমঙ্গলা উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মহারাণীর দিকে। তার চোখে যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে, তা বোধ হয় সে নিজে জানতে পারেনি। মহারাণী কিন্তু লক্ষ্য করেছিল, সে উজ্জ্বল দৃষ্টির দীপ্তি অনেকদিন আলোকিত ক'রে রেখেছিল তার মনকে।

এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল অন্য কথায়।

মহারাণী জিগ্যেস করল, "তোমাদের পাতাল-ঘর কেমন হ'ল ?"

"ভালই। চলুন না দেখবেন।"

"চল।"

যেদিন মহারাণী রূপোর পালকিতে চ'ড়ে সর্বমঙ্গলাকে গয়না পরাতে এসেছিল সেইদিনই সূচনা হয়েছিল এই পাতাল-ঘরের। শ্রীহর্ষ বলেছিল, "তুমি ক্রমাগত এত দামী দামী গয়না কাপড় দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু আমি এসব রাখব কোথা! আমাদের তো ওই দুটি প্যাটরা মাত্র সম্বল। চোর ডাকাতে নিয়ে যাবে যে—"। মহারাণী বলেছিল, "সে ব্যবস্থাও হবে।" তার পরদিনই মিস্ত্রি এসেছিল মাটির নীচে মজবুত পাকা পাতাল-ঘর নির্মাণ করবার জন্য। একটা ঘরের মেঝে খুঁড়ে ভূগর্ভে নির্মিত হয়েছিল ঘরটি। অথচ বাইরে থেকে বোঝবার উপায় ছিল না, মেঝের নীচে অতবড় একটা ঘর রয়েছে। পাতাল-ঘরে নেমে মহারাণী চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

"বেশ হয়েছে ঘরটি। পছন্দ হয়েছে তো ?"

"আপনি যখন করিয়ে দিয়েছেন তখন অপছন্দ হবার কি আছে ? ঘর ভালই হয়েছে। তবে—"

থেমে গেল সর্বমঙ্গলা।

"তবে আবার কি ?"

"এই ঘরটায় নাবলেই কেমন যেন গা ছমছম করে আমার। মনে হয় কোন বিপদ লুকিয়ে আছে এর ভিতরে।"

"তার মানে ভীতুর শিরোমণি তুমি! চল, ওপরে যাই—"

সেদিন অনেকক্ষণ ছিল মহারাণী সর্বমঙ্গলার কাছে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল তার। যা সে জানতে গিয়েছিল তা জেনেই ফিরেছিল। শ্রীহর্ষকে পেয়ে সর্বমঙ্গলা সুখী হয়নি। শ্রীহর্ষকে বুঝতে পারেনি সে ঠিক। কাছে পেয়েও যেন পায়নি, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে, অথচ ভয়ের কারণটা যে কি তা-ও জানে না। এমন দিনও না কি গেছে যে শ্রীহর্ষ সমস্তদিন একটি কথাও বলেনি তার সঙ্গে, পুঁথি নিয়ে ছাত্রদের নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলে না। রাত্রে কখন যে শুতে আসে সর্বমঙ্গলা টের পায় না সব সময়ে। আলাদা বিছানায় শোয় শ্রীহর্ষ। বলে, একসঙ্গে শুলে তার না কি ঘুম হয় না। খাওয়ার সময়ও অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, সামনে যা দেওয়া যায় তাই খেয়ে নেয়। রান্না ভালো হ'লে প্রশংসাও করে না, খারাপ হ'লে বকাবকিও করে না।···কেরবার

সময় হাওদার উপর মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আকাশের শুভ্র মেঘ-স্তূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মহারাণী ভাবছিল --শ্রীহর্ষকে পাওয়া অত সোজা নয়। আমি ওকে চিনেছিলাম বলেই ছেড়ে দিয়েছি। ও মহাদেব, অনেক তপস্যা করলে তবে ওকে পাওয়া যায়। অত তপস্যা আমার পোষাবে না বলেই ছেড়ে দিয়েছি ওকে। আমার স্বামী আমাকে পাবার জন্যেই তপস্যা করবে। আমি তপস্যা করব কেন! কিন্তু কোথায় সে ? কোথাও সে আছে কি ? আকাশের পটে শ্রীহর্ষের মুখখানাই ফুটে উঠল ধীরে ধীরে। তারপর তার সমস্ত মন আনন্দে ভরে উঠল—সর্বমঙ্গলা তাহলে পায়নি। মন্দির প্রদক্ষিণই করছে কেবল, মন্দিরে ঢোকবার দ্বার খুঁজে পায়নি এখনও। হঠাৎ তার মনে হ'ল, আমিও কি পেয়েছি ? কখনও কি পাব ? ও মন্দিরের কোন দ্বার আছে কি ?

মহেন্দ্রনাথ শেষে বিনা-নিমন্ত্রণেই এলেন একদিন। তাঁর ধৈর্য সীমা অতিক্রম করেছিল। নানাসাহেবের ওজুহাত নিয়েই এলেন। ওজুহাতটা অবশ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিকও ছিল না। প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে বৃটিশ ফৌজ রহড়া গ্রাম ঘেরাও করেছিল নানাসাহেব সে গ্রামে আছেন এই সন্দেহ ক'রে। একজন শৈব সন্ন্যাসীকে ধরেও নিয়ে গিয়েছিল তারা, তার উপর অত্যাচারও করেছে যথেষ্ট। রহড়ার জমিদার কুলেশ বাঁড়ুয্যে নিজে জামিন হয়ে শেষে তাকে উদ্ধার করেছেন। এ সব খবর মহারাণীকে বলবার মতো বইকি।

শৌরসেনী যথারীতি মহেন্দ্রনাথকে গোল-বৈঠকে নিয়ে গেল। পানের ডিবে, আতরদান প্রভৃতি সামনে সাজিয়ে দিয়ে নম্র মৃদু কণ্ঠে বলল, "রাণীমা এসেছেন, আপনি কথা বলুন—"

বলা বাহুল্য, এবার ঠিক এ ধরনের অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেননি মহেন্দ্রনাথ। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বসে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর এক খিলি পান বার করলেন ডিবে থেকে, শূন্যে সেটা ধরে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর কি ভেবে আবার রেখে দিলেন সেটা। গোঁফে তা দিলেন একবার, তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে বললেন, "নানাসাহেব যে এ অঞ্চলে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই। রহড়ায় গভর্নমেণ্টের ফৌজ গিয়েছিল। তোমাকে তাই সাবধান ক'রে দেওয়া কর্তব্য মনে করলাম।"

মহেন্দ্রনাথ এতদিন 'আপনি' বলে এসেছেন, কিন্তু সেদিনের ঘটনা স্মরণ ক'রে 'তুমি' বলাই সমীচীন মনে করলেন।

পরদার ওপার থেকে উত্তর এল, "আপনিই তো আমার একমাত্র ভরসা। যেমন বলবেন, তেমনি করব।"

"তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। সেদিন পরদা সরে গিয়েছিল আজ আবার পরদা কেন ?"

মহারাণীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল পরদার ওপারে।

"তবে সেদিন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলাম না কি ?"

"না। আমার ছাত-বাগানের মালিনী রঙ্গাবতীকে দেখেছিলেন। সে আপনার অনুগ্রহ লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়ে গেছে"—তারপর একটু থেমে বলল, "তাকে ডেকে পাঠাব কি ?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ। ক্ষণকাল নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর ক্রোধে আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল তাঁর। দেখতে দেখতে সমস্ত মুখখানা লাল হয়ে গেল, অগ্নি-বর্ষী হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। মহারাণীর যেমন মনে হয়েছিল তাঁরও তেমনি মনে হ'ল, তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমার সঙ্গে এরকম চাতুরী করবার অর্থ কি বুঝতে পারছি না।"

"ভগবান সাক্ষী, আমি কোনও চাতুরী করিনি। রঙ্গাবতী পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়েছিল, তারপর আপনি না কি তাকে ডেকেছিলেন। আপনার আদেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে, কারণ আপনি আমার সম্মানিত অতিথি আর সে পরিচারিকা মাত্র। আমি তখন এখানে ছিলামও না, ছিলাম খিড়কি বাগানে। এসে দেখলাম আপনি ওর সঙ্গে আলাপ করছেন। তখন আপনাকে বাধা দেওয়া রুচিবিরুদ্ধ মনে হয়েছিল আমার—"

মহেন্দ্রনাথ কোনও উত্তর দিলেন না।

মহারাণী বলল, "আপনি যদি আদেশ করেন, রঙ্গাবতীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। মনে হয় সে-ও আপনার সঙ্গ লাভ করবার জন্তে উৎসুক।"

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গেল মহেন্দ্রনাথের। আরও কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি। তারপর সহসা তাঁর চোখের কোণে হাসির দীপ্তি ফুটে উঠল, সুস্থ রস-বোধ জাগ্রত হ'ল মনে, ক্রোধের মেঘ হঠাৎ কেটে গেল। মৃদু হেসে উপমার সাহায্যে উত্তর দিলেন তিনি।

"মণিভ্রমে কাচে হাত দিতে গিয়েছিলাম। ভুলটা যখন ভেঙে গেল তখন হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। আসল হীরাকেই শিরোভূষণ করব, যদি অবশ্য পাই। দেবীর জন্তেই পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে রেখেছি। তোমাকেই চাই আমি।"

"আমাকে যদি দেবীর মর্যাদাই দিলেন তাহলে উচ্ছিষ্ট ভোগ নিবেদন করছেন কেন ? আমি দেবী নই, সামান্য মানবী, আমারও উচ্ছিষ্টে রুচি নেই।"

আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ। আবার তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ধক্ ধক্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল।

"একটা কথা তোমাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি মহারাণী। আমি যদি এই মুহূর্তে উঠে পরদা সরিয়ে জোর ক'রে তোমাকে দখল করি কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।"

"মহারাজ জবাব দাও এ কথার—"

বজ্রগর্জনে সমস্ত গোল-বৈঠকটা থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। মহেন্দ্রনাথের হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু নিজের অভব্য উক্তির জন্য পরমুহূর্তেই লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি।

বললেন, "সিংহকে ভয় করি না। কিন্তু নিজের এই আত্মবিস্মৃতির জন্য লজ্জিত হয়েছি। ক্ষমা চাইছি—"

পরদার ওপার থেকে কোন জবাব এল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে মহেন্দ্রনাথ উঠে গেলেন। সিঁড়ির নীচে সম্বৃতবাসা শৌরসেনী নত-নেত্রে দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে অন্দরমহলের সীমানা পার ক'রে দিয়ে ফিরে এল।

সেদিন এ ঘটনাটা যদি না ঘটত তাহলে পরবর্তী ঘটনাগুলোর চেহারা বদলে যেত হয়তো। হয়তো মহারাণী মহেন্দ্রনাথের সাহায্য চাইত, হয়তো মহেন্দ্রনাথের লাঠি শড়কি বন্দুকধারী বরকন্দাজের দল রৈ রৈ করে ছুটে আসত তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু এ ঘটনার পর তা আর সম্ভবপর হ'ল না।

এর পরদিনই যে ঘটনাটি ঘটল তা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তার ফল যা হ'ল তাতে ওলট-পালট হয়ে গেল সব। পরদিন বাইরের মহলে বহুরূপী এল একজন, ফুলের গয়না প'রে, সুন্দর একটি ফুলের সাজি নিয়ে, মালিনী সেজে। নেচে গেয়ে এমন জমিয়ে ফেললে সে যে ভাড় জমে গেল। সেরেস্তার বুড়ো বুড়ো কর্মচারীরাও কানে-কলম-গোঁজা অবস্থায় বেরিয়ে এসে তার নাচ দেখতে লাগল। নাচ যখন শেষ হয়ে গেল তখন মালিনী নায়েব মশায়ের কাছে নিবেদন জানাল সে অন্দরে গিয়ে রাণীমাকেও নাচ দেখাতে চায়।

নায়েব মশাই গোঁফ চুলকে বললেন, "সেদিন আর নেই হে যে হুট বলতেই অন্দরে ঢুকে পড়বে। আজকাল পুরুষ চাকর পর্যন্ত বিনা হুকুমে অন্দরে ঢুকতে পায় না। খুব কড়াক্কড়ি আজকাল।"

"হুজুর চেষ্টা করলে হুকুম নিশ্চয় পাব। হুজুরের কথায় কি 'না' বলবেন রাণীমা—"

তোষামোদে তুষ্ট হয়ে নায়েব মশাই হুকুম করলেন, "তেওয়ারি, অন্দরের ঘণ্টার দড়িটা টেনে দাও তো। কেউ এলে বলে দাও একজন বহুরূপী রাণীমাকে নাচ-গান দেখাতে চায়—"। ঘণ্টার শব্দে শৌরসেনীই বেরিয়ে এসেছিল কপাট খুলে। বহুরূপীর কথা শুনে সে-ও উৎসাহিত হ'ল খুব। একটু পরেই খবর এল মহারাণী বহুরূপীকে অন্দরে যেতে হুকুম দিয়েছেন। অন্দরেও বহুরূপী জমিয়ে ফেললে খুব। গানের গলাও তার যেমন মধুর, নাচও তেমনি সুন্দর। তার বিদ্যাসুন্দরের গান আর পদাবলী-কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। মহারাণী দ্বিতলের অলিন্দে চিকের আড়ালে বসে ছিল। তারও খুব ভাল লাগল, বিশেষ ক'রে পদাবলী কীর্তনগুলি। গান শেষ হয়ে গেলে

শৌরসেনীর হাতে দু'টি মোহর দিয়ে সে বলল, "চমৎকার পেয়েছে। দিয়ে আয় ওকে—"

শৌরসেনী নেবে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে যা বলল তা প্রত্যাশা করেনি মহারাণী।

"বহুরূপী আপনাকে প্রণাম করতে চাইছে। নিয়ে আসব এখানে ?"

"নিয়ে আয়।"

বহুরূপী এসে ভক্তিভরে প্রণাম করল মহারাণীকে। তারপর সসঙ্কোচে বলল, "এই ফুলগুলি আমি তৈরি ক'রে এনেছি আপনার চরণে উপহার দেব ব'লে।"

সাজিটি মহারাণীর পায়ের কাছে রেখে হাত জোড় ক'রে বসে রইল সে।

সাজিতে শোলার তৈরি নানান রকম সুদৃশ্য ফুল ছিল, একটি পদ্ম কলিও ছিল।

"তুমি তৈরি করেছ ? বাঃ চমৎকার তো, ভারী খুশী হলাম তোমাকে দেখে। বাড়ি কোথা তোমার ?"

"ডিহি দরিয়াপুর—"

ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল মহারাণীর। নামটা যেন শোনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক মনে পড়ল না তখন।

বহুরূপী প্রণাম ক'রে চলে গেল। ফুলের সাজিটা দালানের এককোণেই প'ড়ে রইল অনেকক্ষণ। মহারাণী শিব-মন্দিরের কাজ সেরে যখন ফিরে এল তখন শৌরসেনী বলল, "ফুলগুলো কি আপনার ঘরে দিয়ে আসব, না গোল-বৈঠকে সাজিয়ে দেব।"

"আমার ঘরেই দিয়ে আয়। পুতুলের আলমারিতে রেখে দেব। বেশ করেছে ফুলগুলি—"

মহারাণীর পুতুলের আলমারিতে হাত দেবার হুকুম ছিল না কারও। ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি সাজানো ছিল ওই আলমারিটির মধ্যে। মহারাণী নিজেই খুলত সেটি মাঝে মাঝে। শৌরসেনী মহারাণীর ঘরে সাজিটি রেখে এল। খানিকক্ষণ পরে মহারাণী সাজিটি আলমারিতে রাখতে গিয়ে দেখল সাজিটি আলমারির তাকে আঁটছে না, ফুলগুলি আলাদা আলাদা ক'রে রাখতে হবে। তাই করতে গিয়ে ফুলের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল সাপ। ফুলের তলায় পানের ডিবের মতো রূপোর কৌটো ছিল একটি। তার ভিতর ছিল এই চিঠিখানি।

"মহারাণী, আশা করি আমার কথা মনে আছে। আমি ব'লে এসেছিলাম আমার দাবী দিয়ে আবার আমি আসব। এবার হতাশ হয়ে ফেরবার ইচ্ছে নেই, সঙ্গে চতুর্দোলা, পুরোহিত নিয়েই যাব। শতাধিক সশস্ত্র লোকও থাকবে সঙ্গে। আগামী অমাবস্যা রাত্রে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব। সাক্ষাতে সব কথা হবে। ইতি—উদয়প্রতাপ"

অন্য মেয়ে হ'লে হৈ চৈ ক'রে উঠত। কিন্তু মহারাণী নীরব হয়ে গেল! ভাবছে

লাগল কি করা উচিত। মহেন্দ্রনাথের যে আচরণ কাল প্রকট হয়ে পড়েছে তারপর আর তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা যায় না। তার নিজের বাইরের মহলে যে ক'টি বরকন্দাজ আছে তারা শতাধিক সশস্ত্র লোককে রুখতে পারবে না, যদি চেষ্টা করে তাহলে অনর্থক রক্তারক্তি হবে, লাভ হবে না কোনও। শেষ পর্যন্ত ওদের হারিয়ে দিয়ে প্রতাপ জোর ক'রে অন্দরমহলে ঢুকবে, বলাৎকার করতেও দ্বিধা করবে না। ডিহি-দরিয়াপুরের যে দাসীটি তখন অন্দরমহলে চুল-বাঁধুনী হয়েছিল সে নিম্নকণ্ঠে উদয়প্রতাপের যে পরিচয় দিয়েছিল তা ভয়ানক। তার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে নিজের কার্যসিদ্ধি করবার জন্যে উদয়প্রতাপ হীনতম উপায় অবলম্বন করতেও কুণ্ঠিত হবে না, জোর করেই তাকে চতুর্দোলায় টেনে তুলবে। ডিহি-দরিয়াপুরের চাকরানীটি বলেছিল ও ডাকাতের সর্দার একজন। ডাকাতি করেই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে, ওর দলের লোক সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে, যখন যেখানে খুশী ডাকাতি ক'রে বেড়ায়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোনও কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না সে। কিছুদিন আগে চাকরানীটি ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, এখনও ফেরেনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মহারাণী ভাবতে লাগল কি করলে সব দিক রক্ষা হয়। অনেক ভেবে অবশেষে সে ঠিক করলে গভর্নমেণ্টের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিশোরীকাকা যদি নিজে গিয়ে খবরটা কালেক্টার সাহেবকে ব'লে আসেন তাহলে তিনি কি মহারাণীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য ব্যবস্থা করবেন না?

আর চারদিন পরে অমাবস্যা! হাতে বেশী সময় নেই।···মহারাণী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইল খানিকক্ষণ, তারপর কিশোরীকাকার খোঁজে পাঠাল শৌরসেনীকে।

শৌরসেনী ফিরে এসে বলল, তিনি খাজনা আদায় করবার জন্যে মহালে মহালে ঘুরছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই এমন আর একটি ঘটনা ঘটল যে কালেক্টার সাহেবকে খবর দেওয়ার কল্পনা বিসর্জন দিতে হ'ল।

সেদিন কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদ উঠল অনেক রাত্রে।

মহারাণী বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল, কিছুতে ঘুম আসছিল না। ঠিক ভয়ে নয়, অস্বস্তিতে। আর একটা অদ্ভুত জিনিসও হচ্ছিল তার, শ্রীহর্ষকে মনে পড়ছিল। সর্বক্ষণ সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল সে। খবরটা পাওয়ার পর থেকে তার মন শ্রীহর্ষকে যেন আঁকড়ে ধরছিল। অথচ শ্রীহর্ষ এ ব্যাপারে কি-ই বা করতে পারে? এ খবর তাকে দেওয়াও বৃথা। দিলে হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠবে (সত্যি হবে কি, মহারাণীর একবার মনে হ'ল), হয়তো বলবে তুমি আমার বাড়িতে এসে থাক, হয়তো গ্রামের লোকদের এনে জড়ো করবে, হয়তো নিজেই চ'লে যাবে কালেক্টার সাহেবের কাছে। খবরটা পেলে শ্রীহর্ষ যে কত কি করবে এই কল্পনাই তার মনে প্রসারিত হচ্ছিল মেঘের

মতো। এমন সময় খিড়কির বাগানে মহারাজের গর্জন শোনা গেল। একবার নয়, দু'বার। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল মহারাণী। মহারাজ এ সময়ে ডাকছে কেন? অযৌক্তিকভাবে একটা অদ্ভুত কথা মনে হ'ল তার। মহারাজ কি টের পেয়েছে আমি শ্রীহর্ষের কথা ভাবছি? হিংসে হ'ল না কি ওর। আর একবার গর্জন শোনা গেল।

মহারাণী নেমে পড়ল বিছানা থেকে। তারপর কপাট খুলে বেরিয়ে গেল। দালানের অপরপ্রান্তে শৌরসেনীর ঘর। তার ঘরের বন্ধদ্বারের দিকে চেয়ে সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। ওর ঘুম ভেঙেছে কি? তার কোন লক্ষণ না দেখে একাই সন্তর্পণে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, চলে গেল খিড়কির বাগানে। খিড়কির বাগানে ঢুকে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। এ কোথায় এল সে। এই কি তার খিড়কির বাগান? এ যে মনে হচ্ছে অচেনা এক নূতন জগৎ! এ খিড়কির বাগান সে কোনদিন দেখেনি তো। গভীর রাত্রি থমথম করছে চতুর্দিকে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে শিবমন্দিরের পিছনে, মন্দিরটাই মনে হচ্ছে যেন ধ্যানমগ্ন শিব। শিবের তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে চাঁদ যেন ললাট ছেড়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। নাগলিঙ্গম্ গাছগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ফুলের ঝোপগুলো মনে হচ্ছে যেন পুঞ্জীভূত গোপন কথা, জ্যোৎস্নার কাছ থেকে কি যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে, জ্যোৎস্না কিন্তু লক্ষ্যও করছে না এসব, আকাশের ধ্যানেই সে নিমগ্ন, তার অজ্ঞাতসারেই তার মহিমা যেন ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে, সে এখনও আসেনি।

মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাণী। এ কি নূতন সাজে সেজেছে তার খিড়কির বাগান। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সে মহারাজের মহলের দিকে। গিয়ে দেখল মহারাজের দৃষ্টি শিব-মন্দিরে নিবদ্ধ। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে।

"মহারাজ, কি হয়েছে?"

মহারাজ একলম্ফে চলে এলো মহারাণীর কাছে। মহারাণী যে এমন সময়ে আসবে তা প্রত্যাশাই করেনি সে। মহারাণী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই তার স্বাভাবিক রীতিতে গরগর শব্দ ক'রে সে আনন্দ প্রকাশ করল। তারপর সামনের পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে পিঠ পেতে দিল—ভাবটা উঠবে পিঠে? ওঠ না। মৃদু হেসে মহারাণী পিঠে চড়ল। তার মনে হ'ল আজকের রাত্রির এই অদ্ভুত মায়া মহারাজকেও যেন বদলে দিয়েছে। একটু যেন বেশী ভদ্র হয়েছে ও আজ। মহারাজের পিঠে চ'ড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কিছুক্ষণের জন্য সে উদয়প্রতাপের সাংঘাতিক চিঠির কথাও ভুলে গেল। তার কল্পনাও যেন পাখা মেলে উড়তে লাগল। মনে হ'ল শ্রীহর্ষের অশরীরী প্রেম যেন আজ ভর করেছে মহারাজের উপর। মহারাজের মাধ্যমেই শ্রীহর্ষ যেন সানন্দে বহন করছে তাকে। কল্পনা করতে লাগল শ্রীহর্ষ ঘুমুচ্ছে, সর্বমঙ্গলার কাছে নয়, আলাদা খাটে। স্বপ্ন দেখছে কি? হঠাৎ মহারাণী দেখতে পেল কষ্টি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কষ্টিও জেগে আছে না কি এত রাত্রে? কি বলছে ও। মহারাজের পিঠ

থেকে নেমে মহারণী পশুমহল থেকে বেরিয়ে এল। কষ্টি আসছে না কেন? আবার হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। মহারাণী এগিয়ে গেল, গিয়ে দেখল কষ্টি কাঁপছে।

"কি বলছিস?"

কষ্টি কিছু বললে না, আঙুল দিয়ে শিবমন্দিরটা দেখিয়ে দিলে কেবল।

"কি হয়েছে ওখানে?"

কষ্টির চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে গেল, মনে হ'ল যেন জীবন্ত চোখ নয়, মনে হ'ল শাদা পাথরের উপর থেকে কালো পরদা স'রে যাচ্ছে যেন। আবার সে আঙুল দিয়ে শিবমন্দিরটা দেখাল।

কি হয়েছে মন্দিরে? মন্দিরের দিকেই এগিয়ে গেল মহারাণী।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল, কিছু দেখতে পেল না। আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল কপাটের শিকলটা খোলা রয়েছে! নিজের হাতে রোজ সে শিকল তুলে দিয়ে যায়, আজ কি ভুলে গেছে? এরকম ভুল তো আর কোনদিন হয় না। কপাট খুলে ভিতরে ঢুকেও প্রথমে সে কিছু দেখতে পায়নি। আবছা জ্যোৎস্নায় শিবলিঙ্গটা দেখা গেল প্রথমে। তারপরই চমকে উঠল সে। শিবলিঙ্গের পিছনে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে।

"কে?"

গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর এল, "নানাসাহেব—"

নানাসাহেব! স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহারাণী। পরমুহূর্তেই তার মনে হ'ল সে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রত্যাশা করছিল নানাসাহেব আসবেন। এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত মহেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন তাকে। যদি আসেন তাহলে সে কি করবে তা-ও ভেবে রেখেছিল সে। তাই সুবল মিস্ত্রিকে দিয়ে পালকিগুলো মেরামত করিয়ে রেখেছে।

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে নানাসাহেব যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে, বৃটিশ পুলিশের তাড়ায় তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, শিকারীর তাড়ায় বন্য ব্যাঘ্র যেমন পালিয়ে বেড়ায় বন থেকে বনান্তরে। আজ নিরুপায় হয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন এই শিবমন্দিরে। তাঁর এক সঙ্গী তাঁকে বলে গেছে আগামী অমাবস্যা রাত্রে বধূসরা নদীতে সে একটি নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করবে তাঁর জন্যে। নৌকোতে চড়তে পারলে মাঝির ছদ্মবেশে তিনি সহজে পালিয়ে যেতে পারবেন। সেই নৌকোটির জন্য অমাবস্যার রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হবে এই অঞ্চলে। মা কি তাঁর সন্তানকে আশ্রয় দেবেন? যদি না দেন তাহলে এখনি তাঁকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কয়েকদিন আগে একজনের অন্দরমহলেই তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাই সাহস ক'রে এখানে ঢুকেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশী নির্ভরযোগ্য। মায়েরাই তো চিরকাল সন্তানদের রক্ষা ক'রে এসেছেন, তাঁর ক্ষেত্রে যে

এর ব্যতিক্রম হবে এ আশঙ্কা তাঁর নেই। এক মা যদি অসুবিধা বোধ করেন, আর এক মা দেবেন।

মহারাণী নির্বাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নানাসাহেবও চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"আমি কি আশ্রয় পাব না? যদি আপনার অসুবিধা হয় আমি এখনই চলে যাচ্ছি—"

"না, আপনি থাকুন। যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব আপনাকে।"

নানাসাহেব হাত জোড় ক'রে হাটু গেড়ে ব'সে পড়লেন এবং তারপর প্রণাম করলেন মহারাণীকে। তারপর উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'এমন আশ্বাস মা ছাড়া আর কে দিতে পারে। কপাটের ফাঁক দিয়ে আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি আমি। আপনাকে দেখে প্রথমেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন? মনে হয়েছিল আপনি বুঝি লছমীবাই, তার যে মৃত্যু সংবাদটা শুনেছি সেটা মিথ্যে। তারপর যখন আপনি কাছাকাছি এলেন, যখন আপনাকে সিংহের পিঠে চ'ড়ে বেড়াতে দেখলাম তখন আমার ভুল ভাঙল। বুঝলাম আপনি লছমীবাই নন, আপনি আরও অনেক বড়, আপনি স্বয়ং জগদ্ধাত্রী। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্ভয় হয়ে গেলাম। মনে হ'ল যে মন্দিরে আজ আশ্রয় পেয়েছি সে মন্দিরের শঙ্কর নিষ্প্রাণ পাথর নন, জাগ্রত দেবতা, তাই তাঁর শক্তি জগদ্ধাত্রীকে আজ জীবন্ত দেখলাম। আমার আর কোন ভয় নেই—"

এই নাটকীয় ব্যাপারে মহারাণী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল একটু।

সসঙ্কোচে বলল, "আপনি যা ভাবছেন তা আমি নই। সামান্য মেয়ে আমি, আপনারই দেশের মেয়ে, এর চেয়ে বড় পরিচয় আমার আর কিছু নেই। আপনি এই মন্দিরে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। আমার যথাসাধ্য আমি করব।"

তারপর মহারাণী যা করল তা সে জীবনে কখনও করেনি। নানাসাহেবের জন্য নিজেই সে বিছানা বয়ে নিয়ে এল, জলও নিয়ে এল একটা রূপোর ভৃঙ্গারে। নানাসাহেবের কথা কাউকে সে জানতে দেবে না, নিজেই তার সেবা করবে। মন্দির-সংলগ্ন ছোট যে ঘরটি ছিল তাতেই তাঁর থাকবার জন্য ব্যবস্থা ক'রে দিল সে। এমন কি কাপড় চোপড়ও দিয়ে গেল কিছু।

"আপনি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বিশ্রাম করুন। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ আসবে না।"

কষ্টি দূর থেকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল সব। মহারাণী জানত দেখলেও বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা ওর নেই। বাইরে ও যায়ও না। তবু মহারাণী তাকে বলে গেল, "ওদিকে যাসনি। উনি আমার আপনার লোক—"

কিছুক্ষণ পরে নানাসাহেবের সমস্ত ক'রে দিয়ে মহারাণী যখন নিজের ঘরে ফিরল তখনও নানাসাহেবের এই কথাগুলো তার কানে বাজছিল—"যে মন্দিরে আজ আশ্রয়

পেয়েছি সে মন্দিরের শঙ্কর নিষ্প্রাণ পাথর নন জাগ্রত দেবতা। তাই তাঁর শক্তি জগদ্ধাত্রীকেও আজ জীবন্ত দেখলাম!" সত্যিই কি তাকে জগদ্ধাত্রীর মতো দেখাচ্ছিল? আশ্চর্য তো। এই কথাটাই মনের মধ্যে সঞ্চরণ ক'রে বেড়াতে লাগল নানা ভাবে। তারপর মনে হ'ল উদয়প্রতাপের কথা। নানাসাহেব যখন এসেছেন তখন তো কালেক্টার সাহেবকে আর খবর দেওয়া যায় না। ডাকাতের সর্দারের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে না কি শেষ পর্যন্ত?

না, তা অসম্ভব।

উপায় একটা বার করতেই হবে।

তার পরদিন সদর নায়েবের ডাক পড়ল মহারাণীর দরবারে।

"কি বলছেন মা?"

"কিশোরীকাকা ফিরেছেন কি?"

"না। তবে আজই ফেরার কথা।"

"তাহলে আপনিই ব্যবস্থা করুন। আগামী অমাবস্যা রাত্রে বাইরে থেকে কিছু গণ্যমান্য অতিথি আসার কথা আছে। তাঁদের ভালো ক'রে অভ্যর্থনা করতে হবে। আমাদের বাগান বাড়িটাও পরিষ্কার করিয়ে রাখুন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালো হওয়া চাই।"

"যে আজ্ঞে। ক'জন অতিথি আসবেন?"

"তা একশ'র কম নয়। বেশীও হ'তে পারে। আপনি দু'শ লোকের জন্য ব্যবস্থা করুন।"

নায়েবের চোখ দুটো কপালে উঠে গেল।

"তাহলে তো পুকুরে জাল ফেলাতে হয়।"

"ফেলান। দুধ দই ক্ষীর আনবার জন্য মহালে মহালে লোক পাঠিয়ে দিন। কয়েকজন ভালো রাঁধুনী চাই। ময়রাদেরও খবর দিন বাড়ীতে ভিয়ান বসবে। নহবতখানাটাও সাজিয়ে ফেলতে বলুন—"

"নবত্ বসবে না কি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো জমিরুদ্দিনকে খবর দিতে হয়।"

"অমাবস্যার দিন সকাল থেকেই সে আসুক তার লোকজন নিয়ে। হ্যাঁ, আর একটা কাজ করতে হবে। সেদিন খুব ধুমধাম ক'রে কালীপুজোও করব। সমস্ত বাড়িটা আলো দিয়ে সাজাতে হবে। কুমোর বাড়ি থেকে হাজার দুই প্রদীপও আনিয়ে নিন। আমাদের ঝাড় লণ্ঠনগুলোও পরিষ্কার করিয়ে রাখুন।"

নায়েবমশাই উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। ঝঞ্ঝাটের কথা ভেবে বিব্রতও হচ্ছিলেন। একটু চেষ্টা করলেন যাতে ঝঞ্ঝাটটা কমে।

"অকালে দীপাবলী করবেন? কাল তো কালীপুজো নয়। শেষকালে কোনও অমঙ্গল হবে না তো?"

"অকালবোধন ক'রে শ্রীরামচন্দ্রের তো মঙ্গলই হয়েছিল। আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি মানত করেছিলাম, সেই মানত শোধ করছি। অমঙ্গল হবে কেন তাতে? আপনি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমাদের পালকির বেয়ারা ক'জন আছে?"

"তা জন কুড়ি হবে।"

"আরও ষাট সত্তর জন বেয়ারা দরকার হবে যে সেদিন। আমাদের সব কটা পালকিই বেরুবে সেদিন। মেয়েরা সবাই নদীতে স্নান করতে যাবে সন্ধেবেলা, তারপর সবাই অঞ্জলি দেবে। আর বেয়ারা পাওয়া যাবে না?"

"চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না কেন। তবে বেশী মজুরি চাইবে হয়তো—"

"বেশী মজুরিই দেবেন। অন্তত আশী পঁচাশী জন বেয়ারা সেদিন সন্ধ্যাবেলা হাজির থাকা চাই। কিশোরীকাকা যদি ফিরে আসেন বলবেন তাঁকে, আর তিনি যদি না-ও এসে পৌঁছন আপনিই ব্যবস্থা ক'রে ফেলবেন। আমার নামে খরচ লিখে আপনি শ'পাচেক টাকা এখুনি খাজাঞ্চিখানা থেকে নিয়ে নিন। আমি হুকুমনামা পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি আরও দরকার হয় তা-ও দেব। কিন্তু যা যা বললাম তা যেন সব ঠিক মতো হয়।"

টাকার অঙ্কটা শুনে নায়েব মশায় একটু আর্দ্র হলেন। কারণ তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানান এই ধরনের খামখেয়ালী ব্যাপারে যে সব টাকা জলের মতো খরচ হয় তার পাই-পয়সা হিসেব কেউ চায় না, দেয়ও না। সমুদ্রবিলাসের আমলে এসব হামেসাই ঘটত। সেই বাপেরই বেটি তো, এ-ও শুরু করেছে এইবার। মনে মনে খুব খুশী হলেন তিনি।

মুখে বললেন, "তা হবে বইকি মা। আপনি যখন ইচ্ছা করছেন, সব হবে। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি—"

সুদক্ষ সেনাপতিরা যেমন যুদ্ধের পরিকল্পনাটা আগে থাকতে নিখুঁত ভাবে করে রাখেন, মহারাণীও তেমনি সমস্ত রাত জেগে পরিকল্পনা করে ফেলেছিল একটা। নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা হবার পর আর ঘুমোয়নি সে। সে ঠিক করেছিল উদয়প্রতাপের সঙ্গে ভদ্রতার চূড়ান্ত করবে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তার ধারণা হয় যে বিবাহের আয়োজনই বুঝি করা হয়েছে। তারপর উদয়প্রতাপকে বলতে হবে যে বাড়ির মেয়েরা জল সইতে যাবে পালকি ক'রে। এতে সম্ভবত সে আপত্তি করবে না। কুড়িটা পালকি যখন একে একে বেরিয়ে যাবে তখন একটা পালকিতে সে নানাসাহেবকে অনায়াসে বাড়ির বার করে দিতে পারবে। নানাসাহেব নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলে তখন বোঝা-পড়া করা যাবে উদয়প্রতাপের সঙ্গে। বুদ্ধির যুদ্ধে জিতবে কিনা সেটা নির্ভর করবে অবশ্য শ্রীহর্ষের অভিনয়-দক্ষতার উপর।

…মহারাণীর পরিকল্পনায় কিন্তু একটি খুঁত ছিল। ছাত-বাগানে বন্দিনী রঙ্গাবতীর সম্ভাব্য প্রতিশোধের কথাটা কল্পনায় আসেনি তার। একথাও তার মনে ছিল না যে ছাতের যে ঘরে রঙ্গাবতী আছে সে ঘর থেকে শিব-মন্দিরের ভিতর পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। শিবমন্দিরে যে একজন অচেনা লোক এসে ঢুকেছে এটা রঙ্গাবতীও দেখতে পেয়েছিল রাত্রে।

মহারাজের গর্জনে তারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতে এসে সে-ও দাঁড়িয়েছিল। তার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হ'ল যখন সে দেখতে পেলে মহারাণীও খিড়কি-বাগানে নেমে এসেছে। আড়ি-পাতা তার স্বভাব, নিজেকে আড়াল ক'রে আলসের ফাঁক দিয়ে সব দেখেছিল সে। মহারাণী এত রাত্রে সিংহের মহলে এল কেন? তারপর সে দেখতে পেল কষ্টির হাতছানি। দেখল মহারাণী মন্দিরে গেল, মহারাণীর সঙ্গে মন্দির থেকে কে একজন বেরিয়ে এসে পাশের ঘরে ঢুকল। দেখল মহারাণী নিজে তার জন্যে বিছানা, খাবার, এমনকি জল পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ গোপনতা কাকে কেন্দ্র করে? নানাসাহেবের কথা সে আগেই শুনেছিল। ঘোর সন্দেহ হ'ল তার।

মহারাণী আবার দোলনায় দুলছিল মনে মনে। সে দোলনা কখনও নিয়ে যাচ্ছিল তাকে আকাশে, আবার পরমুহূর্তে নামিয়ে আনছিল মর্তে। শ্রীহর্ষ কি রাজী হবে না? হতেই হবে তাকে। এখনও আসছে না কেন?

শৌরসেনীকে আবার ডাকল মহারাণী।

"শ্রীহর্ষকে কে ডাকতে গেছে?"

"নটবরকে পাঠিয়েছিলাম বাইরে থেকে।"

"এখনও আসছে না কেন? আবার লোক পাঠা। তুই না হয় নিজেই যা পালকিটা নিয়ে। আমি একটা চিঠিও দিচ্ছি।"

চিঠিতে একটি ছত্র শুধু লিখলে সে।

"অবিলম্বে চ'লে এস। জীবন-মরণ সমস্যা।"

চিঠিখানা খামে পুরে বললে, "তার হাতেই দিবি এটা। অন্য কারো হাতে যেন না পড়ে।"

চিঠি নিয়ে চলে গেল শৌরসেনী।

তারপরই রঙ্গাবতীর দাসী ললিতা এল।

"রঙ্গাদিদি একবার তাঁর কিশোরী দাদুর কাছে যেতে চাইছেন। বলছেন অনেকদিন খবর পাননি, মন কেমন করছে। যাবেন কি?"

"কিশোরীকাকা তো এখানে নেই।"

"খবর নিলাম একটু আগেই ফিরেছেন।"

"বেশ যাক। কিশোরীকাকাকে আমারও দরকার একবার। রঙ্গা যেন তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। দরকারটা জরুরী।"

একটু পরেই রঙ্গাবতীর পালকি বেরিয়ে গেল হুমব্রো হুমব্রো ক'রে। মহারাণী আবার দুলতে লাগল দোলনায়।

তিন

স্নানান্তে বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে শ্রীহর্ষ এলেন।

মহারাণী নিজের শোবার ঘরে পালঙ্কের উপর বসে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল।

"কি ব্যাপার, এত জরুরী তলব কেন? উপর্যুপরি দুবার লোক গেল।"

"জরুরী বলেই দু'বার গেল। বস বলছি সব। এখানেই বস না।"

"এই যে বসছি—"

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন শ্রীহর্ষ।

"কেন, আমার পাশে বসলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত বুঝি।"

শ্রীহর্ষ মৃদু হেসে বললেন, "পাশে বসতেই তো চেয়েছিলাম একদিন। তখন তো রাজি হওনি। এখন লগ্ন বয়ে গেছে। তোমার জরুরী দরকারটা কি বল—"

শ্রীহর্ষের মুখের দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইল মহারাণী।

তারপর বলল, "শুনে হয়ত সুখী হবে আমার মৃত্যু আসন্ন।"

"কি রকম।"

"স্বয়ং যম এবার বর-বেশে আসছে।"

"হেঁয়ালিটা ভেঙে বল।"

মহারাণী উদয়প্রতাপ সম্পর্কিত ঘটনাগুলো একে একে বলে গেল। শ্রীহর্ষের মনে হ'ল তিনি যেন একটা উপন্যাসের কাহিনী শুনছেন।

"কাল আসবে উদয়প্রতাপ?"

"চিঠি তো দেখলে।"

"আমার মনে হয় অবিলম্বে মহেন্দ্রনাথকে খবর দেওয়া উচিত।"

"না, তা দেব না।"

"কেন?"

"আমার খুশী"—তারপর একটু থেমে মুচকি হেসে বললে, "মেয়েমানুষ হলেও আমার আত্মসম্মান আছে।"

"তাহলে পুলিশে খবর দাও।"

"তা-ও দেওয়া যাবে না, কারণ নানাসাহেব আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে পুলিশ ডেকে তাঁকে বিপন্ন করতে পারব না।"

"নানাসাহেব!"

আকাশ থেকে পড়লেন শ্রীহর্ষ।

"নানাসাহেব তোমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন ? কোথা আছেন ?"

"খিড়কি বাগানে, শিবমন্দিরে।"

"কি করবে তাহলে এখন।"

"সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

"আমি কি করতে পারি বল।"

"বলছি।"

নিজের পরিকল্পনাটা তখন বললে সে। শুনে চমৎকৃত হয়ে গেলেন শ্রীহর্ষ। মহারাণী বুদ্ধিমতী তা তিনি জানতেন, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা তিনি করেননি। বললেন, পরিকল্পনা তোমার চমৎকার হয়েছে। আমি এসে কালীপুজো ক'রে দেব, নানাসাহেব যদি পালকি ক'রে আমার বাড়িতে পৌছে যান তাহলে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য পাতাল-ঘরে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে না। সর্বমঙ্গলাকে বলে এলে আমি না ফেরা পর্যন্ত সে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু তুমি যে মিথ্যে কথাগুলো আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছ ওটা আমি পারব না। ওটা আর কাউকে দিয়ে করাও তুমি—"

"আমার মান-প্রাণ রক্ষার জন্যে সামান্য দু'একটা মিছে কথা বলতে পারবে না তুমি! আশ্চর্য।"

"নিজের মান-প্রাণ রক্ষার জন্যেও পারব না। মিছে কথা কখনও বলিনে যে। আর কেউ বলুক না।"

"একথা আমি আর কাউকে বলিনি, বলবও না। তুমি যদি সত্যকে আঁকড়ে আমাকে ডাকাতের হাতে তুলে দিতে চাও, দিও।"

বিপন্ন মুখে চুপ ক'রে গেলেন শ্রীহর্ষ।

মহারাণী নির্নিমেষে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। হঠাৎ তার নীচের ঠোঁটটা কেঁপে উঠল। শ্রীহর্ষ দেখলেন তার চোখে জল টলমল করছে।

"ও কি! আচ্ছা তাই হবে। যা বলছ তাই করব। মিছে কথা কখনও বলিনি কিনা—"

মহারাণী স্থির কণ্ঠেই উত্তর দিল, কিন্তু গলা কেঁপে গেল তার।

"বলতে হবে না। চলে যাও তুমি, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

বিছানার উপর উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল সে।

শ্রীহর্ষ আরও বিব্রত হলেন। তারপর ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

শ্রীহর্ষ চলে গেলেন একটু পরে। মহারাণী উঠে বসল। বসেই রইল খানিকক্ষণ। তার মুখখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সে আবার নূতন ক'রে যেন অনুভব করল শ্রীহর্ষ তাকে ভালবাসে না। শেষ পর্যন্ত সে রাজি হ'ল বটে কিন্তু সেটা ভদ্রতার খাতিরে,

ভালবাসে বলে নয়। খোলা জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে আকাশের দিকে।

...চমক ভাঙল মহারাজের ডাক শুনে। নিমেষের মধ্যে মনে পড়ল এখনও অনেক কাজ বাকী। নানাসাহেবকে খেতে দিতে হবে, কষ্টিকেও বুঝিয়ে বলতে হবে। ব্যাপারটা তাকে এখনও কিছু বলাই হয়নি।

মহারাণী নেমে গেল খিড়কির বাগানে। প্রথমেই গেল মহারাজের ঘরে। অনেকক্ষণ ধ'রে আদর করল তাকে। তার পিঠে চ'ড়ে বেড়াল খানিকক্ষণ। তারপর তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললে, "তুই আমাকে বাঁচাতে পারবি তো? পারবি? উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

মহারাজের গলা থেকে গরগর গরগর শব্দ বেরুতে লাগল। তারপর গেল সে কষ্টির ঘরে। কষ্টিকে বুঝিয়ে বললে সব। চোখ বড় বড় ক'রে কষ্টি শুনতে লাগল।

"ঠিক পারবি তো?"

কষ্টি ঘাড় নেড়ে জানালে, পারবে।

তারপর সে গেল নানাসাহেবের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

সাজিতে ফল, মিষ্টান্ন এবং ঝারিতে দুধ নিয়ে নানাসাহেবের কাছে গিয়ে দেখল পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো তিনি পরিক্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। ঘরের কোণে সে যেমন ভাবে বিছানা পেতে দিয়ে গিয়েছিল তা ঠিক তেমনি ভাবেই পাতা রয়েছে। দেখে মনে হ'ল না যে তিনি তাতে শুয়েছিলেন। খাবারও স্পর্শ করেননি।

"আপনি কিছু খাননি দেখছি।"

"না। খেতে ইচ্ছে করে না।"

ভাঙা ভাঙা হিন্দিতেই উত্তর দিলেন।

"ঘুমোননি?"

"না। ঘুম আসে না।"

"আপনাকে তো বলে গেলাম আমি, চিন্তার কোন কারণ নেই, আপনি বিশ্রাম করুন।"

"চিন্তার কারণ বাইরে নেই, এইখানে আছে।"

এই বলে প্রথমে তিনি বুকে তারপর মাথায় হাত দিলেন।

তারপর হঠাৎ ঝুঁকে মহারাণীর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "একটা কথা জানেন না বোধহয়। আমি পাপী, মহাপাপী। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম।"

"বিশ্বাসঘাতকতা? কবে—"

"শুনবেন সব কথা?"

তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন একটা আকুল আগ্রহ ফুটে উঠল। কথাটা বলে যেন মনের ভার লাঘব করতে চান।

"বলুন।"

"শুনুন। কানপুরে অনেক ইংরেজ পরিবারকে ঘেরাও করেছিলাম শহরের দক্ষিণপূর্ব কোণের একটা বাড়িতে। হুইলার সাহেব তাদের বাঁচাবার জন্মে লড়েছিলেন, খুব লড়েছিলেন তিনি। আমাদের অনেক সিপাহী জখম হচ্ছিল। ৮ই জুন থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত লড়েছিল তারা। শেষকালে আমি তাদের একটা প্রস্তাব পাঠালাম যে তারা যদি অবিলম্বে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে নৌকো ক'রে তাদের এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তারা আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু যখন তারা নৌকোয় চড়ল, নৌকো যখন মাঝ দরিয়ায়, তখন সামলাতে পারলাম না আমি, শর্তের কথা ভুলে গেলাম, তাঁতিয়া তোপীও আমাকে বললে এতগুলো দুষমনকে এত সহজে ধ্বংস করবার সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। হুকুম দিলাম, গুলি চালাও নৌকোর উপর। চার পাঁচজন সাঁতরে পালিয়েছিল কেবল, বাকী সব মারা যায়। তাদের মধ্যে অনেক আওরাৎ ছিল, অনেক বাচ্চা ছিল, অনেক বুড়ো ছিল, রোগী ছিল।"

পিছনে দুহাত নিবদ্ধ ক'রে নানাসাহেব আবার পরিক্রমণ করতে লাগলেন। তারপর মহারাণীর সামনে হঠাৎ থেমে একটু ঝুঁকে আবার বললেন, "বিবিগড়ে যে সব ইংরেজ বন্দী হয়েছিল তাদেরও হত্যা করেছিলাম। তাদের মধ্যেও অনেক আওরৎ ছিল, বাচ্চা ছিল। আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু তাদের আর্তনাদ আমি সর্বদা শুনতে পাই। ঘুম হয় না—"

আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

আবার থেমে বললেন, "আমার মনে হয় এই পাপেই লছমীবাই মারা গেছে, তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়েছে, এই রাগেই হড্‌সন্ গুলি ক'রে মেরেছে বাহাদুর শাহর পুত্র পৌত্রদের, লোপ ক'রে দিয়েছে মোগল বংশ। এইবার আমার পালা—"

আবার পরিক্রমণ শুরু করলেন।

"ওসব ভেবে অনর্থক মন খারাপ করবেন না। যুদ্ধের সময় শত্রুর প্রতি দয়া করলে চলে না। ওরাও কি আপনাদের উপর দয়া করেছে? করেনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আপনাকে রক্ষা করব। আমার কাছ থেকে অন্তত পুলিশ আপনাকে নিয়ে যেতে পারবে না—"

"কি ব্যবস্থা করেছ শুনি।"

"আপনি নদীতীরে কখন যেতে চান?"

"রাত দুপুরে। সপ্তর্ষি অস্ত যাবার পর ওরা ছিপ নিয়ে আসবে বলেছে। নদীতীরে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, তার ওপর আমাকে থাকতে বলেছে।"

"তাহলে শুনুন আমি কি ব্যবস্থা করেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে ওই নদীর কাছেই। তার বাড়িতে মাটির নীচে পাতাল-ঘর আছে একটা। অমাবস্যার

দিন সন্ধ্যার পর একটা পালকি ক'রে সেখানে আপনি যাবেন, গিয়ে সেই পাতাল-ঘরে লুকিয়ে থাকবেন। তারপর রাত দুপুরে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবেন নদীর দিকে। ওদের বাড়ি থেকে নদী প্রায় আধ-ক্রোশ দূরে। ওদের খিড়কি দরজা থেকে বেরিয়েই রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তরে চলে যাবেন।"

"পালকি ক'রে যাবার সময় কেউ দেখতে পায় যদি —"

"পাবে না। আমার একটা দোতলা পালকি আছে। তার ছাতটা বাক্সের মতো খোলা যায়। একজন অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে তাতে। আপনি তার ভিতরই যাবেন, নীচে থাকবে আমার একজন বিশ্বস্ত দাসী। পালকি আগা-গোড়া বোরখা ঢাকা থাকবে—"

চুপ ক'রে রইলেন নানাসাহেব।

মহারাণী বলল, "কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। কিছু খেয়ে বিশ্রাম করুন।"

ম্লান হাসি হেসে নানাসাহেব ঘাড় কাৎ ক'রে সম্মতি জানালেন। দুজনের এতক্ষণ আলাপ হ'ল ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাতে অসুবিধা হ'ল না কারও। মনের একটা ভাষা আছে যা সর্বজনীন, যার প্রকাশ চোখমুখের ভাব-ভঙ্গীতে, শব্দের উপর যা নির্ভরশীল নয়।

নানাসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহারাণী কষ্টির কাছে গেল। রত্নাবতী কিন্তু দোতলার ঘরে ঠায় বসে থেকে জানলার ফাঁকে চোখ দিয়ে সব লক্ষ্য করছিল।

পরিকল্পনাটি বলার সময়েই মহারাণী শ্রীহর্ষকে বলেছিল নানাসাহেবের খবরটা তিনি যেন সর্বমঙ্গলাকে এমনভাবে বলেন যাতে নানাসাহেবের খবরটা সে জানতে না পারে। সর্বমঙ্গলাকে গোপন ক'রে নানাসাহেবকে পাতাল ঘরে আশ্রয় দেওয়া যাবে না, সে সময়ে শ্রীহর্ষও বাড়িতে থাকবেন না, তাঁকে কালীপূজো নিয়ে থাকতে হবে। সর্বমঙ্গলার কাছেই নানাসাহেবকে পাঠাতে হবে, কিন্তু মহারাণীর মতে আশ্রিত ব্যক্তিটি যে নানাসাহেব একথা সর্বমঙ্গলার না জানাই ভালো —হয়তো ভয় পাবে, যদি গল্পচ্ছলে কখনও কাউকে বলে ফেলে তাহলেও বিপদের সম্ভাবনা।

শ্রীহর্ষ ফিরবার সময় ভাবতে ভাবতে আসছিলেন কি বলবেন সর্বমঙ্গলাকে। বাড়ি পৌঁছবামাত্র সর্বমঙ্গলা জিগ্যেস করলো, "রাণীর দরবারে ডাক পড়েছিল কেন?"

"কাল অমাবস্যা। কালীপূজো করতে হবে।"

"ওদের তো বাঁধা পুরুত আছেন?"

"কাল একটু ধুমধাম করতে চায়, বলছে মানত ছিল, তাই আমাকে অনুরোধ করেছে। আলো-টালো জ্বলবে খুব—"

সর্বমঙ্গলা চুপ ক'রে রইল।

"কাল আর এক ঝঞ্ঝাট হবে, আর সেটা পোয়াতে হবে তোমাকে।"

"সেটা আবার কি ?"

"একজন ফেরারি আসামী পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে মহারাণীর নিজের লোক। কাল সন্ধ্যার পর সে পালকি ক'রে এখানে আসবে। মহারাণীর অনুরোধ, তাকে খানিকক্ষণের জন্ম পাতাল ঘরে লুকিয়ে রাখতে হবে। রাত দুপুরের পর সে খিড়কি দিয়ে নদীর ধারে চলে যাবে।"

"আমাদের পাতাল ঘরে ?"

"হ্যাঁ। আমি তখন থাকব না, তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।"

সর্বমঙ্গলা আবার চুপ ক'রে গেল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে ?"

"উত্তর আর কি দেব। বলছ যখন, করব। কিন্তু মনে কর খবর পেয়ে পুলিশ যদি এসে খানাতল্লাস করতে চায় ?"

"পুলিশ খুব সম্ভবত আসবে না। আর যদি এসেই পড়ে, ভয় কি, বাধা দেবে। বলবে আমার স্বামী না আসা পর্যন্ত খানাতল্লাসী হবে না। তিনি আসুন, তারপর যা-হয় কোরো। পারবে না বলতে ?"

"পারব।"

চার

অমাবস্যার দিন সকাল থেকেই ধুম পড়ে গেল মহারাণীর বাড়িতে। জমিরুদ্দিনের দল খুব ভোরে এসেই শুরু করলে ভৈরোঁ। একদল চাকর গেল বাগান বাড়িটা পরিষ্কার করবার জন্যে, আর একদল বাইরের মহলটা সাজাতে লাগল। অতিথিশালার ঘরে ঘরে বিছানো হতে লাগল দামী দামী কারপেট, ভারী ভারী তাকিয়াগুলোতে পরানো হতে লাগল ফরসা ওয়াড়, ফরাসী-গড়গড়া হুঁকো-সটকা তামাক খাওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হুঁকে-বরদার পিয়ারী। সিন্দুক থেকে বাসন বার করা হ'ল রাশি রাশি, পিতলের কাঁসার রূপোর পাথরের, সেগুলো পরিষ্কার করতে লাগল একদল ঝি। কুটনো কোটার ভার নিলে অন্দরের মেয়েরা, লাউ কুমড়ো আলু বেগুনের স্তূপ নিয়ে বসে গেল সবাই। দশজন রাঁধুনী দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড চালাটার বড় বড় উনুন কেটে বড় বড় চেলাকাঠের সাহায্যে আঁচ দিয়ে দিলে ভোর থেকেই, ডাল আর অম্বলটা তারা আগে রেঁধে ফেলবে। তারপর মহাল থেকে জিনিসপত্র আনা শুরু হ'ল। ভারে ভারে দুধ দই ছানা মাখন ঘি তেল। বড় বড় রুই কাতলাও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, সদ্য-ধরা জ্যান্ত মাছ সব, খাবি খাচ্ছে তখনও। উত্তর দিকের উঠোনে স্তূপীকৃত হ'ল মাছগুলো, জেলেরা সঙ্গে বড় বড় বঁটিও এনেছিল, হৈ হৈ ক'রে মাছ কুটতে লেগে গেল সবাই। পালকি বইবার জন্য আশী জন

বেয়ারাও জোগাড় ক'রে ফেলেছিলেন নায়েব মশাই, তারাও একে একে আসতে লাগল আর তাদেরও নানা কাজে লাগিয়ে দিলেন তিনি। কতকগুলোকে নিযুক্ত করলেন প্রকাণ্ড একখানা সামিয়ানা খাটাতে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল সেইখানেই সামিয়ানা খাটানো সাব্যস্ত করলেন তিনি, অতিথিশালায় যদি স্থানাভাব ঘটে এইখানে বসানো হবে কিছু লোককে। দীপাবলীর জন্য যে প্রদীপগুলো এসেছিল সেগুলোকে ভিজিয়ে শুকিয়ে, তেল-সলতে দিয়ে সাজিয়ে রাখতে আদেশ দিলেন কয়েকজনকে, ছাতটা পরিষ্কার করতে লাগল জনকয়েক, ফুল আর দেবদারু পাতা সংগ্রহ করতে গেল কয়েকজন, কলা-গাছের জন্যও জনকয়েক গেল। অন্দর মহলের প্রশস্ত বারান্দায় শিল পড়ে গেল কুড়ি-পঁচিশটা, নানা বয়সের ঝিয়ের দল মশলা বাটতে লাগল গাছ-কোমর বেঁধে। তাদের মুখে মুখে পান-দোক্তা দিয়ে বেড়াতে লাগল একজন। বারোটি কুচকুচে কালো নধর পাঁঠা নিয়ে বাইরের মহলে প্রবেশ করল খাঁড়া হাতে বলিষ্ঠ জগু কামার। মা কালীর নিত্য পূজারী অবিনাশ ঠাকুর সেগুলিকে মন্ত্রঃপূত করে মায়ের কাছে উৎসর্গ ক'রে দিলেন। সেগুলিকে মায়ের সামনে বলিদান দেওয়া হবে। জগুই কাটবে। সেকালে হিন্দুঘরে বৃথা-মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল না, মাংস খেতে হ'লে আগে সেটা মায়ের প্রসাদী ক'রে নিতে হ'ত। অবিনাশ ঠাকুর প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, "একটা পাঁঠা রেখে দাও। রাত বারোটার সময় শ্রীহর্ষ ঠাকুর যে পুজোটা করবেন তাতে দরকার হবে।" বাকী পাঁঠাগুলো তিনি একে একে উৎসর্গ করতে লাগলেন, আর জগু হাড়-কাঠে ফেলে কাটতে লাগল। মা কালীর মন্দিরের সামনে হাড়-কাঠ পোতাই ছিল একটা। বলিদান শেষ ক'রে জগুই পাঁঠাগুলোকে নিয়ে গেল পিছন দিকের আর একটা আটচালায়, জন কয়েক বাগদী সাহায্যকারীও সঙ্গে গেল তার। পাঁঠাগুলোকে ছ'ড়ে কেটে তৈরী ক'রে তবে তার ছুটি। মাংস-পোলাও রান্না করবার জন্যে আলাদা রাঁধুনি এসেছিল জনকয়েক। মাংস পোলাওয়ের জন্য বিশেষ মশলা আর বাসন তারা আলাদা ক'রে রাখতে লাগল। সিধু মুহুরী একটা ঢাকা ঝুড়ি নিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নায়েব মশায়ের কানে কানে রহস্যময় ভাবে কি বললেন। নায়েব মশাই আদেশ দিলেন, "ওই কোণের ঘরে সাবধানে রাখ ওগুলো।" কয়েক বোতল মদ, কিছু গাঁজা এবং গাঁজার কলকে নিয়ে এসেছিলেন সিধু মুহুরী। যারা মেহনত করছে তাদের মধ্যে অনেকে গাঁজা খায়, মাঝে মাঝে গাঁজায় দম না দিলে কাজে উৎসাহ পাবে না তারা। আর 'কারণ' তো কালী পুজোর অঙ্গ, অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ চাইতে পারেন।

কিশোরীমোহন কিন্তু এবারও এলেন না। তাঁর জন্যে অবশ্য আটকাল না কিছু। মুহুরী আমলারা তদ্বির তদারক করছিল, আর বৃদ্ধ নায়েব মশাই চরকির মতো ঘুরছিলেন চারদিকে।

নহবতে বাজতে লাগল ভৈরোঁর পর ভৈরবী, তারপর আশাবরী। এইভাবে সমস্ত দিন চলল।

সন্ধেবেলা যে কি হবে, অতিথিরা কখন আসবে, তা ঘুণাক্ষরে কাউকে বলল না মহারাণী। কেউ তাকে জিগ্যেস করতেও সাহস করলে না। অন্দরমহলে সিন্ধুবালা আর কুসুমের দল নিজেদের বিভিন্ন অনুমানকে ধ্রুব-সত্য মনে ক'রে সোৎসাহে কাজ করে যাচ্ছিল। উলকি মোনার মাকে এসে ফিস ফিস ক'রে বললে, "মহারাণীর মুখটি শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেছে।" গোবরার মা চোখ মোটকে বললেন, "এতেও যদি মুখ না শুকোয়, কিসে আর শুকুবে বল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে শয্যা নিত।" কুসুমের দলের কুঁজো গিন্নি কিন্তু মহারাণীর অন্য রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি কুসুমের কানে কানে বললেন, "ধন্যি মেয়ে বটে। মাথার উপরে অত বড় একটা খাঁড়া ঝুলছে, কিন্তু গেরাজ্যি নেই। চান ক'রে এসে ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকুচ্ছে শুনলাম!" নায়েব মশাইও নিজের কল্পনা অনুসারে এর অর্থ করেছিলেন একটা। তিনি ভেবেছিলেন কিশোরীমোহন কিম্বা মহেন্দ্রনাথের চেষ্টায় মহারাণীর বিয়েরই সম্বন্ধ হচ্ছে বোধহয় কোথাও, পাত্রপক্ষ আজ দেখতে আসছে। কিন্তু কিশোরীমোহন বা মহেন্দ্রনাথ কাউকে দেখতে না পেয়ে মাঝে মাঝে খটকাও লাগছিল তাঁর। মহারাণী নিজের বিয়ের আয়োজন নিজেই হামরাই হয়ে করছে এটা তাঁর ভাল লাগছিল না। তিনি আশা করছিলেন বিকেল নাগাদ কেউ হয়তো এসে পড়বেন।

...বিকেলের দিকে (জমিরুদ্দিন তখন পূরবী ধরেছে) অন্দর থেকে মহারাণীর হুকুম এল, শ্রীহর্ষের বাড়িতে দুটি খালি পালকি যাবে। চিঠিও যাবে একটি। চিঠিতে মহারাণী শ্রীহর্ষকে লিখল, "একটি পালকিতে তুমি চলে এস। দ্বিতীয় পালকিটি তোমার ওখানেই থাকবে। কেন থাকবে তা পরে শুনো।"

সন্ধ্যাবেলা আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে ঝলমল করতে লাগল বাড়িটা। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে অতিথিরা কখন আসবে। সকলের সাগ্রহ প্রতীক্ষা একটা অদৃশ্য উৎসুক পরিবেশ সৃষ্টি করছে চতুর্দিকে, সমস্ত বাড়িটাই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। প্রদীপের শিখাগুলো পর্যন্ত নিষ্কম্প। জমিরুদ্দিন ইমনে তান ধরেছে। মহারাণী অপেক্ষা করছিল শ্রীহর্ষের জন্য। পাতালঘরের বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে নিশ্চিতরূপে এ খবর পাবার পর তবে সে নানাসাহেবকে পাঠাবে। খিড়কি-বাগানে মন্দিরের কাছে দোতলা পালকিটি সে সন্ধের পর থেকেই দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এমন ব্যবস্থা করেছে যে শৌরসেনী পালকির নীচের তলায় ব'সে নানাসাহেবের সঙ্গে যাবে, কিন্তু সে-ও জানতে পারবে না যে দোতলায় তার মাথার উপর নানাসাহেব শুয়ে আছেন। মহারাণী বিকেলেই শৌরসেনীকে বলে রেখেছে, "সর্বমঙ্গলার জন্যে পালকি পাঠাতে হবে। তুই পালকি নিয়ে যাবি, তোর হাতে চিঠিও দেব একটা। তুই চিঠিটা দিয়ে পালকিটা রেখে চলে আসিস। সেখানে আর একটা পালকি আছে। সর্বমঙ্গলা কিছু জিনিসপত্র আনবে, তার জন্যে বড় পালকিটা রেখে আসিস।" অন্ধকার হতেই নানাসাহেব একটা ছোট সিঁড়ির সাহায্যে পালকির দোতলায় উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে

রইলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁকে কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু রঙ্গাবতী দেখেছিল। মন্দির থেকে তার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য সরেনি।

একটু পরেই শ্রীহর্ষ তাঁর পুঁথিপত্র নিয়ে এসে পড়লেন। মহারাণীকে বললেন, "ওদিকে সব ঠিক আছে, পালকি পাঠাতে পার।"

শৌরসেনী গিয়ে পালকিতে উঠল, পালকি অন্দর থেকে বেরুতে যাবে, এমন সময় দুম দুম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল কয়েকটা, তারপরই ঘোড়ার খুরের শব্দ। মনে হ'ল একদল অশ্বারোহী বাড়ির সামনে এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অন্দরমহলের ঘণ্টা। একজন দাসী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—নায়েব মশাই বললেন, একজন সাহেব এসেছে পুলিশ ফৌজ নিয়ে। তার সঙ্গে কালেক্টারের পরওয়ানা আছে সে এখুনি বাড়ি খানাতল্লাসী করবে। পুলিশে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।"

মহারাণী নিস্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শ্রীহর্ষের দিকে ফিরে বলল, "তুমি সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। দেখা ক'রে বল একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়ি এমন ভাবে খানাতল্লাসী করা খুবই অপমানজনক। আমার বাবা গভর্নমেণ্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, আমিও সে বন্ধুত্ব অটুট রেখেছি। তবু এ অপমান তাঁরা যদি করতেই চান তাহলে অন্দরের মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দেবার অনুমতি তাঁরা আশা করি দেবেন। মেয়েরা ঢাকা পালকিতে আগে একে একে আমার বাগানবাড়িতে চ'লে যাক, তারপর তারা অন্দরে ঢুকুন। তাঁদের যদি সন্দেহ হয় পালকি সিংহদরজা থেকে বেরুবার সময় তাঁরা দেখে নিতে পারেন পালকিতে মেয়ে-সোওয়ারি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অবশ্য বাড়িতেই থাকব।"

শ্রীহর্ষ বাইরে চলে গেলেন।

পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করেছে এ খবর রঙ্গাবতীর কাছেও পৌঁছেছিল। উত্তেজিত হয়ে নেবে এসেছিল সে। মহারাণী তাকে দেখে বলল, "পুলিশ বাড়ি খানা-তল্লাসী করবে, তৈরি হয়ে নে, তোদের সব বাগান-বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।"

"আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না কোথাও।"

"তাহলে আর সবাইকে খবর দে।"

শ্রীহর্ষ ফিরে এলেন।

বললেন, "ক্যাপ্টেন সাহেব বলছেন খানাতল্লাসী তাঁকে করতেই হবে, কালেক্টার সাহেবের কড়া হুকুম। তবে মেয়েদের অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু বেরিয়ে যাবার আগে প্রত্যেক পালকিটি তাঁরা দেখে তবে যেতে দেবেন।"

অন্দরমহলে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। কুসুম ভাবলেন, পুলিশ বোধহয় তাঁর সেই কাকাই পাঠিয়েছেন। মোনার মা মনে করলেন, বৃন্দাবন থেকে সিন্ধুবালা কলকাঠি নাড়ছেন। দুজনেই মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করলেন। বাকী সকলের মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। কাঁদতে লাগল কেউ কেউ।

মহারাণী আশ্বাস দিল সকলকে, "ভয় কি। এখুনি আবার ফিরে আসবে সবাই।"

সে নিজে দাঁড়িয়ে পালকিতে চড়াতে লাগল সকলকে। রঙ্গাবতীও কাছে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে লাগল। যেমন ঠিক ছিল শৌরসেনী নানাসাহেবের পালকিতে উঠল।

মহারাণী তাকে আবার বলল, "এ পালকিটা শ্রীহর্ষের বাড়ি যাবে। সর্বমঙ্গলার জন্তে এ পালকিটা থাকবে সেখানে। পুজোর সময় সর্বমঙ্গলা আসবে। তুই চিঠিটা সর্বমঙ্গলাকে দিয়ে বাগান বাড়িতেই চলে যাস। ওখানে তোর ফেরবার জন্ত একটা পালকি আছে—"

সর্বমঙ্গলাকে চিঠি লিখেই রেখেছিল সে।

"রাত দুপুরে তুমি এস সব কাজ চুকিয়ে। সেই সময়ই পুজো হবে। সব জিনিস নিয়ে এস। পালকি তোমার জন্তে অপেক্ষা করবে।"

রঙ্গাবতী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সব শুনলে সে। তার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না।

...পালকি বেরুতে লাগল একে একে।

ক্যাপ্টেন সাহেব সিংহদরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রত্যেক পালকি বেরুবার আগে তিনি ঢাকা তুলে তুলে দেখতে লাগলেন। নানাসাহেবের পালকিটা শেষের দিকে ছিল। সেটার ঢাকা তুলেও দেখলেন তিনি। রূপসী শৌরসেনী নত নেত্রে বসে ছিল জড়সড় হয়ে। তাকে দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন সাহেব যে পালকিটা যে অন্তান্ত পালকির চেয়ে বড় তা লক্ষ্য করবারই অবসর পেলেন না।

"পাস্—"

নানাসাহেবের পালকি বেরিয়ে গেল।

তারপর পুলিশ ঢুকল অন্দরমহলে। সমস্ত ঘর খোলাই ছিল, প্রত্যেক ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারা। তারপর গেল খিড়কির বাগানে। মশাল জেলে জেলে প্রত্যেক গাছের তলায় তলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, বড় গাছগুলোর উপরেও চড়ল। মহারাজের মহলের কাছে আসতেই গগনবিদারী গর্জন ক'রে মহারাজ সম্বর্ধনা করল তাদের। শ্রীহর্ষও ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন। তিনি বললেন, "মহারাণীর পোষা সিংহ।" ক্যাপ্টেন সাহেব অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলেন সিংহটাকে, তারপর বললেন, "রেআর আফ্রিকান ভ্যারাইটি।"

কষ্টি চোখ বড় বড় ক'রে বসে ছিল নিজের ঘরে।

শ্রীহর্ষ বললেন, "এও কঙ্গো দেশের মেয়ে। ওই সিংহের সেবা করে।"

ক্যাপ্টেন সাহেব মুখ ছুঁচলো ক'রে ছোট্ট শিস দিলেন একটা।

বাগান খোঁজা শেষ ক'রে তারপর তাঁরা ঢুকলেন মহারাণীর মহলে। মহারাণী দোলনায় দুলছিল, সাহেব যখন এল তখন ভ্রূক্ষেপও করল না, যেমন দুলছিল তেমনি দুলতে লাগল।

শ্রীহর্ষ পরিচয় দিলেন, "ইনিই স্টেটের মালিক, মহারাণী চৌধুরাণী—"

সাহেব বাঁ হাত দিয়ে মাথার হ্যাটটা তুললেন একবার।

মহারাণী চেয়েও দেখলো না সেদিকে, যেমন ছুলছিল, দুলতে লাগল।

সাহেব বললেন, "আমি প্রতি ঘরে ঘরে ঢুকে দেখতে চাই।"

শ্রীহর্ষ উত্তর দিলেন, "আসুন, আমি দেখাচ্ছি—"

ঘরে ঢোকবার আগে সাহেব তাঁর সহকারীকে বললেন, "তুমি ছাতটা দেখে এস"—সহকারী একাই উঠে গেলেন ছাতবাগানে একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে। সহকারীটি এদেশী লোক, সম্ভবত গুর্খা। ছাতে গিয়েই তাঁর দেখা হ'ল রঙ্গাবতীর সঙ্গে। রঙ্গাবতী এই সুযোগই খুঁজছিল। সে যা জানত তা ব'লে দিলে তাঁকে। কিন্তু হিন্দি ভালো জানা ছিল না, তাই ভাল ক'রে সব বুঝিয়ে বলতে পারলে না। তবে সহকারী ক্যাপ্টেন এইটুকু বুঝলেন যে নানাসাহেব একটু আগে এখানে ছিল, পালকি ক'রে এখন শ্রীহর্ষ পণ্ডিতের বাড়িতে গেছে। সেখানে ফৌজ নিয়ে গেলে তাকে ধরা যাবে। তিনি তর তর ক'রে নেমে এলেন ছাত থেকে। এসে দেখলেন শ্রীহর্ষ দাঁড়িয়ে আছে, সাহেব নীচে চলে গেছেন। তিনিও নীচে নেবে গেলেন। গিয়ে ক্যাপ্টেনের কানে কানে বললেন খবরটা।

"ইম্‌পসিব্‌ল্"—চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, "প্রত্যেক পালকি আমি নিজে দেখেছি।"

তাঁর আত্ম-অভিমানে যেন ঘা লাগল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন।

"শ্রীঅরসা প্যাণ্ডিৎ?"

"তাই তো বললে মেয়েটি।"

"তার বাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে?"

"সেটা অসম্ভব হবে না। কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে।"

শ্রীহর্ষই যে এতক্ষণ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন সে কথা জানতেই পারলেন না তাঁরা। কারণ মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁরা পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন। এ অঞ্চলের কাউকেই চিনতেন না।

কিছুক্ষণ ভেবে ক্যাপ্টেন বললেন, "বেশ, চল, চেষ্টা করেই দেখা যাক।"

ক্যাপ্টেনের হুকুম পেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল অশ্বারোহী ফৌজের দল।

শ্রীহর্ষ নীচে নামেন নি। মহারাণীর কাছাকাছি থাকাই সমীচীন মনে করেছিলেন তিনি। সবাই যখন চলে গেল তখন মহারাণীও নেবে পড়ল দোলনা থেকে। দুলতে দুলতে একটি কথাই ভাবছিল, সেই কথাটাই বললে।

"নানাসাহেব যে এখানে এসেছিলেন এ খবর ওরা পেল কি ক'রে?"

"সরকারের চর চারিদিকে ঘুরছে। উনি যখন দেওয়াল বেয়ে উঠেছিলেন তখনই হয়তো দেখে ফেলেছিল কেউ—"

রত্নাবতীর কথা কারও মনেই হ'ল না।

"উদয়প্রতাপ আজ আর আসবে কি? এদিকে যখন ফৌজ এসেছে—"

"রাত তো খুব বেশি হয়নি। আমার মনে হয় সে ঠিক আসবে। তুমি পুজোর ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি কষ্টির খবরটা নি—"

মহারাণী নেবে গেল খিড়কির বাগানে।

শ্রীহর্ষ বাইরে পুজোর ব্যবস্থা করতে গেলেন।

পাঁচ

কালীপুজো শেষ হয়ে গেছে।

মন্দিরের মধ্যে বসে শ্রীহর্ষ সুললিত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করছেন।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃ-খড়্গ বামাধোর্ধ-করাম্বুজাম
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাম্।
মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী-গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্।

থমথম করছে অমাবস্যার রাত্রি। সে রাত্রি যেন সহস্র উজ্জ্বল চক্ষু মেলে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। প্রদীপগুলোতে পুনরায় তেল দিয়ে উস্‌কে দেওয়া হয়েছে। নিষ্কম্প শিখায় জ্বলছে তারা। পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে নায়েব মশাই স'রে পড়েছেন, গোমস্তা-আমলারও কেউ নেই। চাকর রাঁধুনিরা পালায়নি, তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে একটা আটচালায়। জমিরুদ্দিন নহবৎখানায় ব'সে আছে, কিন্তু বাজাচ্ছে না। পুজোর সময় বাজাতে মানা করেছিলেন শ্রীহর্ষ। অতিথিদের দেখা গেলে তবে সে আবার বাজাবে। অন্দরমহল খালি। দীনা বাইজীর মহলেও কেউ নেই, মহারাণী তাকেও পাঠিয়ে দিয়েছে বাগান বাড়িতে। সেই অতি-নিবিড় অতি-নীরব অমাবস্যা রাত্রি মথিত করে উঠছে কেবল শ্রীহর্ষের আকুল কণ্ঠস্বর।

কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্
ঘোর-দংস্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত-ধারা বিস্ফুরিতাননাম।
ঘোর-রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাম্।

হঠাৎ নহবৎ বেজে উঠল, শুরু হয়ে গেল দরবারি কানাড়া।

নহবৎখানা থেকে জমিরুদ্দিন দেখতে পেয়েছিল সুসজ্জিত একটা চতুর্দোলা আসছে, আর তার সামনে-পিছনে আসছে একদল মশালধারী লোক। তাদের পিছনে রয়েছে ঘোড়-সোয়ার। অনেক ঘোড়-সোয়ার।

...সিংহদরজা খোলাই ছিল। বিনা বাধায় সদলবলে প্রবেশ করলেন উদয়প্রতাপ। শ্রীহর্ষ বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। তাঁর গলায় জবাফুলের মালা, পরিধানে রক্তাম্বর, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ। মূর্তিমান অগ্নির মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। চতুর্দোলা থেকে উদয়প্রতাপ নাবলেন। তাঁর বর-বেশ।

শ্রীহর্ষই সম্বর্ধনা করলেন এগিয়ে।

"আসুন, আসুন। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা।"

উদয়প্রতাপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কে ?"

"আমি পুরোহিত।"

"ও, নমস্কার। আমার সঙ্গেও পুরোহিত আছেন একজন। মহারাণী কোথা ?"

"অন্দরমহলে আছেন তিনি। আপনারা বসুন। খবর পাঠাচ্ছি তাঁকে। আসুন এই দিকে—"

মন্দিরের সামনেই অতিথিশালা। তারই সুপ্রশস্ত দালানে শতাধিক লোকের বসবার জায়গা নায়েব মশাই ঠিক করে রেখেছিলেন। দামী কার্পেটের উপর সাজানো ছিল শাদা-ওয়াড় পরানো তাকিয়ার সারি। মাঝখানের তাকিয়াটির বৈশিষ্ট্য ছিল কেবল। সেটিতে ছিল দামী জরি-বসানো মখমলের ওয়াড়। তার সামনেও দামী মখমল পাতা ছিল একটি। দেখলেই মনে হয় বরাসন। উদয়প্রতাপ এরকম সম্বর্ধনা প্রত্যাশা করেননি, বরং ভেবেছিলেন বাধা পাবেন। প্রস্তুতও হয়ে এসেছিলেন সেজন্য। শ্রীহর্ষের আহ্বানে সকলে গিয়ে দালানে আসন গ্রহণ করবার পর উদয়প্রতাপের চতুর্দোলা থেকে প্রকাণ্ড একটি মুখ-বাঁধা পিতলের হাঁড়ি নামিয়ে আনল একজন। উদয়প্রতাপ সেটি তাঁর পাশেই রাখতে বললেন।

"মহারাণীর সঙ্গে দেখা হবে কখন ?"—প্রশ্ন করলেন তিনি শ্রীহর্ষকে।

"আমি খবর নিচ্ছি।"

শ্রীহর্ষ ভিতরে চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বললেন, "মহারাণী আপনার সঙ্গে এখনি আলাপ করবেন। কিন্তু একা আপনার সঙ্গেই আলাপ করতে চান তিনি।"

"আমিও তাই চাই। কিছু করবার আগে গোটাকতক কথা বলবার আছে তাঁকে।"

"বেশ। আসুন তাহলে সর্বাগ্রে মা-কে প্রণাম করে নিন।"

শ্রীহর্ষ কালীমন্দিরের দরজাটি খুলে দিলেন ভাল ক'রে। কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি,

আকারে খুব ছোট, কিন্তু ভীষণ-দর্শনা। উদয়প্রতাপ সদলবলে উঠে এসে প্রণত হলেন সেই মূর্তির সামনে।

যে পুরোহিতটি ওঁদের সঙ্গে এসেছিলেন তিনি বললেন, "এরকম কালীপ্রতিমা আমি আর দেখিনি কখনও। অদ্ভুত মূর্তি—!"

শ্রীহর্ষ এই ধরনেরই সুযোগ খুঁজছিলেন একটা।

বললেন, "এরকম জাগ্রত কালীও এ অঞ্চলে আর নেই। উনি শুধু প্রস্তর-প্রতিমা নন, প্রয়োজন হ'লে জীবন্তও হ'তে পারেন। একবার একজন লোভী পুরোহিত ওঁর মুকুটের নীলাটি নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল, উনি খড়্গাঘাতে স্বহস্তে তাকে বধ করেন—"

"বলেন কি!"

"এ সত্যি কথা, সকলেই জানে।"

প্রণাম-পর্ব শেষ হবার পর শ্রীহর্ষ উদয়প্রতাপকে বললেন, "আপনি আসুন তাহলে—"

আবার সেই ঘরে সেই পরদার সম্মুখে গিয়ে বসলেন উদয়প্রতাপ। দেখলেন মেঝের উপর সেই আলপনাটিই আঁকা রয়েছে—বিরাট একটা সাপের সঙ্গে বিরাট একটা ময়ূরের যুদ্ধ হচ্ছে।

মহারাণীই প্রথমে কথা কইল।

"নমস্কার। আশা করি পথে কোন কষ্ট হয়নি। আপনার চিঠি পাঠাবার অভিনব পদ্ধতিটি খুব ভালো লেগেছে আমার। সত্যিই আপনি অসাধারণ লোক।"

"শুনে সুখী হলাম। আপনি তো জানেন এই দিনটির জন্যে কতকাল থেকে প্রতীক্ষা ক'রে আছি।"

"আমিও আজ প্রতীক্ষা করছি অনেকক্ষণ থেকে। আশা করেছিলাম সন্ধেবেলাই আপনারা এসে পড়বেন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও সেই ভেবেই করেছি, হয়তো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

"আসতে কেন দেরী হয়েছে তা শুনলে আপনি হয়তো ক্ষমা করবেন। একটু ঘুরে আসতে হয়েছে। আপনার একটি মহাশত্রু নিপাত ক'রে এসেছি।"

"আমার মহাশত্রু! কে সে?"

"আপনাদের ম্যানেজার কিশোরীমোহন। তিনি কালেক্টার সাহেবকে গিয়ে খবর দিয়েছিলেন যে আপনার নাকি নানাসাহেবের উপর গভীর সহানুভূতি। আপনি এবং গাঙ্গুটির জমিদার মহেন্দ্রনাথ নাকি তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন। হয়তো এজন্য পুলিশ ফৌজ আপনাদের বাড়িতে হানা দেবে।"

"আমাদের ম্যানেজার যে কালেক্টার সাহেবকে একথা বলেছেন তা আপনি টের পেলেন কি ক'রে?"

"রাঘব সিংহ কালেক্টার সাহেবের দো-ভাষী। তারই জবানীতে খবরটা কালেক্টার সাহেব শুনেছেন। ওই রাঘব সিংহই খবরটা আমাকে দিয়েছিল।"

"তিনি খবরটা আপনাকে দিতে গেলেন কেন?"

"কারণ আমরা সবাই নানাসাহেবের দলের লোক। নানাসাহেব এই অঞ্চলেই এসেছেন তা সত্যি, ঠিক কোথা আছেন সে খবর অবশ্য এখনও পাইনি, তবে আমাদের দলের লোকেরা চেষ্টা করছে যাতে তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নেপাল অঞ্চলে পালিয়ে যেতে পারেন।"

পরদার ওপারে মহারাণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ক্ষণকালের জন্যে সে ভাবলে নানাসাহেবের খবরটা একে বলা সমীচীন হবে কি? শেষে না বলাটাই ঠিক করল। "আমাদের ম্যানেজারকে মেরে ফেলেছেন!"

"তার মুণ্ডটা একটা পিতলের হাঁড়িতে পুরে এনেছি আপনাকে উপহার দেব ব'লে। বাইরে আছে সেটা—"

স্তম্ভিত হয়ে গেল মহারাণী। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল ছাতবাগানের ঘর থেকে শিব-মন্দিরটা স্পষ্ট দেখা যায়। সহসা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সব। কাল-ভুজঙ্গিনীটা এখনও তো ছাতের উপর রয়েছে। আবার সব পণ্ড ক'রে দেবে নাকি! এখনই একবার দেখা দরকার সে কি করছে।

"আমি একবার ভিতরে যাচ্ছি। এখুনি আসব আবার। বসুন আপনি—" উদয়-প্রতাপের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে মহারাণী দ্রুতপদে চলে গেল ছাত-বাগানে। গিয়ে দেখল রঙ্গাবতী নেই সেখানে। ফৌজ চ'লে যাবার পর সে-ও লুকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে, কেউ টের পায়নি। হেঁটেই চলে গিয়েছিল সে বাগানবাড়িতে, সেখান থেকে একটা পালকি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল কিশোরীমোহনের বাড়ির উদ্দেশে, তাঁকে সুখবরটা দেবার জন্য। রঙ্গাবতীকে দেখতে না পেয়ে মহারাণী বিস্মিত হ'ল, কিন্তু তখন আর খোঁজাখুঁজি করবার সময় ছিল না। আবার ফিরে এল সে।

বলল, "আপনারা পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করব কি?"

"তার আগে আপনার উত্তর চাই, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল কিনা।"

"আমি আপনাকে আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি। আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এ-ও আমি জানি শক্তিমানের প্রবল জেদ প্রবল জল-প্রপাতের মতো। তার সামনে দুর্বলের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সামান্য খড়-কুটোর মতো ভেসে যায়।"

অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন উদয়প্রতাপ।

"শক্তিমান সমুদ্রবিলাসের প্রবল জেদের সামনে যেমন একদিন ভেসে গিয়েছিলেন বিশ্বদেব শর্মা, যারা গিয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলে সূর্যদেব—"

"বিশ্বদেব, সূর্যদেব কে?"

"ইতিহাসটা শুনুন তাহলে। বহুকাল আগে আপনার বাবার জমিদারিতে নিমগাঁয়ে বিশ্বদেব শর্মা নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। আপনার তখন জন্ম হয়নি বোধহয়। বিশ্বদেব স্বদেশ-হিতৈষী লোক ছিলেন তাই সিপাহীদের বিদ্রোহ সমর্থন করতেন তিনি। কিন্তু আপনার বাবা সমুদ্রবিলাসের মতি-গতি ছিল ঠিক উলটো। তিনি ছিলেন গভর্নমেণ্টের খয়ের খাঁ। তিনি হুকুম জারি করলেন আমার কোনও প্রজা যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে তাকে। বিশ্বদেব স্বাধীন-চেতা লোক ছিলেন, সে হুকুম অগ্রাহ্য করলেন। কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহীকে আশ্রয় দিলেন তিনি নিজের বাড়িতে। ফল কি হ'ল জানেন? সমুদ্রবিলাস তাড়িয়ে দিলেন তাঁকে নিজের জমিদারি থেকে। আপনাদের ওই ম্যানেজার—যাঁর মুণ্ডটা আমি কেটে এনেছি—নিজে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন তাঁর বাড়িতে। শুধু তাই নয় পুলিশ লেলিয়ে দিলেন তাঁর পিছনে। ফৌজের গুলিতে তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলে ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল তাঁর চোখের সামনে। নিজেদের কাজ হাসিল করবার জন্যে সাহেবরা স্ত্রীলোকদের উপরও গুলি চালাতে ইতস্তত করে না। ছোট ছেলে শঙ্করদেবকে নিয়ে বিশ্বদেব ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশ থেকে দেশান্তরে ছন্নছাড়া ভিখারীর মতো। যেখানেই যান পুলিশ তাড়া করে। অবশেষে বিন্ধ্যাচলের এক সরাইখানায় শোচনীয় মৃত্যু হ'ল তাঁর। ভিখারীর মতো মারা গেলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুশয্যায় আপনার কাকা পর্বতবিলাস উপস্থিত ছিলেন, তিনি সব জানতেন। বিশ্বদেব মারা গেলেন, কিন্তু বেঁচে রইল তাঁর ছোট ছেলে শঙ্করদেব —"

উদয়প্রতাপ চুপ করলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মহারাণী বলল, "আমার বাবা সত্যিই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি তাঁর এ আচরণ সমর্থন করেন না। অথচ আপনিও তো ঠিক তাই করতে যাচ্ছেন, এতে আশ্চর্য লাগছে একটু। ও ঘটনার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?"

"সম্পর্ক আছে বইকি। আমিই বিশ্বদেবের সেই ছোট ছেলে শঙ্করদেব। উদয়প্রতাপ আমার ছদ্ম নাম।"

"বলেন কি!"

হঠাৎ বাড়ির ছাতটা মাথায় ভেঙে পড়লেও এত চমকে উঠত না মহারাণী। উদয়প্রতাপ বলতে লাগলেন, "বাবা মারা যাবার পর আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল এর প্রতিশোধ নেওয়া, যে জমিদারি থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই জমিদারির মালিক হওয়া, যে জমিদার তাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন তাঁর আদরিনী কন্যাকে আমার দাসী করা। এই লক্ষ্য স্থির রেখে আমি আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছি। অতি সতর্কভাবে আপনাদের প্রত্যেকটি খবর রেখেছি আমি। শক্তি সংগ্রহ করেছি। তারপর হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেখতে পেলাম আপনাকে একদিন। দেখে মুগ্ধ

হয়ে গেলাম। তারপর গেলাম আপনার কাকার কাছে। যদি ভদ্রভাবে বিয়েটা হয়ে যায়। আপনার কাকা আমাকে চিনতে পারেননি, আমিও নিজের আসল পরিচয় দিলাম না তাঁকে। উদয়প্রতাপের পরিচয়েই বিবাহের প্রস্তাব করলাম। তিনি রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু আপনি হলেন না। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লোক আমি নই। দেখলাম শক্তিই প্রয়োগ করতে হবে। আজ ঠিক ক'রে এসেছি, আপনাকে না নিয়ে আমি ফিরব না—"

"একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনার শক্তির উৎস কি ?"

"এখন আর বলতে আপত্তি নেই। আমি ডাকাতি করি। এতে আমার ধনবল জনবল দুইই হয়েছে। আর তা হয়েছে বলেই আজ আমি লক্ষ্যে পৌঁছেছি।"

মহারাণী চুপ ক'রে রইল।

উদয়প্রতাপ বলতে লাগলেন, "সেবার ভিক্ষা করতে এসেছিলাম, আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এবার দাবী নিয়ে এসেছি আশা করি এবার আপনি আর বিমুখ হবেন না। আমি চতুর্দোলা, পুরোহিত, বিয়ের সব আয়োজন নিয়ে এসেছি। ভোরের দিকে বিয়ের লগ্নও আছে একটা। আপনি রাজি হ'লে ভদ্রভাবে বিয়ে হয়ে যাবে। আপনি আলো আর নহবতের ব্যবস্থা করেছেন দেখে আশা হচ্ছে আপনার মত হয়তো বদলেছে। আপনাদের পুরোহিত মশায় যদি সম্প্রদান করেন তাহলে প্রচলিত প্রথাতেই বিয়ে হবে। আর আপনি যদি তাতে রাজি না হন বাধ্য হয়ে আসুর মত অবলম্বন করতে হবে আমাকে। এখন কি করবেন আপনিই ঠিক করুন।"

"আমার একটি অনুরোধ আছে কেবল।"

"বলুন, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব সে অনুরোধ।"

"আমাদের পূর্বপুরুষের স্থাপিত মা কালী জাগ্রত দেবতা। বিয়ের আগে তাঁর অনুমতি নিয়ে আসুন।"

"অনুমতি! পাথরের প্রতিমা অনুমতি দেবেন কি ক'রে ?"

"আপনি তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে মাটিতে মাথা রেখে মনে মনে তাঁর অনুমতি চাইবেন। মা যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁর হাতের জবাফুলটি আপনার মাথার উপর পড়বে।"

"বেশ, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ফুল যদি না পড়ে—"

"তাহলে বুঝতে হবে এ বিয়েতে মায়ের সম্মতি নেই। তা সত্ত্বেও আপনি যদি বিয়ে করতে চান, করবেন। ঠাকুর দেবতার উপর আপনার বিশ্বাস আছে আশা করি—"

"খুব আছে। আমরা ডাকাতি করি। কালীই তো আমাদের উপাস্য দেবতা। এসেই প্রথমে আপনার মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে এসেছি। তাহলে আর দেরি করবেন না, ব্যবস্থা করে ফেলুন, এখনি গিয়ে মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি—"

"আগে আপনার সঙ্গীদের খেয়ে নিতে বলুন। তারপর মন্দিরে ঢুকবেন।"

"আমি কিন্তু খাব না।"

"ওঁরা খেয়ে নিন।"

উদয়প্রতাপ হেসে বললেন, "বরযাত্রীরা আগে খেয়ে নিতে পারে, তাতে দোষ নেই। আচ্ছা, তাহলে সে-ই ব্যবস্থাই করুন। আমি বলে দিচ্ছি ওদের।"

উদয়প্রতাপ বেরিয়ে গেলেন।

জমিরুদ্দিন নহবতে বাগেশ্রী আলাপ করছিল।

উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা ভূরি ভোজনান্তে তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেউ পান চিবুচ্ছেন কেউ তামাক খাচ্ছেন। মদ গাঁজারও ব্যবস্থা ছিল, তা-ও সেবন করছেন অনেকে। উদয়প্রতাপও রয়েছেন তাদের মধ্যে। বিবাহ হবে না এ সন্দেহ আর কারও মনে নেই। বিনা রক্তপাতে যে এত বড় সম্পত্তিটা উদয়প্রতাপের করতলগত হ'ল এতেই সবাই বেশী খুশি।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন আর একজনকে বলছিলেন, "আর বউটা তো ফাও। সর্দারের ওরকম বউ প্রতি গ্রামে গ্রামে একটা দুটো ক'রে আছে। তা সবসুদ্ধ পঞ্চাশটা হবে। শুনেছি এর মধ্যেই শতখানেক কাচ্চাবাচ্চাও হয়েছে—"

শ্রীহর্ষ এসে প্রবেশ করলেন।

"এবার চলুন তাহলে, অনুমতিটা নিয়ে নিন। আমি সঙ্কল্প ক'রে মায়ের হাতে জবাফুল দিয়ে এসেছি।"

"চলুন।"

শ্রীহর্ষের পিছনে পিছনে উদয়প্রতাপ মন্দিরে গিয়ে ঢুকলেন। একটু ভয় হ'ল তাঁর, মন্দিরের ভিতর সূচীভেদ্য অন্ধকার।

"ভিতরে এত অন্ধকার কেন?"

"অন্ধকারেই অনুমতি নেওয়া নিয়ম। মা কালী যে অন্ধকারেরই দেবতা—"

উদয়প্রতাপকে মন্দিরে ঢুকিয়ে দিয়ে কপাটটি বন্ধ করে দিলেন শ্রীহর্ষ। তারপর দাঁড়িয়ে রইলেন বন্ধদ্বারের সামনে।

এর একটু পরেই আর্তনাদটা শোনা গেল। কিন্তু একবার মাত্র। শ্রীহর্ষ কপাট খুলে আলো জ্বেলে দিলেন। তারপরই চীৎকার ক'রে উঠলেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হয়েছে—"

উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে উঠল অনেকে। তারা সবিস্ময়ে দেখল কালীর প্রস্তর-প্রতিমা অন্তর্হিত হয়েছে, তার স্থানে দাঁড়িয়ে আছে জীবন্ত কালীমূর্তি, উত্থিত দক্ষিণ হস্তে রক্তাক্ত খড়্গ, উদয়প্রতাপের ছিন্নমুণ্ড বাম হাতে তুলে ধ'রে অট্টহাস্য করছে।

চমৎকার অভিনয় করেছিল কষ্টি।

শ্রীহর্ষ দুহাত তুলে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন, "আপনারা যদি বাঁচতে চান

পালান। মা আজ রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরেছেন, পালান, পালান আপনারা। এ স্থান ত্যাগ করুন অবিলম্বে—"

এর পরই সিংহের গর্জন শোনা গেল।

পরমুহূর্তেই সিংহবাহিনীর মন্দির থেকে মহারাজের পিঠে চ'ড়ে বেরুল মহারাণী, মাথায় মুকুট, হাতে বল্লম।

আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন শ্রীহর্ষ, "এ কি, মা জগদ্ধাত্রীও যে জীবন্ত হয়েছেন দেখছি, আজ আর কারো রক্ষা নেই, সবাই মরবে আজ।"

উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছিল অনেকে। তাদের দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চেয়ে আর একবার গর্জন ক'রে উঠল মহারাজ। তারপর একলম্ফে সিংহ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পালাতে লাগল উদয়প্রতাপের সঙ্গীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথিশালা খালি হয়ে গেল।

স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীহর্ষ।

কষ্টি আগেই পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গিয়েছিল। শ্রীহর্ষ পিছনের বারান্দা থেকে প্রস্তর প্রতিমাটিকে এনে আবার স্বস্থানে স্থাপন করলেন।

ছয়

শ্রীহর্ষ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন প্রায় ভোর, কিন্তু অন্ধকার তখনও কাটেনি। টোলের ছুটি ছিল, ছাত্রেরা বাড়ি চলে গিয়েছিল আগের দিনই। যে চাকরটার বাইরে শোবার কথা দেখলেন সে নেই। তার সাড়া পেলেন না।

"সর্বমঙ্গলা—"

একটা কাল-পেঁচা বিকট চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল।

"সর্বমঙ্গলা—"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শ্রীহর্ষের মনে হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। হঠাৎ নজরে পড়ল পালকিটা বাইরে পড়ে আছে, বেয়ারাগুলো নেই।

"সর্বমঙ্গলা—"

বারান্দায় উঠে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবেন এমন সময় কিসে যেন হোঁচট্ খেলেন। দরজার সামনে শুয়েছে কে? অন্ধকারে বুঝতে পারলেন না কিছু।

"কে এখানে শুয়ে—"

কোন সাড়া নেই। তখন ভয় হ'ল। নানাসাহেবের কিছু হয়নি তো! সর্বমঙ্গলা

কোথা! হাতড়ে দেশলাই খুঁজে আলো জ্বাললেন একটা। জ্বেলে যা দেখলেন তাতে চক্ষুস্থির হয়ে গেল তাঁর।

কপাটের সামনে সর্বমঙ্গলার রক্তাক্ত মৃতদেহটা প'ড়ে আছে।

পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল তার। প্রাণ থাকতে সে পুলিশকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশ ভিতরে ঢুকেছিল, কিন্তু নানাসাহেবকে ধরতে পারেনি তারা। পাতাল-ঘরটাই আবিষ্কার করতে পারেনি। নানাসাহেব যথাসময়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে নদীতীরের বটবৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

শ্রীহর্ষ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এতক্ষণ দেবতাকে নিয়ে যে মিথ্যা অভিনয় করলাম, হাতে হাতে তারই শাস্তি দিলেন ভগবান।

সাত

মহারাজ মহারাণীকে পিঠে নিয়ে ছুটতে লাগল।

মহারাণীর ইচ্ছে ছিল তাকে নিয়ে সোজা শ্রীহর্ষের বাড়ির দিকে চ'লে যাবেন। মহারাজ কিন্তু কিছুতেই সে রাস্তায় গেল না। স্বাধীনতা পেয়ে সে দুর্বার হয়ে উঠেছিল, বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগল। মহারাণীর হাত থেকে বল্লমটা পড়ে গেল, সেটা আর মহারাণী কুড়িয়ে নিতে পারল না, এত জোরে ছুটছিল মহারাজ। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল সে। মাঠে বেরিয়ে তার গতিবেগ এত বেড়ে গেল যে তার পিঠে বসে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল মহারাণীর পক্ষে। তবু সে বসে রইল। দুহাতে মহারাজের গলা ধ'রে তার কেশরে মুখ গুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে রইল তাকে। তার মনে হ'তে লাগল এখন মহারাজই তার জীবনের একমাত্র সম্বল, তাকে সে কিছুতেই ছাড়বে না। চোখ বুজে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল তাকে। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে লাগল মহারাজ। মহারাণীর মাথার মুকুটটাও খুলে পড়ে গেল। মহারাণীর খেয়াল নেই। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ ঢুকে পড়ল একটা অড়রের ক্ষেতে। তার ভিতরেও ছুটতে লাগল সে। মহারাণীর গা ছ'ড়ে গেল, কাপড় ছিঁড়ে গেল।

"থাম একটু—কি করছিস—"

মহারাজ কিন্তু থামল না। ছাড়া পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে। অড়র ক্ষেত পার হয়েই ছিল একটা নালা। মহারাজ একলাফে পার হয়ে গেল নালাটা, মহারাণী পড়ে গেল তার পিঠ থেকে। নালাতে জল খুব বেশী ছিল না, কাদাই ছিল বেশী। কাদায় জলে মাখামাখি হয়ে গেল মহারাণীর সর্বাঙ্গ। তবু নালা পেরিয়ে মহারাণী ওপারে গিয়ে উঠল, দেখল সামনের বিস্তৃত মাঠ ভেঙে মহারাজ ছুটছে।

"ফিরে আয়, মহারাজ, ফিরে আয় বলছি—"

মহারাজ কিন্তু ফিরল না, দেখতে দেখতে মাঠটা পার হয়ে গেল সে। মাঠের ওপারে একটা জঙ্গল ছিল, তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল মহারাণী, "মহারাজ, তুইও আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলি—"

কান্নার আবেগে তার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল।

মহারাজ কিন্তু তাকে ফেলে পালায়নি। ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে সে ছুটছিল, লাফাচ্ছিল, কিন্তু মহারাণীকে ফেলে পালাবার কথা মনেও হয়নি তার। বনের ভিতর ঢুকে মহারাণীর জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল, প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করতে লাগল মহারাণী আসবে, ছুটতে ছুটতে এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে তার পিঠে। অনেকক্ষণ আশা ক'রে বসে রইল সে, কিন্তু মহারাণী আর ফিরল না। বন থেকে তখন সন্তর্পণে বেরুল মহারাজ। মাঠে বেরিয়ে মহারাণী যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেই দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর ডাকল একবার। মহারাণী এল না। তবু ব'সে রইল সে।...একটু দূরে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুজন অশ্বারোহী সাহেব। তারা খরগোশ শিকার করতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ সিংহের সম্মুখীন হতে হবে ভাবেনি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। পরমুহূর্তেই গর্জন করে উঠল তাদের বন্দুক। রক্তাক্ত দেহে মহারাজ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

মহারাণীর সঙ্গে আর তার দেখা হ'ল না।

রাত্রির অন্ধকার নেমেছে চারদিকে।

সর্বমঙ্গলার শেষকৃত্য সমাপন ক'রে শ্রীহর্ষ একা বসে আছেন বারান্দায়। অবিশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনিতে স্পন্দিত হচ্ছে অন্ধকার। শ্রীহর্ষ ভাবছেন দ্রুত লয়ে কি অদ্ভুত ঘটনা-পরম্পরা ঘটে গেল একদিনের মধ্যে। সমস্ত জীবনটাই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আবার যেন সব নূতন করে আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আরম্ভ করা যাবে কি? মহারাণী বাল্যকাল থেকে তাঁর জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। সে-ও কোথা চলে গেল। বাকী জীবনটা একাই কাটাতে হবে? ছাত্র আর টোল নিয়ে? কত কথা মনে হচ্ছিল তাঁর।

মহেন্দ্রনাথও নেই। সকালে তাঁকে খবর দিতে গিয়েছিলেন। গিয়ে শুনলেন তিনি নিরুদ্দিষ্টা বেদানার খোঁজে বেরিয়েছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নেই। তাঁর ম্যানেজার এসে সব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এসে প্রথমেই পুলিশে খবর দিলেন। দারোগা এসে রিপোর্টে লিখলেন—"মহারাণী চৌধুরাণীর বাড়িতে কাল রাত্রে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতদের সঙ্গে মহারাণীর বরকন্দাজদের সংঘর্ষের ফলে ডাকাতের সর্দার উদয়প্রতাপ মারা গেছে। উদয়প্রতাপ সঙ্গে করে একটা পিতলের হাঁড়ি নিয়ে

এসেছিল। তার ভিতর ম্যানেজার কিশোরীমোহনের ছিন্ন মুণ্ড পাওয়া গেছে। কিশোরীমোহনকে আগেই খুন করেছিল তারা তার বাড়িতে গিয়ে, মুণ্ডটা নিয়ে এসেছিল সম্ভবত মহারাণীকে ভয় দেখাবার জন্য। কিশোরীমোহনের বাড়িতে তাঁর ধড়টা পাওয়া গেছে।" রিপোর্টে দারোগা সাহেব এ সন্দেহও প্রকাশ করলেন যে মহারাণীকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন সম্ভবত ডাকাতরাই তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে। তার খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠানো হয়েছে।

এদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছিল। শ্রীহর্ষের বাড়িতে নানাসাহেবকে না পেয়ে ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেন ভাবলেন কিশোরীমোহন লোকটি ধূর্ত এবং পাজি। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ ক'রে কিশোরীমোহন ইচ্ছে ক'রে পুলিশবাহিনীকে বিপথে চালিত করেছে এবং অন্যদিক দিয়ে হয়তো নানাসাহেবকে পালাতে সাহায্য করেছে। শ্রীহর্ষের বাড়ি থেকে তাই তাঁরা সোজা হানা দিয়েছিলেন কিশোরীমোহনের বাড়িতে। সেখানে কিশোরীমোহনকে তাঁরা পাননি। রঙ্গাবতীকে পেয়েছিলেন, তাকেই ধরে নিয়ে গেছেন। মুণ্ডহীন লাসের কাছে রঙ্গাবতীকে দেখে তাদের আরও সন্দেহ হয়েছিল যে মেয়েটি শয়তানী।

শ্রীহর্ষ ভাবছিলেন। মহারাণীর খোঁজে যারা বেরিয়েছে তাদের মধ্যে একজনও ফেরেনি এখনও।

হঠাৎ শ্রীহর্ষ চমকে উঠলেন।

উঠোনের অন্ধকারে আবছা-মূর্তি দেখা যাচ্ছে কার।

"কে ?"

আলোটা কমানো ছিল একধারে, সেটাকে বাড়িয়ে দিলেন।

"এ কি মহারাণী ! এ কি চেহারা তোমার—"

মহারাণীকে ভিখারীর মতো দেখাচ্ছিল।

"কোথা ছিলে সমস্ত দিন—"

মহারাণী কোন কথা না বলে এগিয়ে এল ধীরে ধীরে, তারপর শ্রীহর্ষের পায়ের উপর মাথা রেখে পা দুটো জড়িয়ে ধরল তার।

মানসপুর

উৎসর্গ

ডাক্তার পার্ব্বতীচরণ সেন, এম. বি.

বন্ধুবরেষু—

ভাই পার্ব্বতী,

তুমি সারাজীবন কুষ্ঠ রোগী-রোগিণীদের সেবা করেছ। এখনও করে যাচ্ছ। তাদের ব্যথা বেদনা হতাশা তোমার মনে নিরন্তর যে সাড়া জাগাচ্ছে তা দুর্লভ মহত্বের পরিচায়ক। তুমি আমার বহু কালের বন্ধু, তোমার বন্ধুত্ব-গর্ব্বে আমি গৌরবান্বিত। সেই গৌরব-বোধের সামান্য চিহ্নস্বরূপ এই কাহিনীটি তোমার নামে উৎসর্গ করে' কৃতার্থ হলাম। ইতি—

৪।৫।৬৫ তোমার বন্ধু

ভাগলপুর বলাই

একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিশ্বদীপ। সাধারণতঃ একা একাই তিনি ঘুরে বেড়ান। যদিও এখানে অপরিচিত কেউ নেই, কিন্তু অতি-পরিচয়ের সংকীর্ণ বেড়ার মধ্যেও ধরা দেয় না কেউ। মনে হয় সকলেরই সব কথা জানেন তিনি, অথচ এ-ও আবার মনে হয়, কিচ্ছুই জানা হয়নি। জানার আঙিনায় দাঁড়িয়ে অজানার আকাশকে অসীম ব'লে মনে হয়। কিন্তু ওই অসীমকে সীমার পরিধিতে টেনে আনবার চেষ্টাই তাঁর মনে মনে। মাঝে মাঝে ভাবেন সে চেষ্টা সফল হয়েছে বুঝি, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারেন থই পাওয়া যাচ্ছে না। মুরুব্বী তাঁর মস্ত বড় সহায় এখানে। তার সাহায্যে তাঁর জ্ঞানের পরিধি অদ্ভুতরকম বেড়ে গেছে। সমস্ত প্রকৃতির রহস্য অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে যেন খুলে যাচ্ছে। অনেক জিনিস জানতে পারছেন যা আগে জানতেন না। গাছপালা, আকাশ, মেঘ, এমন কি কীট-পতঙ্গও তাঁর মনের অনেক কাছে এসেছে। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে, তাদের কথা বুঝতে পারেন তিনি আজকাল। তাদের সঙ্গে গল্পও করেন মাঝে মাঝে। আগে এসব অসম্ভব ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু এখন সম্ভব হয়েছে। মনে হচ্ছে এখানে, এই মানসপুরে, সবই সম্ভব। আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেদিন। অপ্সরীদের দেখা পেয়েছেন একদিন বধূসরা নদীর জলে। পদ্মের মতো ভাসছিল তারা। বিশ্বদীপ বিস্ময় বোধ করছিলেন, নদীর জলে শ্বেতপদ্ম এল কোথা থেকে। অপূর্ব একটা হাওয়া বইছিল তখন, শিস দিচ্ছিল শ্যামা, নদীর বাঁকে ঘনিয়ে এসেছিল আশ্চর্য একটা নিরালা প্রহর। তাঁর মনের কুয়াশাটা, মনের বিস্ময়টা, হঠাৎ যেন কেটে গেল আরও উজ্জ্বল বিস্ময়ের আলোকপাতে। পাঁচটি শ্বেতপদ্ম হ'য়ে গেল পাঁচটি অপ্সরী—তুফানী, তুহিনা, তরলা, হাওয়া আর হিল্লোলা। তাঁকে দেখে তারা কিন্তু বিস্মিত হয়নি মোটেই। বলেছিল, তুমি তো বিশ্বদীপ। তোমাকে তো আমরা চিনি। তুমি আমাদের চিনতে পারছিলে না দেখে মজা লাগছিল। বিশ্বদীপ বলেছিলেন, আমি ভেবেছিলাম তোমরা বুঝি পদ্ম। এই শুনে তারা কলকণ্ঠে যে ভাবে হেসে উঠেছিল তাতে মনে হয়েছিল যেন বিহুলার চম্পক-অঙ্গুলিগুলি বুঝি পিয়ানোর ঘাটে ঘাটে লঘু ছন্দে নেচে গেল। বিহুলার, হাঁা বিহুলারই। অদ্ভুত ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে সে। আশ্চর্য, এখানে, এই মানসপুরে, বিহুলা হারিয়ে যায়। থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষলোকে নয়, পরোক্ষলোকের সীমা স্বর্গে। বিহুলা বিহুলাই থাকে, যে দেশে থাকে সে দেশে শ্বেতপদ্মরা অপ্সরী হ'য়ে যেতে পারে না। তুফানী, তুহিনা, তরলা, হাওয়া, হিল্লোলা পাঁচ জনে পাঁচ রকম। পাঁচ জনেই সুন্দরী, কিন্তু প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে। তুফানীকে দেখলেই মনে হয়, সত্যিই সে যেন একটা উদ্দাম ঝড়, কিন্তু ঝড়কে সে সংযত ক'রে রেখেছে তার সর্বাঙ্গে। তার চোখে বিদ্যুৎ, হাসিতে বিদ্যুৎ, তার কৃষ্ণকুন্তল মেঘমালা যেন। মনে হয় এই বুঝি তুফান উঠল, কিন্তু

ওঠে না। তুহিনার নামও সার্থক। তুহিনের মতোই সে। অসংখ্য অনুভূতির দৌরাত্ম্যকে সে জমিয়ে ফেলেছে যেন নিজের মধ্যে, রূপান্তরিত করেছে শীতল প্রসন্নতায়। মৃদু প্রসন্ন হাসি চিকমিক করছে চোখ দুটিতে। চূর্ণকুন্তলে সূক্ষ্ম কম্পন আছে কিন্তু প্রগল্‌ভতা নেই। তরলা কিন্তু তরলা নয়। মনে হয় কঠিনা নামটা বেশী মানাত ওকে।, চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছিল বিশ্বদীপের, অপরূপ অপ্রত্যাশিত একটা তীক্ষ্ণতা যেন ঝকমক করছে, পৃথিবীর সমস্ত স্থূলতাকে বিদীর্ণ ক'রে দিতে পারে যেন এক নিমেষে। তাকে দেখে একটা অবান্তর কথা মনে হয়েছিল বিশ্বদীপের। ও কি কেরানীর বউ হ'তে পারবে? তাঁর মনের কথা টের পেয়েছিল সে অদ্ভুতভাবে। বলেছিল, পারব। আমি সব পারি। আমার নাম তরলা ঠিকই দিয়েছ। যে-কোনও পাত্রের আকার ধারণ করতে পারি অনায়াসে। হাওয়া সত্যিই হাওয়া। ছটফটে, দুরন্ত, দুষ্ট, কোথাও যেন থামবে না। সর্বাঙ্গে তার চঞ্চলতা, মূর্তিমতী পলাতকা যেন। ওর চঞ্চলতা শুধু যেন চঞ্চলতাই। কোন ছন্দ নেই। হিল্লোলাও চঞ্চলা, কিন্তু সে ছন্দোময়ী। তার হাসিতে, ভঙ্গীতে এমন কি চোখের পলকেও ছন্দ আছে। সর্বদাই সে হেলছে, দুলছে লীলাভরে—একবারও ছন্দ পতন হচ্ছে না। মাঝে মাঝে হিল্লোলা স্থির হয়ে যায়, আর আশ্চর্য, তখনও মনে হয় সে যেন তালে তালে দুলছে, নিস্পন্দও যেন স্পন্দিত হচ্ছে। বিশ্বদীপই এদের নামকরণ করেছেন, ভেবেছেন ওদের বিশিষ্টতাই বুঝি রূপায়িত হয়েছে নামগুলোতে। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে, না পারি নি। ওদের নামকে ছাপিয়ে যা উপচে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে তা ভাষা দিয়ে ধরা যায় না। ওরা মাঝে মাঝে ধরা দেয় বটে, কিন্তু আসলে ওরা অধরা।

একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিশ্বদীপ। মনে মনে সঙ্গী খুঁজছিলেন। জানতেন খুঁজলে একজন-না-একজনকে পাওয়া যাবেই। মানসপুরে এইটেই সুবিধা। হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে হাজির হলেন। মানসপুরে সব আছে, নদী, পাহাড়, প্রান্তর, ঝরনা, আরও অনেক কিছু যা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু যা যে কোনও মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পাহাড়ের সারি অনেক দিন দেখতে পাননি তিনি। হঠাৎ একদিন দেখলেন সবুজ প্রান্তরের ওপারে স্তব্ধ ঘননীল মেঘের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের শ্রেণী। স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে আছে যেন তাঁর দিকে। কিছুদিন পরে ওই পাহাড় থেকেই নেমে এসেছিল তিন জন পাহাড়ী। একজন খুব বলিষ্ঠ, শালপ্রাংশু মহাভুজ ব্যক্তি, মুখময় কালো গোঁফ দাড়ি, চোখ দুটি বড় বড় লাল লাল। কথা খুব কম বলেন, মাঝে মাঝে নিচের ঠোঁটটা নাড়ান আর ঠোঁটের নিচের দাড়িগুলো নড়তে থাকে। মুরুব্বী বলেছিল, খুব সংযমী লোক উনি। বছরে একবার একটি গণ্ডার খান। সারা বছর আর কিছু খান না। কথাটা অবশ্য অবিশ্বাস্য। পরে জানা গেল মুরুব্বী রূপক করেছে। উনি প্রতি বছর নাকি বিরাট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন একটা। একটার বেশী পারেন না। মানসিক আহারের কথা বলেছিল মুরুব্বী, আত্মার আহারের কথা।

এঁরও নামকরণ করেছেন বিশ্বদীপ। সংস্কৃত-ঘেঁষা ভারী নাম—অসাধ্যসাধন শর্মা। একজনের নাম সংস্কৃত-ঘেঁষা হওয়াতে ওজন মিলিয়ে বাকী দুজনের নামও ওইরকম রাখতে হ'ল। শোনা গেল দ্বিতীয় পাহাড়ীটি নাকি সদাগর। নানারকম জিনিসপত্র নিয়ে বাণিজ্য করেন দেশবিদেশে। ওই পাহাড়ের ওপারে নাকি মহাসাগর আছে। সেই সাগরে পাড়ি দেন তিনি। ছিপছিপে ফরসা লোকটি। এঁরও দাড়ি আছে, নীল চোখ, অনেকটা যীশুখৃষ্টের মতো দেখতে। অথচ ইহুদী নয়। এ সত্ত্বেও বিশ্বদীপ ভেবেছিলেন এঁর নাম যীশু রাখবেন। কিন্তু সব দিক ভেবে ওজনদার নামই রাখতে হ'লে—শ্রীমন্ত-প্রতিম। তৃতীয় পাহাড়ীটি অদ্ভুত খেয়ালী গোছের। তিনি দ্বিতীয় পাহাড়ীর সঙ্গী, দুজনে সর্বদা একসঙ্গে থাকেন। যখন বিশ্বদীপ বললেন, উনি সদাগর, সাগরে পাড়ি দেন, তাই ওঁর নাম দিলাম শ্রীমন্ত-প্রতিম, তখন তৃতীয় পাহাড়ী তিনটি তুড়ি মেরে বললেন, খাসা নাম হয়েছে। খাসা, খাসা, খাসা। আলো ঝলমল ক'রে উঠল তাঁর কালো চোখের তারায়, ভুরুর চুলে দখিন হাওয়া শিহরণ তুলে নাচতে লাগল। তারপর একটু যেন প্রত্যাশাভরে বললেন, আমারও নাম ক'রে দিন একটা। আমার কিন্তু কোনও গুণ নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে আমার, জানেন? অনেক নদী আছে আমার মনের ভিতর। কুলকুল করছে দিনরাত। যখনই আপনার শ্রীমন্তর সঙ্গে সাগরে পাড়ি দিই অমনি একটা-না একটা নদী বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে। আর সেই সাগর-সঙ্গমে কি দেখতে পাই জানেন? কমলে কামিনী। আপনার শ্রীমন্ত দেখতে পায় না, ও খালি বাণিজ্যের কথা ভাবে। আমি পাই। আমার মনটাকে একটু একটু ক'রে সাগরে বিলীন ক'রে দিচ্ছি। এইটেই শুধু পারি। মনে হচ্ছে আমার সমস্ত সত্তাটা যেন মিশে যাবে শেষে সাগরের সঙ্গে। আমার কি নাম দেবেন? বিশ্বদীপ বললেন, সাগর-সঙ্গম থাক না। এই শুনে একটা পা তুলে বাউলের মতো নাচতে লাগল সে। আর বলতে লাগল, এটাই বা কি কম, রম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্। তার ডান হাতটাও উঠে গেল শূন্যে। বিশ্বদীপের মনে হয়েছিল একটা একতারাও যেন ধীরে ধীরে মূর্ত হচ্ছে অদৃশ্য-লোকের জাদুমন্ত্রে। অনেকক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে ছিলেন বিশ্বদীপ। তারপর জিগ্যেস করেছিলেন, আপনাদের নিজেদের কোনও নাম নেই? সাগর-সঙ্গম অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিল এ শুনে। তারপর বলেছিল, আমরা পাহাড়ের উপর থাকি যে, আকাশের কাছাকাছি, নামের আমাদের দরকার কি। আমরা পরস্পরকে ইশারায় ডাকি। তাতেই কাজ হয়। যখন হয় না, তখন বলি এই এই। বাস, ওই যথেষ্ট। তুমি যে নামগুলো দিলে ওগুলো তোমার কাজে লাগবে। মাঝে মাঝে আমরা আসব। আসব, আসব, আসব। সাগর-সঙ্গম এক কথা তিনবার বলে জোর দেবার জন্য। সত্যিই মাঝে মাঝে আসে তারা। তখন বিশ্বদীপ মানসপুরের আর এক রূপ দেখতে পান।

…নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। পাহাড়গুলোর দিকে চাইলেন। বড়

বেশী গম্ভীর, নির্বাক নিষেধের মতো। না, পাহাড়ীরা আজ কেউ আসবে না। নদীর তীরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে মনে মনে একজন সঙ্গী খুঁজতে লাগলেন। মানসপুরে এমন তো কখনও হয় না। আতিথেয়তায় সে চিরবদান্য। দেহের খিদে পেলে খাবার এসে যায়, মনের খিদে পেলে সঙ্গী।...

"নমস্কার—"

বিশ্বদীপ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একটি রূপসী নারী বধূসরা নদীর জলে আবক্ষ নিমগ্ন হ'য়ে রয়েছে। বিশ্বদীপের মনে হ'ল মূর্তিমতী পবিত্রতা যেন।

"নমস্কার। আপনাকে চিনতে পারছি না তো। এর আগে দেখেছি কি ?

"দেখেছেন। কিন্তু অন্য রূপে। আমি বধূসরা। অনেকক্ষণ থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম আপনি মনে মনে একজন সঙ্গী খুঁজছেন। আগেই আসতাম কিন্তু আকাশের মেঘ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল আমার জলে। তার সঙ্গেই কথা কইছিলাম।"

এতে বিশ্বদীপ অবাক হলেন না। তিনি জানেন মানসপুরে এ সবই স্বাভাবিক। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আকাশের সম্বন্ধে কথা নাকি।"

"না। আকাশের খবর পাই নক্ষত্রদের কাছ থেকে। ভরণী, রেবতী আর চিত্রার সঙ্গে খুব ভাব আমার। তারাই প্রায় আকাশের খবর বলে। মেঘ আজ একটা সুসংবাদ এনেছে। খুব চিন্তিত ছিলাম ক'দিন।"

ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হ'ল না বিশ্বদীপের কাছে।

বললেন, "ও, তাই নাকি। ব্যাপারটা কি ?"

বধূসরা হেসে বলল, "দেনা-পাওনার ব্যাপার। সূর্যদেব রোজ হু হু ক'রে আমার জল টেনে নিচ্ছেন। মেঘ হ'য়ে সে সব জল ঘুরে বেড়াচ্ছে ইন্দ্রদেবের এলাকায়। কিছু মেঘ যদি জল হ'য়ে ফিরে না আসে, তাহলে আমি বাঁচব কি ক'রে? তাই মনে মনে ইন্দ্রদেবকে আবেদন জানিয়েছিলাম একটা। ওই মেঘটি এসে আজ খবর দিয়ে গেল, ইন্দ্রদেব আমার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। আদেশ দিয়েছেন সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করলে বর্ষা নামবে। মেঘেরা জল হ'য়ে ফিরে আসবে আমার কাছে। ওই দেখুন, আপনার সঙ্গী এসে গেছে একজন। আমি এখন চলি তাহলে। মাছেদের একটা সভা আছে এখন। সেখানে যেতে হবে আমাকে।"

"কই সঙ্গী ?"

"ওই যে কলমীপাতার উপরে।"

বিশ্বদীপ দেখলেন কলমীপাতার উপর পোকা বসে আছে একটি। ছোট্ট কালো পোকা। মুরুব্বী আলাপ করিয়ে দিয়েছিল একদিন এর সঙ্গে। ওর ডানার উপর লাল লাল ফুটকি আছে ব'লে ওর নামকরণও করেছিল সে লাল-ফুটকি। লাল-ফুটকি হঠাৎ উড়ে এসে বসল তাঁর বুকের উপর। তারপর ভীতকণ্ঠে বলল, "তুমি এখান থেকে স'রে চল একটু। ওই পাখীটার হাবভাব ভালো লাগছে না। অনেকক্ষণ থেকে ওর চোখ

এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছি। দেখতে পেলেই টপ ক'রে খেয়ে ফেলবে আমাকে। আমি এতক্ষণ কলমীপাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিলাম ওর ভয়ে। তোমাকে দেখে সাহস ক'রে বেরিয়ে এলাম কলমীপাতার তলা থেকে। চল এখান থেকে যাই—"

বিশ্বদীপ দেখলেন একটা টুনটুনি পাখী উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। 'ওর সঙ্গেও আলাপ করতে হবে একদিন' ভাবলেন বিশ্বদীপ। "চল, চল, এখান থেকে চল"—পিঁ পিঁ পিঁ ক'রে বলতে লাগল লাল-ফুটকি। অনবরত বলতে লাগল, বিশ্বদীপের মনে হ'ল একটা ছোট্ট শানাই যেন পোঁ ধরেছে। লাল-ফুটকি ভারী ভীতু, ভয়টাই যেন ওর জীবনের মূলমন্ত্র, মনে হ'ল বিশ্বদীপের। সবারই তাই নয় কি? এ কথাও মনে হ'ল। উত্তরটাও পেয়ে গেলেন, সবার, মানে সব জানোয়ারদের। ইচ্ছে হ'ল টুনটুনির সঙ্গে আলাপ হ'লে লাল-ফুটকিদের কথা নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু মুরুব্বীর সাহায্য না পেলে তো টুনটুনির সঙ্গে আলাপই হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—রামু, টিটা, বিলুয়া, কয়লা, কানু, কুত্‌তা, কেশর আর ধাকড়ের কথা; মনে পড়ে গেল কেশিয়া, খুদরি, কাবা, সন্‌ঝা, শুকরি, শামা, শামার মা, বুলিয়া, খুদরির মা, চিকনি, চন্দা, মিশরী, মহুয়া আর বিবির কথা—তাঁর ফ্যাকটারির মজুর আর মজুরনী এরা। এরাও একদিন দাবি করেছিল আমাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সুবিচার চাই। সুবিচার? সুবিচারের অর্থ কি! মনে পড়ল নীট্‌শের কথা, শক্তির বিচারই সুবিচার। শক্তি তার রূপ বদলাতে পারে, আধার বদলাতে পারে, কিন্তু তার বিচারই সুবিচার, কোন্‌টা সু কোন্‌টা কু এ ঠিক করবার অধিকার একমাত্র শক্তিমানেরই আছে। ফ্যাকটারির কথা মনে পড়তেই সব যেন আবছা হ'য়ে গেল, মনে হ'ল মরীচিকার মতো মানসপুর মিলিয়ে যাচ্ছে।

"আমাকে নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল এখান থেকে—।" পিঁ পিঁ ক'রে অনবরত বলে চলেছে লাল-ফুটকি।

আবার মানসপুরে ফিরে এলেন বিশ্বদীপ। চলতে লাগলেন মাঠের দিকে। দিগন্ত-বিস্তৃত বিরাট মাঠ। সবুজ ফসলে ঢেউ তুলে তুলে ছুটোছুটি করছে পাগলা হাওয়া। মাঠের ওপারে কাজ করছে সিংহ। দুপুরের কাঠফাটা রোদে কোদাল কুপিয়ে চলেছে, ক্রমাগত কুপিয়ে চলেছে, রোদ প'ড়ে মাঝে মাঝে চকচক ক'রে উঠছে কোদালের শাণিত অংশটুকু। ক্রোধ, না দীপ্তি? অন্যমনস্কভাবে ঢুকে পড়লেন তিনি মাঠের মাঝখানে। একদল সবুজ ধানগাছ তাঁর হাঁটু ঘিরে দাঁড়াল যেন উৎসুক হ'য়ে। লাল-ফুটকির পিঁ পিঁ ডাকটা থেমে গেল হঠাৎ। সে পট্ ক'রে কখন যে বিশ্বদীপের বুক থেকে ধানক্ষেতের বুকে লাফিয়ে পড়েছে তা বুঝতে পারেননি বিশ্বদীপ। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, আর দেখতে পেলেন না। আত্মগোপন করেছে। দূরে সিংহ মাটি কোপাচ্ছে। তার দিকেই অগ্রসর হলেন বিশ্বদীপ। অদ্ভুত লোক এই সিংহ। ওর আসল নাম কেউ জানে না, ওর মুখটা সিংহের মতো ব'লে সবাই ওকে সিংহ ব'লে ডাকে। কুষ্ঠ হয়েছে ওর। সমাজে কোথাও সম্মানের আসন পায়নি। বউ ছেলে মেয়ে

আত্মীয়স্বজনরা ওকে ত্যাগ করেছে, না, ওই তাদের ত্যাগ ক'রে চলে এসেছে তা জানেন না বিশ্বদীপ। জানবার উপায় নেই, কারণ সিংহ এ বিষয়ে নীরব থাকতেই ভালোবাসে, নিজের কথা কারো কাছে বলতে চায় না। রুদলবাবু ওকে আশ্রয় দিয়েছেন, রুদলবাবু বলেন সিংহ তার জীবনে একটা পরম প্রাপ্তি। রুদলবাবুর ভালো নাম রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ। লোকে আদর ক'রে তাঁকে রুদলবাবু ব'লে ডাকে। বিহারী ব্রাহ্মণ। মানসপুরের লোক। মানসপুরে তাঁর অনেক জমি, বাগানও আছে একটা প্রকাণ্ড বড়। যদিও বিহারী কিন্তু বাংলা বলেন চমৎকার। বিশ্বদীপের সঙ্গে খুব ভাব। প্রায়ই বলেন, 'আমার ঘর আপনার ঘর, আমার জমি আপনার জমি, আমার বাগান আপনার বাগান। যখন খুশি আসবেন, যত দিন খুশি থাকবেন।' বিশ্বদীপ অনুভব করেছেন তাঁর এ উক্তির মধ্যে লোক-দেখানো ভণ্ডামি বা লৌকিকতা নেই। রুদলবাবুর মুখেই তিনি সিংহের আগমন-বার্তা শুনেছিলেন। একবার প্রচণ্ড বর্ষা হ'য়ে তাঁর গোলাপবাগান ডুবে গিয়েছিল। আশঙ্কা করছিলেন অবিলম্বে জল বার ক'রে দিতে না পারলে গোলাপগাছগুলো ম'রে যাবে। চাকরও কেউ আসেনি সেদিন। মানসপুরে কেউ কারও চাকর নয়। খুশিমতো আসে, খুশিমতো কাজ করে। প্রকৃতির ইঙ্গিত-ইশারা মেনে চলে তারা। তারা মনে করে প্রবল বর্ষায় প্রকৃতিই চায় না যে তারা কাজ করুক। প্রচণ্ড রোদে বা ভীষণ ঝড়েও এই ইঙ্গিত পায় তারা। যেদিন চারদিকে ফুল ফোটে সেদিনও। তবু কাজ হ'য়ে যায়, কিছু বাকি প'ড়ে থাকে না। সেদিন কিন্তু রুদলবাবু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল গোলাপগাছগুলো বাঁচবে না। নিজেই কোদাল হাতে ক'রে বেরুবেন ভাবছিলেন এমন সময় দেখলেন কে একজন কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বাগান থেকে জল বার ক'রে দিচ্ছে। অবাক হ'য়ে গেলেন রুদলবাবু। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন সিংহ একমনে কোদাল কুপিয়ে যাচ্ছে।

"কে তুমি?"

সিংহ কিছু না ব'লে একবার শুধু মুখ তুলে চাইল তাঁর দিকে। শুধু চাইল, আর কিছু বলল না। কিন্তু তার থেকেই রুদলবাবু ওর সব কথা বুঝে গেলেন। বুঝে গেলেন মানবসভ্যতার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ভণ্ডামি, সমস্ত স্বার্থপরতার মূর্ত প্রতীক ওই সিংহবদন লোকটা। বুঝে গেলেন বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য হেরে গেছেন, জিতেছে শুধু বারো-আনা পশু সেই মানুষের দল যারা তাদের চার আনা মহত্ত্ব নিয়ে আস্ফালন করে শুধু, আর কিছু করে না, করতে পারে না, করতে চায় না। সিংহের মতো লোক তাদের সঙ্গে থাকতে পারেনি। তথাকথিত সভ্য মানুষদের ঘৃণা, লজ্জা, অনুকম্পা, ভয় বার ক'রে দিয়েছে তাকে সমাজ থেকে। তার দলে আছে কালো কুৎসিত দরিদ্র মেয়েরা যাদের বিয়ে হয়নি, আছে সেই সব হতভাগ্য অসমর্থ যুবকেরা যারা মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারেনি বলেই রোজগার করতে পারে না, যারা মনুষ্যত্বের উপাসক বলেই বর্তমান সভ্যতার পঙ্‌ক্তি-ভোজনে স্থান পায়নি—এরা সবাই কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত। কারো কুষ্ঠ গায়ে

ফুটে বেরিয়েছে, কারো মনে, কারো জীবনে। এর জন্ত ওরা কেউ দায়ী নয়, অথচ সবাই দায়ী করেছে ওদের। ওরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, লুকিয়ে লুকিয়ে। রুদ্দলবাবু সিংহের সেই নীরব চাহনি থেকেই সব বুঝে গেলেন। বিশ্বদীপকে তিনি বলেছিলেন, "ওর ওই একটি চাহনি থেকেই সব বুঝে গেলাম আমি। কিন্তু একটা জিনিস তখন বুঝতে পারিনি। তখন বুঝতে পারিনি যে কুষ্ঠ কেবল ওর দেহেই নিবদ্ধ, আশ্চর্যরকম সুস্থ ওর মন, আশ্চর্যরকম সুন্দর ওর চরিত্র। যা কয়লার খনি ব'লে মনে হয়েছিল তার মধ্যে যে কয়লা নেই হীরে আছে, এটা আবিষ্কার করতে একটু সময় লেগেছিল।" সেদিন—আলাপের সেই প্রথম দিন—অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রুদ্দলবাবু। কি যে বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। কয়েক মিনিট কাটবার পর আর একটা প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে। মনে হ'ল এটা জিগ্যেস করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"কোদালটা কোথায় পেলে?"

"আমারই কোদাল", সিংহ উত্তর দিয়েছিল একটু হেসে। তারপর বলেছিল, "আমার সমস্ত সংসার আমি কাঁধে ক'রে নিয়ে বেড়াই। ওই যে—"

রুদ্দলবাবু দেখলেন যে অশ্বত্থগাছটায় দোলনা টাঙানো আছে তারই তলায় সিংহের জিনিসপত্র রয়েছে। প্রকাণ্ড দুটো ঝোলা, আর লম্বা একটা লাঠি। লাঠির দুধারে ঝোলা দুটো ঝুলিয়ে সিংহ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। লাঠিটা বাঁকের মতো ব্যবহার করে। সিংহ এক জায়গায় থাকতে চায় না। মানসপুরে অনেক দিন আছে। কিন্তু এক জায়গায় থাকে না। কখনও এ গাছতলায়, কখনও ও গাছতলায়, কখনও নদীর ধারে, কখনও ঝোপের পাশে। সিংহ বলল—এক জায়গায় একদিনের বেশী থাকলে মায়া ব'সে যায়। আর তাহলেই কষ্ট। অনেকদিন পরে রুদ্দলবাবু সিংহের মুখে এই উক্তিটি শুনেছিলেন।

সেদিন—আলাপের সেই প্রথম দিনে—সিংহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আর একটি উক্তিও করেছিল। বলেছিল, "গোলাপগাছগুলো জলে ডুবে যাচ্ছে দেখে কষ্ট হ'ল, তাই জলটা বার ক'রে দিচ্ছি। আমার ছোঁয়া লেগে আপনার বাগানটার কুষ্ঠ হবে এ ভয় আশা করি আপনার নেই।"

রুদ্দলবাবু ভালো লোক, তাই নির্ভীক। সিংহের মুখে একথা শুনে মনে মনে একটু অপমানিত বোধ করলেন। বললেন, "আমার ভয়ের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। মানুষরাই তো কুষ্ঠরোগীদের ভয় পায়। আর তো কেউ পায় না। আমি যে সব গাছতলায় বসেছি, তারা ছায়া দিয়েছে, ফলও দিয়েছে, ভয় পায়নি, ঘৃণাও করে নি। যে মাটিতে বসেছি সে কখনও বলেনি স'রে বস। যাদের তোমরা পশু বল তারাও আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে বরাবর। একটা মহিষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই হ'য়ে গিয়েছিল। এ সব বিশ্বাস হ'চ্ছে না বোধ হয় আপনার—"

রুদ্দলবাবু এ ধরনের কথা শুনবেন প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু শুনেই বুঝলেন তাঁর

কল্পনা সীমাবদ্ধ, এতো সীমাবদ্ধ যে তাতে অপ্রত্যাশিতের স্থান আছে এখনও। চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন। একটু ইতস্তত ক'রে শেষে বলেছিলেন, "মানসপুরে তুমি থাক। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু হলাম।"

সেই থেকে সিংহ মানসপুরে আছে। কিন্তু থেকেও সে থাকে না অনেক সময়, খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে। আজ এ গাছতলায়, কাল ও গাছতলায়। বিরাট মানসপুরে গাছও অনেক। প্রায়ই দেখা যায় সিংহ একটা গাছতলা থেকে আর একটা গাছতলায় যাচ্ছে কাঁধে তার সংসার ব'য়ে। দারুণ দুপুরে ধূ-ধূ মাঠের ভিতর দিয়ে একা চলেছে, গায়ে মোটা আলখাল্লা। নানা রংয়ের তালি দেওয়া অদ্ভুত আলখাল্লাটা। সিংহ যখনই কোন ন্যাকড়া রাস্তায় কুড়িয়ে পায় তখনই সেটা সেলাই ক'রে নেয় তার আলখাল্লার উপর। তাই বেখাপ্পারকম জোড়াতালি-লাগানো চেহারা ওটার। যখনই স্থান পরিবর্তন করে তখনই গায়ে দেয় ওটাকে। অন্য সময় খালি গায়ে থাকে সে। শীতের সময়ও। এ বিষয়ে বিশ্বদীপের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল তার একদিন। বিশ্বদীপ জানতে চেয়েছিলেন শীতকালেও সে তার জামা গায়ে দেয় না কেন। এ কথা শুনে সিংহবদনে যে হাসি ফুটে উঠেছিল তা শুধু বীভৎস নয়, তা ভয়ংকরও। বিশ্বদীপের মনে হয়েছিল একটা ভয়ংকর আর্তনাদ যেন হাসিতে রূপান্তরিত হ'তে চাইছে। খানিকক্ষণ বিশ্বদীপের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বলেছিল, "শীতকালে স্বয়ং ভগবান সোনালী শাল পাঠিয়ে দেন। সেইটে গায়ে দিয়ে ব সে থাকি। জামা গায়ে দিয়ে অসুখ ঢাকবার চেষ্টা আর করি না। সে চেষ্টা সফল হয় না। জামাটা পরি খালি 'জার্নি'র সময়, আমি যে মানুষ ছিলাম এই কথাটা ভুলতে পারি না। তাই জামা গায়ে দিই।"

'জার্নি' কথাটা খুব ভালো লেগেছিল বিশ্বদীপের। একটা গাছের তলা থেকে আর একটা গাছের তলায় যাওয়াটা সিংহের কাছে 'জার্নি'। কিছু কিছু ইংরেজীও জানে তাহলে সিংহ!

"কেবল ওই জন্যেই জামা গায়ে দাও?"

"মানুষ ছাড়া আর কে জামা গায়ে দেয় বলুন। মানুষই কেবল খোদার উপর খোদকারি করেছে। পশুপাখী গাছপালা সবাই ভগবানের দেওয়া পোশাক পরে থাকে। মাঝে মাঝে ভগবানই তাদের পোশাকের খোলস ছাড়িয়ে দেন। কিন্তু মানুষের কাছে ভগবান হার মেনেছেন। ক'টা খোলস ছাড়াবেন, মানুষের যে অসংখ্য খোলস। নিজেরাই খোলস তৈরি করছে আর পরছে—"

সিংহ যখন কথা বলে তখন অনেক কথা বলে। আবার যখন বলে না, তখন একেবারেই বলে না।

বিশ্বদীপ যখন দেখতে পান সিংহ মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছে এক গাছতলা থেকে আর এক গাছতলায়—তখন আর একটা কথা মনে হয় তাঁর। ও কি নিজের কাছ থেকে পালাচ্ছে? সত্যি কি পালানো যায়?

আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে সিংহ। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বধ্সরা নদীর জলে গা ডুবিয়ে ব'সে থাকে সে। বলে, "ভগবানের যখন ইচ্ছে আমাকে ভিজিয়ে দেবেন তখন ভালো করেই ভেজা যাক।"

তার জিনিসগুলো মাঠে প'ড়ে ভেজে। তারপরে মাঠে পড়ে পড়েই শুকিয়ে যায় আবার রোদ উঠলে। সিংহ নির্বিকার। রুদলবাবু সিংহকে খেতে দিতে চান, রোজ কিছু খাবার পাঠিয়ে দেন তাকে। কিন্তু সিংহ রোজ সে খাবার খায় না। সে যেদিন রুদলবাবুর কাজ করে সেই দিনই তাঁর দেওয়া খাবার খায়। স্বপাকে খেতে ভালোবাসে। ওর ওই ঝোলার মধ্যে বাসনপত্র, লোহার উনুন সব আছে। রুদলবাবু তাই ওকে কাঁচা সিধে দেন রোজ। এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই বিশ্বদীপ অগ্রসর হচ্ছিলেন সিংহের দিকে, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে।

"আমাদের মাড়িয়ে দিচ্ছেন যে। আলের উপর দিয়ে যান না।"

অনেকগুলো ধানগাছ কলরব ক'রে উঠল। বিশ্বদীপ আলের উপর উঠে পড়লেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু সিংহের কাছে পৌঁছতে পারলেন না তিনি। ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে ফোনটা বেজে উঠল। ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ক'রে ভাঙা লরিটাতে স্টার্ট দিতে লাগল আফজল খাঁ ড্রাইভার। তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠল—ও হো হো হো হো। তারপরই, রোক্কে, রোক্কে, রোক্কে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কলকাতা।

মানসপুর মিলিয়ে গেল।

দুই

নিখুঁত সাহেবী পোশাক প'রে বিশ্বদীপ তাঁর আপিস-ঘরে ব'সে ছিলেন ফোনের রিসিভারটা তুলে।

"হ্যাঁ, আমি বিশ্বদীপ কথা বলছি। ধাকড়ের সঙ্গে কথা বলেছিলে? ও, আচ্ছা, তুমি চ'লে এস এখানে। হ্যাঁ আমি আপিসেই থাকব। একটা ট্যাক্সি নিয়েই চ'লে এস এখানে।"

পাইপটা কামড়ে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ।

"আসতে পারি?"

"আসুন। ও আপনি! ছবি হ'ল?"

"এঁকে এনেছি, দেখুন আপনার পছন্দ হয় কি না।"

আর্টিস্ট নবনীবাবু তাঁর ব্যাগ থেকে ছবি বার করলেন একটি। স্নানরতা দুটি যুবতী মেয়ের ছবি। একজন উরুতে সাবান ঘষছে আর একজন বগলে। ভিজে কাপড়ের ভিতর দিয়ে তাদের যৌবনমহিমা প্রকটিত। আর তাদের চোখেমুখে যা প্রকাশ পাচ্ছে

তা লজ্জা নয়, আমন্ত্রণ। একধারে 'পরিষ্কার' সাবানের ছবিটাও রয়েছে। ছবিটা দেখে বিশ্বদীপের ভদ্র মন একটু সংকুচিত হ'য়ে পড়ল, কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ী মন ভাবতে লাগল এ ছবি বাজারে ছাড়লে 'পরিষ্কার'-এর বিক্রি বাড়বে কি না। বিক্রি বাড়াবার জন্যেই ছবি। ঘোষাল নবনীকে পাঠিয়েছেন।

"এ ছবি লোকে নেবে তো—"

"লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস এ ছবি দিলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে।"

নবনী পকেট থেকে একটা ডগমগে রঙের রুমাল বার ক'রে ঘাড় মুছতে লাগলেন চোখ বুজে। কালো মুশকো লোকটা। বেশ তাগড়া জোয়ান। মোটেই পেলবমার্কা নয়। ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষালের বিশেষ বন্ধু। বিশ্বদীপ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। ঘোষাল আমার অসুখের কথা বলেছে কি ওকে? না বলাই তো উচিত। তবু নবনীকে অসন্তুষ্ট করবার সাহস হ'ল না তাঁর। দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। নবনী ঘাড়ই মুছতে লাগলেন।

"আপনার ছবিটা আমি কিনব"—একটু ইতস্তত: ক'রে বললেন শেষে তিনি—"কিন্তু আর একটা ছবিও এঁকে দিন আমাকে। 'পরিষ্কার' সাবানের একটা বড় ছবি নানারকম ফুলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে!"

নবনীবাবু ঘাড় মোছা শেষ ক'রে বললেন, "দেব। পরশু দিয়ে যাব।"

নবনীর মুখটা যেন কাঠের মুখ। ভাবলেশহীন। তিনি যখন চাইলেন বিশ্বদীপের দিকে, বিশ্বদীপ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আবার অনুভব করলেন ওঁর মনের কোনও আভাস ওঁর মুখে পাওয়া যাবে না। কোনও অবান্তর বাড়তি কথাও উনি বলবেন না। এরকম কাষ্ঠ-মুখ লোকের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের অন্তরঙ্গতা কেন হয়েছে তা বিশ্বদীপের মাথায় আসে না। ডাক্তার ঘোষাল পরিহাস-প্রিয় প্রাণবন্ত লোক, সারাজীবন যেন একঘেয়েমির দেওয়ালকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে চলেছেন। প্র্যাকটিসটাকেও যথাসম্ভব সরস ক'রে নেবার চেষ্টা করেন, তা-ও যখন বিরস হ'য়ে আসে তখন দৌড় মারেন বিদেশে। কেবল গঙ্গোত্রী কেদারবদরী নয়, নায়গ্রা, গোবি, নাগাসাকিতে গেছেন। শেখভের Steppe প'ড়ে রাশিয়ায় যাবারও ইচ্ছে হয়েছে। এরকম লোকের সঙ্গে নবনীর অন্তরঙ্গতা হ'ল কি ক'রে। ওঁর নবনী নামই বা দিলে কে। অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবছিলেন বিশ্বদীপ।

নবনী আর একবার রুমাল বার ক'রে ঘাড়টা মুছলেন। আর একবার চাইলেন বিশ্বদীপের দিকে। বিশ্বদীপের মনে হ'ল টাকার কথাটা পাড়তে পারছেন না বোধ হয়।

"টাকাটা কি দিয়ে দেব এখনি?"

"দিন।"

চেক বই বার করলেন বিশ্বদীপ। ভাবলেন কত দেবেন। নবনীকে সাহস ক'রে জিগ্যেস করতে পারলেন না। শেষে এক হাজার টাকার একটা 'চেক' লিখে একটু সসংকোচে এগিয়ে দিলেন সেটা। মনে হ'ল যেন 'ঘুষ' দিচ্ছেন। নবনী চেকটার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আমি ছবি পিছু একশ' টাকা নিই। এত টাকা দিচ্ছেন কেন ?"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল তাঁর ওই কাষ্ঠ-মুখেও যেন বিস্ময়ের আভাস ফুটেছে একটা। সন্দেহ হ'ল হাসছেন একটু একটু।

"কিছু টাকা আগাম দেওয়া থাক। অনেক ছবি আঁকতে হবে ভবিষ্যতে—"

"যখন আঁকব তখন দেবেন। এখন একশ' টাকাই দিন।"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল একটা দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তিনি যেন।…পাশের একটা গলি থেকে টং টং টং টং শব্দ উঠতে লাগলো। তীক্ষ্ণ করুণ কঠোর দুঃসহ একটা শব্দ। প্রতিবাদের সঙ্গে কান্না মিশে যেন মিনতি করছে নিষ্ঠুরতাকে। লোহার উপর হাতুড়ি চালাচ্ছে কে যেন। তার সঙ্গে মিশছে—ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং—লরিটাকে চালাবার চেষ্টা করছে আফজল খাঁ। একশ' টাকার চেকই একখানা লিখে দিলেন বিশ্বদীপ। এ চেকখানা হাতে করেও নবনী ইতস্তত করতে লাগলেন।

"আমার মনে হ'চ্ছে ছবিখানা আপনার পছন্দ হয়নি। তা যদি না হ'য়ে থাকে তাহলে—"

"ছবি আমার পছন্দ হয়েছে। তবে ওটা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হবে কি না সেটা ঠিক করবেন পাঠকজি, আমার ম্যানেজার। তিনিই এ সব করেন—"

"যে পাঠকজি ভালো জ্যোতিষী ?"

"হ্যাঁ। তিনি জ্যোতিষ চর্চাও করেন।"

এখবরটা পেয়ে বিশ্বদীপ আবার একবার আড়চোখে চাইলেন নবনীর মুখের দিকে। তাঁর আশা হ'ল নবনীকেও যদি জ্যোতিষের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় তাহলে নবনী হয়তো শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠবেন তাঁর। কিন্তু নবনীর মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। তা দেখে বিশ্বদীপ একটু হতাশও যেমন হলেন তেমনি আবার নিশ্চিন্তও হলেন যেন। ভাগ্যের রহস্য-নিকেতনে জ্যোতিষের সিঁধকাটি নিয়ে যাঁরা সত্য-রত্ন-সন্ধানে প্রবেশ করেন তাঁদের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা হয় বটে, কিন্তু এর একটা বিপদও আছে। নিজের জীবনের সব সত্য কথা সকলকে বলা চলে কি ? নবনী যদি তাঁর জীবনের নিগূঢ় খবরটি জেনে ফেলে তাহলে তিনি কি সুখী হবেন, না, শান্তি পাবেন ? এই জন্যে পাঠকজিকে তিনি জ্যোতিষচর্চায় উৎসাহিত করেননি নিজের বিষয়ে। জ্যোতিষের দৌলতেই অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। পাঠকজির জন্যেই অনেকে তাঁর কাছে এসেছে। শ্যামল সোম পাঠকজির কাছে হাত দেখাতেই এসেছিলেন

প্রথমে। তার পরে অন্যভাবে জড়িয়ে পড়লেন বিশ্বদীপের সঙ্গে, বিশ্বদীপ পরিচয় পেলেন তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার। রঙ্গমঞ্চ থেকে গ্রীনরুম, তারপর একেবারে অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। শুনলেন তাঁর কাব্য, মনে গেঁথে গেল এই লাইনটা—ব্যথার প্রদীপে তেল নেই আছে জমাট রুধির, শিখা নেই, আছে উগ্র তপ্ত শাণিত তীরের ফলা। অদ্ভুত কবি শ্যামল সোম। শ্যামল সোমের বন্ধু দুটিও অদ্ভুত। একজন রুটি-ওলা অনন্ত রায় আর একজন বই-ওলা অনঙ্গ সেন। বিশ্বদীপ ভেবেছিলেন এইভাবে নবনীর সঙ্গেও হয়তো ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে যাবে। তাঁর মেলায় আর একটা লোক বাড়বে। আর একটু হয়তো অন্যমনস্ক ক'রে দেবে তাঁকে। অন্যমনস্কই থাকতে চান তিনি। নবনী জ্যোতিষের কথা জানতে চাইলে কেন? ওরও এ বিষয়ে জ্ঞান আছে নাকি! পরিচয় হলে হাত দেখতে চাইবে কি? বিশ্বদীপের কুষ্ঠি নেই। পাঠকজি বলেছিলেন হাত দেখে কুষ্ঠির ছক বানিয়ে দেবেন। পাঠকজিকে হাত দেখাননি তিনি। নবনীকেও দেখাবেন না যদি দেখতে চায়।

"না, দেখাব না—"

উচ্চকণ্ঠে কথা ক'টি বলেই লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন বিশ্বদীপ। তারপর বুঝলেন লজ্জার কারণ নেই। নবনী চ'লে গেছে। কখন চ'লে গেছে তা তিনি বুঝতে পারেননি।

টং টং টং টং টং—লোহার উপর আঘাত ক'রে চলেছে হাতুড়ি। ঘড়াং, ঘড়াং, ঘড়াং, আফজল না-ছোড়, লরিটাকে চালাবেই। তুমুল গর্জন ক'রে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল এরোপ্লেন। বড় রাস্তা থেকে ট্রাম গাড়ির শব্দটা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠল। নিচে রাস্তায় তারস্বরে চীৎকার করছে একদল ছেলে একটা ন্যাকড়ার ফুটবল নিয়ে। মনে হ'চ্ছে জীবন মরণ সমস্যায় মেতেছে যেন। তারপর চীৎকার ক'রে উঠল খবরের কাগজটা। চতুর্দিকে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, নারীধর্ষণ। নেতাদের বক্তৃতা। বক্তৃতার চতুর্দিকে ফেনা। ফেনা, ফেনা, ফেনা। ওছাড়া উপায়ই বা কি আছে আর? সাইপ্রাস, ভুটান, চীন, আফ্রিকা। খবরের কাগজটা যেন পাগল হ'য়ে উঠেছে! র‍্যাঁদা চালাচ্ছে বিক্ষত মর্মে!

"আসব?"

প্রথমে শুনতে পেলেন না বিশ্বদীপ। তিনি জানালা দিয়ে একটা নারকেলগাছের দিকে চেয়ে ছিলেন। কয়েকটা কচি ডাব ভয়ে আঁকড়ে আছে যেন গাছটাকে। সবুজ চিক্কণ পাতা দিয়ে রোদ পিছলে পড়ছে। যেন পালাতে চাচ্ছে। ভয়ে সিটিয়ে আছে গাছটা। গুণ্ডাপরিবৃত অসহায় যুবতীর মতো। চারদিকে বাড়ি, পাকা বাড়ি। নানা মাপের, নানা আকারের, নানা ছাঁদের। প্রত্যেকটি ভয়ংকর। ইট, সিমেন্ট, কংক্রিট, লোহা, মাটি নেই,...।

"আসতে পারি—"

"ও হ্যাঁ। ও, শ্রমিক-সামন্ত—"

"ট্যাক্সি পেতে দেরি হ'য়ে গেল।"

"এস বস। উঃ খুব ঘামছ যে। বাড়িয়ে দাও ফ্যানটা। তারপর কি হল—"

বিদুলার ভাই টোটো। বিদুলার যেমন টোটোরও তাই, মন-ভোলানো চেহারা। সস্তা কাঁচের চুড়ির মতো সর্বদাই একটা সস্তা জলুসে চকমক করছে। প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বিদুলার ভাই বলেই তাকে রাখতে হয়েছে ফ্যাকটারিতে লেবার-অফিসার ক'রে। বিশ্বদীপ নাম দিয়েছে শ্রমিক-সামন্ত।

"কি হল—"

মুখে একটা চিকমিকে হাসি ফুটিয়ে টোটো বললে, "কিচ্ছু হয়নি। ধাকড় বলছে ওদের দাবি মানতে হবে—"

"দাবিটা কি? দ্বিগুণ মাইনে ছাড়া আরও কিছু চাইছে?"

"চাইছে। বলছে আমাদের থাকবার ঘর চাই, পরবার কাপড় চাই। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। বলছে দ্বিগুণ মাইনে পেলে এই মাগ্‌গির বাজারে শাকভাত খেয়ে চলবে কোনরকমে। জিনিসপত্রের দাম যদি আরও বাড়ে মাইনে আরও বাড়াতে হবে। নমো নমো ক'রে যেটুকু ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স দেওয়া হয় তাতে কুলুবে না। তাছাড়া ওরা বলছে আজকাল চিকিৎসার খরচ এত বেশী হয়েছে যে অসুখে পড়লে মহা মুশকিল। এরও প্রতিকার চায় ওরা। সিলি!"

টোটোর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ স্মিতমুখে। বুঝলেন টোটো তাঁকে খুশী করবার জন্যেই এসব কথা ব'লে চলেছে।

"ধাকড়ের সঙ্গে আমিই তাহলে কথা বলি, কি বল?"

"যা বলবার আমি তো বলেছি। আমি যা বলেছি, আপনি তার বেশী কি আর বলবেন।"

"বেশী হয়তো কিছু বলতে পারব না। আমি আমার দিকটা দেখবার চেষ্টা করব কেবল।"

"তাতে কোনও লাভ হবে না। তাছাড়া আর একটা 'ফানি' ব্যাপার আছে ওদের। ওরা নিজেদের মধ্যে যে ইউনিয়ন করেছে তাতে পুরুষের চেয়ে মেয়ে বেশী। ধাকড় অবশ্য ওদের সর্দার। কিন্তু ধাকড়ের উপর সর্দারি করে শামার মা। আবার শামার মা শুনছি মহুয়ার কথায় উঠ-বোস করে।"

"সেই রঙীন কাপড়-পরা মেয়েটি?"

"হ্যাঁ। তার ভয়ানক ইনফ্লুয়েন্স। মেয়েটা কিছু লেখাপড়া জানে, মহা ফড়ফড় করে। আমি তো হকচকিয়ে যাই তার সামনে।"

বিশ্বদীপ নীরব হ'য়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আমি ওদের সকলের সঙ্গেই দেখা করব। তুমি ওদের ফ্যাকটারিতে থাকতে বল, আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

"আপনি যাবেন ? ফট্ ক'রে যদি কোন অপমান ক'রে বসে !"

হাসলেন বিশ্বদীপ।

"করলেই বা ! আমি মস্ত একটা মানী লোক এই বোধটা মনে সর্বদা উদ্যত ক'রে রাখলেই অপমানিত হবার ভয় থাকে। আমার সে ভয় নেই।"

"বেশ ! দিদি কিন্তু পছন্দ করবে না এটা, তা বলে দিলুম।"

টোটো যেন একটু রাগতভাবেই উঠে গেল।

আবার বেজে উঠল ফোনটা।

"হ্যালো, কে, বিদুলা ? আমার বাড়ি যেতে দেরি হবে একটু। হ্যাঁ। আটটার আগে ফিরতে পারব না। সে সময় আসতে পার। বাড়িতে কেউ থাকবে না। পিয়ানোর একটা গৎ শুনিয়ে যেতে পার। ও, তাই নাকি ! শ্যামল এসেছিলেন ? একটা কবিতা রেখে গেছে ? তাই নাকি ! নিয়ে এসো, দেখব। এখনি শোনাবে ? বেশ শোনাও।"

ফোনে বিদুলা পড়তে লাগল কবিতাটা। বিশ্বদীপের মনে হ'ল, কি অদ্ভুত মিষ্টি গলা বিদুলার। যেন একটা বাঁশী বাজছে দূর থেকে।

"...যা নাগালের মধ্যে নেই তাই যে সুন্দর এ কথা মানি না। কিন্তু যা সুন্দর তা নাগালের বাইরে থাকে চিরকাল। এই সত্যের সাগরে সাঁতার কাটছি। জানি ডুবে যাব, জানি স্বপ্নের ভেলা তলিয়ে যাবে, তবু উপেক্ষা করতে পারি না কুহকিনী সাইরেনের গানকে। পারি না, কারণ আমরা সুন্দরের উপাসক, আমরা জানি যা সুন্দর তা নাগালের বাইরে থাকবে বরাবর, আর এ-ও জানি তবু তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে ; এই চেষ্টা, এই উন্মুখতা, এই আগ্রহই সেই স্বপ্নের উৎস, যে স্বপ্ন আত্মার অমৃত, যে স্বপ্ন চেতনার আশ্রয়, যে স্বপ্ন দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দেয়, যে স্বপ্ন কণ্ঠস্বরকে রূপান্তরিত করে সংগীতে। জানি তুমি নাগালের বাইরে, তুমি চিরকাল থাকবে অনায়ত্ত স্বর্গের ইন্দ্রাণী, তবু আমি থামব না, কারণ আমি থামতে পারি না। ফুলের গন্ধ সুদূর আকাশে পৌছবে না সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য যে ফুল তবু থামবে না। প্রতিমুহূর্তে সে গন্ধের ঢেউ পাঠিয়ে দেবে নির্বিকার মহাকাশের দিকে, যতক্ষণ মৃত্যু না এসে থামিয়ে দেয় তাকে.."

কলকণ্ঠে হেসে উঠল বিদুলা।

"শুনলে ? কেমন লাগল ?"

"চমৎকার ! শ্যামল সত্যিকার কবি।"

"এ ছাড়া আর কিছু মনে হ'চ্ছে না তোমার ?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন বিশ্বদীপ। তাঁর মুখে যে ছায়া ঘনিয়ে এল ক্ষণকালের জন্য তার আভাস কিন্তু ফুটল না তাঁর উত্তরে।

বললেন, "পাথরের বুকে তরঙ্গিণী ঝাঁপিয়ে পড়লেও সাগর বিচলিত হয় না। কারণ সে জানে তরঙ্গিণী শেষ পর্যন্ত তার কাছে আসবেই !"

"ইস্"—

হঠাৎ ফোনটা কেটে দিলে বিতুলা।

বিতুলার কথাই ভাবতে লাগলেন বিশ্বদীপ। বিতুলার সঙ্গে প্রথম দিনের সেই পরিচয়ের কথাটা মনে পড়ল। চোরাবাজারের একটা দোকানে দেখা হয়েছিল। প্রকাণ্ড একটা জাপানী পরদার পটভূমিকায়। নীল আকাশ, অনেক বড় নীল আকাশ, আর সে আকাশকে অলংকৃত করেছে সূর্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র নয়, চেরীগাছের পুষ্পিত একটি পল্লব, অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে মৃত্তিকার মায়া কাটিয়ে লীলাভরে এবং একটু স্পর্ধা-ভরেই যেন প্রসারিত করেছে নিজেকে আকাশের বুকে। থমকে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ...। জাপানী শিল্পীর এই কল্পনার পটভূমিকায় বিতুলাকে প্রথম দেখেছিলেন তিনি। হালকা সবুজ রঙের একটি পাতলা শাড়ি পরেছিল বিতুলা, মাথায় ঘোমটা ছিল না, পিঠে দুলছিল বেণী, সবুজ মখমলের চটি ছিল পায়ে, চোখে যে ভাষা ছিল তা যেন কোনও বিশেষ যুগের নয়, বিশেষ ধরনের নয়, তা অপরূপ, তা বিস্ময়কর, কিন্তু তা ক্ষণিক আধুনিকতার চটুলতা নয়, তা যেন চিরন্তন। বিশ্বদীপের মনে হয়েছিল ওই ভাষা শকুন্তলার চোখে ছিল, দময়ন্তীর চোখে ছিল, শ্রীরাধার চোখে ছিল, ক্লিওপেট্রার চোখেও ছিল হয়তো। জাপানী পরদাটার পাশে বড় আয়না ছিল একটা। সেই আয়নায় প্রতি-ফলিত হয়েছিল বিশ্বদীপের চেহারাটা আর সেই চেহারার দিকে নির্নিমেষে চেয়েছিল বিতুলা, হ্যাঁ, আয়নায় প্রতিফলিত তার চেহারাটাই প্রথমে দেখেছিল সে, তার অধর স্ফুরিত হয়েছিল, বিদ্যুৎকণা বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার চোখের দৃষ্টি থেকে এবং তারপরেই সে এমন একটা অন্যমনস্কতার ভান করেছিল, (যেন দেখেও দেখছে না তাঁকে, বিশ্বদীপ যেন সেখানে নেই, তাঁর প্রবল অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করতে পারলে যেন সে বাঁচে)··· হঠাৎ বিশ্বদীপ অনুভব করেছিলেন বিতুলা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। রূপবান ব'লে খ্যাতি ছিল বিশ্বদীপের। অনেকেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হ'ত। বাল্যকাল থেকেই রূপের অজস্র প্রশংসা শুনেছেন তিনি। কিন্তু বিতুলার চোখে সেদিন যা দেখলেন তা কৃতার্থ ক'রে দিল তাঁর সমস্ত চেতনাকে, সমস্ত সত্তাকে। যে রূপ নিতান্তই বিধাতার দান, যার জন্যে তাঁর নিজের কোনও কৃতিত্ব নেই, যা নিতান্তই দুর্জ্ঞেয় রহস্য একটা, যেটাকে নিজে তিনি বিশেষ মূল্য দেননি কোনদিন, বিতুলার চোখে সেদিন সহসা সেই রূপের ভাষ্য যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। তিনি গর্ব অনুভব করলেন, নিজেকে দিগ্বিজয়ী বীর ব'লে মনে হ'ল। সেই আশ্চর্য অপূর্ব মনোহর জাপানী পরদার পটভূমিকায় আবার তিনি দেখলেন বিতুলাকে: মনে হ'ল সেই জাপানী শিল্পী যা আঁকতে পারেননি, আঁকতে সাহস করেননি, তাঁর সেই অনঙ্কিত কল্পনা যেন মূর্ত হ'ল বিশ্বদীপের বিস্মিত দৃষ্টির অভিনন্দনে অকস্মাৎ। বিশ্বদীপ অনুভব করলেন সে এসে গেছে। দু'দিন আগে তিনি দুটো বড় বড় ফুলদানী কিনে দোকানেই রেখে গিয়েছিলেন। সেই দুটো নেবার জন্যেই তিনি গিয়েছিলেন সেদিন।

দোকানী বিতুলার দিকে চেয়ে বলল, "এই যে উনিও এসে গেছেন। উনিই কিনে রেখে গিয়েছিলেন কাল ফুলদানী ছুটো।"

তারপর বিশ্বদীপের দিকে ফিরে সে বলল, "এই ভদ্রমহিলা ফুলদানী ছুটো নিতে চাইছিলেন, আমি বললাম, বিক্রি হয়ে গেছে।"

এই ব'লে সে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বিশ্বদীপের দিকে, যার অর্থ বুঝতে দেরি হ'ল না বিশ্বদীপের। অর্থাৎ দাঁও পেয়ে গেছেন, ছেড়ে দিন বেশী দামে।

বিশ্বদীপ তখন ফিরে সপ্রতিভ ভাবে যা বলেছিলেন তা কেন বলেছিলেন কি ভেবে বলেছিলেন এর উত্তর তিনি নিজেও জানেন না আজও। শুধু এইটুকু জানেন যা বলেছিলেন তাতে ভণ্ডামি ছিল না। বরং এই কথাই মনে হয়েছিল যে জীবনে সেই বোধ হয় প্রথম সত্য কথা সাহস ক'রে বলতে পারলেন। অপরিচিতাকে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন করার প্রয়োজনও অনুভব করেননি তিনি। বলেছিলেন, "ও তুমি! তোমার জন্যেই তো কিনেছি এ ছুটো। তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে, এখানে যে তোমার দেখা পেয়ে যাব তা ভাবিনি।"

দোকানদার অবাক হ'য়ে গিয়েছিল, আর বিতুলার চোখের দৃষ্টিতে যে ছদ্ম রোষ-বহ্নির দীপ্তি ফুটি ফুটি করেও ফুটতে পারছিল না, যা ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হ'য়ে যাচ্ছিল অকপট আনন্দের অনাবিল প্রকাশে, তার দিকে চেয়ে রোমাঞ্চিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বদীপ। আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন বিতুলা কোনও প্রতিবাদ করল না দেখে। দোকানদার বুঝতে পারেনি যে বিতুলাকে তিনি প্রথম দেখলেন। বিতুলা যা বলেছিল তাও অপ্রত্যাশিত, অথচ বিশ্বদীপের মনে হয়েছিল মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়—এইটাই তো প্রত্যাশা করছিলাম। বিতুলাও এক মুহূর্তে সমস্ত মিথ্যার মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে আসতে পারবে, এইটাই তো স্বাভাবিক।

বিতুলা বলেছিল, "তোমার জন্মেও একটা জিনিস রেখেছি আমি। কি ক'রে দেব তোমায় সেটা?"

"চল, তোমার কাছে যাচ্ছি এখনি।"

বিশ্বদীপ নিজের গাড়ি করেই সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন বিতুলাকে বিতুলার বাড়িতে। এই কলকাতা শহরে যে এমন একটি নির্জন গলি থাকতে পারে তা বিশ্বদীপের কল্পনাতীত ছিল। বাড়ির ঠিক পাশেই পুষ্পিত একটা কদমগাছ। কলকাতা শহরে এমন কদমগাছ আগে তাঁর চোখে পড়েনি। মনে হ'ল এ যেন প্রবাসী, বিতুলাকে দেখতে এসেছিল, দেখবার পর আর ফিরে যেতে পারেনি, রোমাঞ্চিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিতুলার বাড়ি, নিজের বাড়ি। সাতটি ঘর, সাতটি ঘরে সাত রকম রঙ। বাড়ির নাম ইন্দ্রধনু। বিতুলারই বাড়ি, বিতুলাই মালিক, বিতুলাই সব। বিতুলার বাবা সিঙ্গাপুরে ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি মারা যান, বিতুলা তখন বিলেতে পড়ছিল, মা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। বিতুলা যখন বিলেত

থেকে ফিরে এল তখন বাবার ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে। টোটোকে সে অনেক পরে নিয়ে এসেছিল সিঙ্গাপুর থেকে। টোটো তার ভাই বটে কিন্তু আপন ভাই নয়, বিদুলার বাবার একটি রক্ষিতা ছিল, তারই ছেলে টোটো। বিদুলাই মানুষ করেছে তাকে। এ সব খবর অনেক দিন ধ'রে একটু একটু ক'রে সংগ্রহ করেছিলেন বিশ্বদীপ। কিন্তু সেদিন, সেই প্রথম দিন, যে খবরটা, যে চমকপ্রদ আশ্চর্য খবরটা বিস্ময়ের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর সমস্ত সত্তাকে, সে খবরটা, বিদুলা এসে গেছে। কলকাতার মরুভূমিতে দেখা দিয়েছে মরূদ্যান আর সেখানে তাঁর জন্যে যে নারী অপেক্ষা করছে সে শুধু নারী নয়, সে সাকী।

গগনবিদারী ঘর্ঘর আওয়াজ হ'ল একটা। আফজল লরিটাকে স্টার্ট করেছে। লোহার উপর হাতুড়ির নিষ্ঠুর প্রহারটা থেমে গেছে। ছাতের উপর নূতন ধরনের আর একটা শব্দ শুরু হয়েছে। মসলা পিষছে বোধহয় কেউ।

"বিশ্বদীপবাবু আছেন?"

"আছি, আসুন।"

বেঁটে মোটা কালো কুচকুচে শশধর সরখেল প্রবেশ করলেন ঘর্মাক্ত কলেবরে। আপাদমস্তক খদ্দর ঢাকা এই মালটিকে বিশ্বদীপ অনেক দিন থেকে চেনেন। কংগ্রেস পার্টির লোক। নানা ছুতোয় চাঁদা নেন। চাঁদা না দিলে জীবন দুর্বহ ক'রে তোলেন। শশধরবাবুর চেষ্টাতেই অনেক সিমেণ্ট পেয়ে গেছেন তিনি ফ্যাকটারির জন্য। এলেই কিন্তু চাঁদা দিতে হয়। শশধরের দন্তগুলি সর্বদাই বিকশিত। হলদে রঙের এবড়োখেবড়ো দাঁত। ঢাকতে পারেন না, কিংবা চান না।

"আজ আবার কি—"

খাতাটা খুলে এগিয়ে দিলেন শশধর সেটা।

"এবার জাতীয় পতাকা উৎসব করব ভেবেছি। প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকা ছাপিয়ে প্রত্যেকটির ইতিহাসও লিখে দেব। আমাদের জাতীয় পতাকাটা অবশ্য প্রত্যেক পাতায় থাকবে। হাজার পনরো খরচ হবে। আপনার কাছে আপাতত শ'পাঁচেক চাই। পরে দরকার হ'লে আবার দিতে হবে কিন্তু। জানি, আপনি দেবেন।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সবাই দেয় না মশাই। ওই যে হাজরা, একটি পয়সা দেয়নি এখনও। খালি ঘোরাচ্ছে।"

বিশ্বদীপ বুঝলেন তর্ক করা বৃথা। দেরি করাও নিরর্থক। পাঁচশ' টাকার চেক লিখে দিলেন একটা। শশধর ঝুঁকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন। বিশ্বদীপ শুনেছেন ও একটা বাড়ি তুলছে নিউ আলিপুরে। অথচ কিছুই তো করে না। এত টাকা পাচ্ছে কোথা! জোর ক'রে চিন্তাটাকে ঠেলে দিলেন মন থেকে। ভয় হ'ল বেশী ভাবলে

আলকাতরার টিনটা উলটে পড়বে এখুনি। মাখামাখি হ'য়ে যাবে সব। ত্রিবর্ণ পতাকার সব রং ঢাকা প'ড়ে যাবে।

আফজল খাঁ এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

"অমলবাবু বললেন গাড়িটা সারাতে আড়াইশ' টাকা আন্দাজ লাগবে। গ্যারেজে নিয়ে যাচ্ছি ওটা। অনেক কষ্টে স্টার্ট করেছি। কিছু পেট্রোল আর মোবিলও কিনতে হবে। কেশিয়ারবাবুকে পনরো টাকার স্লিপ দিয়ে দিন একটা।"

স্লিপ দিয়ে দিলেন বিশ্বদীপ। আফজল খাঁ সেলাম ক'রে চ'লে গেল। ফোন বেজে উঠল আবার।

"ও, মুরারিবাবু! সাবানের স্টক ফুরিয়েছে? লরিটা খারাপ হয়েছে ব'লে পাঠাতে পারিনি! আপনি একটু পরে পাঠকজিকে ফোন করবেন—হ্যাঁ দুটো নাগাদ—রিক্শা ক'রে কিছু সাবান দিয়ে আসবে আপনার দোকানে। ভাল বিক্রি হচ্ছে? না, তা কি ক'রে হবে? চালমুগরা তেল থেকে তৈরী, খুব ভালো গন্ধ তো হবে না। হ্যাঁ, সব রকম চর্মরোগেই উপকার হবে। চালমুগরাতে কুষ্ঠও ভালো হয়। ও, আচ্ছা আমাদের আর্টিস্টকে বলব। কিন্তু তাতে আবার উলটো ফল হবে না তো। সাবান মেখে ওরকম ম্যাজিকাল এফেক্ট্ যদি না হয়, সম্ভবত হবে না, তাহলে ··আচ্ছা, আচ্ছা, ডাক্তার ঘোষালকে জিগ্যেস করি, তিনি যা বলবেন তাই করব। আচ্ছা, নমস্কার—"

মুরারিবাবু বলছিলেন দুটো ছবি আঁকাতে। একটা ছবি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকের, তার নিচে লেখা থাকবে 'পরিষ্কার সাবান ব্যবহারের পূর্বে'। দ্বিতীয় ছবিটি হবে একটি কমনীয়কান্তি যুবকের, তার নিচে লেখা থাকবে 'পরিষ্কার সাবান ব্যবহারের পরে'। মুরারি কুণ্ডু চতুর ব্যবসায়ী। তিনি বলছিলেন এই ছবি বাজারে ছাড়লে হু হু ক'রে সাবান বিক্রি হবে। প্রত্যেকে যদি একবার করেও পরীক্ষা ক'রে দেখে তাহলে অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সাবান বিক্রি হ'য়ে যাবেই। কিন্তু ··ওই কিন্তুই বিশ্বদীপের সর্বনাশ করেছে। ভুরু কুঁচকে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর অন্যমনস্কভাবে নিজের বাম উরুটায় চাপ দিয়ে দেখলেন একবার। না, বিশেষ উন্নতি তো হয়নি। গুম হ'য়ে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। মাথার শিরাটা দপদপ করতে লাগল। মনে হ'ল···ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে ফায়ার বিগ্রেড ছুটেছে। কোথায় আগুন লাগল কে জানে। নিজের কথা ভুলে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। আবার ফোন।

"ডাক্তার ঘোষাল? আশ্চর্য, আপনার কথা এখুনি ভাবছিলাম। সিমেন্ট? কত? দুশো বোরা! তা দিতে পারি বোধহয়। সম্প্রতি পেয়েছি কিছু, আমার ফ্যাক্টারির একটা ঘর হ'চ্ছে। আচ্ছা, আপনিই নিন! ও, আপনার বেকার-ভবনের জন্য দরকার বুঝি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব। আমার উরুতের সেই বোদা ভাবটা এখনও আছে কিন্তু। না, না, ব্যস্ত হচ্ছি না, ধৈর্য ধরেই থাকব, কিন্তু, মানে—আছে, সব কথা খুলে বলব আপনাকে একদিন, আচ্ছা, আচ্ছা —"

হাউমাউ ক'রে বারান্দায় কেঁদে উঠল কে যেন। তারপর দড়াম ক'রে কপাটটা খুলে ঢুকে পড়ল ছকুলাল। আপিসের চাকর একটা। মুক্ত কচ্ছ!

"আমাকে শালা বীরেন মেরেছে হুজুর। আমার কাছা খুলে টাকা কেড়ে নিয়েছে—"

বীরেনও ছকুর পিছু পিছু এসেছিল। বীরেন আপিসের কেরানী। গ্রীষ্মকালে শুধু গায়ে ব'সে কাজ করে। আপিসে এসেই জামাটি খুলে ফেলে সে।

বীরেন বলল, "আমার পকেট থেকে রোজ একটি ক'রে টাকা চুরি যাচ্ছিল সার। আজ এই ব্যাটাকে হাতেনাতে ধরেছি। নোটটি আমার পকেট থেকে সরিয়ে নিজের কাছায় বেঁধে রেখেছিল। নোটে আমার ইনিশিয়াল করা আছে, দেখুন আপনি—"

ছকু ব্রাহ্মণ-সন্তান। তার মা বিশ্বদীপের বাড়িতে রাঁধুনী ছিল। কিছুদিন আগে মারা গেছে। বেকার ছকুকে তিনি আপিসের বেয়ারা ক'রে বাহাল করেছিলেন। সে যে শেষকালে···কি বলবেন ভেবে পেলেন না তিনি। শেষে বললেন, "তুমি বাড়ি যাও, এখানে কাজ করতে হবে না। আমার বাড়িতেই যেমন কাজ করছিলে তাই কর গিয়ে।"

ছকুলাল চোখ মুছতে মুছতে চ'লে গেল। একটু আড়ালে গিয়ে কিন্তু তার মুখে দুষ্ট হাসি ফুটল একটা। বীরেনকে সে কলা দেখিয়ে এবং ভেংচি কেটে বেরিয়ে গেল।

বীরেনের চোখ দিয়ে আগুন ছুটে বেরুল আবার।

"কাণ্ড দেখলেন ব্যাটার! আমাকে ভেংচি কেটে কলা দেখিয়ে চ'লে গেল।"

"তুমি তোমার টাকাটা পেয়েছো তো? আচ্ছা বল তো কেন ও টাকা চুরি করে! আমি তো ওর সব খরচ দিই।"

"সিনেমা দেখে। সিগারেট খায়। আমরা বিড়ির খরচ জোটাতে পারি না, ও কাঁইচি ফোঁকে!"

বীরেন গরগর করতে করতে চ'লে গেল।

তারপর এলেন হলধরবাবু একগাদা ফাইল বগলে ক'রে। সই করতে হবে। বিশ্বদীপ যন্ত্রচালিতবৎ সই ক'রে যেতে লাগলেন। সব খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। একটা চিঠিতে সই করতে যাচ্ছিলেন, হলধরবাবু বললেন, "চিঠিখানা আপনি পড়ে দেখুন একবার। পাঠকজি ডিক্‌টেট করেছিলেন ওটা। বলেছিলেন আপনাকে দেখিয়ে নিতে। বিশ্বদীপ পড়লেন চিঠিখানা। জনৈক বোম্বাই-ব্যবসায়ী তাঁর সাবানের ব্যবসায়ে অংশীদার হ'তে চান। এক লাখ টাকা দিয়ে বেশ মোটা রকম অংশ একটা কিনতে চান তিনি। পাঠকজি লিখেছেন যে মিস্টার শেরওয়ানী এ বিষয়ে সত্যিই যদি আগ্রহশীল হন তাহলে তাঁকে এখানে আসতে হবে। সামনাসামনি কথা হওয়াই ভালো। বিশ্বদীপ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু ভাবলেন, তারপর সই ক'রে দিলেন। নানা কাগজে অনেকক্ষণ ধ'রে ক্রমাগত সই করতে হ'ল।

টং টং টং টং আবার হাতুড়িটা পিটতে শুরু করেছে লোহাকে। তার সঙ্গে মিশছে একটা মোটর সাইকেলের দুর্দান্ত শব্দ···আবার কে যেন আসছে।

"আসতে পারি ?"

"আসুন। ও আদিত্যবাবু? কখন এলেন আপনি ?"

"নটা ছত্রিশে হাওড়ায় পৌচেছি। হাঁটতে হাঁটতে আসছি সেখান থেকে –"

"হাঁটতে হাঁটতে কেন ? ট্রামে বাসে খুব ভিড় জানি, ট্যাক্সি ক'রে এলেই পারতেন। ট্যাক্সিও পাওয়া গেল না ? রিক্শ—"

আদিত্যনারায়ণ এমন একটা মুখ ক'রে বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে রইলেন যা প্রায় অবর্ণনীয়। ভাবটা—তুমি যা বলবার ব'লে যাও, আমার কথাটি আমি শেষে বলব।

"রিক্শও পেলেন না ?"

"ট্রেনে আমার বাক্স মনি-ব্যাগ সব চুরি গেছে।"

"তাই নাকি। স্টেশন থেকে ফোন করলেই পারতেন গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম—"

"একটি পয়সা ছিল না কাছে। হরিশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছে দুটো টাকা চাইলাম। বললে, নেই। একটি বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে স'রে পড়ল। অথচ ওর কাছে আমাদের ছত্রিশ টাকা ন আনা খাজনা বাকী।"

চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপের দিকে, যেন বিশ্বদীপই হরিশ। আদিত্যনারায়ণ বর্তুলাকার খর্ব ব্যক্তি। বিশ্বদীপের দেশের বিষয়সম্পত্তির নায়েব। অর্থাৎ তিনিই সেখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। দুটো নদী পেরিয়ে এবং আট ক্রোশ গরুর গাড়িতে চ'ড়ে সেখানে পৌছতে হয়। বিশ্বদীপ প্রায়ই পারেন না। আদুবাবু যা করেন তাই হয়। আদুবাবু নাটক করতে ভালবাসেন। তিনি যখনই আসেন তখনই একটা নাটকীয় পরিস্থিতি সঙ্গে ক'রে আনেন এবং সে নাটক কখনও কমেডি বা প্রহসন বা লঘু কিছু হয় না, তা হয় ঘন-ঘোর ভয়ংকর ট্রাজিক ব্যাপার, মনে হয় এই বুঝি সব গেল, আর কোন কূলকিনারা নেই, হায়-হায়-হায়-কি-হবে-গোছ কাণ্ড, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদুবাবু অসাধারণ কৌশলে সামলে দেন সব। শ্রোতাকে স্বীকার করতেই হয় আদুবাবু না থাকলে রক্ষা ছিল না। আদুবাবু হিরো।

"আপনি এলেন কেন হঠাৎ ?"—বিশ্বদীপ প্রশ্ন করলেন।

চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইলেন আদুবাবু। ভাবটা যেন, আসবার আসল কারণটা খুলে বলব এতো বোকা পেয়েছেন নাকি আমাকে। একটা ধূর্ত চাপা হাসি চিকমিক করতে লাগল চোখের দৃষ্টিতে।

"শখ ক'রে আসিনি। আসতে হয়েছে। না এলে জেল হ'য়ে যেত। নতুন দারোগাটা বাঘা। একটু আধটু রুধিরে তৃপ্তি হয় না ওর। একটা গোটা মোষ চাই। তাকে ব'লে এসেছি মোষের খোঁজে চললুম, দু'দিনের মধ্যেই এনে দেব। তবে ছাড়া পেয়েছি—"

"হেঁয়ালি ভেঙে বলুন।"

আদিত্যনারায়ণের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটল একটা এবার।

"হাজার পাঁচেক টাকা চাই। আমাদের লাউপুরের জমিতে বানের সময় যে লোকগুলো এসে ঘর বেঁধেছিল, তারা খাজনাপত্তর কিছু দিচ্ছে না, উকিলবাবু বললেন ওদের উঠিয়ে না দিলে ওদের একটা দখ্‌লিস্বত্ব হ'য়ে যাবে জমিতে। এমন সময় ভগবান দয়া করলেন—আগুন লেগে গেল ওদের ঘরগুলোতে। দারোগার সন্দেহ আমিই আগুন দিয়েছি। বুঝুন! এ ছাড়া আর একটা ফৌজদারিও হয়েছে। ছাতনায়, জমির আল নিয়ে ঝগড়া। প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের বরকন্দাজ বাসুকীনাথ টাঙি চালিয়ে দু'ফাঁক ক'রে দিয়েছে একটা লোককে। কবজির জোর আছে লোকটার। খুনটি ক'রে সে দেশে পালিয়েছে। এখন আমাকে সাক্ষী-সাবুদদের ঘুষ খাইয়ে নিজেদের দলে আনতে হবে। প্রচুর ঝক্কি!"

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন আদিত্যনারায়ণ, আবার বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ—'শুনলেন তো, টাকা ছাড়ুন এবার।'

বিশ্বদীপের দেশে অনেক জমিজমা বিষয়সম্পত্তি আছে। সেটা আইনত যদি জমিদারী হ'ত তাহলে গভর্নমেন্ট তা নিয়ে নিতেন। কিন্তু তা জমিদারি নামে চিহ্নিত নয়। বিশ্বদীপের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি। আগে সব ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ছিল, কিন্তু বংশে বিশ্বদীপ ছাড়া আর কোন বংশধর না থাকাতে বিশ্বদীপই উত্তরাধিকারসূত্রে সব পেয়েছেন। আদিত্যনারায়ণই সব দেখাশোনা করেন। বিশ্বদীপ মাপজোক ক'রে দেখেননি কখনও কিন্তু জনশ্রুতি তাঁর এক হাজার বিঘের উপর জমি আছে। তাছাড়া বাগান আছে, পুকুরও আছে। শিবমন্দির আছে। প্রকৃত আয় কত হয়, কত হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করবার শক্তি বা সামর্থ্য বিশ্বদীপের নেই। তিনি আদুবাবুর উপর বিশ্বাস করেছেন তাই এবং আদুবাবুকে কেন্দ্র ক'রে এমন একটা মহিমা সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন, যা কলিকালে দুর্লভ। বিশ্বদীপ রামচন্দ্র নন আদুবাবুও মহাবীর হনুমান হ'তে পারেন না, কিন্তু বিশ্বদীপ ওই চিত্রটাকেই মনে মনে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেন। বিশ্বদীপের যুক্তি আদুবাবু ইচ্ছে করলে তাঁকে একটি পয়সা না দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি গড়ে তাঁকে মাসে হাজার টাকা ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন, এ বাজারে এটা কম কথা নয়। তাঁর ধারণা আদুবাবু লোকটি সজ্জন, কিন্তু রহস্যময়। আদুবাবু বিশ্বদীপের বাবার আমলের কর্মচারী। বিশ্বদীপ বিলেত থেকে ফিরে এসে তাঁকে 'কাকা' ব'লে সম্বোধন করাতে আদুবাবু যা বলেছিলেন তা বিশ্বদীপ ভোলেননি। আদুবাবু বলেছিলেন, "দেখুন, আপনার বাবা আমার মনিব ছিলেন, আপনিও আমার মনিব, জাতে আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আগুরি। আপনার নকল কাকা সেজে একটা ভুয়ো মাখামাখির ভাব যদি করতে চাই তাহলে সেটা মিথ্যে হবে। এ মিথ্যের মুকুট আমার মাথায় মানাবেও না। আমি আপনার বাবার নফর ছিলুম, আপনারও থাকব"—এই ব'লে তিনি হাত জোড় ক'রে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চোখ বুজে যে ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তা অভিনয় হিসেবে এত নিখুঁত হয়েছিল যে অভিনয় বলে মনেই হয়নি।

বিশ্বদীপ আদুবাবুর কথা শুনে হঠাৎ যেন একটু দুর্বল বোধ করতে লাগলেন। কারও প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে তিনি দুর্বল বোধ করেন।

"অত টাকা এক্ষুণি চাই?"

আদুবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না, কিন্তু চোখমুখের ভঙ্গীতে যা প্রকাশ করলেন তার ভাবটা যেন—আমি কি তাহলে এখানে ইয়ার্কি করতে এসেছি! কথা বললেন একটু পরে।

"টাকা না নিয়ে ওখানে ফেরা যাবে না।"

"আজ তো ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'য়ে গেছে। কাল ব্যবস্থা করা যাবে। টমসন যদি যেতে চায় টমসনকেও পাঠিয়ে দেব আপনার সঙ্গে। সে এককালে পুলিসে বড় চাকরি করত, তাকে দেখলে ওখানকার দারোগা হয়তো বেশী কিছু করতে সাহস পাবে না। তবে টমসন গেলে তার মেমসাহেবও যাবে তার সঙ্গে। ও একা কোথাও যায় না।"

"একেই তো হাঙ্গামের মধ্যে আছি। তার ওপর সায়েবসুবো নিয়ে কি সামলাতে পারব?"

"টমসন একেবারে বাঙালী হ'য়ে গেছে। চাপ্টালি খেয়ে ব'সে কলায়ের ডাল আর পোস্ত দিয়ে ভাত খেতেও আপত্তি হবে না তার। মেমসায়েবও ঠিক ওই রকম, শাড়ি সিঁদুর পরে—।"

"টমসন সায়েব কি এখনও পুলিসের চাকরি করেন?"

"না। আগে করত, এখন রিটায়ার করেছে। আমার বিশেষ বন্ধু। ছেলেপিলে নেই, এদেশেই থেকে গেছে। আমারই একটা বাড়িতে থাকে। আচ্ছা, কাল সব ব্যবস্থা হবে। আমি টমসনের সঙ্গে কথা ব'লে দেখি। আপনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

"আমি কিন্তু কপর্দকশূন্য হ'য়ে পড়েছি যে—।"

"ও আচ্ছা। দেখি কত আছে আমার কাছে—"

বিশ্বদীপ মনি-ব্যাগ বার ক'রে একটা একশ' টাকার নোট দিলেন তাঁকে। আদিত্যনারায়ণ নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

আবার ফোন বাজল!

"বিদুলা? হ্যাঁ আছি। এখনই আসছো? হ্যাঁ আছি, এস।"

বিদুলা এ সময় হঠাৎ আসছে কেন?

টং—টং—টং—টং···নিদারুণ শব্দটা আবার স্পষ্ট হ'য়ে উঠল।

'খুন ক'রে ফেলব তোকে···"

"আর করব না, বাবা গো তোমার পায়ে পড়ি, আর মেরো না, আর মেরো না।" বিশ্বদীপ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, সামনের বাড়িতে সেই ষণ্ডা লোকটা তার প্রথমপক্ষের মেয়েকে আবার মারতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী দাঁড়িয়ে এই নির্যাতন দেখছে।

মুখে তার মুচকি হাসি। লোকটা নাকি বেকার। কিছুতেই কোন কাজ জোটাতে পারছে না। মেয়েটা দুষ্টু, ধার ক'রে তেলেভাজা কেনে, প্রায়ই নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে,·· বিশ্বদীপ লোকমুখে এসব খবর শুনেছেন। এর কি কোনও প্রতিকার আছে? সমাজ কোথায়? রাষ্ট্র কি করছে? আমরাই বা কি করতে পারছি? পর পর এই সব কথা মনে হ'ল বিশ্বদীপের, উপকার করবার ইচ্ছে থাকলেও উপকার করা যায় না। বিশ্বদীপ পাঠকজিকে বলেছিলেন ওকে যদি কোন কাজ দিতে পারেন ফ্যাক্টারিতে। পাঠকজি রাজী হননি। লোকটা নাকি চোর আর চরিত্রহীন। বউকে বাজারে বিক্রি ক'রে পয়সা রোজগার করে। মেয়েটা তাতে প্রধান বাধা। সেইজন্যই ওর উপর এতো রাগ। বিশ্বদীপ উঠে সামনের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। বন্ধ জানলা ভেদ ক'রে তবু মেয়েটার আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল—"আর কক্‌খনো করব না, বাবা গো তোমার পায়ে পড়ি..."।

চোখ বুজে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ।

একটু পরেই বিতুলা এসে ঢুকল হুড়মুড় ক'রে।

"চোখ বুজে ব'সে আছো যে? শরীর খারাপ না কি?"

"না। হঠাৎ এলে যে এখন?"

"ওয়ালটেয়ারে যাবে? শ্যামল খুব ভালো একটা বাড়ি পেয়েছে সেখানে। আমাকে যেতে বলছে। যাবে তুমি?"

"আমি তো এখন যেতে পারব না। ফ্যাক্টারিতে স্ট্রাইক হয়েছে, আহুবাবু এসেছেন, দেশেও নানা গোলমাল, এখন যাই কি ক'রে। তুমি যেতে চাও তো যাও না··"

"শ্যামলের সঙ্গে আমার একা যেতে কেমন ভয় করে। বিশেষত ওই রকম কবিতা লেখার পর—"

"আমি সঙ্গে গেলেও সে ভয় থাকবে। সবটা নির্ভর করছে তোমার উপর। তুমি যদি ঠিক থাক—"

"আমি ঠিক আছি। সে বিষয়ে কিছু ভেবো না।"

"তাহলে চলে যাও।"

"তুমি রাগ করবে না তো? তোমাকে একা ফেলে কোথাও যাইনি। তাছাড়া শ্যামল কি যে করবে শেষ পর্যন্ত!"

"দারোয়ানটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। রিভলভারটাও নিতে পার।"

"না, না, অতটা ভয় করি না···শ্যামল অতটা সাহস করবে না।"

"তবে চ'লে যাও।"

"রাগ করবে না তো লক্ষীটি।"

"আরে না, না—।"

বিতুলা চ'লে যাবার পর বিতুলার প্রথম দিনের সেই উপহারটার কথা মনে পড়ল বিশ্বদীপের। প্রথম যেদিন সে তাকে চীনে ফুলদানী দুটো কিনে দিয়েছিল, সেদিন বিতুলাও তাকে উপহার দিয়েছিল অদ্ভুত একটা চীনে খেলনা। সত্যিই অদ্ভুত জিনিসটা, কাঠের তৈরী, কাঠের উপর চমৎকার রং ফলিয়েছে চীনে শিল্পী। প্রকাণ্ড মাঠের উপর অনেক দূর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা বটগাছ। তার থেকে নেমেছে অসংখ্য ঝুরি। গাছকে পৃথিবীর মাটিতে বাঁধবার একটা চিরস্থায়ী ষড়যন্ত্র যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে চারপাশে। কিন্তু সেই বটগাছের একপাশ থেকে বেরিয়েছে আর একটা ডাল, সবুজ, সতেজ, জীবন্ত সে, তার থেকে ঝুরি নামেনি, সে যেন মাটির সঙ্গে বাঁধা পড়তে চায় না, সে যেন ছুটে যেতে চাইছে আকাশের দিকে। তাতে ঝুরি নেই, কিন্তু দোলনা বাঁধা আছে একটা। নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের পটভূমিকায় টুকটুকে লাল দোলনাটি আর সেই দোলনায় ব'সে আছে বিস্রস্তবাসা আলুলায়িতকুন্তলা সেই মেয়েটি যার কথা কবিরা অনাদি কাল থেকে বলেও শেষ করতে পারছে না, যার চারদিকে অসমাপ্ত কাব্য স্তূপীকৃত হ'চ্ছে কেবল যুগ যুগ ধ'রে। একটা চাবিতে দম দিয়ে দিলে দুলতে থাকে দোলনাটা আর বুড়ো বটগাছের অঙ্গে জাগে শিহরণ, দূর থেকে বাজতে থাকে আকুল-করা বাঁশীর সুর একটা। বটগাছকে কেন্দ্র ক'রে দু'একটা সবুজ রঙের পাখীও উড়তে থাকে, আকাশে ভেসে আসে মেঘের দল। মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত একটা স্বপ্ন মূর্ত হ'য়ে উঠল যেন। দোলনা দুলতে থাকে, একবার আকাশের দিকে যায়, আবার নেমে আসে মাটিতে। মনে হয় না ওটা কাঠের তৈরী, মনে হয় যেন জীবন্ত, মনে হয় ওই যেন বিতুলা। অনেকদিন পরে বিতুলা যে চিঠিটা লিখেছিল তার দু'একটা লাইনও মনে পড়ল হঠাৎ। 'কাব্যে কন্দর্পের কথা পড়েছিলাম, তাকে যে কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাব একথা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। আর একটা ভুলও ভাঙল। বুঝতে পারলাম যা অবিনশ্বর তাকে মহাদেবও ধ্বংস করতে পারেন না। মদনকে ভস্ম করার গল্পটা নিতান্তই গল্প।'

বিশ্বদীপ সত্যিই রূপবান। বিশ্বদীপ ভেবেছিলেন এ রূপ সার্থক হবে যদি তা বিতুলাকে ঘিরে জ্যোতির পরিমণ্ডল রচনা করতে পারে। কিন্তু...।

তিন

মানসপুরের আকাশ আজ গাঢ় নীল। মনে হ'চ্ছে যেন ঘননীল মাণিক্যের দ্যুতি স্ফুরিত হ'চ্ছে ওর নীরব সুদূর গাম্ভীর্য থেকে। বিশ্বদীপ নূতন ধরনের একটা পরিবেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। চারদিকের গাছগুলো চেনা নয়, পাতাগুলো ঝালরের মত আর প্রত্যেক পাতাকে ঘিরে অজস্র ফুল। ছোট ছোট ফুল, কিন্তু নূতন ধরনের দেখতে। চারদিক সাদা, সেই সাদার উপর সূক্ষ্ম গোলাপী রেখার একটি ঢেউ আর মাঝখানটায়

কালো আর কালোর উপর সোনালী রেখার কারুকার্য। মনে হয় ছোট্ট একটি খোঁপা যেন। সারা গাছ এই ফুলে ভরতি। লক্ষ লক্ষ মেয়ে যেন পিছন ফিরে ব'সে আছে, কেউ যেন মুখ ফেরাবে না, তাদের খোঁপা থেকেই আন্দাজ ক'রে নিতে হবে তাদের মুখভাব আর মনোভাব। বিশ্বদীপের মনে হচ্ছিল ওরা সবাই যেন তার দিকে পিছন ফিরে ব'সে মুচকি মুচকি হাসছে। তাদের মুখের কৌতুকহাস্য যেন বলছে—তোমার সঙ্গে আড়ি। বিশ্বদীপ ভাবছিলেন—কি ক'রে ওদের সঙ্গে ভাব করা যায়। ভাবছিলেন, গান গাইবেন কি? কে যেন তাঁকে বলেছিল ফুলেরা গান ভালবাসে। দোয়েল শ্যামার গান শুনে তারা নাকি মুখ ফেরায়। বিশ্বদীপেরও গানের খ্যাতি খুব। কিন্তু সে গান কি···এমন সময় দেখতে পেলেন মুরুব্বী আসছে। মুরুব্বী বহুরূপী লোক, নানা বেশে দেখা দেয়। কখনও কিশোর, কখনও যুবক, কখনও আবার বৃদ্ধ। পোশাকও নানা ধাঁচের, নানা রঙের। কখনও রঙীন উত্তরীয়, কখনও গৈরিক, কখনও কৌপীনবস্ত্র, কখনও সাহেবী পোশাক, কখনও বা আর কিছু। তাকে চেনা যায় তার চোখের দৃষ্টি থেকে। সে দৃষ্টি কখনও বদলায় না। তা আলোর মতো, আকাশের মতো। মুরুব্বীর চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বদীপ চিনতে পারলেন তাকে। আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধুতিতে চমৎকার মানিয়েছে, বিশেষ ক'রে মুখের হাসিটি খুব নূতন মনে হ'ল। মনে হ'ল একটা অনন্ত আশ্বাস যেন হাসি হ'য়ে ফুটেছে ওর মুখে। মুরুব্বী সবাইকে সমীহ ক'রে কথাবার্তা বলে, যেন সে সকলের চেয়ে ছোট, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

"আপনি গাছের দিকে অমন ক'রে চেয়ে ব'সে আছেন যে—"

বিশ্বদীপ বললেন, "ভাবছি ওরা কখন মুখ ফেরাবে।"

"ওরা মুখ ফেরালে কি সামলাতে পারবেন? ওদের খোঁপাগুলো সব একরকম। প্রত্যেকটি মুখ আলাদা, প্রত্যেকটি মন আরও আলাদা। প্রত্যেকটি হাই-পাওয়ার 'বাল্‌ব', টর্চও বলতে পারেন। নানা রঙের। সবগুলো যদি আপনার দিকে ফোকাস করে অন্ধ হ'য়ে যাবেন। খোঁপা দেখেই সন্তুষ্ট থাকুন—"

চুপ ক'রে রইলেন বিশ্বদীপ। এর উত্তরে কি বলা উচিত তাই ভাবছিলেন। এমন সময় মুরুব্বী মুচকি হেসে বললে, "একটা কথা যদি বলি রাগ করবেন না তো?"

"না, রাগ করব কেন।"

"আপনি বিত্তুলার খোঁপাটাই দেখেছেন, মুখটা দেখতে পাননি এখনও।"

বিশ্বদীপ অবাক হবার অবসর পেলেন না কারণ এর পরই মুরুব্বী যা করলে তা আরও বিস্ময়কর। পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাঁচের বাক্স বের ক'রে বললে —"একে চেনেন? আলাপ করুন এর সঙ্গে। একে মানুষের ভাষা শিখিয়ে দিয়েছি। ওর ভাষা আর আপনাকে শিখতে হবে না।"

বিশ্বদীপ দেখলেন কাঁচের ছোট্ট বাক্সটার মধ্যে রঙীন প্রজাপতি বসে আছে একটা। প্রজাপতি বলেই মনে হল তাঁর।

"চমৎকার প্রজাপতি তো!"

"দিনের প্রজাপতি নয়, রাতের প্রজাপতি। ইংরেজরা বলে 'মথ'। আমি নাম দিয়েছি রংবাহারী। এরা রাত্রে বেরোয়। রাতের সব খবর রাখে এরা। দিনের খবর তত রাখে না। আমি এদের দিনের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিতে চাই। আপনিও একটু আলাপ করুন না। আমি ততক্ষণ নওরঙ্গীকে খুঁজে আনি। নওরঙ্গী দিনের প্রজাপতি। তার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দেব।"

"কোথায় আছে নওরঙ্গী—"

"ওই যে দূরে যেখানে শিয়ালকাঁটার জঙ্গলে অসংখ্য হলদে ফুল ফুটেছে সেখানেই আছে সম্ভবত। ওর বান্ধবী সোনাহলুদ ওই পাড়ারই মেয়ে—"

কাঁচের বাক্সটা বিশ্বদীপের হাতে দিয়ে মুরুব্বী চ'লে গেল। মিলিয়ে গেল যেন মরীচিকার মতো। মুরুব্বী রহস্যময়, কিন্তু সে বাস্তব, তাকে ছাড়া চলবার উপায় নেই মানসপুরে।

কাঁচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এল রংবাহারী। বেরিয়ে চুপ ক'রে রইল।

"এমন সুন্দর নীল তোমার রং..."

"আমার রং নীল নয় শুধু"—রংবাহারী বললে—"আমি দিনের আলোয় নীল, কিন্তু রুদলবাবুর ঘরে যে আলোটা জ্বলে সে আলোয় আমার রং সবুজ।"

"রুদলবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে নাকি?"

"আমি রোজ রাত্রে ওঁর ঘরে চুপিচুপি যাই, গিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাকি ওঁর দেয়ালগিরিটার পাশে। রুদলবাবু আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসেন, আর পা দোলান, তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন ওয়াণ্ডারফুল। আমার মনে হয় দিনের আলোতেও যদি আমাকে দেখতেন, দুবার ওয়াণ্ডারফুল বলতেন। কিন্তু দিনের আলোয় আমি বেরুতে ভয় পাই। ফিঙে পাখীরা আমাদের দেখলেই খেয়ে ফেলে। ফিঙে পাখী কালো, রাত্রিও কালো, কিন্তু রাত্রি তো আমাদের কিছু বলে না, তার কালো তার অন্ধকার অপরূপ, সে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধ'রে নিয়ে যায় রূপকথালোকে। দিনের বেলা ওই কালো কেন দেখা দেয় ফিঙে-রাক্ষস হয়ে। কেন হয় বলুন না—"

হঠাৎ বিশ্বদীপ অনুভব করলেন রংবাহারী সর্বাঙ্গ দিয়ে কথা কইছে যেন। এমনিতে মনে হ'চ্ছে চুপটি ক'রে ব'সে আছে, কিন্তু আশ্চর্যরকম বাঙ্ময় ওর নীরবতা। নীরবতার ভিতর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে অদৃশ্য বুদ্বুদের মতো।

বিশ্বদীপ বললে, "কেন হয় তা তো জানি না। যা হয় তা দেখি আর মেনে নিই। মাঝে মাঝে আর এক কাণ্ড হয়। যা হয়েছে তা হয়েছে কি না বুঝতে পারি না অনেক সময়। তাই মানতেও পারি না। সব গোলমাল হয়ে যায়।"

"ঠিক বলেছেন। আমারও তাই হয়েছে। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম আমি আছি। ছোট্ট একটা চ্যাপটা ডিমের মধ্যে, শিমূলগাছের গুঁড়ির ফাটলে। সে ডিম

আপনি ফেটে গেল একদিন। তার থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি নূতন রূপে। পোকার মতো। আশে-পাশে দেখলাম আমারই মতো আরও কয়েকটা পোকা কিলবিল করছে। আমারই ভাই বোন সম্ভবত। কিন্তু একদিনের মধ্যেই তারা কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর বিশ্বগ্রাসী খিধে জাগল পেটে। পাতা খেয়ে বেড়াতে লাগলাম। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ওই এক কাজ। কেবল খাওয়া আর খাওয়া। কত পাতা যে খেয়েছি তার ঠিক নেই। তারপর এল এক অদ্ভুত অবস্থা। অদ্ভুত একটা আলস্য, অদ্ভুত একটা জড়তা। খেতে ভালো লাগে না, নড়তে ভালো লাগে না, কিছু করতে ভালো লাগে না। স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম একেবারে। আমার শরীর শক্ত হ'য়ে গেল। মনে হ'ল বন্দী হ'য়ে যাচ্ছি, বাইরের জগৎ লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। লুপ্তই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। তখনও কিন্তু মরলাম না। স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, অদ্ভুত একটা নীল স্বপ্ন। আমার যেন নীল ডানা গজিয়েছে, আমি যেন অন্ধকারের সমুদ্রে নীল নৌকো বেয়ে চলেছি···তারপর হঠাৎ ফেটে গেল শক্ত খোলাটা একদিন। আমি বেরিয়ে এলাম এই বেশে। রাত্রি বলছে আমার বুকে উড়ে বেড়াও, ফিঙে বলছে দেখতে পেলেই খেয়ে ফেলব। এরপর কি হব, কোথায় যাব, আলোয় না অন্ধকারে, আকাশে না গর্তে...”

বিশ্বদীপের সব গুলিয়ে গেল। কথাগুলো তাঁর নিজের মনের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, না, রংবাহারী বলছে তা বুঝতে পারলেন না তিনি। দেখলেন রংবাহারীর নীল পাখা দুটো আর সামনের দিকের শুঁড়টা কাঁপছে শুধু।

“কি হ'চ্ছে, কি হ'চ্ছে, কি হ'চ্ছে—”

মাথা নেড়ে নেড়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল শারিকা। মানসপুরের শালিক পাখী। ভারী আড্ডাবাজ। দেখা হ'লে দু'চার কথা বলবেই।

বিশ্বদীপ বললেন, “হয়নি কিছুই। রংবাহারীর সঙ্গে আলাপ করছি। মুরুব্বী ওকে রেখে গেছে আমার কাছে।”

“গোবদাগাবদা বেশ দেখতে তো। মুরুব্বী হয়তো রাগ করবে তা না হ'লে একবার ঠুকরে দেখতুম। যাত্রা দেখেছ? রুদলবাবু একবার যাত্রা করিয়েছিলেন এখানে। আসরের একধারে আমাদের বসবার জায়গাও ছিল। ভারী মজার জিনিস। যুদ্ধ হ'ল, নাচ হ'ল, গান হ'ল, বিয়ে হ'ল, সব মিথ্যে কিন্তু! গঙ্গাফড়িং সেখানে যা কাণ্ড করেছিল তা আর বলবার নয়। সে হঠাৎ উড়ে গিয়ে বসল রানীর নাকে। রানী মূর্ছা গেল সঙ্গে সঙ্গে। রানীর মুকুটে ছোট ছোট সবুজ পুঁতি ছিল, গঙ্গাফড়িং ভেবেছে ওগুলো সবুজ পোকা বুঝি, ওরা সবুজ পোকা খায়, তাই লাফিয়ে চ'লে গেছে। সে কি কাণ্ড!”

“হঠাৎ যাত্রার কথা মনে পড়ল কেন তোমার—”

“তোমার এই রংবাহারীকে দেখে। যাত্রার দলে যে রাজা সেজেছিল তার ছিল এইরকম পোশাক। যাই, দেরি হচ্ছে বাবা! আমাকে বাসা বানাতে হবে। পিড়িং—”

উড়ে গেল শারিকা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল মুরুব্বী সাইকেল ক'রে আসছে। তার সামনে দুটো প্রজাপতিও আসছে উড়তে উড়তে। নওরঙ্গী আর সোনাহলুদ। নওরঙ্গীর ডানা দুটো কমলা রঙের, তার চারদিকে মিশকালো রঙের খাঁজ-কাটা পাড়। নীচের পাখায় কমলা রঙের সঙ্গে এসে মিশেছে হলুদ রং। সে হলুদের ধারে ধারে আবার হালকা রঙের কালো। ওপরের ডানাতেও কমলা রঙের পাশে পাশে হলুদ আর কালোর হালকা রং ঠিক মুখের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে ডানার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চ'লে গেছে। ওপরের ডানায় দু'টি কালো ফুটকি, নীচের ডানায় দু'টি লাল ফুটকি। কমলা-হলুদ-কালো-লালের স্বপ্ন যেন নওরঙ্গী। সোনাহলুদ আরও সুন্দর। খাঁটি সোনার রং আর হলুদের রং, আর ডানার ধারে ধারে সরু সরু কালো রেখা, আর কিচ্ছু নেই, মনে হ'চ্ছে আর কিছু থাকবার দরকারই বা কি। এতেই তো মাৎ ক'রে দিয়েছে।

মুরুব্বী এসেই সাইকেলটা থেকে টপ ক'রে নেমে সেটা শুইয়ে রেখে দিলে ঘাসের জঙ্গলে।

"ওরা আমাকে ধরা দিলে না, বললে উড়ে উড়ে যাব। তাই সাইকেল যোগাড় করতে হ'ল একটা। ওদের সঙ্গে উড়তে তো পারি না! বাস, এইবার আমাদের মীটিংটা করা যাক—"

নওরঙ্গী বসল ঘলঘসে ফুলের উপর। সোনাহলুদ বললে, "আমি বসব না, উড়ে উড়ে বেড়াব। বসলেই নওরঙ্গী এসে বিরক্ত করবে"—বলেই ছোট্ট মিষ্টি শব্দ করল একটা। বিশ্বদীপের মনে হ'ল হাঁচি, কিন্তু আসলে ওটা হাসি। মুরুব্বী বললে, "নওরঙ্গী, রংবাহারীর সঙ্গে আলাপ কর।"

নওরঙ্গী। রুদলবাবু কিন্তু আমাদের পলিটিক্স করতে মানা ক'রে দিয়েছে। তাই রাত্রের অন্ধকারে যে-সব ভয়ংকর কাণ্ড হয় সে সব কথা জিগ্যেস করব না। আমি শুধু জানতে চাই, ভাই রংবাহারী তুমি কি খাও।

রংবাহারী চুপ ক'রে ব'সে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "আমি ভাই মধু খাই। যে সব ফুলে মধু থাকে আমি সেই সব ফুলের ভিতর আমার এই লম্বা শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিয়ে মধু চুষে খাই।"

নওরঙ্গী। খাওয়া দাওয়ার পর কি কর?

রংবাহারী। যেখানে আলো দেখি সেইখানে যাই। রুদলবাবুর ঘরে অনেকবার গেছি। ভালো লেগেছে রুদলবাবুকে।

নওরঙ্গী। হাঁ। রুদলবাবু ভালো লোক। দিনেও ভালো রাত্রেও ভালো। অনেক লোক দিনে ভালো থাকে, রাত্রে অন্যরকম হ'য়ে যায়, রুদলবাবু সেরকম নয়। আর কোথা গেছ তুমি…।

রংবাহারী। নীল আলো জ্বলে সেই যে তোমাদের নব-কিশোরের ঘরে—সেখানে। নতুন বিয়ে হয়েছে। বউকে নিয়ে কি কাণ্ড যে করে! তার ঘরে মাঝে মাঝে যাই।

বউটি ভারী লক্ষী। রজনীগন্ধার মতো। মনে হয় ওর মুখের ভিতর যদি আমার এই শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিতে পারতাম তাহলে অনেক মধু পেতাম বোধহয়। কিন্তু সাহস করিনি কোনদিন…।

সোনাহলুদ রংবাহারীর মাথার উপর উড়ে উড়ে বলতে লাগল—'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না।"

নওরঙ্গী। আর কোথায় গিয়েছিলে—

রংবাহারী। ওই যে তোমাদের সিংহ। গাছতলায় ব'সে থাকে। প্রায়ই আলো জ্বালে না। কিন্তু জান, এক একদিন জ্বালেও। অনেক রাত্তিরে। মোমবাতির আলো জ্বেলে চিঠি পড়ে। আঁকাবাঁকা হাতের লেখা চিঠি। আমি সিংহের মাথায় চ'ড়ে বসেছিলুম একদিন। ভারী ভালো, কিছু বলে না।

সোনাহলুদ আর একবার উড়ে উড়ে রংবাহারীকে ব'লে গেল—"তোমাকে ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে—"

রংবাহারী। আমিও তো তোমাদের দিনের আলোয় আসতে চাই। তুমি কোথায় থাক? তুমি সুন্দর।

সোনাহলুদ। আমি শিয়ালকাঁটা বনে সকালবেলা থাকি, তারপর দুপুরে যাই বধুসরা নদীর ধারে ঘনসবুজ কচুপাতাগুলো যেখানে ঝুঁকে ঝুঁকে জলের আয়নায় মুখ দেখছে অনবরত, ঠিক তার পাশেই আছে ঘেঁটুবন, অজস্র ফুল তাতে, সেইখানে যাই দুপুরে। বেশীক্ষণ থাকতে পারি না অবশ্য, পাশেই বড় বকুলগাছে এক ঝাঁক টিয়া বাসা বেঁধেছে, ভারী চেঁচামেচি করে। বিকেলে যাই রুদ্দলবাবুর গোলাপ বাগানে। আর রাত্রে ফনীমনসার ঝোপে। রাত্রে সেখানে যদি আস দেখা পাবে আমার। তোমাকে খুব ভালো লেগেছে আমার…এসো, নিশ্চয় এসো…।

সোনাহলুদ ক্রমাগত চক্কোর দিয়ে উড়তে লাগল।

নওরঙ্গী। দেখ্ সোনাহলুদ বড় বাড়াবাড়ি করছিস। অচেনা রংবাহারীকে দেখে ক্রমাগত ব'লে যাচ্ছিস, তোমাকে খুব ভালো লেগেছে, তোমাকে খুব ভালো লেগেছে। ভেবেছিস এ শুনে আমার হিংসে হবে। কিন্তু আমি ব'লে দিচ্ছি আমার কিচ্ছু হবে না। আমি তোর পরোয়া করি না…।

নওরঙ্গী ঘলঘসে ফুলের উপর থেকে উড়ে গিয়ে বাবলাগাছটার ডালে ডালে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মুরুব্বী তখন বললে, "তোমাদের প্রাইভেট ঝগড়া মীটিংয়ে চলবে না। রংবাহারী দিনের বেলা যদি আসে তোমরা আপত্তি করবে কি না সেইটে আগে ঠিক কর।

নওরঙ্গী। আমাদের দিনের সীমান্ত রক্ষা করে উষা। রাগী মেয়ে। সুন্দরী ব'লে দেমাকও আছে। সে যদি আপত্তি না করে আমাদের আর আপত্তি কি?

মুরুব্বী। তার মানে শুকতারার খোশামোদ করতে হবে? বেশ তাই করা যাবে।

বাস, তাহলে ওই কথা রইল। এইবার বিশ্বদীপবাবুকে সিংহের কথা শুনিয়ে দাও কিছু। সিংহের কথা শোনবার জন্তে উনি খুব উৎসুক।

নওরঙ্গী। সিংহ খুব ভালো লোক।

রংবাহারী। চমৎকার, চমৎকার :

সোনাহলুদ। মানসপুরে ওই তো দেবতা।

এমন সময় তড়াক ক'রে লাফিয়ে এল প্রকাণ্ড সোনা ব্যাং লম্ফ সিং। রাক্ষুসে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে বললে, "এখানে কিসের আড্ডা জমিয়েছ তোমরা ?"

মুরুব্বী। সিংহের কথা হচ্ছে।

লম্ফ সিং। সিংহ লোক খুব ভালো। কিন্তু ওর সম্বন্ধে একটা নতুন খবর কাল পেয়েছি, আগে জানতুম না—।

নওরঙ্গী। কি খবর ?

সোনাহলুদ। ওর সব খবর আমরা দিয়েছি, ও ভালো লোক, চমৎকার লোক, ও মানুষ নয় দেবতা—এর চেয়ে বেশী আর কি খবর দেবে তুমি।

লম্ফ সিং চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পটাৎ ক'রে লম্বা জিবটা বার ক'রে পোকা খেয়ে ফেললে একটা। তারপর চোখ দুটো আরও বড় ক'রে বললে, "ওর বউ আছে। জান এ খবরটা ?—"

রংবাহারীর ডানা দুটো আর শুঁড়টা কাঁপতে লাগল। সে বলল, "জানি। অপরূপ সুন্দরী সে। জ্যোৎস্নার মতো দেখতে। আমি একদিন দেখেছিলাম তার পায়ের উপর উপুড় হ'য়ে কাঁদছিল বউটি। একটু পরে উঠে চ'লে গেল।"

লম্ফ সিং বলল, "আরে না, না। আমি যাকে দেখেছি সে মানুষ নয়, ঝুমকোলতা। ঝুমকোলতার ঝোপটার ভিতর ঢুকে আমি একদিন পোকা ধরছিলাম। হঠাৎ সিংহ এসে সেই লতাটার সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রে দিলে। বললে, বউ তোর কাছে দু'দিন আসতে পারিনি। রাগ করেছিস নাকি ? আজ তোর গোড়ায় দু'বালতি জল ঢেলে দেব—। আমি তো একথা শুনে অবাক। বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলুম এ তোমার বউ নাকি ? সিংহ বললে, হ্যাঁ, এই আমার বউ। আমার যে মানুষ-বউ ছিল তারও নাম ছিল ঝুমকো। কিন্তু আমার অসুখের জন্য সে তো রইল না আমার কাছে। এ চিরকাল থাকবে। জিগ্যেস করলুম, তোমার কি অসুখ হ'য়েছে ? উত্তর দিলে না, শুধু হাসলে একটু। ওকে হাসতে দেখলে ভয় করে। ওরে বাবা, একি—"

লম্ফ সিং তড়াক ক'রে একটা লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঢেমনা সাপ তীরবেগে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। মুরুব্বী বললে, "তাহলে এইবার সভাভঙ্গ করা যাক। আমি রংবাহারীর জন্তে শুকতারার কাছে খবর পাঠাব। রজনীগন্ধার সঙ্গে ওর খুব ভাব। শুকতারার আলো আর রজনীগন্ধার গন্ধ একই

জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে একা একা বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম এটা। আমি ছাড়া এ খবর আর কেউ জানে না, আজ এই তোমাদের প্রথম বললুম! আচ্ছা, তাহলে ওই ঠিক রইল—।"

রংবাহারী বলল, "ওই কালো ফিঙে পাখীটার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হ'ল? ও যদি আমাকে খেয়ে ফেলে—।"

মুরুব্বী এতে চ'টে গেল একটু।

"দেখ বাপু, ভয় করলে মানসপুরে থাকা চলবে না। এখানে সাপও আছে, ব্যাঙও আছে, পোকাও আছে, পাখী-প্রজাপতিরাও আছে। জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে, ক্ষিধেও আছে, খাবারও আছে। কাউকে আমরা বাদ দিয়ে থাকতে পারব না। সবাই মিলেমিশে থাকতে হবে। এই থাকাটা একদিন যদি হঠাৎ না-থাকা হ'য়ে যায় তাতেও আপত্তি করলে চলবে না। কারণ তাতেও আনন্দ আছে···ক্রমাগত নিজের কোলে ঝোল টানলে কি চলে?"

নওরঙ্গী আর সোনাহলুদ সমস্বরে ব'লে উঠল—"না, না, না। আমরা বাঁচব এবং মরব, থাকব এবং থাকব না। এই আমাদের গান, এই আমাদের ছন্দ···।"

উড়ে উড়ে চ'লে গেল ওরা।

রংবাহারী তখন বলল, "আমি তাহলে এবার কি করব?"

"তুমি উড়ে উড়ে চ'লে যাও ওদের সঙ্গে। তোমারও তো ডানা আছে। ফিঙে কিছু বলবে না এখন তোমাকে। সে চিল নিয়ে ব্যস্ত আছে···"

"তবে যাই—"

রংবাহারীও উড়ে গেল। বিশ্বদীপ দেখলেন তার নীল পাখার নীচে সোনালী রংও রয়েছে। মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন মুরুব্বী নেই। তার সাইকেলও নেই।

"এই যে আমি এখানে আছি—"

বিশ্বদীপ দেখলেন ধানক্ষেতের মাঝখানে ব'সে আছে মুরুব্বী। ধানে শীষ ধরেছে। নুয়ে পড়েছে ধানগাছগুলো। মনে হচ্ছে সবাই যেন মুরুব্বীর দিকেই নুয়ে পড়েছে আর তার কানে কানে চুপিচুপি কি যেন বলছে সব। বিশ্বদীপকে দেখে মুরুব্বী একটু অপ্রস্তুত হ'ল। ধানক্ষেত থেকে উঠে এসে বললে, "ওরা এখন যুবতী হয়েছে। নানারকম গোপন কথা জ'মে ওঠে ওদের মনে। আমার কাছে সে সব বলে ওরা মাঝে মাঝে। তাই ফাঁক পেলে ওদের কাছে গিয়ে বসি। তাছাড়া আর একটা সত্যি কথা বলব, যুবতীদের কাছে বসতে ভালো লাগে—।"

"কি বলছিল ওরা—"

"বলছিল এবার তো আমাদের শীষ ধরেছে, এইবার তোমরা আমাদের বকসিস দেবে। কেটে ফেলবে কচাকচ। কমলবাবুকে বোলো তাঁর কাস্তেরা যেন ভোঁতা না হয়ে আসে।"

বিশ্বদীপ বুঝতে পারলেন না ঠিক। মুরুব্বী সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে ব্যাপারটা। বললে, "মাথায় ঢুকল না বুঝি। এখানে লোহারাম মিস্ত্রীর পাঁচ পুত্র—কাস্তে, কাটারি, কোদাল, কুড়ুল আর খন্তা। কাস্তের ছেলেরা সব কাস্তে, কাটারির ছেলেরা সব কাটারি, কোদালের ছেলেরা সব কোদাল, খন্তার ছেলেরা সব খন্তা, আর কুড়ুলের ছেলেরা সব কুড়ুল। সুতরাং এ পাঁচটা জিনিসের অভাব নেই রুদলবাবুর। লোহার অন্য জিনিসের দরকার হ'লে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। অনেক খরচা পড়ে যায়। রুদলবাবু লোহারামকে বলেছিলেন, তুমি অন্তত কিছু খুরপি আর পেরেক আমাকে দাও। লোহারাম বললে, আর আমি পারব না। যে পাঁচটিকে জন্ম দিয়েছি তারাই পঞ্চপাণ্ডব। কুরুবংশ সৃষ্টি করবার ইচ্ছে নেই আমার। আসলে কি জানেন, লোকটা মহা কুঁড়ে। মধু ছুতোরের সঙ্গে ব'সে ব'সে খালি গুড়ুক খাবে আর গল্প করবে। কাস্তে, কাটারি, কুড়ুল, কোদাল, খন্তা এমনিতে বেশ কাজ করে, পাঁচ জনই খুব ভালো মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ভোঁত হ'য়ে যায়। তখন রুদলবাবুকে আবার খরচ ক'রে তাদের শহরে পাঠাতে হয়। বুদ্ধিতে শান দিয়ে আবার ফিরে আসে ওরা। তখন কাজকর্ম বেশ ভাল চলে। ধানগাছগুলো সেই কথাই বলছিল। আমি কথা দিয়েছি রুদলবাবুকে বলব। সেইখানেই যাই। আপনি যাবেন কি? রুদলবাবু এখন বোধহয় তানপুরা সাধছেন। চড়ুইভাতিতে গান শোনাবেন একটা। ওহো আপনাকে এ কথাটা বলতে ভুলে গেছি। বধূসরা নদীর ধারে হবে। বধূসরাই হচ্ছেন নাটের গুরু। দিনরাত একটা-না-একটা হুজুক নিয়ে আছেন। সেদিন মাছের সভায় গুরুতর গোলযোগ হয়েছিল। আধমনী রুই মাছের প্রতিনিধি গামা বললে—চিংড়িরা মাছ নয়, পোকা। ওরা আমাদের দল থেকে বেরিয়ে যাক। এই বলে ল্যাজের এক ঝাপটায় দূর ক'রে দিলে চিংড়িগুলোকে। বধূসরা না থাকলে সেদিন চিংড়িবাবুরা কলকে পেতেন না। বধূসরা একেবারে মহাত্মা গান্ধির দোহাই পেড়ে বললে, হরিজনরা আজকাল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসছে। হে মৎস্য-বংশাবতংস, তোমরা তো মানুষদের চেয়ে সভ্য, তোমরা পেছিয়ে থাকবে! গামা এই শুনে 'থ'। খানিকক্ষণ আস্তে আস্তে পাখনা নেড়ে বললে, আচ্ছা, আসুক তাহলে ওরা। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে চড়তে পাবে না তা ব'লে দিচ্ছি। মিটমাট হ'য়ে গেল। আজ আবার বধূসরা চড়ুইভাতির হুজুক তুলেছে। পাহাড়ী তিনজন আসবে, আর আসবে অপ্সরীরা। বধূসরা নদীর জলে আসল রাজহংস এসেছে একজোড়া, পরশু থেকে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, একেবারে নীরব, একটি শব্দ করে না। তারা শুনছি বক্তৃতা করবে। আপনিও যাবেন তো—তাহলে চলুন—"

"আমি আগে সিংহের সঙ্গে দেখা করব।"

"সে আজ বাঁশবনে আড্ডা নিয়েছে, সেইখানে চ'লে যান তাহলে।"

মুরুব্বী এমন হঠাৎ অন্তর্ধান করল যে অবাক হ'য়ে গেলেন বিশ্বদীপ। সন্দেহ হ'তে লাগল সে এতক্ষণ ছিল তো!

যেখানটা বাঁশবন আছে সেখানটা চমৎকার। একটি ছোট গ্রাম যেন। গোছা গোছা বাঁশ কিছুদূর অন্তর অন্তর জোট বেঁধে রয়েছে। যেন এক একটি পরিবার। সবুজ সতেজ পাতাগুলো কি সুন্দর! প্রত্যেক গাছটি ঈষৎ হেলে রয়েছে আর তাদের চারিপাশে রয়েছে ছোট ছোট চারার দল। সরু সরু কঞ্চিগুলো যেন সবুজের শিখা। একটু দূরে একটা নেউল ঘুরঘুর করছে। বাঁশঝোপের ভিতর আলাপ শোনা যাচ্ছে—বুলবুলিদের। একজোড়া গাংশালিক চ'রে বেড়াচ্ছে। শ্যামার শিস শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আর সবার উপরে ঘননীল আকাশের ভাষাময় নীরবতা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে চারিদিক।

বিশ্বদীপ প্রথমে সিংহকে দেখতে পাননি। তারপর হঠাৎ দেখলেন একটা বাঁশ-ঝোপের আড়ালে সে হাতজোড় ক'রে চোখ বুজে ব'সে আছে। একটা ঢিপির উপর কয়েকটা কলা, আর কিছু ভিজে ছোলা রয়েছে। সিংহ তাদেরই পুজো করছে মনে হ'ল। একটু পরে সত্যিই প্রণাম করলে তাদের। বিশ্বদীপ অবাক হলেন। কিন্তু আরও অবাক হলেন যখন সিংহ তাঁর দিকে না ফিরেই বলল, "এঁরা দেবতা, এঁরা আমার প্রাণদাতা, আমার ক্ষুধার আগুনে নিজেদের আহুতি দিয়ে এঁরা আমাকে বাঁচাচ্ছেন, কবে যে এঁদের ঋণ শোধ করতে পারব জানি না। আপনি কখন এলেন—।"

বিশ্বদীপ অবাক হলেন, ওর পিঠেও দুটো চোখ আছে নাকি!

"এই একটু আগে এসেছি আমি। শুনলাম বধূসরা নদীর ঘাটে আজ একটা জলসা হবে—"

"হয়তো হবে। কিন্তু সেজন্য আপনি আসেননি। আপনি এসেছেন আমার কাছে। কিন্তু যে সান্ত্বনা আপনি আমার কাছে চাইছেন তা তো আপনাকে দিতে পারব না। তা দেওয়া যাবে না, আপনি দু'দিন পরেই বুঝতে পারবেন সান্ত্বনা বলে যা দিয়েছি তা মিথ্যা স্তোকবাক্য। আপনাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সেইটেই বড় কথা, সেইটেই আসল কথা, সেইটেই একমাত্র কথা। যে বেগুনে পোকা ধরেছে, যে পাউরুটিতে ছেতো পড়েছে তা লোকে নেবে না, নেওয়াটা স্বাভাবিক নয়, এই কথাটা মেনে নিতে হবে আপনাকে। রুদলবাবুর মতো লোক বেশী নেই, আর নেই ব'লে দুঃখ ক'রেও লাভ নেই। পৃথিবীতে একরকম লোক দুটো থাকে না। রুদলবাবু সত্যি সত্যি আছেন কি না তা-ও সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে—"

সামনের একটা কঞ্চির উপর একটা টুনটুনি এসে দোল খেয়ে নিল একবার। বিশ্বদীপ তাই দেখতে লাগলেন। প্রথম টুনটুনিটা উড়ে যাবার পর আর একটা টুনটুনি এল, সেও দোল খেল। তারপর বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক ভেসে এল—পিঁচ্, পিঁচ্, পিঁচ্। দ্বিতীয় টুনটুনিটা উড়ে গেল। সিংহকে কি বলতে এসেছিলেন তা ভুলে গেলেন বিশ্বদীপ। বিস্মৃতির একটা কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেল যেন। সেই কুয়াশার ভিতর দিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ হাঁটলেন। তারপর

একটা কলকণ্ঠের হাসিতে কুয়াশা মিলিয়ে গেল। বিশ্বদীপ দেখলেন—বধূসরা নদীর সেই বাঁকটায় তিনি এসেছেন যেখানে ঘনসবুজ মাঠের উপর কৃষ্ণচূড়াগাছটি সর্বাঙ্গে লাল ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় বসেছে সভা। হিল্লোলা হাসছে। রুদলবাবু তানপুরা কোলে নিয়ে ব'সে আছেন, তাঁর মুখেও হাসি। হাসিটা মনে হচ্ছে পাতার-ফাঁকে-ঝরে-পড়া সূর্যালোকের মতো। তিনজন পাহাড়ীও ব'সে আছে একধারে। হিল্লোলা হাসছে অসাধ্যসাধনের বাম উরুর উপর ব'সে। দীর্ঘকায় অসাধ্যসাধনের মুখে আশ্চর্য দীপ্তি ঝলমল করছে একটা। অসাধ্যসাধন বলছেন, "আমরা ব্রহ্মচারী, পাহাড়ে থাকি। এমন অপ্সরীর দেখা সেখানে কচিৎ পাই। বধূসরা যে মাছভাজা আজ আমাদের খাইয়েছেন, তা-ও আমাদের অদৃষ্টে বড় একটা জোটে না। যা দুষ্প্রাপ্য তা পেলেই আনন্দ হয়। সুতরাং আজ বড়ই আনন্দিত হয়েছি। যা অপ্রত্যাশিত তা পেলেই বোঝা যায় যে অপ্রত্যাশিত ব'লে কিছু নেই, এবং এই বোধই আনন্দজনক।"

রুদলবাবু বললেন, "আপনার এই ভাবটি বড় সুন্দর। যদি অনুমতি করেন এটা আমার তানপুরায় বাজাই।"

রুদলবাবু অদ্ভুত একটা সুর বাজাতে লাগলেন।

হিল্লোলা বলল, "আমরা নাচব।"

পাঁচজন অপ্সরাই নাচতে লাগল। বিশ্বদীপের মনে হ'ল পাঁচটা রং যেন নেচে বেড়াচ্ছে। শুধু নাচ নয়, গানের কলিও ফুটে উঠছে একটা মাঝে মাঝে। তাতে কথা নেই কেবল সুর আছে। সেই ভাষাহীন সুর যেন বলছে—আমি এসেছি তোমাদের মনে। মনেই অপরূপ হ'য়ে থাকব। ভাষায় বাঁধা পড়লেই কেউ হব সবুজ, কেউ নীল, কেউ হলুদ, কেউ লাল, কেউ গোলাপী—কিন্তু তা আমরা হ'ব না, ভাষার নাগালে ধরা পড়ব না কিছুতেই। মনে মনেই আমাকে দেখ, আমাকে শোন।

"বসুন"—চুপিচুপি কে যেন বললে।

বিশ্বদীপ তন্ময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন বধূসরা একটি মখমলের মোড়া এগিয়ে দিচ্ছেন তাঁর দিকে।

"বাঃ, এমন সুন্দর মখমল পেলেন কোথা থেকে—মনে হ'চ্ছে বিদেশী।"

"না, একেবারে দেশী। আমার যেখানটায় স্রোত নেই, সেখানে শ্যাওলা এসে জমে। তারা বেশী দিন বাঁচে না। তাদের বাঁচিয়ে রাখি আমি স্নেহ দিয়ে, কল্পনা দিয়ে। তারা একদিন আমায় বলেছিল প্রতিদানে কি তোমাকে দেব। আমাদের নিয়ে যা খুশি কর তুমি। অতিথিদের বসবার জন্য কয়েকটা আসন বানিয়েছি তাই। বসুন—।"

খুব মৃদুকণ্ঠে এ কথা ক'টি ব'লে বধূসরা আবার নেবে গেল নদীর জলে। নদীটা এতক্ষণ যেন নির্জীব ছিল, এবার সজীব হ'য়ে উঠল। তার প্রতিটি তরঙ্গ যেন আরও হিল্লোলিত হ'ল, প্রতিফলিত আলোকে জাগল নূতন ভাষা, নূতন হাসি। তারপর হঠাৎ গান থেমে গেল। থেমে গেল রুদলবাবুর বাজনা। সব বদলে গেল যেন হঠাৎ। বিশ্বদীপ

দেখলেন পাঁচটি সাদা ভুইচাঁপা সবুজ মাটি ভেদ ক'রে ফুটে উঠেছে। আর পাঁচটি একাগ্র হ'য়ে চেয়ে আছে অসাধ্যসাধনের দিকে। রুদলবাবু হাত জোড় ক'রে আছেন। তাঁর তানপুরাটাও মানুষের মূর্তি ধ'রে তাঁর পাশে ব'সে হাতজোড় ক'রে রয়েছে। সকলেরই দৃষ্টি অসাধ্যসাধনের দিকে।

অসাধ্যসাধন বললে, "বুঝেছি, তোমরা আমার কাছে পুরাণের গল্প শুনতে চাইছ। বেণ রাজার গল্পটা শোন তাহলে। তোমরা আজকাল মনে কর যে আজকালই বুঝি দুর্ধর্ষ বদমাশ লোক জন্মাচ্ছে, আগে বুঝি সব ভালো ছিল। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। রাবণের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তোমাদের ধারণা রাবণ রাক্ষসবংশের লোক ছিল, সে তো দুরাত্মা হবেই। কিন্তু বেণ রাক্ষসবংশের ছিল না। অত্রি বংশে অঙ্গ নামে যে সর্বশক্তিমান প্রজাপতি ছিলেন তিনিই বেণের বাবা। অবশ্য মায়ের দিকে গোলমাল ছিল কিছু। বেণের মা ছিলেন মৃত্যুর কন্যা সুনীথা। বেণ প্রজাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ঘোর অত্যাচারী আর অধার্মিক হ'য়ে উঠলেন। বৈদিক ধর্ম উঠিয়ে দিলেন একেবারে। বেদের অধ্যয়ন পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। দেবতারা সোমরস পান করতে না পেয়ে চ'টে গেলেন। বেণ সবাইকে বলতে লাগলেন, 'আমাকেই পূজা কর, আমিই যজ্ঞ, আমিই যজ্ঞকর্তা। যত হোম আমার উদ্দেশ্যেই অর্পিত হোক।' মরীচি প্রভৃতি মুনিরা অনেক বোঝালেন তাঁকে। কিন্তু বেণ তাঁদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে ক্রূর হাসি হেসে বললেন, 'আমার চেয়ে বড় ধর্মের স্রষ্টা আর কে আছে? আমিই বীর্য, আমিই তপস্যা, আমিই সত্য। আমার থেকেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়েছে। তোমরা অতি মূঢ়, তাই একথা বুঝতে পারছ না। আমি ইচ্ছা করলে সমস্ত সৃষ্টি জ্বালিয়ে দিতে পারি, বন্যায় প্লাবিত করতে পারি, আমি সবশক্তিমান। যজ্ঞটজ্ঞ ছেড়ে দাও, আমাকেই তোমরা পূজা কর। আমিই একমাত্র পূজ্য।'

বেণের কথা শুনে মহর্ষিরা বুঝলেন শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। লোকটা অতি পাজি। তখন তাঁরা ল'ড়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁকে পরাজিত ক'রে তারপর তাঁরা যা করলেন তা বড় অদ্ভুত। হরিবংশে লেখা আছে—তাঁরা তাঁকে নিগ্রহ ক'রে তাঁর বাম উরু মন্থন করতে লাগলেন। তাঁর মথ্যমান বাম উরু থেকে বেরুল অত্যন্ত বেঁটে আর অত্যন্ত কালো একটা পুরুষ। মুনিদের দেখে হাতজোড় ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইল। মানে, অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল। মুনিরা তাকে 'নিষীদ' এই বাক্য ব'লে বসতে বললেন। হরিবংশ বলছেন এর থেকেই তার 'নিষাদ' নাম হ'য়ে গেল এবং এই জন্যেই সে নিষাদবংশের জন্মদাতা হ'ল। অর্থাৎ বেণের মধ্যে যেটুকু পাপ ছিল তা বেরিয়ে গিয়ে সৃষ্টি করল বর্বর জাতির। মুনিগণ তখন বেণের দক্ষিণ পাণি মন্থন করতে শুরু করলেন। সেই দক্ষিণ পাণি থেকে আবির্ভূত হলেন মহারাজ পৃথু, হাতে আজগব ধনু, অঙ্গে কবচ, হাতে দিব্য শরমালা। মূর্তিমান অগ্নির ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন তিনি। বেণ ইহলীলা সংবরণ ক'রে স্বর্গবাসী হলেন। পৃথু তখন রাজ্যশাসনের ভার নিলেন। তিনি

সমস্ত প্রজাগণের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন ব'লে তাঁর রাজা নাম হ'ল। মহা-প্রতাপশালী ছিলেন তিনি, যখন সমুদ্রের দিকে যেতেন তখন সমুদ্রের জল স্তব্ধ কঠিন হ'য়ে স্থল হ'য়ে যেত, পাহাড়ের দিকে গেলে পাহাড়রা স'রে গিয়ে তাঁকে পথ ক'রে দিত, গাছের ডাল ভাঙা যেত না তাঁর রাজত্বে, চাষ ক'রে ফসল উৎপন্ন করতে হ'ত না, চিন্তা করলে ফসল আপনাআপনি গজিয়ে উঠত ভূমি ভেদ ক'রে। সমস্ত গাভীরা কামধেনু হ'য়ে গেল, পত্রে পত্রে মধু সঞ্চার হ'তে লাগল। তখন পিতামহ যজ্ঞে সুত ও মাগধগণের সৃষ্টি করলেন। দেবর্ষিগণ সেই সুত ও মাগধগণকে বললেন, তোমরা পৃথুর স্তুতিগান কর। তাদের কাছে পৃথুর সমস্ত গুণাবলীও বিবৃত ক'রে বললেন তাঁরা। তা শুনে সুত ও মাগধগণ পৃথুর স্তবগান করতে লাগলেন। স্তবগানে প্রীত হ'য়ে পৃথু রাজা পুরস্কৃত করলেন তাঁদের। সুতদের দিলেন অনূপদেশ আর মাগধদের দিলেন মগধ। তখন সমস্ত প্রজা আর মুনিগণ এসে বললেন, আমাদেরও বৃত্তি দাও। এ শুনে পৃথু ভাবলেন ধরিত্রী সমস্ত সম্পদের অধিকারিণী। তাঁর কাছ থেকেই সম্পদ আদায় ক'রে প্রজাগণকে দিতে হবে। তখন তিনি ধনুর্বাণ নিয়ে ধরিত্রীকে পীড়ন করতে শুরু করলেন। বসুন্ধরা যেখানেই যান সেখানেই দেখুন পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন কি ব্রহ্মলোকে গিয়েও তিনি নিস্তার পেলেন না। দেখলেন দেবতারা পর্যন্ত পৃথুর ভয়ে ত্রস্ত। তখন তিনি হাতজোড় ক'রে পৃথুকে বললেন, আমি স্ত্রীলোক, আমাকে হত্যা করা বা পীড়ন করা তোমার উচিত নয়। আমিই জগৎকে ধারণ ক'রে আছি। আমি বিনষ্ট হ'লে তোমার সমস্ত প্রজাই নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। আমি স্ত্রীলোক, আমাকে বধ ক'রে তোমার মতো পুণ্যাত্মা পাতকগ্রস্ত হবে একথা আমি ভাবতেও পারি না। তুমি কথাটা ভেবে দেখ। পৃথু বললেন—প্রাণহানি করলে পাতক হয় একথা আমি জানি। কিন্তু একজনকে নিধন করলে বা পীড়ন করলে যদি বহুলোকের উপকার হয় তাহলে তাতে পাতক তো হয়ই না, অনেক সময় পুণ্যও হয়। প্রজাগণের জন্তেই আমি তোমাকে হনন করতে উদ্যত হয়েছি। প্রজাপালন করা আমার কর্তব্য। তুমি যদি আমার প্রজাদের সঞ্জীবিত রাখ, তাদের সমস্ত অভাব যদি মিটিয়ে দাও, তাহলে তুমি আমার দুহিতা হবে। তোমাকে দোহন ক'রে আমি সকলকে প্রতিপালন করব। বসুন্ধরা বললেন, বেশ, আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে যদি দোহন করতে চাও, তাহলে আমার জন্ত একটি বৎস অনুসন্ধান কর। সেই বৎস এমন হওয়া চাই যাকে দেখে আমার ক্ষীর আপনি ক্ষরিত হবে। আমি এখন অসম হ'য়ে আছি, আমার দেহের কোথাও উঁচু কোথাও নীচু। তুমি আমাকে সর্বত্র সমান কর যাতে আমার ক্ষরিত ক্ষীর সর্বত্র সঞ্চারিত হ'তে পারে। এই শুনে বেণনন্দন পৃথু ধনুষ্কোটি দ্বারা সমস্ত পাহাড় পর্বত কেটে সমান ক'রে ফেললেন। আগে পৃথিবী বিষম ছিল এখন সব সমান হ'য়ে গেল। তাতে অনেক সুবিধা হ'ল। প্রজাদের বসতি বাড়ল। চাষ করবার মতো জমিও হ'ল অনেক। পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা ক'রে পৃথিবী থেকে শস্য দোহন করতে লাগলেন—"

এই সময় বাধা পড়ল। লম্ফ সিং হঠাৎ কোথা থেকে লাফিয়ে এসে পড়ল সকলের মাঝখানে। বলল, "আপনার এ গল্পের নীতি কি তা বুঝিয়ে দিন।"

অসাধ্যসাধন বললো, "সব ভালো গল্পের যা নীতি এরও তাই। অর্থাৎ পৃথিবীতে নতুন কিছু হচ্ছে না। একই জিনিস বার বার হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। নাম বদলে রূপ বদলে একই ব্যাপার ঘটছে বার বার। এখনও মহাপাপী বেণেদের জন্ম হচ্ছে, এখনও মহর্ষিরা তাঁকে মন্থন ক'রে তার ভিতর থেকে পৃথুর মতো শক্তিমান পুণ্যবান রাজাকে সৃষ্টি করছেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য এখনও শক্তিমান রাজারা পৃথিবীকেই দোহন করছেন। নূতন আর কি হচ্ছে। এই রকমই চলবে—।"

লম্ফ সিং চোখ পাকিয়ে বললে, "কেন ?"

অসাধ্যসাধন বললেন, "তুমি তো লাফাতে পার। একলাফে আকাশে চ'লে যাও। আকাশকে জিগ্যেস কর—কেন। সে হয়তো উত্তর দিতে পারবে। আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আমি সব 'কেন'র উত্তর জানি না!"

"বেশ—"

লম্ফ সিং একলাফে আবার বেরিয়ে গেল।

অসাধ্যসাধন তখন শ্রীমন্ত-প্রতিমের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি এবার তোমার গল্পটা শোনাও এঁদের।"

কিছুক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে থেকে অবশেষে শ্রীমন্ত বললেন, "আমি যা বলব তা যদি আপনারা নিছক গল্প ব'লে মনে করেন অর্থাৎ মিথ্যা বানানো কাহিনী মনে করেন তাহলে খুব দুঃখিত হব আমি। তবে একথাটাও আমি গোড়াতেই আপনাদের ব'লে দিতে চাই যে এটা সত্য কি না তা-ও আমি হলপ ক'রে বলতে পারব না। পাহাড়ের ওপারের মহাসমুদ্রে আমি যখন পাড়ি দিতে যাই, তখন সত্য-মিথ্যা সব একাকার হ'য়ে যায়। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনাগুলো সূর্যের আলো লেগে যখন রামধনুরঙের হ'য়ে যায়, আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল যখন লুকোচুরি খেলতে থাকে, কোন্‌টা মেঘ আর কোন্‌টা সমুদ্র যখন ঠিক করা মুশকিল হয়, তিমি মাছের দল যখন দূর সমুদ্রের জলে খেলা করে, আমার ময়ূরপংখীর সঙ্গে সমুদ্রের বড় বড় পাখীরা যখন বন্ধুত্ব করতে আসে, খাঁটি মুক্তোর মুকুট মাথায় প'রে মৎস্যনারীরা যখন সাঁতার দিয়ে বেড়ায়, জীবন্ত শঙ্খদের আভাস যখন ফুটে ওঠে ফেনার ঘূর্ণাবর্তে, তখন সত্যের হালকে আঁকড়ে থাকতে ভুলে যাই, অথচ আবার মাঝে মাঝে আবিষ্কার করি যে সত্যের হালকেই তো আঁকড়ে আছি, পঞ্চইন্দ্রিয় প্রত্যহ যে সত্য পরিবেশন করছে চেতনার কাছে তাকে অস্বীকার করবার সামর্থ্য তো নেই, আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি সেই নীলাম্বরী সুন্দরীকে যে সোনার কলস আঁকড়ে ধ'রে দিগন্তরেখায় আবির্ভূত হয় অগাধ সাগরজলে, প্রশ্ন জাগে—সাগরজলে সূর্য উঠছে, না ডুবছে? আবার তখন সত্য ও কল্পনা এক হ'য়ে যায়। সত্যের হালটা তখন যায় হারিয়ে, হাত বাড়িয়ে তাকে

খুঁজতেও আর ইচ্ছে করে না। অন্তর্যামী কিন্তু বুঝতে পারেন যা দেখছি তা সত্য। মিথ্যা হলেও সত্য।

আমি এবার পাড়ি দিয়েছিলাম পরশপাথরের খোঁজে। শুনেছিলাম সপ্তর্ষি নক্ষত্র-মণ্ডলের ছায়া যেখানে সাগরজলে কাঁপে না, তার একটু কাছেই নাকি পরশপাথরের দ্বীপ আছে। সে দ্বীপে যত পাথর আছে সবই নাকি পরশপাথর। দেখতে সাধারণ নুড়ির মতো, কিন্তু পরশপাথর। লোহারা সে অঞ্চল থেকে দূরে স'রে গেছে পাছে তাদের জাত চ'লে যায়। তারা একটু দূরে গিয়ে জমা হয়েছে সাগরজলে, সেখানকার জল শক্ত হ'য়ে গেছে তাই, তাই সেখানে সপ্তর্ষির ছায়া কাঁপে না। এই দ্বীপের খোঁজে বেরিয়ে-ছিলাম এইবার। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়লুম যেখানে সাতরকম ঝড় দাপাদাপি করছে কেবল। আমার ময়ূরপংখীটাকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলতে লাগল। আমি তখন বন্ধুটিকে বললাম—যার নাম আপনারা দিয়েছেন সাগর-সঙ্গম—তাকে ডেকে বললাম, ওহে ব্যবস্থা কর একটা। আমার বন্ধুটি সারাক্ষণ চোখ বুজে থাকে, বলে আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আমার সন্দেহ ও ঘুমায়। অনেক ঠেলাঠেলির পর ও উঠে বাঁশী বাজাতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড় তুফান শান্ত হ'য়ে গেল সব। সাতটি মুগ্ধ দৈত্য তখন আমার ময়ূরপংখীতে উঠে এসে বললেন, বাঁশীর অপূর্ব সুর শুনে আমরা শান্ত হ'য়ে গেছি বটে, কিন্তু আমরা দাপাদাপি করতে চাই। আমরা সাতটি ঋষির বিক্ষুব্ধ অন্তর। ঝড়ের মূর্তি ধারণ ক'রে বাইরে এসেছি। ওই দেখুন, একটু দূরে ওঁরা নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন। সত্যিই দেখলুম একটু দূরে সাতজন বিখ্যাত মহর্ষি হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁদের দাড়ি আর জটা বেয়ে জল পড়ছে। ময়ূরপংখীটা নিয়ে গেলুম তাঁদের কাছে। অনেক মিনতি করার পর তাঁরা ময়ূরপংখীতে উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার। তাঁরা এমন কৃচ্ছ্রসাধন করছেন কেন। বশিষ্ঠ বললেন, এখানে আমরা একটা কুষ্ঠদ্বীপ স্থাপন করেছি। সে দ্বীপে নিয়ম করেছি যাদের কুষ্ঠ হয়েছে তারা কুষ্ঠরোগীকে বিয়ে করতে পারবে না। সুস্থ একজনকে বিয়ে করতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ রকম নিয়ম করার মানে? পুলহ বললেন, মানে অতি সোজা। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা যে পাপী নয়, তাদের যে ঘৃণা করা উচিত নয়, এইটে প্রচলিত করবার জন্যে এ নিয়ম করেছি এখানে। আমি বিস্মিত হলাম। জিগ্যেস করলাম—এ রকম নিয়ম চলবে কি? এখানে কুষ্ঠরোগীই বা এল কোথা থেকে আর সুস্থ লোকই বা কে আছে? অত্রি বললেন—এই দ্বীপটি আমাদের শাসনাধীন। এখানে গন্ধর্ব আর গন্ধর্বীদের আবাস। তারা আমাদের হুকুম ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারে না। স্বর্গ-লোক থেকে স্বয়ং শচীদেবী ওদের খাবার পাঠান, স্বর্গলোকের শিল্পী ওদের পরিচ্ছদের ভার নিয়েছেন। ওদের কোনও কষ্ট নেই। এই সমুদ্রের মাঝখানে সন্ধ্যা-উষা ওদের রোজ প্রসাধন করে, জ্যোৎস্না আনে রূপের পসরা। ওরা মহাসুখে আছে, আর চিরকাল থাকবে যদি ওরা আমাদের শাসন মেনে চলে। মর্ত্যের পথে ঘাটে কুষ্ঠরোগীরা কিলবিল

করছে, তাদের কোন দোষ নেই অথচ তাদের দুঃখ অন্তহীন। এ দেখে বন্ধু পুলস্তর হৃদয় বিগলিত হ'ল। পুলস্ত তখন বলতে লাগলেন, এদের যদি আমরা ব্যবস্থা না করতে পারি, তাহলে আমাদের সমস্ত তপস্যা বৃথা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনের কাছেই গেলুম আমরা। তাঁরা বললেন, আপনারা মহাতপস্বী, আপনারা যা করবেন তাই হবে। তখন আমরা সমস্ত কুষ্ঠরোগীদের এনে আমাদের এই দ্বীপে জমা করলুম। অঙ্গিরা তখন বললেন, আর নিয়ম করলুম—রূপবান রূপবতী গন্ধর্ব গন্ধর্বীরা কুষ্ঠকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। ওদের রূপ অক্ষয়, কুষ্ঠের সংস্পর্শে এলে সে রূপ নষ্ট হবে না। বরং ওদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে কুষ্ঠ রোগীরা ভাল হ'য়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনা আছে। হয়তো ওদের সন্তান-সন্ততিরাও সুস্থ হবে। এই সব ভেবে আমরা এই নিয়ম করেছিলাম। মর্ত্যলোকে কোন কুষ্ঠরোগী দেখলেই আমরা পবনদেবের সহায়তায় তাকে এখানে নিয়ে আসি। মর্ত্যের গ্লানিময় জীবনের ক্লেদ থেকে মুক্ত হ'য়ে তারা এখানে বেশ সুখে থাকে। অনেক গন্ধর্ব গন্ধর্বীদের সঙ্গে বিয়েও হয়েছে তাদের। কিন্তু···। অঙ্গিরা থেমে গেলেন হঠাৎ। তাঁর চক্ষু দুটিতে রক্তাভা ফুটে উঠল। মরীচি তখন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। বললেন, কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে; গন্ধর্বীদের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করেছে। সে বলেছে আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কুষ্ঠরোগীকে বিবাহ করব না। সে গদ্যে বলেনি, কবিতায় বলেনি, গানে বলেছে। ওরা বিখ্যাত গাইয়ে। গানই ওদের ধর্ম। সুতরাং ওর দলে বড় বড় মুগ্ধ গন্ধর্ব জুটে গেছে। হাহা, হুহু, হংস, তুম্বুরু ওর পক্ষ নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে। এ আন্দোলন আমরা থামাতে পাচ্ছি না। আমাদের শক্তির অহংকার চূর্ণ হয়েছে, আমাদের তপোবল ভূলুণ্ঠিত। তাই ঠিক করেছিলাম সমুদ্রে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করব। কিন্তু তপস্যার জোরে আমরা এককালে অমর হয়েছিলুম, তাই আত্মহত্যা করতে পাচ্ছি না। সমুদ্রে ডুব-জল পাওয়া যাচ্ছে না। কি করব এখন বুঝতে পাচ্ছি না। ওই দেখ, ওই দেখ, সেই মেয়েটা আবার গান ধরেছে। গান দিয়েই ও পাগল ক'রে দেবে সকলকে। এর পর যা হ'ল তা আরও আশ্চর্য। আমরা দেখলাম সত্যিই অপরূপ একটি রূপসী তীরে ব'সে গান গাইছে। সে গানও আশ্চর্য গান। চোখের সামনে দেখলাম সে গানের শক্তিতে সাতজন ঋষি বিগলিত হ'য়ে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে গেলেন। ঠিক যেন বরফের চাঙড় গ'লে গেল সূর্যালোকস্পর্শে। আমিও গ'লে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনাদের সাগরসঙ্গম একটা বেসুরো ধমক দিয়ে বললে, খবরদার! রূপসী অন্তর্হিত হ'ল, গান থেমে গেল। বেসুরো ধমক হারিয়ে দিলে সুরকে। আমার মনে হয় ওই ঋষিরা যদি বেসুরো ধমক দিতে পারতেন তাহলে বোধহয় সব ঠিক হ'য়ে যেত। কিন্তু ঋষিরা তো বেসুরো কিছু করতে পারেন না। ছন্দ, সুর, তাল তাঁদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে। তাই মুশকিলে পড়েছেন—"

বিশ্বদীপ জিগ্যেস করলেন, "যে মেয়েটিকে দেখলেন সে ঠিক কি রকম দেখতে বলুন তো।"

"সে রূপসী। এর বেশী আর কিছু বলতে পারব না। আমাদের ভাষার ওইখানেই অক্ষমতা। কারো ঠিক রূপ সে বর্ণনা করতে পারে না!"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল একটা সবুজ কুয়াশা যেন চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। আর সেই সবুজ কুয়াশার মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকির দল। নানারঙের আলো বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে তাদের গা থেকে। হঠাৎ কানের কাছে তিনি একটা সুড়সুড়ি অনুভব করলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন মুরুব্বীর গোঁফের ডগাটা তাঁর কানে এসে ঠেকেছে। মুরুব্বী চুপিচুপি বলল, "ও জানে না, আমি জানি। মেয়েটি বিদুলার মতো দেখতে। সম্ভবত বিদুলাই—"

সবুজ কুয়াশাটা মিলিয়ে গেল। বিশ্বদীপ বুঝতে পারলেন স্বপ্ন নেমেছিল তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে, আর তাঁর চিন্তাগুলো হ'য়ে গিয়েছিল জোনাকির দল। সব মিলিয়ে গেল। তারপর তাঁর মাথায় কে যেন হাতুড়ি মারল। কড় কড় ক'রে ন'ড়ে উঠল কড়াটা।

চার

"আসতে পারি?"

"আসুন।"

পাঠকজি এসে প্রবেশ করলেন। পাঠকজিকে দেখে মনে হয় না যে তিনি ধূর্ত লোক। তাঁর মুখখানা একতাল মাখনের মতো। মনে হয় গালে আঙুল দিলেই বুঝি আঙুলটা ডুবে যাবে। খুব সামান্য কটা রঙের গোঁফ আছে। দাড়ি নেই। ভুরুও কটা। ছোট ছোট চোখ। চোখের তারা ধূসর। থ্যাবড়াথোবড়া, বেঁটে, থলথলে গোছের লোকটি। মেরজাই গায়ে দেন। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। কপালের মাঝখানে একটি টিপ। সেটিও ধূসর রঙের। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। কপাল খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু বেশ উঁচু। মনে হয় যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি যখন চুপ ক'রে থাকেন তখনও তাঁর দুই গালের নীচের দিকটা এবং থুতনির পিছন দিকটা থরথর ক'রে কাঁপে। মনে হয় তাঁর কোন চিন্তা যেন বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে কিন্তু তিনি আত্মপ্রকাশ করতে দিচ্ছেন না। সেইজন্যই এই কম্পন।

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম একটু আগে। ডাক্তার ঘোষাল যে আর্টিস্টটিকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি বিজ্ঞাপনের জন্য একটা ছবি দিয়ে গেছেন। এই দেখুন। এটা কি পছন্দ হবে আপনার?"

পাঠকজি তোতলা। সহজে কথা বলেন না। বক্তব্য প্রায়ই লিখে দেন। পকেট থেকে তিনি কাগজ কারবন পেপার আর পেন্সিলটি বার করলেন। তিনি সাধারণতঃ

লিখে উত্তর দেন। যা লেখেন তার কারবন কপি রেখে দেন নিজের কাছে। ছবিটি দেখে লিখলেন—"এ ছবি অতি বাজে হয়েছে। বিজ্ঞাপনে দিলে আমাদের সুনাম কলঙ্কিত হবে। ফেরত দাও, এ চলবে না।"

বিশ্বদীপকে তখন বলতে হ'ল, "আমি ছবিটি কিনে ফেলেছি।"

পাঠকজি একবার নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন বিশ্বদীপের দিকে। তারপর লিখলেন—"তাহলে রেখে দাও। কিন্তু আমার পরামর্শ, ওটা আর বাঁধিয়ো না। বৈঠকখানাতেও টাঙিও না। কাঁটি ঠুকে বাথরুমে টাঙিয়ে রেখো। কত টাকা দিয়েছ ওকে—?"

বিশ্বদীপকে একটু ইতস্ততঃ ক'রে অবশেষে সত্যি কথাটাই বলতে হ'ল—"একশ' টাকা দিয়েছি।" পাঠকজি আর একবার নিষ্পলক হ'য়ে গেলেন। তারপর লিখলেন—"রথচাইলড্ শুনেছি নোট জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ফতুর হয়েছিলেন কি না জানি না। তোমাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি রথচাইল্ডের মতো টাকা তোমার নেই। দু'দিনেই কাত হ'য়ে যাবে।"

বিশ্বদীপ তাকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন—"তিনি আরও ছবি এঁকে দেবেন। ছবি-পিছু তিনি একশ' টাকার বেশী নেবেন না। নিজে মুখে তিনি একথা ব'লে গেলেন।"

পাঠকজি লিখলেন—"আমাদের আর ছবির দরকার নেই। বিজ্ঞাপনের জন্য খুব ভালো দুটি ছবি পেয়েছি। একটি হ'চ্ছে উদীয়মান সিনেমা-তারা নিখুঁতকুমারীর। তিনি 'পরিষ্কার' সাবান হাতে ক'রে হাসছেন। নিজে হাতে লিখেও দিয়েছেন, 'পরিষ্কার' সাবান মেখে আমি আনন্দ পেয়েছি। আমার মাঝে মাঝে ব্রণ হ'ত। এ সাবান মাখার পর থেকে আর হয়নি। দ্বিতীয় ছবিটি দিয়েছেন স্বামী গহনানন্দ। উঠতি-স্বামীদের মধ্যে উনি প্রধান আজকাল। তিনি 'পরিষ্কার' সাবান সম্বন্ধে লিখেছেন—'পরিষ্কার' সাবানে শুধু দেহ নয়, মনও নির্মল হয়। এ সাবান মাখার পর হতে আমার দুই শিষ্যের মন ব্রহ্মমুখী হয়েছে। সাবানটি সত্যই উৎকৃষ্ট। নিখুঁতকুমারীকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি আর স্বামীজিকে প্রণামী দশ টাকা। এঁদের ছবি ছাপিয়ে তার নীচে এঁদের অভিমত ছাপিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস তাতে খুব কাজ হবে।"

পাঠকজি দুটি ফোটোগ্রাফ বার ক'রে বিশ্বদীপকে দিলেন। বিশ্বদীপ দেখলেন নিখুঁতকুমারী সাবানটি হাতে নিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। গহনানন্দ গম্ভীর। বিশ্বদীপ বুঝলেন নবনীবাবু বোধহয় পাঠকজির কাছে আর কলকে পাবেন না। একটু বিমর্ষ হলেন। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না তো লোকটা? ঘোষাল কি—এ চিন্তা কিন্তু বেশীদূর এগোল না। পাঠকজি নিজেই একটুকরো কাগজে লিখে প্রশ্ন করলেন—"ডাক্তার ঘোষাল যে আর্টিস্টকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল তার নাম কি নবনীবাবু?" বিশ্বদীপ মাথা নাড়তেই তিনি আবার লিখলেন—"তিনি আমার কাছে গিয়েছিলেন

হাত দেখাতে। লোকটি ভালো। কিন্তু তাঁর সন্তান-সম্ভাবনা নেই। ওইটে জানতেই গিয়েছিলেন। ওঁকে আমরা অন্যভাবে কাজ দিতে পারব। আমাদের সাবানের প্যাকেটের উপর যে ছবি থাকে, কিংবা বাক্সে যে ছবি থাকে তা উনি আঁকতে পারেন। বলেছি সাধারণ ফুল লতাপাতাই যেন আঁকেন। বেশী কেরদানী করলে খারাপ হ'য়ে যাবে। আমাদের সাবানটা তো ঠিক বিলাসের জিনিস নয়। ওটা হ'ল এক দৈব ওষুধ। অম্বর স্বপ্নে পেয়েছিল ওটা, আফ্রিকার জঙ্গলে সে ছিল যখন, যখন তার নাক মুখ সব গলে গলে পড়ছিল, যখন এক আমি ছাড়া তার আর কেউ সঙ্গী ছিল না, তখন একদিন রাত্রে হঠাৎ সে উঠে বললে—স্বপ্নে ওষুধ পেয়েছি, শীগ্‌গির টুকে নাও। দেশে ফিরে গিয়ে এ দিয়ে সাবান তৈরি কোরো। আর বিলিও। সেইগুলো দিয়েই এই সাবান তৈরি করিয়েছি। কিন্তু বিলোতে পারিনি। ভেবে দেখেছি বিলোলে কুবেরের ঐশ্বর্যও শেষ হ'য়ে যায়। তাই এটা নিয়ে সামান্য লাভ রেখে ব্যবসা ফেঁদেছি। বিশেষ ক'রে তোমার জন্যেই আরও এসব করতে হয়েছে আমাকে। অম্বর বলেছিল তুমি দেশের জমিজমা নিয়ে থাকবে আর তার জমানো যে পঁচাত্তর লাখ টাকা আছে তা দিয়ে সাবান তৈরি হবে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম তুমি বরাবর বিলেতে মানুষ হয়েছ, তুমি ওই ঘোর পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে না। তাই এখানেই সাবানের ব্যবসাটা গ'ড়ে তুললুম। এখানে তোমাদের যে ক'খানা বাড়ি আছে তার থেকে মাসে হাজার টাকার বেশী আয় হয় না। তোমার যে রকম খরচের হাত, ভেবে দেখলুম, ও টাকায় তোমার কুলুবে না, তাই সাবানের ফ্যাকটারি করেছি। তবে এর থেকে খুব বেশী লাভ করি না। এসব কথা তোমাকে আগে বলিনি, আজ বললুম, কারণ ক্রমে ক্রমে তোমাকে সবই বলতে হবে। তোমার বাবা তাঁর যথাসর্বস্ব আমার নামে লিখে দিয়ে গেছেন, তা আমি তোমার নামেই শেষ পর্যন্ত লিখে দেব। কিন্তু তার আগে সব কথা বলতে হবে তোমাকে—।"

পাঠকজি একটু ঝুঁকে খস খস করে লিখে চলেছিলেন। লেখা শেষ করে বিশ্বদীপকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন। প'ড়ে চমকে উঠলেন বিশ্বদীপ।

"বাবার কথা তো আপনি কিছুই বলেননি আমাকে! বলেননি কেন!"

পাঠকজি লিখলেন, "বলবার সময় আসেনি এখনও। সময় এলেই বলব। তুমি যে সমস্ত সম্পত্তির মালিক এইটেই এখন লোকের কাছে প্রচার থাকুক। লাউপুরের কোনও খবর রাখ?"

"এখুনি আতুবাবু এসেছিলেন। পাঁচ হাজার টাকা চাইছেন, সেখানে নাকি খুন জখম দাঙ্গা নানারকম কাণ্ড হয়েছে। ভাবছি টমসমকে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।"

পাঠকজি লিখলেন, "তা দাও। আতুবাবুর সঙ্গে আমিও দেখা করব। এখানে যদি আবার আসে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। ফ্যাকটারিতে যে স্ট্রাইক হয়েছে তার কি করছ? তোমার টোটোবাবু কিছু করতে পারলেন?"

বিশ্বদীপ বললেন, "না, আমি নিজেই দেখা করব তাদের সঙ্গে ভেবেছি। আপনি উঠছেন নাকি!"

ঘাড় নেড়ে পাঠকজি হঠাৎ উঠে চ'লে গেলেন।

অভিভূত হ'য়ে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ। পাঠকজিকে আরও রহস্যময় মনে হ'তে লাগল। নিজের বাবা মাকে তাঁর মনেও নেই। তাঁরা তাঁকে লণ্ডনে টমসন পরিবারের কাছে রেখে বরাবর বিদেশ বাস করেছেন। যেখানে থাকতেন তার কোনও ঠিকানা কখনও দেননি তাঁকে। টমসন পরিবারের কাছে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতেন পাঠকজি। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও জমা ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর নামে। তিনি যখন ওখানকার পড়া শেষ ক'রে প্রাণীতত্ত্ব (Zoology) নিয়ে গবেষণা করছেন তখন পাঠকজি একদিন এসে হাজির হলেন ইংলণ্ডে—বললেন তোমার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। মা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছাক্রমেই এসব সংবাদ তোমাকে দেওয়া হয়নি। তাঁরা তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে চাননি। কেন চাননি তাও তাঁরা প্রকাশ করতে মানা ক'রে গেছেন। যে বাবা মাকে কখনও দেখেননি তাঁদের জন্য একটা অস্পষ্ট কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না বিশ্বদীপের। টমসন সাহেবের মাকেই তিনি মায়ের মতো ভক্তি করেছেন। তিনিও মারা গেছেন কিছুদিন আগে। কিন্তু পাঠকজি এ কি কথা বললেন আজ? তাঁর বাবার হাত পা গ'লে গ'লে পড়ছিল? চালমুগরার তেল এ সাবানের প্রধান উপকরণ···তাহলে কি ? আর ভাবতে পারলেন না বিশ্বদীপ। আর একটা কথাও হঠাৎ মনে হ'ল—পাঠকজি তাঁর নামে ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা জমা ক'রে দিয়ে বলেছিলেন, এ টাকা তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। তোমার বাবা আমাকে তোমার গার্জেন নিযুক্ত ক'রে গেছেন। তোমার হয়েই আমি সাবানের কাজটা শুরু করছি। তোমার লাউপুরের জমিজমার ব্যবস্থা তুমিই কর। পাঠকজি কিন্তু আজ বললেন যে পঁচাত্তর লাখ টাকা আছে আমার? এত টাকার কথা এতদিন তো বলেননি তিনি! কোথায় আছে এ টাকা? কার নামে আছে? হঠাৎ একটা অস্পষ্টতার কুয়াশায় ঘিরে এল চারিদিক। লাল কুয়াশা। তারপর সেই লাল কুয়াশার উপর পড়ল নীলের আভা। লাল কুয়াশা মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল মানসপুরের আকাশ। নীলকান্ত মণির মতো তার রং। সেই ফুল-ওলা গাছটা নেই। বধূসরা নদীর ধারে নানা রঙের স্বপ্নের মধ্যে ব'সে আছে তিন পাহাড়ী। আর কেউ নেই। মনে হ'চ্ছে কতকগুলো রঙ যেন ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের মতো। তাদের ভিতর দিয়ে পাহাড়ী তিনজনকে দেখা যাচ্ছে। তারপর আপিস মিলিয়ে গেল। ট্রামের শব্দ থেমে গেল হঠাৎ।

পাঁচ

হঠাৎ একরাশ সবুজরঙের মেঘকে ঠেলে বেরিয়ে এলেন সাগরসঙ্গম। এগিয়ে এসে একমুখ হেসে বললেন, "একি মশায়, হঠাৎ পালিয়েছিলেন কোথা আমার সঙ্গে দেখা না করেই। বধূসরাও নানারকম খাবার নিয়ে আপনার খোঁজ করছিলেন। কিন্তু আপনাকে পাওয়া গেল না। বধূসরা কি করবেন ভাবছিলেন, এমন সময় হিল্লোলা এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসল। বলল, ওর খাবারটা আমাকে দিন, আমি খেয়ে ফেলি। পরে ওকে ফিরিয়ে দেব। অবাক হলেন বধূসরা। বললেন, খেয়ে ফেললে আবার ফিরিয়ে দেবে কি করে? হিল্লোলা এক পাক নৃত্য ক'রে বলল, এবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হবে, তখন ওকে একটা চুমু দেব। খাবার খেলে যে আনন্দ পেত তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পাবে। হিল্লোলা হাসতে হাসতে খেয়ে ফেললে আপনার খাবারগুলো। সে এখনি আসবে। দোলনায় দুলতে গেছে। আপনি হঠাৎ ডুব মেরেছিলেন কোথা? আমার একটা ভারী মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে এবার। শুনুন সেটা।"

"বলুন। চলুন, ওই ঘাসের উপর বসা যাক গিয়ে।"

ঘাসের উপর গিয়ে বসলেন তাঁরা। বিশ্বদীপের মনে হ'ল যেন দামী কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে কে।

"কি গল্প আপনার, বলুন এবার—"

"গল্প কেন হ'তে যাবে। আমরা যা বলি তা সত্যি কথা। আপনার শ্রীমন্ত যখন পরশপাথরের দ্বীপ খুঁজতে ব্যস্ত আমি তখন ময়ূরপংখীর একধারে চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। ও বলছে বটে ঝড় তুফান অনেক হয়েছে, কিন্তু আমি জানি কিচ্ছু হয়নি। যা কিছু হয়েছে তা ওর মনে। পরশপাথরের দ্বীপ পাওয়া যাবে কি যাবে না এই অনিশ্চয়তাই ওর মনে ঝড় তুলেছিল। হয়তো সেই মানসিক অস্বস্তির সময় সপ্তর্ষিদের দেখে থাকবে, আমি কিছু জানি না। আর আমার মনে হয় কুষ্ঠদ্বীপের ব্যাপারটাও ওর কল্পনা। ওর সন্দেহ হয়েছে যে ওকে কুষ্ঠব্যাধি আক্রমণ করেছে। একবার ও চিল্কা হ্রদে ঢুকে পড়েছিল মাছের সন্ধানে। সেখানে এক কুষ্ঠরোগীর বাড়িতে ছিলও কিছুদিন। তাই ওর ধারণা হয়েছে যে ওরও বুঝি কুষ্ঠ হয়েছে। তাই ও নানারকম কল্পনা করে—"

"শ্রীমন্ত কোথায় গেল, তাকে দেখছি না—"

"সে রুদলবাবুর কাছে গেছে। একবার চীনদেশে গিয়েছিল বুঝলেন, সেখানে চায়ের নেশাটি রপ্ত ক'রে এসেছে। যেখানে চায়ের সন্ধান পায় সেইখানেই চ'লে যায়। রুদলবাবুর বাড়ির চা নাকি উৎকৃষ্ট। আমারও যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কেমন একটা বিশ্বাস হ'য়ে গিয়েছিল, আবার আপনি আসবেন।"

"আর অসাধ্যসাধন?"

"সে মুরুব্বীর সঙ্গে গেছে তোড়-জোড় পণ্ডিতের কাছে। ওই আর একটা লোক। সারাজীবন ধরে তোড়-জোড়ই করছে। নানারকম বই যোগাড় করেছে, কিন্তু পড়া আর হ'য়ে উঠছে না। কেবল তোড়-জোড়, তোড়-জোড় আর তোড়-জোড়। অসাধ্য-সাধন খবর পেয়েছে ওর কাছে গণেশসংহিতা ব'লে অমূল্য গ্রন্থ আছে নাকি একটি। মুরুব্বী ভরসা দিয়েছে যোগাড় ক'রে দেবে। সেই সন্ধানে গেছে।"

"এইবার শুনি আপনার অভিজ্ঞতাটা।"

"শুনবেন, শুনবেন, শুনবেন ?"

হঠাৎ সাগরসঙ্গম মহানন্দে তুড়ি দিয়ে দিয়ে নাচতে লাগল। তারপর হঠাৎ থেমে বলল, "কেউ আমার কথা শুনতে চাইছে এ ঘটনা ঘটলে এমন আনন্দ হয়। আসলে, জানেন, পৃথিবীতে কেউ কারো কথা শোনে না, সবাই নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত। সবাই তাই অন্যমনস্ক, মানে, নিজের কথাটাও শুনতে পায় না, শোনবার চেষ্টা করছে অনবরত। অপরের কথায় হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে যায় কেবল। একরকম পুতুল আছে দেখেছেন, একটু টোকা দিলেই মাথা নাড়তে থাকে—আমরা অনেকটা সেই রকম। কারো কথা শুনছি না, বুঝছি না, মাথা নেড়ে যাচ্ছি কেবল। আপনি সত্যি শুনবেন কথাটা ?"

"শুনব।"

"তাহলে চোখ বুজুন। আজকে আকাশের যে রকম নীল জ্যোতি, আর বাঁশবনে সবুজের যে রকম ঝলক তাতে ঠিক অন্যমনস্ক হ'য়ে যাবেন। চোখটা বুজে ফেলুন।"

বিশ্বদীপ সত্যিই চোখ বুজলেন।

সাগর-সঙ্গম যেন বাঁশীর সুরে কথা বলতে লাগলেন। মনে হ'তে লাগল যেন দূর স্বপ্নলোক থেকে ভেসে আসছে তাঁর কথাগুলি।

"দেখুন, এবারেও আমি কমলে কামিনী দেখেছি। নীল সমুদ্র আর সবুজ সমুদ্র যেখানে মিশেছে এবার সেখানে হঠাৎ দেখলাম অসংখ্য কমল ফুটে আছে। সাধারণ কমল নয়, খুব বড় বড়। তার একটার উপর যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি খুব রূপসী, কিন্তু সেকেলে কমলে কামিনীর মতো নয়। পরনে শাড়ি নয়, ব্রিচেস্। কোমরে রিভলভার। গায়ে মিলিটারি কোট। পায়ে বুট। হাতে একটা দূরবীন, সেই দূরবীনেই চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সেই দূরবীনের দুটো লেন্স থেকে শব্দ বেরুচ্ছে—কোথায়, কোথায়, কোথায়। আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। এবার হাতী নেই। কোথায়, কোথায়, কোথায়—এই শব্দ ক্রমশঃ আকাশ ছেয়ে ফেললে। তারপর এরোপ্লেনের শব্দে রূপান্তরিত হ'ল সেটা। চেয়ে দেখি দূরে এরোপ্লেন আসছে, এক আধটা নয়, অসংখ্য। শীতকালে হাঁসের দল আসে যেমন, তেমনি। ক্রমে ক্রমে কাছে এল তারা। খুব কাছে এসে পড়ল যেটা তার থেকে বম্ পড়ল। আর কমলে কামিনী হাঁ ক'রে গিলে ফেললে সেই বম্টা। তারপর ক্রমাগত বোমাবর্ষণ হ'তে লাগল, আর তার সবগুলো গিলে

ফেলতে লাগল কমলে কামিনী। আশ্চর্য কাণ্ড! শুনলে বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু স্বচক্ষে দেখলুম। তারপর দেখলুম চতুর্দিক আলোয় আলো হ'য়ে গেছে। চোখ ধাঁধানো আলো। যতরকম আলো কল্পনা করতে পারেন—সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, গ্যাসের আলো, নিয়নের আলো সব রকম আলো মিলে মিশে সে এক আলোর সমুদ্র। এরোপ্লেন নেই। সেই বিরাট আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কেবল কমলে কামিনী। আলোর প্রতিমা। তার রূপের বর্ণনা করবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ আমার বুকের ভিতর থেকে একটা প্রণামের নদী বেরিয়ে পড়ল কলকল ক'রে, আর লুটিয়ে পড়ল গিয়ে সেই আলোক-প্রতিমার পায়ের উপর। প্রণাম-নদীর জল রামধনু রঙের। সেই নদী কমলে কামিনীর পায়ে লুটিয়ে পড়তেই অদ্ভুত রূপান্তর হ'ল একটা। আলোর কমলে কামিনী আবার পুরোনো কমলে কামিনী হ'য়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল —আমরাই তোমাদের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। তোমাদের পুরাণে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে সমুদ্রের যত বিষ মহাদেব গলাধঃকরণ ক'রে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের চোখে পড়েনি। বিশ্বের যত বিষ আকণ্ঠ পান করেছে ঘরে ঘরে তোমাদের মেয়েরা, তাদের শুধু কণ্ঠ না, সর্বাঙ্গ নীল হ'য়ে গেছে সে বিষে! তোমরা দেখেও তা দেখ না। তোমরা চিরকাল হাতী, অবয়ব প্রকাণ্ড, কিন্তু চোখ ছোট। নিজেদের স্বার্থের জন্য ওদের দু'পায়ে দ'লে যেতেও তোমাদের আপত্তি নেই। তাই আমি এতকাল হাতী গিলেছি। কিন্তু এখন দেখছি পুরুষদের প্রতাপ বোমার রূপ ধারণ করেছে। তাই এখন বোমা গিলছি। তোমাদের আমরাই বাঁচাব! আমরা, মানে, মেয়েরা। তোমরা আগে ছিলে হাতী, এখন হয়েছ বোমা। সব গিলে ফেলব আমি। এই শুনে হঠাৎ আমি বাঁদর হ'য়ে তড়াক তড়াক ক'রে লাফাতে লাগলাম। কতক্ষণ লাফিয়েছিলাম জানি না, লাফাতে লাফাতে বোধহয় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম আপনার শ্রীমন্ত আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। সূর্যাস্তের রং পড়েছে আমার মুখে। দিগন্তহীন এক সমুদ্র দিয়ে হুহু ক'রে চলেছে আমাদের ময়ূরপংখী। সমুদ্রের জল লাল। বাস, আমার কথাটি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়োলো। বাস, চললাম। শ্রীমন্ত আর অসাধ্যসাধনও এসে গেছে। ও বাবা শ্রীমন্ত প্রজাপতির জুড়ি হাঁকিয়ে আসছে দেখছি।"

বিশ্বদীপ সত্যিই দেখলেন দুটি বড় বড় বহুবর্ণবিচিত্র প্রজাপতি একটি ছোট্ট গাড়ি টেনে আনছে। গাড়িটা মনে হ'ল মেঘ আর রং দিয়ে তৈরি। খুব হালকা। যেন ভেসে আসছে।

"রুদলবাবু এত সব অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। আশ্চর্য! অথচ লোকটা মহাপুরুষ। যে যা চাইবে তক্ষুনি দিয়ে দেবেন। অসাধ্যসাধনের কাণ্ড দেখুন—"

বিশ্বদীপ দেখলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ অসাধ্যসাধন একটি চলন্ত বৃক্ষের মতো

আসছেন। আর তাঁর পিছনে সারি সারি কুলি—প্রত্যেকের মাথায় বইয়ের বোঝা। গণেশসংহিতা।

"বাস, চললুম—"

সাগরসঙ্গম, শ্রীমন্ত, অসাধ্যসাধন সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তারপর বিশ্বদীপ অনুভব করলেন একটা প্রকাণ্ড কাশগাছ ঠিক তাঁর পাশ থেকে উঠে দুলছে, আর কাশের ফুল তাঁর ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে স'রে যাচ্ছে লীলাভরে। কাশফুল তো ছিল না এখানে, হঠাৎ এল কোথা থেকে!

"আমি হিল্লোলা। আপনার ধার শোধ ক'রে দিলুম।"

কলকণ্ঠে হেসে মূর্তিমতী হ'ল হিল্লোলা।

"আর বাকী চারজন কোথায়?"

"মুরুব্বী তাদের নিয়ে ঘুরছেন পোকার ধান্দায়। সবুজ-ফুটকি পোকাটা খুব শিকারী, সে ছোট ছোট পোকা ধ'রে খায়। মুরুব্বীর ইচ্ছে তাকে নিরামিষ খাওয়াবেন। তাতে সে রাজী হবে কেন? গঙ্গাফড়িং জংবাহাদুরও পোকা ধরে খায়। সে সাফ ব'লে দিয়েছে নিরামিষ খেতে পারবে না। মুরুব্বী তাকে হালুয়ার লোভ দেখিয়েছিলেন, সে রাজী হয়নি। এখন মুরুব্বী এক নতুন ফন্দী ধরেছেন। সবুজ-ফুটকি পোকাটি পোকা বটে, কিন্তু প্রেমিকও। আমাদের পাঁচজনকেই সে ভালবেসে ফেলেছে। মুরুব্বী চেষ্টা করছেন আমরা যেন ওকে নিরামিষাশী হবার জন্য অনুরোধ করি। মুরুব্বীর বিশ্বাস আমাদের অনুরোধ ও রাখবে। আর ও যদি আমাদের অনুরোধ মেনে নিয়ে হালুয়া খায় তাহলে জংবাহাদুরও শেষ পর্যন্ত খাবে। কারণ জংবাহাদুর ওকে খাতির করে খুব। লাল-ফুটকিও ওদের সঙ্গে জুটেছে। আমাকে যেতে বলেছিল, আমি যাইনি। আমি ওসব অসংগত অনুরোধ করতে পারব না। আমি ভাবলাম তার চেয়ে তোমার ঋণটা শোধ ক'রে দিই। আচ্ছা, তুমি অমন গোমড়া মুখ ক রে আছ কেন বল তো?"

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "মনের ভিতরে খানিকটা জমাট অন্ধকার হ'য়ে আছে। কিছুতেই সেখানে আলো পৌঁছচ্ছে না—"

"আলো সব জায়গায় পৌঁছতে পারে না তো। মাঝে মাঝে অন্ধকারই আলো হ'য়ে যায়। আপনি সোমরস যোগাড় করতে পারবেন? সোমরসের অদ্ভুত ক্ষমতা। সব অন্ধকারকে সে আলো ক'রে দেয়।"

"হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, শ্যাম্পেন, শেরি যোগাড় করতে পারি, কিন্তু সোমরস কোথা পাব। বেদে তার কথা পড়েছি—"

"আমি এনে দেব একদিন। পদ্মফুলের মধুতে শরৎ-শশীর জ্যোৎস্না পড়লে সোমরস হয়। খুব ভোরে পদ্মফুল থেকে সংগ্রহ করতে হয় তা প্রজাপতি হ'য়ে। আপনারা যাকে 'মথ' বলেন তারা এ বিষয়ে ওস্তাদ। তাই তাদের সর্বাঙ্গে অত রং। আমার কয়েকটি

'মথ'-বন্ধু আছে, তারা আমাকে আলোর পাত্রে দিয়ে গেছে খানিকটা। আমি নিয়ে আসব একদিন!"

"আমি কবে আসব তার তো ঠিক নেই—তুমি কবে আসবে।"

"আমারও ঠিক নেই। তবে জানি, এলেই দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি মনের নল সঙ্গে ক'রে আনবেন। সোমরস এমনি ঢক ঢক ক'রে খাওয়া যায় না। মনের নল ডুবিয়ে আস্তে আস্তে খেতে হয়। ওই ওরা আসছে, ওদের কাছে একথা বলবেন না যেন। তুফানীটা ভারী হিংসুটে, ও হয়তো এখুনি আপনাকে আলাদীনের প্রদীপ দিতে চাইবে। ওর কাছে আছে সেটা—"

একটি সরু শুকনো ডাল হাতে ক'রে মুরুব্বী এল। এসেই বিশ্বদীপকে বললে, "একটা সুসংবাদ আছে। রুদলবাবু বলেছেন এবার ধান কাটবেন না। বলেছেন ধান যখন আপনি মাটিতে প'ড়ে যাবে তখন তা কুড়িয়ে নেবেন। বুলবুলিদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। বুলবুলিরা পেট ভ'রে খেয়ে নেবে। তারপর যা বাঁচবে তা তারা রুদলবাবুর গোলায় জমা করবে। এ এক মস্ত ব্যাপার হ'ল। সবুজ-ফুটকি এমন একটা মহত্ত্বের উদাহরণ দেখেও হালুয়া খেতে রাজী হ'চ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না!"

সবুজ-ফুটকি ডালটায় বসেছিল। সে টিক্ টিক্ টিক্ ক'রে বললে, "আমি বুঝতে পারছি সব। কিন্তু এ-ও আমি বুঝতে পারছি তোমার হালুয়া যত ভালই হোক ও খেলে আমি বাঁচব না। এই অপ্সরীরা আমাকে অনুরোধ করছেন, এঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করবার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু আমি বলছি হালুয়া খেলে আমি বাঁচব না।"

তুফানী, তুহিনা, তরলা আর হাওয়া সমস্বরে ব'লে উঠল—"তুমি ম'রে প্রমাণ কর যে সত্যি তুমি আমাদের ভালবাস। তুমি সত্যিই যদি ম'রে যাও আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। তখন অবশ্য তোমার এ চেহারা থাকবে না। তুমি হবে অপ্সর। তোমার গায়ের রং হবে গোলাপী, মাথার চুল আর গোঁফ হবে বেগুনী, গায়ে ফুটকি থাকবে না, থাকবে জরির পোশাক, তখন টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ ক'রে কথা বলতে পারবে না, কণ্ঠে তোমার তখন সা রে গা মা খেলবে! ইন্দ্রের সভাতেও তোমার ডাক পড়তে পারে—"

সবুজ-ফুটকি বললে, "আমি কিন্তু সবুজ-ফুটকিই থাকতে চাই। অপ্সরী হবার বাসনা নেই। তোমাদের চুলে, কাঁধে, বুকে এক আধবার যদি বসতে দাও, তাহলেই আমি ধন্য হব।"

মুরুব্বী চুপ ক'রে ছিল। বললে, "তুমি তাহলে পোকাই খাবে, হালুয়া খাবে না?"

সবুজ-ফুটকি বললে, "যে পোকাদের আমরা খাই তাদের জন্তে আপনার দরদ কেন বুঝতে পারছি না—"

মুরুব্বী বললে, "দরদ নয়, কর্তব্য। লাখখানেক পোকার এক ডেলিগেশন এসেছিল আমার কাছে—"

সবুজ-ফুটকি বললে, "ওদের আমরা খাই ব'লে আপনারা বেঁচে আছেন। ওদের স্বভাব তো জানেন ? ওরা সুযোগ পেলেই আপনাদের কানে কিংবা নাকে ঢুকে যাবে। আচ্ছা, রুদলবাবুর কাছে চলুন, তিনি যা বলেন তাই করব।"

"রুদলবাবু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। তিনি তোমাকে হালুয়া খেতে বাধ্য করবেন না কখনও। কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি খাও তাহলে খুশী হবেন।"

অপ্সরীরা সবাই আবদেরে মেয়ের মতো ব'লে উঠল—"চলুন, আমরা রুদলবাবুর কাছেই যাই, সেখানে ভালো লবেঞ্চুস আছে—"

"তোমরা যাও তাহলে, আমি যাচ্ছি ধানক্ষেতে। তাদের খবরটা দিতে হবে। আমি পরে যাব।"

মুরুব্বী চ'লে গেল।

বিশ্বদীপের মনে হ'ল একটা তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি যেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে।

সবুজ-ফুটকিও উড়ে চ'লে গেল আর তার সঙ্গে উড়ে গেল অপ্সরীরাও পাঁচটি ফুলের পাপড়ির মত। তারপর বিশ্বদীপ হঠাৎ দেখতে পেলেন সিংহ সামনে দাঁড়িয়ে। তার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত সিংহবদনে অদ্ভুত করুণ একটা মিনতি ফুটে রয়েছে। তার কাটা ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখের দুটো পাতাই লোমহীন, দুটো পাতার কোলে কোলে সূক্ষ্ম ক্ষতের চিহ্ন। মনে হ'চ্ছে লাল কাজল পরিয়ে দিয়েছে কে যেন! রক্তের কাজল। মিনতিভরা দৃষ্টি তুলে সে নীরব হ'য়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে বলল, "আমায় মাপ করুন আপনি। আপনাকে যা বলেছি তা সত্যি কথা। কিন্তু বড় অপ্রিয়। এ অপ্রিয় সত্য ব'লে আপনার মনে ব্যথা দেবার অধিকার আমার নেই। তাছাড়া সত্য কি তাও তো জানি না। কুৎসিতকে ঘৃণা করবার প্রবৃত্তি যিনি দিয়েছেন তিনিই তো ভগবান, তিনিই তো চিরসুন্দর, তিনিই করুণাময়। তিনিই একদিন কুৎসিতকে সুন্দর ক'রে নেবেন, আর যখন তা সম্ভব হবে তখনই পোকা-লাগা বাঁকা বেগুনটা সুস্থ সতেজ বেগুনের পাশে নিজের জোরে নিজের দাবিতে দাঁড়াতে পারবে। বক্তৃতা ক'রে তা হবে না। মানুষ সুন্দরকে চিরকাল ভালবাসবে। আর কুৎসিতকে চিরকাল ঘৃণা করবে। হঠাৎ কোনদিন কোনও মানুষ হয়তো সুন্দর কুৎসিতের পার্থক্য ভুলে যাবে, তখন সে হয়তো কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করবে, আলিঙ্গন করবে, সেবা করবে, যেমন করেছিলেন যীশু, শ্রীচৈতন্য, গান্ধী, সে মানুষ আসবে হয়তো আবার, কিন্তু সে আসবে যদি আমরা তাকে সৃষ্টি করি। আমাদের অন্তরের বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থ কামনাই সৃষ্টি করে ওদের। কেবল বক্তৃতায় কোনও কাজ হবে না। সেই মহামানবকে সৃষ্টি করবার ভার আমাদেরই, কারণ আমরাই আতুর। অপ্রিয় কথার ঢিল ছুঁড়লে তিনি আসবেন না। আমি অন্যায় করেছি আজ। আমাকে ক্ষমা করুন।"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল সিংহের চোখ বেয়ে রক্তের অশ্রু ঝরছে। তারপর—ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।

ছয়

"হ্যালো, কে, আমি বিশ্বদীপ কথা বলছি। ও, ওরা সব ফ্যাকটারিতে জড়ো হয়েছে। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি এখুনি—"

টোটো ফোন করছিল। বিশ্বদীপ তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি অনিমেষ চৌধুরীকে ব'লে গেলেন—"যদি কোন দরকারী কাজ থাকে তাহলে আমাকে ফ্যাকটারিতে ফোন কোরো। ফোন না পেলে আমি সোজা বাড়ি চ'লে যাব। আদুবাবু যদি আসেন তাঁকে আমার বাড়িতে যেতে বোলো।"

বিশ্বদীপের গাড়িটি বেশ দামী। অস্টিন সমারসেট্। বিলেত থেকে আসবার সময় কিনে এনেছিলেন। নিজেই চালান। ক্লীনার রণছোড় দেও, ভালো ড্রাইভার, তাকে ড্রাইভারেরই মাইনে দেন বিশ্বদীপ, কিন্তু এখনও গাড়ি চালাতে দেন না। রণছোড়ের ঘুমোবার শক্তি অসাধারণ। যে-কোনও স্থানে, যে-কোনও অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। বিশ্বদীপ গাড়ির ভিতর তাকে ঘুমুতে দেন না। গাড়ি 'লক্' করা থাকে। গ্যারেজের ভিতর গাড়িরই একপাশে মাটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল রণছোড়। গ্যারেজেই সে ছোট বিছানা এনে রেখেছে। পুরোনো শতরঞ্জি একটি আর ছোট ময়লা একটি বালিশ। বিশ্বদীপ এসে দেখলেন রণছোড়ের নাক ডাকছে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন তার দিকে। সুস্থ সুন্দর চেহারা। অথচ যে সব পুষ্টিকর খাদ্য খেলে শরীর ভালো থাকে ডাক্তাররা বলেন, তা ওর ভাগ্যে বোধহয় জোটে না। মাইনে তো একশ' পঁচিশ টাকা। বিরাট সংসার পালন করতে হয়। দিনের বেলা ছাতু খায়, রাত্রে ভাত কিংবা রুটি; মাছ-মাংস কচিৎ কদাচিৎ। অথচ আমরা···। গাড়ি খোলার শব্দে রণছোড় তড়াক ক'রে উঠে পড়ল এবং সেলাম করল মিলিটারি কায়দায়। এটা সে বরাবরই ক'রে থাকে। সকালে গাড়ি পরিষ্কার করা এবং যখন তখন মিলিটারি কায়দায় সেলাম করা —এই তার একমাত্র কাজ। বিশ্বদীপ ওকে মিলিটারি পোশাকও কিনে দিয়েছেন। খাকী স্যুট পরেই থাকে সর্বদা।

ফ্যাকটারিতে পৌঁছে দেখলেন টোটো গেটের কাছে মুখ সূচালো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বদীপের গাড়ি থামতেই সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "ওরা সব ফ্যাকটারির পিছনের দিকে বড় হলটায় ব'সে আছে। আমি কতকগুলো পয়েণ্ট লিখে রেখেছি। সেগুলির উপর লক্ষ্য রেখে আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলবেন। ওরা খুব ঘুঘু, একটু ফাঁক পেলেই ক্যাঁক ক'রে চেপে ধরবে। বিশেষত ওই ধাকড়টা।" টোটো একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল বিশ্বদীপকে। বিশ্বদীপ সেটার দিকে একনজর চেয়ে দেখলেন, তারপর সেটা প্যাণ্টের পকেটে পুরে ফেললেন।

হলের ভিতরে যেতেই ধাকড় এগিয়ে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। ধাকড় বলিষ্ঠ

বেঁটে লোক। মাথাটা প্রকাণ্ড। কুচকুচে কালো থ্যাবড়া নাক। চোখ ছোট ছোট। সে হিন্দীতে যা বলল তার বাংলা মর্ম হচ্ছে এই—

"আমাদের মধ্যে দুটো দল হ'য়ে গেছে। একদল বলছে মাইনে তিনগুণ ক'রে দিলে আমাদের আর কোন দাবি নেই। এদের দলপতি হচ্ছে রামু। রামুর দলে চিকনি, চন্দা, মিশরি, সনঝা আর শুকরি আছে। আর আমার যেটা দল তারা বলছে আমাদের মাইনে দ্বিগুণ হলেও চলবে। কিন্তু আমাদের অসুখের সময় আপনাকে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। জিনিসপত্রের দাম যদি আরও বেড়ে যায়, তাহলে সেই অনুসারে আমাদের মাইনেও বাড়াতে হবে। আমার দলে আছে কেশিয়া, খুদরি, কাবা, শামা, শামার মা বুলিয়া, খুদরির মা আর বিবি। মহুয়া কোনও দলে যায়নি। আমাদের সবাইয়ের কথাই আপনি শুনুন এবং ইন্‌সাফ মাফিক যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

বিশ্বদীপ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, "আমি আমার কথাটাই আগে বলি, তারপর তোমাদের কথা শুনব। প্রথমেই তোমাদের ব'লে দিচ্ছি যে যদিও আমি দামী পোশাক পরি, মোটরে চড়ি এবং আরও নানারকম বিলাসিতা করি, কিন্তু আমি তোমাদেরই মতো একজন মজুর মাত্র। জন্ম থেকেই যে আওতায় আমাকে মানুষ হ'তে হয়েছে সেই আওতার প্রভাব আমি অতিক্রম করতে পারিনি। বিলেতে জন্মেছি, বিলিতী স্কুল কলেজে লেখাপড়া করেছি, বিলিতী ধরনে মানুষ হয়েছি, তাই আমার চালচলন হয়তো একটু বিলিতীগোছের হ'য়ে গেছে। যদিও এতে দোষের কিছু নেই, তবু এর জন্য আমি লজ্জিত। আমি তোমাদের মতো হ'তে চেষ্টা করছি, হয়তো একদিন তাই হব, কিন্তু একটু দেরি লাগবে। এইবার আমাদের ব্যবসার কথা। এই 'পরিষ্কার' সাবানের ব্যবসাতে ঠিক কত লাভ হয় আমি জানি না। পাঠকজি জানেন। তোমাদের মাইনে বাড়িয়ে দিলে আমাদের ব্যবসা টিকবে কি না তাও আমি জানি না, পাঠকজি জানেন। কারণ যদিও ব্যবসা আমার নামে কিন্তু পাঠকজিই আসল মালিক তিনি একটু আগে আমাকে বলছিলেন যে খুব কম লাভ রেখে তিনি এই সাবানের ব্যবসা করেন। কম লাভ রাখার উদ্দেশ্য যে এ সাবান বহুরকম চর্মরোগ, এমন কি কুষ্ঠরোগেও উপকারী। আমার বাবা স্বপ্নে এই সাবান তৈরি করবার উপাদান পেয়েছিলেন। আমাদের যদি অফুরন্ত টাকা থাকত তাহলে বিনালাভে এ সাবান আমরা বিতরণ করতে পারতুম। কিন্তু তত টাকা আমাদের নেই। যদি বিনামূল্যে বিতরণ করি তাহলে কিছুদিন পরে এ ফ্যাকটারি বন্ধ ক'রে দিতে হবে। প্রতিটি সাবান তৈরি করতে চার আনা ক'রে খরচ হয়। আমরা বাজারে এটা বারো আনা ক'রে বিক্রি করি। যে আট আনা লাভ হয় তার থেকে ফ্যাকটারির জিনিসপত্র, ওষুধ, বিদেশী মেশিন এই সব কেনা হয়। আমি আপিসের কাজকর্ম দেখি ব'লে মাসে পাঁচশ' টাকা পাই। পাঠকজি কিছু নেন না। তোমাদের যা মাইনে দেওয়া হয় তা বাজারের

'রেট' অনুসারেই দেওয়া হয়। তোমরা অন্য কোথাও এর থেকে যদি বেশী পাও, তোমাদের আটকে রাখার অধিকার আমাদের নেই। তবে আমার একটা প্রস্তাব আছে। সেটা তোমাদের বলছি, পাঠকজিকেও বলব। আমাকে এবং পাঠকজিকে নিয়ে আমাদের ফ্যাকটারিতে সবসুদ্ধ একশ' বারোজন কাজ করে। এর মধ্যে দু'জন মেথর আর ঝাড়ুদার আছে। আমার ইচ্ছে আমরা এই ব্যবসার সবাই মালিক হই। এর থেকে যা লাভ হবে তা আমরা সবাই সমানভাবে ভাগ ক'রে নেব। আমার মনে হয় তাহলে ব্যবসাটা ভালো চলবে, আর তোমাদেরও কোনও ক্ষোভ থাকবে না। আমাদের আপিসে আমি আর পাঠকজি আছি, তোমাদের দিক থেকে দু'জন প্রতিনিধি সেখানে রাখতে পার। ব্যবসার কাজ ঠিকমতো চলছে কি না তা তারা দেখবে এবং সেজন্য আলাদা পারিশ্রমিক পাবে। আমাকে তোমরা যা দেবে তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। আমার এ প্রস্তাবটা তোমরা বিবেচনা ক'রে দেখতে পার।"

ধাকড় ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমরা হুজুর ব্যবসার কিছু বুঝি না। নগদ মজুরির কথা বুঝি। এ মজুরিতে আমাদের পোষাচ্ছে না, সেই কথাই আপনাকে বলছি।"

"অন্য কোথাও কি তোমরা এর চেয়ে বেশী মজুরি পাচ্ছ ?"

"এখনও পাইনি। আপনি যদি না দেন, আমাদের খুঁজতে হবে।"

"আর কারো কিছু বলবার আছে ?"

রামু এগিয়ে এল। সে এতক্ষণ পাগড়ি বেঁধে ব'সে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে পাগড়িটা খুলে কাঁধে রেখে হাত দুটি জোড় ক'রে নমস্কার করলে বিশ্বদীপকে। তারপর বলল, "হুজুর, আমরা হিসেব ক'রে দেখেছি যে আমরা এখন যা মজুরি পাচ্ছি, তার তিনগুণ না পেলে আমাদের সংসার চলবে না। আপনি শুধু যদি চাল ডাল তেল নুন লকড়ির হিসাব চান তাহলে এখনই আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারি সেটা। আমি আমার বাড়ির খরচার হিসাবটা লিখে এনেছি।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না। আমি তোমার কথা বলব পাঠকজিকে। কিন্তু আমাদেরও দেখতে হবে তোমাদের সব দাবি মিটিয়ে ব্যবসা টি'কবে কি না। তাই বলছিলাম তোমরাও এ ব্যবসার অংশীদার হও।"

"ব্যবসার কিছু বুঝি না আমরা। আমি প্রথমে চাল ডাল মসলার একটা দোকান করেছিলাম, কিন্তু আমার গোতিয়া আর দোস্তরা সে দোকানকে খেয়ে ফেলল, সবাই কর্জা চায়। কর্জা না দিলে ঝগড়া হয়, লোকে নিন্দা করে। তাই দোকান করলে কর্জা দিতেই হয়। আপনাদের এ সাবুনের ব্যবসা বড় ব্যবসা, লাখ লাখ টাকার 'হিলডোল' হয়, আমরা মুরুখ্ লোক, আমরা এসব ব্যাপারে কোন পাত্তা পাব না। ধাকড় ঠিকই বলেছে, আমরা মজুর, নগদ মজুরির কথাই বুঝি—"

এবার মহুয়া দাঁড়াল ভিড়ের মধ্যে। সে পিছন দিকে ছিল। দু'হাত দিয়ে পথ ক'রে

নিয়ে সামনের দিকে এল। ছিপছিপে রোগা মেয়ে। রূপসী বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় তা নয়। কপালের উপর একটা কাটা দাগ। রং খুব কালো নয়, মেটে মেটে। ছোট ছোট চোখ, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি। নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। গাছ-কোমর ক'রে শাড়ির আঁচলটা বাঁধা। হাতে কয়েকগাছ লাল গালার সরু চুড়ি। সে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললে, "বিশ্বদীপবাবু, আপনি যে এত মহৎ তা আমি জানতাম না। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আপনি আমাদের সবাইকে আপনার ব্যবসাতে সমান অংশীদার করতে চাইবেন। আপনার প্রস্তাবে আমি সর্বান্তঃকরণে রাজী আছি। আর আমার বিশ্বাস আমি এদেরও রাজী করাতে পারব!"

বিশ্বদীপ একটু অবাক হ'য়ে গেলেন।

"তুমি ফ্যাকটারিতে কি কাজ কর?"

"আমি কেমিষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে মিস্টার সিন্‌হার অ্যাসিস্‌টেণ্ট,—"

"ও। কতদূর লেখাপড়া করেছ তুমি?"

"ঢাকায় আই. এস. সি. পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর দেশ ভাগ হ'য়ে গেল। বাবা মা মারা গেলেন, আমি অনেক কষ্টে এখানে পালিয়ে এসেছিলাম। পড়াশোনার আর সুযোগ পেলাম না। তাই হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই করছি। আপনার ফ্যাক-টারিতে ছ'মাস কাজ করছি।"

"তুমি আমার এ প্রস্তাবে রাজী আছ শুনে খুশী হলাম। তোমাদের কষ্ট দিয়ে আমি নিজে একা বড়লোক হব এরকম ইচ্ছা আমার নেই। দেখ তুমি এদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে। আমিও পাঠকজিকে ব্যাপারটা বলব।"

বিশ্বদীপ উঠে পড়লেন।

ধাকড় তখন বললে—"কি ঠিক হ'ল তাহলে বাবু—"

"তোমাদের মাইনে বাড়াব। তোমাদের সংসার যাতে সচ্ছল হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। তবে কি উপায়ে সেটা হবে তা এখনি বলতে পারছি না। তিনটে প্রস্তাব এসেছে. তিনটেই আমি পাঠকজির সঙ্গে আলোচনা করব। তোমরাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর। ক'রে তোমাদের মতামত আমাকে জানিও।"

মহুয়া বলল, "আমার সব কথা এখনও আপনাকে বলা হয়নি। আমরা যদি আপনার ব্যবসার অংশীদার হই, তাহলে আমাদের দৈনিক খরচা আমরা পাব তো? তা না পেলে আমাদের সংসার চলবে না। আমরা রোজ যা নেব তা আমাদের প্রাপ্য লাভের অংশ থেকে আপনারা কেটে নেবেন এই ধরনের একটা ব্যবস্থা হ'লে ভালো হয়।"

"বেশ, পাঠকজিকে এ কথাও বলব। পাঠকজি নামে ম্যানেজার, কিন্তু আসলে তিনিই মালিক।"

বিশ্বদীপ বেরিয়ে এলেন। টোটো বাইরে অপেক্ষা করছিল।

সে বলল—"এঃ, আপনি তো সব মাটি ক'রে দিলেন! ঝাড়ুদার, মেথর, কেমিস্ট

সব সমান অংশীদার হবে। এ কি বললেন আপনি ওদের! তাছাড়া ব্যবসা আপনার, আপনি ওদের সমান অংশ দিতে যাবেন কেন! দিস্‌ ইজ্‌ সিলি!"

বিশ্বদীপ এমন একটা মুখভাব করলেন যেন কিছুই শুনতে পাননি। সোজা গাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। রণছোড় সেলাম ক'রে কপাট খুলে দিল। বিশ্বদীপ গাড়িতে চ'ড়ে ব'সে স্টার্ট দিলেন।

টোটো কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দু'হাত উল্‌টে বলল—"বাঃ বাবা!"

সাত

ওয়ালটেয়ারে বিতুলার সঙ্গে শ্যামল সোম তো গিয়েইছিল আরও গিয়েছিল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'জন, অনন্ত রায় আর অনঙ্গ সেন। এদের ইতিহাসটা আগে বলি। অনন্ত আর অনঙ্গ দু'জনেই শ্যামলের বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে ভবানীপুরে এক স্কুলে পড়ত। তারপর ওদের ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায় অনেক দিন। শ্যামল যখন বিলেত থেকে ঘুরে এল তখনও অনেকদিন ওদের পুনর্মিলন ঘটেনি। হঠাৎ একদিন চিৎপুর স্ট্রীটে চেক-চেক লুঙ্গি-পরা এক রুটি-ওলাকে দেখে শ্যামল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আভাসে অনন্তর মুখটা তার মনে পড়ল। সেই রকম হৃষ্টপুষ্ট গোল মুখ, চোখ দুটি টানা-টানা। বাল্যকালে মুখটা কচি কচি ছিল মনে হ'ল, এখন তাতে গোঁফ দাড়ি গজিয়েছে। শ্যামল আবার সাইন-বোর্ডটার দিকে চেয়ে দেখল—"সব রকম ভালো পাউরুটি এখানে পাওয়া যায়।" ডাক্তার তাকে ব্রাউন ব্রেড খেতে বলেছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু শ্যামবাজার অঞ্চলে ও জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, "এখানে কি ভালো ব্রাউন ব্রেড পাওয়া যাবে?"

"যাবে।"

"দিন একটা—"

পাউরুটি নিয়ে দাম দিয়ে শ্যামল প্রশ্ন করল—"একটা কথা জিগ্যেস করছি যদি কিছু মনে না করেন? আপনার নাম কি অনন্ত?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো—"

"আমার নাম শ্যামল সোম। মনে হ'চ্ছে এককালে আমরা একসঙ্গে পড়তাম ভবানীপুরে।"

"ও, সারটেনলি—"

পরক্ষণেই হুড়মুড় ক'রে এগিয়ে এল অনন্ত। টেবিল থেকে একথাক পাঁউরুটিও প'ড়ে গেল হুড়মুড় ক'রে। এগিয়ে এসেই আলিঙ্গনবদ্ধ ক'রে ফেললে সে শ্যামলকে। তারপর দুজনে ভিতরে গিয়ে বসল।

"তুই তো বিলেত গিয়েছিলি ? অনন্ত বলেছিল—"

"হাঁ। মাসখানেক আগে ফিরেছি—"

"কি হ'য়ে ফিরেছিস ?"

"ভ্যাগাবণ্ড। Swollen-headed vagabond. বার দুই ফেল ক'রে একটা বি. এ. ডিগ্রি যোগাড় করতেই ফতুর হ'য়ে গেলাম। তারপর পালিয়ে আসতে হ'ল। একটা মেয়ে এইসা পিছুতে লাগল যে আর কিছুদিন থাকলেই 'জালবদ্ধ বিহঙ্গম' হ'য়ে যেতাম। তা হবার ইচ্ছে ছিল না, স'রে পড়লাম। এখানে এসে প্রাইভেট ট্যুসনি করছি। এখনও বন্দরে পৌঁছুতে পারিনি।"

"বন্দর মানে ?"

"বাঙালীর ছেলের একটি মাত্র বন্দরই তো আছে—চাকরি।"

"তুই কবি হয়েছিস দেখছি।"

"বেকার লোকেরাই সাধারণতঃ কবি হয়। তুই কি করছিস ?"

"এই দোকান। সিক্স্থ ক্লাসের পর স্কুল ছেড়ে দিতে হ'ল। বাবা মা দু'জনেই গত হলেন। কলিমুদ্দিনের একটা রুটির দোকান ছিল, সেইখানে সে আমাকে ফেরিওলা বাহাল ক'রে নিলে। তোমরা আজকাল মুসলমানের নাম করলেই চটে যাও। কিন্তু আমি ওই কলিমুদ্দিন আলীর কাছে কৃতজ্ঞ। অনেক আত্মীয়স্বজন আছে আমার, অনেক ঘোষ বোস মিত্তির গুহ চাটুজ্যে বাঁড়ুয্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, কেউ সাহায্য করেনি। সাহায্য করেছিল ওই গোখাদক কলিমুদ্দিন। তার দোকানেই কাজ শিখি। সে-ই আমাকে রোজ এক টাকা ক'রে দিত। তারপর সে-ই বলল—'তুমি সব কাজ শিখেছ, এইবার চিৎপুরের দিকে নিজের একটা দোকান কর। বেশী রোজগার হবে।' ঠিক সেই সময় রোগা লম্বা সুঁটকো এক ভদ্রলোকও জুটে গেলেন। তিনি বললেন—'আমার মেয়েকে যদি বিয়ে কর, আমি তোমার দোকান ক'রে দেব।' কলিমুদ্দিনই বরকর্তার কাজ করলে। বলল, 'চিৎপুরে একটা ছোটখাটো দোকান করতে হ'লে হাজার পাঁচেক টাকা চাই। সে টাকাটা নগদ অগ্রিম জমা দিতে হবে। আপনি যদি সেটা অনন্তর নামে পোস্টাফিসে জমা ক'রে আমার কাছে 'পাস' বুকটা এনে দেন, বাকিটা আমি ক'রে দেব।' কলিমুদ্দিন গোপনে আমাকে বললে, 'ও বাপের মেয়ে সুন্দরী হবে না। তবু বিয়ে কর, যদি টাকাটা দেয়। পছন্দ না হয় পরে আর একটা বিয়ে কোরো। যদি টাকা রোজগার করতে পার আওরতের অভাব হবে না।' কলিমুদ্দিনের জীবনদর্শন মোটেই জটিল নয়।"

এমন সময় আর একজন খদ্দের এল। তাকে পাঁউরুটি দিয়ে অনন্ত আবার এসে বসল শ্যামলের কাছে।

অনন্ত বলল, "তোর সময় নষ্ট করিয়ে দিচ্ছি না তো ?"

"মোটেই না। সন্ধ্যাবেলা একটা ট্যুসনি করতে হয়, সমস্ত দিন চাকরির চেষ্টায়

টো-টো ক'রে ঘুরতে হয়। অঢেল সময় আমার হাতে। যখন খুব বিরক্তি ধরে তখন চ'লে যাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে। সেখানে কোন গাছতলায় ব'সে কবিতা লিখি। আমি এখানে বসলে তোর কোনও অসুবিধা হবে কি না বল। আমার কিছু করবার নেই।"

"আমার কিছু অসুবিধা হবে না। অনঙ্গকে একটা ফোন ক'রে আসি দাঁড়া। পাশের দোকানেই ফোন আছে। সে-ও চ'লে আসুক। তোর কথা শুনলেই লাফিয়ে চ'লে আসবে সে।"

অনন্ত ফোন ক'রে ফিরে এল।

"তুই থাকিস কোথা?"

"একটা মেসে। একটি ঘরের জন্যে মাসে তিরিশ টাকা দিত হয়। বাকি ৪৫ টাকায় আমার সমস্ত মাস চলে। ভাল ক'রে চলে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে—"

অনন্ত একটু হাসল।

শ্যামল তখন বলল, "তোর ক'বছর বিয়ে হয়েছে?"

"সাত বছর—"

"তোর বউয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ ক'রে আসতে হবে। কোথায় তোর বাসা—"

"বাসা বউবাজারে। কিন্তু আমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখ পাবি না। তার চেয়ে তোকে নয়নতারার কাছে নিয়ে যাব একদিন। তাকে তোর ভাল লাগবে।"

"সে আবার কে?"

"চলতি সামাজিক ভাষায় সে আমার 'রক্ষিতা'। কিন্তু আসলে সে-ই আমার সব। তার কাছে গিয়েই শান্তি পাই। আমার বউ খুব কালো, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সর্বদাই যেন ফোঁস ফোঁস করছে, মানুষ নয়, যেন কেউটে সাপ। মুখ সর্বদাই তোলো হাঁড়ি। ভাবটা সে যেন কোনও কুইন ভিকটোরিয়া, এতদিন বাপের ঘর আলো ক'রে বসেছিল, আমি যেন তার বাপকে ঠকিয়ে বিয়ে করেছি তাকে। সর্বদা মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে থাকে! কাঠ বাঁজা। দিনরাত রেডিও, সিনেমা, মাসিকপত্র আর নবেল নিয়ে ব'সে আছে। সংসারের কুটোটি নাড়ে না। যেদিন রাঁধবার লোক আসে না, সেদিন বাজার থেকে খাবার কিনে আনতে হয়। দোকান থেকে ফিরে গিয়ে কোনওদিন তাঁর হাসিমুখ দেখিনি। কোনদিন সে আমার জন্যে একটু খাবারও তৈরি ক'রে রাখেনি। কোনদিন জল গামছা এগিয়ে দেয়নি। দোকান থেকে ফিরে গিয়ে মনে হ'ত যেন জেলে গিয়ে ঢুকলাম। আজকাল দোকান থেকে ফিরে নয়নতারার বাড়িতে যাই। বাড়ি ফিরি রাত্রি বারোটার পর। নিজের ঘরটিতে তালা লাগিয়ে রেখে আসি। সেইটি খুলে শুয়ে পড়ি। নয়নতারার ওখানেও শুতে পারতুম। কিন্তু কলিমুদ্দিন মানা করলে। বললে—যত রাতই হোক, বাড়ি ফেরা

চাই। তা না হ'লে ঢি ঢি প'ড়ে যাবে। তোকে নয়নতারার কাছে নিয়ে যাব। দেখবি কি সুন্দর ব্যবহার! সত্যিকার মেয়েমানুষ। নরম মন, নরম ব্যবহার, সেবা করবার জন্ম সর্বদাই ব্যগ্র। নিজে হাতে আমার জন্মে রোজ নতুনরকম খাবার তৈরি ক'রে রাখে। আমি গেলে নিজে হাতে আমার পায়ের জুতো খুলে, পা ধুইয়ে দেয়। জামা গেঞ্জি খুলে ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দেয়। চুল আঁচড়ে দেয়—তুই হাসছিস? যা বলছি, একটিও মিথ্যে নয়।"

"গানটান গাইতে পারে?"—শ্যামল জিগ্যেস করল।

"পারে হয়তো। আমি ওসব জিগ্যেস করিনি। নয়নতারাও আমাকে কিছু বলেনি। দেখ ভাই, আমরা একটু যত্ন-আত্তি পেলেই বর্তে যাই। গানটান বুঝিও না, চাইও না। না চাইতেই তোমাদের রেডিওর দৌলতে যা পাচ্ছি দিনরাত তাই যথেষ্ট। কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে!"

"অনঙ্গ কি করছে—?"

"সে এম. এ. পাস করেছিল। কিন্তু হয়ে গেল থার্ড ক্লাস। চাকরি জুটল না। আমি কিছু টাকা দিয়েছিলাম, সে নিজেও কিছু যোগাড় করেছিল ধারধোর ক'রে। সামান্য কিছু ক্যাপিটাল নিয়ে বইয়ের দোকান করেছে সে। ভালই চলছে এখন।"

এরপর উপর্যুপরি আরও কয়েকজন খদ্দের এল অনন্তর। তারপরই ট্যাক্সি ক'রে এসে পড়ল অনঙ্গ। অনঙ্গকে দেখে শ্যামল অবাক। মাথায় কদমছাট চুল। গোঁফ দাড়ি কামানো। টিকোলো নাক। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি। পায়ে বিদ্যেসাগরী লাল চটি একজোড়া। চোখ দুটো জলজল করছে। শ্যামলের মনে হ'ল এ যেন একটা আবির্ভাব! অনঙ্গ এসেই শ্যামলকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, "আমি তোর কথা রোজ ভাবি। তুই বিলেতে থেকে যে কবিতা দুটো আমাকে পাঠিয়েছিলি তা ওয়াণ্ডারফুল। এখনও কবিতা লিখছিস কি?"

"ও ছাড়া আর তো কিছু করবার নেই। অনেকগুলো খাতা ভ'রে গেছে—"

"আমাকে দিস। আমি ওর থেকে বেছে বেছে ছাপব।"

"ছাপবি?"

সত্যিই অবাক হ'য়ে গেল শ্যামল সোম। তার কবিতা ছাপবে অনঙ্গ!

"দেখ ভাই অনঙ্গ, তুমি আমার বন্ধু। তুমি যদি পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতে চাও, তাহলে আমি যেমন তোমাকে তা করতে দেব না, তেমনি আমার কবিতাও তোমাকে ছাপতে দেব না। কবিতা কেউ আজকাল পড়ে না এদেশে। বিশেষত আমার কবিতা কেউ পড়বে না, আমি 'ঘোড়া'র সঙ্গে 'মোড়া' বা 'থোড়া' মেলাবার জন্মে কবিতার ভাবকে দুমড়ে দিতে পারি না। আর তোমাদের আধুনিক কবিদের আবছা ঝাপসা কবিতা লেখার ক্ষমতাও আমার নেই। সুতরাং আমার

কবিতা বাজারে কাটবে না। এমন কি পোকাতেও কাটবে কি না সন্দেহ। সুতরাং তোমাকে এ গহ্বরে ঠেলে দিতে আমি রাজী নই।"

অনঙ্গ বলল, "দেখ ভাই শ্যামল, গহ্বরে না ঢুকলে অনেক সময় রত্ন পাওয়া যায় না, তোমাকে এ কথা ব'লে খোসামোদ করতে চাই না। তোমার কবিতা হয়তো রাবিশ, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো I know my businoss. ওসব কথা পরে হবে, এখন তুই কি করছিস বল।"

সেদিন তিন বন্ধুর পুনর্মিলনের পর একটা জিনিস ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল। ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল মৃত্যু ছাড়া আর কেউ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। অনন্তর ভুঁড়ি হয়েছিল একটু, লুঙ্গির কসিটা বার বার খুলে যাচ্ছিল তার। সে কসিটা আবার ভাল ক'রে গুঁজে বলল, "আমার আর একটা প্রস্তাব আছে শোন। তুমি যতদিন না ভালো একটা চাকরি যোগাড় করতে পারছ ততদিন আমি তোমাকে বিনাপয়সায় রোজ একটা ক'রে ব্রাউন ব্রেড দেব। না, না, একটা কথা শোন। আমি মহত্ব প্রকাশ করছি না, আমি সেই ধার শোধ করবার চেষ্টা করছি যা কখনও শোধ হয় না। সেই ছেলেবেলায় তুমি রোজ তোমার টিফিন থেকে আমাকে ভাগ দিতে, মনে আছে? ব্যস্, আর কোনও কথাটি নয়। রোজ তোমার ঠিকানায় একখানা ক'রে রুটি পৌঁছে যাবে।"

অনঙ্গ বলল, "আমি অবশ্য তোমার কাছে ঋণী নই। কিন্তু আমি একটা জিনিস নি-খরচায় ক'রে তোমার কিছু উপকার করতে পারি হয়তো। তুমি আমার দোকান থেকে বই নিয়ে পড়তে পার, একটি জিনিস কেবল তোমায় দেখতে হবে বই যেন জখম বা ময়লা না হয়। আমার দোকানে ইংরেজি বইয়ের স্টক খুব নিন্দনীয় নয়। গেলেই দেখতে পাবে—যেও একদিন। অনন্ত তোমার দৈহিক খাবার যোগাচ্ছে, আমি তোমার মানসিক খাবার যোগাব।"

শ্যামল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমাকে একটা কাগজ দাও।"

"কি হবে?"

"দাও না। এনি কাগজ—"

অনন্ত পাউরুটি যে কাগজে মুড়ে দেয় সেই ব্রাউন পেপার এগিয়ে দিলে একটা। শ্যামলের পকেটে কলম ছিল। সে টেবিলের উপর কাগজটা রেখে লিখতে লাগল:—

একটা রঙীন ঘুড়ি আকাশে উড়ছিল
বেশ উড়ছিল খানিকক্ষণ।
তার পরই—ভো কাট্টা।
টাল খেতে খেতে পড়ল সে গিয়ে
একটা কন্টকাকীর্ণ বাবলা গাছের উপর,

ধূ ধূ প্রান্তরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল গাছটা।
ঘুড়ি তার সঙ্গী হল।
বোবা বাবলা বোবা হয়েই রইল।
তারপর একদিন যা ঘটল
তা বিস্ময়কর।
ওই তেপান্তর ধূ ধূ মাঠে কোথা থেকে
হাজির হ'ল দুটো ছেলে।
একজনের হাতে লগি একটা
আর একজনের হাতে লাটাই।
আস্তে আস্তে লগি দিয়ে
ঘুড়িটাকে নামিয়ে ফেলল তারা।
তারপর সেটাকে উড়িয়ে দিলে আকাশে।
ঘটনা সামান্য,
তবু বলছি জয় জয় জয়।
উর্বশীই সব সময়ে অমৃতকুম্ভ আনেন না
দুপুর রোদে, তেপান্তর মাঠে
লগি-হাতে দুটো ছেলে সেদিন যা নিয়ে এল
তা অমৃতই।

অনঙ্গ বলল, "বেশ হয়েছে।"

অনন্ত কসি গুঁজে বলল, "আমাকে দাও ওটা, আমি বাঁধিয়ে রেখে দেব। নীচে ডেট দিয়ে নাম সই ক'রে দাও।"

শ্যামল কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে কাগজটা। তারপর বলল, "ভাল কবিতা আর একটা লিখে দেব।"

এরপর প্রায় বছর তিনেক কেটে গেছে। তিন বন্ধুর বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়েছে আরও। শ্যামল সোম ভাল চাকরি পেয়েছে একটা। অনঙ্গর দোকানের একজন পুরোনো খদ্দের হঠাৎ ভি. আই. পি. হ'য়ে গেলেন একদিন। তিনিই সুযোগ সুবিধা ক'রে দিলেন। শ্যামল কিন্তু এখনও অনঙ্গর দোকান থেকে রোজ একখানা ক'রে বই নিয়ে আসে, আবার প'ড়ে ফেরত দেয়। অনন্তও রোজ একটা ক'রে ব্রাউন ব্রেড দিয়ে যাচ্ছে তাকে বিনা পয়সায়। ঘনিষ্ঠতা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে উঠেছে যে পয়সা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না আর। অনন্তর রক্ষিতা নয়নতারা আর তার স্ত্রী বিজনবালা দুজনের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে শ্যামলের। দুজনকেই ভালো লেগেছে তার। বিজনবালাকে যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিল ততটা লাগেনি। তার মনে হয়েছে বিজনবালার পায়ে অনন্ত-রূপ জুতো জোড়াটি ভাল ফিট করেনি, একটু বেশী টাইট

হয়েছে। তাই বিজনবালা স্বস্তি পাচ্ছে না। সে যে আবহাওয়ায় মানুষ সেই আবহাওয়াটা এখনও ঘিরে আছে তাকে সর্বক্ষণ। সেই আবহাওয়ায় স্বামী হিসাবে অনন্ত অচল। তার স্লিম হওয়া উচিত ছিল, স্মার্ট হওয়া উচিত ছিল, বড় চাকরি করা উচিত ছিল, তাকে নিয়ে যখন-তখন যেখানে-সেখানে আস্ফালন করবার মতো কোনও একটা, তাক-লাগানো যোগ্যতা থাকা উচিত ছিল, কিন্তু অনন্ত ভুঁড়িওলা নাদুসনুদুস পাঁউরুটি-ওলা মাত্র। এককালে নাকি ফেরি-ওলা ছিল! বিজনবালা আধুনিকা সে পার্টিতে যেতে চায়, মহিলা সমিতিতে মাতব্বরী করতে চায়, হোমগার্ডস-এ নাম লেখাতে চায়, নভেল পড়তে চায়, সাহিত্যজগতের খবর রাখতে চায়, ফুটবল খেলোয়াড়, হকি খেলোয়াড়, সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের খুঁটিনাটি জীবনচরিত জানতে চায়—ছেলেবেলা থেকে এইসবই করেছে সে। কিন্তু রং কালো আর দাঁত উঁচু ব'লে কোনও আধুনিক অভিজাত সমাজে ঢোকবার টিকিট সে পেল না। বিয়ে করতে হ'ল পাঁউরুটি-ওলা অনন্তকে, যার বুকভরত্তি লোম, থলথলে ভুঁড়ি, হলদে দাঁত, মুখে বিড়ির গন্ধ। অনন্তর ইচ্ছে বিজন রান্নাঘরে ঢুকে তার জন্যে নানারকম রান্না করুক, তার জন্যে মোজা সোয়েটার বুনুক, সে আপিস থেকে ফিরলে তার ঘামে-ভিজে জামা গেঞ্জি নিজে হাতে খুলে সাবান জলে ভিজিয়ে দিক, অনন্তর ফিরতে দেরি হ'লে তার অপেক্ষায় জানলার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকুক। সে খেতে বসলে পাখা হাতে তার সামনে ব'সে হাওয়া করুক। এসবে অভ্যস্ত নয় বিজন কোনওকালে। ছেলেবেলায় সে নাচ শিখেছে, গান শিখেছে, সেতার শিখেছে, গীটার শিখেছে, মোটরে ক'রে যখন যেখানে খুশি গেছে। কখনও আলিপুরে, কখনও বন্ধুর বাড়ি, কখনও বোটানিকাল গার্ডেন, কখনও বা সিনেমা। উবু হ'য়ে ব'সে মশলা বাটা বা রুটি বেলা সে শেখেনি কখনও। রাঁধতেও জানে না। পান সাজতেও না। পুডিং তার প্রিয় খাদ্য, কিন্তু অনন্ত মোটেই তা ভালবাসে না। ফুচকাও না। অথচ স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে সে কি আনন্দে যে একটার পর একটা ফুচকা খেত তার স্মৃতি এখনও মনে পড়ে তার। যদিও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করতে পারেনি, কিন্তু কলেজের অনেক মেয়ে তার বান্ধবী। তাদের কাছ থেকে সে কত মজার গল্প যে শুনত···অনন্ত কিন্তু ভিন্ন জগতের লোক। ময়দা, চিনি, তাড়ি আর পাঁউরুটি এ ছাড়া সে আর কিছু জানে না। আর জানে কলিমুদ্দিন, আর খদ্দের। শ্যামল সহৃদয় মন নিয়ে এর সঙ্গে আলাপ করেছে এবং এই বন্দিনী বিহঙ্গমকে মাঝে মাঝে মুক্ত হাওয়ায় ছেড়ে দেবার চেষ্টা করেছে। অনন্ত বাধা দেয়নি। শ্যামল সুযোগ পেলেই তাকে সিনেমায় থিয়েটারে নিয়ে যায়, সাহিত্যিক বা গানের জলসায় কার্ড যোগাড় ক'রে দেয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতেও নিয়ে যায় মাঝে মাঝে। শ্যামল লক্ষ্য করেছে তার মনের মতো পরিবেশ পেলে বিজনবালার চেহারা বদলে যায়। তার মধ্যেও সেই ঔৎসুক্য, সেই কমনীয় লজ্জা, সেই ভীরু মিনতি, সেই অনির্বচনীয় আকূতি আছে যা চিরকাল কবিতার খোরাক যুগিয়েছে। সে অনন্তকে একদিন

বলেছিল, "তুমি মাছকে জল থেকে তুলে ডাঙায় এনেছ বলেই ও ছট্‌ফট করছে। ওর আসল রূপ তুমি দেখতে পাচ্ছ না। ওকে ঠিকমতো পেতে হ'লে ওকে জলে ছেড়ে দিতে হবে।" অনন্ত হেসে উত্তর দিল, 'আমি ডাঙার মানুষ, ওকে জলে ছেড়ে দিয়ে আমি কি ছিপ্ কাঁধে ক'রে ওর পেছু পেছু ঘুরে বেড়াব! ওকে তো ছেড়েই দিয়েছি, যা খুশী করুক। জলে স্থলে আকাশে যেখানে গিয়ে সুখ পাবে পাক। আমাকে দিক্ না করলেই হ'ল!"

"তুমি একটু সাঁতার শেখ না." হেসে জবাব দিয়েছিল শ্যামল, "ও যে জগতের লোক সেখানেও আনন্দের খোরাক আছে।"

অনন্ত কোনও জবাব না দিয়ে হেসে একটি বিড়ি ধরিয়েছিল কেবল। মাঝে মাঝে অনন্তর সঙ্গে শ্যামল বিজনবালার কাছে যায়। শ্যামল গেলে একটা নূতন চঞ্চলতা জাগে তার, অপটু হস্তে নিজেই চা করবার চেষ্টা করে, কোন কোন দিন হালুয়াও।

নয়নতারাকে দেখে কিন্তু সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেছে শ্যামল। নয়নতারার বয়স হয়েছে। চল্লিশের কাছাকাছি, আরও নাকি বেশী হ'তে পারে। কিন্তু মনে হয় যেন ষোড়শী যুবতী। এই ধারণাই শ্যামলের অনেকদিন ছিল। একদিন বয়সের প্রসঙ্গ ওঠাতে নয়নতারা নিজেই বলল, "দেখুন, দেখে মেয়েমানুষের বয়স আন্দাজ করা যায় না। আমার বয়স কত বলুন তো?"

"কুড়ির মধ্যেই নিশ্চয়"—শ্যামল বলেছিল।

"চাল্লিশ পেরিয়ে গেছে।"

মুচকি হেসে চোখ নীচু ক'রে, মাথার কাপড়টা ঈষৎ টেনে যেভাবে কথাটা বলেছিল নয়নতারা তার ছবি এখনও আঁকা আছে শ্যামল সোমের মনে। তার এ-ও মনে হয়েছিল মেয়েটি হয়তো মিথ্যা কথা বলছে, যা মেয়েরা সাধারণতঃ করে না, নিজের বয়স বাড়িয়ে বলা, তাই ক'রে সে হয়তো নিজের অসাধারণত্ব প্রমাণ করতে চাইছে। তার চলনে বলনে ভাবে ভঙ্গিমায়, চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের কোনও লক্ষণই দেখতে পায়নি সে। কিন্তু এ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাবার সময়ও পায়নি, প্রয়োজনও বোধ করেনি। তার আচরণে, তার অনবদ্য ভদ্র ব্যবহারে, তার আন্তরিক সেবা-পরায়ণতায় সে ক্রমশঃ মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। মা আর প্রেয়সীর এমন একটা শোভন সংমিশ্রণ যে সম্ভব তা দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। প্রথম দিন গিয়ে গানবাজনার কথা পেড়েছিল শ্যামল। অনন্তকে বলেছিল, "উনি গানটান জানেন নিশ্চয়। একটু শোনাতে বল না।"

নয়নতারা তখন পাশের ঘরে ছিল।

অনন্ত বলল, "আমি তো খোঁজ করিনি। হয়তো জানে। আমি আগেই তো বলেছি দোকান থেকে যখন ফিরি তখন আর গানটানের কথা মনে আসে না। মনে হয় জামা কাপড় ছেড়ে হাত পা মুখ ধুয়ে একটু জিরুই। ওগো শুনছো—"

নয়নতারা পাশের ঘর থেকে এল।

"শ্যামল জিগ্যেস করছে তুমি গানটান কিছু জান কি না। ও কবি লোক তো। যদি জানা থাকে শোনাও ওকে দু'একটা।"

নয়নতারা লজ্জিত হ'য়ে পড়ল। তারপর মাথার কাপড়টা একটু টেনে আনতনয়নে বলল, "এককালে জানতুম। কিন্তু ওঁর কোন শখ নেই ব'লে চর্চা নেই তেমন।"

"তবু শোনাও একটা।"

নয়নতারা শুধু গলায় মৃদুকণ্ঠে পূরবীর আলাপ শুনিয়েছিল সেদিন। অমন সুন্দর আলাপ শুধু গলায় যে হ'তে পারে তা শ্যামলের জানা ছিল না। গান সম্বন্ধে তার নিজেরও বিশেষ জ্ঞান ছিল না, তবু সে অবাক হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল সে। তারপর বলল, "এ তো অতি চমৎকার। আমি গানের কিছু বুঝি না, তবু খুব ভালো লাগল। কি গাইলেন ?"

"পূরবী—"

"ওস্তাদ রেখে শিখেছিলেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ। ছেলেবেলায় অনেকদিন ওস্তাদের কাছে শিখেছিলাম। থাক ওসব কথা—। শিঙাড়া করেছি, নিয়ে আসি।"

পরমুহূর্তেই পাশের ঘরে চ'লে গিয়ে দু'থালা ভরতি গরম শিঙাড়া নিয়ে এল। তার মুখের ভাব দেখে শ্যামলের মনে হয়েছিল সে যেন নীরব ভাষায় বলছে—যা বোঝ, তাই এনেছি, নাও। মুখে কিন্তু সে বলল, "আপনি যে সুরের এমন সমঝদার হবেন তা ভাবতে পারিনি। শিঙাড়াগুলো কেমন হয়েছে দেখুন তো।" শিঙাড়াও চমৎকার হয়েছিল। তারপর অনেকবার শ্যামল অনন্তর সঙ্গে নয়নতারার বাড়ি গেছে। কিন্তু গানের প্রসঙ্গ আর সে উত্থাপন করতে পারেনি। তার প্রথম দিনেই মনে হয়েছিল ও প্রসঙ্গের অন্তরালে হয়তো বেদনাদায়ক কোনও রহস্যময় যবনিকা আছে, যা সরাবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কিছুদিন পরে ও প্রসঙ্গ আর মনেও ছিল না তার। নয়নতারার সেবাপরায়ণতাই ক্রমশঃ এত বড় হ'য়ে উঠেছিল তার কাছে যে তার অন্য কোনও গুণ আছে কি না কিংবা থাকা উচিত কি না এসব কথা মনেই পড়েনি তার। নয়নতারাকে সে কোনও বিদুষী অধ্যাপিকা, বা নৃত্যগীতপটীয়সী নর্তকীরূপে আর কল্পনাই করতে পারে না। একটি উপমাই তার সম্বন্ধে বার বার মনে হয় শ্যামলের। সে যেন বিরাট একটা দীর্ঘিকা, স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধ নীলাভ কৃষ্ণকান্তিতে মনোরম। তীরে ছায়াশীতল গাছের শ্রেণী, দূরে সুন্দর একটি বাঁধানো ঘাট। সেখানে অবগাহন করা যাবে, তৃষ্ণার জল পাওয়া যাবে, কিছু না করেও যদি কেবল তীরে ব'সে থাকা যায় তাহলেও তৃপ্তি পাওয়া যাবে। নয়নতারার সঙ্গে সে দিদি সম্বন্ধ পাতিয়েছে। তার সঙ্গে অন্য কোনরকম সম্বন্ধের কথা ভাবতেও পারে না সে। অনন্তর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক আছে কি না তা সে জানে না, জিজ্ঞাসাও করেনি। কিন্তু মনে হয় অনন্তকে ও সেবা দিয়েই বশ করেছে। অনন্ত রোজ দোকান থেকে ফিরে

এগারোটা বারোটা পর্যন্ত নয়নতারার কাছে থাকে, তারপর একটি রিক্‌শা ক'রে বাড়ি যায়। একদিন শ্যামল অনন্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি দিদির নাগাল পেলে কি ক'রে? অনন্ত নির্বিকারভাবে উত্তর দিয়েছিল—কলিমুদ্দিনই ওর খবর দেয় আমাকে। তার এক বন্ধুর কাছে ও ছিল দিনকতক। বন্ধুটি মারা যায়। বিধবার মতোই ও বাস করছিল। তারপর আমি গিয়ে ওকে নিয়ে আসি। প্রথমে আসতে চায়নি, কিন্তু কলিমুদ্দিন অনেক ক'রে বলাতে রাজী হ'ল। অনেক কষ্টে রাজী করাতে হয়েছে। আলাদা বাড়ি ভাড়া ক'রে তবে ওখানে নিয়ে এলুম, কিন্তু মাস দুই যাইনি। দূর থেকেই কেবল খবর নিতুম। একদিন দেখলুম ও রঙীন শাড়ী প'রে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আমি যখন গেলুম তখন বললে, আপনি বসুন, আপনার জন্যে রোজ খাবার ক'রে রাখি। কিন্তু আপনি আসেন না। আমি বসতেই আমার জুতোর ফিতে খুলতে ব'সে গেল। ব্যস্, সেইদিন থেকেই শুরু আর কি। শ্যামলের মনে হয় নয়নতারা তার জীবনেও একটা পরম প্রাপ্তি। তার বিশ্বাস কোথাও যদি সে আশ্রয় না পায় নয়নতারার কাছে পাবে। বিজনের কাছেও সে যায়। যায় কৌতূহল নিয়ে। সে জানে, অনুভব করে বিজনের মধ্যেও সেই চিরন্তনী নারী আছে, তার আভাস মাঝে মাঝে সে পেয়েছে, কিন্তু তার হাতের সুধাপাত্রটি এখনও দেখতে পায়নি। সে জানে কোথাও না কোথাও সেটি আছে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার উদগ্র কাঁটাগুলোর আড়ালে সেটিকে দেখা যাবেই একদিন। ফণীমনসার গাছে ফুল ফুটবে। জীবন এইভাবেই চলছিল তিন বন্ধুর। অনঙ্গর জীবনে কোনও নারীর আবির্ভাব হয়নি এখনও। তার চরিত্র পাথর আর আগুনের সমন্বয়। বেলা দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দোকানে থাকে। দিনের বেলায় খায় দুধ আর ফলমূল। রাত্রে কোনও ভালো হোটেলে গিয়ে ইংরেজি খানা খায়। সে শ্যামলকে বলেছিল, আমি বিয়ে করব না। কারণ স্বপ্নকে বিয়ে করা যায় না। তাছাড়া স্বপ্নও একটা বা একরকম নয়। রোজ তাদের রূপ বদলায়, রং বদলায়। ওদের নিয়েই আমি ভালো আছি। একটা বাস্তব বউ এনে তাকে কষ্ট দিতে চাই না। দেশবিদেশের সাহিত্য আর তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করেই তার সময় কাটে। সন্ধের পর তার দোকানে যে আড্ডাটা বসে সেখানে অনেক নামজাদা অধ্যাপকও আসেন। তাঁদের সঙ্গে আসেন আরও অনেক নামজাদা লোক যাঁরা ঠিক সাহিত্যিক নন। এই আড্ডাতেই একজন ভি. আই. পি.-র সাক্ষাৎ পেয়েছিল শ্যামল। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন চাকরি ক'রে দেবেন। কিন্তু অনেকদিন তাঁর কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া গেল না। তখন অনঙ্গ তাকে একদিন নিয়ে গেল পাঠকজির কাছে। পাঠকজির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার একজন অধ্যাপকের মাধ্যমে। অধ্যাপকটি বলেছিলেন পাঠকজি হাত দেখে এবং চোখ মুখ দেখে অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। সত্যি অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করলেনও। কোন্ তারিখে শ্যামলের চাকরির চিঠি আসবে সে তারিখটি পর্যন্ত ব'লে দিলেন। সেই থেকে শ্যামল পাঠকজির ভক্ত হয়েছে। সেইখানেই

বিশ্বদীপের সঙ্গে আলাপ হ'ল একদিন। বিশ্বদীপের স্বপ্নালু চোঁখের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। আরও অবাক হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর রূপ দেখে। শুধু 'কন্দর্পকান্তি' বললে ও রূপের বর্ণনা হয় না। ওঁর রূপে এমন একটা কিছু আছে যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তারপর যখন বিশ্বদীপের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তখন শ্যামলের মনে হ'ল এঁর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করতে না পারি তাহলে জীবনই বৃথা। বন্ধুত্ব হতেও দেরি হ'ল না। তার কবিতা শুনেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন বিশ্বদীপ। বস্তুতঃ মনে হ'ল বিশ্বদীপের সমস্ত সত্তা বন্ধুই খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন সারাজীবন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার মতো নুড়ির জঙ্গলে যেন সারাজীবন খুঁজছেন পরশপাথর। এখনও খুঁজছেন কিন্তু পাননি, তাই তাঁর খোঁজারও শেষ হয়নি এখনও। নূতন লোক পেলেই সাগ্রহে আলাপ করতে যান। শ্যামলের সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। শ্যামলের কবিতা শুনতে শুনতে তাঁর চোখে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে তা অসাধারণ, মনে হয় তিনি যেন নায়গ্রা প্রপাত দেখছেন কিংবা চেয়ে আছেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে। কবিতা পড়া শেষ হ'য়ে গেলেও চোখ মুখের সে উদ্দীপ্ত ভাব নিবে যায় না, অনেকক্ষণ থাকে। একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন একদিন।

"কবিতা ছাপাবার চেষ্টা করবেন না। ভাল কাগজে রং আর তুলি দিয়ে লিখে পুঁথির মতো রেখে দিন ওগুলো লুকিয়ে। অধিকাংশ মানুষই এখনও বর্বর, তারা কবিতার মর্যাদা দিতে পারে না। ভগবানও বোধহয় একথা জানেন। তাই তিনি মণি সৃষ্টি ক'রে তাকে লুকিয়ে রেখেছেন খনির অন্ধকারে, মুক্তা সৃষ্টি ক'রে তাকে স্থান দিয়েছেন সেই শুক্তির মধ্যে যে গভীর সমুদ্রবাসী। কবিতা ছাপা হলেই তা খেলো হ'য়ে গেল। শেক্‌স্‌পীয়র থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেরই ওই দুর্দশা। অনেকে কেনে কিন্তু পড়ে না, অনেকে পড়ে কিন্তু বুঝতে পারে না। কবিতার অর্থ বোঝবার সামর্থ্য অধিকাংশ লোকেরই নেই। ডিগ্রীধারী সবজান্তা একদল লোক আছেন তাঁরা কবিতা জবাই করেন। তা ও ধারালো ছুরি দিয়ে নয়, ভোঁতা ছুরি দিয়ে। আপনার কবিতার সে দুর্দশা যেন না হয়।"

এসব ঘটনার কিছুদিন পরেই আলাপ বিদুলার সঙ্গে। চমকে গেল শ্যামল। বিদুলা যেন নানারঙের বাল্‌বের একটা বিরাট তোড়া, অবিশ্বাস্য দক্ষতায় নিজেকে প্রকাশিত করেছে বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বহুবর্ণবিচিত্র ঝাড়লণ্ঠনের বিস্ময়কর শোভায়। সর্বদাই যেন ঝলমল করছে। তার চারদিকে যে অসংখ্য অতসী কাচ দুলছে তার প্রত্যেকটি থেকে প্রতি দোলনেই বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে নূতন রশ্মি, নূতন বিস্ময়। সে অপূর্ব, কিন্তু সে প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা নয়, মানুষের তৈরী শিল্পসভ্যতার নানা কারুকার্যে সে মণ্ডিত। তার রূপ অনবদ্য, তার হাসি সুন্দর, তার ছলা-কলা, লীলা-লাস্য সবই মনোহর, সবই আকর্ষণ করে, কিন্তু সাহস ক'রে খুব কাছে যাওয়া যায় না। নয়নতারার সঙ্গে বিদুলার কোন মিল নেই। একজন সুসজ্জিত আধুনিক ড্রয়িংরুম, আর একজন স্বাভাবিক কুঞ্জবন।

কিরনবালার সঙ্গেও মিল নেই বিতুলার। আধুনিক সভ্যতার ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতাই কাঁটার মতো উদগ্র হ'য়ে আছে তার চারদিকে, সে সভ্যতার শোভা সে আহরণ করতে পারেনি। বিতুলাকেও সে নিজের কবিতা শুনিয়েছে, বিতুলা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবার ভান করেছে, কিন্তু তার এ উচ্ছ্বাস যে মেকী তা বুঝতে দেরি হয়নি শ্যামলের। আর একটা জিনিসও বুঝতে দেরি হয়নি,—দু' একদিন যাতায়াতের পরই সে বুঝেছিল যে বিতুলা বিশ্বদীপকে ভালোবাসে। তবু সে বিতুলার কাছে মাঝে মাঝে যায়, বিশ্বদীপের কাছেও যায়, তাদের মধ্যে সেই বস্তু গ'ড়ে উঠেছে যাকে আধুনিক ভাষায় বলে 'ফ্রেণ্ডশিপ,' কিন্তু যা গভীর কিছু নয়। কিন্তু মনোরম।

ওয়ালটেয়ারের বাড়িটা অনঙ্গই যোগাড় করেছিল। সমুদ্রের কাছেই বেশ বড় বাড়ি। কথা ছিল অনঙ্গ আর অনন্ত দু'দিন মাত্র থাকবে সেখানে। এই দু'দিনের জন্য তারা দোকানে লোক ঠিক ক'রে এসেছিল। শ্যামল এসেছিল এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে। বিতুলার সঙ্গে ছিল চাকর, রাঁধুনী আর দারোয়ান। বিতুলা তিন চারবার ক'রে সমুদ্রে স্নান করত। সমুদ্রের সঙ্গে খেলা করবার জন্যেই যেন এসেছিল সে। সেদিন সকালে অনন্ত, অনঙ্গ আর শ্যামল তিনজনেই বসে ছিল সমুদ্রের ধারে। বিতুলা স্নান করতে গিয়েছিল একটু দূরে নির্জন জায়গায়। অনঙ্গ একটা ফরাসী গল্পসংগ্রহের ইংরেজি অনুবাদ পড়ছিল। শ্যামল বসে ছিল সমুদ্রের দিকে চেয়ে আর বকবক ক'রে যাচ্ছিল অনন্ত। ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের সান্নিধ্যে এসে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়েছে অনন্তলালের। তার মনের দুয়ার যেন খুলে গেছে।

সে বলছিল, "দেখ ভাই শ্যামল, এখানে এসে মনে হ'চ্ছে আমার মনটা যেন হাওয়া হ'য়ে গেছে আর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের ঢেউগুলোর উপর। এতো ভালো লাগছে। দোকানটোকানের কথা মনেই পড়ছে না।"

শ্যামল গম্ভীরভাবে বলল, "নয়নতারার কথা—?"

"নয়নতারা এখানে বেমানান। ঘরের কোণে যে প্রদীপ সুন্দর তা কি এখানে মানায়?"

"তুইও যে কবি হ'য়ে উঠলি দেখছি। মানায় কি না তা জিজ্ঞেস করিনি। মনে পড়ছে কি না তাই জিজ্ঞেস করছি। তোর মনের ভিতর তো একটা ঘরের কোণ আছে, সেখানে প্রদীপ জ্বলছে কি না।"

"না, জ্বলছে না, মাইরি বলছি। মনে হচ্ছে সব যেন উড়ে গেছে। আমাদের পাশের গলিতে মাঝে মাঝে প্রমোদ ভট্‌চাজ গীতা-টিতা পড়ে, ভূমার কথা বলে। সেখানে গেছি মাঝে মাঝে, কিন্তু ঢুলেছি কেবল। কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। এখন যেন বুঝতে পারছি ভূমা কি।"

অনঙ্গ বই থেকে মুখ তুলে বলল, "তুমি আজই সন্ধের ট্রেনে ফিরে যাও। ভূমার ছোঁয়াচ লাগলে তোমার দোকান টি'কবে না। তুমি গাঁইয়া লোক, যদিও কলকাতায়

থাক, দুটো সমুদ্রের ধাক্কা তুমি সইতে পারবে না। আজই ফিরে যাও। তোমার দোকান উঠে গেলে সেটা একটা ন্যাশনাল লস হবে ব'লে মনে করি। ভালো রুটি আজকাল দুর্লভ।"

অনন্ত স্মিতমুখে বিঁড়ি ধরিয়ে বলল, "দেখ্, অনঙ্গ, লেখাপড়া শিখে তুই একটি আস্ত গাড়োল হয়েছিস দেখছি। মাথার উপর থেকে আকাশ লোপ পেয়ে যাবে, কিংবা পায়ের তলায় মাটি থাকবে না একথা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি আমার পাউরুটির দোকান থাকবে না একথাও ভাবা যায় না। আমি তোদের কাছে আমার মনটা একটু খুলে ধরেছিলুম আর অমনি তোরা ঠাট্টা শুরু ক'রে দিলি। কিন্তু দুটো সমুদ্র তুই কোথায় পেলি, আমি তো একটা দেখছি।"

"আর একটা সমুদ্র, সমুদ্রে স্নান করতে গেছে।"

"বিদুলাকে তুই সমুদ্র বলিস! আমি তো মনে মনে ওর নামকরণ করেছি চণ্ডী।"

অনঙ্গ বলল, "আমি বলিনি। শ্যামল বলেছে। শ্যামল ওর নামে কবিতা লিখেছে একটা এখানে।"

"কই শোনায়নি তো আমাকে—"

অনঙ্গ শ্যামলের দিকে ফিরে বলল, "দেখ শ্যামল, তুমি ও মেয়ের সঙ্গে প্রেম কর আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ওকে বিয়ে করবার চেষ্টা কোরো না। ওকে সামলাবার তাগদ তোমার নেই। বেশী ঘনিষ্ঠ হ'লে ওর সঙ্গে ভেড়ার মতো ঘুরতে হবে।"

অনন্ত বলল, "শ্যামল ভেড়া হ'য়ে গেছে এ কল্পনা করা শক্ত। সত্যিই শক্ত।"

অনঙ্গ তার উত্তরে বলল, "তাহলে ভেড়া না ব'লে খানসামা বলছি। যে মেয়ে দুধের সরের সঙ্গে জুঁইফুল বেটে সর্বাঙ্গে মাখে, যার আতরের শিশিটা রাঘব বোয়ালের মতো দেখতে, যার তোয়ালেকে ভেলভেট ব'লে ভুল হয় তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি শ্যামলের কর্ম?"

শ্যামল বলল, "আমি পাল্লা দিচ্ছি না তো, আমি কেবল কবিতা লিখছি। আমি সূর্য চন্দ্র সমুদ্র হিমালয় নিয়ে কবিতা লিখেছি, কিন্তু ওদের বিয়ে করব, কিংবা ওদের সঙ্গে পাল্লা দেব একথা একবারও ভাবিনি। বিদুলার সম্বন্ধেও ভাবিনি।"

অনঙ্গ বলল, "কিন্তু তোমার চোখমুখের ভাব থেকে যা প্রকাশ পায় তার উৎস ঠিক নিরাসক্ত কবির নির্বিকার সৌন্দর্য-বন্দনা ব'লে তো মনে হয় না। তাই অনন্তকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু আমার মতে কবিদের দুটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথম প্রেম, দ্বিতীয় প্রশংসা। তোমার মনে যদি প্রেম জেগে থাকে আমি আপত্তি করব না। বরং বড় বড় কবিদের নজির তুলে তোমাকে সমর্থন করব। বায়রনের কথা ছেড়ে দাও, পৃথিবীর প্রায় সব কবিই কোন-না-কোন সময় প্রেমে পড়েছেন এবং যখন পড়েছেন তখনই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ফুলে ফলে শোভায় বিস্ময়কর হয়েছে। প্রেমে পড়, বিদুলা

দেবী প্রেমে পড়বার মতো মেয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁকে পড় না, সেখান থেকে তোমাকে তোলবার মতো ক্রেন আমার বা অনন্তর নেই।"

অনন্ত বলল, "আমার দোকানের পেছনে একটা ঘর খালি হয়েছে। দোতলা বাড়ি, চমৎকার উঠোন, কল আছে, রান্নাঘর আছে, বাথরুম আছে। আমার মনে হয় শ্যামল একটি গেরস্তঘরের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেলুক। ফেলুর একটি ডাগরডোগর মেয়ে আছে, জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব করতে পারে; সেদিন দেখলুম গাছকোমর বেঁধে ঝাড়ু নিয়ে বালটি বালটি জল ঢেলে উঠোন পরিষ্কার করছে। ফেলুর বউ বছর-বিয়ানী। দশটি ছেলেমেয়ে। সক্কলকার হ্যাঁপা ওই মেয়েটাই সামলায়। শ্যামলের যদি মত থাকে ওই মেয়েটির সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারি। আমার বিশ্বাস ওকে বিয়ে করলে শ্যামল আরাম পাবে আর এই সব ঘোড়া-রোগ থেকে মুক্তিও পাবে।"

অনঙ্গ বলল, "শুনেছি বসন্তরোগের টিকে নেওয়ার পর কারও কারও বসন্ত হয়। আমার মনে হয় শ্যামলের মনটা এখন আগে থিতুক, তারপর ওর বিয়ের কথা ভাবা যাবে। ঝড় তো বেশীক্ষণ থাকে না—"

অনন্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে নাক চোখ মুখ কুঁচকে মাথা চুলকোতে লাগল। তারপর বলল, "এ তো ঝড় নয়, এ যে চুলকোনি। এ ব্যামো সহজে যায় না। তাছাড়া ও মাগী যে রকম চণ্ডী দেখছি—"

শ্যামল হঠাৎ ব লে উঠল, "এ আলোচনা এখন বন্ধ কর। বিদুলা দেবী আসছেন।"

তবু অনন্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, "ওর নাকটা দেখেছ? ঠিক যেন টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো। মনে হয় এখুনি ঠুকরে দেবে। আমার তো ওর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে।"

একটু পরেই বিদুলা এসে গেল। আলুলায়িতকুন্তলা। চুল প্রচুর। শ্যামলের মনে হ'ল একরাশি কালো ফেনা যেন আছড়ে পড়ছে দেহ-তটের উপর। পরিধানে একটি রূপোলী জরিপাড় মেহেদিরঙের শাড়ি। এসেই হেসে বলল, "চলুন ভিতরে যাই। চা না কফি কিছু একটা খাওয়া যাক।".

অনঙ্গ বলল, "আপনার ফরমাশ মতো আনারস আনিয়েছি গোটাচারেক। সেটার কি এখনই সদ্গতি করবেন?"

বিদুলা এমন একটি মিষ্টি হাসি হাসল যেন আনারসের সদ্গতি করাটাই বুঝি একটা পরম উপভোগ্য আনন্দদায়ক ব্যাপার। বলল, "না, আনারস আনিয়েছি, আনারস দিয়ে মাংস রাঁধব ব'লে। এ রান্নাটি নতুন শিখেছি। আজ আপনাদের খাওয়াব। চলুন যাওয়া যাক—"

ভিতরে গিয়ে দেখা গেল বিদুলার নির্দেশে তার রাঁধুনী প্রচুর খাবারের আয়োজন করেছে। ছানার একরকম নোনতা খাবার, ডিম-আলুর পুর দিয়ে শিঙাড়া, খোসা-ছাড়ানো মটরশুঁটির ঘুগনি, তাছাড়া কেক বিস্কুট অনেক রকম। অনন্ত একটু চা খেলে শুধু।

"আপনি কিচ্ছু খেলেন না যে—"

"আমার মুড়ি খাওয়া অভ্যাস। এসব পেটে সইবে না।"

"সইবে, সইবে। এই ছানার নিমকিটা খেয়ে দেখুন। খুব সহজে হজম হয়। ওবেলা আপনার জন্যে মুড়ি আনাব।"

চা পর্ব শেষ হ'য়ে গেলে অনঙ্গ বলল, "এবার শ্যামলের কবিতা শোনা যাক।"

"আপনি কি বই পড়ছিলেন ?"

"ওটা ফরাসী গল্পের ইংরেজি অনুবাদ। অ্যালবার্ট কামুর একটা গল্প পড়লাম।"

"কি গল্প ?"

"দি গেস্ট। নূতন স্বাদ পেলাম গল্পটির মধ্যে। ভারু ব'লে মাস্টারটির চরিত্র অদ্ভুত রঙে এঁকেছেন উনি। খুনী আসামীটাও বেশ।"

"কামুর ও লেখাটা আমি পড়িনি। 'দি ফল্' পড়েছি। বড্ড বেশী morbid মনে হয়।"

"Morbid কথাটা আজকাল খুব চালু হয়েছে। কিন্তু ও দিয়ে এ যুগের সব লোকেদের, বিশেষ ক'রে লেখকদের বিচার করা চলে না বোধহয়। এ যুগে সবাই morbid। কিন্তু প্রত্যেকের চেহারা আলাদা। বৃন্তলীন বললে সব ফুলকেই হয়তো বোঝায়, কিন্তু 'বৃন্তলীন' শব্দটি দিয়ে জবার আর রজনীগন্ধার বৈশিষ্ট্য ফোটানো যায় না।"

বিদুলা হঠাৎ উঠে একটা সুদৃশ্য আতরদানী থেকে উৎকৃষ্ট গোলাপী-আতর 'স্প্রে' ক'রে দিল সবায়ের গায়ে। তারপর সেটা রেখে দিয়ে বলল, "কামুর কি বৈশিষ্ট্য দেখেছেন আপনি ?"

"সব কবিদের মতো উনিও পাঁকের মধ্যে পঙ্কজ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। অবশ্য ওঁর পঙ্কজ ওঁর নিজের পঙ্কজ, নিজের স্বপ্ন, নিজের সৃষ্টি। যে পৃথিবী নিষ্ঠুর, যে পৃথিবী বিরূপ, যে পৃথিবীর দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেমও ক্ষণিক অভিনয়মাত্র, সেই পৃথিবীতে উনি ভদ্রলোকের একটা জগৎ সন্ধান করেছেন সারাজীবন। হয়তো আবিষ্কার করতেন সে জগৎ কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি মারা গেলেন। হার্ডিও সারাজীবন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তাঁর কাব্যের প্রধান সুরই নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে পরাজয়ের সুর, তাঁকে অনেকে morbid করেন। আমাদের শ্যামলকেও সে হিসাবে morbid বলা চলে। ও কালকে যে কবিতাটা লিখেছে সেটা দেখেছেন ?"

"না, উনি দেখাননি তো। কেন জানি না, উনি কেমন যেন সহজ হ'তে পাচ্ছেন না।"

শ্যামল অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেনি। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল সপ্রতিভ থাকবার এবং সেইজন্যেই বোধহয় সহজ হ'তে পারছিল না।

বলল, "আমি যখন একলা থাকি তখনও সহজ থাকতে পারি না। আমার মন

এমন এক জগতে ঘুরে বেড়ায় যেখানে মনে হয় এখুনি বুঝি ধাক্কা খাব কোথাও। জগৎটা অপরিচিত এবং অস্পষ্ট। কবিতাটা শুনবেন সত্যি?"

"নিশ্চয়। এখানে কি আর করবার আছে—"

শ্যামল পড়তে লাগল—

অন্ধকারে বেরিয়েছিলাম
সমুদ্র খুঁজতে
যে সমুদ্র
দিনে অনেক দূরে স'রে যায়
রাত্রে কাছে আসে:
যে সমুদ্রের বার্তা পাই
আকাশের ইন্দ্রধনুতে,
ঘননীল অপরাজিতার নিগূঢ় ইঙ্গিতে,
মখমল কোমল গোলাপের
গাঢ় লাল রহস্যের কুহেলিতে।
যে সমুদ্রের রত্ন
প্রেয়সীর অঙ্গে,
আশার মঞ্জরীতে,
হতাশার দুরাশায়,
যে সমুদ্র সমুদ্রই নয়
যা আমার মন,
যা আমাকে ঘিরে আছে
অথচ যাকে আমি পাই না,
সেই সমুদ্রের কল্লোল শুনছি,
চিরকাল শুনছি।
তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম
সেদিন অন্ধকারে:
গিয়েছিলাম অন্ধকারের পরপারে
যেখানে আদিত্যবর্ণ পুরুষ নয়,
যেখানে আমার জলন্ত সত্তা জলছে
জ্যোতির্ময়ী রক্তিম উষার শোভায়।
সেই উষার আলোকে দেখলাম
সমুদ্রও সমুদ্রস্নান করছে।
তাকেও ঘিরে আছে একটা মহাসমুদ্র

সেই সমুদ্রে
সে ডুবছে, ভাসছে
সাঁতার কাটছে
সেই মহাসমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে
ভেসে বেড়াচ্ছে উচ্ছ্বসিত ফেনার মতো
আমার নাগালের বাইরে।
আবার অন্ধকার নেবে এল
সমুদ্র ঢেকে গেল।

এমন সময় চাকরটা টেলিগ্রাম নিয়ে এল। টোটো টেলিগ্রাম করেছে বিদুলাকে— Come immediately. বিদুলার সমস্ত মুখটা পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল। তার মনে হ'ল নিশ্চয় বিশ্বদীপেরই কিছু হয়েছে।

বলল, "আমাকে আজই ফিরতে হবে। ট্রেন কখন?"

"ট্রেন রাত্রে"—অনন্ত জবাব দিল।

"এখান থেকে প্লেন পাওয়া যাবে না বোধহয়।"

"না।"

অনন্ত বলল, "আমাকেও ফিরতে হবে আজ। অনঙ্গ তুই থাকবি কি?"

"আমি আর একদিন থাকতে পারতুম। কিন্তু আর থেকে কি হবে। চল সবাই ফিরেই যাই।"

শ্যামল কিছু বলল না।

বিদুলা চাকরটাকে ডেকে বলল, "মাংসটা এখনি কেটে পরিষ্কার ক'রে রাখ আর আনারস দুটোও কুটে ফেল। চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—ভেবেছিলাম আজ বিকেলে ওটা করব। কিন্তু বিকেলে গোছগাছ করতে হবে।"

চাকরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল সে। খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে শ্যামলের দিকে চেয়ে হেসে বলল, "আপনার কবিতা মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। মনে হচ্ছে যেন লিকয়ার খেয়েছি।"

যে হাসিটা হাসল তা হয়তো তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু অনন্তর মনে হ'ল ঢং, শ্যামলের মনে হ'ল পুষ্পবৃষ্টি। অনঙ্গর কিছুই মনে হ'ল না।

আট

বিশ্বদীপ ফ্যাকটারি থেকে সোজা গেলেন ডাক্তার ঘোষালের ক্লিনিকে। গিয়ে দেখলেন অনেক রুগী ব'সে আছে কিন্তু ঘোষাল নেই। তিনি যে নূতন বাড়িটা করাচ্ছেন সেইটের তদারক করতে গেছেন। বিশ্বদীপ সেখানে গেলেন। গিয়ে দেখেন প্রখর রোদে একটা টুলে ব'সে তিনি ইঁট গোনাচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন সেগুলো ভিজিয়ে রাখতে। বিশ্বদীপকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আসুন ত্রাণকর্তা, সিমেণ্ট কই?"

"সিমেণ্ট লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিন। ফ্যাকটারির গুদোমে আছে।"

ঘোষাল গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভান ক'রে বললেন, "আমি আশা করেছিলুম আপনি ট্রাক ভাড়া ক'রে সিমেণ্টটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, not only that, ট্রাকের ভাড়াটাও দিয়ে দেবেন!"

বিশ্বদীপ হেসে ফেললেন।

"না, না, হাসির কথা নয়। আমি পাইওনিয়ার। আমি এরোপ্লেনে ক'রে চিন্তার যে জগতে পেঁাছে গেছি সেখানে পেঁাছতে আপনাদের আরও এক শতাব্দী লাগবে অন্তত, কারণ আপনারা হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছেন। বেকারসমস্যাই পৃথিবীতে আজকাল সর্বপ্রধান সমস্যা। অনেকে আধপেটা খেয়ে থাকে কিন্তু তাদের মাথা গোঁজবার একটা জায়গা আছে—বাবা, কাকা, মামা, জেঠা, শ্বশুর, anybody—কিন্তু এমন একদলও আছে যারা খেতেও পায় না, শুতেও পায় না। এরাই dangerous, এরা পকেটমার, ছিঁচকে চোর, মিথ্যুক ভিখিরি, বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার, পলিটিকাল দাঙ্গাবাজ, বিদ্রোহী বেপরোয়া বীর—সব কিছু হ'তে পারে। লে মিজারেব্‌ল্‌স বইয়ে এদেরই চিত্র এঁকেছেন মহাকবি হিউগো। এদের অসীম সম্ভাবনা। এদের যদি অন্তত মাথা গোঁজবার একটা জায়গা ক'রে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো এরা অসম্ভব কিছু একটা ক'রে ফেলতে পারে। ফ্যারাডে, রানা প্রতাপ, সার আর. এন. মুখার্জী, বীরেন চাটুজ্যে হয়তো এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তাদের অন্তত একটা থাকবার আস্তানা ক'রে দেওয়া দরকার। আমি গরীব লোক, কোনক্রমে একটা আস্তানা খাড়া করছি, আশা করছি আপনারা সাহায্য করবেন। কিন্তু এ-ও জানি আপনারা করবেন না—"

ঘোষাল পকেট থেকে একতাড়া নোট বার ক'রে বিশ্বদীপকে দিলেন।

"আসুন। হাজার টাকা আছে। আর কত লাগবে—"

"না, না, টাকা আমি নেব না। কাল নাগাদ সিমেণ্ট পেয়ে যাবেন। আমি আপনার কাছে অন্য একটা দরকারে এসেছিলাম।"

"ডাক্তারি পরামর্শ?"

"হাঁ।"

ডাক্তারি পরামর্শ তো আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দিই না!"

"এখন কি ব্যস্ত আছেন?"

"আছি। কিন্তু তবু আপনার সহিত যাইব। আমি এখন আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আপনি যখন আমার সিমেণ্টের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি আমার প্রভু। বলুন কোথায় যাইবেন—আমার ক্লিনিকে না আপনার বাড়িতে।"

"আমার বাড়িতে গেলেই সুবিধা হয়।"

"চলুন। যেখানে বলেন সেখানেই যাইব।"

ডাক্তার ঘোষাল ইচ্ছা ক'রে মাঝে মাঝে শুদ্ধ বাংলা বলেন। এটা তাঁর রসিকতার একটা বিশেষ ধরন।

বিশ্বদীপের বৈঠকখানার কোচের উপর ব'সে ঘোষাল পাইপটি ধরালেন। তারপর বললেন, "কি বলবেন এবার বলুন—I am now receptive."

"আমার উরুতের ওই বোদা ভাবটা তো যাচ্ছে না। এক বছর হ'য়ে গেল—"

"আমি তো আপনাকে অনেকবার বলেছি ওটা হয়তো অনেকদিন থাকবে। হয়তো সারাজীবন। আর কোথাও তো কিছু হয়নি? বাস্ তাহলে আপনি ওই ওষুধ খেয়ে যান আর ওই তেলটা মালিস করতে থাকুন।"

বিশ্বদীপও চুপ ক'রে রইলেন, তারপর তিনিও পাইপ ধরালেন।

"এই জিগ্যেস করবার জন্যে আপনি আমাকে এতদূর টেনে আনলেন?"

"আমার কি বিয়ে করা উচিত?"

"ডাক্তার হিসেবে যদি জিগ্যেস করেন তাহলে বলব উচিত নয়। আপনার স্ত্রীর হয়তো infection না-ও হ'তে পারে কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েদের হবার সম্ভাবনা আছে, যদি তাদের আপনি নিজের কাছ থেকে সরিয়ে না রাখেন। এই হ'ল ডাক্তারি মত। আর মানুষ হিসেবে আমার মত হ'চ্ছে যদি কোন মহীয়সী মহিলা সব জেনেশুনে আপনার সঙ্গে মাল্য বিনিময় করতে রাজী হয় তাহলে ক'রে ফেলুন বিয়ে। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তা হবে এবং যখন হবে তখন তার ব্যবস্থা করা যাবে, in the meantime খানিকটা আমোদ ক'রে নিন না, ক্ষতি কি! আমাদের শাস্ত্রে বলে আমাদের শরীরে সব রকম রোগের বীজাণু ঢুকছে বেরুচ্ছে, কতকগুলো আড্ডা গেড়েই আছে, সংস্কৃতে বলেছে—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং, পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত বিয়ে হয়েছে, যত প্রেমালিঙ্গন হয়েছে, তা হয়েছে একটি ব্যাধিমন্দিরের সঙ্গে আর একটি ব্যাধি-মন্দিরের। সুতরাং লেপ্রসি নামক ব্যাসিলাসের সম্বন্ধে অত বেশী রকম শুচিবায়ুগ্রস্ত হবার কোনও কারণ দেখি না। আমরা সমুদ্রে শয্যা পেতেই আছি, শিশিরকে ভয় করবার কোন মানে হয় না।"

"কিন্তু এসব কথা শুনে কি কোনও মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে ?"

"কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষ বড় বিচিত্র জীব। সে সব করতে পারে। আমি একটি লোককে জানি সে অসতী মেয়েকে অসতী জেনেও বিয়ে করেছে, কারণ তাকে সে ভালোবাসত। ভালোবাসায় সব অসম্ভব সম্ভব হয়। সে লোকটি গ্রেট ম্যান, শুধু গ্রেট নয়, ভেরি গ্রেট !"

"কি রকম ? অসতী মেয়েকে বিয়ে করেছে ?"

"গল্পটা তাহলে বলি। লোকটির প্রথমপক্ষে একটি বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ছেলে হচ্ছিল না। কেন হ'চ্ছে না জানবার জন্যে সে আমার কাছে এল। সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমি তার সিমেন পরীক্ষা ক'রে দেখলুম তার ছেলে হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মেয়েটার মধ্যে কোনও দোষ পেলুম না। হঠাৎ একদিন শুনলুম মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। চুকেবুকে গেল, এরকম হামেশাই হ'চ্ছে। বছরখানেক পরে ছোকরার সঙ্গে আবার দেখা। উষ্কখুষ্ক চুল, তাগড়া চেহারা, মুখময় গোঁফ দাড়ি, দেখে হঠাৎ ডাকাত ব'লে মনে হ'ল। চিনতেই পারিনি প্রথমে। পরে পারলাম। বললে, কোন কাজ পাচ্ছি না। দু'দিন খেতে পাইনি। যদি কিছু ব্যবস্থা ক'রে দেন। তখন আমার বাড়িটা হচ্ছিল। বললাম, যদি মাটি কোপাতে পার কাজ আছে। আমার বাড়ির ভিত খোঁড়া হ'চ্ছে সেইখানে চ'লে যাও। বিনা প্রতিবাদে চ'লে গেল। দিন পনরো মাটিও কোপালে, তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলুম সে একজন আর্টিস্ট। আমার কণ্ট্রাকটর বললে, দুপুরে যখন খাওয়ার ছুটি থাকে তখন ও খেতে যায় না, গাছতলায় ব'সে ছবি আঁকে। ডেকে পাঠালুম। বললাম, তোমার ছবি দেখাও। ছবি দেখে তাক লেগে গেল। সব ছবিগুলো কিনে নিলুম। বললুম, তোমাকে আর কোদাল চালাতে হবে না, তুলি চালাও। আমারই বাড়ির পিছন দিকের একটা ঘরে তাকে থাকতে দিলুম। কিছুদিন পরে দেখি শুঁটকো রোগা বেণী-দোলানো স্যাণ্ডাল-পরা একটা মেয়ে রঙীন শাড়ী প'রে তার কাছে আসতে আরম্ভ করেছে। শুনলুম সেও নাকি আর্টিস্ট। আপত্তি করবার কোন হেতু খুঁজে পেলুম না। ও মশায়, দিনকতক পরে ছোকরা এসে আমাকে সেই প্রশ্নই জিগ্যেস করলে, যা আপনি আজ করছেন। আমার কি বিয়ে করা উচিত ? আপনাকে যা বললাম, তাকেও তাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, মেয়েটিকে সব কথা খুলে বল, বল যে আমার সন্তান হবার আশা নেই, এ জেনেও যদি সে রাজী থাকে, ঝুলে পড়। ছোকরা বলল, একটি মেয়ে তো নিঃসন্তান জীবন যাপন করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে, এ-ও যদি তা-ই করে! বললাম, করতে পারে, না-ও করতে পারে। সবাই একরকম হয় না। তবে you must be prepared to face hysteria.—ওটা কোন-না-কোন আকারে দেখা দেবেই। শুনে ছোকরা চুপ ক'রে রইল, তারপর চ'লে গেল। মাস কতক কেটে গেল, কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবলুম ফাঁড়া বোধহয় কাটল। কিন্তু দেখলুম কাটেনি।"

ঘোষালের পাইপ নিবে গিয়েছিল, সেটা ভাল ক'রে ধরিয়ে আবার তিনি শুরু করলেন।

"হঠাৎ একদিন এসে বলল আলেয়ার পেটে ভারী ব্যথা হ'চ্ছে। একটু যদি দেখেন—। দেখলুম গিয়ে। নিয়ে গেলুম হাসপাতালে। Acute Abdomen. পেট কাটতে হ'ল। লম্বা ইনসিশন (incision) দিতে হয়েছিল। পেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একজায়গায় obstruction পেলুম প্রায় তলপেটের কাছাকাছি। সেই সময় লক্ষ্য করলুম ইউটেরাসটি বেশ বড়, সম্ভবত gravid, তিনমাস পোয়াতি মনে হ'ল। একটু অবাক হলুম। দিন তিনেক যমে মানুষে টানাটানি চলল, তারপর বেঁচে গেল মেয়েটা। ছোকরা মেয়েটার শিয়রে দিনরাত ব'সে থাকত। মেয়েটা যখন একটু ভালো হ'ল তখন খবরটি তাকে বললুম। বললুম—ওর সঙ্গে আর বেশী মাখামাখি কোরো না, ও পোয়াতি হয়েছে। শুনে ছোকরা প্রথমটা গুম হ'য়ে রইল, তারপর সবেগে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলাম একটা খুনখারাপি না হয়, অনুতাপ হ'তে লাগল, খবরটা ব'লে হয়ত ভুল করেছি। আমাদের প্রফেসনাল এটিকেটের বাইরে গেছি। পরদিন শুনলাম আমার বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে সে। আরও চিন্তা হ'ল। প্রায় মাসখানেক আর দেখাও পেলাম না। তারপর যখন তার কথা ভুলব-ভুলব করছি, তখন দেখি সে একদিন একটি হলদে খাম হাতে ক'রে বিকশিতবদনে আমার বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলেয়াকে বিয়ে করবে, নেমন্তন্ন করতে এসেছে। বললে, ছেলেপিলে না হ'লে ওর জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে এই ভয়ে ওকে বিয়ে করিনি। কিন্তু যখন আপনার কাছে শুনলুম ও সন্তানসম্ভবা, তখন সে ভয়টা কেটে গেল। ওকে সব খুলে বলেছি, ওরও সব কথা জেনেছি আমি। সব জেনেশুনেই আমরা বিয়ে করছি। বিয়ে হ'য়ে গেল, একটি সুন্দর খোকা হ'ল, একটি খোলার ঘর ভাড়া ক'রে বেশ সুখে ছিল ওরা। আমি ওকে দিয়ে কিছু ছবি আঁকালুম। যে সব রোগীর মুখ চোখ চেহারা দেখেই রোগ ধরা যায় সে সব রোগীর অনেক ছবিও আঁকিয়েছি ওকে দিয়ে। বেশ সুখে ছিল। এখন কিন্তু আবার নূতন একটা ভূত ওর কাঁধে চেপেছে। বললে একদিন—আমরাও যাতে একটা ছেলে হয় তার ব্যবস্থা আপনাকে ক'রে দিতে হবে। শুনছি আজকাল নাকি এরকম ইন্‌জেক্‌শন বেরিয়েছে, আপনি তো সবই জানেন—। কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্‌জেকশনগুলো বেশ দামী। তাই দিচ্ছি, ওর শখ মিটুক। শুনছি জ্যোতিষীদের কাছেও নাকি হাত দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। একদিন আমার কাছে এসে বললে, আমার সিমেন আবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন। আমি বলেছি—আর পরীক্ষা করবার দরকার নেই। যে রকম কড়া ইন্‌জেকশন নিয়েছ তাতে আমার মনে হয় সব ঠিক হ'য়ে গেছে। আমি জানি, ও ঠিক হবে না। কিন্তু সে কথা ওকে ব'লে লাভ নেই। একদিন মহানন্দে এসে খবর দিয়ে গেল—আলেয়া আবার নাকি সন্তানসম্ভবা। মেয়েটা আপনাদের স্ট্যাণ্ডার্ডে অসতী। ওরা কিন্তু খুব সুখে আছে। আমি এইটেই আসল মনে করি, you must adjust your সমাজ, your morals, your

economy, your politics accordingly. সুখ শান্তিই কাম্য। আমি যে মেয়েটাকে মানুষ করেছিলুম সে ছিল মুসলমানের মেয়ে, আমি অনায়াসে তাকে শুদ্ধি ক'রে নিয়ে হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতুম, একটা কাহার ছেলে টাকার লোভে রাজীও হয়েছিল, কিন্তু আমি মেয়েটাকে জিগ্যেস করলুম, তোর কি ইচ্ছে। সে বলল, আমি মুসলমানকে বিয়ে করলেই সুখী হব। তাই দিলুম—"

ডাক্তার ঘোষালের আবার পাইপ নিবে গিয়েছিল। সেটাতে আবার তামাক পুরে ধরাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ছকু একটা রঙীন ট্রের উপর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে এসে হাজির হ'ল দ্বারপ্রান্তে। তাকে এসব করতে কেউ বলেনি, কিন্তু এইটেই তার বিশেষত্ব, তার অন্যমনস্ক মনিবের অনুচ্চারিত হুকুম তামিল ক'রে সে ভারী একটা গর্ব বোধ করে। এটা তার বাহাদুরী। বিশ্বদীপও এজন্য তার উপর খুশী।

দুজনেই গ্লাস দুটো তুলে নিলেন।

ঘোষাল বললেন, "আপনি বিদুলাকে ব্যাপারটা বলুন না খুলে, তারপর তাকে আমার কাছে রেফার ক'রে দিন—"

বিশ্বদীপ সবিস্ময়ে ভুরু দুটো তুলে চেয়েছিলেন ঘোষালের দিকে। বিদুলার খবর উনি পেলেন কি ক'রে! ঘোষালের মুখে একটি নীরব হাসি প্রায় আকর্ণবিস্তৃত হ'য়ে উঠল। বললেন, "আমি সব জানি, সব খবর রাখি।"

"কে বললে আপনাকে?"

"হাওয়া—"

একটু চুপ ক'রে থেকে বিশ্বদীপ প্রশ্ন করলেন, "আপনি যে আর্টিস্টের কথা এতক্ষণ বললেন তিনিই কি নবনীবাবু, যাকে আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন?"

"নামটা বলা আমার পক্ষে উচিত হবে না। You may guess anything আমি লোকটিকে শ্রদ্ধা করি, both as an artist and as a man."

পাশের ঘরে ফোনটা বেজে উঠল।

ঘোষাল বললেন, "আমি তাহলে উঠি এখন। কাল তাহলে সিমেণ্ট পাচ্ছি তো?"

"নিশ্চয়—"

ঘোষাল চ'লে গেলেন।

ফোন ধ'রে বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলেন বিশ্বদীপ।

"হ্যালো, আমার এখানে আসতে চান? এখনি? মাপ করবেন, কে আপনি তা ঠিক চিনতেই পারছি না।"

"আমি মহুয়া। একটু আগেই তো আপনার সঙ্গে কথা হ'ল আমাদের মীটিংয়ে। আপনার প্রস্তাব নিয়ে আমি আলোচনা করেছি সকলের সঙ্গে। এখনও ঠিক কোন মীমাংসায় আসতে পারিনি। ধাকরই বাধা দিচ্ছে বেশী। সে বলছে আমরা বেশী

টাকা চাই না, বেশী টাকা পেলে আমরা বরবাদ হ'য়ে যাব। আর রামু বলছে আমরা ব্যবসার কিছু বুঝি না, বাবুরা আমাদের ঠকাবেন। সে জানতে চাইছে ব্যবসার অংশীদার হ'লে মাসে আমরা কত টাকা ক'রে আশা করতে পারি।"

"সে কথা পাঠকজিকে জিগ্যেস না ক'রে বলতে পারব না। আমার প্রস্তাবও পাঠকজির অনুমোদনসাপেক্ষ। তাঁর সঙ্গে আগে কথা ক'য়ে নি—"

"এ ছাড়া আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারও বলতে চাই আপনাকে। আসব ?"

"এস—"

একটু পরেই একটা রিক্শ ক'রে এসে হাজির হ'ল মহুয়া। বিশ্বদীপ লক্ষ্য করলেন তার কানের পাশে আর গলার কাছে পাউডার লেগে রয়েছে। মহুয়া এসেই প্রণাম করল তাঁকে। তারপর ঘাড় নীচু ক'রে মুখখানা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্বদীপ আবার লক্ষ্য করলেন তার ঘাড়ের কাছে দু'একটি পাতলা চুল ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে। এও লক্ষ্য করলেন বড় রোগা মেয়েটি, গলার কাছের হাড় দুটো উঁচু হ'য়ে রয়েছে।

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—"

মহুয়া সসংকোচে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসল। তারপর মাথা আরও নীচু ক'রে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আজ আপনার মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছি ব'লে আপনাকে এ কথা বলতে সাহস করছি। এটা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা, যদি কিছু না-ও করতে পারেন, কাউকে যেন বলবেন না।"

"কি বল—"

"এটা হয়তো আপনার কাছে বলাও আমার উচিত হ'চ্ছে না। কিন্তু আর যে কি করব তা-ও ভেবে পাচ্ছি না।"

"কি বল, শুনিই না।"

"আমার যিনি 'বস্' মিস্টার সিন্হা, তিনি কিছুদিন থেকে রোজ আমার কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করেছেন। এতে লোকে নানা কথা বলাবলি করছিল। শামার মা আমার সঙ্গে থাকে, তাকে জিগ্যেস করলুম কি করা যায়। শামার মাকে দেখেছেন ? তালের মতো ভারী মুখ তার। তার উপর সর্বদা গালে পান গুঁজে থাকে। সহজে কথা কয় না। কোনো উত্তর দিলে না। দ্বিতীয়বার জিগ্যেস করাতে বললে, আসছে আসুক না। দেখাই যাক না ওর দৌড় কতদূর, যদি বিয়ে করে ভালোই তো। ঘর বাঁধতে পারবি। শামার মায়ের অবস্থা একটু ভালো। শামা একটা রেশন শপের মালিক। আমাদের অনেকে তার দোকান থেকে জিনিস কেনে, আমিও কিনি। সেইজন্যে শামা আর শামার মায়ের খুব প্রতিপত্তি ফ্যাকটারির কুলি মহলে। কাল সন্ধ্যার সময় আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, সেই সময় মিস্টার সিন্হা এসেছিলেন। সেই সময় শামাও বাড়িতে ছিল। শামা নাকি মিস্টার সিন্হাকে গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে বের ক'রে দিয়েছে বাড়ি থেকে। এ নিয়ে আমাদের পাড়ায় ভারী

হৈ চৈ হয়েছে। আমি যখন ফিরলুম তখনও দেখি শামা আর শামার মায়ের বচসা থামেনি। শামা বলছে, আমি মহুয়াকে বিয়ে করতে চাই। ও যদি আমাকে বিয়ে না করে তাহলে ওকে আমি আমার বাড়িতে থাকতে দেব না। লোকে নিন্দা করছে। শামার মা বলছে, তোমাকে স্বজাতের মেয়ে বিয়ে করতে হবে। মহুয়াকে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে বাঙালীন, কোন্ জাত ঠিক নেই, ওকে আমি পুত্রবধূ করতে পারব না। এসব কথা শুনে কাল রাত্রেই আমি শামার বাড়ি ছেড়ে চ'লে এসেছি। সমস্ত রাত শিয়ালদ' স্টেশন-প্লাটফর্মে ছিলাম। প্ল্যাটফর্ম থেকেই আজ মীটিংয়ে গিয়েছিলাম। মীটিংয়ের পর শামার মা আমাকে বাড়িতে ফিরে যাবার জন্তে পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগল, কিন্তু আমি যাইনি। শামার মা আমাকে বলল যে রামুর দল তার হাতের মুঠোর মধ্যে, সবাই প্রায় শামার দোকানে ধারে জিনিসপত্তর কেনে—আমি যা ঠিক করব তাই হবে। মীটিংয়ের পর আমি মিস্টার সিন্‌হার বাড়িতেও গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম সব। এ-ও বললাম যে আমার মাথা গোঁজবার কোনও জায়গা নেই। তিনি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর কপালে কয়েকবার আঙুল ঠুকে বললেন, এক কাজ করতে পারি। তুমি আমার বাড়িতে ঝি হ'য়ে বহাল হ'য়ে যাও। আমার ঝিটা কাল থেকে আসছে না। আমার স্ত্রী ভারী অসুবিধায় পড়েছেন। আমার বাড়ির পিছনে একটা 'লাম্বার রুম্' আছে, সেটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তুমি থাকতেও পার। মিস্টার সিন্‌হা যে বিবাহিত তা আগে আমি জানতাম না। বললাম, আচ্ছা, দেখি অন্য কোথাও চেষ্টা ক'রে যদি কিছু পাই। কিন্তু কোথাও কিছু পাচ্ছি না। শিয়ালদ'র পুলিসরাও তাড়া করছে, থাকতে দিচ্ছে না। কি যে করব তাই ভাবছি। আপনি কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন? আমি ফ্যাকটারির কাজের পর পড়াশোনা করতে চাই। একটা নাইট কলেজে ভরতি হতে পারব এ ভরসা দিয়েছেন একজন অধ্যাপক। কিন্তু একটা ঘর যোগাড় করতে পারছি না। ফ্যাকটারির পিছনে গুদোমঘরের পাশে ঘর আছে কয়েকটা—"

"সে ঘর তোমাকে দিলে অন্য শ্রমিকরাও চাইবে। পাঠকজি তাতে রাজী হবেন না। তিনি গুদোমঘরের কাছে দারোয়ান ছাড়া কাউকে থাকতে দিতে চান না। আচ্ছা, আপাতত তুমি এইখানেই থাক। ছকু—"

ছকু আসতেই তিনি বললেন, "বাগানের ওধারে যে ঘরটা আছে সেটা এঁকে খুলে দাও। দুটো ঘরই খুলে দাও। দুটোই তুমি ব্যবহার করতে পার।"

মহুয়া প্রণাম ক'রে চলে গেল।

বিশ্বদীপের হাতা-ওলা প্রকাণ্ড বাড়ি। জায়গার অভাব নেই।

মহুয়া চ'লে যাবার পর টোটো হাজির হ'ল হঠাৎ।

"আপনার বাগানের ঘরের চাবিটা দিন তো। ওখানেই আমার খরগোশগুলোকে রাখব ভেবেছি। দিদি ও নিয়ে দিনরাত খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে—"

'ও ঘর দুটোতে মহুয়াকে থাকতে দিয়েছি।"

"মহুয়াকে ?"

"হ্যাঁ।"

"You mean আমাদের ফ্যাকটারির মহুয়াকে ?"

"হ্যাঁ—"

"কেন ?"

"বিপদে পড়েছে বেচারী—"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল টোটো।

বিশ্বদীপ বললেন, "তোমার খরগোশগুলোকে আমার ল্যাবরেটরিতে দিয়ে দাও। যদিও আজকাল ল্যাবরেটরির কাজ তেমন করি না, কিন্তু করবার ইচ্ছে আছে। যে সব প্রাণী উদ্ভিদ্‌ভোজী তাদের নিয়ে একটা experiment করব।"

"মেরে ফেলবেন না তো ?"

"আরে না না। তাদের প্রত্যেককে কেবল একরকম উদ্ভিদ্ খেতে দেব। কাউকে কপিপাতা, কাউকে পালংশাক, কাউকে দুর্বো ঘাস, কাউকে শিম। তারপর তাদের stool মাইক্রসকোপে পরীক্ষা ক'রে দেখব, হজম হবার পর সেই বিভিন্ন উদ্ভিদ্‌গুলির কি রকম রূপান্তর হয়েছে। দরকার হ'লে সেগুলোর ফোটো তুলব, কিংবা ছবি আঁকাব।"

টোটোর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হ'য়ে গেল।

"এসব উদ্ভট চিন্তা আপনার মাথায় ঢোকে কি ক'রে বলুন তো! আমার খরগোশগুলো ঘাস ছাড়া কিছু খাবে না। পরশু জ্যামমাখানো পাউরুটি দিয়েছিলাম, স্পর্শ করলো না—"

"দু'দিন উপোস করিয়ে রাখলে সব খাবে।"

মহুয়া আবার প্রবেশ করল এবং টোটোকে নমস্কার ক'রে বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে বলল, "আমার জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে আসছি তাহলে। খাটটা বিক্রি ক'রে দিয়েছি, আপনার ঘরের মেঝে তো পাকা। আমি মাটিতেই শোব। ওই টাকা দিয়ে বরং বই কিনব কিছু—"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমার কাছে পুরোনো কিছু বই আছে—Elementary Chemistry Physics-এর। তোমার যদি কাজে লাগে নিতে পার।"

মহুয়ার মুখে একটা সলজ্জ কৃতজ্ঞতার আভা ফুটে উঠল।

"পুরোনো বই চলবে কি ? আচ্ছা, এসে দেখব।"

মহুয়া চ'লে যাবার পর টোটো অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, চলি—" সহসা সবেগে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে তার মনে হ'ল বিদুলাকে খবর দেওয়া উচিত। টেলিগ্রাম ক'রে দিল একটা।

টোটো চ'লে যাবার পর চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ। নিজেকে বড় অসহায় মনে হ'তে লাগল। যে সমাজে তিনি বাস করছেন, যে সমাজে তাঁকে বাস করতে হবে, সে সমাজ তো অনুকূল নয়। কোথায়ই বা যাব! তারপর তাঁর মনে হ'ল পাঠকজির সঙ্গে স্ট্রাইকের বিষয়ে একটু কথা কওয়া দরকার। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে হ'লে টালিগঞ্জে তাঁর বাসায় যেতে হবে। তিনি ফোন নেননি। কোনওরকম বিলাসিতাকেই প্রশ্রয় দেননি তিনি। প্রকাণ্ড একটা ঘরে বিরাট একটা বিছানা মেঝেতে পেতেছেন, তারই একধারে একটা কাঠের ডেস্কের সামনে ব'সে চিঠিপত্র লেখেন। চিঠিপত্র লিখেই সাধারণতঃ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হয়। তোতলা ব'লে তিনি আপিসে আসেন না। আগে স্বপাকে খেতেন, এখন শুকুল ব'লে একটি মিথিলা-বাসী র'াধুনী রেখেছেন, নিজে এখন আর পেরে ওঠেন না। শুকুল শুধু র'াধুনী নয়, সে তাঁর চাকর কোচোয়ান, প্রাইভেট সেক্রেটারি, এমন কি বন্ধুও। শুকুলের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সে তাঁর মুখ দেখেই তাঁর মনের কথা টের পায়। পাঠকজির চোখের দৃষ্টি থেকেই সে বুঝতে পারে তিনি কি চান, তাঁর মেজাজ কেমন। শুকুলকে পার না হ'য়ে পাঠকজির কাছে পৌঁছবার উপায় নেই। বিশ্বদীপ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। উঠতে ইচ্ছে করল না। চ'লে গেলেন মানসপুরে।

নয়

মানসপুরে গিয়ে বিশ্বদীপ দেখলেন ধানগাছগুলো সব শস্যভারে শুয়ে পড়েছে মাঠে, আর অসংখ্য বুলবুলির দল পাকা ধানের শীষ মুখে ক'রে উড়ে যাচ্ছে রুদলবাবুর গোলার দিকে। বিরাট একটা কোলাহল প'ড়ে গেছে। সবিস্ময়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখছিলেন বিশ্বদীপ। উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে চারদিক, ঘননীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। বাঁশপাতি পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। আর লক্ষ লক্ষ বুলবুলি ছুটেছে রুদলবাবুর গোলার উদ্দেশে। কোথায় তাঁর ধানের গোলা? বুলবুলির দল দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মানসপুর কত বড়? কোথায় তার শেষ? এই সব কথাই মনে হচ্ছিল বিশ্বদীপের। হঠাৎ থপ্ ক'রে কি যেন একটা পড়ল তাঁর কাঁধের উপর। তারপর তিনি শুনতে পেলেন কে যেন আকুলকণ্ঠে বলছে—"আপনার বুকপকেটটা একটু ফাঁক করুন। আমি ঢুকে পড়ি—"

বুকপকেটটা ফাঁক করতেই বিশ্বদীপের মনে হ'ল রংবাহারী ঢুকে পড়ল তার ভিতর।

"আমাকে কোনও অন্ধকার জায়গায় নিয়ে চলুন।"

দক্ষিণদিকে একটু দূরে কয়েকটা গাছকে ঘিরে ফেলেছিল তেলাকুচো লতা। এই উজ্জ্বল রোদে মনে হচ্ছিল একটা ঘনসবুজ দুর্গ যেন দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকেই গেলেন বিশ্বদীপ। কাছে গিয়ে আবিষ্কার করলেন ভিতরে ঢোকবার একটা পথও

আছে। ঢুকে দেখলেন বেশ অন্ধকার। রংবাহারী তাঁর পকেট থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে উড়ে বসল একটা পাতার উপর।

"এমন চমৎকার একটা জায়গা আছে, আমি তো দেখতে পাইনি। আঃ বাঁচলুম—"

বিশ্বদীপ দেখলেন রংবাহারীর রং মলিন হ'য়ে গেছে। ডানা থেকে মাঝে মাঝে রং উঠে গেছে যেন। মনে হ'ল খুব যেন শ্রান্তক্লান্ত।

"তোমার শরীরটা খারাপ নাকি?"

"খুব খারাপ। মুরুব্বী আমাকে দিনের জগতে এনেছে বটে, কিন্তু এ জগতে আমি থাকতে পারছি না। নওরঙ্গী আর সোনাহলুদ আমার সঙ্গে খুব ভদ্রতা করেছে, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, সবাই ভদ্র ব্যবহারও করেছে আমার সঙ্গে। ফিঙে পাখীও আশ্বাস দিয়েছে আমাকে কিছু বলবে না। তবু কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। আমার মনে হ'চ্ছে ওদের ভদ্রতাটা যেন মৌখিক, ওরা যেন মুরুব্বীর খাতিরেই আমাকে কিছু বলছে না। আমি ওদের আপনার লোক হ'য়ে যেতে পারি নি। আপনার লোক হ'লে মাঝে মাঝে ঝগড়া হ'ত, কেউ গালাগালি দিত, তা বরং ভালো লাগত। কিন্তু এখানে দেখা হলেই সবাই মুচকি হেসে নমস্কার করে আর ভদ্রতার বেড়ায় ঘিরে ফেলে নিজেদের। সে বেড়া পার হ'য়ে ওদের কাছে যাবার উপায় নেই। আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। ভাবছিলাম দিনের আলোয় আর বেরুব না। রাত্রির প্রগাঢ় নিবিড়তায় যে সুখ পেয়েছি দিনের আলোয় তা নেই। দিনের আলো সব নগ্ন ক'রে দেয়, তাই প্রত্যেকে এক একটা আবরণে ঢেকে রাখে নিজেদের। সে আবরণ ভেদ করবার সাধ্য আমার নেই। ওদের কঠিন আবরণে মাথা ঠুকে ঠুকে আমি মৃতপ্রায় হয়েছি। আমি দিনের আলো থেকে পালাতে চাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, ক'দিন থেকে রাত আর আসছে না, সূর্য অস্ত যাচ্ছে না। সূর্যদেব বলেছেন, রুদলবাবুর সব ধান যতক্ষণ না বুলবুলিরা গোলায় তুলে দিচ্ছে ততক্ষণ তিনি মানসপুর থেকে অস্ত যাবেন না। কারণ রাত হ'লে বুলবুলিরা কাজ করতে পারবে না, আর ধান বেশীদিন জমিতে প'ড়ে থাকলে প'চে যাবে। আমি কি করি বলুন তো—।"

বিশ্বদীপ বললেন, "তুমি এইখানেই থাক খানিকক্ষণ। আমি ফিরে যাবার সময় তোমাকে না হয় সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার বাড়িতে একটা 'ডার্ক রুম' আছে সেইখানে না হয় থেকো।"

"ডার্ক রুম কি?"

"ফোটো তুলে যেখানে ডেভেলাপ করি। আমার সঙ্গে ছোট একটা ক্যামেরা থাকে, এখনও আছে, দাঁড়াও তোমার ফটো তুলি।"

পকেট থেকে ছোট ক্যামেরাটা বার ক'রে রংবাহারীর ছবি তুললেন একটা।

"তুমি তাহলে এইখানেই বস। আমি আসছি একটু পরে।"

বিশ্বদীপ বেরিয়ে চেনা কাউকে দেখতে পেলেন না। ধানক্ষেতটা পেরিয়ে সিংহের খোঁজে যাবেন ভাবছিলেন, এমন সময় ধানক্ষেতের মাঝে যে কাক-তাড়ুয়াটা ছিল সেটা হঠাৎ কথা ক'য়ে উঠল।

"বিশ্বদীপবাবু, কখন এলেন? আমি রুদ্দলবাবুর ধানক্ষেত পাহারা দিচ্ছি, কাকেরা বড় জ্বালাতন করছে।"

কাক-তাড়ুয়া রূপান্তরিত হ'য়ে গেল মুরুব্বীতে প্রবীণ একজন মজুর যেন। বিশ্বদীপের কাছে এসে বলল, "কাণ্ডটা দেখেছেন। আকাশে সূর্য পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আর কি খাটানটাই খাটছে ওই বুলবুলিরা—"

বিশ্বদীপ ক্যামেরা বার ক'রে ফোটো তুললেন, একটা মুরুব্বীর, আর একটা ধানক্ষেতের।

"ওটা কি বস্তু?"

"ক্যামেরা। ওতে ছবি তোলা যায়।"

"ও, রুদ্দলবাবুর কাছে ওর নাম শুনেছি। রুদ্দলবাবু নানারকম জিনিস সংগ্রহ করেছেন, এটা কিন্তু তাঁর নেই। তাঁর মতে বাইরের ছবিকে ধ'রে রাখা আর পাখীকে খাঁচায় পুষে রাখা এক জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। প্রতিমুহূর্তে কত ছবি হচ্ছে আর মুছে যাচ্ছে। এইটেই স্বাভাবিক। পাখীরা যেমন দল ধ'রে থাকে, ছবিরাও তাই। একটা ছবিকে দল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কোনও মানে হয় না। আপনি কোন্ দিকে যাবেন? রুদ্দলবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি কপাট বন্ধ ক'রে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আর চাকরদেরও বলেছেন ঘুমুতে। অর্থাৎ তিনি যে বুলবুলিদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন এইটে দেখাতে চান। আমাকেও ঘুমুতে বলেছিলেন। কিন্তু আমার ঘুম হয় না। না দিনে, না রাত্রে। খুব যখন ক্লান্ত লাগে তখন বধূসরা নদীতে গিয়ে ডুবে ব'সে থাকি খানিকক্ষণ। ওতেই আমার ঘুমের কজে হ'য়ে যায়। বধূসরা কিন্তু উন্মনা হ'য়ে পড়েছে ক'দিন থেকে। আপনার ওই সাগর-সঙ্গম ওকে ব'লে গেছে যে সব নদীকেই শেষ পর্যন্ত সাগরে মিলতে হবে। যে নদী সাগরে পৌঁছতে পারল না তার জীবনই বৃথা। কথাটা শুনে ও উতলা হয়েছে একটু। এখানে কাছেপিঠে সাগর নেই, আছে পাহাড়ের ওপারে। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে বধূসরা যাবে কি ক'রে। অথচ ওর মনে মনে ইচ্ছেটা ক্রমশই প্রবল হ'য়ে উঠছে বুঝতে পারছি। রুদ্দলবাবুকে বলব, দেখি তিনি কি বলেন।"

বিশ্বদীপ জিগ্যেস করলেন, "বধূসরা নদী কোথায় গিয়ে পড়েছে—"

"পড়েছে গিয়ে উৎপলেশ্বরী বিলে। সে-ও সাগরেরই মতো। এপার ওপার দেখা যায় না। সব রকম পদ্ম ফোটে সেখানে। এমন কি নীলপদ্ম পর্যন্ত। নানারকম হাঁস যদি দেখতে চান, তাহলে চ'লে যান উৎপলেশ্বরী বিলে। সেদিন রাজহংস দুটো এসেছিল ওই বিল থেকেই। আপনি যখন এলেন তখন তারা চলে গিয়েছিল। তারা সাধারণতঃ

কোন শব্দ করে না। কিন্তু সেদিন বধূসরার অনুরোধে কথা বলেছিল। প্রথম হাঁসটি বললে, 'আমার মনে হয় বলবার কিছু নেই।' দ্বিতীয় হাঁসটি বললে, 'আমি এ কথার সমর্থন করি।' এই ব'লে তারা দুটি সাদা মেঘের মতো উড়ে চ'লে গেল হিমালয়ের দিকে। বছরে একবার ক'রে উৎপলেশ্বরী বিলে আসে তারা। বধূসরার কিন্তু উৎপলেশ্বরী বিলে আর মন ভরছে না, সে সাগর চায়। এখন যদি তার কাছে যান আর তার সঙ্গে যদি দেখা হয়, কেবল সাগরের কথা বলবে। আমি ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে সাগরে যাওয়ার অনেক বিপদ আছে, রবিন্সন ক্রুশোর গল্পটা বললুম ওকে। শুনে একটু হেসে বললে, আমি কচি খুকী নই যে ও গল্পে ভুলব। সাগরে বিপদ আছে বলেই তো সেখানে যেতে চাই। এই ব'লে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে আর অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আরে, আবার কাকের দল এসে হাজির হয়েছে। আমি চললুম।"

মুরুব্বী তাড়াতাড়ি চ'লে গিয়ে আবার কাক-তাড়ুয়া হ'য়ে গেল।

কলিং বেলটা ঝনৎকার দিয়ে উঠল। মিলিয়ে গেল মানসপুর। ছকু এসে খবর দিল পাঠকজি এসেছেন।

দশ

পাঠকজি এসে তাঁর কাঠের চেয়ারটিতে গিয়ে বসলেন। তিনি গদি-আঁটা চেয়ারে ব'সে অস্বস্তি ভোগ করেন। তিনি বসতেই ছকু কাঠের ছোট টেবিলটি এগিয়ে দিলে তাঁর সামনে। ছকু জানে তিনি লিখে কথাবার্তা কন। পাঠকজি আসাতে বিশ্বদীপ অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন। তাঁরই যাওয়া উচিত ছিল। বললেন, "আমিই যাচ্ছিলাম এখনি।"

পাঠকজি প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। বিশ্বদীপের মনে হ'ল একটা মৃদু হাসির আভা যেন ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর চোখে-মুখে। শুকুল ঘরে ঢুকে তাঁর কাগজ-পত্রের ব্যাগটি একপাশে রেখে, মসলার কৌটোটি তাঁর হাতে দিয়ে বলল, "আমি গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি, ঘোড়ার জন্য ঘই কিনতে হবে।" পাঠকজি তার দিকে চেয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল তুললেন। শুকুল বলল, "মনে আছে, দুটো খাতাও আনব।" শুকুল বেরিয়ে গেল। পাঠকজি মোটর চড়েন না, তাঁর একটি সেকেলে ভিক্টোরিয়া গাড়ি আছে। সেইটেতে চড়েই তিনি ঘোরাফেরা করেন। শুকুলই গাড়ি চালায়, ঘোড়ারও তত্ত্বাবধান করে। পাঠকজি তারপর ব্যাগ থেকে কাগজ, কারবন পেপার আর পেনসিল বার করলেন। প্রথমেই লিখলেন, "স্ট্রাইকের কি হল?"

"এখনও কিছু হয়নি। দুটো দল হয়েছে। একটা দল বলছে, দ্বিগুণ মাইনে চাই। জিনিস-পত্রের দাম যদি আরও বাড়ে তাহলে আরও মাইনে বাড়াতে হবে। এ ছাড়া

তারা তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে বলছে। দ্বিতীয় দল বলছে, মাইনে তিনগুণ ক'রে দিলেই তারা সন্তুষ্ট। আর কিছু চায় না আপাতত। আমি ওদের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছি। আমি বলেছি, তোমরাও আমাদের এ ব্যবসায়ের অংশীদার হও। এটা আমাদের সকলের ব্যবসা হোক। যা লাভ হবে তা আমরা সমান অংশে ভাগ ক'রে নেব। মহুয়া ব'লে একটি মেয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। সে ওদের কারো দলে নয়। সে বলেছে, ওদের বুঝিয়ে সে আমার প্রস্তাবে রাজী করাবে। এখন আপনি বলুন ওদের কি করা উচিত—"

পাঠকজির মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন বিশ্বদীপ। মনে হ'ল তিনি যেন দম বন্ধ ক'রে আছেন। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে লিখলেন, "ওদের দূর ক'রে দাও। আমি ভেবেছি আপাতত ফ্যাকটারি দিনকতক বন্ধ রাখলেও ক্ষতি নেই। আমাদের সাবানের স্টক যথেষ্ট আছে। তারপর কম লোক রেখে কম সাবান তৈরি করব আর সাবানের দাম বাড়িয়ে দেব। তাতেই মনে হয় পুষিয়ে যাবে। যদি না পোষায় তাহলেও কি করব আমি ভেবে রেখেছি। অম্বরের ইচ্ছা ছিল না আমরা এ সাবান নিয়ে ব্যবসা করি। তাই ভেবেছি ব্যবসা যদি না চলে তাহলে ব্যবসা আর করব না, ওটা দানই ক'রে দেবো কোন লেপ্রসি চিকিৎসককে। তোমার বন্ধু ডাক্তার ঘোষাল কেমন লোক?"

"লোক তো খুব ভালো। লেপ্রসির চিকিৎসাও করেন। বেশ সুনাম আছে। কিন্তু বড্ড বেশী খামখেয়ালী।"

"দরকার হ'লে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করা যাবে। আপাতত তুমি স্ট্রাইকারদের ব'লে দাও যে বাজারের রেট অনুসারেই আমরা তাদের মাইনে দিচ্ছি। এর বেশী আর এক পয়সাও বাড়াতে পারব না।"

এই কথাগুলি লিখে কাগজটি এগিয়ে দিলেন পাঠকজি এবং জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল বিশ্বদীপ হয়তো আপত্তি করবেন এবং তারপর চ'টে যাবেন। বিশ্বদীপ হয়তো জানেন না, কিন্তু পাঠকজি বিশ্বদীপকে মনে মনে শুধু যে সমীহ করেন তাই নয়, ভালওবাসেন। সুতরাং তিনি একটু ভয়ে ভয়েই চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপের দিকে। বিশ্বদীপের কানের ডগা দুটো লাল হ'য়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, "আপনি সেদিন বলেছিলেন যে সাবানের ব্যবসায়ের জন্য আপনি দশ লাখ টাকা রেখেছেন। সে টাকা কি ভাবে ব্যয় হবে তা কি আপনিই ঠিক করবেন? তা যদি হয় তাহলে আমি ওর মধ্যে থাকব না। আমি আমার রিসার্চ নিয়ে থাকব, বিলেতে একটা ল্যাবরেটরিতে ভালো কাজের সুযোগ পেতে পারি—হয়তো সেখানেই চ'লে যাব।"

পাঠকজি তাড়াতাড়ি লিখলেন, 'তুমি যা খুশি করতে পার। ব্যবসা তোমার, তোমার মতেই তা চলবে। আমি তোমাকে সৎপরামর্শ দিয়েছি কেবল। তা নেওয়া

না নেওয়া তোমার ইচ্ছা। টমসন সায়েবকে খবর পাঠিয়েছি, তিনি এখনি হয়তো আসবেন। আদুবাবু কি এসেছিলেন এখানে? আমার কাছে যাননি।"

"না, এখানেও আসেননি এখনও।"

কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলেন উভয়ে।

তারপর বিশ্বদীপ হঠাৎ বললেন, "আমার বাবা মায়ের কথা জানতে বড় কৌতূহল হ'চ্ছে। তাঁদের কথা কবে বলবেন?"

পাঠকজির চিবুকের নীচের দিকের মাংসটা একটু থরথর ক'রে উঠল। মসলার কৌটোটি খুলে মসলা খেলেন একটু। তারপর লিখতে লাগলেন।

"সেকথা এখুনি বলতে পারি। আগে থাকতে তোমার মন খারাপ ক'রে দেবার ইচ্ছে ছিল না। ভেবেছিলাম তোমার বিয়ের আগে সব কথা তোমাকে বলব। কারণ তোমার যা হবার তা তো হবেই, কি হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না, কিন্তু বিয়ে করবার আগে তোমার বাবা মায়ের ইতিহাসটা শুনতে হবে তোমাকে। তুমি যাকে বিয়ে করবে তাকেও শোনাতে হবে—তোমার বাবা মা দুজনেরই কুষ্ঠ হয়েছিল। তোমার বাবারই আগে হয়েছিল, আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখনই ও বলত আমার উরুতের একধারটা অসাড় মনে হ'চ্ছে। একজন ডাক্তার দেখলেন, কিছু ওষুধও দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। সেই সময়ই ওর বিয়ে হয়েছিল। উরুতের বোদা-ভাবটা যে শেষে কুষ্ঠরোগে দাঁড়াবে, এটা কেউ বুঝতে পারেনি তখন। যখন বোঝা গেল তখন অম্বর তোমার মাকে বললে, তুমি আলাদা থাক, তোমার আলাদা থাকার সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তোমার মা কিছুতে রাজী হ'ল না। তোমার বাবা যখন বিলেতে পড়তে গেল, তখন তোমার মা-ও গেল তার সঙ্গে। বললে, ওকে একলা ছেড়ে থাকতে পারব না। ওদের অবস্থা খুব ভালো ছিল, টাকাকড়ির অভাব হ'ল না। লাউপুরের বিষয়-সম্পত্তি ছাড়াও তখন ওদের কলিয়ারি ছিল দুটো। ওরা বিলেত চ'লে গেল। আমি তখন কাশীতে টোলে পড়াশোনা করছি। কিছুদিন পরে হঠাৎ এক 'কেব্‌ল' আর কিছু টাকা এসে হাজির। কেব্‌লে লেখা, টাকা পাঠালুম, অবিলম্বে চ'লে এস। খুব বিপদে পড়েছি। চ'লে গেলুম। চ'লে যাওয়া সহজ ছিল আমার পক্ষে। কারণ আমার বাবা অনেকদিন আগেই গত হয়েছিলেন। সংসারে আর কেউ ছিল না। বিয়েও করিনি, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর বিয়ে করবার অবসরও পাইনি। গিয়েই দেখলুম তার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হয়েছে। সে অবশ্য তখন ডি-এস সি পেয়েছে ফিজিক্সে। কাজও করছে একটা ল্যাবরেটরিতে। অম্বর আমাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেল। সে আমাকে টেলিগ্রাম করেনি, করেছিল তার স্ত্রী দময়ন্তী। দময়ন্তী আমাকে আড়ালে বলল, অম্বর নাকি দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ওঁর একজন সাহেব বন্ধু ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন, তিনিই ওঁর কাছে থাকেন সদাসর্বদা। একসঙ্গে পড়েছিলেন দুজনে। খুব ভালো লোক। আফ্রিকায় নাকি ওঁদের হীরের ব্যবসা আছে। উনি ওঁকে আফ্রিকায়

নিয়ে যেতে চাইছেন। বলছেন সেখানকার ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে। সেখানে নাকি ওঁদের বড় একটা ল্যাবরেটরি আছে। ঘরে বসেই কাজ করতে হবে। চেনাশোনা কোনও লোক কাছেপিঠে নেই, তাই মনের শান্তি নষ্ট হবে না। আমি ঠিক করতে পারছি না, কি করা উচিত। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তারপর অম্বরের কাছে শুনলাম, দময়ন্তী সন্তানসম্ভবা। অম্বর বললে, তুমি এসে গেছ, ভালোই হয়েছে। ছেলে মেয়ে যা-ই হোক তার ভারটা তোমায় নিতে হবে। আমাদের সংস্পর্শে তাকে আর রাখব না। দময়ন্তীরও একটা প্যাচ দেখা দিয়েছে—"

এই সময় বাধা পড়ল। মিস্টার টমসন এসে হাজির হলেন। ক্যাম্বিসের জুতো, থান, পাঞ্জাবি-পরা, ধপধপে ফরসা রং, মাথায় টাক, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। তবু কিন্তু বাঙালী ব'লে মনে হ'চ্ছে না। সায়েবই মনে হ'চ্ছে। মুখের ভাব অত্যন্ত ভদ্র বিনীত। ঘরে ঢুকেই পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "ও, পাঠকজিও আছেন, নমস্কার, নমস্কার। বিশু, আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। তোমার লাউপুরের ম্যানেজার আদুবাবু আমার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন সময় পেলে আমাকে নিতে আসবেন। লাউপুরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এখনও তো তাঁর দেখা নেই। লিখেছেন তাঁর সেখানে জরুরী কাজ আছে, আসবার সময় যদি না পান, সোজা তিনি চ'লে যাবেন সেখানে। আমি যেন টাকা নিয়ে সেখানে পরে আসি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা।"

"বসুন। কথা ছিল আদুবাবু আপনাকে নিয়ে যাবেন। লাউপুরে নাকি নানারকম হাঙ্গামা হয়েছে। সেখানকার পুলিস নাকি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাই আমি ভাবছিলাম আপনি সেখানে গেলে ঠিক বুঝতে পারবেন দোষটা কাদের। পুলিস লাইনে তো আপনি অনেকের চেনা, ওখানকার দারোগা আপনাকে দেখলে হয়তো অন্যায় করতে সাহস করবেন না। তাই বলছিলাম যদি—"

টমসন স্মিতমুখে চেয়ে ছিলেন এবং মনে মনে এই 'যদি'টার প্রতীক্ষা করছিলেন। কথাটা তিনি হেসে সম্পূর্ণ ক'রে দিলেন—"যদি আমি দয়া ক'রে সেখানে যাই, এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা। বিশু, ইউ আর এ ডারলিং। তুমি কিন্তু একটা কথা ভুলে যাও যে তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। আমার মায়ের দুধ খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছ আমরা দুজনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। তোমার বিপদে যদি আমি না গিয়ে দাঁড়াই তাহলে আই কানট্ জাস্টিফাই মাই এক্‌জিস্‌টেন্স! লিসি আর আমি জিনিস-পত্র গুছিয়ে এতক্ষণ আদুবাবুর অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু তিনি এলেন না দেখে তোমার কাছে এলাম। কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে আমাকে ব'লে দাও, আমি এখনই বেরিয়ে পড়ব। আমাকে একটা চিঠিও দিয়ে দাও।"

পাঠকজি এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে ছিলেন। এ শুনে খসখস ক'রে তিনি লিখলেন—"আপনি একা সেখানে যেতে পারবেন না। দুরূহ পথ। গেলেও কলকে পাবেন না,

আভুবাবু আরও দুরূহ। আমি আপনার সঙ্গে যাব। চারটের সময় ট্রেন আছে, তাহলে আর দেরি করবেন না, চলুন যাই।" তারপর তিনি বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে আর একটা স্লিপ লিখলেন—"গাড়িটা এখানেই রেখে যাচ্ছি। শুকুল ফিরলে বোলো যে আমরা লাউপুরে রওনা হয়েছি। সেখানে পে'ৗছে খবর দেব।"

পাঠকজি উঠে পড়লেন।

বিশ্বদীপ জিগ্যেস করলেন, "টাকা সঙ্গে আছে তো?"

পাঠকজির কোমরে লম্বা একটা গেঁজে থাকে। সেটা কোমর থেকে খুলে দেখলেন। তারপর ঘাড় নেড়ে জানালেন আছে—দু'হাতের দশটি আঙুল তুলে জানালেন দশ হাজার টাকা আছে।

"আপনারা কোথা যাবেন?"

"সোজা স্টেশনে যাওয়াই তো ভালো।"

টমসন বললেন, "লিসিকেও তুলে নিতে হবে।"

বিশ্বদীপ বললেন, "চলুন আমিই তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাদের। ছকু—"

ছকু একটা ট্রেতে কয়েক পেয়ালা চা নিয়ে আসছিল।

"চায়ের এখন দরকার নেই। শুকুল এলে বোলো সে যেন গাড়ি নিয়ে বাড়ি চ'লে যায়। বোলো পাঠকজি লাউপুরে গেছেন, কয়েকদিন পরে ফিরবেন।"

"তুমি আবার কষ্ট করছ কেন, আমরা রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ডেকে নিতাম।"

"না, না, চলুন—"

তিনজনে বেরিয়ে গেলেন।

এগারো

বিদুলা ওয়ালটেয়ার থেকে ফিরে সোজা চলে এল বিশ্বদীপের বাড়িতে স্টেশন থেকেই। টোটো তাকে আনবার জন্ম গাড়ি নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিল।

"তুমি গাড়িতে বস, আমি খবরটা নিয়ে আসি"—টোটো নামতেই দারোয়ানটা সেলাম করে দাঁড়াল।

বলল "সাহেব এখন ঘুমুচ্ছেন, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। ডাক্তার সাহেব একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন আর আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছেন যাতে কেউ এসে ওঁকে না ওঠায়।"

টোটোর পিছু-পিছু বিদুলাও নেমেছিল। সব শুনে সে ভ্রুকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর টোটোর দিকে ফিরে বলল, "তুমি বাড়ি যাও। আমি এখানেই ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করব। তুমি গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিও।"

টোটোর যাবার ইচ্ছে ছিল না। সে একটু ইতস্তত করতে লাগল। কিন্তু বিতুলার আদেশ অমান্য করবার সাহস তার নেই। তবু একটু ঘুরিয়ে বলল, "গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলছ? কিন্তু রহিম এখনও হয়তো ফেরেনি।"

রহিম বিতুলার ড্রাইভার।

"তাহলে গাড়িটা এখানেই থাক। তুমি বরং একটা ট্যাক্সি ক'রে চলে যাও।"

"তোমার ব্যাগটা তাহলে নামিয়ে রেখে যাই। যদি কিছু দরকার হয়। আমি বলি কি তুমি বাড়ি গিয়ে স্নান করে কিছু খেয়ে তারপর এসো। সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছ। এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে?"

বিতুলার চোখ দুটো যেন টর্চের মতো জ্ব'লে উঠল। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি টোটোর মুখের উপর পড়তেই ঘায়েল হয়ে পড়ল বেচারা। বলল, "তবে থাক," বলেই হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেল মোড়ে গিয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, "দিদি—"

বিতুলাকে দারোয়ান চিনত।

সে আর একবার সেলাম করে বলল, "মা, আপনি তাহলে বসবেন চলুন, আমি পাখাটা খুলে দিচ্ছি—"

ড্রইংরুম খোলাই ছিল। জানালাগুলো বন্ধ ছিল খালি। দারোয়ান এসে সেগুলো খুলে দিল। বিতুলা বসেই দেখতে পেল ঘরের কোণে মাটিতে বসে আছে একটি রোগা মেয়ে, ময়লা রঙীন কাপড় পরা। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বিতুল নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছিল তাকে। দারোয়ান বলল, "মহুয়া মাইজি! সাহেবের অসুখের খবর পেয়ে কাল সমস্ত রাত এখানে বসেছিল। সাহেবের ঘরে হুকু ছাড়া কারও ঢোকবার হুকুম ছিল না। তবু মহুয়া মাইজি সারারাত এখানে ব'সে ছিল যদি হুকুর মুখ থেকে কোনও খবর পায়—"

"মেয়েটি কে—"

"ফ্যাকটারিতে কাজ করে। কোথাও থাকবার জায়গা পায়নি ব'লে সাহেব ওকে এখানে বাগানের ঘরে থাকতে দিয়েছেন।"

টোটোর মুখে এসব কথা স্টেশনেই শুনেছিল বিতুলা। দারোয়ান পাখাটা ঠিক ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাখার হাওয়াটা গায়ে লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল মহুয়ার। সে চোখ চেয়ে হতভম্ব হ'য়ে ব'সে রইল কয়েক মুহূর্ত, মনে হ'ল এ কোন্ অচেনা জায়গায় এসেছে সে। তারপরই সব মনে পড়ল। মুখ ফিরিয়েই দেখতে পেল বিতুলাকে। তাড়াতাড়ি উঠে হেঁট হ'য়ে নমস্কার করল তাকে। বিতুলাকে সে চিনত। তারপর উঠে সসংকোচে একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। বিতুলা নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে রইল, এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন তাকে দেখতে পায়নি। তারপর তার নজরে পড়ল কয়েকখানা কাগজ। পাঠকজি কাল যে সব কাগজে লিখে লিখে বিশ্বদীপের সঙ্গে কথা কইছিলেন সেই কাগজগুলো সামনের টেবিলেই ছড়ানো ছিল। বিতুলা সেইগুলো

তুলে পড়তে লাগল। একটু পরেই ভ্রূকুঞ্চিত হ'য়ে গেল তার। এসব-কি!—এসব কার কথা? কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে যেন একটা মর্মরমূর্তির মতো হ'য়ে গেল। সত্যিই মনে হ'তে লাগল একটু ঝুঁকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে শঙ্কা, বেদনা আর বিষাদের প্রতিমূর্তি যে ব'সে আছে, সে জীবন্ত মানবী নয়, সে মর্মরমূর্তি। কে এসব লিখেছে! যাদের কথা লিখেছে তারা কি বিশ্বদীপের বাবা মা? না, না, না, হতেই পারে না, একটা দৃঢ় অবিশ্বাসের দুর্গে নিঃশব্দ প্রতিবাদের মতো বসেছিল সে। একটা সংবাদ কেবল বিরাট একটা গাঁইতির মতো সে দুর্গের দেওয়ালে আঘাত হানছিল। সে সংবাদটি হ'চ্ছে, বিদুলা জানত পাঠকজি বিশ্বদীপের সঙ্গে লিখে লিখে কথা কন, আর এও জানত তিনি বিশ্বদীপের পিতৃবন্ধু। এ পাঠকজিরই হস্তাক্ষর। বিদুলা চেনে।

"আশ্চর্য, আসতে আসতে ঠিক আমার মনে হচ্ছিল এখানে আপনার দেখা পাব। এরকম প্রিমনিশন্ (premonition) আমার মাঝে মাঝে হয়। ভয় হচ্ছে, শেষকালে মহাপুরুষটুরুষ হ'য়ে যাব না তো?"

বিদুলা চোখ তুলে চেয়ে দেখল ডাক্তার ঘোষাল হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে আছেন। সে জানতেও পারেনি তিনি কখন এসেছেন।

"নমস্কার। বিশ্বদীপের কি হয়েছে?"

"ভয়ানক মাথা ধরেছিল কাল। রাত দুটোর সময় আমাকে ফোন করে। আমি এসে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে গিয়েছিলাম ঘুমের জন্য। এখনও ওঠেনি?"

"কই কোনো সাড়াশব্দ তো পাইনি। আপনার বারণ আছে শুনে ভিতরে যাইনি।"

"ভালো করেছেন। আমি দেখে আসি চুপিচুপি।"

ঘোষাল হেঁট হ'য়ে পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন। জুতো খুলে নিঃশব্দ চরণে তিনি চ'লে গেলেন ভিতর দিকে। গিয়ে দেখলেন, বিশ্বদীপ উঠে দাড়ি কামাচ্ছে। তার শোবার ঘরেই দাড়ি কামাবার ব্যবস্থা থাকে।

"বাঃ, ফিট্?"

বিশ্বদীপ হাসিমুখে ঘার ফিরিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ভালো আছি। কাল আর একটা ব্যাপারও ঘটেছিল। কাল রাত্রে আমি খেতেই ভুলে গিয়েছিলাম। ছকু খাবার দিয়ে আমাকে যখন ডাকল আমি বললাম যাচ্ছি একটু পরে। তার পরে ভুলেই গেলাম, মানে এমন একটা—"

ঘোষাল বললেন, "বুঝেছি। প্রথমেই আপনাকে একটা ধন্যবাদ দিই। আপনার দৌলতে আজ আমার একবার কোমরের exercise হয়েছে। আর একবারও হয়তো হবে। হেঁট হ'য়ে জুতোর ফিতে খুলেছি। চাকরে আজকাল জুতো পরিয়ে দেয়, আর খুলেও নেয়। উইল ইউ বিলিফ? ও, আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি, শ্রীমতী বিদুলা এসে ব'সে আছেন—"

"বিতুলা ? কখন এসেছে ?"

"নো আইডিয়া। অনন্তকাল থেকেই তো উনি আপনার দিকে আসছেন, আপনার ড্রইংরুমের সোফায় কখন এসে পৌছেছেন তা ঠিক বলতে পারব না। না, ন'. এভাবে যাবেন না। তোয়ালেটা ঘাড় থেকে নাবান, মুখটা ধুয়ে ফেলুন, চুলটা একটু আঁচড়ে নিয়ে, ভালো একটি ড্রেসিং গাউন প'রে তারপর যান। সব জিনিসেরই তো একটা ডেকোরাম আছে। দেখি পাল্সটা —"

ঘোষাল অনেকক্ষণ ধ'রে নাড়ী দেখেন চোখ বুজে। তাই দেখলেন, তারপর বললেন, "ঠিক আছে। আজ রাত্রে শোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেবেন। আমি পাঠিয়ে দেব। আপনি আসুন, আমি ততক্ষণ বিতুলা দেবীর সঙ্গে একটু পর-চর্চা করি গিয়ে—"

বিতুলা তেমনি নিশ্চল প্রতিমার মতোই ব'সে ছিল।

"বিশ্বদীপ উঠেছে ?"

"হ্যাঁ। বেশ ভালো আছে। আসছে এখুনি।"

ডাক্তার ঘোষাল চেয়ারে ব'সে আবার জুতো পরতে লাগলেন।

ছকু ট্রেতে ক'রে কফি আর কিছু খাবার নিয়ে এল।

বিতুলা বলল, "আমি স্নান না ক'রে কিছু খাব না। আপনি খান, আমি ছেঁকে দিচ্ছি—"

ডাক্তার ঘোষালের তখন চোখ পড়ল পাঠকজির লেখা কাগজগুলোর উপর।

"কি এগুলো ?"

"কি জানি, আমিও বুঝতে পারছি না।"

ডাক্তার ঘোষাল কাগজগুলো তুলে পড়তে লাগলেন। তারপর বিতুলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি পড়েছেন নাকি ?"

"পড়লুম তো —"

"আমার দুজন পেশেন্টের হিস্ট্রি পাঠকজি এখানে রেখে গেছেন।"

"তোমার বাবা, তোমার মা এসব লিখেছেন কেন—কার বাবা, কার মা ?"

"তোমার। আমার পেশেন্টদের একটি ছেলে আছে তার নাম 'তোম', ডাক নাম। ভালো নাম তমক-বিলাস। দিন ও কাগজগুলো আমাকে। পাঠকজি নিশ্চয় বিশ্বদীপ-বাবুকে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার দেখা না পেয়ে। বিশ্বদীপবাবুর এমনভাবে এগুলো ফেলে রাখা উচিত হয়নি।"

ঘোষাল কাগজগুলো মুড়ে নিজের পকেটে পুরে ফেললেন। উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল বিতুলার মুখ। মর্মরমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। ঘোষাল এ সুযোগটা নিতে ইতস্তত করলেন না।

বললেন, "আপনার কাছে অনেকদিন থেকে একটা আর্জি পেশ করব ভাবছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি। এখন সেটা নিবেদন করব কি ?"

"নিশ্চয়—"

"আমি 'বেকার-ভবন' ব'লে একটা বাড়ি তৈরি করছি বোধহয় শুনেছেন। সে ভবনে পঁচিশজন বেকার বিনা পয়সায় থাকতে পারবে। কিন্তু খবরটা বাজারে চাউর হবামাত্র হাজার হাজার বেকার এসে বলবে, আমি বেকার, আমাকে থাকতে দাও। বলা বাহুল্য এদের মধ্যে অনেক মিথ্যাবাদী, অনেক সুবিধাবাদী থাকবে। এদের ছেঁটে ফেলে দিয়ে মোটা দানার প্রকৃত বেকার বার করতে হবে। বেকারদের মধ্যেও ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস আছে। যারা সুস্থ, সবল, কিন্তু কাজ করতে চায় না এবং যাদের কোথাও কোন আশ্রয় নেই—এরাই হ'ল ফার্স্ট ক্লাস বেকার। এই স্ট্যাণ্ডার্ডে আমি সেকেণ্ড ক্লাস আর থার্ড ক্লাস বেকারদের ডেফিনিশনও ঠিক করেছি। এদের বাছবার জন্য একটা কমিটি চাই। সে কমিটিতে থাকবেন বিশ্বদীপবাবু, কবি শ্যামল সোম, পুস্তকবিক্রেতা অনঙ্গ সেন, রুটিওয়ালা অনন্ত রায়, আর অনন্ত রায়ের পত্নী বিজনবালা, শিল্পী নবনী দাস, আর আমার ইচ্ছে আপনিও থাকুন এতে।"

'আপনি থাকবেন না ?"

"না। I shall be your most obedient servant. আপনাদের আদেশ এবং নির্দেশ আমি বশংবদ ভৃত্যের মতো পালন করব।"

"বেকারদের কাজের কোন ব্যবস্থা করবেন ?"

"না, সে দায়িত্ব আমরা নেব না। তাদের খেতেও দেব না। তবে আমরা তাদের বলব কিছু-না-কিছু একটা কর। অন্তত ভিক্ষে কর। সেটাও একটা কাজ। আর মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গিয়ে আড্ডা দেব। নানারকম গল্প বলব। ইতিহাসের গল্প। ইতিহাসে তো আপনি পারঙ্গমা শুনেছি। বেকারদের সম্ভাবনা কি এবং কতখানি তা আপনার মুখ থেকে শুনলে আমার বিশ্বাস ওরা প্রেরণা পাবে। আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী হবেন কি ?"

সুমিষ্ট হাসি হেসে বিদুলা বলল, "বেশ। আপনার কথা অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। তবে কি জানেন, আমার নির্দিষ্ট কোনও কাজ নেই বলেই সময়ও নেই, আমি সর্বদাই যেন ব্যস্ত—"

"কি নিয়ে ব্যস্ত—"

"নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বারো তেরো ঘণ্টা নিজেকে নিয়েই কেটে যায়। মাঝে ইতিহাসের কতকগুলো গল্প লিখেছি, অনঙ্গবাবু সেগুলো ছাপছেন, তার সঙ্গে কতকগুলো রেখাচিত্র দিলে ভালো হত, আমি এককালে আঁকতুম, ভাবছিলুম নিজেই আঁকব। আঁকতে গিয়ে কিন্তু হতাশ হলাম। ভালো হ'ল না। আপনি এখনি আর্টিস্ট নবনী দাসের কথা বললেন, তিনি কেমন আঁকেন ?"

"চমৎকার! প্রথম শ্রেণীর আঁকিয়ে! কি রকম ছবি চান তাকে বুঝিয়ে দিলে সে ঠিক এঁকে দেবে। পেটে অবশ্য বিদ্যে বেশী নেই। কিন্তু আঁকে খুব ভালো। কি ধরনের ছবি দিতে চান—"

"মাদাম পম্পাডোর, পাইলেট্, জোয়ান অব আর্ক, ক্লিওপেট্রা, টমাস বেকেট্, রানা প্রতাপ, লছমীবাঈ—এই সব—"

"আমার বিশ্বাস ও পারবে। ওকে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে?"

"দেবেন—"

এই সময় বিশ্বদীপ ঢুকলেন।

"তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

বিতুলা নির্নিমেষে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "অনেকক্ষণ। স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছি।"

"কে তোমাকে খবর দিলে? আমার তেমন তো কিছু হয়নি।"

ডাক্তার ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন।

"এইবার আমি যাব। বিতুলা দেবী, আমি বিশ্বদীপবাবুকে দু' মিনিটের জন্ত বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। সিমেন্ট সম্বন্ধে একটু প্রাইভেট টক্ আছে—জাস্ট টু মিনিট্স্।"

বিশ্বদীপকে নিয়ে ঘোষাল বাইরে চলে গেলেন।

বেশ একটু দূরে গিয়ে বললেন, "সিমেন্টের কথা নয়। সিমেন্ট পেয়ে গেছি। আজ ঢালাই হবে। আমি আপনাকে ডেকেছি অন্ত কারণে। বোধহয় কাল আপনার সঙ্গে পাঠকজির কথা হয়েছিল। তিনি আপনার বাবা মায়ের কথা বলেছিলেন কি? যাই হোক কাগজগুলো টেবিলে প'ড়ে ছিল। বিতুলা দেবী সেগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করে petrified হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় আমি এলুম। এসেই একমুঠো ধুলো নিক্ষেপ করলুম আপনার প্রেয়সীর চোখে। বললুম—আমার দুটি পেশেন্টের ইতিহাস পাঠকজি লিখে রেখে গেছেন। তাদের ছেলের ডাক নাম 'তোমা', ভাল নাম তম্বরু-বিলাস। কারণ তাঁর লেখায় 'তোমার বাবা মা' 'তোমার বাবা মা' কথাগুলো আছে। বিতুলাও এখনই বোধহয় আপনাকে এই কথা জিগ্যেস করবেন, আপনি প্রাঞ্জল ভাষায় নির্জলা মিথ্যেটি বলে দেবেন। পাঠকজিকে বলবেন, তিনিও যেন বলেন। লেখাগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। পুড়িয়ে ফেলব। বাস্ চললুম—"

বিশ্বদীপ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা কথা মনে হল, কথাটা যেন আলোর মতো ব্যাপ্ত হয়ে গেল তাঁর সমস্ত সত্তায়—সবাই আমাকে ভালবাসে। কেন ভালবাসে? কি গুণ আছে আমার? কিছুই তো নেই। তারপরই মনে হল বিতুলার সঙ্গে এ মিথ্যাচার কত দিন করবেন তিনি। কিন্তু এ-ও তিনি জানেন সত্যকথা বললে বিতুলা সরে' যাবে। বিতুলা তাঁকে ভালবেসেছে তাঁর রূপের জন্য। তাঁর মনের, তাঁর অন্তরতম সত্তার পরিচয় সে তো পায়নি, পাবার সুযোগই হয়নি। হয়তো একদিন সুযোগ পাবে, তখন হয়তো তাঁকে আরও ভালবাসবে, কিন্তু সে সুযোগ কি পাবে সে? যে পথ বেয়ে সে আসছে সে পথ রূপের পথ, সেই চির-উজ্জ্বল সনাতন পথ, সে পথ যদি লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে—। হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন, না

মিথ্যা আচরণই করতে হবে। যতদিন পারা যায় মিথ্যাটাকেই তিনি আঁকড়ে থাকবেন। তাছাড়া, কে জানে, হয়তো পেরেও যেতে পারে।

"তুমি কি করছ ওখানে একা দাঁড়িয়ে—"

বিতুলা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন বিশ্বদীপ।

"আমি তাহলে এখন যাই। তুমি তো ভালোই আছ দেখছি!"

"না, না, এর মধ্যে যাবে কি। চা খাও—"

"আমি স্নান না ক'রে কিছু খাই না।"

"ব্যাগ তো এনেছ দেখছি, এখানে স্নানও ক'রে নাও। দাঁড়াও আমি ফিরপোতে ফোন করছি!"

"কেন?"

"এইখানেই ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবে ট্যাক্সি ক'রে। চেনা লোক আছে আমার, এখুনি এসে যাবে—"

প্রতিবাদ করবার আগেই বিশ্বদীপ চলে গেলেন ফোন করতে।

বিতুলার ব্যাগে সম্পূর্ণ এক সেট পোশাক ছিল, এমন কি এক জোড়া জুতো পর্যন্ত। সবই নীল রঙের। ওয়ালটেয়ারে যে সমুদ্রের কাছে সে ছিল সেই সমুদ্রেরই স্বপ্ন যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসেছিল বিশ্বরূপের ড্রইংরুমে। মহুয়া সম্বন্ধে বিতুলা কোনও উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। টোটো যে তাকে টেলিগ্রাম করেছিল সে কথাটাও সে গোপন করত, কিন্তু তার মনে হল কথাটা গোপন থাকবে না, কারণ শ্যামল সোম আর তার বন্ধু দুজন সেখানে ছিল।

বলল, "টোটো যে এমন ভীতু তা আমি জানতাম না। আমি আরও দু'একদিন থাকতুম ওখানে, কিন্তু টোটোর এক টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, come immediately স্টেশনে বললে আমার একা থাকতে ভয় করছিল। তার মুখেই শুনলাম তুমি অসুস্থ—"

একটু থেমে তারপর বলল, "টেলিগ্রামটা পেয়েই কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তোমার কিছু হয়েছে নিশ্চয়। তোমার কথা সর্বদাই মনে হয়েছিল, উদারায় বাজছিল যে সুরটা টেলিগ্রামটা যাওয়ামাত্র সেটা যেন তারায় বাজতে লাগল। আর থাকতে পারলুম না। ডাক্তার ঘোষালও একটা আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন তিনি প্রত্যাশা করছিলেন যে আমাকে এসে দেখবেন। তুমি অবশ্য আমার কথা ভাবছিলে না তা আমি জানি, নানা কাজে ব্যস্ত ছিলে তুমি, তোমাদের স্ট্রাইকের কি হ'ল—"

বিতুলা সহজ, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিল।

বিশ্বদীপ তার সামনে ছোট একটা টাইপরাইটার নিয়ে একটা চিঠি টাইপ করে যাচ্ছিলেন। বিলেতের যে ল্যাবরেটরিতে তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু তাঁকে আহ্বান করেছিল কাজ করবার জন্যে তারই চিঠির জবাব দিচ্ছিলেন তিনি। তাঁর সহপাঠী তাঁকে লিখেছিল—তুমি যদি আস তাহলে থাকবার আলাদা একটি কোয়ার্টার্স পাবে। মাইনে

কত পাবে তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমাদের প্রফেসার তোমাকে পেলে আর কাউকে নেবেন না বলেছেন, তাই মনে হয় আমরা যা পাচ্ছি তা তুমি নিশ্চয় পাবে। আর মস্ত সুবিধা নিজের খুশিমতো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। বিশ্বদীপ অকপটে তাকে সব কথা খুলে লিখছিলেন। লিখছিলেন ডাক্তার সন্দেহ করছেন আমার লেপ্রসি হয়েছে—এ জেনেও কি প্রফেসার আমাকে কাজ দেবেন। এটা আমার আগে জানা দরকার।...

এ চিঠিটা বিদুলা চলে যাবার পরও তিনি লিখতে পারতেন। চিঠিখানা মাসখানেক আগে এসেছে, এতদিন উত্তর দেওয়ার কথা মনে হয়নি—ফিরপোর লোকটাকে বিল দেবার সময় চেকবুক বার করতে গিয়ে চিঠিটা বেরিয়ে পড়ল। বিশ্বদীপ যেন বেঁচে গেলেন। বিদুলার সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে তিনি যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। ডাক্তার ঘোষাল তাঁকে যে মুখোশটা পরতে বলে গেলেন, সে মুখোশ তিনি পরেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভয় হচ্ছিল বিদুলার প্রদীপ্ত দৃষ্টির আঘাতে সে মুখোশ খুলে যাবে। বিদুলার দৃষ্টিটাকে তাই তিনি এড়াবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে। চিঠিটা পেয়েই তাই বললেন, "একটা জরুরী চিঠির জবাব লিখতে হবে এখুনি। তুমি ব'স আমি চট ক'রে লিখে ফেলছি ওটা—।" তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে নিজের শৌখিন ছোট টাইপরাইটারটা এনে টাইপ করতে শুরু করে দিলেন। স্ট্রাইকের কথা উঠতে টাইপরাইটারের দিকেই চেয়ে বললেন, "এখনও কিছু ঠিক হয়নি। আমার ইচ্ছে সকলকে সমান অংশীদার ক'রে নি। কিন্তু দেখলুম পাঠকজির তাতে মত নেই। অথচ আবার এ-ও বলছেন, তুমি যা করবে তাই হবে। কি করব ঠিক করতে পাচ্ছি না—"

"আমি এসে দেখলুম ওই কাঠের টেবিলটায় পাঠকজির লেখা খানকয়েক কাগজ রয়েছে। প'ড়ে অবাক হয়ে গেলুম—"

"ও, হ্যাঁ, উনি দুজন কুষ্ঠরোগীর ইতিহাস লিখে রেখে গিয়েছিলেন ডাক্তার ঘোষালকে দেবেন বলে—"

"হ্যাঁ ডাক্তার ঘোষাল তাই তো বললেন। নিয়েও গেলেন তিনি কাগজগুলো—"

বিশ্বদীপ টাইপ ক'রে যেতে লাগলেন।

বিদুলা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তাঁর মুখের দিকে। এমন একটা অপূর্ব সুন্দর মুখ সে আর দেখেনি কখনও। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। ও মুখে মেয়েলী ভাব নেই, ওর কমনীয়তা পেলব নয়, তা বলিষ্ঠ, পরুষ অথচ সুন্দর। একটা ছবিতে সে সমাধিমগ্ন মহেশ্বরের যে মুখ দেখেছিল এ সেই মুখ। ছবিটা একজন তিব্বতী শিল্পীর আঁকা, হিমালয়ের পটভূমিকায়। একজন আমেরিকান টুরিস্ট কিনে নিয়ে যাচ্ছিল ছবিখানা। জাহাজে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। লোকটা বুড়ো মাতাল। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা কইত না। ওই ছবিটার সামনে অর্ধনিমীলিত নয়নে বসে গ্লাসের পর গ্লাস

মদ খেয়ে যেত। বিশ্বদীপ সেই রহস্যময় মহাদেব। বিশেষ ক'রে একটা রহস্যের কোনও সমাধান করতে পারছিল না বিজুলা। বিশ্বদীপ একদিনও তার কাছে প্রণয় নিবেদন করেনি, একদিনও কোন অশোভন আচরণ করেনি, একদিনও বিবাহের প্রস্তাব করেনি। তাকে ঈর্ষান্বিত করবার জন্ম মাঝে মাঝে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার ভান করেছে—ইদানীং যেমন শ্যামল সোমের সঙ্গে—কিন্তু বিশ্বদীপের মনে কোন ঈর্ষা জাগাতে পারেনি। তার হঠাৎ ওয়ালটেয়ারে চ'লে যাওয়ারও গোপন উদ্দেশ্য ওই। কিন্তু কই, বিশ্বদীপ তো বিচলিত হল না। অথচ সে জানে, খুব ভাল ক'রে জানে যে বিশ্বদীপ তাকে ভালবাসে। সে অনুভব করে যে বিশ্বদীপ সদাসর্বদা তার কথাই ভাবে, তার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তার নারী-প্রকৃতির নিগূঢ় বোধশক্তি দিয়ে এটা সে নির্ভুলভাবে অনুভব করেছে, কিন্তু বাইরে বিশ্বদীপ নির্বিকার। কেন? এর রহস্য আজও আবিষ্কার করতে পারেনি বিজুলা। সত্যিই, মহাদেব না কি!

"তুমি তোমার ফ্যাকটারির সম্বন্ধে যা ভেবেছ তা ঠিকই ভেবেছ। ওদের হাতেই ছেড়ে দাও সব, ওরা ওটা চালিয়ে যা লাভ করতে পারে করুক। তোমার তো টাকার খুব অভাব নেই। কি হবে তাহলে টাকার জন্যে এই হতভাগা সভ্যতার আঁস্তাকুড়ে মুখ জুবড়ে পড়ে থাকবার! চল আমরা বেরিয়ে পড়ি কোথাও। জাপান যাই চল। যে সময় চেরী ফুল ফোটে সেই সময় যাব আমরা—কি বল?"

বিশ্বদীপ এইবার তার দিকে চোখ তুলে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, "সেও তো সভ্যতার আঁস্তাকুড়। নর্থ পোল বা সাউথ পোলে যেতে পারি, সাহারায় যেতে পারি, ঘন অরণ্যে যেতে পারি, হিমালয়ে যেতে পারি, মহাসমুদ্রে ছোট একখানা জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতে পারি। কিন্তু তা কি পারব? একা থাকবার সাধনা তো করিনি কখনও।"

"একা থাকবে কেন! আমিও তো থাকব।"

"পারবে? একখানা শাড়ি প'রে তুমি ক'ঘণ্টা থাকতে পার? একরকম খাবার ক'দিন ভাল লাগে! সর্বদা যদি একা আমাকে নিয়ে থাক তাহলে আমাকেও ভালো লাগবে না!"

"তুমি নিজেকে শাড়ি আর খাবারের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেলে? তুমি জীবন্ত মানুষ, ক্ষণে ক্ষণে তোমার রূপ বদলায়—"

"বদলায় জনতার পটভূমিকায়। জনতা যদি না থাকে তাহলে আমি বদলাব না, তুমিও বদলাবে না। অসহ্য মনে হবে তখন পরস্পরের সঙ্গ। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই মানুষের মনকে পূর্ণ করতে পারে না। মানুষ একজন স্রষ্টা, সৃষ্টি করবার প্রেরণা, সৃষ্টি করবার উপাদান, সৃষ্টি করবার সুযোগ তার চাই। রবিন্‌সন ক্রুশো যা যা করেছিল তা করবার প্রেরণা আর সুযোগ যদি তার না থাকত তাহলে ওই দ্বীপে সে একা থাকতে পারত না, পাগল হ'য়ে যেত!"

"তোমার মতে তাহলে মানুষ কিছুতেই নির্জনবাস করতে পারে না?"

"পারে, কিন্তু সেখানে দ্বিতীয় লোকের স্থান নেই। নির্জনবাসী মানুষের একটি মূর্তিই আমরা সার্থকভাবে কল্পনা করতে পেরেছি, সে মূর্তি তার ধ্যান-মূর্তি!"

বিশ্বদীপ চিঠিটা টাইপরাইটার থেকে খুলে নিলেন, তারপর ঠিকানাটা টাইপ করতে লাগলেন। খামটার চেহারা দেখে বিদুলা বলল, "বিলেতে লিখছ নাকি কাউকে—"

"হ্যাঁ—"

"বিলেতেই তোমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব, না? আর একদিনও তো বিলেতেই কাকে যেন চিঠি লিখছিলে—"

"হ্যাঁ, সারাজীবন তো প্রায় ওইখানেই কেটেছে—"

"আচ্ছা বিশ্বদীপ, তোমার বাবা মাও কি বিলেতে ছিলেন? তাঁদের কথা তো একদিনও বলনি আমাকে—"

বিশ্বদীপ চুপ ক'রে রইলেন। ঠিক কি উত্তর দেবেন হঠাৎ মাথায় এল না।

"তোমার বাবা মা-ও বিলেতে ছিলেন নাকি—"

"সব বলব তোমাকে একদিন। এখন চল একটু বেড়িয়ে আসি—"

"কোথায়?"

"যেখানে হ'ক। মোটরে লম্বা একটা দৌড়, শ'খানেক মাইল—"

"চল। আমার মোটরটা নিয়েই যাই—"

বিদুলা সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় ফোন বাজল।

বিশ্বদীপ চ'লে গেলেন পাশের ঘরে ফোন ধরতে।

"হ্যালো, হ্যাঁ, আমি বিশ্বদীপ। না, না, চিন্তার কোনও কারণ নেই, ভালো আছি। না, আজ আপিস যাব না। আজ রবিবার, কাজের তাড়া থাকলে আজও যেতুম, কিন্তু তাড়া নেই। হ্যাঁ, বিদুলা এখানে আছে। কথা বলবেন? ধ'রে থাকুন তাহলে—"

বিশ্বদীপ ফিরে এসে বললেন, "শ্যামল সোম ফোন করছিল। সে-ও নাকি আজ ফিরেছে তোমার সঙ্গে? ডাক্তার ঘোষাল ওকে ফোন করেছিলেন, তার কাছ থেকে ও আমার মাথাধরার খবর পেয়েছে। ফোন ধ'রে আছে, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল গিয়ে— আমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় প'রে নিই।"

বিদুলা চ'লে গেল পাশের ঘরে। আলাপ হ'তে লাগল।

"নমস্কার। স্টেশনের ভিড়ে আপনাদের আর খবর করতে পারিনি। টোটোর সঙ্গে দেখা হতেই খবর পেলুম বিশ্বদীপ অসুস্থ। তাই স্টেশন থেকেই চ'লে এসেছি এখানে। ও, হ্যাঁ, ডাক্তার ঘোষালের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি আমাকেও বলছিলেন কি একটা কমিটির মেম্বার হবার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁর বেকার-ভবনের ব্যাপার। মাথায় ছিট আছে একটু ভদ্রলোকের, না?"

কলকণ্ঠে হেসে উঠল বিদুলা।

"হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই, ওরিজিনালিটি আছে বইকি! আমি তো রাজী হয়েছি ওঁর

কমিটিতে যেতে। উনি কমিটিতে যাদের নেবেন বললেন তাদের সবাইকে আমি চিনি। দুটি লোক ছাড়া, অনন্তবাবুর স্ত্রী বিজনবালা আর শিল্পী নবনী দাসের সঙ্গে পরিচয় নেই। তবে নবনী দাসের সঙ্গে দু'এক দিনের মধ্যেই পরিচয় হবে। ও, তাহলে তো খুব ভালো হয়, নিয়ে আসুন বিজনবালাকে একদিন আমার কাছে। পরশু বিকেলে? হ্যাঁ, আমি ফ্রি আছি। আমার ওখানেই চা খাবেন। আমি খুব খুশী হব। আমার হ'য়ে আপনি নিমন্ত্রণ করবেন তাঁকে। আপনার কবিতাও কিন্তু আনবেন কিছু। না, না, সত্যিই খুব ভালো লাগে, বিশ্বাস করুন। না, বিশ্বদীপকে নিমন্ত্রণ করব না। ও নিমন্ত্রণ করলে যায় না। হঠাৎ এসে বিব্রত করেই বেশী আনন্দ পায় ও। হ্যাঁ, এখুনি বেরুচ্ছি আমি। বিশ্বদীপও বেরুবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি।"

বিশ্বদীপ সত্যিই হঠাৎ আবেগের মুখে ঠিক করেছিলেন বিদুলার সঙ্গে লম্বা একটা চক্কর দিয়ে আসবেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে পোশাক বদলাতে গিয়ে তাঁর মনে হ'ল, যা মনে হ'ল তাকে ভয়ই বলতে হয়। অথচ ঠিক ভয় নয়। তাঁর অন্তর্যামী সহসা যেন তাঁকে প্রশ্ন ক'রে বসল—অতক্ষণ তুমি ওর সঙ্গে কি কথা বলবে? এর আগে এতক্ষণ তো তুমি ওর কাছে এমন একটানা থাকোনি। এতক্ষণ একসঙ্গে থাকলে অনিবার্যভাবে যে সব আলোচনা উঠে পড়তে পারে তার জন্য তুমি কি প্রস্তুত আছো? বিয়ে করবে? না, প্লেটোনিক প্রণয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? বিয়ে যদি কর তাহলে সব কথা ওকে খুলে বলতে হবে; তা তুমি পারবে না। দূর থেকে তার স্বপ্ন দেখেই যদি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও, তাহলে বেশীক্ষণ তার কাছে না থাকাই ভালো। যে প্রেয়সীকে বাহুপাশে বাঁধতে পারবে না, তার সান্নিধ্য এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। সান্নিধ্যের ছোঁয়াচে রঙীন স্বপ্নও ময়লা হয়ে যায়, আর সাবান দিয়ে সে স্বপ্নকে কাচা যায় না…।

জামা কাপড় না বদলেই বেরিয়ে এলেন বিশ্বদীপ।

"বিদুলা, আমার এখন বেরুনো চলবে না। একটা engagement-এর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এক ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এখন। তাছাড়া ডাক্তার ঘোষালকে না জিগ্যেস ক'রে এমনভাবে বেরিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না—"

বিদুলার উৎসুক নয়নের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। সে ভেবেছিল দূরে কোনও মাঠের কোনও গাছতলায় ব'সে বিশ্বদীপকে হয়তো সত্যিই সেই কথা সে আজ ব'লে ফেলবে যা কোনও নারী প্রথমে কোন পুরুষকে বলে না। কিন্তু মুখে সে যা বলল, তার সুর একেবারে আলাদা।

"সেই ভালো। আজ তোমার না বেরোনই উচিত। আজকের দিনটা পুরো রেস্ট্ নাও। আমি যাচ্ছি তাহলে। আমি থাকলেই বকবক করব। তোমার ঠিক রেস্ট্ হবে না—চলি—"

বিদুলা চ'লে গেল। যাবার সময় দেখল মহুয়া বাগানের সেই ঘরের সামনে ব'সে কড়া মাজছে। একটু দাঁড়াল সে, তারপর চ'লে গেল। মোটর স্টার্ট করার শব্দ পাওয়া

গেল। বিশ্বদীপ খোলা জানলাটার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর শুয়ে পড়লেন ইজি চেয়ারটায়।

বারো

মানসপুরের আকাশে বাতাসে অদ্ভুত একটা আলো ঝলমল করছে। রোদ নয়, জ্যোৎস্না নয়, অদ্ভুত ধরনের সোনালী-বাদামী রঙের অদৃষ্টপূর্ব আলোয় ভ'রে গেছে চারিদিক। বিশ্বদীপের মনে হ'তে লাগল সত্যিই তিনি যেন রূপকথার দেশে এসেছেন। এসেই তিনি রুদলবাবুর দেখা পেয়ে গেলেন। রামায়ণে রামের যেমন ছবি দেখেছিলেন, বাহুমূলে কেয়ূর, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় রত্নহার, মাথায় মুকুট, হস্তে ধনুর্বাণ, রুদলবাবুও ঠিক যেন তেমনি। বিরাট এক মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে ব'সে আছেন, আর তাঁর সামনে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এক রাক্ষস। বীভৎস তার চেহারা। নাকের কাছে প্রকাণ্ড গহ্বর। ঠোঁট দুটো ফোলা-ফোলা, একটা চোখ প'চে গেছে, আর একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হাতের আঙুল নেই। সর্বাঙ্গে ঘা। ঘায়ে পোকা কিলবিল করছে। কিন্তু তবু সে বিরাটকায়।

বিশ্বদীপকে দেখে রুদলবাবু তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে নেমে এলেন।

"আসুন, আসুন, বসুন—"

বিশ্বদীপ ইতস্তত করতে লাগলেন। একটিমাত্র সিংহাসন রয়েছে, সেটাতে গিয়ে বাসাটা কি শোভন হবে? কিন্তু পরমুহূর্তেই সবিস্ময়ে দেখলেন ঠিক আর একটা অনুরূপ সিংহাসন মূর্ত হ'য়ে উঠল প্রথম সিংহাসনটার পাশে।

"আসুন, বসুন—"

দু'জনে গিয়ে দুটো সিংহাসনে বসলেন। ব'সে বিশ্বদীপ লক্ষ্য করলেন মাথার উপর যে গাছটি রাজছত্রের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সেটিও যেন আর একটু বিস্ফারিত হ'য়ে গেল।

বিশ্বদীপ হেসে প্রশ্ন করলেন, "রুদলবাবু, আজ আপনার এমন অদ্ভুত পোশাক কেন—"

"যে পোশাক প'রে একদা শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস-রাক্ষসী বধ ক'রে দেশকে নির্ভয় করেছিলেন এই রাক্ষসটিকে বশীভূত করবার জন্য আজ আমি সেই পোশাক পরাই সমীচীন মনে করলাম। অবশ্য বাইরে পোশাকটা পরেছি স্রেফ অভিনয়ের জন্য, অভিনেতার পোশাক প'রে বেশ একটা আনন্দও পাওয়া যায় আর তার একটা সামাজিক দামও আছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি যে রুদলবাবু ছিলাম তাই আছি। হাতে ধনুর্বাণ নিয়েছি বটে কিন্তু ধনুর্বাণ দিয়ে এই রাক্ষসকে আমি বশ করিনি। আমার আসল অস্ত্র ভদ্রতা আর ভালবাসা। রূপকের সাহায্য নিয়ে যদি বলি, আর রূপকের সাহায্য ছাড়া এসব কথা ঠিক বলাও যায় না, তাহলে বলতে হবে ধনুকটি হচ্ছে

নিঃস্বার্থপরতা আর বাণটি হচ্ছে প্রেম। ও ছাড়া কাউকে সত্যিকার বশ করা যায় না।"

বিশ্বদীপ মানসপুরে এসে সাধারণতঃ বিস্মিত হন না। যা হয় তা যত অসম্ভবই হোক, তিনি মেনে নেন। কিন্তু রূপলবাবুর এ কথায় তিনি একটু বিস্মিত হলেন। কৌতূহলও হ'ল একটু।

"কুষ্ঠরোগকে আপনি বশীভূত করেছেন?"

রূপলবাবু হেসে বললেন, "না। সে কাজ ডাক্তারদের, বিজ্ঞানীদের। আমি কুষ্ঠরোগের ভয়টাকে বশীভূত করেছি। সামনে রাক্ষসরূপী যাকে দেখছেন সে কুষ্ঠরোগ নয়, সে কুষ্ঠরোগের ভয়। কুষ্ঠরোগের চেয়েও তা ভয়ংকর। আপনি সিংহকে তো চেনেন? আমি রোজ তাকে আলিঙ্গন করেছি। হঠাৎ একদিন দেখলাম ভয় আর নেই। সে পরাজিত হয়েছে। এই মূর্তি ধ'রে হাতজোড় ক'রে সে একদিন সামনে এসে দাঁড়াল। তখন বললুম, দাঁড়াও এ ব্যাপারটাকে একটা কাব্যের রূপ দিতে হবে। তাই এইসব কাণ্ডকারখানা। আমি এই রাক্ষসটাকে বললাম, তোমার এই ভয়ংকর রূপকে আমি মনোহর ক'রে দেব। তোমাকে দেখে আর কেউ ভয় করবে না, ভালবাসবে। তুমি আর ভয় থাকবে না, হ'য়ে যাবে ভালবাসা। দেখুন না কি মজা হয়—"

হঠাৎ অন্ধকার হ'য়ে গেল চারিদিক। কালো মখমলের মতো একটা যবনিকা নেমে এল যেন।

রূপলবাবু বললেন, "ড্রপ সিন প'ড়ে গেল। এখুনি উঠবে আবার।"

একটু পরেই আলো হ'য়ে গেল সব। অদ্ভুত কোমল একটা সবুজ আলোয় তন্দ্রাতুর হ'য়ে স্বপ্ন দেখছে দশদিক। আর সেই কুষ্ঠরাক্ষসকে প্রদক্ষিণ করছে একদল সবুজ পাখি। কি পাখি, কোন্ জাতের পাখি তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা যে সবুজ, তারা যে চিরন্তন প্রাণের প্রতীক এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যেক পাখির মুখে চমৎকার একটি সাদা ফুল। সেই ফুল দিয়ে তারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে রাক্ষসকে। হঠাৎ দেখা গেল পাখিরা অন্তর্ধান করেছে, আর অসংখ্য ফুলের মালা দুলছে রাক্ষসের গলায়। আর আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে তার। গায়ে যে-সব ঘা ছিল তা নেই, হাতে আঙুল গজিয়েছে। গলায় বুকে কুষ্ঠের কোনও চিহ্ন আর নেই। মুখটা কিন্তু এখনও বীভৎস, নাকের গহ্বরটা এখনও ভয়াবহ, চোখ দুটো এখনও তেমনি আছে। রূপলবাবু হাততালি দিয়ে উঠলেন। আবার সব অন্ধকার হ'য়ে গেল। এ যেন অন্যরকম অন্ধকার! বিশ্বদীপ বিলেতে একবার ঘোর বর্ষায় একটা চার্চে ঢুকেছিলেন। সেই চার্চে সেদিন যে নিবিড় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, সেই অন্ধকার যেন এখানেও ঘনিয়ে এল। সেই চার্চে অন্ধকারকে বাঙ্ময় ক'রে বিশপের বক্তৃতা গম্ভীর সংগীতের মতো মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল সকলকে। এখানকার অন্ধকারকে স্পন্দিত ক'রেও তেমনি একটা সংগীত যেন গুঞ্জরিত হ'তে লাগল। সেই সংগীতে কোনও কথা নেই, কেবল

সুর, গভীর বেদনার সুর, আকুল প্রার্থনার*সুর। বিমূঢ়ের মতো ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ। কতক্ষণ এ সুর বেজেছিল তা বুঝতে পারেননি বিশ্বদীপ। কিন্তু হঠাৎ যখন তাঁর চমক ভাঙলো, তখন মনে হ'ল সাগর পার হ'য়ে এলেন তিনি, কান্নার সাগর। তারপর অন্ধকার স্বচ্ছ হ'তে লাগল ধীরে ধীরে। যখন তা অবলুপ্ত হ'ল তখন বিশ্বদীপ দেখতে পেলেন একটা দুগ্ধ-ধবল মেঘ ঘিরে রয়েছে কুষ্ঠ-রাক্ষসকে। একটু পরেই কিন্তু বুঝতে পারলেন ওটা মেঘ নয়, ওটা অপরূপ একটা সাদা ওড়না। তারপরই দেখতে পেলেন তরলার মাথাটা। সে কুষ্ঠ-রাক্ষসের গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু খাচ্ছে। দেখতে দেখতে তরলা মিলিয়ে গেল। তারপর এল তুহিনা, তার ওড়নাও সাদা, কিন্তু সে অন্যরকম সাদা, বরফের উপর যেন জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হ'চ্ছে। তুফানী এল জরদা-রঙের ওড়নায় সেজে, হাওয়া এল হাওয়ার মতোই, তার ওড়না স্বচ্ছ। সবশেষে এল হিল্লোলা সোনালী মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে। সবাই তারা একে একে চুমু খেয়ে গেল কুষ্ঠ-রাক্ষসকে। হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন রুদলবাবু।

"এইবার দেখুন, রাক্ষস কোথা ?"

বিশ্বদীপ দেখলেন কন্দর্পকান্তি সুপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন একজন।

"ভয় ভালবাসা হ'য়ে গেল। এইবার বল কি খাবে ? মুরুব্বী, খাওয়ার আয়োজন করেছ তো—"

এতক্ষণ যে গাছটি রাজছত্রের মতো পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল সে হঠাৎ রূপান্তরিত হ'ল মুরুব্বীতে।

"সব রকম। স্বয়ং দ্রৌপদী এসে রান্নার ভার নিয়েছেন।"

"দ্রৌপদীকে পেলে কোথা থেকে ?"

"তিনি নিজেই এসেছেন। বললেন, মহাপ্রস্থানের পথে যেতে যেতে তিনি প'ড়ে গিয়েছিলেন। কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকায়নি। তাই তিনি মনের দুঃখে মর্তের সমতলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ভাবছিলেন কোনও গরীব গৃহস্থের ঘরে দাসীবৃত্তি ক'রে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। বললেন, রাণী হ'য়ে দেখলাম কোন সুখ নেই। দাসী হ'য়ে দেখি যদি সুখ পাই। তোমাদের মানসপুরের কাছাকাছি আসতেই অদ্ভুত একটা টান অনুভব করলাম। কে যেন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল। আমি তখন সবিনয়ে বললাম—আমরা ভালবাসার অদৃশ্য জাল বিছিয়ে দিয়েছি যে চারিধারে। আপনি হয়তো সেই জালে পা দিয়েছিলেন। দ্রৌপদী খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, আমাকে কি আপনারা দাসী ক'রে রাখবেন ? আমি বললাম, এখানে রাজা-প্রজা-মনিব-চাকর কিছু নেই। আপনি যেভাবে থাকতে চান সেইভাবে থাকতে পারবেন। আজ আমাদের এখানে একটা ভোজ আছে, আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে। দ্রৌপদী একটু হেসে বললেন, বেশ তো চলুন আপনাদের রান্নাঘরটা কোথা—"

কলিং বেলটা বেজে উঠল। ছকু এসে বলল, "ডাক্তার ঘোষাল এসেছেন।"

ডাক্তার ঘোষাল এসে ঢুকলেন, এক হাতে এক শিশি ওষুধ আর এক হাতে একটা ছবি।

"মাপ করবেন, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছি ব'লে চ'লে এলুম। এই আপনার ওষুধ, দরকার হ'লে রাত্রে আর এক দাগ খাবেন। দু'ঘণ্টার মধ্যে যদি ঘুম না হয় তাহলে আর এক দাগ খাবেন। ওষুধটা পাঠিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু আমাকে আসতে হ'ল এই ছবিটার জন্যে। দেখুন—"

বিশ্বদীপ দেখলেন, একটি নধর গাভীর ছবি। তার পাশে দুটি বাছুর রয়েছে। একটি ছোট, খুব ছোট, মনে হয় সদ্যপ্রসূত; আর একটি বড়।

"যে আর্টিস্টের কথা সেদিন বলেছিলাম তারই আঁকা এই ছবি। ছবির সঙ্গে একটি চিঠিও পাঠিয়েছে। সেটি পড়ে শোনাচ্ছি—

মান্যবরেষু,

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে বুধী নামে একটি গাই ছিল, তার দুটি বাছুর হয়েছিল। দুটি বাছুরকেই খুব ভালবাসতাম আমি। অবস্থা বিপর্যয়ে তাদের হারিয়েছি, কিন্তু বাছুর দুটির কথা আজও আমার মনে পড়ে। আজ একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে। বাছুর দুটোর বাপ কে ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও। আজ ওদের ছবি এঁকে পাঠালাম, কারণ গত রবিবারে আলেয়ার আর একটি ছেলে হয়েছে। ধপধপে ফরসা সুন্দর ছেলে। আমি জানি ও আমার ছেলে নয়। আর একটা ল্যাবরেটরি থেকে আমি সিমেন পরীক্ষা করিয়েছিলাম। ইনজেকশনে কোনও ফল হয়নি। আপনি জানতেন কোনও ফল হবে না, তাই ইনজেকশনের দাম নেননি, আর আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এইবার ঠিক হ'য়ে গেছে। আপনি মহৎ, আপনাকে প্রণাম জানাই। কিন্তু আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার দরকার ছিল না, আমার ভাগ্যকে আমি মেনে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, যে বিধাতা আমাকে এত দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলেছেন তাঁকে আমি একটি জিনিসের জন্য প্রত্যহ প্রণাম করি। তিনি আমাকে ভালবাসবার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি আলেয়াকে ভালবাসতে পেরেছি। আলেয়া তো অনেক জিনিসই বাইরে থেকে আনে নিজেকে অলংকৃত করবার জন্য। বাজার থেকে ফুল আনে, এসেন্স আনে, নিজের পছন্দমতো জামাকাপড় আনে, আয়না, সাবান, ফুলদানী আনে, ছেলে দুটোকেও না হয় এনেছে। কি হয়েছে তাতে! ও নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না, যেমন ঘামাতুম না বুধীর বাছুরের বেলায়। হয়তো আমার উপমাটা ঠিক হচ্ছে না, তবু ওই উপমাটা আমার খুব লাগসই মনে হয়েছে। আমার বিশ্বাস আছে ছেলে দুটিকেও আমি ভালবাসতে পারব। এই ছবিটি আপনাকে উপহার দিলাম। আমার অনেক ছবি আপনি কিনেছেন, এটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি কাল আপনার সঙ্গে দেখা করব।—"

ডাক্তার ঘোষাল এই পর্যন্ত প'ড়ে থেমে গেলেন।

"নামটা আমি প্রকাশ করব না। You may guess anything. আমার এখন বসবার সময় নেই। অনেক রুগী ব'সে আছে। তাছাড়া একটা অস্ট্রেলিয়া-ফেরত ইনজিনিয়র ছোকরা ফিঙের মতো আমার পিছুতে লেগেছে, সে আমাকে বোঝাতে চায় যে বাড়িটা ঠিক লেটেস্ট স্টাইলে হয়নি। I hate latest style, কিন্তু সেকথা ওর মুখের উপর বলতে পারছি না, আমার এক বন্ধুর ছেলে। আচ্ছা চলি—"

ডাক্তার ঘোষাল চ'লে গেলেন।

বিশ্বদীপের হঠাৎ মনে পড়ল তিনি মানসপুরে কয়েকটা ফোটো তুলেছিলেন,—রংবাহারীর, ধানক্ষেতের আর মুরুব্বীর। তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা নিয়ে চ'লে গেলেন ডার্ক-রুমে। মনে পড়ল রংবাহারীকে তিনি এখানে নিয়ে আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু আনা হয়নি। হয়তো এখনও সে তাঁর অপেক্ষায় সেই অন্ধকার ঝোপে ব'সে আছে।··· ফোটোগুলো ডেভালাপ করে দেখলেন একটা ফোটোও ওঠেনি। একটাও না! অথচ তাঁর ক্যামেরাটা খুব ভাল ক্যামেরা। হঠাৎ তাঁর ঘাড়ের উপর থপ্ ক'রে কি একটা যেন বসল।

"ভয় পাবেন না, আমি রংবাহারী।"

"তুমি চ'লে এসেছ! কি ক'রে এলে?"

"আপনি মনে করলেন যে। মুরুব্বী আমাকে খুব ভালো একটা উপায় শিখিয়ে দিয়েছে। মনে করলেই আমি অন্ধকার জায়গায় চ'লে যেতে পারি। যেখানে খুশি যেতে পারি। যে অন্ধকার ঝোপটায় আপনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে রোজ আমাকে মনে করে। রোজ সেখানে যাই। আপনি আজ যেই আমাকে মনে করেছেন অমনি চ'লে আসতে পেরেছি। সিংহের কাছে গিয়েছিলাম একদিন, সে আপনার কথা বলছিল—"

হঠাৎ আবার ফোনটা বেজে উঠল। বিশ্বদীপ ডার্ক-রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাঁধে হাত দিয়ে দেখলেন, রংবাহারী নেই।

ফোন করছিল শ্যামল সোম।

"ও, আপনি বাড়িতে আছেন? বিতুলা দেবী একটু আগে ফোন করেছিলেন আবার। আজ তাঁর বাড়িতে আমার একজন বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। চায়ের নিমন্ত্রণ আছে আমাদের সেখানে। বিতুলা দেবী বললেন, তিনি নিমন্ত্রণ করলে হয়তো আপনি যাবেন না, কিন্তু আমি বললে যাবেন। তাই ফোন করছি। আসবেন? বিতুলা দেবী একজন আর্টিস্টকেও খবর পাঠিয়েছেন আসবার জন্তে। খুব ভালো আর্টিস্ট নাকি—"

"নবনী দাস কি? আমি তাকে চিনি। সত্যিই বড় আর্টিস্ট। অনন্ত রায়?

আপনার বাল্যবন্ধু ? ও, না তাঁর সঙ্গে তো আলাপ নেই। অনঙ্গবাবুর সঙ্গেও নেই। সকলকে নিমন্ত্রণ করেছে বিতুলা ? পাঁচটা ? দেখি, শরীর যদি খারাপ না হয়, তাহলে যাব। না, এখন বেশ ভালো আছি। খেয়ে আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করব। ইনসোমনিয়ার জন্যেই মাথাটা ধরেছিল। আচ্ছা, আচ্ছা—"

বিশ্বদীপ একটু উৎসাহিত বোধ করতে লাগলেন। ভিড়ের মধ্যে তিনি ভালোই থাকেন।

আবার ফোন বাজল।

"ও, বিতুলা ? হ্যাঁ এক্ষুণি ফোন করেছিলেন শ্যামলবাবু। আমি বিকেলে যাব।"

"আমাকে খুশী করবার জন্যে আসবার দরকার নেই। শ্যামলবাবুকে আমি বলিনি তোমাকে অনুরোধ করতে। তিনিই কথাটা তুললেন, তখন আমি বললুম ব'লে দেখতে পারেন। আমার বলবার মুখ নেই কারণ নিমন্ত্রণ করলে উনি প্রায় আসেন না।"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল বিতুলার গলাটা যেন ধরা-ধরা। বললেন, "যাব। আমি কেন যে যাই না তা তুমি জান, সময়ই পাই না। তাছাড়া, না,..আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পাচ্ছি না, থাক। আজ যাব। হ্যালো, হ্যালো—"

বিতুলা ফোন ছেড়ে দিয়েছিল। চেয়ারে বসতেই বিশ্বদীপের মনে হ'ল কা'র যেন একটা ছায়া পড়েছে দ্বার প্রান্তে।

"কে ওখানে—"

সসংকোচে মহুয়া এসে দাঁড়াল।

"আপনি কেমন আছেন ?"

"ভালো আছি। তোমার কোনও অসুবিধা হ'চ্ছে না তো—"

"না।"

তারপর একটু থেমে সে বলল, 'আমাদের সম্বন্ধে কি ঠিক হ'ল শেষ পর্যন্ত ? ধাকড় আর রামু এসেছিল একটু আগে। তারা বলছে সাহেব যখন ভরসা দিয়েছেন সব ঠিক ক'রে দেবেন, তখন আমাদের আর চিন্তা নেই। আমরা কাজে জয়েন করছি—কাল।"

"বেশ, পাঠকজি বাইরে গেছেন, তিনি আসুন। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।"

মহুয়া তবু দাঁড়িয়ে রইল।

"আরও কিছু বলবে ?"

"যদি আপনি রাগ না করেন, বলি। আমি আর মিস্টার সিনহার অ্যাসিস্‌টেণ্ট হ'য়ে কাজ করতে চাই না। আমাকে অন্য কোনও একটা কাজ দিন। আমাকে আর যে কাজ দেবেন তাই আমি করতে পারব।"

"মিস্টার সিন্‌হা যদি না থাকেন তুমি ল্যাবরেটরির কাজ চালাতে পারবে ?"

"আমিই তো চালাই—"

"আচ্ছা, পাঠকজি আসুন। সে ব্যবস্থাও হবে।"
মহুয়া আস্তে আস্তে চলে গেল।

তেরো

পাঠকজি, টমসন সাহেব আর টমসন-পত্নী লিসি লাউপুরে পৌঁছে দেখলেন আদুবাবু নেই। কাছারিবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তাঁরা। পুরাতন চাকর বিরজু ছিল, সে-ই তাঁদের অভ্যর্থনা করল। সে বলল, "নায়েবমশাই এখনও কলকাতা থেকে ফেরেননি।" বলেই সে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে এমন একটা ভিজা-বিড়াল-গোছ ভাব করতে লাগল যে সন্দেহ হ'ল পাঠকজির। তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বার ক'রে টমসন সাহেবকে নির্দেশ দিলেন, "আপনি জিগ্যেস করুন থানা এখান থেকে কতদূর। আর বলুন যে আমরা আগে থানায় গিয়ে দারোগা সাহেবের সঙ্গে কথা ব'লে তারপর এখানে এসে ভাতেভাত রেঁধে খাব। ও যেন খানিকটা দুধ যোগাড় ক'রে রাখে, আর উনুনটা জেলে রাখে যেন—"

বিরজু সব শুনে বলল, "আমি পুরুষোত্তম সিংকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে সব ব্যবস্থা করবে—"

সে এমনভাবে চ'লে গেল যে মনে হ'ল যেন পালিয়ে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে পাঠকজি চেয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর টমসনের দিকে চাইতেই তিনি দেখলেন, লিসি যে বাস্‌কেটটি সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন তার থেকে খাবার বার করছেন। চৌকির উপর খবরের কাগজ বিছিয়েছেন, তার উপর বিছিয়েছেন একটি ধপধপে সাদা ন্যাপকিন। প্লেটও দু'একটা বেরিয়েছে। পাঠকজির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই বললেন, "আপনি খাবেন তো?"

পাঠকজি ঘাড় নেড়ে জানালেন খাবেন।

তারপর একটুকরো কাগজ বার ক'রে লিখলেন, "খাব না একথা আপনার মাথায় এল কি করে। আমি স্বপাক খাই, হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্যে। জাত বাঁচাবার জন্যে নয়। আর একটা কথাও জেনে রাখুন, আমি সর্বভুক। বিলেতে বীফ বেকন সব খেয়েছি। এখন অবশ্য কাঁচকলায় রুচি হয়েছে। আপনি কি এনেছেন?"

লিসি বললেন, "আলুসিদ্ধ, পাউরুটি, ডিমসিদ্ধ আর জেলি। কয়েকটা আপেলও আছে।"

পাঠকজি লিখলেন, "তোফা হবে। আপাতত ওই খাওয়া যাক। পরে রান্নার ব্যবস্থা করা যাবে।"

খেতে খেতে টমসন জিগ্যেস করলেন, "একটা কথা জানতে চাই পাঠকজি। আশা করি আমার এ কৌতূহল আপনি মার্জনা করবেন। বিশ্বদীপকে আমাদের কাছে রেখে

আপনি তার বাবা মাকে নিয়ে চ'লে গেলেন। শুনেছিলাম অম্বরবাবুর এক বন্ধুর হীরের কারবার ছিল আফ্রিকায়, সেইখানেই কাজ নিয়ে—"

পাঠকজি লিখলেন, "ওসব কথা আমি কিছুই বলব না। বিশ্বদীপও জানে না। তাকে কিছুটা বলেছি, পরে সবটাই বলব, তার কাছ থেকেই শুনবেন। অম্বর আর দময়ন্তীর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তাদের কথা গোপন রাখব।"

"আপনি তো জানেন বিশ্বদীপকে আমার মা নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন। ওকে আমি নিজের ভাইয়ের মতো মনে করি, ওর টানেই এদেশে এসেছি, এদেশে চাকরি করেছি, রিটায়ার করবার পরও যেতে পারিনি। আমাদেরও ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি। বিশ্বদীপই আমাদের সব। কিছুদিন আগে লিসি একটা চিঠি পেয়েছে আফ্রিকা থেকে। সেখানে ওর এক বান্ধবী আছে। সে লিখেছে, অম্বরবাবুর নাকি কুষ্ঠ হয়েছিল এবং তিনি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গিয়েছিলেন—"

পাঠকজি আবার লিখলেন, "আমি কিছুই বলব না। বিশ্বদীপই সব কথা বলবে আপনাকে একদিন।"

এমন সময় পুরুষোত্তম সিং এসে হাজির হ'ল। তার নামটা যত জমকালো, চেহারাটা তত নয়। রোগা লিকলিকে চেহারা, মুখে সিংহের ছাপ নেই, মুখখানি যেন একটি কিশোরী মেয়ের। চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক ও লজ্জা। মুখে বয়সের ছাপ পড়েনি। বয়স কত আন্দাজ করা যায় না। এসে প্রণাম ক'রে সসংকোচে দাঁড়িয়ে রইল একধারে।

পাঠকজি টমসন সাহেবের মারফত প্রশ্ন করলেন, "আদুবাবু কোথা?"

"আমি ঠিক জানি না। বিরজু ব'লে বেড়াচ্ছে তিনি কলকাতা থেকে ফেরেননি। কিন্তু আমি ইউসুফ মিঞার কাছ থেকে খবর পেয়েছি তিনি কাল ফিরেছেন।"

"ইউসুফ মিঞা কে?"

"এখানে তাঁর আবগারির দোকান আছে। আদুবাবু সেখান থেকে গাঁজা কেনেন"—বলেই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল সে।

টমসন সাহেব ও লিসি হেসে ফেললেন। পাঠকজির মুখ কিন্তু আরও গম্ভীর হ'য়ে গেল, চোখের দৃষ্টি থেকে ছুটে বেরুল আগুন।

টমসন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখানে কি করেন?"

"আমি এখানকার পাঠশালার পণ্ডিত। বিশ্বদীপবাবুই স্কুল স্থাপন ক'রে আমাকে এখানে বাহাল ক'রে গেছেন। আর একটা অদ্ভুত কাজও দিয়ে গেছেন আমাকে। এ অঞ্চলের যত কুষ্ঠরোগী আছে তাদের খাওয়া-পরা আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় আমাকে। বেশী রোগী অবশ্য নেই, তিনটি আছে। এখানে ডাক্তারও নেই। আমিই আনড়ার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে ওষুধ নিয়ে আসি। আনড়া এখান থেকে দশ

মাইল দূরে। এজন্ত বিশ্বদীপবাবু আমাকে মাসে একশ' টাকা নিতে বলেছিলেন আতুবাবুর কাছ থেকে। কিন্তু আতুবাবু কিছুই দিতে চান না—"

কথাটা বলেই পুরুষোত্তম যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বলল, "আপনাদের জন্ত কি করতে হবে বলুন, আমি সব ক'রে দিচ্ছি।"

টমসন সাহেব বললেন, "শুনলাম এখানে নাকি দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'য়ে গেছে খুব। থানাটা কত দূরে—"

"থানা খুব বেশী দূরে নয়, কিন্তু কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা তো শুনিনি।"

টমসন সাহেব বললেন, "চলুন, তাহলে থানাটাই ঘুরে আসা যাক প্রথমে। সেইখানেই সব খবর পাওয়া যাবে।"

খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল, তিনজনেই পুরুষোত্তম সিংহের সঙ্গে থানা অভিমুখে রওনা হ'য়ে গেলেন।

তাঁরা চলে যাওয়ার একটু পরেই কাছারিবাড়ির কোণের দিকের একটা ঘরের জানলা খুলে গেল এবং দেখা গেল আতুবাবু সেই জানলা দিয়ে উঁকি মারছেন। তারপর তিনি সন্তর্পণে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দার এক কোণে এক বাইক ঠেসানো ছিল। সেইটেতে চড়ে' উধাও হ'য়ে গেলেন তিনি নিমেষে। পাঠকজিরা যেদিকে গেছেন ঠিক তার উলটো দিকে গেলেন।

থানার দিকে যেতে যেতে পুরুষোত্তম সিংহ আর একটি খবর বললে যা পাঠকজি ইতিপূর্বে শোনেননি। এটা অবশ্য আশ্চর্য কিছুই নয়, পাঠকজি লাউপুরের ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাননি কোনদিন। বিশ্বদীপই যা করবার করেন। পুরুষোত্তম সসংকোচে বলল, "বিশ্বদীপবাবু যখন এখানে এসেছিলেন তখন তিনিই আমাকে এখানকার ম্যানেজার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। কারণ, আমি জানি আমি আতুবাবুর সঙ্গে পারব না। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে ওঁর জমিদারির কাজকর্ম ভালভাবে চলে। আতুবাবুকে কিন্তু পেরে ওঠা শক্ত। উনি কখন কোন্ দিক দিয়ে কি যে ক'রে ফেলেন কিছু বুঝতে পারি না। এই দেখুন না, দাঙ্গাহাঙ্গামা কিছু হয়নি অথচ আপনাদের এখানে অনর্থক টেনে এনেছেন।"

থানায় গিয়ে দেখা গেল থানার দারোগা চিৎবিহারী চৌধুরী টমসন সাহেবের পূর্ব-পরিচিত। টমসন সাহেব যখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তখন তিনি নাকি কনেস্টবল হ'য়ে বাহাল হন। টমসন সাহেব যদিও চিনতে পারলেন না তাঁকে, কিন্তু তিনি টমসন সাহেবকে দেখে গদ্গদ, অভিভূত, উচ্ছ্বসিত, কৃতার্থ—ওই ধরনের যত রকম হওয়া সম্ভব তা হলেন এবং করজোড়ে দাঁড়িয়ে একটি কথাই বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, "আপনি দেবতা, আপনি যে এখানে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন তা আমার স্বপ্নাতীত ছিল।" খুব খাতির ক'রে সাড়ম্বরে বসালেন সকলকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনে বললেন, "না সে-সব কিছু হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস হয়েছে যা

আরও সাংঘাতিক। আহ্নবাবু পাগল হ'য়ে গেছেন। অনেকদিন থেকেই সন্দেহ করছি ব্যাপারটা, কিন্তু এখন আর সন্দেহ নেই।"

"কোথায় তিনি—"

"ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন চারিদিকে। আমি লোক পাঠাচ্ছি তাঁকে ধ'রে আনতে। ধরেই আনতে হবে, কারণ এমনিতে তিনি আসবেন না।"

বেরিয়ে গেলেন তিনি এবং দু'জন কনেস্টবলকে বললেন আহ্নবাবুকে ধ'রে আনতে।

সকলকে সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করবার জন্যে সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন তিনি। কিন্তু পাঠকজি ঘনঘন মাথা নাড়াতে টমসন সাহেব বললেন, "আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাঠকজি স্বপাক খান। আমরাও ওঁর সঙ্গে খাব। আপনি আমাদের আহ্নবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন তাড়াতাড়ি।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সেটা তো আমার কর্তব্য। আপনারা অন্তত একটু ক'রে প্রসাদ খেয়ে যান। আমার ঠাকুরের প্রসাদ। এই ঘরে আসুন।"

পাশের একটি ঘরে প্রবেশ করেই তাঁরা প্রথমে দেখতে পেলেন প্রকাণ্ড একটি ছবি। হৃষ্টপুষ্টকায় ভুঁড়ি-ওলা টাক-মাথা বিরাটদেহ প্রখরদৃষ্টি ব্যক্তিটি নীরব ভাষায় যেন বললেন, "ও, তোমরাও এসেছ। আসবেই জানতাম—"

চিৎবিহারী বললেন, "আমার গুরুদেব ঘনিষ্ঠানন্দ পুরী। আমি রোজ এঁর পুজো করি। কিছু প্রসাদ খান।"

প্রসাদে আপেল খোবানি আঙুর জাতীয় ভালো ভালো খাদ্যই ছিল। পাঠকজি কিন্তু প্রসাদও নিলেন না। তিনি মাথা নেড়ে হাতজোড় করলেন। টমসন এবং লিসি খেলেন একটু একটু।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে টমসন বললেন, "মিস্টার চৌধুরী, কিছু মনে করবেন না। আপনার গুরুদেবকে দেখে আমার একটা মুখ মনে প'ড়ে গেল। আমি যখন মধ্যপ্রদেশে ছিলাম তখন ঠিক এই চেহারার একটা ডাকাত ধরেছিলাম। তার নামে অনেকগুলো খুনের চার্জ ছিল, তার ফাঁসি কিন্তু হয়নি। ঠিক এই চেহারা। চেহারায় মিল অবশ্য থাকে, কিন্তু এরকম মিল আমি দেখিনি—"

চিৎবিহারী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, "ইনি চিরকাল হিমালয়ে কাটিয়েছেন। দৈবাৎ একবার কুম্ভমেলায় আমার সঙ্গে দেখা হয়, তারপর থেকে আমি এঁর সঙ্গ ছাড়ি নি। অনেকদিন পরে যমুনোত্রীর মন্দিরে আমাকে উনি দীক্ষা দেন। অনেকদিন আমাকে ঘুরিয়েছিলেন। হিমালয়ের এক গুহায় উনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন—"

লিসি এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি।

বললেন, "উনি যদি ডাকাতও হতেন তাহলেও আমরা ওঁকে অশ্রদ্ধা করতাম না। রামায়ণের মহাকবি বাল্মীকি তো দস্যু ছিলেন। দস্যুও ঋষি হ'তে পারেন একথা আমরা মানি।"

"আচ্ছা, এবার তাহলে যাওয়া যাক—"

পাঠকজির মুখভাব লক্ষ্য ক'রে টমসন আর থাকতে চাইলেন না। কাছারিতে ফিরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন দুটো কয়লার উনুনে আঁচ এসে গেছে এবং বিরজু তাঁদের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই পুরুষোত্তম নানারকম তরকারি, চাল, ডাল, বাসনপত্র নিয়ে হাজির হ'য়ে গেল। সে ওঁদের থানায় পৌঁছে দিয়েই চ'লে এসেছিল। টাটকা মাছও এনেছিল সে কিছু।

পাঠকজি একটি কাগজের টুকরায় লিখলেন—"আজ শুধু ভাতেভাত খাব না। ডালের ছেঁচকি, বেসন দিয়ে কুমড়োফুল ভাজা, আর মাছের ঝাল করব। আশা করি আপনাদের সম্মতি আছে—"

টমসন ও লিসি সানন্দে সম্মতি জানালেন।

বিকেলের দিকে দারোগা চিৎবিহারী চৌধুরী এলেন। এসে বললেন, "আদুবাবুকে ধরেছি, কিন্তু তাঁকে আনা গেল না, কারণ তাঁকে বেঁধে রাখতে হয়েছে। তাঁর নিজের বাড়ির একটা ঘরেই আছেন তিনি। আপনারা যদি দেখতে চান, চলুন—দুটো পালকি আসছে। হেঁটে আপনারা যেতে পারবেন না, রাস্তা ভালো নয়।"

পালকি করেই গেলেন তাঁরা। গিয়ে দেখলেন দারোগাবাবু আগেই পৌঁছে গেছেন বাইকে ক'রে। পালকি থেকে নেমেই স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাঁদের। বাড়ির ভিতর থেকে কান্নার হাহাকার উঠছে।

চিৎবিহারী বললেন, "আসুন, এই ঘরে—"

বারান্দার দিকে একটি ঘরের তালা খুললেন তিনি।

"আসুন—"

ভিতরে গিয়ে দেখা গেল রক্তচক্ষু আদুবাবুর দুটি হাত পিছমোড়া ক'রে জানলার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। এঁদের দেখে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর বললেন, "এসেছেন হুজুররা! আসুন, আসুন। দেখুন আমি কেবল নৌকো বাইছি। সংসার তরণী। বিরাট তুফান। তবু থামিনি। হেঁইও হেঁইও। হুঁশিয়ার, খবরদার। হেঁইও হেঁইও। সাতটি জোয়ান মেয়ে আইবুড়ো হ'য়ে ব'সে আছে। একটি আধটি নয়, সেভেন! বড়টাকে কাঁধে নিয়ে ফেরিওলার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি দ্বারে দ্বারে। কোথাও পাত্তা পাচ্ছি না। মহৎ বাঙালী সমাজ, উচ্চশিক্ষিত বাঙালী সমাজ, অগ্রণী বাঙালী সমাজ, কিন্তু কলকেটি কেউ দেয় না। মিনিমাম পাঁচ হাজার। তাই দাঙ্গাহাঙ্গামা, ফৌজদারী ইত্যাদি ইত্যাদি। হেঁইও হেঁইও, মারো জোয়ান হেঁইও—"

আদুবাবু দুলতে লাগলেন, যেন তরঙ্গতাড়িত নৌকোতে ব'সে আছেন।

পাঠকজি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সবাই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ফিরবার মুখে লিসি টমসনকে বললেন, "তুমি বলছিলে কলকাতায়

ব'সে ব'সে তোমার ভালো লাগছে না। আমারও লাগছে না। এসো না এখানে এসে আমরা থাকি। এখানে অনেক কাজ করতে পারব। বিশুরও উপকার হবে, আমরাও কাজ পাব।"

"খুব ভালো হয়। দেখি বিশু কি বলে।"

কাছারিতে ফিরে এসেই পাঠকজি একটুকরো কাগজে লিখলেন—"আপনারা সত্যিই যদি এখানে থাকতে পারেন তাহলে মস্ত বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়। বিশু রাজী হবে, আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনারা থাকতে পারবেন কি? আমার মনে হ'চ্ছে আদুবাবু পাগলামির অভিনয় করছেন আর দারোগা চিংবিহারীর সঙ্গে তার ষড় আছে!"

টমসন বললেন, "সে সন্দেহ আমারও হয়েছে। তাই আরও মনে হ'চ্ছে যে, আমাদের আসা দরকার। কলকাতায় ফিরে যা হয় ঠিক করা যাবে।"

চোদ্দ

সেদিন বিতুলার বাড়িতে আড্ডাটা খুব জমেছিল। বিশ্বদীপও গিয়েছিলেন, যদিও একটু দেরিতে। বিতুলা তাঁর আশেপাশে ঘুরছিল একটা রঙীন প্রজাপতির মতো, যা বলছিল তা বুঝতে পারছিলেন না বিশ্বদীপ, মনে হচ্ছিল একটা নতুন ছন্দ যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিতুলা যখন টেবিলে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য আলাদা একটা সোনালী পিয়ালাতে চা ঢালছিল তখন বিশ্বদীপের মনে হচ্ছিল সে যেন নেই, তার একটা প্রতিচ্ছবি, তার একটা প্রতীক যেন দাঁড়িয়ে চা ছাঁকছে। তাঁর মনের যে অন্তরতম লোকে তিনি নিয়ে যেতে চান বিতুলাকে, বস্তুত যেখানে না নিয়ে যেতে পারলে বিতুলাকে পাওয়াই যায় না, এবং যেখানে যাবার জন্য বিতুলাও বোধহয় উৎসুক সেই অন্তরতম লোকের পথে দাঁড়িয়েছিল সিংহ। তার গায়ে সেই শতচ্ছিন্ন বহুবর্ণবিচিত্র ময়লা আলখাল্লা, কাঁধের সেই লাঠিটার দু'ধারে ঝুলছে তার সংসার, আর তার দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা নির্বাক প্রশ্ন—এখানে ওকে আনবে? না, বিশ্বদীপ সহজ হ'তে পারছিলেন না বিতুলার কাছে। বিতুলাও পারছিল না। বিশ্বদীপের মনে হচ্ছিল বিতুলা একটা অদৃশ্য দেওয়ালের গায়ে মাথা খুঁড়ছে, আলোর মতো স্বচ্ছ আর হীরের মতো কঠিন দেওয়ালটা। দেওয়াল ব'লে বোঝা যায় না, কিন্তু বিতুলা বুঝেছে, সেই দেওয়ালটার উপর মাথা খুঁড়ছে সে। অসহায় হ'য়ে পড়েছে, বিশ্বদীপ বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু বিতুলার অসহায় ভাব আর কেউ দেখতে পায়নি। শ্যামল সোমের সঙ্গে বিতুলা সোৎসাহে কাব্য আলোচনা করছিল, আর্টিস্ট নবনী দাসকে সে বুঝিয়ে দিচ্ছিল ঠিক কি রকম ক'রে তার বইয়ের ছবি আঁকতে হবে। অনঙ্গ সেনের দোকানে নতুন

কি কি বই এসেছে তা জানতে চাইছিল আগ্রহভরে। বলছিল—"আপনি যেটা নিজে প'ড়ে আমাকে কিনতে বলবেন সেইটে কিনব। সমালোচকদের কথায় বিশ্বাস ক'রে অনেকবার ঠকেছি"—তারপর হেসে উঠেছিল তার অনবদ্য কলকণ্ঠে। অনন্ত রায় সাদামাটা গেঁয়ো লোক, সে একটু দূরে দূরেই স'রে থাকতে চাইছিল, কিন্তু বিদুলা ছাড়েনি তাকেও। বলছিল, "ময়দার সঙ্গে বেসন মিশিয়ে যদি পাউরুটি করা যায় তাহলে কেমন হয়।" পাউরুটির গল্পই করতে লাগল সে নানা ছাঁদে। কিন্তু বিশ্বদীপ বুঝতে পারছিলেন বিদুলা অসহায় হ'য়ে পড়েছে, সে ওই অদৃশ্য কঠিন স্বচ্ছ দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে যাচ্ছে—তাই বিজনবালার সঙ্গে তার আলাপে অত উচ্ছ্বাস, অত বিস্ময়, মেকি-আন্তরিকতার অত ছড়াছড়ি। বিজনবালা মেয়েটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশ্বদীপের। দেখতে কুৎসিত ব'লে নয়, বিজনবালাকে দেখে তার মনে হচ্ছিল একটা কাক যেন কাকাতুয়া ব'লে পরিচিত করতে চাইছে নিজেকে। আর বিদুলা তার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইছিল যেন সে কাকাতুয়া দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে সত্যি, যেন অমন কাকাতুয়া আর সে দেখেনি। কিন্তু বিশ্বদীপ অনুভব করছিলেন—ও অসহায়ভাবে মাথা খুঁড়ে চলেছে খালি, কঠিন স্বচ্ছ দেওয়ালটার কাছে কিছুতেই পরাভব স্বীকার করতে চাইছে না, ঢেকে রাখতে চাচ্ছে নিজেকে, বিশ্বদীপের কাছে কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে না। কিন্তু বিশ্বদীপ সব বুঝতে পেরেছিলেন, তার গল্প গান হাসির অন্তরালে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি অসহায় বিদুলাকে। বিদুলাও কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল? এইসব স্বপ্নের ভিড়েই পথ হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি বারবার সেদিন। তবু মাঝে মাঝে শ্যামল সোমের কবিতার লাইনগুলোই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে বিদুলার কাছাকাছি। বিশেষতঃ এই লাইনগুলো: তোমার কাছে এসে দেখি আরও দূরে চ'লে গেছি। তোমার কাছে যে পথ দিয়ে আসা যায় তার মাপ মাইল দিয়ে হয় না, তার মাপ মুহূর্ত দিয়ে, যে মুহূর্ত অসীমকে সীমার মধ্যে আনে, যে মুহূর্তের মধ্যবিন্দুতে অনাদি অনন্ত আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে আছে, যে মুহূর্তে স্বার্থ নিঃস্বার্থ অবলুপ্ত হ'য়ে রূপান্তরিত হয় অরবিন্দের সুষমায়—সে মুহূর্ত এখনও আসেনি। তাই তোমার অতি কাছে এসেও মনে হচ্ছে অনেক দূরে আছি। সে মুহূর্ত, সেই অসম্ভব বিস্ময় এখনও সম্ভব হয়নি। তাই তুমি দূরে আছ। বিশ্বদীপের মনে হচ্ছিল তারই মনের কথা যেন বাজছে শ্যামল সোমের কবিতার সুরে। বিদুলা মুগ্ধ হবার চেষ্টা করছিল, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছিল, শ্যামলকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলতেও বাধছিল না তার—কিন্তু বিশ্বদীপ অনুভব করছিলেন বিদুলা ওই দুর্ভেদ্য দেওয়ালটার সামনে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেবল, তার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। অনঙ্গ সেনও একটা মজার কথা বলেছিল। বলেছিল, আমরা সবাই স্লেভ (slave), পোশাক-পরিচ্ছদে বড়লোকের নকল করি, লোক-লৌকিকতাতেও তাই, আমদের প্রেমনিবেদনেও অনন্যতা নেই, সেই ফুল ছবি কবিতা চলেইছে তো চলেছে, সাহিত্যের রুচির ক্ষেত্রেও

তাই। যেহেতু নেহরুর টেবিলে রবার্ট ফ্রস্টের দু'লাইন কবিতা পাওয়া গেছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট ফ্রস্টের ভক্ত হ'য়ে উঠল অনেকে। হুহু ক'রে ওর বই বিক্রি হচ্ছে। আমাদের slave হওয়ার দিকেই প্রবণতা বেশী, তাই বোধহয় প্রেমের পথে ভক্তিই শেষ কথা। মীরা তো স্পষ্ট ক'রে বলেই গেছেন—ম্যয় নে চাকর রাখো জী! শ্যামল মনে হচ্ছে এখনও কোথাও আত্মসমর্পণ করেনি, কারণ কবিতায় ও এখনও যুক্তির অবতারণা করছে! কবিতাটা ভালো, কিন্তু ওতে চিঁড়ে ভিজবে না, অবশ্য শ্যামল যে কোন চিঁড়ে ভেজাবার চেষ্টা করছে তা আমি বলছি না। বিশ্বদীপের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল অনঙ্গ সেন। সায় দিয়ে বিশ্বদীপও হেসেছিলেন একটু। অনন্ত বললে—লোকে যখন অভিভূত হ'য়ে পড়ে তখনই slave হয়। আমার দোকানের পাশে ওই যে রোগা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটা আছে, কুঁজো হ'য়ে ময়লা টেবিলটার পাশে ব'সে থাকে, ছোট্ট একটু ছাগলদাড়ি আছে, চোখের কোণে পিঁচুটি, আড়ময়লা জামা-কাপড়—হঠাৎ একদিন দেখলাম এক হোমরাচোমরা ধনী মাড়োয়ারী তার slave হ'য়ে গেছে। হাত জোড় ক'রে এসে ব'সে থাকে প্রায়ই। শেঠজির নাকি কুষ্ঠ হয়েছিল, ডাক্তারবাবুর দু'ফোঁটা ওষুধে সেরে গেছে। উৎকর্ণ হ'য়ে উঠেছিলেন বিশ্বদীপ। তখনই ইচ্ছে করছিল ডাক্তারের নাম ঠিকানাটা টুকে নিতে। কিন্তু সাহস হ'ল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা মতলবও ফেঁদে ফেললেন মনে মনে। ভাবলেন—শ্যামল, অনঙ্গ আর অনন্তকে তিনি নিজের গাড়ি ক'রে পৌঁছে দেবেন, আর সেই সময় দেখে আসবেন ডাক্তারবাবুর দোকানটা। কাষ্ঠমুখ নবনী দাস আর্টিস্ট একধারে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। সে অনুভব করছিল বিদ্যায় বুদ্ধিতে সে এদের সকলের চেয়ে অনেক ছোট। সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতি নিয়ে যে সব আলোচনা চলছে সে সব আলোচনায় যোগ দেবার তার অধিকার নেই—এ কথা সে জানত তাই চুপ ক'রে ছিল। আর একটা কারণেও চুপ ক'রে ছিল সে। সে জানত যে বিশেষ জগতে তার নিজের কৃতিত্ব আকাশচুম্বী সে জগতে এঁদেরও প্রবেশাধিকার নেই। অথচ এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের মহাসমঝদার ব'লে মনে করেন এবং সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা এঁদেরই মন রেখে তাকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে হয়। তাই এঁদের সাহচর্যে আসতে বাধ্য হ'লে নবনী দাস চুপ করেই থাকে বরাবর। ডাক্তার ঘোষালের আগ্রহাতিশয্যেই সে এই বেকার-কমিটিতে যোগ দিয়েছিল। ওই একটিমাত্র লোককেই সে ভক্তি করে, ভালবাসে। ডাক্তার ঘোষাল বারবার বলেন তিনি আর্টের কিছু বোঝেন না। কোনও ছবি তাঁর ভালো লাগে, কোনও ছবি লাগে না। এর বেশী আর কোন দাবি নেই তাঁর। বিশ্ববিখ্যাত ভ্যান গাউ-এর ছবি পিকাসোর ছবি ভালো লাগেনি তাঁর, কিন্তু নবনী দাসের ছবি লেগেছে। হ'তে পারে তিনি আনাড়ী, কিন্তু ভণ্ড নন, পরের মুখে ঝাল খাওয়াকে ঘৃণা করেন। তিনি যে বেকার-ভবন তৈরি করেছেন সেই ভবনের তিনতলার উপর তিনি নবনী দাসের জন্য একটা ফ্ল্যাট বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন তুমি

এই বাড়ির রক্ষাকর্তা হিসাবে থাকো। নবনী রাজী হয়নি। সে তার ভাড়া-করা বাড়িতেই সুখী। সে শিল্পী, তাই স্বাধীনতা চায়। এই সব কারণে উত্তরোত্তর উত্তেজিত হ'য়ে ঘোষাল ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলেন যাতে নবনী দাস অনেক ছবির অর্ডার পায়। ডাক্তার ঘোষাল বিশ্বদীপের কাছে যে আর্টিস্টের গল্প করেছিলেন, সে ই যে নবনী দাস তা বিশ্বদীপ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই একটু সকৌতুকে চেয়েছিলেন তার দিকে। ডাক্তার ঘোষাল তার সম্বন্ধে যে গল্পটা বলেছিলেন তা এতই অস্বাভাবিক এবং বিস্ময়জনক যে বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়। কিন্তু ডাক্তার ঘোষালের কথা অবিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বদীপ নবনী দাসের কাছে গিয়ে বসেছিলেন। ব'সে বলেছিলেন—"পাঠকজি শুনলাম আপনাকে কিছু কাজের অর্ডার দিয়েছেন আমাদের সাবানের জন্য। ডাক্তার ঘোষালের কাছে একটি গাই এবং দুটি বাছুরের ছবি দেখলাম। অপূর্ব ছবিখানা। ডাক্তার ঘোষাল আর্টিস্টের নাম বললেন না, কিন্তু চমৎকার ছবিটা। আমারও একটা ফরমাশ আছে ছবি আঁকার। আপনি সময় ক'রে উঠতে পারবেন কিনা জানি না—"

"সময় তো এখন নেই। আজ বিতুলা দেবী আবার অনেকগুলো ছবি দিলেন আঁকতে। কি ছবি চাই আপনার ?"

"বিতুলার একখানা পোর্ট্রেট"—নিম্নকণ্ঠে বললেন কথাগুলো।

"বেশ এঁকে দেব, কিন্তু সময় লাগবে।"

"তাড়াতাড়ি নেই—"

এর পর বিশ্বদীপ সহসা যেন অনুভব করেছিলেন এরা সবাই তাঁর আপন লোক। নবনী দাসকে অস্বাভাবিক ভাবলেন কেন ? তিনি বিতুলাকে চান এর চেয়ে বেশী অস্বাভাবিক এবং অসংগত আর কি হতে পারে ! বিতুলাকে চাইবার কি অধিকার আছে তাঁর !

নবনী দাস হঠাৎ তার গরুর ছবির প্রসঙ্গে ফিরে গেল।

"আমার গাই বাছুরের ছবিটা আপনার ভালো লেগেছে ?"

"ওটা আপনার আঁকা নাকি ! ওয়াণ্ডারফুল ছবি—"

"ওটা ডাক্তার ঘোষালকে দিয়েছি। ওই একটিমাত্র ছবিই ওঁকে বিনামূল্যে দিতে পেরেছি—"

এইটুকু বলেই বোধহয় নবনী দাসের মনে হ'ল অতিরিক্ত বাচালতা করা হচ্ছে। চুপ ক'রে গেল। আর একটি কথাও বলেনি। এর পরই বিতুলা ঠিক তাঁর সামনের চেয়ারটায় এসে বসল। বিশ্বদীপের মনে হ'ল হঠাৎ হাস্নুহানার গন্ধে ভরে গেল চারিদিক। বিতুলা একটু মৃদু হেসে বুকের কাপড়টা অকারণে টেনে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা ক'রে বলল, "তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কিছুই তো তুমি ছুঁলে না। চা তো দু'চুমুক খেয়ে সরিয়ে রাখলে। একটু কফি ক'রে দিই ? শিঙাড়াগুলো গরম আছে এখনও। খাবে ?

"দাও—"

বিশ্বদীপ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল বিতুলার ড্রইংরুম। মানসপুরে চ'লে গিয়েছিলেন তিনি।

মানসপুরে গিয়ে প্রথমেই দেখা হ'ল বধূসরার সঙ্গে। বধূসরা একটা তমালগাছের তলায় উন্মনা হ'য়ে ব'সে 'ছিল দূরের দিকে চেয়ে। বিশ্বদীপ তাকে দেখে চমকে গেলেন। বধূসরা, না বিতুলা? আশ্চর্য, বিতুলার মুখের একটা আদল পড়েছে বধূসরার মুখে! বিস্মিত হ'য়ে বধূসরার দিকে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। দিগন্তের দূর পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে কি ভাবছে বধূসরা? অনেকক্ষণ বিশ্বদীপের মুখে কোনও কথা সরেনি। বধূসরাও টের পায়নি কিছু। এমনিভাবেই হয়তো অনেকক্ষণ কেটে যেত। কিন্তু গাছের উপর জংলাশাড়ি-পরা কোকিল-বধূ হঠাৎ জোরে খিকখিক ক'রে হেসে উঠল। চমক ভেঙে গেল বধূসরার। সে ঘাড় ফিরিয়ে বিশ্বদীপকে দেখে একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ল।

"আপনি কতক্ষণ এসেছেন—"

"এই তো এলাম -"

"পাহাড়ের দিকে অমনভাবে চেয়ে ছিলেন কেন—কি দেখলেন ওখানে?"

চুপ ক'রে রইল বধূসরা কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "পাহাড়ের ওপারে সমুদ্র আছে।"

বলেই চুপ ক'রে গেল আবার।

তারপরই বিশ্বদীপের মনে হ'ল বধূসরার সমস্ত সত্তা গান গাইছে। সে গানের ভাষা নেই তবু তা শোনা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, এমন কি দেখাও যাচ্ছে। তমালগাছের পাতাগুলো কাঁপছে থরথর ক'রে, জংলাশাড়ি-পরা কোকিল-বধূ হঠাৎ উড়ে চ'লে গেল যেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়, নওরঙ্গী আর সোনা হলুদ সবুজ নলখাগড়ার পাতায় বসে আস্তে আস্তে ডানা খুলছে আর মুড়ছে, একঝাঁক বাঁশপাতি দল-বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন সবুজ আশার মতো। আকাশের মেঘের দল স্বপ্নাচ্ছন্ন, মাঠের আল ধ'রে সারি সারি পোকার দল চলেছে। লাল-ফুটকি, সবুজ-ফুটকি, নীল-ফুটকি সবাই চলেছে। চলেছে সেইখানে যেখানে সবাই যেতে চায় কিন্তু পৌঁছতে পারে না...যেখানে শুধু গান পৌঁছয়। বধূসরার সমস্ত সত্তা গান গাইছে। সে গান বিশ্বদীপও স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। বধূসরার সমস্ত সত্তা যেন বলছে—ওগো সাগর, শুনেছি তুমি অগাধ, অপার, অতল, বিশাল, বিরাট; শুনেছি আকাশের সঙ্গে তোমার মিতালি, শুনেছি তুমি রত্নাকর, শুনেছি তুমি বহুবল্লভ, অসংখ্য নদীর কল্লোলিত কামনা চরিতার্থ করেছ তুমি, আরও কত কি শুনেছি...এর পর বধূসরার গান আর বোঝা গেল না। মনে হ'ল গানের উপর যেন আছড়ে পড়ছে অসংখ্য ঢেউ, সমুদ্রের কল্লোলে যেন ঢেকে যাচ্ছে সব। বধূসরার মনের শেষ কথাটি যেন শেষ হয়েও হচ্ছে না।

হঠাৎ বিশ্বদীপ দেখতে পেলেন—পাহাড়গুলোর কুষ্ঠ হয়েছে। বড় বড় ঘা দগদগ করছে ওদের সর্বাঙ্গে।

"ও কি, এক কামড় খেয়েই যে থেমে গেলে! বাকিটা খাবে না? ভালো হয়নি বুঝি—"

বিশ্বদীপ অপ্রস্তুতমুখে বাকি আধখানাও খেয়ে ফেললেন।

"শুধু ভালো নয়, চমৎকার হয়েছে, দাও, আরও খাব।"

গপগপ ক'রে খেতে লাগলেন। অবাক্ হ'য়ে দেখতে লাগল বিতুলা। হঠাৎ তার চোখে জল এসে পড়ল। সে যেন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল বিশ্বদীপ যা করছে তা স্বাভাবিক নয়। ও যেন তার নাগালের বাইরে চ'লে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বদীপ ফেরবার সময় অনঙ্গ, শ্যামল, অনন্ত আর বিজনবালাকে নামিয়ে দিয়ে এলেন তাদের বাড়িতে। অনন্ত তার দোকানেই নেমে গেল। বিশ্বদীপ তার দোকানের সামনে সেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারটিকেও দেখলেন। ছোট্ট ছাগলদাড়ি আছে (ইংরেজিতে যাকে বলে 'গোটি')—বকের মতো একাগ্র মুখভাব। একাগ্র দৃষ্টি পুস্তকে নিবদ্ধ। ছোট্ট মানুষটি। চোখে মুখে নাকে কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ ছুঁচের ভাব।

বিজনবালাকে যখন নামিয়ে দিলেন তখন সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসল। বিশ্বদীপকে প্রণাম ক'রে বলল, "আমার কোনও গুণ নেই, তবু যদি আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার কথা মনে থাকবে কি আপনার?"

অনঙ্গ আর অনন্ত আগেই নেমে গিয়েছিল। গাড়িতে ছিল কেবল শ্যামল। বিজনবালার কাণ্ড দেখে সেও অবাক্ হ'য়ে গেল।

বিশ্বদীপ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, "নিশ্চয়ই থাকবে। আপনি কি কাজ করবেন আমায় বলুন।"

"আমি বিয়ের আগে বাবার চিঠি টাইপ করতুম। আপনার চিঠি টাইপ ক'রে দিতে পারি। মাইনে চাই না। আমি কাজ চাই, যে কোনও কাজ। সময় নিয়ে কি যে করব আমি ভেবে পাই না—"

বিশ্বদীপ বললেন, "একটা কাজ আমি করব ভেবেছিলাম কিন্তু ক'রে উঠতে পারিনি। আপনি তাহলে সেইটে করুন। যেখানে যত বিজ্ঞাপন পাবেন সংগ্রহ করুন, সেগুলোকে পরে নানা শ্রেণীতে ভাগ করতে পারা যাবে। কোন্ বিজ্ঞাপন কোথায় পেলেন, কোন্ তারিখে পেলেন পাওয়ামাত্রই টুকে রেখে দেবেন এ খবরগুলো। আমার বিশ্বাস এর থেকে পরে অনেক রকম চিন্তার ও আনন্দের উপকরণ পাওয়া যাবে।"

"বেশ তাই করব।"

বিশ্বদীপ চ'লে গেলে শ্যামল সোম সবিস্ময়ে বলল, "এ কি ব্যাপার বৌদি—"

"লোকটি দেবতা। আপনার কৃপায় আজ আমার দেবদর্শন হ'য়ে গেল। এজন্য আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

"দেবতা কি ক'রে বুঝলেন ? দেবতা মাপবার মাপকাঠি আছে নাকি কাছে ?"

"মেয়েমানুষদের মনের মধ্যে নিখুঁত নিভুঁল মাপকাঠি থাকে। সেটা যে কি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।"

বিজনবালা আর কোন কথা না ব'লে ভিতরে ঢুকে গেল আর সদর দরজায় খিল বন্ধ ক'রে গটগট ক'রে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

শ্যামল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে, তারপর মুচকি হেসে সে-ও চলে গেল। সে বিজনবালাকে ভালোবাসে না। সে বিজনবালারূপ অদ্ভুত পুতুলটাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কেবল, আর উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে। শ্যামল যদিও সাহিত্যের ছাত্র, তার মনটা কিন্তু বিজ্ঞানীর মতো। কবিতা নিয়েই শুধু নয়, জীবন নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার অদম্য কৌতূহল তার। কয়েকদিন থেকে একটা কথা তার মাথায় ঘুরছে, অনন্তকে কথাটা সে বলেনি এখনও, হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললে সেইদিনই বলবে। গলি থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা। অনন্তর দোকান তখনও বন্ধ হয়নি। সে ব'সে হিসাব করছিল। বিস্মিত হ'য়ে বলল, "কি হঠাৎ ফিরলে যে আবার।"

"হিসাব শেষ ক'রে নাও, একটা কথা বলবার আছে।"

"কি কথা—"

"হিসাব শেষ কর আগে। আমি না হয় আর এক কাপ চা খেয়ে আসি। এখুনি আসছি।"

শ্যামল বার বার চা খায়। পাশের চায়ের দোকানটায় গিয়ে ঢুকল। ফিরল প্রায় আধঘণ্টা পরে। তখন অনন্ত তার খেরোর খাতা বেঁধে ফেলেছে।

"কি বলবে বল—"

"আমি অনেকদিন থেকেই কথাটা তোমাকে বলব ভাবছি—" ব'লে শ্যামল চুপ ক'রে গেল।

"কি কথা ?"

তারপর ওস্তাদ ঘাতক যেমন এক কোপে পাঁঠার মুণ্ডটা উড়িয়ে দেয় তেমনিভাবে আচম্বিতে শ্যামল বলল, "তুমি কি জান যে তুমি একটি খুনে ?"

"আমি !"

"হ্যাঁ, তুমি। Slowly এবং inexorably একটি স্ত্রীলোককে হত্যা ক'রে চলেছ তুমি। সেটা খেয়াল আছে ?"

অনন্ত খুব নির্বিকারভাবে একটু মুচকি হেসে একটি বিড়ি ধরিয়ে ফেলল। তারপর

বলল, "ও সেই পুরোনো কাসুন্দি। এত রাত্তিরে আর ওসব ঘাঁটবার ইচ্ছে নেই। চল ওঠা যাক। বেশ রাত হয়েছে।"

"আজ বৌদি কি করলে জান? রাস্তার মাঝখানে বিশ্বদীপবাবুকে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে বললে, আমাকে যাহোক একটা কাজ দিন। আমি আর পারছি না। শুনে আমার মনে হ'ল যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল। বিশ্বদীপবাবু চ'লে গেলে আমাকে বললে —আমার জীবন ধন্য হ'য়ে গেল, আজ দেবদর্শন করলুম। তুমি হয়তো তোমার পাঁউরুটি-বুদ্ধি নিয়ে এর অন্য মানে করবে কিন্তু আমি জানি এসব হ'চ্ছে—helpless cries of an agonised soul."

"বাংলা ক'রে বল, ইংরেজি বিদ্যে আমার বেশীদূর নেই।"

"আমি একটা কথা সোজা তোমাকে জিগোস করতে চাই—তুমি বৌদিকে এমনভাবে অবহেলা করছ কেন?"

"অনেকবার তো বলেছি। যে পথ কাঁটায় ভরতি, যে পথ এবড়োখেবড়ো, যে পথে চললে বার বার হোঁচট খেতে হয় সে পথে আমি চলতে পারিনি বলেই চলা ছেড়ে দিয়েছি।"

"তাহলে আইনত ওকে ছেড়ে দাও। ও আর কাউকে বিয়ে ক'রে সুখী হোক।"

"কে ওকে বিয়ে করবে! করুক না, আমার আপত্তি নেই।"

"কিন্তু আইনত ও সেটা পারে না। আগে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে হবে। ও অবশ্য সেটা করতে পারে, অনায়াসে বলতে পারে—তুমি একটি রক্ষিতা নিয়ে আছ।"

"আমার যে রক্ষিতা আছে তা ও জানে না।"

"তা আমি জানি। ওকে যদি মুক্তি দিতে চাও আমি ওকে কথাটা বলতে পারি, ডিভোর্সের সব ব্যবস্থাই করতে পারি।"

অনন্ত মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করছিল।

"একটা কথা মনে হ'চ্ছে, বলব?"

"বল।"

"আজ হঠাৎ ওকে নিয়ে এত উত্তেজিত হয়েছ কেন বুঝতে পারছি না। তুমিই কি ওকে বিয়ে করতে চাও নাকি।"

এবার শ্যামল হো হো ক'রে হেসে উঠল।

"আমি একটা খাঁচার পাখীকে ছেড়ে দিতে চাই বলেই যে তাকে বিয়ে করতে চাই এ বুদ্ধি তোমার মাথায় ছাড়া অন্য কারো মাথায় গজাতো না! আমি কিন্তু আসলে যা বলতে চাচ্ছি সেটা বলাই হয়নি এখনও। তুমি ওর সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহার করো। ও তোমার গেঁয়ো mentality-র সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পাচ্ছে না ব'লে ওকে তুমি যে আইনের সুযোগ নিয়ে কাপুরুষের মতো মেরে ফেলবে সেটা কি ভালো? ওর দিকে একটু মন দাও, ভালবাসার একটু অভিনয় কর, তাহলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে—"

"দেখ ভাই, আমি কাঁটা বাছতে পারি না বলে মাছ খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। ও যে শজারু, ওকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরব কি ক'রে!"

"অভিনয় কর।"

"অভিনয় করতে আমি পারি না, তাছাড়া অভিনয় দু'দিনেই ধরা প'ড়ে যায়।"

"তা যায়, কিন্তু এ-ও শোনা গেছে যে অভিনয় করতে করতে অনেক সময় অভিনেতা আর অভিনেতা থাকে না। যে ভূমিকায় সে অভিনয় করছে সেই ভূমিকার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যায় সে। তুমি কিছুদিন যদি অভিনয় কর তাহলে হয়তো সত্যিই তুমি একদিন বিজনবালার প্রেমে প'ড়ে যাবে। এ রকম ঘটনা সত্যিই ঘটেছে।"

"কিন্তু তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন?"

"প্রথম কারণ—আমার মাথা আছে ব'লে, দ্বিতীয় কারণ—তুমি আমার বন্ধু, তুমি যে একটা পিশাচ হবে এ আমি সহ্য করতে পারি না ব'লে, তৃতীয় কারণ—বৌদিকে দেখে আমার কষ্ট হয় ব'লে। তুমি চাইছ বৌদি বরাবর কেবল তোমার গোড়ে গোড় মিলিয়ে চলবে আর তুমি তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার তোয়াক্কাও করবে না—এ অসম্ভব ব্যাপার আমি চলতে দেব না—"

শ্যামল দুম ক'রে একটা কিল মেরে বসল টেবিলের উপর। ভয় পেয়ে গেল অনন্ত। দেখল শ্যামলের চোখ দুটো কপালের দিকে ঠেলে উঠেছে, নাকের ছ্যাদা দুটো বড় হ'য়ে গেছে। অনন্ত শ্যামলকে সত্যিই ভালবাসত, তাই এই কাণ্ড দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে পড়ল সে। কি কাণ্ড করবে ছোকরা!

বলল, "আহা চটাচটির দরকার কি। কি করতে হবে সেইটেই বল না খুলে।"

শ্যামল বলল, "তুমি দোকান থেকে সোজা বাড়ি যাবে। বাড়ি গিয়ে বৌদিকে নানারকম ফরমাশ করবে। বলবে আমার জুতোর ফিতে খুলে দাও, বলবে আমি আজ শুক্ত খাব রান্না কর, যদি না করে, তার সঙ্গে ঝগড়া করবে!"

"ঝগড়া করলে অশান্তি হবে কেবল। ও গজগজ করা ছাড়া আর কিছুই করবে না।"

"যদি না করে তাহলে তোমার সেবা করবার জন্যে লোক বাহাল কর একজন। নয়নতারাকেই নিয়ে যাও তোমার বাড়িতে!"

"বল কি! নয়নতারা এতে রাজী হ'তে পারে কখনও!"

"দিদিকে আমি যতদূর জানি তাতে মনে হয় হবে। She is a gem – দু'বেলা তোমার বাড়ি গিয়ে তোমাকে সেবা ক'রে আবার চ'লে আসবে। তুমি দুপুরে কিংবা অন্য সময় তার বাড়িতে যেতে পার। কিন্তু বৌদিকে নিয়ে তুমি মাঝে মাঝে সিনেমা যাবে, পার্টিতে যাবে, পিকনিকে যাবে। দিনরাত কেবল পাঁউরুটি নিয়ে ব'সে থাকলে চলে? আর একথাটাও তোমার ভোলা উচিত নয় যে বৌদির বাবার টাকাতেই তুমি এই পাউরুটির দোকান খুলতে পেরেছিলে! বৌদিকে কষ্ট দিলে মহাপাপ হবে তোমার।"

অনন্ত বাঁ-হাত দিয়ে মাথায় দু'চারবার হাত বুলিয়ে শেষে বলল, "বেশ, তুমি যখন ক্ষেপেছ, তখন তাই করা যাবে। কিন্তু আমি জানি ওতে কোনও ফল হবে না। তবে নয়নতারাকে আমি বলতে পারব না, তুমি বোলো।"

"বলব। আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি—কাল সকালে দিদির কাছে যাব।"

শ্যামল বেরিয়ে গেল। ফুটপাথ ধ'রে একা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে গিয়ে হাজির হ'ল চৌরঙ্গীতে। আরও খানিকটা হেঁটে গড়ের মাঠে গিয়ে যখন পৌছল তখন সেখানে গিয়ে বসল একটা খালি বেঞ্চিতে। খানিকক্ষণ বসবার পর নিজেকে আবিষ্কার করল সে। আবিষ্কার করল তার জীবনের মহাশূন্যতাকে। এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চায় সে কবিতা লিখে, বিদুলার সঙ্গে আলতো আলতো প্রেমালাপ ক'রে, বিজনবালার ব্যর্থ জীবনকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে, অনঙ্গের সঙ্গে সাহিত্যচর্চা ক'রে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল শূন্যতা শূন্যতাই আছে। আর সেই শূন্যতায় সঞ্চরণ করছে একটা আকুল ক্রন্দন, তার ভাষা নেই, সুর নেই, ছন্দ নেই, তা স্পষ্ট নয় কিন্তু তা যে কান্না, তাতেও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে, তারপর আবার শুরু করল হাঁটতে। চোখের সামনে নানারঙের আলো জ্বলছে, নিবছে, দু'পাশ দিয়ে জনস্রোত ব'য়ে চলেছে—কিন্তু তার শূন্যতা পূর্ণ হচ্ছে না,—হবার নয়। সে নিজেই জানে না কিসে তা পূর্ণ হবে।

সেদিন বিশ্বদীপ অনেক রাত্রে ফিরে দেখলেন মহুয়া তখনও তাঁর অপেক্ষায় বারান্দার একধারে ব'সে আছে। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে চ'লে যাচ্ছিল। বিশ্বদীপ ডাকলেন তাকে।

"তুমি এখনও ঘুমোও নি?"

"না।"

"কেন—?"

"এমনি।"

আর কিছু না ব'লে সে চ'লে গেল।

পনেরো

দিন পনেরো পরে।

বিশ্বদীপ আপিসে ব'সে ছিলেন। ধাকড় আর রামু এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

বিশ্বদীপ বললেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন। ওই চেয়ারে ব'স। তোমরা তো এখন ব্যবসায় সমান অংশীদার। ব'স। তোমাদের সঙ্গে একটা কথা আছে। মহুয়া কোথায়?"

"সে কারখানায় কাজ করছে। সে বলছে আপনি যা ঠিক ক'রে দেবেন তাই সে মেনে নেবে। আমাদেরও তাই মত।"

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন। ব'স।"

"আপনার সামনে হুজুর 'কুরসি'তে বসতে 'লাজ' লাগছে।"

ধাকড় অপ্রস্তুতমুখে মাথাটা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

রামু বলল, "আমাদের হুজুর কুরসিতে বসার 'আদত্' (অভ্যাস) নেই। দাঁড়িয়েই আমরা ভালো থাকি।"

বিশ্বদীপ একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, "তোমরা দুজন আর মহুয়া—এই তিনজনই কি সব শ্রমিকের হ'য়ে ব্যবসার কাজকর্ম দেখবে? অবশ্য আমিও থাকব।"

ধাকড় মাথা চুলকে বলল, "আমরা তো কিছুই বুঝি না।"

"আমি বুঝিয়ে দেব। আমাদের ব্যবসার একটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের দিক, আর একটা হচ্ছে মাল আমদানির দিক, আর একটা হচ্ছে মাল রপ্তানীর দিক। এই তিনটে দিক তোমরা তিনজনে দেখাশোনা কর। আমি আপিসের হিসাবপত্র, চিঠি লেখা এইসব নিয়ে থাকব। তোমাদের নিজেদের কাজকর্ম ছাড়াও সন্ধের পর এইসব দেখতে হবে। এসবের জন্য আপিসে অন্য লোকও আছে, তোমরা তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সব করবে।"

রামু বলল, "আমরা ওসব পারব না বাবু। অত মেহনত আমাদের পোষাবে না। আমরা সন্ধ্যাবেলা একটু বিশ্রাম করি, সিনেমায় যাই।"

বিশ্বদীপ বললেন, "বেশী কাজ না করলে বেশী টাকা পাবে কি ক'রে। বাজারে সমস্ত ফ্যাকটরিতে মজুরদের যা মাইনে, আমরা তাই তোমাদের দিচ্ছিলাম, কিন্তু তোমরা তাতে সন্তুষ্ট নও। তোমাদের সকলকে ব্যবসার অংশীদার ক'রে নিতে চাইছি তাতেও তোমরা রাজী হ'চ্ছ না। বলছ ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব তোমরা নিতে পারবে না। বেশী খাটতেও পারবে না। কিন্তু এটা জেনে রেখো বেশী খাটতে না পারলে বেশী রোজগার করা যায় না।"

ধাকড় মাথা চুলকে বলল, "আমরা মুরুখ মানুষ হুজুর, ব্যবসার কিছু বুঝি না। ব্যবসা আমাদের হাতে পড়লে চৌপট হ'য়ে যাবে।"

"তোমাদের সব শিখে নিতে হবে। আমি কাল সব হিসেব দেখেছি। গত বছর আমাদের খরচখরচা বাদ দিয়ে পনেরো হাজার টাকা লাভ হয়েছিল। এ টাকাটা আমরা ব্যবসা বাড়াবার কাজে লাগিয়েছি। তোমরা যদি এর অংশীদার হও, আর এ বছরও যদি অত লাভ হয়, তাহলে তোমাদের প্রত্যেকে তোমাদের মাইনে ছাড়া বছরে একশো সওয়াশো টাকা ক'রে পাবে। ব্যবসা যদি বাড়াতে পারো, আরও বেশী পাবে।"

রামু হাত উলটে ব'লে বসল, "বছরে একশো সওয়াশো টাকার জন্তে অত ঝঞ্ঝাটে আমরা যেতে চাই না। আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দিন।"

"ব্যবসাটা নিজেরা চালিয়ে দেখ তোমাদের মাইনে বাড়ানো চলবে কিনা। আমি সবই তো তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাইছি। ভয় পাচ্ছ কেন, আমরা তো তোমাদের পিছনে থাকবই। তোমরা কাজের ভার নাও, বোঝ কতটা মাইনে তোমাদের নেওয়া সঙ্গত। তোমরা কি চিরকালই সামান্য মজুর থাকবে? তোমাদেরও বড় ব্যবসাদার হ'য়ে দেশের ভালোমন্দের চিন্তা করতে হবে। আমেরিকার বড় বড় কোটিপতিদের মধ্যে অনেকে খুব সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। কেউ সামান্য চাষার ছেলে, কেউ সামান্য জনমজুর। পারবে না কেন? লেগে পড়।"

এ বক্তৃতা শুনে ধাকড় আর রামু দুজনেই চুপ ক'রে রইল। তারপর ধাকড় বলল, "কিন্তু আমরা আমাদের অংশ থেকে আগোড় (অগ্রিম) কিছু নিতে পারব কি?"

বিশ্বদীপ বললেন, "এ সম্বন্ধে পাঠকজির সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছেন অগ্রিম নেওয়া চলবে না। বছরের শেষে তোমাদের যা পাওনা তা হিসাব ক'রে নগদ দিয়ে দেওয়া হবে। আর এর জন্তে তোমাদের বেশী মেহনত করতে হবে। এ ব্যবস্থায় তোমরা যদি রাজী না থাক, আমরা তোমাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হব। তোমরা জিনিসটা ভালো ক'রে ভেবে দেখ, তারপর যা ভালো মনে কর তা আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে জানিয়ে দিও।"

ধাকড় আর রামু প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।

চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ। তাঁর মনে হ'ল—কেন এসব করছি! তাঁর তো টাকার দরকার নেই। তিনি কি সত্যিই এইসব অশিক্ষিত ভীরু মজুরদের বড় ব্যবসাদার করতে চান? তারপরই তাঁর হঠাৎ মনে হ'ল কাজ না থাকলে তিনি পাগল হ'য়ে যাবেন। কাজ দিয়ে হোক, অকাজ দিয়ে হোক, জীবনকে নিশ্ছিদ্র নিরবসর ক'রে রাখতে হবে সর্বদা। নিজের চারিদিকে একটা ধাঁধা সৃষ্টি করতে হবে, সৃজন করতে হবে প্রহেলিকার যবনিকা। বিলাতে যদি রিসার্চ করবার সুযোগ পান থাকতে পারবেন কি সেখানে বিদুলাকে ছেড়ে? বিদুলা এখানে থাকবে আর তিনি—।

"আসতে পারি?"

"আসুন।"

প্রবেশ করলেন মিস্টার সিন্‌হা। ফ্যাকটরির কেমিস্ট্রি বিভাগের কর্তা। প্যান্ট-বুশশার্ট-নীল-চশমা-পরা স্মার্ট ভদ্রলোক। পরিষ্কার কামানো, কিন্তু কামানো সত্ত্বেও সারা মুখে কেমন যেন একটা নীলচে ভাব। দুটো ঠোঁটই মোটা। চিবুকটি মাংসল এবং তার মাঝখানে একটা গর্ত। এই গর্তটির জন্য তিনি নিজে কামাতে পারেন না, নাপিতের সাহায্য নিতে হয়। চওড়া ভুরুর নীচে চক্ষু দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু চোখের দৃষ্টির মধ্যে প্রসন্নতা নেই। চতুর চালাক ভাব আছে, একটা হিংস্রতাও যেন মাঝে মাঝে উঁকি

দিচ্ছে সে দৃষ্টি থেকে। মাংসল নাক, কান দুটিও বেশ বড় বড়। মুখটাও বড়। তিনি এসেই কাজের কথা পাড়লেন।

"আমাকে নোটিশ দিয়েছেন কেন, সার? আমার কাজের কোন ত্রুটি হয়েছে কি? আমি তো যথাসাধ্য—"

"না, আপনার কাজের কোনও ত্রুটি পাইনি আমরা। মাসে তিনশ' টাকা মাইনে দিয়ে কেমিস্ট রাখবার সামর্থ্য নেই আমাদের ফার্মের। ওয়ার্কাররা বেশী মাইনের দাবি ক'রে স্ট্রাইক করেছে। তাদের নইলে আমাদের চলবে না, কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের কাজটা আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।"

"আপনি? শুনেছিলাম আপনি Zoology-র লোক।"

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "কেমিস্ট্রিও জানি কিছু কিছু। বি. এস-সি.তে কেমিস্ট্রি পড়তে হয়েছিল তো। সাবান তৈরি করবার মতো বিদ্যে আমার আছে।"

"তা তো নিশ্চয়ই, তা তো নিশ্চয়ই। তাহলে চার্জটা কি আমি আপনাকেই দিয়ে যাব?"

"আপনি কবে যাবেন?"

"আপনার নোটিশ পাওয়ার পরই আমি বিজ্ঞাপন দেখে কয়েক জায়গায় কাজের চেষ্টা করেছিলাম। একটা ভাল ফার্মে চাকরি পেয়ে গেছি। তারা আমাকে এই সপ্তাহেই জয়েন করতে বলছে।"

"বেশ, আপনাকে আজকেই ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি মহুয়াকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে যান। তার কাছ থেকে আমি বুঝে নেব।"

"একটি লিখিত order দিন তাহলে।"

"আপিস থেকে একটু পরে সে order যাবে আপনার কাছে। যাবার আগে আপনার মাইনেটাও নিয়ে যাবেন।"

"চ'লে যাবার আগে আপনাকে আর একটা কথাও ব'লে যাওয়া আমি কর্তব্য মনে করি।"

"কি বলুন—"

"ওই মহুয়ার সম্বন্ধে। ও একটি জাতসাপ। She is a viper. ওকে বিশ্বাস করবেন না, ওর সংস্রবেও আসবেন না। শুনলাম আপনি ওকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, তাই আপনাকে সাবধান করা উচিত মনে করেই এই কথাগুলো বললাম।"

বিশ্বদীপের একবার মনে হ'ল মহুয়ার কাছে মিস্টার সিন্‌হার সম্বন্ধে যা শুনেছেন তা বলেন। কিন্তু কথাটা মনে হওয়ামাত্র তাঁর ভদ্রমন সংকুচিত হ'য়ে উঠল।

শুধু বললেন, "ধন্যবাদ। আর কিছু বলবার আছে আপনার?"

"না। আচ্ছা, তাহলে চলি, নমস্কার।"

একটা দায়-সারা গোছ নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার সিন্‌হা। বিশ্বদীপের

আবার মনে হ'ল এইসব অকাজ দিয়ে কতদিন নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারব। মনে হ'ল বিদুলা অপেক্ষা করছে আমি কবে তাকে গিয়ে বলব তুমি এস। কিন্তু আমি পারছি না, বিবেক বাধা দিচ্ছে, পাঠকজি বলেছেন বিয়ে করবার আগে সব কথা খুলে বলতে হবে, সিংহ বাধা দিচ্ছে তার রহস্যময় ইঙ্গিত দিয়ে। মনে পড়ল রুদলবাবু কুষ্ঠ-ভীতিকে জয় করেছিলেন। কিন্তু বিদুলা তো রুদলবাবু নয়, বিদুলা পারবে না। বিদুলাকে এই নিদারুণ পরিস্থিতির সামনেও সে নিয়ে যেতে পারবে না। হঠাৎ ইনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে হোমিওপ্যাথিক শিশিটা বার করলেন তিনি। ডাক্তার কারফরমা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন সারিয়ে দেবেন। বলেছেন, ও কুষ্ঠ নয়, ও শুধু নিউরাইটিস। কিছুদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। কিন্তু আর একটা কাণ্ডও করেছেন তিনি। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সব বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। বলেছেন, আগে আমি আপনাকে যে ওষুধ দেব তা আপনার রোগের ওষুধ নয়, আগে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের বিষগুলো আপনার শরীর থেকে বার করতে হবে। বিশ্বদীপ বড় বিজ্ঞানী, তবু তিনি ডাক্তার কারফরমার কথা বিশ্বাস করেছেন। হ্যাঁ করেছেন, কারণ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ভালো হ'য়ে যাবে। ডাক্তার ঘোষাল সে আশ্বাস দিতে পারেননি। তিনি কেবল নানারকম ট্যাবলেট খাইয়ে যাচ্ছেন আর বলছেন অপেক্ষা করুন, ধৈর্য চাই···।

কপাট ঠেলে পাঠকজি প্রবেশ করলেন। শুকুল ঘরে ঢুকে তাঁর ব্যাগ দিয়ে গেল। তারপর বলল, "বিলাইতি খইনি কোথাও পাচ্ছি না। সাঁওতালি খইনি একরকম পাওয়া যাচ্ছে, সেটারও বেশ তেজ আছে, সেটা কিনব ?"

পাঠকজি ঘনঘন মাথা নেড়ে বারণ করলেন। তারপর কাগজ বার ক'রে লিখলেন—"হাতীবাগান বাজারে রামকিষুণ মুদির কাছে পাবে। তার কাছে যদি না থাকে তাহলে আমার নাম ক'রে বললে সে যোগাড় ক'রে দেবে। সারাজীবন ঐ খইনি খেয়েছি, বুড়ো বয়সে সাঁওতালি খেতে পারবো না।"

শুকুল একদৃষ্টে তার প্রভুর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই জবাব পাবে তা সে জানত তবু রাগ-অনুরাগ-মিশ্রিত একটা দৃষ্টি স্তব্ধ হ'য়ে রইল তার বিস্ফারিত চোখে। একটু বাধা সৃষ্টি করতেও চেষ্টা করল সে, যদিও জানত সেটাও টিকবে না।

"অতদূর যেতে আসতে সময় লাগবে কিন্তু, রান্নার যোগাড় ক'রে আসিনি।"

পাঠকজি একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে লিখলেন—"সে জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যা বলছি তাই কর।"

শুকুল বেরিয়ে গেল।

তখন পাঠকজি বিশ্বদীপকে সম্বোধন ক'রে লিখলেন—"টমসনের চিঠি পেয়েছ ? ওঁরা ওখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন। তোমার জন্যে যে বাংলোটা আলাদা করা আছে সেইটেই পছন্দ হয়েছে ওঁদের। লিসি লিখেছেন তাঁর বাসনপত্র ফার্নিচার সব যেন ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমিও চিঠি পেয়েছি। তাঁর সব জিনিসপত্র পরশু পাঠিয়ে দিয়েছি। আর একটা জিনিসও করেছি, আপনাকে না জিজ্ঞাসা করেই, রাগ করবেন না আশা করি।"

পাঠকজি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খালি, কোন উত্তর না দিয়ে।

"আমি টমসনকে 'পাওয়ার অব এটর্নি' পাঠিয়ে দিয়েছি। ও যখন লাউপুরে থাকবেই ঠিক করেছে তখন ওখানকার সব ভার নিক আর যা ভালো বোঝে তাই করুক। আইনত সে অধিকারটা ওকে দিয়ে দিলুম। লিসির সেলাইয়ের কলটা ভেঙে গেছে দেখলাম, নতুন কলও একটা পাঠিয়ে দিয়েছি তাকে, আর কিছু উল আর বোনবার সরঞ্জাম। ওখানে তো এসব জিনিস পাওয়া যায় না।"

পাঠকজি তৎক্ষণাৎ কাগজে খসখস ক'রে লিখলেন—"খুব ভালো কাজ করেছ। এমন সুবুদ্ধির পরিচয় ইদানীং তুমি দাওনি। সেখান থেকে লোক ফিরেছে? কাকে পাঠিয়েছিলে?"

"টোটো গেছে। আর দুজন চাকর। তাদের এখনি ফিরবার কথা।"

পাঠকজি লিখলেন—"তোমার স্ট্রাইকাররা কি বলে?"

"আপনি যা বলেছিলেন তাই বলেছি ওদের। ওরা এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি।"

পাঠকজি লিখলেন—"আমার মনে হয় ওরা অংশীদার হ'তে রাজী হবে না। ওই মজুরিতেই কাজ করবে ওরা, দেখো। যদি করে তাহলে প্রত্যেককে বছরে পঁচিশ টাকা ক'রে বোনাস দেব আমরা। এখন সেকথা ব'লো না। ওরা যদি এই মজুরিতেই ভালো-ভাবে কাজ করে তাহলেই আমরা ওটা দেব। মিস্টার সিন্‌হার কি হ'ল?"

"তাকে নোটিশ দিয়েছি। মনে হয় এই সপ্তাহেই সে চ'লে যাবে।"

"যতদূর শুনেছি লোকটি সুবিধার নয়। প্রাণপণে আমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করবে। আমাদের সাবানের পুরো ফরমুলা ও জানে কি?"

এটা লিখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চাইলেন তিনি বিশ্বদীপের দিকে।

"সবটা জানে না। আফ্রিকান সেই রুটের অ্যালকহলিক এক্স্‌ট্র্যাক্ট আমি নিজেই করি। ওকে প্রয়োজন মতো মেপে দি। সেটা ও জানে না।"

পাঠকজির ভ্রূ মসৃণ হ'য়ে গেল।

"আফ্রিকার সে রুট কিন্তু খুব বেশী নেই। আমাদের সেখানকার এজেন্টকে এবার চিঠি লিখতে হবে।"

পাঠকজি লিখলেন—"আমি লিখে দিয়েছি। কংগোর একটা জঙ্গল থেকে সেটা সংগ্রহ করতে হয়।"

"আচ্ছা, ও ওষুধে বাবার কি কোনও উপকার হয়েছিল?"

পাঠকজি লিখলেন—"না, সে ওটা ব্যবহার করবার সুযোগই পায়নি। স্বপ্ন দেখবার

দিন কয়েক পরেই ও মারা যায়। ওর সে স্বপ্নের কথা আমাকে ব'লে যায়। স্বপ্নটা অদ্ভুত। স্বপ্নে দেখেছিল কংগোর জঙ্গলে যেন একজন নিগ্রো তান্ত্রিক সব পশুদের ঘা সারিয়ে দিচ্ছে। বাঘ, সিংহ, হাতী, ময়াল সাপ, সকলের গায়ে বড় বড় ঘা, এক বিরাটকায় নগ্ন নিগ্রো গাছের রস নিংড়ে নিংড়ে তাদের ঘায়ে দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেরে যাচ্ছে তাদের ঘা। শেষকালে একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক এসে হাজির হ'ল। নিগ্রোটা একটা বুনো লতা দেখিয়ে বললে—ওতে তোমার ঘা সারবে। ওর শেকড়ের রস আর ওর পাতার স্পর্শ খুব উপকারী। এই বনের ভিতর আরও কিছুদূর যদি চ'লে যাও তাহলে এই লতার জঙ্গল আছে দেখতে পাবে। সেখানে যদি গিয়ে বাস করতে পার তাহলে তুমি সেরে যাবে। কিন্তু সেখানে বাস করতে পারবে না। বিষাক্ত সাপ আছে সেখানে অনেক। লতার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে সে সাপ। এই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল অম্বরের। সে আমাকে বললে, তুমি সব কথা টুকে নাও। আর একটা কাগজ দাও আমাকে, ছবি এঁকে দিই। অম্বর খুব ভালো ছবি আঁকতে পারত। যদিও কুষ্ঠরোগে তার আঙুলগুলো মোটা মোটা হ'য়ে গিয়েছিল তবু সেই লতার পাতা আর নিগ্রো তান্ত্রিকের চেহারা সে এঁকে দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল এই লতা খুঁজে বার কর, আর জগতের কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ কর। সে মারা যাবার পরে অনেক খুঁজে প্রায় বছরখানেক পরে সেই নিগ্রো তান্ত্রিককে আবিষ্কার করি। ছবি না থাকলে পারতাম না। পরে দেখলাম ওই লতার শিকড় ওদেশে অনেকেই কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করে। আমি যতটা পেরেছিলাম সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলাম। তারপরে ওখানে একটি এজেন্ট নিযুক্ত ক'রে এসেছিলাম, সে আমাকে পাঠায়। এজন্য তাকে বছরে হাজার টাকা দিই আমরা, তা তো তুমি জানো। তোমার শরীর আজকাল কেমন আছে ?"

বিশ্বদীপ সত্য কথা বলতে পারলেন না। ঘুরিয়ে বললেন, "ভালোই আছি।"

পাঠকজি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর আবার লিখলেন—"দেখ বিশু, তোমাদের নিয়েই আমার সারাজীবন কাটল। আমার নিজের সংসার পরিবার কিচ্ছু নেই। তোমাদের কেন্দ্র ক'রেই আমার সব। অম্বরকে কথা দিয়েছিলাম তুমি যদি সুস্থ থাকো তাহলে তোমাকে সংসারী ক'রে দিয়ে, তোমার টাকাকড়ি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর আমি ছুটি নেব, তার আগে নয়। তোমার শরীর যখন ভালো আছে, আর তোমার বিয়ের বয়সও যখন হ'য়ে গেছে তখন আমার মনে হয় এবার সদ্বংশের একটি সুশ্রী মেয়ে দেখে তুমি বিয়ে কর। তোমার লাউপুরের জমিদারি ছাড়া, আর এই সাবানের ব্যবসায়ে যে দশ লাখ টাকা খাটছে তা ছাড়া তোমার পঁচাত্তর লক্ষ টাকা আমার কাছে গচ্ছিত আছে। টাকাটা এখানে নেই, আছে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে। আমারই নামে আছে। সেটা এবার তোমার নামে ট্রান্সফার ক'রে দেব।"

"কিন্তু আপনি সেদিন বলেছিলেন মনে হচ্ছে ব্যবসাতে যে টাকা খাটছে সেটা ওই পঁচাত্তর লক্ষ থেকে নেওয়া।"

"না। এ দশ লক্ষ টাকা অম্বর আমাকে আলাদা ক'রে দিয়েছিল, বলেছিল আমার জন্যে তুমি এত কষ্ট করেছ, এ টাকা দিয়ে জীবনটাকে তুমি ভোগ কর—কিন্তু ভোগ বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে আমি তা বুঝি না। আমার সে রকম ট্রেনিং নেই। ভোগ করবারও একটা ট্রেনিং থাকার দরকার। সুতরাং ও টাকাটা আমার কাছেই প'ড়ে ছিল ব্যাঙ্কে। তারপর মৃত্যুকালে অম্বর আমাকে যখন সব টাকাই দিয়ে গেল, তখন ও টাকা খরচ করবার আর প্রশ্নই রইল না। ওই টাকার সুদ থেকে আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় খরচ আমি চালিয়েছি, তোমার পড়া-শোনার খরচ দিয়েছি, টমসন পরিবারকে মাসে মাসে তোমার জন্যে টাকা দিয়েছি। কলকাতায় তোমার জন্যে বাড়ি কিনেছি ছ'টা। এর জন্যে অবশ্য তোমার বাবার কলিয়ারিগুলোকে বিক্রি করতে হয়েছিল। ভোগ করবার জন্যে অম্বর আমাকে যে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিল সেইটে দিয়েই আমি সাবানের ব্যবসা করেছি। তোমাকে এত কথা খুলে কখনও বলিনি, কারণ বলবার দরকার ছিল না। সব টাকাই তোমার। সত্যিই তুমি মস্ত ধনী একজন। লেখাপড়াও ভালো শিখেছ। আশা করা যায় একটি বউ পেলে তুমি সুখী হবে। কিন্তু আমি ভরসা ক'রে আশা করতে পারছি না। যদিও তোমার জন্মসময়টা আমি ঠিক জানি না, টমসন বলেছিল সে হাসপাতালের রেকর্ড নাকি তোমাকেই দিয়েছিল, তুমি বলছ সে সব হারিয়ে ফেলেছ। তবু আমি দশাফল বিদ্যার যতটুকু জানি তার থেকে আমি যা বুঝেছি তাতে আমি আশ্বাস পাই না। দেখতে পাই তোমার পিছনে একটা কালো ছায়া সর্বদা ঘুরছে। আশঙ্কা হয় সেই ছায়া হয়তো শেষ পর্যন্ত সব গ্রাস ক'রে ফেলবে। এটা অবশ্য আমার আন্দাজ। সত্য না-ও হ'তে পারে। অনেক সৌভাগ্যবান্ লোকের পিছনে আমি ওইরকম ছায়া ঘুরতে দেখেছি।…"

পাঠকজি লেখা থামিয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর হঠাৎ আবার লিখলেন—"তুমি বিয়ের সম্বন্ধে কিছু ঠিক করেছ কি, মানে কোনও বিশেষ মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়েছে কি?"

"আমি ও বিষয়ে এখনও মনস্থির করতে পারিনি। আমার বাবার আর মায়ের যে ইতিহাস আমি শুনলাম তা আমি কাউকে বলতে পারব না। যদি পারি তাহলে আপনাকে জানাব। আচ্ছা, একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছে। বাবা এত টাকা পেলেন কোথা থেকে।"

"একজন বড় হীরকব্যবসায়ীর সঙ্গে তোমার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনিই ওকে নিয়ে যান আফ্রিকায়। সেখানে ওঁরই এক ল্যাবরেটরিতে অম্বর কাজ করত। সেই সময় অম্বর হীরের সম্বন্ধে কি যেন একটা গবেষণা করে, আর তার ফলে ব্যবসায়ে অনেক টাকা লাভ হয়। এজন্য প্রায় এক কোটি টাকা দিয়ে সেই গবেষণার সব তত্ত্ব কিনে নেন

সাহেবটি। অম্বরকে তিনি বরাবর খুব সাহায্য করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অম্বরের আর তোমার মায়ের চেহারা এত বীভৎস হ'য়ে উঠল যে তারা আর লোকালয়ে থাকতে চাইত না। জঙ্গলে জঙ্গলে তাঁবু ফেলে ফেলে থাকত…"

আবার নীরব হ'য়ে গেলেন পাঠকজি। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে শুকুল এসে গেল।

"কিছুদূর গিয়েই একটা ছোট দোকানে পেয়ে গেলাম বিলাইতি খইনি। হাতী-বাগানে আর যেতে হ'ল না।"

পাঠকজি উঠে পড়লেন।

"চললেন আপনি ?"

মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন পাঠকজি।

পাঠকজি চ'লে যাবার পর ডাক্তার ঘোষালের ফোন এল।

"কেমন আছেন ?" সেদিন বিদুলা দেবীর বাড়িতে শুনলাম বেকার-ভবন কমিটির সবাই 'মীট' করেছিলেন। এ-ও শুনলাম সেখানে বেকার ছাড়া আর সব বিষয়েরই আলোচনা আপনারা করেছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটার মর্মে আপনারা প্রবেশ করেছেন। নির্জলা বেকাররাও নিজেদের সম্বন্ধে কখনও আলোচনা করে না। সাধারণত তাদেরও আলোচ্য বিষয় হয়—গভর্নমেণ্টের অপটুতা, সাহিত্যের অসারতা, সিনেমা-থিয়েটারের ভালো-মন্দ—এইসব। আমি অবশ্য এসব কথা বলবার জন্যে আপনাকে ফোন করিনি। আমি ফোন করছি অন্য কারণে। আপনি আপনার লরি-ড্রাইভার আফজাল খাঁকে একদিনের জন্য spare করতে পারবেন ?"

"তা পারব না কেন ? কিন্তু ওকে আপনার কি দরকার ? লরি ক'রে মালটাল আনাবেন নাকি ?"

"উনি একটি মহাপুরুষ। এ শহরে কংক্রিট-রহস্য কেউ জানেন না। জানেন কেবল ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষাল। কিন্তু ডাক্তার শ্রীকান্ত ঘোষাল পরশু থাকছেন না, আর সেই দিনই তাঁর ছাদঢালাই হওয়ার কথা। এখানকার একজন বুড়ো সুপারিন্‌টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বললেন—আপনার ড্রাইভার আফজাল খাঁও এ বিষয়ে একজন expert—ওরকম expert তিনি নাকি দেখেননি। আগে এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করত। ওকে অপমান করে ব'লে প্রকাশ্য দিবালোকে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিল সে। মকোদ্দমা ল'ড়ে জিতেছিল, ফাঁসি হয়নি, জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এল যখন, তখন ও ড্রাইভার। জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের একটা ভাঙা গাড়ি ঠিক ক'রে, ড্রাইভারি শিখে লাইসেন্স নিয়ে বেরিয়ে এল। এদিক ওদিক করেছিল দিনকতক, তারপর আপনার কাছে গেছে। কেমন কাজ করে ?"

"চমৎকার। আমার ভাঙা লরিটাকে ঠিক করেছে।"

"করবেই তো, ও যে মহাপুরুষ। পরশু তরশু আমি থাকব না, ও যদি আমার ছাদ-চালাই করবার ভারটা নেয় নিশ্চিন্ত হ'য়ে চ'লে যেতে পারি।"

"কোথায় যাচ্ছেন ?"

"বলব না, কারণ বললে বিশ্বাস করবেন না। আর বিশ্বাসও যদি করেন হাসবেন, অবজ্ঞার হাসি, you poor people, এ ছাড়া আর কোনও হাসি আপনারা হাসতে জানেন না। সুতরাং বলব না।"

"আচ্ছা, আমি কাল সকালেই আফজালকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

"রাগ করলেন তো ?"

"না, না, রাগ করব কেন ?"

"হ্যাঁ করেছেন, আপনার টোন থেকেই বুঝতে পারছি সেটা। কথাটা কিন্তু বলবেন না কাউকে। আমি যাচ্ছি আসাম। সেখানে এক জঙ্গলে এক পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড এক দেবদারু গাছ আছে। সেই দেবদারু গাছের মগডাল থেকে পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় নাকি অপূর্ব দেখায়। সূর্যোদয় আরও অপূর্ব। তাছাড়া সে জঙ্গলে বাঘ আছে। আমি এক ঢিলে দুই পাখী মারব ঠিক করেছি। আমার লোক চ'লে গেছে। ওই গাছের উপর একটা মাচান বেঁধে রাখবে আর একটা মোষের বাচ্চা বেঁধে রাখবে তার কাছে। পূর্ণিমার দিন সেখানে পৌছতে হ'লে পরশু আমাকে এখান থেকে বেরুতেই হবে।"

"আর আপনার রুগীরা ?"

"তারা হয় অপেক্ষা করবে, না হয় অন্য ডাক্তারের খোঁজ করবে। আসল কথা কি জানেন, ওসব আর ভালো লাগে না। তার চেয়েও deeper কথা হচ্ছে, আমার সত্যিকার কাজ কিছু নেই, রুগী চরিয়ে বেড়াই, বাড়ি করি, পোষ্যপুত্র, পোষ্যকন্যা নিয়ে মানুষ করি—কিন্তু এসব বাইরের কাজ। এস:ব মন ভরে না। আমিও একজন বেকার। তাই মন ভরাবার জন্যে মাঝে মাঝে পালিয়ে যাই বনে-জঙ্গলে। Satisfied ? আফজাল তাহলে কাল আসছে ?"

"নিশ্চয়ই—"

"গুড্। ছেড়ে দিচ্ছি।"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল ডাক্তার ঘোষালও তাঁর আপন জন, তাঁকে তিনি ভালবাসেন, কিন্তু সত্যিই কি তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ? কই তাঁকে তো তিনি সব কথা খুলে বলতে পারলেন না। পাঠকজিকেও তো সব কথা খুলে বলেননি। বিদুলাকেও না—পৃথিবীতে সত্যিই কি তাঁর অন্তরঙ্গ আছে কেউ, যাকে সব কথা তিনি অসংকোচে বলতে পারেন, সব শুনেও যার এতটুকু ঘৃণা বা অনুকম্পা হবে না ··

মানসপুরেও অন্ধকার চারিদিকে। বর্ষা নেমেছে। অন্ধকারের সমুদ্রে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য কদম্বফুল, আকাশের বিজলীরাও নেমে এসেছে মানসপুরের কাননে

কান্তারে, তন্বী চঞ্চল আলোক-প্রতিমার মতো সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে সকলে, প্রত্যেকের গলায় দুলছে জুঁইফুলের মালা। অসংখ্য ময়ূর বধূসরা নদীর ধারে সারিবদ্ধ হ'য়ে সংবর্ধনা করছে এদের পেখম তুলে, তাদের কেকারবে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে আকাশ বাতাস, মেঘের পানসিতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে উন্মত্ত ডাহুক-ডাহুকীর দল। মাঠের এক জায়গায় জল জমেছে, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে অসংখ্য সরু সরু সবুজ ঘাস, মাঠের আনন্দ যেন মূর্ত হ'য়ে রয়েছে তাদের সূচীমুখ সবুজ আগ্রহে; তাদের মধ্যে আসর জমিয়েছে লক্ষ সিং সদলবলে। বিশ্বদীপকে দেখে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে সে তাঁকে জানিয়ে দিল, দেখছেন তো ব্যাপার খুব ঘনীভূত। বিশ্বদীপ সেই স্বপ্নময় অন্ধকারে অন্যমনস্ক হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা বড় কালো মেঘের মতো কি যেন ভেসে ভেসে আসছে তাঁর কাছে। খুব কাছে যখন এল তখন বুঝতে পারলেন—মেঘ নয়, হাঁস। কুচকুচে কালো রঙের হাঁস, চোখ দুটো জ্বলছে পদ্মরাগ মণির মতো। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন দু'ফোঁটা গাঢ় রক্তের মতো দুটো চুনিও রয়েছে যেন তার চোখের কোণে।

হাঁস কথা কইল। বলল, "আমি দময়ন্তীর হাঁস। দময়ন্তীর দুঃখে আমার রং হ'য়ে গেছে কালো। দময়ন্তীর দুঃখে আমার অশ্রু হয়েছে রক্তবিন্দু। দময়ন্তী কোথা, তাকেই আমি খুঁজছি।"

ধীরে ধীরে আবার ভেসে চ'লে গেল সে।

তারপর বিশ্বদীপ দেখলেন ছাতা মাথায় দিয়ে বাঁ হাতে কোঁচার কাপড়টা তুলে আর ডান হাতে ছাতির বাঁটটা ধ'রে ছপছপ ক'রে কে একজন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। কাছে আসতেই বিশ্বদীপ মুরুব্বীকে চিনতে পারলেন।

"কি ব্যাপার আজকে বলুন তো—"

"ঘনঘোর ব্যাপার। বধূসরাকে সামলানো যাচ্ছে না। তার আকুল প্রার্থনা বিচলিত করেছে ইন্দ্রকে। তিনি চেরাপুঞ্জীর সমস্ত মেঘকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন; বধূসরা দু'কূল ভেঙে উদ্দাম হ'য়ে ছুটেছে পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের তলায় গিয়ে মাথা খুঁড়ছে। ইন্দ্রদেব নাকি অভয় দিয়েছেন প্রবল বর্ষণে পাহাড়কে ডুবিয়ে দেবেন। বধূসরা পাহাড় পেরিয়ে তখন ওপারে সমুদ্রের সঙ্গে গিয়ে মিশবে। এসবের কোনও মানে হয়?"

বিশ্বদীপের মনে হ'ল এতক্ষণে সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া গেল। পাহাড়টা যে কোনও সমস্যাই নয়, বস্তুতঃ কোনও বাধাই যে সমস্যা নয় এটা বধূসরা প্রমাণ ক'রে ছাড়বে এবার।

"বধূসরা এখন কোথায়?"

"আমিও তো তাকেই খুঁজছি। কিন্তু সে তো এখন দু'কূল-প্লাবিনী, আত্মহারা, উন্মাদিনী। তাকে তো এখন পাওয়া যাবে না, অথচ রুদ্দলবাবু বলছেন তাকে আমার

কাছে নিয়ে এস আমি তাকে বুঝিয়ে বলি। বানে সমস্ত ফসল ডুবে গেছে, এখানকার যত ইঁদুর, ছুঁচো, বিছে, সাপ সবাই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে রুদলবাবুর বাগানের গাছে গাছে। বড় বড় গোখরো সাপ চন্দনগাছের ডালে ডালে জড়িয়ে আছে। টিট্টিভপাখীরা মহা চিৎকার আরম্ভ করেছে, তাদের সব ডিম ভেসে গেছে—কি কাণ্ড বলুন তো! আমি চলি, দেখি যদি বধূসরাকে কোথাও ধরতে পারি। পাব না জানি, কিন্তু রুদলবাবুর হুকুম তো অমান্য করা যায় না, পাই না পাই ঘুরতে হবে।"

ছপছপ করতে করতে মুরুব্বী অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মুরুব্বী চ'লে যাওয়ার পর আর একটা ব্যাপারে বিস্মিত হলেন বিশ্বদীপ। চারিদিকে বৃষ্টি পড়ছে অথচ তাঁর গায়ে লাগছে না কিছু। বিস্ময়ের পরই কিন্তু একটা অস্পষ্ট বেদনা বোধ করলেন। তাঁর মনে হ'ল মানসপুরের আপন লোক হ'য়ে যেতে পারেননি তিনি। এখানে এখনও তিনি অপরিচিত আগন্তুক। এখানকার বৃষ্টি পর্যন্ত ভদ্রতা করছে তাঁর সঙ্গে। রংবাহারীর কথা মনে পড়ল। দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত বিমর্ষভাবে। তারপর বধূসরা নদীর দিকেই গেলেন আস্তে আস্তে। গিয়ে দেখেন সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। ছোট নদী বধূসরা নেই, সে সমুদ্র হ'য়ে গেছে নিজেই। নীল তার জলের রং, সর্বাঙ্গে ছোটবড় অসংখ্য ঢেউ,—দূরে নীল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে মূর্তিমতী আকুলতার মতো সে যেন উথলে উঠেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে কালো কালো ওগুলো কি কাঁপছে? মেঘ না বধূসরার চুল, না তার বিরহ? নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ রোমাঞ্চিত হ'য়ে। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি বিহুলার অন্তরই যেন প্রত্যক্ষ করছেন। তারপর হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ছোট্ট খেলনার মতো একটা ময়ূরপংখী তাঁর পায়ের কাছে এসে ভিড়ল। আর সে ময়ূরপংখী থেকে ছোট ছোট বামনের মতো নেমে এল তিনজন। নেমে তারা ময়ূরপংখীটাকে খেলনার মতোই জল থেকে তুলে সেটাকে একটা বড় পাথরের আড়ালে রেখে দেখতে দেখতে নিজেরা বড় হ'য়ে গেল যেন মন্ত্রবলে। অসাধ্যসাধন, শ্রীমন্ত-প্রতিম আর সাগর-সঙ্গমকে বিশ্বদীপ চিনতে পারলেন। বিশ্বদীপের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। হাসিমুখে এগিয়ে এল সাগর-সঙ্গম।

"খুব তাক লেগে গেছে, না? আমাদেরও লেগে গেছে। অসাধ্যসাধন আরব-তন্ত্র ভাগ্যে পড়েছিল, আর ভাগ্যে শ্রীমন্ত ওকে আরব দেশ থেকে তন্ত্রটা এনে দিয়েছিল—তা না হ'লে তো মহামুশকিলে প'ড়ে যেতাম।"

বিশ্বদীপ একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "এখনও ঠিক মাথায় ঢুকল না।"

"না ঢোকবারই কথা। শ্রীমন্ত একবার আরবসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, সেখানে এক আরব বেদুঈনের সঙ্গে ভাব হ'ল আমাদের। সে বললে, একবার এক হিন্দু পণ্ডিতকে বন্দী করেছিল তারা। পণ্ডিত বলে আমার কাছে পয়সাকড়ি কিছু নেই, আছে শুধু একটি শাস্ত্র—তার নাম মায়ামন্ত্র দীপিকা। শাস্ত্রটি অদ্ভুত। এটা নিয়ে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। শেখ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—বেশ। কিন্তু ও-শাস্ত্রের নাম বদলে দিতে

হবে। মায়ামন্ত্র-দীপিকা নাম কেটে ওর নাম ক'রে দাও আরবী তন্ত্র। পণ্ডিত প্রাণের ভয়ে তাই করলেন। সেই তন্ত্রটি আমার কাছে আছে, আমাকে যদি পঞ্চাশটি আশরফি দাও, ওটি তোমাদের দিতে পারি। শ্রীমন্ত সেবার জাফরান আর লবঙ্গ বিক্রি ক'রে অনেক টাকা উপার্জন করেছিল। সে বললে, আমাদের পণ্ডিত বন্ধুর জন্যে চল এটা কিনে নিয়ে যাই। আমি তো এর ভাষা এক বর্ণ বুঝতে পারছি না। অসাধ্যসাধন বইটি প'ড়ে কিন্তু বলল, এ অদ্ভুত বই। এতে যে-সব মন্ত্র আছে তা গান্ধর্বী মন্ত্র। এ মন্ত্র পাঠ করলে বড় ছোট হ'য়ে যায় আর ছোট বড় হয়। এ মন্ত্র হাতীকে পিঁপড়ে আর পিঁপড়েকে হাতী করতে পারে। আমরা পাহাড় থেকে আগে হেঁটে আসতাম। কিন্তু দেখেছেন তো বধূসরা বান ডাকিয়ে কি কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে। আমাদের ময়ূরপংখী এত কম জলে চলে না। তার জন্য সাগর চাই। তাই শ্রীমন্ত অসাধ্যসাধনকে বললে— তুমি ময়ূরপংখীটাকে ছোট ক'রে দাও আর আমাদেরও ছোট ক'রে দাও। আমরা ওপারে গিয়ে রুদলবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আসি। রুদলবাবু মনে মনে ক্রমাগত আমাদের ডাকছেনও। বধূসরাকে সাগরের স্বপ্ন আমিই দেখিয়েছি, কিন্তু ও যে এমনভাবে ক্ষেপে যাবে তা তো কল্পনা করিনি। অসাধ্যসাধন মন্ত্রবলে পাহাড়কে ছোট ক'রে দিতে পারে—কিন্তু আমরা যাব কোথা। কাছেপিঠে তো আর পাহাড় নেই। এ এক সমস্যায় পড়া গেছে।"

বিশ্বদীপ প্রশ্ন করলেন, "আপনাদের পাহাড়টা ঘুরে সমুদ্রে পৌছান যায় না?"

"যায়। কিন্তু যেখান থেকে ঘুরতে হবে সেখানে বিরাট মরুভূমি আছে একটা। আমরা তার নাম দিয়েছি তৃষ্ণা রাক্ষসী। সেখানে গেলেই বধূসরাকে ও শোষণ ক'রে ফেলবে। চলুন, আগে রুদলবাবুর কাছেই যাওয়া যাক।"

রুদলবাবুর কাছে গিয়ে দেখা গেল তিনি তানপুরায় দেশ রাগিণী আলাপ করছেন তন্ময় হ'য়ে তাঁর বাগানের উঁচু চৌতারায় ব'সে। ইঁদুর, ছুঁচো, বিছে, সাপ, কীট-পতঙ্গের দল মুগ্ধ হ'য়ে শুনছে সে আলাপ। বিশালকায় অসাধ্যসাধনও মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন, তিনিও চোখ বুজে ব'সে পড়লেন রুদলবাবুর পাশে আর ধীরে ধীরে দুলতে লাগলেন। শ্রীমন্ত আর সাগর-সঙ্গমও বসলেন, কিন্তু তাঁদের মুখে মুগ্ধভাব ফুটল না। শ্রীমন্তের ভুরু কুঁচকে গেল, আর সাগর-সঙ্গমের মুখে ফুটল মুচকি হাসি। বিশ্বদীপও বসলেন একধারে, কিন্তু তাঁর মনে হ'তে লাগল, কি যেন একটা করা হয়নি, কি যেন একটা বাকি আছে— তারপর হঠাৎ মনে পড়ল। সিংহের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি তাঁর। সিংহ কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন। কোথাও দেখতে পেলেন না তাকে। ক্রমশ তাকে দেখার আগ্রহটা এতো বাড়ল যে আর সব যেন ঢেকে গেল, ঝাপসা হ'য়ে গেল চতুর্দিক। অবলুপ্ত হ'য়ে গেল রুদলবাবুর গানের আসর, অবলুপ্ত হ'য়ে গেল তিনজন পাহাড়ী। সমস্ত অবলুপ্ত হ'য়ে জাগল কেবল একটি মাঠ—মাঠের অপর প্রান্তে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো বড় বড় পত্রহীন গাছ তাদের আঁকাবাঁকা শাখা

আকাশে মেলে দিয়ে—আর সেই মাঠে একা ভিজছে সিংহ। তার সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা, কিন্তু ঘাগুলো ঘায়ের মতো নয়, ফুলের মতো। মনে হচ্ছে সিংহ যেন ফুলের অলংকার প'রে ব'সে আছে। তার সিংহবদনে ফুলের সুষমা, তা আর বীভৎস নয়, তা সুন্দর। নির্বিকার সিংহ ভিজছে ব'সে ব'সে। তার জিনিসগুলোও ভিজছে। হঠাৎ কয়েকটা বড় বড় শকুনি এসে হাজির হ'ল। একটা শকুনি তার বিরাট পক্ষ বিস্তার ক'রে স্থির হ'য়ে রইল সিংহের মাথার উপর। আর তার জিনিসগুলোর উপর ডানা ছড়িয়ে বসল আরও দুটো শকুনি। শকুনিরা সিংহকে ভিজতে দেবে না, নষ্ট হ'তে দেবে না তার জিনিসপত্র। অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। একটু পরেই চোখাচোখি হ'ল সিংহের সঙ্গে। সিংহ বলল, "তুমি একটু আগে ভাবছিলে অন্তরঙ্গ কেউ আছে কি না পৃথিবীতে? কেউ নেই। তোমার অন্তরঙ্গ তুমি আর তোমার দুঃখ। সুখ নয়, সুখেরা পারাবত, তারা আসে আর উড়ে যায়। দুঃখই তোমার চিরন্তন বন্ধু। মাঝে মাঝে রুদলবাবুরা এসে তোমার ক্ষতকে ফুলের মতো সুন্দর সাজে সাজাবেন, শকুনিদের নিযুক্ত করবেন তোমাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু সে সব টি'কবে না শেষ পর্যন্ত। ক্ষত ক্ষতই থাকবে, বৃষ্টি তোমাকে ভিজিয়ে দেবেই। রুদলবাবুরা মহৎ লোক, কিন্তু তাঁরা সৃষ্টির চিরন্তন সত্যকে উলটে দিতে পারেন না। কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্তরা চিরকাল ঘৃণিত হ'য়ে থাকবে সমাজে, কারণ মানুষের সৌন্দর্যবোধ আছে, তারা কুৎসিতকে আঁকড়ে ধরবে কেন? অভিনয় ক'রে ধরতে পারে, কিন্তু প্রাণ থেকে ধরবে কেন? এই দুঃখকেই মেনে নিয়ে থাকতে হবে, আত্মসমর্পণ করতে হবে ভাগ্যের কাছে…রুদলবাবুর হাসির শব্দে মিলিয়ে গেল সিংহ। বিশ্বদীপ সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর সামনে বিচিত্র একটি স্বর্ণসিংহাসনে ব'সে আছেন এক দিব্যকান্তি পুরুষ। রুদলবাবু আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, "দেবরাজ ইন্দ্র, আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবেন তা প্রত্যাশা করিনি।"

ইন্দ্র বললেন, "আপনি যে পাচটি দূতী পাঠিয়েছেন, তারা ইন্দ্রাণীর প্রিয় সহচরী। শুনলাম আপনারা তাদের নাম দিয়েছেন তুহিনা, তরলা, হিল্লোলা, তুফানী আর হাওয়া। আপনারা নাম দেন, কিন্তু আমি নাম দিতে পারি না, আমি জানি ওরা প্রত্যেকেই অপরূপা। আপনাদের বধূসরাও অপরূপা। তার প্রার্থনায় বিচলিত হ'য়ে আমি মেঘদের পাঠিয়েছি। আবার এই পাঁচটি অপরূপার আগ্রহে আপনার কাছেও আসতে হয়েছে। আদেশ করুন কি করতে হবে—"

"আপনার মেঘরা আমার মানসপুরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তার একটা বিহিত করুন" —রুদলবাবুর চোখ দুটো হাস্যপ্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল।

"কিন্তু আপনাদের বধূসরা যে সাগরের সঙ্গে মিলতে চায়, ওই পাহাড়কে না ডোবাতে পারলে তো তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। তাই ওই পাহাড়কে ডোবাতে চাই।"

মেঘমন্দ্রকণ্ঠে অসাধ্যসাধন ব'লে উঠলেন, "পাহাড়কে ডোবাতে পারবেন না। আমি মন্ত্রবলে পাহাড়কে ক্রমাগত উঁচু করতে থাকব।"

সকলেই অসাধ্যসাধনের দিকে চাইলেন। সন্দেহ রইল না যে অসাধ্যসাধন চটেছেন।

অসাধ্যসাধন বলতে লাগলেন, "আপনারা প্রেম নিয়ে খেলা করবেন আর তার জন্যে আমাদের এতকালের বাসস্থান ডুবে যাবে তা আমি হ'তে দেব না—"

রুদলবাবু আবার হেসে উঠলেন। হাততালি দিয়ে দিয়ে হাসতেই লাগলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "নিশ্চয়ই না। আপনারা তপস্বী, আপনাদের বাসস্থান থেকে উৎখাত করব এরকম কল্পনাকেও আমরা প্রশ্রয় দেব না। আপনাদের মনে মনে আমি ডাকছিলুম এই জন্য যে বধুসরাকে সাগর-সঙ্গম সাগরের খবর দিয়ে উতলা ক'রে তুলেছেন, সে এতকাল উৎপলেশ্বরীকে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। এখন আপনারাই ওকে কোনও উপায়ে নিরস্ত করুন।..."

ইন্দ্র বললেন, "আপনারা যদি সে ভার নেন তাহ'লে আমিও নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। কিন্তু আপনারা যদি কিছু না করেন তাহলে আমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কারণ বধুসরা দেবকন্যা, এক মুনির অভিশাপে নদীরূপে মানসপুরে আসতে হয়েছে ওকে। সে হিসাবে আমি ওর রক্ষক। তবে এই তপস্বীরা যদি এই সমস্যা সমাধান ক'রে দেন, আমি স'রে দাঁড়াচ্ছি। আমাকে যা করতে আদেশ করবেন তাই করব আমি।"

অসাধ্যসাধন বললেন, "আপনারা মেঘদের অবিলম্বে স'রে যেতে বলুন এখান থেকে। তারপর আমরা ভেবে দেখছি কি করতে পারি।"

"তথাস্তু।"

ইন্দ্র অন্তর্ধান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেলটা বেজে উঠল। মানসপুর মিলিয়ে গেল।

প্রবেশ করল টোটো।

"এই যে, তুমি কখন ফিরলে—"

"ঘণ্টা দুই আগে। এসেই 'লান্চ' খেয়ে একটু ঘুমিয়েছিলুম। বাপ্স্ কি দুরূহ 'জার্নি'! ধাপধাড়া গোবিন্দপুর একেবারে!"

'টমসনের খবর ভালো?"

"খুব। আতুবাবুর সঙ্গে তাঁদের তো খুব ভাব দেখলুম। বাংলোর চারধারে বাগান করতে লেগে গেছেন সবাই মিলে। মিসেস টমসন আতুবাবুর মেয়েদের পড়াতে শুরু করেছেন, একটা বালিকা বিদ্যালয় খোলবারও ইচ্ছে হয়েছে তাঁর। গ্রামের মেয়েদের নিয়ে শুরুও ক'রে দিয়েছেন বাংলার বারান্দায়। তাঁর ইচ্ছে পুরোনো কাছারিবাড়িটা মেরামত ক'রে সেখানেই স্কুলটা করবেন। কিন্তু আমার মনে হয় ওই অজ পাড়াগাঁয়ে

বেশী টাকা ইনভেস্ট্‌ ক'রে স্কুল করার কোনও মানে হয়? স্কুল যদি করতেই হয় কলকাতার আশেপাশে করাই ভালো। ওখানে আপনার পুরুষোত্তম একটা স্কুল করেছে, তাতে তো ছাত্রই জোটে না! আমার মনে হয়—"

বিশ্বদীপ হঠাৎ থামিয়ে দিলেন তাকে—"তুমি এখন বাড়ি যাও। আমাকে বেরুতে হবে একটু—"

উঠে দাঁড়ালেন বিশ্বদীপ। এভাবে বাধা পেয়ে ঈষৎ ব্যায়ত আননে দাঁড়িয়ে রইল টোটো। লাউপুর সম্বন্ধে অনেক রকম 'স্কীম' ক'রে এসেছিল সে। স্কুল না ক'রে সেখানে একটা ট্যানারি করলে যে একটা কাজের মতো কাজ হবে, সেইটেই সে বিশ্বদীপকে বোঝাবে ব'লে এসেছিল কিন্তু বিশ্বদীপ হঠাৎ থামিয়ে দিলেন তাকে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে অপ্রসন্নমুখে বেরিয়ে গেল সে।

বিশ্বদীপ নেমে গিয়ে দেখলেন রণছোড়দেও যথারীতি ঘুমুচ্ছে। তাঁর সাড়া পেয়ে সে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করল।

বিশ্বদীপ বললেন, "তুমিই আজ গাড়ি চালাও রণছোড়। আমি পিছনের সীটে বসছি। ট্যাঙ্কে তেল ভ'রে নাও।"

রণছোড় যেন হাতে স্বর্গ পেল।

...হু হু ক'রে গাড়ি চলেছে। বিশ্বদীপের মনে হ'ল এমনি গাড়ি চড়েই যদি স্থান আর কালের সীমা পার হ'য়ে যেতে পারতাম! তাঁর মনে হ'তে লাগল স্থান আর কালের সীমা তিনি যদি পার হ'য়ে যেতে পারতেন তাহলে হয়তো স্মৃতির সীমাও পার হ'য়ে যেতেন। স্থান আর কাল নিয়েই তো স্মৃতি। এই স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি পেলে হয়তো তিনি ভাবতে পারতেন, হয়তো ভাবতে সাহস করতেন যে, তিনিও স্বাভাবিক সহজ সামাজিক লোক। কিন্তু তিনি স্মৃতির যে জগতে বাস করেন সেখানে একটিও স্বাভাবিক লোক নেই। পাঠকজির মতো বন্ধুবৎসল লোক কি স্বাভাবিক? টমসন-দম্পতি কি স্বাভাবিক? ডাক্তার ঘোষাল? আর্টিস্ট নবনী দাস? কবি শ্যামল সোম, রুটি-ওলা অনন্ত, বই-ওলা অনঙ্গ এরা কেউ তো স্বাভাবিক নয়। বিজনবালা, মহুয়া, ধাকড়, রামু, আফজাল—এমন কি ওই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কারফরমা? সবাই অস্বাভাবিক। যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে কেউ সাধারণ লোক নয়, সবাই অসাধারণ। সেইজন্যে মাঝে মাঝে তাঁর সন্দেহ হয় হয়তো তিনিও অস্বাভাবিক, তিনিও অসাধারণ। কিন্তু তিনি অসাধারণ হ'তে চান না। সাধারণ লোকের তুচ্ছ সুখদুঃখে আন্দোলিত হ'য়ে, সাধারণ লোকের মতো আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হ'য়ে, তাদের ভালবাসা ঘৃণার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতে চান। সাধারণ লোকের মতোই তিনি অন্যায় করতে চান, অসাধু হ'তেও তাঁর আপত্তি নেই। সাধারণ লোক হ'লে তিনি বিদুলাকে এতদিন পেতে পারতেন. কিন্তু তাঁর অতি-শুচি. অতি-ভদ্র অসাধারণ বিবেক তাঁকে বাধা দিচ্ছে, তাঁকে অগ্রসর হ'তে দিচ্ছে না, তিনি একদল

অস্বাভাবিক অসাধারণ লোকদের ভিড়ে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য গলা ছেড়ে কাঁদতে পর্যন্ত পারছেন না, কেবল আত্মগোপন করছেন, মুখোশের পর মুখোশ পরছেন। সিংহ তাঁকে ব'লে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত কিছুই লুকোনো যাবে না, তবু তিনি লুকোতে চেষ্টা করছেন। বিদুলাই বা তাঁর কাছে আসছে না কেন ? কেন সে ইতস্তত করছে ? পুরুষরাই এগিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম প্রণয় নিবেদন করবে এই হাস্যকর নিয়মের শৃঙ্খলে সে নিজেকে বেঁধে রেখেছে কেন ? প্রেম তো সব শৃঙ্খলই ছিন্ন করে। বিদুলা এ শৃঙ্খল ছিঁড়তে পারছে না কেন ? কেন ? কেন ? কেন ? তাঁর চেতনায় হাতুড়ির মতো এই প্রশ্নটাই বার বার আঘাত করতে লাগল। চোখ বুজে তিনি ব'সে রইলেন পিছনের সীটে হেলান দিয়ে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে বসলেন। চোখ খুলে দেখলেন অন্ধকার চারিদিকে।

"রণছোড়, আমরা কতটা রাস্তা এসেছি ?"

"দো শ' মাইল —"

"গাড়ি ঘোরাও, চল বাড়ি ফিরি এবার।"

গাড়ি যখন বিদুলার বাড়ির সামনে থামল তখন রাত দুটো। বিশ্বদীপ টর্চ জেলে তাঁর হাতঘড়িটা আর একবার দেখলেন ভালো ক'রে। হ্যাঁ, দুটোই। টর্চ নিবিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। নীচে বাইরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। নিবিড় অন্ধকারের পটভূমিকায় জানালাটা মনে হচ্ছে যেন একটা আলোর ছবি, রূপকথালোকের বাতায়ন যেন। অনেকক্ষণ মুগ্ধ লোলুপ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন সেদিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন জানলার উপর কালো মতো কি যেন রয়েছে একটা। আর একটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন রংবাহারী ব'সে আছে। তাঁকে দেখেই রংবাহারী পাখা কাঁপাতে লাগল। বিশ্বদীপের মনে হ'ল একটা আনন্দের ফুলঝুরি যেন জ্বলে উঠল। সেই কাঁপনের ভাষাও বুঝতে পারলেন তিনি।

"ও আপনি ! এতদিন পরে এলেন ! আমি আপনার বিদুলার কাছে রোজ আসি। রোজ এসে এই জানলার কাচে ব'সে থাকি। কি সুন্দর যে আপনার বিদুলা ! একটু আগে লিখছিল। এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আলোটা নেবায় নি। টেবিলের উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়েছে। না এখান থেকে দেখা যাবে না। ওই বারান্দা দিয়ে যান। কপাট খোলাই আছে। আর কেউ নেই কাছেপিঠে। চাকররা সব শুয়ে পড়েছে। আমার মতো বিদুলাও নিশুতি রাতে একা থাকতে ভালবাসে। কাউকে কাছেপিঠে থাকতে দেয় না। আমি কিন্তু চুপটি করে এই জানলাটিতে এসে বসি। আপনি যান না ওদিক দিয়ে—"

বিশ্বদীপ এগিয়ে গেলেন বারান্দার দিকে। বারান্দায় উঠেই ডান দিকে দেখতে

পেলেন বিদুলার ঘরটা। ঘরের কপাটটা আধখোলা। সন্তর্পণে গিয়ে উঁকি দিলেন। বিদুলা টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কাঁদছে। আলুলায়িত কুন্তল স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে—যেন একরাশ ঘন অন্ধকার। আস্তে আস্তে ঢুকলেন তিনি ঘরের মধ্যে। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলেন অঘোরে ঘুমুচ্ছে বিদুলা। মুখের সবটা দেখা যাচ্ছে না, গালের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। পুরাতন উপমাটা মনে পড়ল বিশ্বদীপের, মেঘের ভিতর থেকে চাঁদ উঠছে। কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর চোখে পড়ল পাতলা ছাপা শাড়ির আঁচলটা বুকের কাছে কাঁপছে ফ্যানের হাওয়ায়। তারপর দেখতে পেলেন সুদৃশ্য খাতাটা। আর একটু এগিয়ে গেলেন। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। খাতার উপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—"বিশ্বদীপ সুন্দর। সুন্দর সুন্দর সুন্দর সুন্দর। আকাশের মতো সুন্দর, আলোকের মতো সুন্দর, কুসুমের মতো সুন্দর। সে সুন্দর বলেই তাকে ভালবাসি, তাই তার রূপের সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি। সে ভালো কি মন্দ, ধনী কি নির্ধন এসব ভাববারও আমি সময় পাইনি। সে সুন্দর, সে কমনীয়, সে অলোকসামান্য, সে জ্যোতির্ময়, সে অনবদ্য, আমার অন্তরের সমস্ত অর্ঘ্য তার পায়ে উজাড় ক'রে অপেক্ষা করছি সে কখন আসবে।" বিশ্বদীপ আর একবার চেয়ে দেখলেন বিদুলার দিকে। মনে হ'ল আত্মসমর্পণ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গে, তার অন্ধকার নিবিড় কালো চুলে, তার কম্পমান নিচোলে। তিনি তাকে সব কথা খুলে বলবেন ব'লে এসেছিলেন, কিন্তু লেখাটা প'ড়ে মনে দ্বিধা জাগল। আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে আবার বেরিয়ে এলেন তিনি।

বাড়ি ফিরে দেখলেন গেটের কাছে মহুয়া ব'সে আছে। তাঁকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, তারপর ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। তিনি যে নিরাপদে ফিরেছেন এইটুকু জানবার জন্যেই সে যেন বসেছিল।

ছকু খাবার গরম ক'রে রেখেছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু খেলেন না। একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজতেই বধূসরা এসে দাঁড়াল তাঁর চোখের সম্মুখে। বধূসরার চোখেমুখে আনন্দ ঝলমল করছে। মনে হ'ল সে যেন মূর্তিমতী জয়জয়ন্তী সুর।

বলল, "সাগরকে আমি পেয়েছি। মণিমাণিক্যখচিত একটি চমৎকার গামলায় ক'রে অসাধ্যসাধন সাগরকে দিয়ে গেছেন আমার কাছে। আমার সারা দেহে মনে সাগরের কল্লোল এখন। উৎপলেশ্বরীও আকুল হ'য়ে উঠেছে। অত বড় সাগর ছোট হ'য়ে এসেছে আমার বুকে, আশ্চর্য নয়? এসেছে কিন্তু, দেখবেন?"

বধূসরা মিলিয়ে গেল। বিশ্বদীপ দেখলেন বধূসরা নদী দুলে দুলে কলস্বরে ব'য়ে চলেছে, তার উর্মিমালায় সাগরের মহিমা।

ষোলো

শ্যামল সোম সত্যিই একদিন কথাটা পাড়ল নয়নতারার কাছে। সব শুনে নয়নতারা বলল, "আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই। তোমরা যাতে সুখী হও তাই আমি করব। তোমাদের সুখী করাই আমার জীবনের ব্রত। তোমার বন্ধু যা বলবেন তাই হবে। তবে তোমার বউদি কিছু মনে করবেন না তো?"

"মনে হয় করবেন না। কারণ তোমাকে আমরা নিয়ে যাব অনন্তর দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া হিসাবে। তুমি সেখানে রান্না করবে, অনন্তর একটু-আধটু সেবা করবে, তারপর রাত্রে আবার এখানে ফিরে আসবে। এ বাড়িটা তোমার যেমন আছে তেমনি থাকবে। অনন্ত তার বউকে একদম দেখে না, সমস্ত দিন দোকানে থাকে, সন্ধের পর তোমার কাছে যায়। তুমি যদি ওখানে গিয়ে থাকো, তাহলে অনন্ত যাবে ওখানে; বউটার কাছে থাকবে খানিকক্ষণ। এরকম করতে করতে হয়তো মায়াও ব'সে যাবে একটা। বউদিকে দেখে ভারী কষ্ট হয় আমার। সংসারের কাজে একটুও মন নেই, সেবা করতে জানে না, কেবল নিজেকে নিয়েই আছে। তুমি হয়তো ওকে শুধরে দিতে পারবে। অনন্তর যদি মা বা দিদি থাকত তাহলে হয়তো এসব হ'ত না। তোমার যেতে তাহলে আপত্তি নেই?"

নয়নতারা বলল, "বলছ যখন যাব। কিন্তু তোমার এ নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন বল তো?"

শ্যামল সোম মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইল।

তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করল, "একটা কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাকে তুমি ভালবাস ব'লে হয়তো এককথায় রাজী হ'য়ে গেলে। এতে তোমার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে না তো?'

নয়নতারা মুচকি হেসে হাত উলটে বলল, "ঘটি বাটি বাক্স তোরঙ্গর আবার আত্মসম্মান থাকে নাকি! জানতুম না তো।"

শ্যামল সোমের মনে হ'ল সে হঠাৎ যেন নয়নতারার অন্তরলোকের একটা গোপন কক্ষে গিয়ে হাজির হয়েছে। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলল, "তুমি নিজেকে এত ছোট মনে কর?"

"ছোট মনে করব কেন? ঘটি বাটি বাক্স তোরঙ্গ কি ছোট জিনিস? ও নইলে পৃথিবীর কারো কি চলে? আর যারা নিজেদের মানুষ ব'লে পরিচয় দেয় তারাই বা কি এমন বড়। অনেক মানুষ তো দেখলুম। তুমি আত্মসম্মানের কথা বলছিলে, কারই বা আত্মসম্মান আছে বল!"

শ্যামল চুপ ক'রে রইল। এ উত্তর শুনবে সে প্রত্যাশা করেনি।

নয়নতারা আবার তাকে জিগ্যেস করল, "তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন বল তো—"

"আমার নিজের যে কেউ নেই দিদি। কিছু নিয়ে তো একটা থাকতে হবে। আগে চাকরির চেষ্টায় ঘুরতুম, অনেক সময় কেটে যেত। এখন চাকরি পেয়ে গেছি, তাই হাতে সময় প্রচুর। চাকরি তো দশটা পাঁচটা, বাকি সময়টা কি করি।"

"শুনেছি তুমি কবিতা লেখ।"

"লিখি। কিন্তু কবিতা রোজ লেখা যায় না। ওরা প্রজাপতির মতো মনের বাগানে মাঝে মাঝে আসে। যখন আসে তখন ধরবার চেষ্টা করি। ওই চেষ্টাটাই কবিতা। কিন্তু ওরা রোজ তো আসে না।"

এর পর নয়নতারা যা বলল তা আরও বিস্ময়কর মনে হ'ল শ্যামল সোমের। মনে হ'ল এতদিন সে নয়নতারার কিছুই বোঝেনি।

"তুমি ভগবান মানো?"

"না।"

"ভগবানই তো কবিতা। কবিতা মানো অথচ ভগবান মানো না, এ তো ভারি আশ্চর্য। তুমি মানো, কিন্তু জানো না যে মানো। ভগবানই কবিতার প্রজাপতি হ'য়ে আসেন তোমার মনে। নানা রূপে তিনি আসেন। তাঁকেই ধরবার চেষ্টা কর, দেখবে তোমার সময় ভালোভাবে কেটে যাবে।"

"তুমি ভগবান মানো?"

"হ্যাঁ। আমার গোপাল আছে।"

"যে গোপাল তোমার জীবনকে দুঃখময় করেছেন সে গোপালকে ভালবাস তুমি?"

"আমিই আমার জীবনকে দুঃখময় করেছি, গোপাল তো করেনি। তাছাড়া আগে যেটা দুঃখ ব'লে মনে হ'ত এখন তা আর দুঃখ ব'লে মনে করি না। খড়কুটো ভেসে চলেছে, খড়কুটোর আবার সুখ দুঃখ কি।"

"দিদি তুমি গ্রেট। চললাম। এবার বউদির সঙ্গে কথা ব'লে দেখি—"

বিজনবালা একগাদা বিজ্ঞাপন নিয়ে বসেছিল। সাইকেলের বিজ্ঞাপন, ঘড়ির বিজ্ঞাপন, শাড়ির বিজ্ঞাপন, ওষুধের বিজ্ঞাপন, গহনার বিজ্ঞাপন—আরও নানারকম বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের জন্ত সে আলাদা ফাইল ক'রে সেগুলো গুছিয়ে রাখছিল, এমন সময় শ্যামল সোম হাজির হ'ল গিয়ে।

"এসব কি হচ্ছে—"

"কতগুলো বিজ্ঞাপন পেয়েছি দেখুন। এই শাড়ির বিজ্ঞাপনের ছবিটা কি সুন্দর—! সব আলাদা আলাদা ক'রে রাখছি। বিশ্বদীপবাবুকে ফোন করেছি, তিনি আসবেন

বলেছেন আজ। জানেন, উনিও আমার জন্ম নানারকম বিজ্ঞাপন যোগাড় করেছেন। কি মজা!"

"আর একটা মজার খবর আছে—"

"কি।"

"অনন্তর এক দূরসম্পর্কের দিদি এসেছেন। অনন্ত তাঁকে মাসিক কিছু টাকা সাহায্য করতে চায়। ভদ্রমহিলা এখানে ছোট একটা বাসা ভাড়া ক'রে আছেন। খুব কষ্টে আছেন কিন্তু মুখ ফুটে টাকা চাইতে পারছেন না। অনন্ত যখন বলল, আমি তোমাকে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করব, তখন তিনি বললেন, আমি ভিক্ষে নেব না। তবে তোমার যদি গেরস্থালির কোন কাজ থাকে তা ক'রে দিয়ে তার বদলে কিছু নিতে পারি। তাই অনন্ত তাঁকে এখানকার রাঁধুনীর কাজে বাহাল করেছে। দু'বেলা এখানে রেঁধে-বেড়ে সকলকে খাইয়ে বাড়ি চ'লে যাবেন।..."

বিজনবালা এ সংবাদে পুলকিতই হ'ল। তার জন্ম তার স্বামী একটা রাঁধুনী রাখছে এটা তো বন্ধুবান্ধব মহলে ব'লে বেড়াবার মতো কথা। তার বন্ধুবান্ধব মহল অবশ্য খুব বড় নয়, তবু পাড়ার দারোগাবাবুর বউ, লাইফ ইনসিওরেন্সের দালাল চণ্ডীবাবুর বউ, পাঁচু কেরানীর বউ এবং আরও দু'চারজনের সঙ্গে তার একটু-আধটু মেলামেশা আছে বইকি। তাদের কাছে সে নিজের বাপের বাড়ির গল্পটা খুব ফলাও ক'রে বলে, যদিও তার বাবা বা বাপের বাড়ির লোকেরা তার তেমন কোন খবর নেন না। কোনক্রমে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে বিজনবালার বাবা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। বিজনবালার মা থাকলে হয়তো খবর নিতেন কিন্তু তিনি বহুকাল আগে মারা গেছেন। তবু বিজন তার বাবা আর বাপের বাড়ির গল্পই করে ফেনিয়ে ফেনিয়ে। তাদের বাড়িতে যে একটা পুরোনো আমলের বড় দেওয়ালঘড়ি আছে, যেটা পনের মিনিট অন্তর অন্তর বাজে, তাদের যে স্প্যানিয়েল কুকুর আছে, তাদের বাড়ির মেঝে যে মার্বেল দিয়ে বাঁধানো—এই সব গল্পই করে সে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। এইবার সে বলতে পারবে তার জন্মে তার স্বামী একটা আলাদা রাঁধুনী রেখে দিয়েছে। চেনাশোনা কারও বাড়িতে রাঁধুনী নেই, সব ঠিকে ঝি, সবাই নিজে রান্না করে। চণ্ডীবাবু সেদিন একটা কম্‌বাইণ্ড হ্যাণ্ড বাহাল করেছেন। বিজনবালার রাঁধতে মোটেই ভালো লাগে না। সে রাঁধতে জানেও না তেমন। কেউ তো শেখায় নি, জানবে কি ক'রে।

বিজনবালা বলল, "হঠাৎ আপনার বন্ধুর এ সুমতি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় আর গরমে সত্যিই বড় কষ্ট হ'ত আমার। ওই দাইটাকেই কিছু পয়সা দিতুম, সেই যা হোক ক'রে দিয়ে যেত। ভদ্রমহিলা রাঁধতে পারেন তো?"

"শুনেছি চমৎকার রাঁধেন"—একটু ইতস্তত ক'রে শ্যামল বলল, "অনন্তও বললে কাল থেকে সকাল সকাল সে বাড়ি ফিরবে।"

"ও তাই নাকি।"

এ খবরটায় খুব সন্তুষ্ট হ'ল না বিজনবালা। স্বামী অনেক রাত্রে ফেরে এই সুযোগ নিয়ে সে সিনেমা-টিনেমা যায়, একটা মহিলা-সমিতিতে গিয়েও পাণ্ডাগিরি করে, অনন্ত সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে সে-সব আবার বন্ধ হ'য়ে যাবে না তো।

"আজ উঠি বউদি। আমাকে অনঙ্গের কাছে যেতে হবে।"

"একটু চা ক'রে দি ?"

"না। তার চেয়ে চলুন পাড়ায় নতুন যে রেস্তোর'াটা খুলেছে সেখানে ব'সে কফি আর চিংড়ি কাটলেট খাওয়া যাক। আমিই খাওয়াব আজ আপনাকে। আপনি তো প্রায়ই আমাকে খাওয়ান।"

চিংড়ি কাটলেটের উপর বিজনবালার খুব লোভ। তার চোখ দুটো প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। কিন্তু শ্যামলের শেষের কথা ক'টি শুনে বেচারীর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল একটা।

"আমি আপনাকে কোনদিনই তো কিছু খাওয়াতে পারিনি। কালেভদ্রে দু'এক কাপ বাজে চা খাইয়েছি হয়তো।"

"তাই বা কে খাওয়ায় এ বাজারে। চলুন, আর দেরি করবেন না।"

রেস্তোর'ায় গিয়ে শ্যামল সোম ছ'খানা কাটলেটের অর্ডার দিল। অবাক্ হ'য়ে গেল বিজনবালা।

"অত কাটলেট কে খাবে।"

"আপনি চারখানা, আমি দুখানা।"

"আমি চারখানা খেতে পারব না।"

"তাহলে খানদুই নিয়ে যান অনন্তর জন্যে। খাবার সময় গরম ক'রে দেবেন। বলবেন আমি কিনে দিয়ে গেছি। খুব খুশী হবে।"

দূরের একটা ঘড়িতে টং টং ক'রে এগারোটা বাজল। অনন্ত এখনও আসেনি। অবশ্য অনন্তর ফিরতে এর চেয়েও বেশি রাত হয় প্রায়। বিশ্বদীপ আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু কই তিনিও তো এলেন না। বিজনবালা জানালার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের খোলার ঘরের চালে রাস্তার আলো পড়েছিল। সেই চালের উপর দিয়ে একটা সাদা বিড়াল আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছিল পাশের বাড়ির ছাদে যাবে ব'লে। রোজই যায়। বিজনবালা প্রায়ই দেখতে পায় ওকে। কিন্তু কোনদিন যে কথাটা মনে হয়নি সেদিন তা হ'ল। বিড়ালদের যদিও ঘড়ি নেই কিন্তু ওরা ঠিক সময় ঠিক কাজটি করে। রোজ রাত এগারোটার পর ওপাশের বাড়ির ছাদে যায়। মানুষের ঘড়ি আছে কিন্তু মানুষ ঘড়ি ধ'রে কাজ করে কি সব সময়ে ?

...বিশ্বদীপের গাড়িটা এসে দাঁড়াল। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল বিজনবালার।

অত বড় লোক এসেছেন তার এই বাড়িতে, কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবে তাঁকে ? তাড়াতাড়ি জানলা থেকে স'রে গিয়ে সে বিছানার চাদরটা আর একবার ঝেড়ে ফেললে তাড়াতাড়ি, তারপর চেয়ারের কুশনটা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুলটাও ঠিক ক'রে নিলে তাড়াতাড়ি। হঠাৎ অনন্তর গলা শুনতে পেল সে। অনন্তই আগে এসে ঘরে ঢুকল। সে-ই অভ্যর্থনা করল।

"আসুন, আসুন, গরীবের কুঁড়েঘরে আপনি যে আসবেন এ তো আমার কল্পনাতীত ছিল। আসুন।"

একটা ফাইল বগলে ক'রে বিশ্বদীপ ঢুকলেন। বিজনবালাকে নমস্কার ক'রে বললেন, "এই নিন। কয়েকরকম বিজ্ঞাপন আছে এর মধ্যে। আরও যোগাড় ক'রে দেব। এগুলোকে 'ক্লাসিফাই' ক'রে সাজান আগে। তারপর ওর থেকে কোন প্রবন্ধ খাড়া করা যাবে পরে। আগে 'ডেটা'গুলো সংগ্রহ হোক।"

অনন্ত একটু অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। কয়েকদিন থেকে সে দেখছিল যে বিজনবালাও নানারকম বিজ্ঞাপন কেটে কেটে ফাইলে রাখছে। এ ভদ্রলোকও একগাদা বিজ্ঞাপন বগলে ক'রে এনেছেন। ব্যাপার কি!

সে সরল মানুষ, সরল ভাবেই বলল, "বিজনও কয়েকদিন থেকে বিজ্ঞাপন নিয়ে মেতেছে। আপনিও একগাদা বিজ্ঞাপন এনেছেন দেখছি। ব্যাপার কি।"

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "গুরুগম্ভীর কিছু নয়। ছেলেখেলা। সময় কাটাবার জন্যে অনেকে ব্যবসা করে, তাস খেলে, রেস নিয়ে মাতে, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে—আমি আপনার স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে। ওতে বেশ সময় কাটবে।"

"ওকে রান্নাবান্নার কাজে যদি মন দিতে বলতেন তাহলে আমার একটু সুবিধে হ'ত।"

"ও তাই বুঝি! আমিও ও-বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। ছকুই আমার ভরসা। মিসেস রায়ের ওদিকে ঝোঁক নেই বুঝি।"

বিজনবালা মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

বিশ্বদীপ অনন্তর দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আমারও অভিজ্ঞতা আপনার মতো। আমার সুবিধার জন্য কেউ কিছু করুক যখনই এ প্রত্যাশা করেছি তখনই ঠকেছি। তাই আর সে প্রত্যাশা করি না। জানেন, পৃথিবীতে আমার সত্যিকার আপন লোক কেউ নেই। যারা আমার আশেপাশে ঘোরে তারা একটা-না-একটা স্বার্থের জন্যই ঘোরে। আমি একা। তাই নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করবার আমার এত আগ্রহ। যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, যদি সত্যিকার বন্ধু পেয়ে যাই একজন। আচ্ছা, চললুম। বিজ্ঞাপন আরও কিছু যোগাড় হ'লে পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, নমস্কার।"

'আমার বিজ্ঞাপনগুলো দেখবেন না ?"

"আজ থাক। আর একদিন দেখব।"

নমস্কার ক'রে একটু দ্রুতবেগেই নেমে গেলেন বিশ্বদীপ। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ ক'রে তিনি অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন একটু। তিনি এসেছিলেন ডাক্তার কারফরমার কাছে ওষুধ নিতে। সেই সময়েই অনন্তকে এসে বলেছিলেন, "চলুন, আপনার বাড়ি যাব। আপনার স্ত্রীকে কিছু দিতে হবে।"

"কি।"

"বিশেষ কিছু নয়। যখন দেব তখন দেখবেন"—তারপর একটু হেসে বলেছিলেন, "সেদিন মীটিংয়ে আলাপ হয়েছিল আপনার স্ত্রীর সঙ্গে। বলেছিলাম আসব একদিন, তাই এমনি আর কি, এদিকে এলাম, ভাবলাম একবার—"

কথাটা অসমাপ্ত রেখে থেমে যেতে হয়েছিল বিশ্বদীপকে।

"চলুন, চলুন, এ তো আমার সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য—"

অনন্ত রায় রুটি-ওলা হলেও কি ক'রে ভদ্রতা করতে হয় তা সে জানে। তার ভদ্রতাটা মুখোশও নয়, আন্তরিক। সে কিন্তু এদের মতিগতি বুঝতে পারে না। তার বাল্যবন্ধু শ্যামলও তার কাছে রহস্য। অনঙ্গটাও কেমন যেন। টাকা রোজগার করছে, সুস্থ সবল শরীর, কিন্তু বিয়ে করবে না। কদমছাঁট চুল ছেঁটে দিনরাত বই পড়ছে আর বক্তৃতা করছে।

বিশ্বদীপ অনন্তর বাড়ি থেকে সোজা মাঠে গেলেন। সেখানে মাঠের চারদিকেই ঘুরে বেড়ালেন অনেকক্ষণ। বিদুলার অজ্ঞাতসারে তার মনের যে খবরটা তিনি জেনে ফেলেছিলেন সেই খবরটা শূলের মতো বিঁধেছিল তাঁর চেতনায়, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটা পরম সুখ তীব্র মদিরার মতো সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল তাঁর শিরায়-উপশিরায়। তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না কি করবেন। সিংহের কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল —শেষ পর্যন্ত কিছুই লুকোনো যাবে না। যাবে না? ডাক্তার কারফরমার ওষুধে পায়ের বোদা-ভাবটা কিন্তু কমেছে একটু। কিন্তু তবু তাঁর অন্তর্যামী সিংহের কথাতেই সায় দিচ্ছে—যাবে না, যাবে না, শেষ পর্যন্ত লুকোনো যাবে না। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকবার জন্যেই তিনি বিজনবালার কাছে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তো বেশীক্ষণ থাকা গেল না। বেশীক্ষণ কোথাও থাকা যায় না, মনে হয় এখুনি বুঝি অসাবধানে আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলব। হঠাৎ নজরে পড়ল—গাড়িতে পেট্রোল ক'মে গেছে। তাড়াতাড়ি একটা পেট্রোল পাম্পের দিকে এগিয়ে গেলেন। যে ছেলেটি পেট্রোল দিতে এল তার বয়স কম, চোখে-মুখে যৌবনের প্রসন্ন দীপ্তি।

রণছোড় সঙ্গে ছিল না, বিশ্বদীপ নিজে গিয়েই পেট্রোল ট্যাঙ্কের ক্যাপটা খুলে দিলেন। পেট্রোল নেওয়া হ'য়ে গেলে গল্প জুড়ে দিলেন তার সঙ্গে। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সব খবর সংগ্রহ করলেন। বাপ মা ছেলেবেলায় মারা গেছে। বাড়ি ভাগলপুর

জেলার পুরৈনি গ্রামে। দেশে তিন বিঘে জমি আছে, সে জমির দেখাশোনা তার কাকা করে। বিয়ে হয়েছে, গওনা হয়েছে, বউ তার চাচীর কাছেই আছে এখন। সে কিন্তু বউয়ের কাছে যেতে পারে না। ছুটি পেতে পারে, কিন্তু যাওয়া আসার ভাড়াই প্রায় কুড়ি টাকা। তাছাড়া গেলে শুধু হাতে যাওয়া যায় না, তার চাচীর জন্যে আর বউয়ের জন্যে অন্তত একখানা করেও শাড়ি নিয়ে যেতে হবে। তার মানে আরও পঁচিশ টাকা চাই। অত টাকা সে জমাতে পারেনি এখনও। কলকাতা শহরে এত খরচ – কবে যে জমাতে পারবে তারও ঠিক নেই। বিশ্বদীপ নাটকীয় কাণ্ড ক'রে বসলেন একটা। পেট্রোলের দাম চুকিয়ে দেবার পর আরও পাঁচখানা দশটাকার নোট বার ক'রে বললেন, "এই নাও, তোমার বউয়ের সঙ্গে মোলাকাত ক'রে এস—"

অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল ছেলেটি। সে প্রথমে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা।

"আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন হুজুর।"

"বাড়তি টাকা এখন আমার হাতে আছে, তাই দিলাম। তোমার যদি এতে আনন্দ হয়, আমারও আনন্দ হবে। আমি তোমার পর নই, আমিও তোমার আপন লোক।"

টাকাটা একরকম জোর ক'রেই তার হাতে গুঁজে দিলেন। ছেলেটির চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠল। সে সেলাম ক'রে স'রে দাঁড়াল।

গাড়ি যখন স্টার্ট নিয়ে একটু দূর এগিয়েছে তখন সে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল— "হুজুর আপনার নাম কি, পাতা কি—"

বিশ্বদীপ তাঁর নিজের একখানা কার্ড বার ক'রে দিলেন তাকে।

বিশ্বদীপ অনঙ্গ সেনের বইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে ফিরছিলেন। দেখলেন দোকান তখনও খোলা। গাড়িটা থামিয়ে নামলেন তিনি। শুনতে পেলেন অনঙ্গ সেন বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলছে—"না, না, মানুষ এখনও পেছিয়ে আছে অনেক। মানুষ যুগে যুগে মুখোশ আর পোশাক বদলাচ্ছে খালি, ভিতরে সে যেমন পশু ছিল এখনও তেমনি পশু আছে। যে সাম্য আমাদের লক্ষ্য সেখানে আমরা এখনও পৌঁছইনি। সাম্যবাদীর পোশাক প'রে সাবেক ক্ষমতালোলুপ পুঁজিবাদীরাই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ দখল ক'রে রেখেছে এখনও। যে উদারতা, যে নিঃস্বার্থপরতা, যে নিষ্ঠা, যে স্বাবলম্বন প্রকৃত সাম্যবাদের পটভূমিকা হওয়া উচিত, তা আমাদের কারো নেই। আমরা সবাই মতলববাজ পশু। নেতারা দাবা-খেলোয়াড়, কখনও হারছেন কখনও জিতছেন। কে? ও আপনি, আসুন, আসুন।"

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, "এই দিক দিয়ে ফিরছিলুম। আপনার বক্তৃতা শুনে নেমে পড়লাম। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছেন নাকি—"

শ্যামল সোম হেসে বলল, "আর কিছু করবার নেই ব'লে ওই নিয়ে একটু বাগাড়ম্বর করা যাচ্ছে। অনঙ্গ বলে ভালো। বসুন।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আপনি যা বললেন তার খানিকটা আমি শুনেছি। আপনার মতে তাহলে ধর্মই কি আমাদের পরিত্রাণের উপায়—"

অনন্ত হেসে বলল, "আমার কোনও মত নেই। কিসে কি হবে তা জানি না। ইতিহাসের নজিরও আমার অসম্পূর্ণ ব'লে মনে হয়। যে যুগে তৈমুর লং বা নাদির শাহ এদেশে এসেছিলেন সে যুগে এদেশে অনেক ভালো লোকও ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ইতিহাসে তাদের উল্লেখ নেই, উল্লেখ আছে ওই পিচাশ দুটোর। পিচাশরাই ইতিহাসের প্রধান ব্যক্তি, ভদ্রলোকেরা নন। ধর্মের কথা বলছিলেন? একজন বড় ইংরেজ লেখক বলেছেন—When I consider the history of religion, I find no warrant for affirming that its services have out-weighed its disservices. Jesus Christ, the greatest and I think, the sanest of enthusiasts, lit the fires of the Inquisition and set up the Pope at Rome. Mahomet deluged the earth with blood and planted the Turk on the Bosphorus. Saint Frances created a horde of sturdy beggars. Luther declared the Thirty Years War,......"

অনন্ত গড়গড় ক'রে মুখস্থ ব'লে গেল।

"ইংরেজ লেখকটি কে?"

"Lowes Dickinson: আমাদের দেশেও অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন—বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? আমরা যেমন পশু ছিলাম তেমনি আছি। আর প্রত্যেক মহাপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে একদল ভণ্ড গুলতানি করছে· মহাত্মাজির অহিংসার মন্ত্র, প্রেমের বাণী তাঁকেও বাঁচাতে পারেনি, দেশকেও পারেনি। দেশ দু'টুকরোই হয়নি, টুকরো টুকরো হ'য়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার বিষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেছে, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছে। আমি অহিংসার মন্ত্র বা প্রেমের বাণীকে ছোট করছি না, আমি বলছি দেশের উপর ওসবের সত্যিকার কোন প্রভাব পড়েনি। স্বার্থপরতাই পশুর ধর্ম, আমরা সেই পশুত্বের উর্দ্ধে উঠতে পারিনি এখনও। আর তা যতক্ষণ না পারছি ততক্ষণ সাম্যের বাণী মুখের বুলি মাত্রই হ'য়ে থাকবে। তাই শ্যামলকে বলছিলাম, তুমি অধ্যাপক হয়েছ, তোমার দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। পশুকে মানুষে রূপান্তরিত করতে হবে। তবেই তো সে দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হ'য়ে আদর্শলোকে দেশকে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষালয়ে সেই কাজটাই হচ্ছে না। আমরা এখনও কতকগুলো অমানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী, লেখক আর কেরানী সৃষ্টি ক'রে চলেছি ··"

ঘড়িতে টং টং ক'রে বারোটা বাজল। শ্যামল উঠে পড়ল।

"এবার তোমার বক্তৃতা থামাও। অনেক রাত হ'য়ে গেল। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। তুমি তো আলোটি নিবিয়ে এইখানেই শুয়ে পড়বে।"

বিশ্বদীপও উঠে পড়লেন।
"চলুন, আপনাকে নাবিয়ে দিয়ে যাই—"
অনঙ্গ তখনও উত্তেজিত হ'য়ে ব'সে ছিল।
হঠাৎ বলল, "ও, হ্যাঁ, সত্যিই অনেক রাত হ'য়ে গেছে। আচ্ছা নমস্কার!"

বিশ্বদীপ সেদিনও ফিরে দেখলেন মহুয়া গেটের পাশে চুপ ক'রে ব'সে আছে। তাঁর গাড়ি গেটে ঢুকতেই সে উঠে চ'লে যাচ্ছিল। বিশ্বদীপ তাকে ডাকলেন।
"তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?"
"এমনি। ঘুম হয় না, তাই ব'সে থাকি।"
আর কিছু না ব'লে চ'লে গেল সে আস্তে আস্তে।
বিশ্বদীপ খাওয়া সেরে যখন শুলেন তখন তাঁর মুদিত চোখের সামনে বিদুলার সেই খাতার পাতাখানা ভেসে উঠল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—"বিশ্বদীপ সুন্দর। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর ··।"

সতেরো

টমসন সায়েবের একটা চিঠি ও চেক পেয়ে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন বিশ্বদীপ। টমসন লিখেছেন,—বাংলাতেই বড় বড় হরফে ছোট ছেলের মতো লিখেছেন—
প্রিয় বিশু,

লাউপুরে আসিয়া আমি আর লিসি পরম আনন্দে আছি। তুমি যে জিনিসগুলি পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া লিসি আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছে। তোমার পুরুষোত্তম ছেলেটি চমৎকার। উহার স্বভাব আদর্শ ক্রিশ্চান মিশনারিদের মতো। ওর পুরুষোত্তম নাম সার্থক। আদুবাবু লোকটিও খারাপ নন। খুব বুদ্ধিমান। তোমার জমিদারির সমস্ত কিছু তাঁহার নখদর্পণে। কিন্তু তোমাদের সমাজে কন্যাদায় একটা মস্ত বড় সমস্যা। সেই সমস্যার চাপে উনি সব সময়ে নীতিসম্মত পথে চলিতে পারেন না। পাঁচ হাজার টাকা পণ দিলে উঁহার বড় মেয়েটির বিবাহ এখনই হইয়া যায়। আমি ঠিক করিয়াছি টাকাটা আমিই দিব। এই সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক পাঠাইতেছি। তুমি আমার ব্যাঙ্ক হইতে টাকাটা তুলিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিও। আদুবাবুর সহায়তা আমার কাম্য। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম তোমার এখানকার বিষয়সম্পত্তি হইতে বৎসরে অনায়াসে ত্রিশ হাজার টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু সেজন্য আদুবাবুর পূর্ণ সহযোগিতা চাই। লিসি তাহার ছোট ছোট মেয়েগুলিকে পড়াইতেছে। মেয়েগুলি বুদ্ধিমতী। লিসির ইচ্ছা এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও খোলা হোক। তোমার বাংলোর দক্ষিণ দিকে লিসি একটি কিচেন গার্ডেন করিতেছে।

আমি বাম দিকে একটি ফুলের বাগান করিতে চাই। দেশী ফুল কিছু লাগাইয়াছি। তুমি কিছু সিজ্‌ন ফ্লাওয়ারের ভালো বিচি এবং দুই ডজন ভালো গোলাপগাছ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। লিসি বলিতেছে তোমার জন্য একটি কার্ডিগ্যান বুনিবে। তোমার যদি পুরাতন কার্ডিগ্যান থাকে সেটি পাঠাইয়া দিও। মাপ পাঠাইলেও চলিবে। আমরা এখানে খুব ভালো আছি। প্রত্যহ নদীতে স্নান করি। ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস খেলার আয়োজনও করিতেছি। তুমি আশা করি ভালো আছ। আমাদের ভালবাসা লও। পাঠকজিকে নমস্কার দিও। ইতি—

তোমারই টমসন।

বিশ্বদীপ তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখে দিলেন।

ভাই টমসন,

তোমার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। তোমার চেকটা ফেরত পাঠাইতেছি। আদুবাবুর কন্যার বিবাহের টাকা আমিই দিব। তাহাকে বলিয়া দিও তাহার সব কন্যার বিবাহের সমস্ত খরচ আমার স্টেট হইতেই দেওয়া হইবে। আদুবাবু আমাদের পুরাতন কর্মচারী। সে যাহাতে স্বচ্ছন্দ ও নিরুদ্বিগ্নভাবে থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আমারই করা উচিত। সে যদি পূর্বেই আমাকে সব কথা খুলিয়া বলিত আগেই এ ব্যবস্থা করিয়া দিতাম তুমিই লাউপুরের মালিক হইয়া থাক এবং লাউপুরের উন্নতির জন্য যাহা ভালো মনে কর বিনা দ্বিধায় তাহা কর। লিসি বালিকা বিদ্যালয় খুলিতেছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। ওখানে আমার অনেক জমি পড়িয়া আছে, যেখানে তোমাদের পছন্দ হয় সেখানেই একটা ছোটখাটো বাড়ি করিয়া লও বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য। পুরুষোত্তমকে যে তিনটি কুষ্ঠরোগীর সেবার ভার দিয়া আসিয়াছি, তাহাদের ঔষধ পথ্যের সব ব্যবস্থা করিয়া দিও। আজ ছয় হাজার টাকা তোমার নামে ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইব। লিসিকেও আমার একটা পুরাতন কার্ডিগ্যান ও একজোড়া পুরাতন মোজা পাঠাইতেছি—আমার একজোড়া মোজাও দরকার। আরও কিছু উলও পাঠাইতেছি। তোমরা আনন্দে আছ এ সংবাদে সত্যই অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। ইচ্ছা করিতেছে তোমাদের কাছে গিয়াই থাকি। কিন্তু তাহা হইবার নয়, আমার ভাগ্য যে আমাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় লইয়া যাইবে তাহা জানি না। একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ভুলিয়া থাকিবার জন্য আমি নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছি, তাহাদের সুখদুঃখের সহিত নিজেকে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তবু আমার অশান্তি দূর হইতেছে না। নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া একটা জিনিস বুঝিলাম, কাহারও মনে শান্তি নাই। সকলেই অন্ধ। আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে এমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সাক্ষাৎ এখনও পাই নাই।

তুমি ও লিসি আমার ভালবাসা জানিবে। আদুবাবুকে নমস্কার ও পুরুষোত্তমকে আশীর্বাদ দিও। পুরুষোত্তম ছেলেটি সত্যই ভালো। ইতি— তোমারই বিশ্বদীপ

চিঠিটা লিখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ। এর পর আর কি করবার আছে ? যার কথা সর্বদাই মনে গাঁথা রয়েছে তার কথাই মনে পড়ল। বিতুলা। বিতুলার সঙ্গে কয়েকদিন দেখা হয়নি, বিতুলাকে তিনি এড়িয়ে চলছেন, ভয় করছে তার কাছে যেতে। তুপুরে তিনি যখন বাড়ি ছিলেন না তখন বিতুলা নাকি ফোন করেছিল, ছকু বললে। ভদ্রতার খাতিরেও ফোন ক'রে তার খবরটা নেওয়া উচিত। কিন্তু কি বলবেন ফোনে ? সত্যি যেটা বলা উচিত সেটা তো বলা যাবে না কিছুতে। একটু ইতস্তত ক'রে তবু ফোনটা তুললেন।

"হালো, হ্যাঁ আমিই। শুনলাম তুমি তুপুরে ফোন করেছিলে। আমি একটু মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিলাম। কোনও দরকার ছিল নাকি ? ও, তুমি শুনেছ। আমি ভেবেছিলাম ব্যাপারটা কেউ জানতে পারেনি। তোমার চাকরটা তো আমাকে কিছু বলেনি। আমি তোমার ঘরে ঢুকে দেখলাম তুমি ঘুমুচ্ছ, তাই পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম। তোমার চাকরকে দেখিনি তো। ও, সে দোতলা থেকে আমার গাড়িটা দেখেছিল শুধু ? নেমে এসে আমাকে দেখতে পায়নি কারণ আমি তো তু'মিনিটের বেশী ছিলাম না। এখনি আসবে ? না, না, এখন এসো না। আমাকে এখন বেরুতে হবে। শ্যামল তোমাকে আর একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছে ? তাই নাকি ? দেখব পরে। তোমার মনে হ'চ্ছে একথা ? হ্যাঁ সত্যিই এড়িয়ে চলছি একটু। তোমার কাছে যাব ব'লে যাত্রা করেছি অনেকদিন আগে কিন্তু এখনও তোমার কাছে পৌঁছতে পারিনি। কেন পারিনি তা যেদিন বলতে পারব সেদিন পৌঁছেও যাব আমার মনের অবস্থা রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন আগে একটা গানে লিখে গেছেন—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।' আরে না, না—ওসব কিছু নয়। তুমি—"

হঠাৎ বিতুলা ফোনটা কেটে দিলে। কি সর্বনাশ, এখুনি এসে পড়বে না তো। বিশ্বদীপ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মোটরটা বাইরেই ছিল। বিশ্বদীপকে বেরিয়ে আসতে দেখেই সেলাম ক'রে উঠে দাঁড়াল রণছোড়।

"রণছোড়, আমার ব্যাঙ্কে চল। সেখান থেকে চাঁদনী যাব। এই চিঠিটাও পোস্ট করতে হবে।"

বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বদীপ। যাবার আগে আলমারি থেকে একটা কার্ডিগ্যান আর একজোড়া মোজাও নিয়ে নিলেন। টমসনকে টাকা আর লিসিকে কার্ডিগ্যান, মোজা আর উল পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় লাগল। ক্ষিধে পেয়েছিল। তবু বাড়ি ফিরতে সাহস হ'ল না—যদি বিতুলা সেখানে ব'সে থাকে ! এখন বিতুলার সঙ্গে দেখা হ'লে এখনই তাকে সব কথা বলতে হবে। কিন্তু তাঁর পায়ের বোদা-ভাবটা সম্পূর্ণরূপে না সেরে গেলে কোনও কথা তাকে বলা যাবে না। বলতে হ'লে বলতে হবে —আমি তোমাকে পাবার যোগ্য নই। আমার কুষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু একথা তিনি এখন কিছুতেই বলতে পারবেন না। চৌরঙ্গীতে গিয়ে একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে

নিলেন। আপিসে ফোন ক'রে জানলেন তেমন দরকারী কাজ কিছু নেই। কেউ দেখা করতে আসেনি। ভাবলেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়। মনে পড়ল আর্টিস্ট নবনী দাসের কথা। তার ঠিকানাটা যোগাড় করেছিলেন। ঠিক ক'রে ফেললেন সেইখানেই যাবেন। খোঁজ করবেন বিতুলার পোর্ট্রেটটায় সে হাত দিয়েছে কিনা। বিতুলার একটা ফোটো দিয়েছিলেন তাকে।

…নবনী দাস গলির গলি তস্য গলির ভিতরে একটা একতলা বাড়িতে থাকেন। নম্বরও অদ্ভুত—৩২।৪৭।এ বাই সি বাড়ির সামনে কোনও 'নেম প্লেট' নেই। কড়া নাড়তে নবনী দাসই বেরিয়ে এলেন।

"ও আপনি, আসুন আসুন।"

নবনী দাস অভ্যর্থনা জানালেন বটে কিন্তু তাঁর চোখে মুখে সে ভাব ফুটে উঠল না। বিশ্বদীপের মনে হ'ল একটু যেন বিরক্তই হয়েছেন।

"আমি বিতুলার সেই পোর্ট্রেটটার খবর নিতে এসেছিলাম। সেটাতে হাত দিয়েছেন কি।"

"সেইটিই তো এখন আঁকছিলাম। আসুন।"

বিশ্বদীপ ঢুকে দেখলেন বাড়ির ভিতরের দিকে একটা বারান্দায় একটি সুন্দর ছেলে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে।

"আপনার ছেলে বুঝি।"

'হ্যাঁ। আসুন, এইদিকে।"

ঘরের ভিতর চমৎকার একটি দোলনা টাঙানো ছিল। দেখেই বিশ্বদীপ বুঝতে পারলেন এ দোলনা শিল্পী নবনী দাসের সৃষ্টি, এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না। একটি শতদল পদ্ম যেন দুলছে। পদ্মের মাঝখানে ছোট্ট একটি বিছানা আর তাতে হাত পা নেড়ে খেলা করছে একটি শিশু।

"বাঃ, চমৎকার দোলনা তো। আপনি করেছেন নিশ্চয়—"

নবনী দাস কোনও উত্তর দিলেন না, তাঁর মুখে আনন্দের একটা ছটা আভাসিত হ'য়ে মিলিয়ে গেল শুধু।

"আসুন—"

ভিতরের দিকে একটা বড় বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হলেন বিশ্বদীপ। একটি তরুণী একটা মোড়ায় ঈষৎ বেঁকে বসেছিল। তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। উদ্দাম যৌবন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে মেয়েটির সর্বাঙ্গে। তার পীবর স্তনযুগল, করীমুণ্ডের মতো নিতম্ব, পেলব বাহুলতা, আবেশময় দৃষ্টি, বিম্বওষ্ঠাধর যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নীরবে—দেখ, দেখ, দেখ আমাদের দেখ। বিশ্বদীপ ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। তারপর নমস্কার ক'রে নবনী দাসের দিকে চেয়ে বললেন, "ইনিই কি মিসেস দাস?"

"হ্যাঁ। আলেয়া, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বদীপবাবু। এঁর জন্তেই পোর্ট্রেটটা আঁকছিলুম এখন—"

আলেয়া লীলাভরে হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর ঘর থেকে সুদৃশ্য একটি মোড়া বার ক'রে বলল, "বসুন।"

মোড়ায় ব'সে বিশ্বদীপের চোখে পড়ল পোর্ট্রেটখানা। মেয়েটি যেভাবে বেঁকে মোড়ায় বসেছিল, পোর্ট্রেটের ছবিটাও ঠিক সেইভাবে বসেছে, নারীদেহের যৌবন-মহিমা অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে ছবিতে। মুখটা কিন্তু বিদুলার, চোখের দৃষ্টি সলজ্জ, সন্নত, আর সমস্ত দেহের উপর কুয়াশার মতো একটা পাতলা ওড়না, ওড়নার খানিকটা অংশ মাথা আর মুখকেও ঢেকে রেখেছে।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো ছবিখানা। শেষ হ'য়ে গেছে নাকি, এখুনি দেবেন?"

"না। তবে আপনি যদি ঘণ্টাখানেক বসেন আর আলেয়া যদি এখন 'সিটিং' দিতে রাজী হয়, তাহলে আজই দিয়ে দিতে পারি।"

"আপনার স্ত্রীই আপনার মডেল নাকি।"

"ও সামনে ব'সে না থাকলে আমি ছবিই আঁকতে পারি না! বিশেষত মেয়েদের পোর্ট্রেট—"

বিশ্বদীপ অবাক্ হলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। ছবিটার দিকেই চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। সত্যিই অপূর্ব হয়েছে ছবিটা।

"আজ তাহলে উঠি—"

"বেশ। কাল আমি দিয়ে আসব ছবিটা।"

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে বিশ্বদীপ বললেন, "আপনার পারিশ্রমিকটা এখনই দিয়ে দেব কি?"

"দিন।"

"কত দেব।"

"আপনার যা ইচ্ছে।"

বিশ্বদীপ পকেট থেকে চেকবুক বার ক'রে একখানা হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন।

নবনী দাসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপিসে গেলেন বিশ্বদীপ। বিদুলা কি সেখানে যাবে? অসম্ভব নয়। তবু আপিসে যেতে হবে একবার। আশা-আশঙ্কার দোলায় দুলতে দুলতে আপিসে গিয়ে হাজির হলেন যখন, তখন বেলা সাড়ে তিনটে। গিয়ে শুনলেন বিদুলা এসেছিল। একটা চিঠি রেখে গেছে। ছোট চিঠি।

বিশু,

ফোনে তোমার এলোমেলো কথা শুনে আমি বড় ঘাবড়ে গেছি। তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম, এখানেও এসেছিলাম। কি বলতে চাও তুমি, সামনাসামনিই বল না।

আমি ধাঁধা বুঝতে পারি না। কখন এলে তোমার দেখা পাব, ফোন ক'রে জানিও। আমি ফোনের অপেক্ষায় বাড়িতেই থাকব।

—বিদুলা

এর পরই এল ধাকড় আর রামু।

ধাকড় সেলাম ক'রে বলল, "হুজুর, যে সিন্‌হা সাহেব এখানে ছিলেন তিনি আর একটা কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছেন। তিনি বলছেন এই সাবুন বানাবেন। আমাদেরও ডাকছেন, বলছেন তোমরাও চ'লে এস, মজুরি ডবল দেব আমরা।"

বিশ্বদীপ বললেন, "ভয় দেখিয়ে আমাকে কাবু করতে পারবে না ধাকড়। আমি এখুনি এই কারবার বন্ধ ক'রে দিতে পারি। তাতে আমার কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম তা আর কেউ তোমাদের দেয়নি। তোমাদের এই ব্যবসার মালিক ক'রে দিয়েছিলাম আমি।"

রামু বলল, "আমরা ব্যবসা চালাতে পারব না হুজুর। সব বরবাদ হ'য়ে যাবে। আমাদের মজুরি কিছু বাড়িয়ে দিন, আমরা এখানেই কাজ করব। আট আনা ক'রে বাড়িয়ে দিলেই আপাতত চলবে, তকলিফসে চলবে, কিন্তু চলবে।"

বিশ্বদীপ বললেন, "আমি তোমাদের বাজারের রেট অনুসারে মাইনে দিচ্ছি। অন্য জায়গায় যদি বেশী পাও যাও—আমি তোমাদের আটকাব না।"

হঠাৎ মহুয়া প্রবেশ করল। সে বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। বিশ্বদীপ দেখলেন তার পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখের দৃষ্টিতে চাপা আগুন।

সে বলল, "ওরা যদি যেতে চায় যাক। আমি অন্য মজুর যোগাড় ক'রে আনব। ওর যত লোক মিলে কাজ করত আমরা তার অর্ধেক লোক নিয়ে সে কাজ ক'রে দেব। শামার মা আমাকে সাহায্য করবে বলেছে। আমিও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি তারা রাজী আছে। এরা একশ' জন কাজ করে। আমরা পঞ্চাশজনে সে কাজ ক'রে দেব। আমরা ব্যবসার অংশীদার হ'তে চাই। আপনার সব শর্তে আমরা রাজী—"

"বেশ। তাই হবে।"

বিশ্বদীপ উঠে পড়লেন।

বাড়ি ফিরতেই ছকুর সঙ্গে দেখা।

সে বলল, "বিদুলা-মা এখুনি ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন বাবু এলেই আমাকে ফোনে জানিয়ে দিও, আর তাঁকে বোলো আমার জন্য যেন অপেক্ষা করেন।"

খবরটা শুনে পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ।

ছকু বলল, "আপনার খাবার কি গরম ক'রে আনব?"

"না। আমি বাইরে খেয়েছি।"

তারপর হঠাৎ তিনি মনস্থির ক'রে ফেললেন।

ছকুকে বললেন, "আমাকে এখুনি একটা দরকারী কাজে কলকাতার বাইরে যেতে যেতে হচ্ছে। এখুনি বেরুব আমি। আমার জিনিসপত্র ঠিক ক'রে দাও।"

তিনি তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে দেখলেন তাঁর কাছে নগদ প্রায় হাজারখানেক টাকা আছে। ব্যাঙ্কে ফোন করলেন। এজেন্টের সঙ্গে চেনা ছিল।

"এখুনি একটা জরুরী দরকারে বাইরে বেরুতে হচ্ছে। আপনাদের আজকের অ্যাকাউণ্ট কি ক্লোজড্ হ'য়ে গেছে? হয়নি? তাহলে আমি যাচ্ছি এখুনি। আমার কিছু টাকার দরকার—ধন্যবাদ।"

বিশ্বদীপ বেরিয়ে যাবার পর ছকু ফোন করলে বিদুলাকে।

"বাবু এখনি এসেই আবার বেরিয়ে গেলেন—"

"কোথায় গেলেন—"

"কোথায় গেলেন তা ব'লে যাননি। বললেন কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন একটা দরকারী কাজে।"

"কবে ফিরবেন।"

"তা-ও ব'লে যাননি।"

ফোনটা ধ'রে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল বিদুলা।

হাওড়ায় গিয়ে বিশ্বদীপ খোঁজ ক'রে জানলেন অমৃতসর মেলে দুটো ফার্স্ট ক্লাস বার্থ পাওয়া যেতে পারে। একটা আপার একটা লোয়ার। মানে একটা কুপেই খালি আছে। দুটো বার্থের টিকিটই কিনে ফেললেন বিশ্বদীপ। তাড়াতাড়ি গিয়ে কুপেটা দখল ক'রে জানলা কপাট বন্ধ ক'রে ব'সে রইলেন, কি জানি বিদুলা এখানেও যদি এসে পড়ে। এসে হয়তো বলবে—আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আসবে কি? আসতে পারবে কি? চোখ বুজে দুরুদুরু হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

"তুমি ভেবেছ, আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা আমি হ'তে দিচ্ছি না।"

তারপর হঠাৎ চমকে উঠলেন। টং টং টং ক'রে ঘণ্টা বাজছে। ট্রেন ছেড়ে দিল। বিদুলা আসেনি। ট্রেনের গতিবেগ বাড়তে লাগল ক্রমশঃ

আঠারো

মানসপুরের মাঠ কাশফুলে ছাওয়া। হুহু ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে একটা। যতদূর দৃষ্টি যায় কাশফুল দুলছে। মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। তারপর বললেন, "তোমরা কোথা থেকে এলে।"

তাঁর কাছে যে কাশফুলগুলো ছিল থেমে গেল তাদের দোলন। কয়েকজন বলল, "ভেসে এসেছি। বধূসরা দু'কূলপ্লাবিনী হয়েছিল, সে-ই আমাদের ভাসিয়ে এনেছে

পলিমাটি আর বালির সঙ্গে। রুদলবাবু বলেছেন তোমরা যতদিন খুশি এখানে থাকো। তাই আমরা আছি।"

"রুদলবাবু কোথা।"

"তিনি তো সর্বত্র আছেন। এখনই হয়তো দেখা পেয়ে যাবে তাঁর।"

"মুরুব্বীকে চেন?"

"না। তবে একজন বহুরূপীকে চিনি। ওই যে মাটির ঢেলার উপর গঙ্গাফড়িং ব'সে আছে সামনের পা দুটো তুলে, ও একটু আগে মানুষ ছিল, একটা ঝারি নিয়ে জল দিচ্ছিল আমাদের গোড়ায়। হঠাৎ গঙ্গাফড়িং হ'য়ে গেল।"

বিশ্বদীপ দেখলেন সত্যিই বেশ একটা বড় গঙ্গাফড়িং ব'সে আছে মাটির ঢেলার উপর। মনে হ'ল সামনের পা দুটো নেড়ে নেড়ে যেন ডাকছে তাঁকে। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন মুচকি মুচকি হাসছেও। কাছে যেতেই ফড়িংটা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে বিশ্বদীপের কাঁধের উপর বসল আর কানের কাছে তার লম্বা গলাটা বাড়িয়ে চুপিচুপি বলল, "মধু খাবে? তাহলে রুদলবাবুর ওখানে চল। সেখানে এক অদ্ভুত মৌচাক হয়েছে। ওই যে বাঁ দিকের সরু পায়েচলা পথটা এঁকেবেঁকে শালবনের ভিতর ঢুকে গেছে ওইটে দিয়ে চল। কাশফুলদের মাড়িও না। ওরা চ'টে গেলে রুদলবাবুও চ'টে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে আর অমনি গ্রীষ্মকাল এসে পড়বে মানসপুরে। সে মহা কষ্ট।"

গঙ্গাফড়িংকে কাঁধে ক'রে বিশ্বদীপ চলতে লাগলেন। রাস্তায় দেখা গেল শাহী বুলবুল আর টুনটুনিরা খেলা করছে দল বেঁধে। গঙ্গাফড়িং চুপিচুপি বলল, "আসলে ওরা হাডুডু খেলছে। কিন্তু মুখ্যুর দল, খেলার নিয়মই জানে না। হুড়োহুড়ি করছে খালি।"

শালবন পার হ'য়ে বিশ্বদীপ একটা স্ফটিকের বাড়ি দেখতে পেলেন। একটা নীলাভ দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে বাড়িটার সর্বাঙ্গ থেকে। গঙ্গাফড়িং বলল, "এই বাড়িটাই এখন রুদলবাবুর পছন্দ। পরিষ্কার করবার জন্যে চাকর দরকার হয় না, কোনও ময়লা জমে না ওর গায়ে। রং করবার জন্যে রাজমিস্ত্রীও দরকার হয় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওর রং আপনি বদলাচ্ছে। এখন নীল দেখছেন তো? একটু পরে গোলাপী রং হ'য়ে যাবে, তারপর কমলা—বিশ্বকর্মা বানিয়ে দিয়ে গেছে।"

বিশ্বদীপ দেখলেন রুদলবাবু দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এক বিরাট মৌচাকের দিকে চেয়ে তন্ময় হ'য়ে ব'সে আছেন। মৌচাকের নীচে বিরাট একটা কারুকার্যখচিত সোনার গামলা। সেই গামলায় টপাটপ ক'রে মধু পড়ছে। গামলার আশেপাশে অনেক সোনার বাটি, প্রত্যেকটি মধুপূর্ণ। কাছে একটা হাতাও রয়েছে দেখতে পেলেন বিশ্বদীপ। গঙ্গাফড়িং বিশ্বদীপের কানে কানে বলল, "গামলাটা যেই মধুতে ভরপুর হচ্ছে অমনি রুদলবাবু হাতা দিয়ে তুলে তুলে বাটিতে বাটিতে আলাদা ক'রে রাখছেন, আর সব্বাইকে ডেকে খাওয়াচ্ছেন। এ এক মহা আপদ হয়েছে। কাঁহাতক মধু খাওয়া

যায়! আমি পঞ্চাশ বাটি খেয়েছি, আর পারা যায় না। সেই ভয়ে গঙ্গাফড়িং সেজে ব'সে আছি। এইবার আপনার পালা। বেশী খাবেন না যেন। মধু ভয়ানক গরম।"

বিশ্বদীপকে দেখে সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করলেন রুদলবাবু। "আসুন আসুন আসুন। অনেকদিন পরে এলেন। আসুন।"

পাশেই মখমলের একটা আসন ছিল, তাতেই বসলেন বিশ্বদীপ। গঙ্গাফড়িং তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল।

রুদলবাবু মৌচাকটা দেখিয়ে বললেন, "দেখুন কি কাণ্ড।"

বিশ্বদীপ অনেকদিন আগে উপনিষদের একটা ইংরেজী অনুবাদ পড়েছিলেন। তাতে উর্ধ্বমূল নিম্নশাখ এক বিরাট বৃক্ষের বর্ণনা পড়েছিলেন তিনি। মৌচাকটা দেখে সেই বৃক্ষের কথা মনে হ'ল তাঁর। মৌচাকে অসংখ্য মৌমাছি গুঞ্জন করছে, দলে দলে উড়ে আসছে, বসছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। বিশ্বদীপ সত্যিই বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। এত বড় মৌচাক তিনি দেখেননি কখনও।

রুদলবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "এ তো অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন আপনি।"

"আমি কিছুই করিনি। করেছে ওই মৌমাছিরা। হয়েছিল কি জানেন, সে এক আজগুবি গল্প। মৌমাছিদের এক রানী একবার আমার এখানে অতিথি হয়েছিলেন। কথায় কথায় তাঁকে আমি একদিন বললুম, আপনাদের প্রতি আমি খুব অন্যায় করেছি, সেজন্য অমি অনুতপ্ত। আগে আমি জানতাম না যে মৌচাকে আপনারা যে মধু করেন তা আপনাদের বাচ্চার জন্য। মধু খুব ভালবাসতাম, আপনাদের বাচ্চাদের ধ্বংস ক'রে অনেক মধু খেয়েছি আমি। তারপর সত্যকথাটা হঠাৎ একদিন শুনলাম। সেদিন থেকে আর মধু খাই না। দুধও অনেকদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি। মাংসও খাই না। বধূসরার জলে কিছু নিঃস্বার্থপর মাছ আছে, তারা মাঝে মাঝে আমাদের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মদান করে। বধূসরার তীরে তখন আমাদের মাছ-ভাজা-খাওয়ার জলসা ব'সে যায়। মৌমাছিদের রানী আমার কথা শুনে হেসে বললেন, আপনার জন্য আমিও মধুর ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমার কর্মীরা আপনার বাড়িতেই মৌচাক তৈরি করবে আর তাতে মধু সঞ্চিত থাকবে কেবল আপনারই জন্যে। তার কয়েকদিন পরেই দেখি এই বিরাট মৌচাক ঝুলছে আমার ছাদ থেকে। সর্বদা মধুতে টলমল করছে। টপটপ ক'রে পড়ছে সর্বদা। কত লোককে যে খাইয়েছি। আপনিও খান। এ সাধারণ মধু নয়, এ প্রেমের মধু।"

একটা বাটি এগিয়ে দিলেন বিশ্বদীপের দিকে। এক চুমুক খেয়েই বিশ্বদীপের সারা দেহে মনে যেন একটা আনন্দের শিহরণ ব'য়ে গেল। সাগ্রহে সবটা খেয়ে ফেললেন।

"আর এক বাটি নিন।"

বিশ্বদীপ আর আপত্তি করতে পারলেন না। বরং তাঁর লোভ হ'ল। বাটির পর বাটি মধু খেতে লাগলেন। তারপর মনে পড়ল সিংহের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি।

"সিংহ কোথা?"

"আছে কোথাও। মাঝে মাঝে দেখা হয়। আমার মনে হয় ও তপস্বী। একা একা দূরে দূরে থাকে। সবাইকে মধু খাইয়েছি, কিন্তু ও খায়নি। বললে, প্রেমের মধু খাওয়ার মতো মন হয়নি এখনও আমার। এখনও আমার মনে রাগ আর ঘৃণা জ'মে আছে। এখন আমার ও মধু মিষ্টি লাগবে না, তেতো মনে হবে। এখন থাক, পরে খাব। আমি আর পীড়াপীড়ি করিনি। মন-মরজি লোক, ওকে না ঘাঁটানোই ভালো। ওই যে যাচ্ছে।"

বিশ্বদীপ দেখলেন সিংহ তার বোঝা দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে চলেছে। পরনে সেই বিচিত্র আলখাল্লা।

"আমি যাই, ওর সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসি।"

বিশ্বদীপ উঠে সিংহের অনুসরণ করলেন।

কিছুদূরে প্রকাণ্ড একটা তেঁতুলগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে একা দাঁড়িয়েছিল। তার তলায় গিয়ে সিংহ বোঝা নামাতেই বিশ্বদীপ হেসে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। সিংহের মুখেও ফুটে উঠল সেই মর্মন্তুদ হাসিটা।

"তোমাকেও পালাতে হ'ল তো শেষ পর্যন্ত। আমি জানতুম পালাতে হবে। সংসারে আমাদের ঠাঁই নেই। ওরা মুখে সহানুভূতি জানাবে, উপকার করবার চেষ্টা করবে, হয়তো উপকারও করবে. কিন্তু তোমার কাছে আসবে না। ওরা সাবধানী, ওরা সৌন্দর্য-লোলুপ, ওরা আলাদা জাত, ওরা আমাদের কেউ নয়। তুমি বড়লোক ফার্স্ট ক্লাসে চ'ড়ে পালাতে পেরেছ। আমাদের হেঁটে পালাতে হয়েছিল। একদিন রাত্রে চুপিচুপি উঠে পালিয়েছিলুম। এখনও পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছি।

তীব্র তীক্ষ্ণ হুইসল-এ অন্ধকার বিদীর্ণ হচ্ছিল। মানসপুর মিলিয়ে গেল। বিশ্বদীপ শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্টেশন নয়। চতুর্দিকে অন্ধকার। অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে। আবার ট্রেনটা চলতে শুরু করল। বিশ্বদীপ আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।

...হঠাৎ দেখলেন উপরের বাংক্ থেকে পাঁচটি মেয়ে উঁকি মেরে দেখছে তাঁকে। অপূর্ব সুন্দরী। তারপর চিনতে পারলেন—তরলা. তুহিনা, তুফানী, হাওয়া আর হিল্লোলা। সঙ্গে সঙ্গে কলকণ্ঠে হেসে উঠল তারা।

"আপনার ভয় নেই, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। মাঝে মাঝে আমাদের চা খাওয়াবেন খালি।"

ট্রেনটা দুলতে লাগল। বিশ্বদীপের মনে হ'ল বসুন্ধরার তরঙ্গ-দোলায় দুলছেন তিনি।

উনিশ

পাটনায় নেমে পড়েছিলেন বিশ্বদীপ। স্টেশনের রেস্ট রুমে ব'সে চিঠি লিখছিলেন পাঠকজিকে।

শ্রীচরণেষু,

আমার ভালো লাগছিল না ব'লে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। ফ্যাকটারির দেখাশোনা আপনি করবেন। যে মজুররা বেশী মজুরির লোভে অন্য জায়গায় যেতে চাইছিল তাদের যেতে বলেছি। মহুয়া বলেছে সে মজুর যোগাড় ক'রে আনবে। তাকে বলেছি মজুরদের আমি ব্যবসার অংশীদার ক'রে নেব। আমার এই ইচ্ছাটা আপনি পালন করবেন আশা করি। মহুয়া মেয়েটি ভালো, তার উপরই সব ভার দিয়ে দেবেন। আমি ভালো আছি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। কবে ফিরব ঠিক নেই। ইতি—

প্রণত

বিশ্বদীপ

কুড়ি

তারপর অনেক জায়গায় ঘুরলেন বিশ্বদীপ। এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, চণ্ডীগড়, অমৃতসর, কাশ্মীর। কাশ্মীরে বোট হাউস ভাড়া ক'রে ঘুরে বেড়ালেন কিছুদিন। কিছুদিন পরে আর ভালো লাগল না। নেমে এলেন দিল্লীতে। দিল্লীর রাস্তায় হঠাৎ দেখা হ'ল বিজনবালার সঙ্গে।

"এ কি, আপনি এখানে।"

"আমি পালিয়ে এসেছি। আমি স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারলাম না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম যে মেয়েটিকে তিনি র'াধুনী ব'লে বাড়িতে এনেছেন সে তাঁর রক্ষিতা। সেইদিনই গৃহত্যাগ করলুম আমি। আমার স্কুলের এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে এখানে। তাঁর স্বামী একজন পদস্থ অফিসার। তিনিই আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন টেলিফোন আপিসে। সেই চাকরিই করছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে আপনার কাছেই গিয়েছিলাম, কিন্তু শুনলাম আপনি বাড়িতে নেই, কলকাতার বাইরে গেছেন, কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। বান্ধবীর ঠিকানাটা ছিল আমার কাছে, সেইদিনই দিল্লী চ'লে আসি। চাকরি পেয়ে গেছি। ভালোই আছি এখন। আলাদা বাসা করেছি একটা। যাবেন? আরও অনেক রকম বিজ্ঞাপন যোগাড় করেছি আমি, দেখাতুম তাহলে আপনাকে। যাবেন?"

বিজনবালার চোখে-মুখে একটা উৎসুক আগ্রহ ফুটে উঠল।

বিশ্বদীপ হেসে বললেন, 'না। এখনই ট্রেন ধরতে হবে আমাকে।"

"ও। আচ্ছা, যাই তাহলে—"

বিজনবালা হেঁট হ'য়ে প্রণাম করল তাঁকে। তারপর চ'লে গেল একটা রিক্শ ডেকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে চাইলে একবার। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বদীপ। তারপর তিনিও হাঁটতে শুরু করলেন। একবার মনে হ'ল এখানে একজন ভালো হোমিওপ্যাথকে কন্‌সাল্ট্‌ করলে কেমন হয়। ডাক্তার কারফরমা মাত্র সাত দিনের ওষুধ দিয়েছিলেন। সে তো কবে ফুরিয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় তাঁর তিন মাস কেটে গেল। তাঁর উরুতের সেই বোদা ভাবটা কমেনি। আজকাল একটু যেন ব্যথা-ব্যথাও করছে। তারপর ঠিক করলেন কলকাতায় ফিরে যা হয় করা যাবে। স্টেশনে গিয়ে তিনি কিন্তু কলকাতার টিকিট কাটলেন না। কাটলেন হরিদ্বারের। সেখানে গিয়ে একটা পাণ্ডার আশ্রয়ে রইলেন কিছুদিন। নিরামিষ খাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু কিছুদিন পরে তাও ভালো লাগতে লাগল। গঙ্গর ধারে ব'সে গঙ্গার কলকলধ্বনি শুনতেন। একদিন গভীর রাত্রে একা ব'সে ছিলেন। জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। মনে হ'ল একটি কিশোরী মেয়ে গঙ্গা থেকে উঠে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল তাঁর সামনে। তার সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্নার জরি ঝলমল করছে। চোখে কৌতুকদীপ্তি।

"আমাকে চিনতে পারছেন ?"

অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন বিশ্বদীপ।

"আমি বধূসরা। সাগরের কাছে চলেছি। পৃথিবীর সব নদীতে ছড়িয়ে দিয়েছি নিজেকে। সব নদীই সাগরে যায়।"

তারপর হঠাৎ সে মিলিয়ে গেল। আর তার দেখা পাননি। দেখা পাবার আশায় আরও দু'মাস ছিলেন তিনি হরিদ্বারে। বিতুলা কিন্তু তাঁকে ছাড়েনি একমুহূর্ত। নিদ্রায় জাগরণে শয়নে স্বপনে তাঁর প্রতি মুহূর্তটি জুড়ে সে অহরহ তাঁকে নীরব ভাষায় ডাকছিল—এসো, এসো, তুমি ফিরে এসো।

হঠাৎ একদিন বিশ্বদীপের মনে পড়ল দিল্লীর এম্‌ব্যাসিতে এক সায়েবের কথা তিনি শুনেছিলেন একজনের কাছে। নামটা খুব পরিচিত ব'লে মনে হয়েছিল। ভেবেছিলেন দেখা করবেন। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন, আর দেখা করা হয়নি। সেইদিনই হরিদ্বার থেকে দিল্লী গেলেন। খোঁজ ক'রে দেখা করলেন সেই সায়েবের সঙ্গে। যা ভেবেছিলেন তাই, এঁর সঙ্গে বিলেতে পড়েছিলেন তিনি। তাঁকে বললেন, "আমি বিলেতে একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ পেতে পারি। যদি পাই চ'লে যাব। কিন্তু আজকাল শুনছি পাস-পোর্ট পাওয়া মুশকিল।"

সায়েব বললেন, "তুমি আমার কাছে চ'লে এসো—আমি তোমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেব with family."

দিল্লীতে বিশ্বদীপ দিন দুই ছিলেন। সেখান থেকে চ'লে এলেন তিনি কাশীতে। কেন জানি না ইচ্ছা হ'ল বাবা বিশ্বেশ্বরের কাছে থাকবেন কয়েকদিন। গিয়ে একটা

হোটেলে উঠলেন। রোজ সকালে গিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ব'সে থাকতেন। বিশ্বেশ্বরের গলিতে গিয়ে খেলনা কিনে বিতরণ করতেন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের। ভিখারীদের পয়সা দিতেন। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন সবাই যেন একটু বিশেষ ভাবে চাইছে তাঁর দিকে। কেন চাইছে? বুঝতে পারেননি তখন। হোটেলে ফিরে বুঝতে পারলেন। হোটেলওলা জিগ্যেস করল, "বাবুজি, আপনার মুখে কি চোট লেগেছে?"

"চোট? না—"

ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। মনে হ'ল তাঁর গালে কে যেন একটা চড় মেরেছে। ডান গালের খানিকটা লাল হ'য়ে উঠেছে, নাকের ডান পাশটাও। লেপ্রসির প্যাচ!

সেইদিনই চিঠি লিখলেন তিনি বিদুলাকে।

বিদুলা,

তোমার কথা প্রতিমুহূর্তে ভেবেছি। আমাকে তুমি একদণ্ড ছেড়ে থাকনি। তোমাকে যে কথাটা বলতে পারিনি ব'লে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি সেই কথাটা বলবার আজ সময় এসেছে। কারণ, আর তা লুকিয়ে রাখা যাবে না। আমার মুখের উপরই সে কাহিনী রক্তাক্ষরে লেখা হ'য়ে গেছে। সংক্ষেপেই বলছি। আমার বাবা মা দুজনেরই কুষ্ঠব্যাধি ছিল। আমাকে যদিও তাঁরা আলাদা ক'রে রেখেছিলেন তবু সে ব্যাধির প্রকোপ থেকে আমি রক্ষা পাইনি। ডাক্তার ঘোষালকে দেখিয়েছিলাম, তাঁর অনেক ওষুধ খেয়েছি, তেমন কোনও উপকার পাইনি। তিনি কেবলই বলতেন, অধীর হবেন না, অপেক্ষা করুন। কিন্তু আমি বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলাম তাড়াতাড়ি ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে তোমার কাছে যাব। তাই একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে আশ্বাস পেয়ে তাঁর ওষুধ খাচ্ছিলাম। কিন্তু তা-ও বেশীদিন খেতে পারিনি। তোমাকে এড়াবার জন্যে আমাকে পালিয়ে আসতে হ'ল। তোমাকে সত্যকথাটা বলবার সাহস আমার ছিল না। আজ সকালে দেখলাম মুখের উপর বেশ বড় একটা লাল প্যাচ হয়েছে। আমি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে সর্বান্তঃকরণ দিয়ে চাই। এসব শোনার পরও তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করতে চাও তাহলে আমার বাসার ঠিকানায় সেটা জানিয়ে দিও। আমি দিন পনরো পরে ফিরব। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি—

বিশ্বদীপ

একুশ

বিশ্বদীপ যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ট্রেনটা লেট ছিল। স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি পেতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় গেল। যখন বাড়ি পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় এগারোটা। চোরের মতো নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। দারোয়ান জেগে ছিল, সে সেলাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকে দেখলেন বাড়ি অন্ধকার।

"ছকু কোথা ?"

"সে বাড়ি গেছে। মহুয়ার কাছে চাবি আছে।"

মহুয়া এসে চাবি খুলে দিলে। বাইরের ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই সে-ও সবিস্ময়ে চেয়ে রইল বিশ্বদীপের মুখের দিকে।

"আপনার মুখে কি হয়েছে বাবু—"

"কুষ্ঠ। আমার চিঠিপত্র কোথা ?"

একগোছা চিঠিপত্র এগিয়ে দিয়ে মহুয়া আস্তে আস্তে চ'লে গেল। প্রথমেই বিদুলার চিঠিখানা চোখে পড়ল। সুন্দর নীল খামে গোটা-গোটা অক্ষরে ঠিকানা লেখা। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলে বিশ্বদীপ। ছোট চিঠি।

বিশু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কি আঘাত যে পেয়েছি তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমার নেই। তোমার ওই সুন্দর মুখে লেপ্রসির প্যাচ হয়েছে একথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। ও দৃশ্য আমি দেখতেও পারব না। যে অনিন্দ্যকান্তি রাজপুত্রকে আমি ভালবেসেছিলুম তাকে বুকে নিয়েই আমি চললুম। ফিরে এসে আমাকে তুমি আর দেখতে পাবে না। ইতি—

বিদুলা

"মহুয়া—মহুয়া —"

মহুয়া বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, ভিতরে এসে দাঁড়াল।

"বিদুলার খবর কি জান ?"

"তিনি কয়েকদিন আগে ছাদ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেছেন।"

স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন বিশ্বদীপ। অনেকক্ষণ পরে বিলেতের একখানা চিঠি নজরে পড়ল। তাঁর অধ্যাপক চিঠি লিখেছেন—"তোমার যখন লেপ্রসি হয়েছে তখন তোমাকে কাজ দিতে পারব না।"

পরদিন খুব ভোরে উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছিলেন বিশ্বদীপ। দারোয়ানকে ডেকে বললেন, "রণছোড়কে গাড়ি বার করতে বল।"

মহুয়া এসে দাঁড়াল।

"এখনই বেরুবেন ?"

"হ্যাঁ। আমি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি। টেবিলের উপর একখানা চিঠি রইল, পাঠকজিকে দিয়ে দিও সেটা।"

"কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?"

"জানি না। তবে আর এখানে ফিরব না।"

মহুয়া চ'লে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ছোট একটা পুঁটুলি নিয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল এসে।

"আপনাকে আমি একা যেতে দেব না। আমিও যাব আপনার সঙ্গে।"

"তুমি ? কেন ?"

নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল মহুয়া। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "আপনার সেবা করবার জন্যে তো একজন লোক চাই।"

"কিন্তু আমার কুষ্ঠ হয়েছে যে—"

"তা হোক। আমি যাব।"

"না, না, সে হয় না।"

"আমি কিছুতেই আপনাকে একলা যেতে দেব না।"

বাইশ

আফ্রিকার এক জঙ্গলের কাছে ছোট একটা বাড়িতে বসে ছিলেন বিশ্বদীপ। মানসপুরের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ প্রসারিত হ'য়ে ছিল তাঁর চোখের সামনে। কাছেই একটা বকুলগাছে অজস্র ফুল। বিদুলা সেই গাছের তলায় ব'সে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। তরলা, তুহিনা, তুফানী, হাওয়া আর হিল্লোলা নাচছিল সেই বাজনার সঙ্গে। একটু দূরে সিংহ তার বোঝা দুটো কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিল আর একটা গাছের তলায়। বধূসরার তীরে পিকনিক হবে নাকি আজ, পাহাড়ীরা আসবে, তারই আয়োজনে মেতে আছে মুরুব্বী।

মহুয়া হঠাৎ এসে বলল, "পাঠকজি এসেছেন।"

মানসপুর মিলিয়ে গেল। সত্যিই পাঠকজি এলেন। এসেই একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে। তাতে লেখা রয়েছে—'অবাক্ হ'য়ো না। তোমার বাবা মাকে নিয়ে জীবনের অনেকদিন কাটিয়েছি। বাকি জীবনটা তোমাকে নিয়েই কাটবে। ভয় পেয়ো না। একজন ভালো ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, তিনি আসবেন একটু পরে। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আজকাল অনেক ভালো ওষুধ বেরিয়েছে।'

বিশ্বদীপ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আবার মানসপুর মূর্ত হ'য়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। পাঠকজি মিলিয়ে গেলেন, তাঁর জায়গায় এসে দাঁড়ালেন রুদ্দলবাবু। তিনিও হেসে বললেন, "ভয় কি, ভালো হ'য়ে যাবে—"

বিঠুলার পিয়ানোতে অপূর্ব গৎ বাজতে লাগল।

পক্ষীমিথুন

উৎসর্গ

বিশিষ্ট কথাশিল্পী
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

ভূমিকা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জীবনকথা দুইটি পক্ষীর জবানিতে এই গল্পে আংশিক ভাবে বিধৃত হইল। পক্ষী দুইটি কে? পক্ষী দুইটি যোগেন্দ্রনাথের অন্তরনিবাসী সত্তার দুইটি অংশ। মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।

ইহার ভাবার্থ বাংলায় নিম্নরূপ:

সুপর্ণ দুইটি পাখী সখ্যভাবে সম্মিলিত
রহিয়াছে একই বৃক্ষ 'পরে
এক পাখী স্বাদু ফল করিছে ভক্ষণ,
দ্বিতীয়টি না খাইয়া নিরীক্ষণ করে।

প্রথম পক্ষীর কথা

গল্পের প্লটের জন্য কল্পনার মন্দিরে ধর্ণা দিয়া বসিয়াছিলাম। চোখে পড়িল রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে একটি লোম-ওঠা কুকুরও আমার গেটের সামনে ধর্ণা দিয়া বসিয়া আছে। দুর্গন্ধ 'ডাস্টবিন্', কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সন্দেহ হইল কুকুরটাও লেখক নাকি, কিন্তু আমার গেটের সামনে ও ধর্ণা দিয়া বসিয়া আছে কেন। আমার বাড়ি তো কল্পনা-মন্দির নহে। কল্পনা দেবী বাস করেন অলক্ষ্যলোকে, আমার এই বাড়িতে মাঝে মাঝে তাঁহার কৃপা-কণা বর্ষিত হয় তাহা সত্য, কিন্তু তিনি তো এখানে থাকেন না। কল্পনা দেবী কোথায় থাকেন তাহা আমিও জানি না···হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, কুকুরটা ওখানে কেন মাটি কামড়াইয়া অহোরাত্র পড়িয়া আছে। তাহার আরাধ্য কল্পনা দেবী নহে, তাহার লক্ষ্য শ্রীমতী জিমি, আমার শৌখিন টেরিয়র কুকুরীটা। জিমি বারান্দার উপর শিকলে বাঁধা থাকে, তাহাকে বাজে কুকুরের সহিত মিশিতে দিই না। সহসা মনে হইল আমার কুকুরের জন্য এত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি কিন্তু ছেলের জন্য তো করি নাই। সে তো স্বচ্ছন্দে একটা চামারের মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার যুবতী কনিষ্ঠা কন্যাটিও যেরূপ সাজিয়া গুজিয়া, শাড়ির রংয়ের সহিত স্যাণ্ডাল ও দুলের রং মিলাইয়া জলসায় জলসায় পার্টিতে পার্টিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সেও যে একদিন কি করিয়া বসিবে কে জানে! আমি আমার কুকুরের সম্বন্ধে এত সচেতন অথচ—। না, আমাকে দোষ দিবেন না। আমি ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধেও সচেতন, কিন্তু আমি নিরুপায়। কুকুরকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পারি না।

এই ধরনের এলোমেলো চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম এমন সময় যাহা ঘটিল তাহা অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর। কল্পনা দেবীর কৃপাতেই সম্ভবত দিব্যকর্ণ লাভ করিলাম। শুনিলাম সেই লোম-ওঠা ধূলিশায়ী খেঁকি কুকুরটা চমৎকার বাংলা ভাষায় কথা বলিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া আরও অবাক হইয়া গেলাম যখন বুঝিলাম কথাগুলি সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে। শুধু তাহাই নয়, দেখিলাম সে আমার মনের কথাও কোনও নিগূঢ় উপায়ে টের পাইয়াছে। সত্যই বড় আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

লোম-ওঠা কুকুর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "হে ভদ্রপুঙ্গব, তোমার মনের কথা আমি টের পেয়েছি। টের পেয়ে কৌতুক অনুভব করছি। তুমি ঠিকই অনুমান করেছ আমি শ্রীমতী জিমির প্রণয়াসক্ত। জিমি শুধু কুকুরী নয়, কুকুরীশ্রেষ্ঠা। তাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি ভাবছ এ লোম-ওঠা কুকুরটার আস্পর্ধা তো কম নয়, এই নীচবংশীয় বামনটার জিমি-রূপ চন্দ্রকে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা

কেন! তোমার মতিভ্রম দেখে সত্যিই বড় কৌতুক অনুভব করছি। তুমি তোমার বড় মেয়ের বেলায় কি করেছিলে তা কি ভুলে গেছ? ওই গবেট মেয়েকে বি. এ. পাস করাবার জন্যে তুমি না করেছ কি। পরীক্ষকদের ঘুষ পর্যন্ত দিয়েছ। বিয়ের বাজারে যেখানে লাখ টাকা কোটি-টাকার ছাপ-দেওয়া হাঙর কুমীররা ঘুরে বেড়ায় সেখানে ডিগ্রীটা বড় টোপ। যথাসর্বস্ব বাঁধা রেখে পণও তুমি যোগাড় করেছিলে। তারপর চাই রূপ আর বংশ। বিউটি পারলার আর প্রসাধনের কল্যাণে তোমার মেয়ের শ্যামবর্ণটা ঢাকা পড়েছিল আর তোমার মিথ্যাভাষণের জোরে চাপা পড়েছিল তোমার বংশ-পরিচয়টা। তোমার বংশে যে দু'জন পাগল, দু'জন হাঁপানি-গ্রস্ত আর একজন যক্ষ্মারোগী ছিল এ খবর তুমি চেপে গিয়েছিলে। যে বংশে যে ছেলের সঙ্গে তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ তাকে যদি চন্দ্র বলা যায়, তাহলে তুমি বামনের চেয়েও ছোট। তুমি যখন বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে পেরেছ তখন আমিই বা পারব না কেন। বর্তমান যুগে এই-ই তো নিয়ম, সবাই বামন কিন্তু সবাই চন্দ্র-লোলুপ। শুধু আমাকে দোষ দিও না!"

কুকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। দেখিলাম কুকুর শুধু ভালো বক্তা নয়, ভালো জ্যোতিষীও। তা না হইলে আমার এত কথা সে জানিল কি করিয়া। দেখিলাম কুকুরের মুখে যেন একটা ব্যঙ্গের হাসি বিচ্ছুরিত হইতেছে। মনে হইল কল্পনা দেবীও সম্ভবত আমার আরাধনায় তুষ্ট হইয়াছেন। এই কুকুরই বুঝি আজ একটি মূর্তিমান প্লটরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

কুকুর আবার কথা কহিল।

"আমাকে তুমি যত নীচ বংশের মনে করছ আমি কিন্তু তা নই। আশা করি তুমি মূর্খ নও। ঋগ্বেদ পড়েছ কি? মহাভারত? বহ্নিপুরাণ? ওগুলি পড়া থাকলে তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না যে আমি মহৎ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছি। দেবকুকুরী দেবশুনি সরমা আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তিনি সামান্যা কুকুরী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দক্ষকন্যা এবং কশ্যপ-পত্নী। ইন্দ্র এঁর ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। অসুরেরা যখন বৃহস্পতির গাভী চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখেছিল তখন এই সরমাকেই ইন্দ্র প্রেরণ করেছিলেন সে গাভী উদ্ধার করবার জন্য। আমাদের এই মহৎ উত্তরাধিকার এখনও আমরা সগর্বে বহন করছি। এখনও তোমরা, তথাকথিত সভ্য মানবরা আমাদের সাহায্যেই চোর ডাকাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা কর, আমাদের সাহায্যেই পলাতক চোর ডাকাত বা খুনীকে গ্রেপ্তার কর। তোমাদের তথাকথিত সভ্য বললাম তার কারণ তোমরা প্রকৃত সভ্য নও, সভ্যতার একটা মুখোশ পরে আছ মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের আদর্শ অভ্রান্ত ভাবে অনুসরণ করি, সে আদর্শ আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। তোমাদের হয়েছে কি? শুনি তোমরা কেউ ভরদ্বাজ, কেউ বশিষ্ঠ, কেউ কশ্যপ, কেউবা আর কোন মহাতপা ঋষির বংশধর, তোমরা তাঁদের আদর্শ অনুসরণ কর কি? আমি জানি কর না। তুমি কোন ঋষিবংশের কুলতিলক তা আমার জানা নেই, কিন্তু তোমাকে দেখে কোন ঋষিবংশধর বলে মনে হয় না। মনে হয় তোমার পূর্বপুরুষ কোন চোর ছ্যাঁচড় বা

দাগাবাজ ছিলেন, তোমার মুখে কোনও দেব বা ঋষি-ভাব নেই, কোনও উচ্চভাবও নেই। তুমি লেখক কেন হয়েছ তা-ও আমি বুঝতে পারছি না। কি লিখবে তুমি? নিজের স্বার্থ আর কামের কাহিনী? সেইটিকে রাজনীতি আর প্রেম-কথা বলে চালাবে? এ ছাড়া আর কিছু করবার ক্ষমতা তোমার আছে বলে তো মনে হয় না। তোমাকে এসব কটু কথা বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আমাকে দেখে তোমার চোখের দৃষ্টিতে যে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে তা আমি বরদাস্ত করতে পারলাম না। আমাকে ঘৃণা কোরো না। আমার জীবনকাহিনী যদি মন দিয়ে শোন তাহলে তোমার লেখার কিছু উপাদান হয়তো তুমি পাবে এবং একথাও তোমার হয়তো মনে হবে যে আমি তোমার জিমির অযোগ্য প্রণয়ী নই—"

বেচারা কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না। একটা বলিষ্ঠ কুকুর আসিয়া তাড়া করিতেই ল্যাজ গুটাইয়া পলায়ন করিল। বলিষ্ঠ কুকুরটা পাড়ারই কুকুর। খাঁটি দেশী কুকুর। কান খাড়া, কালো রং, চোখের উপর বৃত্তাকার দুইটি হলদে দাগ, জিলাপির মতো পাকানো ল্যাজ। কাহারও কথা শোনে না, কাহারও বাধ্য নয়। যথেচ্ছাচারী খাঁটি দেশী প্রাণী। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খাইয়া বেড়ায়, কিন্তু কাহারও বাড়ির সে নয়। সে সকলের, অথচ কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে না। তু করিয়া ডাকিলে দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়ে, বুঝিবার চেষ্টা করে এ ডাকা সার্থক না নিরর্থক। যদি খাবার দাও গপ্ করিয়া আসিয়া খাইয়া যাইবে। বাস্, সম্পর্ক ওইখানেই চুকিয়া গেল। এই পাড়ারই আরও কয়েকটা কুকুর জুটাইয়া একটা দলও পাকাইয়াছে সে। সম্ভবত দলটার ওই দলপতি। দলের প্রধান কাজ পরস্পরের সহিত ঝগড়া করা আর অন্য পাড়ার কোনও কুকুর এ পাড়ায় আসিলে তাহাকে তাড়া করিয়া যাওয়া। অন্য পাড়ার কুকুরের সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা উঁহাদের উত্তরাধিকার। সব কুকুরই ইহা করে। আমাদের প্রাদেশিক আইনগুলিও বোধ হয় এই কুকুর-নীতিরই অনুকরণ। ওই লোম-ওঠা কুকুরটা এ পাড়ার প্রাণী নহে, তাই তাহাকে তাড়া খাইয়া সরিয়া পড়িতে হইল। আর একটা কারণও ছিল, সেইটাই বোধ হয় প্রধান কারণ। ওই বলিষ্ঠ কুকুরটাও আমার 'জিমি'র প্রণয়ী। শুধু ও কেন, এ পাড়ার সব পুং-কুকুরই জিমির দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করে। তাহারা আগন্তুক লোম-ওঠা কুকুরকে বরদাস্ত করিবে কেন? মানুষের আইন-অনুসারেই ও ট্রেসপাসার। সুতরাং ও যে গেটের বাহিরে দূর হইতে প্রিয়া-মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে এ সুযোগটুকুও বেচারাকে উহারা দিবে না। কিন্তু ওই লোম-ওঠা কুকুরটাকে আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল। যদিও ও আমাকে গালাগালি দিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে, তবু উহার কথাবার্তা খুব ভালো লাগিয়াছিল আমার। মনে হইয়াছিল ও যেন কল্পনা দেবীরই কোনও দূত। কুকুর নয়, রূপক। কতকগুলো বাজে কুকুরের তাড়ায় ও পাড়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার যখন উহাকে ভালো লাগিয়াছে তখন উহাকে আমরা গেটের নিকট হইতে কে তাড়াইবে? কখনই

তাহা হইতে দিব না। দেখিলাম বলিষ্ঠ কুকুরটা গেটের সম্মুখে বসিয়া জিমির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

আমার চাকর ভিখনকে ডাকিলাম।

"এই কুকুরটাকে এখান থেকে মেরে তাড়িয়ে দে। অন্য কোন বাজে কুকুরকেও এখানে আসতে দিস না। সেই লোম-ওঠা কুকুরটা যদি আসে তাকে কেবল কিছু বলিস না। ও বেচারা যদি গেটের সামনে বসতে চায় বসতে দিস। খেতেও দিস কিছু।"

ভিখন একবার তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। বুঝিলাম আমার আদেশের মর্ম সে ঠিক গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমি স-লোম বলিষ্ঠ কুকুরটাকে দূর করিয়া দিয়া একটা লোম-ওঠা খেঁকি কুকুরকে কেন সমাদর করিতেছি তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইল না। কিন্তু সে ইহার প্রতিবাদও করিল না। ভোজপুর-নিবাসী বলিষ্ঠ ভিখন কথাবার্তা ক্বচিৎ বলে। প্রভুর আদেশ পালন করাই তাহার অভ্যস্ত স্বধর্ম। সে নিজের তৈলপক্ক বাঁশের লাঠিটি বাহির করিয়া আস্ফালন করিতেই বলিষ্ঠ কুকুরটা সরিয়া পড়িল।

ভিখন গেট খুলিয়া বাহিরে গিয়াও দেখিল কাছে-পিঠে আর কোনও কুকুর আছে কি না। সম্ভবত ছিল, কারণ সে একটা ঢিল কুড়াইয়া দূরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। লোম-ওঠা কুকুরটাও আর আসিল না। ইতিমধ্যে আমার জীবনকাহিনীটা শুনুন। আমার জীবনকাহিনীতে বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব কিছুই নাই। আমিও প্রথম জীবনে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী ছিলাম ও আপনাদের জীবন যেমন, আমার জীবনও তেমনি থোড়-বড়ি-খাড়ার সমন্বয় মাত্র ছিল। হয়তো কখনও থোড়ের বদলে মোচা বা কচু জুটিত, খাড়ার বদলে কখনওবা পুঁইশাক বা কাঁচকলা আবির্ভূত হইত, ব্যাপারটা কিন্তু মোটামুটি একই প্রকার ছিল। আমিও আপনাদের মতো প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলাম। যদিও পিতামাতার নির্দেশে, তাঁহাদেরই নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেন জানি না, বিবাহের পর হইতেই পিতামাতার স্নেহ-তরঙ্গিণীতে ভাটার টান দেখা দিল। নানা ছুতায় আমার মা আমার স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই তিরস্কার-কলহকে কেন্দ্র করিয়া বাড়িতে একটা তিক্ত আবহাওয়া প্রায়ই ঘনাইয়া উঠিত। ক্রমশ আর একটা জিনিসও বোঝা গেল। আমার ভাই নিজের দোষেই আজ বিপন্ন। ছাত্রজীবনে ভালো করিয়া পড়াশোনা করে নাই। মনুষ্যত্ব মর্যাদা বিসর্জন দিয়া অনেকের খোশামোদ করিয়া তাহার একটি চাকরিও জুটাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহা রাখিতে পারে নাই। চুরি এবং মিথ্যাভাষণের অপরাধে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আমি জানিতাম কর্তৃপক্ষ যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, আমার বাবা মাও সেকথা জানিতেন। আমার ছোট ভাইটি সত্যই চোর এবং মিথ্যাবাদী, আমার ঘড়িটি সে-ই চুরি করিয়াছিল ইহার প্রমাণ আমি পাইয়া-

ছিলাম। কিন্তু বাবা মার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া সেকথা বলিতে পারি নাই। আমার বাবার আংটিও কিছুদিন পরে চুরি গেল। বাব মা দুজনেই আমাদের পুরাতন ভৃত্য গণেশকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। আমি জানি গণেশ নিরীহ। অনেক ভদ্রলোকের অপেক্ষা তাহার চরিত্র বেশী ভদ্রতাপূর্ণ। ওই আংটিও আমার ভাই চুরি করিয়াছিল। কিন্তু সেকথাও প্রকাশ্যে বলা গেল না: চোর অপবাদ লইয়া ভদ্র গণেশকে বিদায় লইতে হইল। বাবা মা আমার ভাইয়েরও বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহারা যে বধূকে নির্বাচন করিয়াছিলেন সে ছিল অশিক্ষিতা। শুধু নিরক্ষর নয়—অনেক নিরক্ষরা নারীর স্বভাব ভদ্রতার এবং মনুষ্যত্বের মাধুর্যে পরিপূর্ণ থাকে তাহা জানি—উহার স্বভাব কিন্তু অত্যন্ত অমার্জিত ছিল। কদর্য ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে অভব্য কথাবার্তা বলিত, ভদ্রতাজ্ঞান মোটে ছিল না। আমার স্ত্রীকে একটা ভালো গহনা বা শাড়ি পরিতে দেখিলে হিংসায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। আমার স্ত্রীকে প্রকাশ্যে ভালো গহনা বা শাড়ি কিনিয়া দিবার সাহস আমার ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। যখন সামর্থ্যে কখন-সখনও কুলাইত, তখন বেনামীতে আমার স্ত্রীকে কিছু কিনিয়া দিতাম। বলিতাম, আমার অমুক বন্ধু আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। আমি আমার স্বোপার্জিত অর্থে আমার স্ত্রীকে কিছু কিনিয়া দিয়াছি একথা জানিতে পারিলে আমার বাবা মা দুইজনেরই মুখ ভার হইয়া যাইত। আমার শ্বশুর বড়লোক ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীকে দামী শাড়ি পাঠাইতেন। আমার বাবা একবার বলিলেন, 'বাড়িতে আর একটা বউ রয়েছে, তোমার শ্বশুরের উচিত ছিল তার জন্যও ওই রকম একখানা শাড়ি পাঠানো। তিনি যখন পাঠাননি, তুমিই কিনে দাও।' আমার হাতে তখন পয়সা ছিল না, কিনিয়া দিতে পারি নাই। ইহাতে বাবা মা দুইজনেই অসন্তুষ্ট হইলেন। মা এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন, 'ও শাড়িটা ছোট বউই পরুক, বড় বউয়ের তো অনেক শাড়ি আছে।' আমার স্ত্রী শাড়িখানা ছোট বউকে দিয়া দিল। মায়ের কথা মানিতেই হইল। পরে শুনিয়াছিলাম ছোট বউ নিজের বন্ধুবান্ধব মহলে সেই শাড়িখানা দেখাইয়াই নাকি বলিয়াছিল যে তাহার বাবা নাকি শাড়িটা তাহাকে পাঠাইয়াছে! আমার ভাইয়ের আর চাকরি জোটে নাই। শুনিলাম সে 'বিজনেস' করিতেছে। একদিন বাবার হাতে নগদ একশত টাকা আনিয়া দিল। তাহার সংসারের বোঝা টানিয়া আমাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, সে টাকাটা কিন্তু আমার কোন সাহায্যে আসিল না। বাবা মা তাহা দিয়া গরদ তসর প্রভৃতি কিনিলেন এবং বড়গলা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নাদু খুব বুদ্ধিমান ছেলে। ও যেরকম সদ্বিবেচক এবং চৌকশ, দেখতে দেখতে ও জীবনে উন্নতি ক'রে ফেলবে।' উন্নতি করিতেও লাগিল। তাহার চকচকে স্যুট বুট, তাহার দশ-আনা ছ'-আনা চুলের ছাঁট, মুখের লম্বা চওড়া কথা শুনিলে সত্যই মনে হইত সে যেন অনেক টাকা রোজগার করিতেছে। মুখে লাখ দু'লাখ ছাড়া কথাই ছিল না। ক্রেও হিসাবে

যাহাদের নাম উল্লেখ করিত তাহারা সকলেই ধনী লোক। 'নাতু একদিন বাবাকে বলিল, 'তোমরা যেরকম ন্যাস্টি (nasty) বাড়িতে আছ আমার বন্ধুবান্ধবদের এখানে আনতে লজ্জা হয়। দাদার উচিত একটা ডিসেণ্ট (decent) বাড়ি ভাড়া করা।' আমি তখন স্কুল মাস্টারি এবং অবসর সময়ে সাহিত্য-চর্চা করিয়া যাহা উপার্জন করিতাম তাহাতে ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলাইত না। আমি তখন যে বাসায় থাকিতাম তাহার মাসিক ভাড়া ছিল ত্রিশ টাকা। খান তিনেক ঘর, একটা ফালি বারান্দা, রান্না ঘর আর ভাঁড়ার ঘর। ভাগ্যে বাড়ির সামনে ছোট একটি মাঠের মতো ছিল। মাঠে কদমগাছও ছিল একটি। সকালে সেখানে ছায়া থাকিত। আমি খুব ভোরে উঠিয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া লেখাপড়া করিতাম। বাড়ির ভিতর বসিবার উপায় ছিল না। আমার মা, আমার স্ত্রী এবং নাতুর স্ত্রী, এই তিনজনের মধ্যে উচ্চকণ্ঠের বাদানুবাদ এত উচ্চগ্রামে উঠিত যে কাছে-পিঠে কাক চিল বসিতে পারিত না। এই শান্তির নীড়ে উভয়েরই শিশুসন্তানেরাও ক্রমশ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাদের ঐকতানে কণ্ঠ মিলাইল। আমি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু মুখে কিছু বলিবার উপায় ছিল না। একদিন শুনিলাম আমার ভাই নাকি গভীর রাত্রে মদ খাইয়া বাড়িতে ফেরে। বাবাকে সে কথা বলিলাম। মা-ও কাছে বসিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁহারা কথাটা জানেন। বাবা বলিলেন, 'ওকে আজকাল নানারকম পার্টিতে যেতে হয় তো। সেখানে মদ খাওয়াই রেওয়াজ। নাতু ভালো ছেলে বলেই যতটা পারে সামলে থাকে। ও কিছু নয়। ও কিছু নয়। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভালো রোজগার করছে, ও ঠিক উন্নতি করবে।' নাতু যে ভালো রোজগার করিতেছে এ খবর প্রায়ই শুনিতাম। কিন্তু আমি নিজে তাহার কোন প্রমাণ কোনদিন পাই নাই। তাহার পরিবারের সমস্ত খরচ আমিই বহন করিতাম, আমাকে কিন্তু সে একদিনও একটি পয়সা দেয় নাই। আমার আর এক আতঙ্কের কারণ ছিল আমার বোনেরা। আমার চারটি বোন, চারটিরই বিবাহ বাবা দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহপরবর্তী ঝামেলাগুলি আমাকে পোহাইতে হইত। অন্য সময়ে তাহারা আমার কোন খবর লইত না। আমাকে তাহাদের মনে পড়িত তত্ত্বের সময়। পূজার এবং জামাইষষ্ঠীর পূর্বে তাহারা চিঠি লিখিত। তাহাতে প্রায় প্রতিবারই উল্লেখ থাকিত তত্ত্ব যেন ভালো করিয়া করা হয়, তা না করিলে শ্বশুরবাড়িতে তাহাদের মানরক্ষা হইবে না। প্রতিবারই কর্জ করিয়া তাহাদের মানরক্ষা করিবার জন্য আমাকে টাকা পাঠাইতে হইত। আমাদের বাঙালী সমাজে আরও সব অদ্ভুত নিয়ম আছে। মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে কেহ মরিলে তাহাদের ঘাটে উঠিবার জন্য কাপড় বাপের বাড়ি হইতে আসিবে। অনেকবার ঘাটে উঠিবার জন্য কাপড়ের মূল্য পাঠাইয়াছি। মূল্য তাহাদের মনোমত না হওয়ায় রূঢ় ভাষায় চিঠি লিখিয়া অনেক সমালোচনাও তাহারা করিয়াছে। আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের দৈনন্দিন জীবন-পথে যে অসংখ্য নিষ্ঠুর কুশাঙ্কুর প্রত্যহ সকলের পদকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিতেছে, আমাকেও

তাহারা রেহাই দেয় নাই। আমি মাত্র দুই-একটা উদাহরণই দিলাম, এরূপ উদাহরণ অনেক আছে। উদাহরণের ফর্দ দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন অধিকাংশ চক্ষুলজ্জাসম্পন্ন ভদ্র মধ্যবিত্ত-সন্তানের মতো আমিও রক্তাক্ত চরণের নিদারুণ ব্যথা গোপন রাখিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়াছি। আমি অন্যায়কে অন্যায় বলিতে পারি নাই, অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সাহস আমার ছিল না। ছিল না, কারণ যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব তাহারা আমার নিতান্ত আপন লোক। তাহাদের সহিত প্রকাশ্যে কলহ করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরের পতাকাও আস্ফালন করিবার সাহস ছিল না আমার। যাহাদের আমরা ছোটলোক বলি তাহাদের আছে। তাহারা খোলা রাস্তায় দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে কোলাহল করিয়া ঝগড়া করে। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যায়ের বিরুদ্ধেই গলাবাজি করিয়া প্রতিবাদ জানাইতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর হয়তো কর্কশ, বলিবার ভঙ্গীও হয়তো মনোরম নয়, কিন্তু তাহাদের বক্তব্যে অসার কিছু নাই। আমি কিন্তু ভদ্রলোক, বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ খুলিতে পারি নাই। সহ্য করিয়াছি। সহ্যের সীমা বারবার অতিক্রান্ত হইয়াছে, তবু সহ্য করিয়াছি। প্রথম জীবনটা বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। স্কুল মাস্টার, অতি সামান্য বেতন পাইতাম। লিখিয়াও তখন কোন টাকা পাওয়া যাইত না। লেখা ছাপা হইলেই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতাম। বাবা মাঝে মাঝে বলিতেন, 'ওসব বাজে লেখা না লিখে প্রাইভেট টিউশনি কর। তা করলে দুটো পয়সার মুখ দেখবে।' কিন্তু উপদেশ দিয়া নেশা ছাড়ানো যায় না। সাহিত্য-চর্চা করা আমার নেশা। উহাই আমার জীবনের একমাত্র আকাশ যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে ডানা মেলিতে পারি।

আমি গভর্নমেণ্টের চাকরি করিতাম। কিছুদিন পরে ভগবান আমার উপরে দয়া করিলেন। আমি চাকরিতে কিছু উন্নতি লাভ করিয়া অন্যত্র বদলি হইয়া গেলাম।

বাবাকে বলিলাম, "নাদু যখন এখানে বিজনেস করছে তখন ও এই বাসাতেই থাক, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে ফ্রি কোয়ার্টার্স পেয়েছি।"

"এখানকার সংসার খরচ কে চালাবে?"

"নাদু যখন রোজগার করছে নাদুই চালাক।"

"আর আমরা?"

"তোমরা যা খুশি করতে পার। এখানে থাকতে চাও এখানেই থাক, কিংবা আমার সঙ্গে যেতে চাও তো চল আমার সঙ্গে।"

আমি যেখানে বদলি হইয়াছিলাম সেখান হইতে গঙ্গা বহুদূর। তিন দিনের পথ।

মা বলিলেন, "আমি গঙ্গাহীন দেশে যাব না।"

আমার বাসাটি গঙ্গার ধারে ছিল। মা সেটি ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। আমি একাই একদিন সপরিবারে আমার নূতন কর্মস্থলে যাত্রা করিলাম। জীবনে সেই প্রথম নিজের পরিবার (অর্থাৎ আমার স্ত্রী এবং পাঁচটি সন্তান) লইয়া দূর বিদেশে আমার

আলাদা সংসার শুরু হইল। ভাবিয়াছিলাম সুখী হইব। কিন্তু সুখী হই নাই। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য তো ছিলই, তাহাই আসল কারণ।

আমি আসিতে না আসিতেই বাবার একটি পত্রও আমার পিছু পিছু আসিয়া হাজির হইল। তাহাতে যদিও স্পষ্টভাবে তিনি তেমন কিছু লেখেন নাই কিন্তু তাঁহার চিঠির ভাবে বুঝিলাম মাসে মাসে তাঁহার এবং মায়ের হাত-খরচের জন্য আমি যদি কিছু কিছু পাঠাই তাহা হইলে তিনি সুখী হইবেন। পিতামাতাকে সুখী করা প্রত্যেক সন্তানেরই কর্তব্য। আমি প্রত্যেক মাসে তাঁহাদের কিছু টাকা পাঠাইয়া দিতাম। তাঁহারা আমার দিকটা দেখেন না কেন এ ভাবিয়া মাঝে মাঝে দুঃখ হইত, কারণ আমার বোনেদের তত্ত্ব প্রভৃতির ভারও আমাকে তাঁহাদের নির্দেশে বহন করিতে হইত। বাবা লিখিয়াছিলেন নাদু যাহা রোজগার করে তাহাতে সংসারই নাকি ভালোভাবে চলে না। সে খুব সদ্বিবেচক এবং দূরদর্শী বলিয়া রোজগারের অধিকাংশ টাকাই নাকি ব্যবসায়েতেই নিয়োগ করিয়াছে। অনেক পরে অবশ্য জানিয়াছি 'ফপরদালালি' করাই তাহার প্রধান 'বিজ্‌নেস্' ছিল। একটা ধনী মাড়োয়ারি কণ্ট্রাক্টারের মোসায়েব হইয়াছিল সে। সেই তাহাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা বখশিস হিসাবে দিত, সেই তাহার রোজগার। শেষে সে কোথায় একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাহার বউটার তখনও কিছু রূপ-যৌবন ছিল, সেও একদিন তাহার ছেলে-মেয়েদের ফেলিয়া এক মুসলমানের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল। এ আঘাত মায়ের বুকে সহিল না, অল্পদিন পরেই তিনি মা-গঙ্গার শীতল জলে তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইলেন। বাবা সব ছাড়িয়া কাশী চলিয়া গেলেন। শেষ জীবনে তিনি প্রায় নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কাছে ছোট একটা ঘর ভাড়া লইয়া থাকিতেন। নানা মন্দিরের প্রসাদই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। আমার নিকট তিনি আর টাকা চাহেন নাই। তবু আমি তাঁহাকে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। মনিঅর্ডার ফেরত আসিল। কয়েকদিন পরে বাবার একটি চিঠিও পাইলাম। লিখিয়াছেন, 'আমার আর টাকার প্রয়োজন নাই। আমি যে পেন্সন পাই তাহাতেই আমার কুলাইয়া যাইবে। তোমার বোনদেরও আর তত্ত্বের জন্য প্রতিবছর টাকা পাঠাইতে হইবে না। আমি তাহাদের লিখিয়া দিয়াছি যে আমি অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি আর তোমাদের টাকা পাঠাইতে পারিব না। যতদিন তোমার মা বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন পাঠাইয়াছি, না পাঠাইলে তিনি মনে কষ্ট পাইতেন। তবে তোমাকে একটা অনুরোধ করিতেছি, যদি পার সুশীলাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাইও। সে সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে। তাহার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। শ্বশুরের অবস্থা ভালো নয়, রোজগেরে স্বামী মরিয়া গেল। বৈধব্য-যন্ত্রণার উপর দারিদ্র্য-যন্ত্রণা তাহাকে পিষিয়া ফেলিতেছে। বাবা, তাহাকে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিও। বিশ্বেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।' বাবার আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করিয়াছি। বাবাকে বার বার আমার কাছে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম,

কিন্তু তিনি আর আসেন নাই। কাশীতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কী শোচনীয় সে মৃত্যু! কখন কিভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কেহ জানিতে পারে নাই। আমরা সভ্য মানুষ, সমাজ গড়িয়া বাস করি বটে, কিন্তু প্রতিবেশীর খবর লওয়া প্রয়োজন মনে করি না। আমার বাবার মৃতদেহ ঘরে তিন দিন পড়িয়াছিল। যখন পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল তখন তাঁহার প্রতিবেশীর টনক নড়িল। তিনি বাবার ঘরের কপাট ভাঙিয়া শবদেহ আবিষ্কার করিয়া কি করিলেন জানেন? সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন না, নিজের গা বাঁচাইবার জন্ত পুলিসে খবর দিলেন। আইনত হয়তো তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী আইন ছাড়া অন্য আইন কি তাঁহার জানা ছিল না? আমার ঠিকানা-লেখা চিঠি বাবার ঘরে ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে কি আমাকে টেলিগ্রাম করিতে পারিতেন না? তিনি শিক্ষিত বাঙালী ব্রাহ্মণ, এই সামান্য সৌজন্যটুকু কি তাঁহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না? কিন্তু না, সে সৌজন্য তিনি প্রকাশ করেন নাই। পাছে বিপদে পড়েন এই ভয়ে কেবল পুলিসে খবর দিয়াছিলেন। পুলিসও কর্তব্যে ত্রুটি করে নাই। বাবার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া অবশেষে ডোমের হাতেই তাহারা সেটাকে সমর্পণ করিয়া আইনের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। আমি বার বার বাবাকে চিঠি লিখিয়া এবং অবশেষে টেলিগ্রাম করিয়া যখন কোন জবাব পাইলাম না তখন নিজে গেলাম। গেলাম তাঁহার মৃত্যুর এক মাস পরে। সেখানে গিয়া নিদারুণ সংবাদটা শুনিলাম। তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি কিন্তু একটি সৎকার্য করিয়াছিলেন। তিনি বাবার ট্রাঙ্কটি নিজের ঘরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। বাবা ট্রাঙ্কে কখনও চাবি দিতেন না। আমিও গিয়া খোলা ট্রাঙ্কই পাইলাম। ট্রাঙ্কে একটিও জামা কাপড় ছিল না। কিছু পুরানো চিঠিপত্র ছিল আর ছিল মায়ের একখানা বিবর্ণ ফোটো। মায়ের বধূবেশ। মায়ের এ ফোটো আগে কখনও দেখি নাই। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম—একটি কমবয়সী মেয়ে হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছে, অঙ্গে বধূবেশ, চক্ষে অনন্ত আশা। এই সুন্দরী বালিকা যে আমার মা তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু বাবা ফোটোর পিছনে মায়ের নাম এবং ফোটো লইবার তারিখটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আরও লিখিয়াছিলেন, 'বিবাহের ঠিক পরদিন এ ফোটো তোলা হইয়াছিল।' এ ফোটো আমরা কখনও দেখি নাই। মায়ের কোন ফোটোই আমাদের বাড়িতে ছিল না। সেকালে ফোটো তোলানো একটা লজ্জাকর ব্যাপার ছিল। সন্দেহ হইল বাবা সম্ভবত বিবাহের পরদিন গোপনে এ ফোটো তোলাইয়াছিলেন। একটা অদ্ভুত মাধুর্যে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ প্লাবিত হইয়া গেল। ফোটোটার দিকে অনেকক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম।

"ফোটোটি কার?"

চমক ভাঙিল, দেখিলাম সেই প্রতিবেশী ভদ্রলোক আমাকে স্মিতমুখে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

"আমার মায়ের।"

"ও, বাক্সের ভিতর ছিল বুঝি!"

হঠাৎ নজরে পড়িল ভদ্রলোকের গায়ে বাবারই একটা কোট রহিয়াছে। কালো খদ্দরের কোট। কোটটা আমিই তাঁহাকে করাইয়া দিয়াছিলাম। নির্বাক হইয়া গেলাম। সহসা যেন ব্যাপারটা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল।

"নমস্কার। চললুম।"

বাক্সটা লইয়া চলিয়া আসিলাম।

"আমারও ওই রকম ব্যাপার হয়েছিল। আমার বাবার খবর অবশ্য আমি জানতাম না, এখনও জানি না, মাকে চিনতাম। আমার শৈশবে মা-ই আমার সব ছিল।"

দেখিলাম সেই লোম-ওঠা কুকুরটা আবার গেটের সামনে আসিয়া বসিয়াছে।

চাকরটা সোৎসুকে আমার দিকে চাহিল। ভাবটা, এটাকে সত্যই ওখানে বসিতে দিব না কি? তাহার নীরব দৃষ্টির অর্থ বুঝিলাম।

"ওকে তাড়াস নি। ও থাক ওখানে। দেখিস অন্য কুকুর যেন না আসে। আর দেখ, ভিতর থেকে কিছু খাবার এনে ওটাকে ভিতরেই ডেকে নিয়ে আয় বরং।"

ভিখন উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। তাহার চোখ-মুখে একটা হাসির আভাসও ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম। কিন্তু সে প্রভুভক্ত ভৃত্য, একটি কথা কহিল না। বাড়ির ভিতর হইতে খান দুই রুটি আনিয়া গেট খুলিয়া কুকুরটাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, কুকুরটা আসিল না।

আমার দিকে চাহিয়া বলিল,"আমি রাস্তার খেঁকি কুকুর, আমি রাস্তাতেই থাকব। গেট দিয়ে তোমার খোঁয়াড়ে ঢোকবার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। আমি তোমার 'জিমি'র প্রণয়ী বটে, সত্যিই আমি তাকে অহরহ প্রেম নিবেদন করছি। কিন্তু আমি আমার প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করবার জন্য তোমার ওই প্রাসাদরূপী জেলখানায় ঢুকতে রাজি নই। আমার প্রেম যদি সত্য হয় তাহলে ওই জিমিই নেমে আসবে আমার কাছে পথের ধূলায়। তোমাদের আধুনিক উপন্যাসে তো এ কাণ্ড হরদম হচ্ছে আর সে সবের সিনেমা দেখে তোমরা বাহবা বাহবাও করছ। আমার বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন। তোমার ও খাবারও আমি তোমার গেটের মধ্যে ঢুকে খাব না। শহরে অনেক ডাস্টবিন আছে তার কোনটা না কোনটা থেকে আমার আহার জুটিয়ে নিতে পারব। এখন অবশ্য আমার খিধেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, তোমার রুটি দুটো পেলে ভালো হ'ত। কিন্তু তোমার ও গেটে আমি ঢুকছি না. যদি সত্যিই দিতে চাও, ছুঁড়ে দিতে বল।"

আমি ভিখনের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম সে কুকুরের একটি কথাও বুঝিতে পারিতেছে না। কল্পনা দেবীর কৃপাতেই সম্ভবত আমি এ শক্তি লাভ করিয়াছি।

"রুটি দুটো ছুঁড়েই দে। ও ভিতরে আসবে না।"

রুটি দুইটা ছুঁড়িয়া দিতেই সে গপ গপ করিয়া খাইতে লাগিল। সেই ষণ্ডা কুকুরটা বোধহয় আশেপাশেই ছিল, রুটি ছুঁড়িয়া দিতেই সে ছুটিয়া আসিয়া স-বিক্রমে খেঁকিটাকে তাড়া করিয়া গেল। কিন্তু ভিখন থাকাতে বিশেষ সুবিধা করতে পারিল না। ভিখন একটা ইট তুলিয়া তাহাকে কাছে আসিতে দিল না।

"ওটাকে তাড়িয়ে দে এখান থেকে।"

ভিখন লাঠি উঁচাইয়া কুকুরটাকে পাড়া-ছাড়া করিল। লাঠি দেখিয়া লোম-ওঠা খেঁকি কুকুরটা কিন্তু একটুও বিচলিত হইল না। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে আমি তাহার রক্ষক।

রুটি দুখানা শেষ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ। মনে হইল তাহার চোখের দৃষ্টিতে শাণিত ব্যঙ্গ চকমক করিতেছে।

"আমাকে দুখানা রুটি দিয়েছ বলে মনে কোরো না যে আমি তোমার মন রেখে কথা বলব। আমি জীবনের সব চেয়ে নীচু ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি, এর পর জীবনের আর কোন ধাপ নেই, এর পরই মৃত্যু। সুতরাং কারো মন রেখে চলবার আর আমার প্রয়োজন নেই। চরম দুঃখকে বরণ ক'রে আমি পথের ধূলার সিংহাসনে বসেছি। এখানে আমি রাজা। সুতরাং রাজার মতো স্পর্ধিত সুরেই কথা বলব। একটু আগে তুমি তোমার বাবার শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভাবছিলে, সে কথা আমি টের পেয়েছি। কি ক'রে পেয়েছি তার বিবরণ দিতে আমি অক্ষম। তোমরা রেডিও খুলে অনেক দূরের খবর শোন। আমাদের প্রত্যেকেরই মনে তেমনি একটা রেডিও আছে, তার সাহায্যে আমরা অনেকের মনের কথা টের পাই। যে যত দরিদ্র তার মনের রেডিওটা তত ভালো। আমি দরিদ্রতম তাই আমার মনের রেডিওটা নিখুঁত। তোমার মনের সব কথা আমি টের পাচ্ছি। তোমার বাবার কথা শুনে আমারও মায়ের কথা মনে পড়ল। আমার বাবার খবর আমি জানি না, কারণ আমার বাবা কে ছিল তাই আমার জানা নেই। সেজন্য লজ্জিতও নই আমি। তোমাদের সমাজেরও অনেক বড় লোকের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত। তোমরা সেজন্য লজ্জিত নও, অনেক সময় তাদের মহিমায় তোমরা গৌরবান্বিত। শুধু অতীতে নয়, বর্তমানেও তোমাদের সমাজের অনেক আলোক-প্রাপ্তা নারীরাও জারজ সন্তান প্রসব করেন। এসব সন্তানকে মৃত অবস্থায় অনেক সময় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছি। দু'একটাকে আমি খেয়েওছি। এ ধরনের অনেক জারজ সন্তান অনাথালয়েও মানুষ হচ্ছে। আর এক ধরনের জারজ সন্তান আছে যারা আসলে জারজ হলেও তাদের পিতৃপরিচয় একটা আছে। তোমাদের সমাজে নপুংসক গর্দভের অভাব নেই, তারা নিজেদের স্ত্রীকে বিক্রি ক'রে পয়সা রোজগার করে আর স্ত্রীর গর্ভের জারজদের পিতা বলে সমাজে পরিচিত হয়। আমাদের সমাজে এসব ভণ্ডামি নেই। বিয়ের নলচে আড়াল দিয়ে আমরা প্রেমের তামাক খাই না। আমরা যা করি খোলাখুলিই করি। সব কুক্কুরীই স্বয়ংবরা। শুনেছি মানবসমাজে

কোথাও কোথাও আমাদের নীতিই চলছে এখন। তোমাদের বড়'বড় কবি—যেমন শেলী, বায়রণও আমাদের দলের লোক। ওঁরা অবশ্য প্রেমের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন শুনেছি, কিন্তু ওসব কবিতা আমরা বুঝি না. কার্যতঃ ওঁরা যা করেছেন তার সঙ্গে মোটামুটি আমাদের মিল আছে এই ভেবেই আমরা পুলকিত। তুমি হয়তো ভাবছ আমি সামান্য খেঁকি কুকুর হ'য়ে এত কথা জানলাম কি ক'রে? জানব না? তোমাদের সঙ্গে অনেকদিন ধরে আছি যে আমরা। তোমাদের নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। সম্রাট যুধিষ্ঠির কুকুরকে ছেড়ে স্বর্গে পর্যন্ত যেতে রাজি হননি, সে কি এমনি? কুকুর যে কত মহৎ প্রাণী তা চিনেছিলেন তিনি। হ্যাঁ, কথায় কথায় অন্য কথায় এসে পড়েছি আমি। আমার মায়ের কথা বলছিলাম। এক বস্তিতে এক মুচির বাড়ির পিছনে একটা পোড়ো খোলার ঘরের নীচে আমার মা আমাদের প্রসব করেছিলেন। আমরা তিন ভাই দু বোন একসঙ্গে হয়েছিলাম। যতদিন চোখ ফোটে নি ততদিন সুখেই ছিলাম আমরা। মায়ের কোলের কাছে জড়াজড়ি ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতাম। মা মাঝে মাঝে আমাদের ছেড়ে উঠে যেতেন, বোধহয় খাবারের সন্ধানে। মাঝে মাঝে বাইরে মায়ের আর্ত চীৎকার শুনতে পেতাম। সভ্য মানুষ অচেনা কুকুরকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না, ঢুকে পড়লে তাকে মেরে দূর ক'রে দেয়, এই তোমাদের সমাজের চিরাচরিত প্রথা। যাকে পাঁচপাঁচটা শাবককে দুধ দিয়ে পালন করতে হয় তার ক্ষুধা যে কত সর্বগ্রাসী তা বিচার ক'রে দয়ালু হবার প্রবৃত্তি তোমাদের নেই। স্বার্থ ছাড়া আর কোন জিনিসটাই বা তোমরা দেখতে পাও। অথচ শুনেছি তোমাদের বেদান্তে নাকি আছে সর্বজীবেই এক ব্রহ্ম বর্তমান। একথা কি তোমরা মান? এই নীতি অনুসারে তোমরা কি নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত কর? আমি জানি কর না। আমাদের মতো তোমরা খেয়োখেয়ি করতেই ভালোবাস। স্বার্থ এবং হিংসার তাড়নায় তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের মতো লোককেও নাস্তানাবুদ করতে ছাড়নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সব জানি। লোম-ওঠা কুকুর হলেও তোমাদের সব খবর রাখি। পরের হাঁড়ির খবর রাখা এবং পরচর্চা করা যদি সভ্যতা হয়, তাহ'লে আমিও তোমাদের চেয়ে কম সভ্য নই। হ্যাঁ, আর একটা কথা। এখন আমাকে লোম-ওঠা দেখছ, কিন্তু বরাবর আমি লোম-ওঠা ছিলাম না। আমার বাবা সম্ভবত স্প্যানিয়েল বংশজাত কোনও ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর আভিজাত্যের কিছু চিহ্নও আমার অঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছিল। অর্থাৎ আমারও গায়ের লোম একটু বড় বড় এবং ঈষৎ কোঁকড়ানো ছিল, কানও ঝোলা ছিল একটু, পুচ্ছপ্রান্তেও ঝালরের মতো বাহার ছিল। দেখতে খুব খারাপ ছিলাম না আমি। আমি যখন যুবক ছিলাম তখন অনেক কুক্কুরী সুন্দরীর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছি। শুধু কুক্কুরী নয়, অনেক মানুষও আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সে আর এক মজার ইতিহাস। ওরে বাবাঃ, এ কি—"

কুকুরটা ছুটিয়া পলাইল গেল। দেখিলাম কয়েকটা ছোঁড়া গুলতি লইয়া কুকুরটার পিছু পিছু ছুটিতেছে। ভিখনও লাটি উঁচাইয়া আগাইয়া গেল।

"এই লোণ্ডা সব, বাবুকা কুত্তা হে, নেই মারো।" (এই ছোঁড়ারা, বাবুর কুকুর, মেরো না।)

একটা ছোঁড়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, "মারব না ? নিশ্চয়ই মারব। ওই হতভাগা কুকুরটা কাল রাত্রে আমাদের হাঁড়ি খেয়েছে। বাসী মাংস ছিল সমস্ত সাফ ক'রে দিয়েছে চেটেপুটে। আর পালাতে ওস্তাদ কি রকম, বাঁই বাঁই ক'রে ছুটল ব্যাটা—"

ছোঁড়াটাকে ডাকিয়া বলিলাম, "কত মাংস কিনেছিলে তোমরা।"

"আধ সের কিনেছিলাম, তিনজনে খেয়েছি। আরও খানিকটা ছিল, আজ সকালে ভাত দিয়ে খেতাম। কিন্তু ঐ শ্লা কুকুর সব খেয়ে গেছে।"

হাফপ্যাণ্ট-পরা ছেঁড়া-গেঞ্জি-গায়ে ছেলেটাকে চিনিতাম। আমাদেরই পাড়ার আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের ছেলে। তার মুখে 'শ্লা' আর দন্ত্য 'স'-এর সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিয়া একটু দমিয়া গেলাম। কিন্তু সে ভাবটা গোপন করিতে হইল। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "ও, তাই না কি! ভারী পাজী কুকুর তো। যাই হোক কুকুরটাকে মেরো না। ওর নানা পোজের ফোটো তুলছি আমি। ওকে আমার গেটের সামনে বসিয়ে রাখা দরকার।"

"ওই লোম-ওঠা কুকুরের ফোটো তুলছেন কেন ?"

"কাগজে পাঠাব।"

"ওর ফোটো কাগজে ছাপবে ?"

"ছাপবে।"

"ওর ফোটো কাগজে ছাপিয়ে কি লাভ! ও নেতাও নয়, ফিলিম স্টারও নয়, স্পোর্টস্‌ম্যানও নয়, লেখকও নয়। ওই ছিঁচকে খেঁকি কুকুরের ফোটো ছাপিয়ে কি হবে ?"

"কিছু পয়সা হবে আমার।"

"কিন্তু ও যে আমাদের মুখের গ্রাসটুকু চুরি ক'রে খেয়ে ফেলল, তার কি"—

"তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তাহলে তোমাদের খাওয়ার জন্য একসের মাংসের দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

হ্যাংলার মতো লোলুপ হইয়া উঠিল ছেলেটা।

"আপনি দেবেন ? সত্যি বলছেন ?"

"দেব।"

"ভাল মাংসের সের কিন্তু চার টাকা করে আজকাল।"

"তাই দেব।"

"আরও এক টাকা দিতে হবে। ঘি মসলা-টশলা লাগবে তো। এক টাকায় হবে কি না সন্দেহ—"

"বেশ, আরও দু'টাকাই দেব। এই নাও—"

পকেট হইতে ছয়টি টাকা বাহির করিয়া তাহাদের দিলাম।

"ও কুকুরটাকে কিন্তু তোমরা মেরো না। ওকে আমার গেটের কাছে বসতে দিও। আর একটা কাজ যদি করতে পার তাহলে আরও ভালো হয়।"

"কি বলুন ?"

"এ পাড়ার কুকুরগুলো ওকে তাড়া করে আসছে। তোমাদের হাতে তো গুলতি রয়েছে, সেগুলোকেও যদি ঠেকিয়ে রাখতে পার—"

"নিশ্চয় পারব। সব শ্লাকে এখুনি দূর ক'রে দিচ্ছি। ওরে ঘোঁতা, তোদের মোষটাকে বেঁধে রাখিস—"

"মোষ কি কুকুরের নাম ?"

ঘোঁতা বলিল, "হ্যাঁ। মোষের মতো ঘুমোয় বলে খুড়িমা ওর নাম মোষ রেখেছেন। এদিকে খুব তেজী, কোন কুকুরকে পাড়ায় ঘেঁষতে দেয় না। আমি ওর নাম শের রেখেছিলাম। কিন্তু কাকাবাবু ভয়ানক গোঁড়া কিনা, বললেন, ও সব মুসলমানী নাম চলবে না। আমি বাঘা রাখতুম, কিন্তু পাশের বাড়ির কুকুরটার নাম বাঘা। খুড়িমা বললেন, ওর নাম 'মোষ' থাক। বেঁধে দিতে বলছিস, কিন্তু বাঁধলে ভয়ানক চেঁচাবে। তাছাড়া আমাদের চেনও তো নেই। দড়ি দিয়ে বাঁধলে ছিঁড়ে ফেলবে। আচ্ছা, এক কাজ করব, আমাদের পিছনের বাড়িটার ভাড়াটে উঠে গেছে, সেইখানে ওটাকে বন্ধ করে শেকল তুলে দেব বাইরে থেকে। আমাদের মাংসের ভাগ দিতে হবে কিন্তু।"

"নিশ্চয়।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে নগদ ছয় টাকা হাতে পাইয়া ছেলের দল উল্লসিত হইয়া চলিয়া গেল। আপনারা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন আমি এমন ভাবে ফট্ করিয়া ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিলাম কেন। শুনিয়া রাখুন, আমি এখন বড়লোক হইয়াছি, টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারি। প্রথম জীবনটা খুব কষ্টে কাটিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আমার বেশ পয়সা হইয়াছে। কি করিয়া হইল তাহা পরে বলিতেছি। ওই লোম-ওঠা কুকুরটা আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। উহার সব কথা আমাকেই শুনিতেই হইবে। এজন্য আমাকে যদি কিছু পয়সা খরচ করিতে হয় আমি করিব। আমার পয়সা হইয়াছে একথা শুনিয়া আপনারা বোধহয় আশ্চর্য হইলেন। এক হিসাবে আশ্চর্য হইবার কথাই, আমার মতো স্কুলের মাস্টারের আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা যে যুগের মানদণ্ড লইয়া হিসাব করিতেছেন সে যুগও নাই, সে মানদণ্ডটাও বদলাইয়াছে! সে মানদণ্ডকে আঁকড়াইয়া থাকিলে আমি বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম। আমি সাধু, আমি চরিত্রবান, আমি সনাতন ভারতবর্ষের শুভ্র আদর্শকে আঁকড়াইয়া শত কষ্ট সহ্য করিয়া অনাহারে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছি এই সত্য কথাটুকুও লোকের মনে থাকিত না। লোকের উপহাস কুড়াইয়া, মাথায় গ্লানির বোঝা

বহিয়া আমি নিঃশব্দে হয়তো নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম। অনেকে হয়তো তাহাই বরণীয় মনে করিবেন, কিন্তু আমি পারি নাই। যেদিন চিকিৎসা-বিভ্রাটে আমার ছোট কন্যাটি অকালে মারা পড়িল সেদিনই বুঝিতে পারিলাম কোন্ যুগে বাস করিতেছি। দরিদ্র স্কুল মাস্টারের পক্ষে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করানো অসম্ভব। ডাক্তারবাবু অবশ্য ফী লইতেন না। কিন্তু ঔষধের যে প্রেসক্রপশন লিখিতেন তাহার দাম প্রেসক্রপশন-পিছু প্রায় আট-দশ টাকা। মাসাবধিকাল ঋণভারে জর্জরিত হইয়া তবু চিকিৎসা চালাইয়া যাইতেছিলাম। একদিন একটা ইন্জেকশন দিবার পরই আমার মেয়েটি মারা গেল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, ও ইন্জেকশনে মারা যাইবার কথা নয়। সম্ভবত উহাতে ভেজাল আছে। ডাক্তারবাবু আমাকে দিয়া আর এক শিশি উক্ত ঔষধ কিনাইয়া তাহা কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য সরকারি ল্যাবরেটরিতে পাঠাইলেন। কিছুই হইল না। রিপোর্ট আসিল ঔষধ ঠিকই আছে। শুনিলাম ঔষধ-বিক্রেতা খুব ধনী লোক, কয়েকখানি মোটর এবং বাড়ি আছে তাঁহার, দেশের গণ্যমান্য প্রভাবসম্পন্ন অনেক ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তাও আছে, সুতরাং তিনি অনায়াসে দিনকে রাত অথবা রাতকে দিন করিতে পারেন। টাকার মুদ্গরে সত্য-শিব-সুন্দরকে জখম করিয়া অবাধে স্বেচ্ছাচার চালাইয়া যাইবার ক্ষমতা তিনি অর্থবলে অর্জন করিয়াছেন। আমরা গরীবরা দূর হইতে তাঁহাদের সেলাম করিয়া ধন্য হইতে পারি, আর কিছু করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ যে সমাজে বাস করিতেছি সে সমাজে টাকাই ক্ষমতা, টাকাই মান, টাকাই যশ, টাকাই প্রতিভার নিদর্শন।

দিন কয়েক পরে একটা সুযোগও জুটিয়া গেল। আমাদের স্কুলে এক ধনীসন্তান আমার ছাত্র ছিল। ওরূপ 'গবেট' এবং সর্ব বিষয়ে বখা ছেলে দেখা যায় না সাধারণত। তাহার বাবা একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি ছেলেটির টিউশনির ভার নিন। যা মাইনে চান দেব, আর ছেলেটিকে যদি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেব।"

অবাক হইলাম।

"আপনি ও ছেলেকে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করাতে চাইছেন কেন? ওর লেখাপড়া ক'রে লাভই বা কি, আপনার অতবড় ব্যবসাতেই ওকে বসিয়ে দিন না—"

"আরে সে তো দেবই। লেখাপড়ার দরকার নেই, ডিগ্রীর দরকার। আসল কথা তবে খুলে বলি। এক কোটিপতির একমাত্র মেয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করছি। মেয়ের বাবা বলেছে আমার জামাই অন্তত বি. এ. পাস হওয়া চাই। আপনি ম্যাট্রিকের বেড়াটা তো পার করে দিন, তারপর বাকিটা আমি ঠিক করে নেব। আর আপনিই যদি সে ভার নেন তাতেও আমি রাজি। কত টাকা নেবেন সেটাও ফয়সালা করে নিন। আমি এক কথার মানুষ, হিমালয় নড়তে পারে কিন্তু আমার কথা নড়বে না। কথা নড়লে এত টাকার কারবারকে চালু রাখতে পারতাম না।"

বলিলাম, "মেয়ের বাপ কি অতদিন অপেক্ষা করবে ? বি. এ. পাস করতে আরও বছর পাঁচেক লাগবে অন্তত। প্রতি বছরই যদি পাস করে অবশ্য।"

"মেয়ের বয়স এখন দশ বছর। মা-মরা মেয়ে। বাপের একটি মাত্র সন্তান। বাপ আর বিয়ে করেনি। তার ইচ্ছে শিক্ষিত একটি ছেলের হাতে মেয়েটিকে দিয়ে ছেলেটিকে তার বিষয়ের উত্তরাধিকারী করবে। আমার ছেলের চেহারাটি তো দেখেছেন—কন্দর্পকান্তি রাজপুত্র। মেয়ের বাপের ভারি পছন্দ হয়েছে ওকে। আমাকে বলেছেন ও যদি লেখাপড়াতেও ভালো হয়—অন্তত বি. এ. টাও পাস করে তাহলে ওর সঙ্গেই আমি রূপুর বিয়ে দেব। আমি পাঁচ ছ' বছর অপেক্ষা করতে রাজি আছি। সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম, এখন আপনি যদি ওর বি. এ. পাসের গ্যারান্টি দেন আমি নিশ্চিন্ত হব। কত টাকা চান বলুন—"

সেই প্রথম অধঃপতনের (আধুনিক বিচারে উন্নতিও বলিতে পারেন) প্রথম ধাপে পা দিলাম। সাধারণ বাঘ মানুষ-খেকো বাঘে রূপান্তরিত হইল। যত ধরনের এবং যত রকমের জুয়াচুরি করা সম্ভব সবই করিতে লাগিলাম। প্রশ্নপত্র বলিয়া দিলাম, খাতা বদলাইয়া দিলাম, বন্ধু-পরীক্ষকদের অনুরোধ করিয়া নম্বর বাড়াইয়া দিলাম। আমার দলেও কয়েকজন শিক্ষক এবং পরীক্ষক জুটিয়া গেলেন। যৌথভাবে আমাদের কারবার চলিতে লাগিল। শুধু একটি ছাত্রকে নয়, অনেক ছাত্রকে আমরা এইরূপে ডিগ্রী-ভূষণে মণ্ডিত করিলাম। তাহার মধ্যে অনেকে এখন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, অনেকে বড় ব্যবসায়ী, অনেকে স্কুল কলেজের শিক্ষক। সকলেই আমার কাছে কৃতজ্ঞ, সকলেই আমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। ইহাদের সাহায্যেই আমার জীবন-পথের সমস্ত বাধা অপসারিত হইয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় আমার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটাও আশ্চর্যরকম বদলাইয়া গিয়াছে। এখন অন্যায়কেই ন্যায় বলিয়া গণ্য করি, ন্যায়বানকে মূর্খ নির্বোধ বলিয়া মনে হয়।

পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কলিকাতার অভিজাত-পল্লীতে একটি বাড়ি তুলিয়া ফেলিলাম। শিক্ষক হিসাবে আমার সুনাম রটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং রিটায়ার করার পরও ছাত্রের অভাব হইল না। বাড়িতে বসিয়াই অনায়াসে মাসে চার পাঁচ শত টাকা উপার্জন করিতে লাগিলাম।

আমার সাহিত্য-চর্চাও ছাড়ি নাই। সাহিত্য-চর্চা করিয়াও কিছু কিছু রোজগার করিতাম। কিন্তু সে রোজগার যৎসামান্য।

হঠাৎ নজরে পড়িল সেই লোম-ওঠা কুকুরটা আবার আসিয়া গেটের সামনে বসিয়াছে। আর আমার দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। তাহাতে স্পর্ধা, ব্যঙ্গ, ক্ষোভ, ধিক্কার সবই যেন মিশিয়া আছে। মনে হইল একটু অনুকম্পাও যেন আছে।

"আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যে তুমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ, তার জন্যে তোমাদের শাস্ত্র অনুসারে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার ঠিক উলটোটা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমিই ধন্যবাদার্হ কারণ আমি তোমার গেটের সামনে বসে তোমাকে তোমার লেখার খোরাক জোগাচ্ছি। এখানে বসার আমারও একটা গরজ আছে বটে, আমি আশা ক'রে আছি অদম্য অধ্যবসায় বলে আমি হয়তো তোমার জিমির হৃদয়-হরণ করতে পারব। কিন্তু সে গরজটা গৌণ। কারণ আমি তোমাদের কাব্য-বর্ণিত রোমিও, জগৎ সিংহ বা ওসমানের মতো একনিষ্ঠ প্রণয়ী নই। এখন আমার প্রেমের জগতে জিমিই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নয়—হালদার পাড়ার টুনি আছে, তোমার গলির ওপাশে বুলি আছে, সাহেব পাড়ায় (মানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ায়) খাঁটি আইরিশ টেরিয়ার ক্লিওপেট্রা আছে, তা ছাড়া রাস্তায় ঘাটে নামহীনা অনামিকার দল এত আছে যে তোমাদের বড়লোকদের মতো যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি মস্ত একটা হারেমই বানিয়ে ফেলতাম। কিন্তু তা করিনি, কারণ শুধু যে আমার ক্ষমতা নেই তা নয়, ওসব প্রবৃত্তিও নেই। হারেম বানিয়ে কি হবে? ওরকম একটা বিদঘুটে ঝঞ্ঝাট কাঁধে বয়ে বেড়ানোর কোন মানে হয়? তবে একথাটাও তোমার কাছে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে তোমার জিমিকেই আমার সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে। ওকে পেলে সত্যিই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। কিন্তু হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলাম, কথায় কথায় প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি। আমার মায়ের কথাটা শোন। তোমাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় very interesting. আমি আমার মায়ের কাছে বেশী দিন থাকিনি। একটু বড় হতেই আমার মা আমাদের ফেলে ফেলে চলে যেতেন, আর আমরা ব্যাকুলভাবে তাঁর পিছু পিছু ছুটতাম। হাসছ? তোমাদের সমাজেও কি এ রীতির প্রবর্তন হয়নি আজকাল? ছেলেমেয়েদের ফেলে মায়েরা আজকাল কি প্রজাপতির মতো সেজে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছেন না? তোমরা বল সায়েবদের কাছ থেকে তোমরা এটা শিখেছ। কিন্তু আমাদের সমাজে এ রীতি তো অনাদিকাল থেকে প্রচলিত। আর সায়েবদের সংস্পর্শে আসবার অনেক আগে তোমরা আমাদের সংস্পর্শে এসেছ। কে জানে হয়তো আমাদেরই নকল করেছ তোমরা। আর একটা জিনিসও প্রচলিত হয়েছে তোমাদের সমাজে। সুখের বিঘ্ন বলে অনেক মা আজকাল ছেলেমেয়েদের মেরেই ফেলছেন। তোমাদের খবরের কাগজে এসব খবর ছাপাও হচ্ছে। আশ্চর্য তোমাদের খবরের কাগজগুলো, তাতে তোমাদের মহত্ব, বীরত্ব, মহানুভবতার খবর কম বেরোয়, বেশী বেরোয় কেচ্ছা আর কেলেঙ্কারির খবরগুলো। কাল হিমুবাবুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঙা চাটতে চাটতে খবরের কাগজের আলোচনা শুনছিলাম। হিমুবাবুর দোকানে বহু বেকার ছোঁড়া এসে জোটে বিনাপয়সায় খবরের কাজ পড়বে বলে। তারা দেখলাম তোমাদের সমাজের নানারকম কেচ্ছা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে।

সেখানেই শুনলাম একজন ভদ্রনারী নাকি সুখের সন্ধানে ছেলে মেয়ে স্বামী সবাইকে হত্যা ক'রে স্বাধীনতার মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছেন। খুব ফলাও ক'রে ছেপেছে খবরটা। আমাদের সমাজেও এরকম ঘটে। আমরা যখন মায়ের পিছু পিছু ছুটতাম তখন মা মাঝে মাঝে খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে আমাদের কামড়ে দিত। পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা ক্রমাগত টেনে তার দুধ খাচ্ছে, মেজাজ কখনও ঠিক থাকে? বাচ্চাদের খেয়ে ফেলেছে এরকম খবরও শুনেছি। সেই অসামান্যা কুকুরটির সঙ্গে আমার আলাপ এবং প্রেম দুইই হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, 'বাচ্চা না খেয়ে করব কি। তখন যাঁর বাড়িতে থাকতাম তিনি অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক। পাছে আমার বাচ্চাগুলো ঘর থেকে বেরিয়ে চারিদিক নোংরা ক'রে ফেলে এই ভয়ে আমাকে আর আমার বাচ্চাগুলোকে একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন তিনি। শিকল তুলে দিয়েছিলেন বাইরে থেকে। আমাকে খাবার দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নি। সম্ভবত আমার অসতীত্বে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমাকে পুষেছিলেন বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু ধর্মাত্মা ছিলেন তো, আমি রাস্তায় বেরিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদ করি এটা মোটেই পছন্দ করতেন না। আমি কিন্তু তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম একদিন, এবং কিছুদিন পরে তিনটি বাচ্চাও উপহার দিয়েছিলাম তাঁকে। সম্ভবত এই জন্যেই আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে শেষে আমি আমার বাচ্চাগুলোকেই খেয়ে ফেললাম। কি করি! অনাহারে তো মরতে পারি না। কথায় কথায় আবার অবান্তর কথায় এসে পড়েছি। আমার মায়ের কথাটা বলাই হচ্ছে না। আমার মায়ের কথা অবশ্য খুব বেশী আমি জানি না। কারণ ছেলেবেলাতেই মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। আমাদের সমাজে খুব ছেলেবেলা থেকেই আমরা স্বাবলম্বী হই। মা যতদিন দুধ দিতে পারে ততদিনই তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন। দুধ বন্ধ হলে আমরাও বন্ধন-হীন, মায়েরাও স্বাধীন! সে স্বাধীনতা এত উদার যে তার কোন আব্রু নেই, দিগন্ত নেই, 'যা-খুশি-করতে-পার'-মার্কা স্বাধীনতা, তোমাদের শুদ্ধ ভাষায় বলতে পারি, অবাধ। এত অবাধ যে সে স্বাধীনতায় মায়ের সঙ্গে ছেলের প্রেম করবারও কোন বাধা নেই। এমন কি যৌন-সম্পর্কও চলতে পারে। মায়ের সঙ্গে ছেলের বা বাপের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক আমাদের সমাজে একমুখী নয়, বহুমুখী। মিথ্যা বিধি-নিষেধের বেড়া দিয়ে তাকে আমরা সীমাবদ্ধ করিনি। তোমরাও যখন সভ্য ছিলে, অর্থাৎ ভণ্ডামির আবরণ যখন তোমাদের কুৎসিত কদর্য, অস্বাভাবিক করে তোলেনি, অর্থাৎ তোমাদের সেই আদিম অকৃত্রিম বন্য সভ্যতায়, যার নামকরণ তোমাদের বৈজ্ঞানিক মহাপণ্ডিতেরা স্বর্ণযুগ না ক'রে প্রস্তরযুগ করেছেন, সেই যুগে তোমাদের মতিগতিও আমাদেরই মতো ছিল। তোমার চোখের দৃষ্টিতে যেন একটু ঘৃণার আভাস দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে তুমি যেন মনে মনে বলছ কি জঘন্য, কি কুৎসিত, কি অকথ্য অশ্রাব্য কথাই না বলছে কুকুরটা। তাহলে আর একটা কথা বলি শোন, তোমাদের আদিম প্রবৃত্তি এখনও সম্পূর্ণভাবে

মরেনি। তোমাদেরই অনেক বিজ্ঞানী একথা প্রমাণ করেছেন। ইডিপাসের গল্প তো তোমাদের সমাজে উচ্চাঙ্গের কাব্য বলে গণ্য, আর ইডিপাস কম্‌প্লেকসের বৈজ্ঞানিক তথ্য বার করে তো তোমাদের বিজ্ঞানীরা ধন্য। তোমাদের অনেক নামজাদা লেখকও তো এই নিয়ে গল্প লিখে নিজেদের অনন্যতা জাহির করেছেন আর তোমরা তাঁদের ঘিরে বাহবা বাহবা করেছ। তোমরা ভুলে গেছ যে তোমাদের ওই অনন্যতাটা আসলে অনন্যতা নয়, আসলে ওটা আমাদেরই নকল। আমাদের অর্থাৎ যাদের দেখে তোমরা পশু বলে নাক সেঁটকাও তাদেরই নকল ক'রে তোমাদের যত বাহাদুরি। একটু আঁশটে গন্ধ না থাকলে তোমাদের গল্প কাহিনী জমে না। তোমাদের রামায়ণে মহাভারতে পুরাণেও এ আঁশটে গন্ধ আছে সুতরাং তোমার চোখের ওই ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি আমার কাছে হাস্যকর। তোমরা আমাদের চেয়েও খারাপ। একটা কথা বিশ্বাস করবে কি না জানি না। আমার মায়ের সঙ্গে আমার ওরকম সম্পর্ক কখনও হয়নি। এর জন্য আমি কোন প্রশংসা দাবি করছি না, হয়নি তার কারণ আমি সুযোগ পাইনি। আমার খুব ছেলেবেলাতেই আমার কোঁকড়ানো গায়ের লোম আর বাহারে ল্যাজের জন্য আমাকে মায়ের কাছ-ছাড়া হতে হয়েছিল। প্রথমেই পাড়ার একটা ছোঁড়া আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা দড়ি দিয়ে আমাকে নিজেদের বাড়ির উঠোনে বেঁধে ফেলেছিল। দু'দিনের বেশী অবশ্য সেখানে থাকিনি। নিজের শক্তিবলেই উদ্ধার পেয়েছিলাম সেখান থেকে। তুমি হয়তো ভাবছ ছোট কুকুর বাচ্চার আবার কতটুকু শক্তি থাকতে পারে? ছিল, চেঁচাবার শক্তি। ওই দু'দিন আমি এমন তারস্বরে এবং এত বিচিত্র রকম বিশ্রীসুরে চীৎকার করেছিলাম যে বাড়ির কর্তার মাথার শির ছিঁড়ে পক্ষাঘাত হয়ে গেল। তাঁর নাকি ব্লাডপ্রেসার ছিল। ডাক্তার এসে বললেন আমার চীৎকারই নাকি এর কারণ। সঙ্গে সঙ্গে লাথি মেরে আমাকে দূর ক'রে দিলেন কর্তার বড় ছেলে। রাস্তার কুকুর আবার রাস্তায় গিয়ে পড়লুম। মায়ের কথা একবার মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু মায়ের কাছাকাছি যাবার আর সুযোগ পাইনি। একটু পরেই আর একজনের পাল্লায় পড়লাম। একটা লিক্‌লিকে কালো গোছের ছোঁড়া এগিয়ে এল আমার দিকে। 'আ বাচ্চু আ আ' বলে পট ক'রে সে আমাকে তুলে বগলদাবা ক'রে ফেলল একেবারে। ফেলেই ছুটল পিছু দিকে চাইতে চাইতে। এ রাস্তা সে রাস্তা, এ গলি সে গলি পার হয়ে সে অবশেষে গিয়ে পৌঁছল শহরের শেষ প্রান্তে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়িতে।

"কে রে ভুতো এলি—"

নারী-কণ্ঠে কে যেন বললে ভিতর থেকে।

"হ্যাঁ মা, দেখ কি এনেছি। আসল স্প্যানিয়ালের বাচ্চা। বেচলে ভালো দাম পাওয়া যাবে। সে কুকুরটা কোথা?"

"সেটা হরিবাবুর ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি বাবা। অনেক ক'রে চাইছিল, হাজার হোক ওদের বাড়িতে চাকরি করি তো, 'না' বলতে পারলাম না।"

ভুতোর চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। থপাস ক'রে আমাকে উঠোনে ফেলে সে তেড়ে গেল মাকে। একেবারে দৌড়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধ'রে ফেলল তার।

"হারামজাদি, পরের ধনে পোদ্দারিগিরি করতে কে বলেছিল তোমাকে। ওটা কি কুকুর জানিস? আসল গ্রে-হাউণ্ডের বাচ্চা। ছুঁচলো মুখ, সরু ল্যাজ। সায়েব-পাড়া থেকে হাতিয়েছিলুম। তুই অমনি দানছত্তর খুলে বসলি?"

"ছাড় ছাড়, লাগে। দশটা টাকা দেবে বলেছে।"

"মাত্র দশ টাকা? অন্ততপক্ষে পঁচিশ টাকার মাল। পেডিগ্রি জোগাড় করতে পারলে আড়াই শ' তিন শ' টাকা। তুই দশ টাকায় দিয়ে দিলি, তা-ও ধারে।"

আর একটা হেঁচকা টান দিলে চুলের গোছায়। ভূতনাথ শেষ পর্যন্ত কি করতেন তা জানি না কিন্তু সে সুযোগ পেলেন না তিনি।

"হো-ই ভুত্‌থো, ঘর মে হ্যয়—বাহার নিকলো।"

ভুতো মাকে ছেড়ে তড়াক ক'রে বেরিয়ে গেল পাঁচিল ডিঙিয়ে।

কনেস্টবল প্রবেশ করল উঠোনে।

"ভুত্‌থো কাঁহা—"

"সে তো পরশু দিন মামার বাড়ি গেছে।"

"ঠিকানা বোলো।"

"কেন—"

"আব্‌ শশুরাল যাবে।"

তারপর কনেস্টবল বললে যে ক্যানিং স্ট্রীটে একজন বড়লোকের পকেট মারা গেছে। ল্যাংড়া বলে একটা 'পাকিট মার' ধরাও পড়েছে। ল্যাংড়া নাকি বলেছে যে তার সঙ্গে 'ভুত্‌থো'ও ছিল। মানিব্যাগটা নাকি ভুতোই পেয়েছে। এর পর কি হ'ল আমি জানি না। কারণ দরজাটা খোলা পেয়ে আমি আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল এইবার বুঝি স্বাধীনতা ফিরে পেলাম। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হ'ল না। তোমাদের সমাজে বেওয়ারিস কোন সুন্দর জিনিস বেশীক্ষণ রাস্তায় পড়ে থাকতে পায় না, তা কুকুর, মেয়েমানুষ, ঘড়ি, আংটি, খেলনা যা-ই হোক না কেন। তোমরা স্কুলে শেখ পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়েই পরদ্রব্য হস্তগত করবার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে ঘুরে বেড়াও। কেউ হ্যাংলার মতো, কেউ চোর হ'য়ে কেউবা আবার চোখ রাঙিয়ে। তোমাদের গুণের শেষ নেই। কিছুদূর যেতে না যেতেই আমি আর একজনের পাল্লায় পড়লাম। 'আঃ চু, চু, চু' বলে একটা ছোট ছেলে এগিয়ে এল। খুব ছোট। ছ'সাত বছরের বেশী হবে না। ছেলেটিকে খুব ভালো লাগল আমার। মনে হ'ল যেন আমার সমবয়সী। আমি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলুম। ভুতোর মতো সে আমাকে টপ ক'রে তুলে নিয়ে বগল-দাবা করলে না। সে কেবল তার ছোট্ট হাতখানি নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল আমাকে—আঃ আঃ, চু, চু, চু। আমিও তার পিছু পিছু

গেলুম। কিছুদূর গিয়ে ছেলেটা এক ছুটে কিছুদূর এগিয়ে গেল, তারপর আবার পিছু ফিরে ডাকতে লাগল আমাকে। আমিও যেতে লাগলাম তার পিছু পিছু। আমার ভয় হতে লাগল ভুতো আবার এসে আমাকে তুলে না নেয়। কিন্তু ভুতো আর আসেনি ? সে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল সম্ভবত। ছেলেটার পিছু পিছু অনেক দূর গেলাম। গিয়ে ঢুকলাম ছোট্ট একটা বাড়িতে।

"মা, মা, দেখ কেমন সুন্দর কুকুর বাচ্চা পেয়েছি একটা রাস্তায়।"

"ওমা, কি সুন্দর।"

একটি সুন্দরী বিধবা বেরিয়ে এলেন। ও রকম মাতৃমূর্তি আমি দেখিনি কখনও জীবনে। তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানি না কিন্তু আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে সর্বজীবেই মাতৃমূর্তির প্রকাশ এক এবং সুন্দর। আমার মা দুঃখে কষ্টে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে মাঝে মাঝে আমাদের কামড়ে দিত বটে কিন্তু তবু তার মুখে মাতৃমূর্তির যে অপরূপ ছবি আভাসিত হত তাই যেন পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ দেখলাম ওই বিধবাটির চোখে মুখে সেদিন। মনে হ'ল উনিই যেন আমার মা। তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন, আর তাঁর চোখ মুখ থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল আমার মনে হ'ল তা যেন অনবদ্য স্নেহের পরম প্রকাশ। আমি ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়লুম তাঁর পায়ের কাছে।

"ছুঁয়ে দিলি তো, ছুঁয়ে দিলি তো। আবার স্নান করতে হবে দেখছি। দেখি মুখখানি কেমন।"

আমাকে বুকে তুলে নিলেন আর আমার মুখটা নিজের মুখের কাছে এনে দেখলেন হাসিমুখে ভুরু কুঁচকে।

"খুব দুষ্টু দুষ্টু চেহারা দেখছি। ওমা গোঁফ পেকে গেছে দেখছি এর মধ্যে।"

ছেলেটি বললে, "পাকেনি। গোঁফের রংই ওইরকম। কালোয় শাদায় রং যে ওর। তাই কিছু চুল কালো, কিছু শাদা। ও তো বাচ্চা, এরই মধ্যে গোঁফ পাকবে কি।"

খিল খিল ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা। এতো ভালো লাগছিল আমার। ওদের কথা এত বেশী ক'রে বলছি কারণ ওদের মতো অত ভালো লোক খুব বেশী দেখিনি। দু'চারজন বড় লোকের সংস্পর্শেও এসেছি। তাঁরা ধনী লোক, সত্যিকার বড় লোক নন। তোমরা ধনীদের কেন যে বড় লোক বল তা আমার মাথায় এখনও ঢোকেনি। সত্যিই কি তাঁদের হৃদয় বড় ? সত্যিই কি তাঁরা মানুষ হিসাবে বড় ? না, না, ভুল বলছি। হ্যাঁ, একটি ধনী লোক দেখেছিলাম বটে, তিনি তোমাদের রাজা জনকের মতো ছিলেন। শুধু গায়ে শুধু পায়ে থাকতেন। শুনতাম লক্ষপতি লোক। অনেক দান ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর ছেলেটা ছিল বাপের ঠিক উলটো। ওরকম মূর্তিমান শয়তানও বড় বেশী দেখিনি। মাতাল চরিত্রহীন ছিল ! মদ খেলে আর একটা ভয়ংকর প্রবৃত্তি জেগে উঠত তার মনে। জীবন্ত প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পেত। শুনেছি তার রক্ষিতাদের চাবকাতো শংকরমাছের চাবুক দিয়ে ! আমি যখন

সামনে পড়ে যেতুম আমাকেও নির্যাতন করত ভয়ংকর। বেঁধে বেদম প্রহারও করেছে কতবার। ভাগ্যে তার চাকরটা চোর ছিল তাই নিস্তার পেয়েছিলাম তার হাত থেকে। সে চুরি ক'রে বিক্রি ক'রে দিয়েছিল আমাকে আর এক জায়গায়। ভাগ্যে দিয়েছিল, তা না হলে মরেই যেতাম। ওই দেখ, আবার কথায় কথায় অন্য কথায় এসে পড়েছি। ওটা আমার একটা বদ স্বভাব! সেই বিধবাটির কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে ছুঁলে স্নান করতেন বটে, কিন্তু ভালবাসতেন খুব। একটা অদৃশ্য আশীর্বাদের মতো সেটা যেন আমার সমস্ত মনকে মুগ্ধ ক'রে রাখত। একটা আশ্চর্য কথা শুনবে? তাঁর বাড়িতে তো মাছ-মাংস ঢুকত না, আমাকেও তিনি নিরামিষ খাবার খেতে দিতেন। এক হাতা দুধ আর কলা দিয়ে ভাত মেখে দিতেন আমাকে। তাঁর কাছে থেকে সবরকম ফলমূল খেতে শিখেছিলাম। এমন কি, ছোলাভিজে আর গুড়ও খেতাম। খেতে ভালো লাগত। অকৃত্রিম ভালবাসার পরিবেশে সবই ভালো লাগে। কিন্তু এত সুখ আমার কপালে সইল না। একদিন রাত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাই ঘটল যা মানুষের সমাজেই ঘটা সম্ভব, যা মানুষের সমাজেই সদাসর্বদা ঘটে থাকে, যার খবর তোমরা খবরের কাগজে পড়তে পড়তে মেকী উৎকণ্ঠার সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ কর, যা তোমাদের ঘোঁট করবার উপাদান সরবরাহ করে, কিন্তু যা তোমাদের কখনও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে না। রাত্রে আমি বারান্দার কোণে অন্ধকারে গুটিসুটি হয়ে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম, কিন্তু উৎকর্ণ হয়েছিলাম পাশের বাড়ির ঘড়ির আওয়াজ শোনবার জন্য। পাশের বাড়িতে একটা ঘড়ি ছিল তাতে নানারকম বাজনা বাজত। অত্যন্ত ভালো লাগত আমার আওয়াজটা। মনে হত ওই আওয়াজটা যেন আমাকে কোন অজানা দেশ থেকে ডাকছে। ওই জলতরঙ্গ বাজনাটা শুনলে আমার সমস্ত মন আকুল হয়ে উঠত। সেদিনও ওই বাজনাটার প্রত্যাশা করেছিলাম, কিন্তু বাজনার বদলে এল বজ্র। একটা মোটর থামার শব্দ হল। তারপর কে যেন দুয়ারে কড়া নাড়তে লাগল। অনেক রাত্রি তখন। পাশের বাড়ির ঘড়িতে দুটো বাজল। কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বিধবাটির, আমিও ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠলাম।

"কে—"

"তার হ্যায়—"

কে একজন পরুষকণ্ঠে বলল বাইরে থেকে। কপাট খুলে দিতেই কিন্তু টেলিগ্রাফ পিওন ঢুকল না, ঢুকল একদল গুণ্ডা। তারা এসেই বিধবাটির মুখ বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে, আর তারপর যা করল তার বর্ণনা ভদ্রভাষায় দেওয়া যায় না। তার ছেলেটা একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু ওই একবার মাত্র। শাণিত ছোরার ঘায়ে পরমুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বেচারা। সম্ভবত চিরকালের জন্য। খানিকক্ষণ পরে বিধবার অর্ধনগ্ন দেহটা টানতে টানতে তারা বাইরে নিয়ে গেল। আমিও পিছু পিছু গেলাম। দেখলাম বাইরে একটা বড় মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, তাতেই তারা টেনে তুলল

তাঁকে। মোটর চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ অবাক হয়ে। আমাদের তোমরা পশু বল, আমাদের দেখে ঘৃণা বা অনুকম্পা প্রকাশ করতে তোমরা অভ্যস্ত কিন্তু এরকম বীভৎস কাণ্ড আমাদের সমাজে হয় না, তোমাদের সভ্যসমাজেই হয়।

একবার আমার ইচ্ছে হল ঘরের ভিতর সেই ছেলেটি কি অবস্থায় আছে দেখে আসি। কিন্তু সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখতে আর প্রবৃত্তি হল না। আমি বুঝতে পারছিলাম সে আর বেঁচে নেই। তার জীবন্ত মুখটাই আমার চোখে ভাসছিল। সেই স্মৃতিটুকুকে সম্বল ক'রে আমি চলে গেলাম সেখান থেকে। আমার জীবনের কাহিনী বিপুল এবং ঘৃণ্য। কিন্তু তার সবটা বললে তো মহাভারত হয়ে যাবে আর একখানা। আর সেসব কাহিনী প্রায়ই একঘেয়ে, কুকুরের উপর মানুষের অবিচার অত্যাচারের কথা, মাঝে মাঝে একটু-আধটু রকমফের আছে বটে, কিন্তু মোদ্দা কথাটা ওই। অবশ্য আমার সব কথা তুমি যদি টুকে নিতে পার তাহলে হয়তো সুবিধে হবে তোমার, ঢাউস বড় বই বাজারে বের করতে পারলে তোমাদের নাকি বেশী নাম হয়, বেশী টাকা হয়। এলাচ, আঙুর, আপেল ফেলে আজকাল তোমাদের পাঠক-পাঠিকারা নাকি লাউ কুমড়োর বৃহদাকৃতি দেখে মুগ্ধ হন বেশী। কিন্তু তবু আমার সব কথা আমি তোমাকে বলব না। কারণ তুমি স্বীকার করবে কি না জানি না, আমিও একজন শিল্পী। আমার শিল্পকর্মকে আমি বাজারের পণ্য করিনি, তাই তোমাদের চেয়ে বড় শিল্পী আমি। অবশ্য তুমি বলতে পার আমার শিল্পকর্মকে পণ্য করবার উপায়ও নেই আমার, আমি লিখতে পারি না, কিন্তু তোমাদের সব শিল্পীরাই কি লিখতে পারে? অনেক বড় বড় লেখক লেখা টোকায়। তুমি যেমন এখন আমার কথা টুকছ। কিন্তু আমার সে প্রবৃত্তিই নেই। রসিকের দেখা পাই না, সবাই সবজান্তা ফড়ে। কি হবে তাদের কাছে রস পরিবেশন ক'রে। কিন্তু দেখ, যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সে কথাটা আবার ভুলেছি। কথায় কথায় বার বার অন্য কথায় চ'লে যাচ্ছি। আমার মায়ের কথাটা আগেই বলে নিই। আমি তখন রাখাল কশাইয়ের দোকানের কাছে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতুম এক-আধ টুকরো হাড়ের আশায়। পাশেই ছিল হাড়কাটা গলি। সেখানে থাকত 'মরবি ছুঁড়ি'। তার আসল নাম কি ছিল তা জানি না, কিন্তু ওই নামেই সবাই ডাকত তাকে। দু'তিন ঘণ্টা অন্তর তার কাছে লোক আসত, তোমাদের সভ্য সমাজের লোক সব। আমি রাত্রে 'মরবি ছুঁড়ি'র বাড়িতে শুতে যেতাম। সেখানে কামুক মাতাল বাবুদের কৃপায় প্রায়ই এঁটো মাংস বা মাংসের হাড়টাড় জুটে যেত আমার কপালে। রাখাল কশাইও 'মরবি ছুঁড়ি'র বাবু ছিল, কেউ কেউ বলত তার ব্যবসার অংশীদারও ছিল নাকি। মোট কথা, সে-ও রোজ যেত তার কাছে। এক বাটি মেটের চাট আর এক পাইন্ট ধেনো মদ নিয়ে রোজ রাত্রি দশটা আন্দাজ যেত সে। তোমার ভুরু কুঁচকে গেল কেন? রাখাল নামটা শুনে? হ্যাঁগো সে হিন্দুই ছিল। শুধু হিন্দু নয়, হিন্দু ব্রাহ্মণ। চক্রবর্তী উপাধি। এই সময়টাতে একদিন রাস্তায় বেরিয়েছি—হঠাৎ

দেখি টম্ মোটর চাপা পড়তে পড়তে কোনক্রমে বেঁচে গিয়ে ছুটে এল আমার কাছে। টম্ আমার বাল্যবন্ধু ছিল। তার মা আর আমার মা সহোদরা দুই বোন। দেখা হলেই দুজনে ঝগড়া মারামারি লাগিয়ে দিত, মনে হত মায়ের ওর চেয়ে বড় শত্রু আর বোধহয় কেউ নেই, কিন্তু ওর ছেলে টমের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। টম্ খুব বিনয়ী ছিল। আমার কাছাকাছি এলেই ঘাড় হেঁট ক'রে ল্যাজটা পিছনের দুটো পায়ের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করত যে তাকে না ভালোবেসে উপায় ছিল না। তুমি হয়তো বলবে ও বিনয়ী ছিল না, ভীতু ছিল। কিন্তু ওর ওই ভীতু-ভীতু ভাবটাই ভালো লাগত আমার। তোমাদের আপিসের বড়বাবুরা যেমন হাত-জোড়-করা হেঁ-হেঁ বুলি-বাজ খোশা-মুদে কেরানীদের দেখে গদগদ হন আমিও তেমনি টমকে দেখে হতাম। কেরানীদের সঙ্গে টমের একটু তফাতও ছিল। কেরানীরা আড়ালে বড়বাবুদের গাল দেয়, কিন্তু টম্ কখনও আমাকে আড়ালে গাল দিয়াছে বা আড়ালে আমার ক্যারিকেচার ক'রে হাসাহাসি করেছে এ কথা আমি কল্পনাই করতে পারি না। ভণ্ডামি জিনিসটা মানুষদেরই একচেটে। টমের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল। কুকুরের ভাষায় সে এসে বললে, তোমার মা বৌবাজারে একটু আগে মোটরচাপা পড়ে মারা গেছে। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও, এখনি চলে যাও। খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। শোকে খুব যে একটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম তা বলতে পারি না। তবু খানিকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মায়ের অনেক-দিন-আগে-দেখা মুখটা মনে পড়ল। ক্ষিধের জ্বালায়, নানা দুঃখে কষ্টে সে মুখ মাঝে মাঝে বীভৎস হয়ে পড়ত সত্যি, কিন্তু তবু সে মায়ের মুখ। এই মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম সেই বিধবাটির মুখে, সে মুখও আর দেখতে পাব না। তোমাদের এই ভেজাল-সর্বস্ব সভ্যতায় কোনও বিশুদ্ধ জিনিস বেশীক্ষণ টেঁকে না। হয় তাতেও তোমরা ভেজাল মিশিয়ে খারাপ ক'রে দাও, না হয় তাকে শেষ করে ফেল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই মানবসমাজেই আমাদের বাস করতে হয়। আর আশ্চর্য, এই মানব-সমাজে বাস করেই আমরা বুঝতে শিখেছি কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা আলো, কোনটা অন্ধকার। এই সব কথাই তখনও মনে হয়েছিল বোধহয়, ঠিক মনে নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বৌবাজারের দিকেই অগ্রসর হলাম অবশেষে। বৌবাজার লম্বা রাস্তা। অনেক লোকের ভিড়, সবাই নিজের কাজে, নিজের ধান্দায় ছুটে চলেছে, মোটরও অনেক। এর মধ্যে আমার মায়ের মৃতদেহটা কোথায় পড়ে আছে, কি ক'রে আমি তা জানতে পারব এই ভেবে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। তবু কিন্তু থামিনি, চলতেই লাগলাম রাস্তা ধরে। রাস্তা শেষ হয়ে গেল তবু কিছু দেখতে পেলাম না। আবার উলটো দিকে চলতে লাগলাম। অনেকক্ষণ চলবার পর তোমাদের সার্কুলার রোডের কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম ফুটপাথের কাছে একটা কুকুর পড়ে আছে। কাছে গেলাম, চিনতে পারলাম মাকে। মা তখনও মরে

নি ! কোমরের উপর দিয়ে গাড়ির চাকাটা চ'লে গিয়েছিল। কোমরটা ভেঙে গেছে। রাস্তার ময়লার উপর রক্তাক্ত দেহে শুয়ে মা এঁকে বেঁকে কাতরাচ্ছে। আমাকে দেখে খুব জোরে কেঁদে উঠল একবার। আমি এখনও মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ অহংকারকে আঁকড়ে আছি যে মা মৃত্যুকালে তার পুত্রকে দেখে হয়তো খুশী হয়েছিল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে সে খুশীর কোন আভাস আমি দেখতে পাইনি, মা যে আমাকে চিনতে পেরেছিল তাও তার দৃষ্টি থেকে বুঝতে পারিনি। মায়ের যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি তখন অনিবার্য মৃত্যুকেই দেখছিল সামনে, আমাকে নয়, যুক্তি দিয়ে ভাবলে এই কথাই মনে হয়। কিন্তু আমরা সব সময়ে যুক্তি আঁকড়ে থাকতে পারি না। তাই কল্পনা করছি, মা আমাকে দেখে খুশী হয়েছিল। তুমি তোমার বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পাওনি বলে দুঃখ করছিলে, কিন্তু আমার মনে হয় আমি মায়ের শেষ সময়ে যদি না উপস্থিত হতাম তাহলেই বোধহয় ভালো হত। দেখলাম কেবল মায়ের সেই চলচ্ছক্তিহীন অসহায় অবস্থা, আর চারিদিকে উদাসীন জনস্রোত। কেবল একটি হাফপ্যান্ট-পরা ছোট ছেলে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বোধহয় মজা দেখছিল, কারণ তার চোখের দৃষ্টি থেকে যা উপচে পড়ছিল তা করুণা বা অনুকম্পা নয়, তা কৌতুক। আর একটা বড় গোছের ছেলে তার কাছে এসে দাঁড়াল। ছোট ছেলেটা বললে, "হাবুদা, কুকুরটা মোটর চাপা পড়েছে দেখেছো? কি রকম অদ্ভুত ভাবে সামনের পা দুটো দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে দেখ। সার্কাসে গেলে এ কুকুর নাম করত। দেখ দেখ, কেমন শরীরটাকে বেকাচ্ছে—"

হাবুদা সাবধানী লোক। বললেন, "কাছে যাসনি, কামড়ে দেবে। এই কুকুরগুলো একটা নিউসান্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কর্পোরেশনে ফোন করেছি, নিয়ে যাক এটাকে সরিয়ে। এখনও তো কেউ এলো না। কর্পোরেশনও আজকাল ওয়ার্থলেস হয়েছে দেখছি—"

কিন্তু দেখা গেল হাবুদা কর্পোরেশনকে যত ওয়ার্থলেস মনে করেছিলেন, তত ওয়ার্থলেস তাঁরা নন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যমদূতাকৃতি জন দুই ডোম এসে হাজির হল। তাদের হাতে মোটা মোটা বাঁশ।

"আরে এটা এখনও মরেনি দেখছি। একে তো টাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"সাবড়েই দাও না।"

দড়াম ক'রে একটা বাঁশের লাঠি পড়ল মায়ের মাথায়। আর্তনাদ ক'রে উঠল মা। তার পর আর এক লাঠি। মাথাটা ফেটে গেল, ছিটকে বেরিয়ে এল একটা চোখ। মাকে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার আর অসুবিধা রইল না। আমি ভেবেছিলাম ওরা মায়ের পাগুলো বেঁধে তার ভিতর বাঁশ চালিয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবে। একটা মরা গরুকে ওই ভাবে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম। কিন্তু দেখলাম ওরা অত মেহনত করতে রাজি নয়, তারা মায়ের পা ধরে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল। আমার

আত্মসম্মানে হাঠাৎ ঘা লাগল। তুমি হাসছ মনে হচ্ছে। ভাবছ রাস্তার খেঁকি কুকুরের আবার আত্মসম্মান থাকে নাকি। তোমরা হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বিদেশীর, বিভিন্ন শাস্ত্রের, অদ্ভুত বিচিত্র সমাজের লাথি খেয়ে খেয়ে যদি আত্মসম্মানের বড়াই করতে পার —তাহলে আমি পারি না কেন ? আমার আত্মসম্মান তোমাদের চেয়েও তীক্ষ্ণ, যদিও তোমাদের মতো সরব নয়। বিশ্বাস কর, আমি ঘেউ ঘেউ ক'রে সেই ডোমগুলোর পিছনে তাড়া করেছিলাম। আমার হাতে অবশ্য পিস্তল ছিল না, থাকলে তোমাদের শহীদদের মতোই আমিও শহীদ হতাম সেদিন। দেশমাতৃকার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের যে মনোভাব হয়েছিল আমার মায়ের অপমান দেখেও আমার ক্ষোভ তার চেয়ে কিছু কম হয়নি। আমি ঘেউ ঘেউ ক'রে তেড়ে যেতেই একটা ডোম বললে—আয়, এটাকেও শেষ ক'রে দি। বলেই সে বাঁশ নিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে। তোমাদের শহীদরা যা করেছিল আমিও তাই করলাম। বোঁ বোঁ ক'রে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলাম একটা গলির ভিতর ঢুকে। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তোমাদের শাস্ত্রেও সে কথা বলেছে। এ গলি সে গলি দিয়ে একটা কানাগলিতে ঢুকে শেষে এক ছাতুউলি বুড়ির আশ্রয়ে এসে পৌঁছে গেলাম। বুড়ীও প্রথমে আমাকে আমল দিতে চায়নি, একটা ঝাঁটা নিয়ে দূর দূর ক'রে তেড়ে গিয়েছিল প্রথমে, কিন্তু আমি তার পায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে শুয়ে পড়লাম একেবারে। দু'এক ঘা ঝাঁটার বাড়ি খেয়েও পড়ে' রইলাম। বুড়ী তখন বলে উঠল—

"ওলো সাবি, মুখপোড়া কুকুরের কাণ্ড দেখে যা। ঝাঁটা খেয়েও নড়ছে না। কি করি বল তো। তুই বেরিয়ে আয় না, কত ভাবোন আর করবি এখন থেকে। নগেন তো আসবে সেই সন্ধের পর—"

"আহা, আমি ভাবোন করছি নাকি। চুল আঁচড়াবো না তা বলে !"

একটি ছোট আয়না বাঁ হাতে নিয়ে আর ডান হাত দিয়ে মাথার অজস্র ঘনকৃষ্ণ চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে সাবি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চোখে মুখে চাপা হাসির অপরূপ শোভা। পরনে কমলারঙের একটি সস্তা শাড়ি। বুড়ীর যুবতী নাতনী সাবি। (বোধহয় সাবিত্রীর অপভ্রংশ) সত্যিই সুন্দরী। রং খুব ফরসা নয়, খুঁটিয়ে দেখলে নাক মুখ চোখও নিখুঁত নয়, তবু সে সুন্দরী। নগেনও—তার স্বামী বা প্রণয়ী যে-ই হোক—নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। সাবি বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে বলল—
"ওমা, কি সুন্দর কুকুর, ওকে মারছ কেন দিদিমা—"

যৌবনে সব স্ত্রী-পুরুষই একটু উদার হয়। তাদের মনে তখন এমন একজন সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর আবির্ভাব হয় যে অনায়াসে দৈনন্দিন তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সুন্দরকেই জীবনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু হায়, তোমাদের জীবনে এই উদার সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী। তাদের সিংহাসনচ্যুত ক'রে গদি দখল করে বদমায়েশ মতলববাজ স্বার্থপর শয়তানরা। তারাই তোমাদের সমাজ শাসন করে। তারাই হর্তাকর্তা বিধাতা।

বুড়ী খেঁকিয়ে উঠল।

"সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর। সুন্দর দেখলে আর জ্ঞান থাকে না। একটি মাত্র তো ঘর, একটি সুন্দরকে তো জুটিয়েছ, আমাকে বারান্দায় শুতে হচ্ছে, আবার সুন্দর সুন্দর বলে হেদিয়ে পড়ছ! রাস্তার নেড়ি কুত্তো, ও আবার সুন্দর। দূর হ মুখপোড়া—"

আবার বুড়ী ঝাঁটা তুলল।

"না, না ওকে মেরো না দিদু। আহা, আমাদের যদি আর একটু বেশী জায়গা থাকত ওটাকে ঠিক পুষতাম। কি সুন্দর দেখতে, সত্যি! দাঁড়াও ওকে কেক্‌টা খেতে দি—"

"ওকে কেক্‌টা দিয়ে দিলে নগেন খাবে কি?"

"সে তো রোজই খায়। আজ না হয় খাবে না।"

"কাণ্ড দেখ মেয়ের।"

একটা ছোট তিন-কোণা কেক্ বার ক'রে সাবি নিজে হাতে সেটি ধরলে আমার মুখে। টপ্‌ ক'রে খেয়ে ফেললাম এবং কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে ল্যাজ নাড়তে লাগলাম। একটু আগেই মায়ের যে শোচনীয় মৃত্যু দেখে এসেছিলাম তা আমার লোভকে দমাতে পারলে না। যখন কেক্ খাচ্ছিলাম তখন সে কথা মনেও ছিল না। তুমি হাসছ নাকি? তোমাদের কীর্তিকথা কি তুমি জান না? পাছে তেড়ি নষ্ট হয়ে যায় এজন্য তোমাদের অনেকেই আজকাল মা বাবার মৃত্যুতে চুল কামাও না, অনেকেই নমো নমো ক'রে শ্রাদ্ধ সেরে ফেল, অনেকে আবার তা-ও কর না, দাদা থাকলে দাদার উপর বা ছোট ভাই থাকলে তার উপর শ্রাদ্ধের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। সেখানেও তোমাদের পাটোয়ারি বুদ্ধির খেল দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। যে পুরোহিত তোমাদের মৃত পিতা বা মাতার আত্মার তৃপ্তির জন্য সারাদিন উপবাসী থেকে গলদঘর্ম হয়ে মন্ত্রপাঠ ক'রে যান তোমাদের সাধারণত চেষ্টা থাকে কি ক'রে তাঁকে তাঁর ন্যায্য পাওনাটা থেকে বঞ্চিত করবে। তিনতলা পাকা বাড়ি, প্রকাণ্ড মোটর, গোঁফে আতর এমন লোকেরও মাতৃশ্রাদ্ধে দানের যে রকম খেলো জিনিসপত্র দেখেছি তাতে তোমাদের উপর ঘেন্না ধরে গেছে। তোমাদের সত্যি যদি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে শ্রাদ্ধের ভড়ং করতে যাও কেন তা বুঝি না। আমার মনে হয় ভূতের ভয়ে কর। তোমাদের ভয় হয় শ্রাদ্ধ না করলে মৃতের প্রেতাত্মা যদি ঘাড়ে এসে চড়ে কিংবা অন্য কোন অনিষ্ট করে। আসলে তোমরা অত্যন্ত কাপুরুষ এবং ভীতু। আর একদল আছেন যাঁরা শ্রাদ্ধের উপলক্ষ ক'রে নিজেদের ঐশ্বর্যটা জাহির করতে চান লোকসমাজে। এরকমও দেখেছি যে মা মরছে ছেলে দিব্যি মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়িতে পড়ে আছে, কিন্তু সেই মা যখন ম'ল তখন শ্রাদ্ধের কি ধুম! সত্যি বলছি, ঘেন্না ধরে গেছে তোমাদের উপর। ওকি, জিমিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ওকে দেখব বলেই তোমার গেটের সামনে কষ্ট ক'রে বসে আছি; তোমাকে গল্প শোনাবার জন্যে আমি আসিনি। আমি চললাম।

ও যখন বাইরে আসবে তখন আমি আসব। ও মেয়েটি কে? তোমার নিজের লোক নাকি! ওর চেহারা চাল-চলন তো ভালো নয়। পেট-কাটা জামা আর ফিনফিনে শাড়ির নীচে গোলাপী সায়ার বাহার সাধারণত যে জাতীয় ললনাদের শ্রীবৃদ্ধি করে, তাদের তোমরা কি চোখে দেখ আজকাল? তোমাদের রুচি তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলায়। আচ্ছা চললুম, পরে আসব আবার—"

কুকুরটা চলিয়া গেল। দেখিলাম আমার ভাইঝি সুলীনা জিমিকে লইয়া ভিতরে যাইতেছে। এখন জিমির স্নান করিবার সময়। সুলীনা স্বহস্তে তাহাকে স্নান করায়। জিমি সুলীনারই কুকুর। নগদ আড়াই শ' টাকা খরচ করিয়া কিনিয়াছে। নিজেই তাহার সব পরিচর্যা করে। আমার ভাই নাদুর কথা আগেই বলিয়াছি। সুলীনা তাহারই মেয়ে। আমার কাছেই মানুষ হইয়াছে। উহার মা সুন্দরী ছিল, রূপসী বলিয়া উহারও সুখ্যাতি হইয়াছে। একাধিক সিনেমা কোম্পানি উহাকে অভিনেত্রীরূপে পাইবার জন্য ব্যস্ত। উহার বাজারদর প্রায় গগনচুম্বী হইয়াছে। আমিই এখন উহার গার্জেন, সুতরাং আমার বাজারদরও এখন গগনচুম্বী। সিনেমায় নামিবার পূর্বে উহার ডাকনাম ছিল 'টেঁপি', ভালো নাম ছিল শংকরী। কিন্তু ওসব সেকেলে নাম আজকাল সিনেমায় চলে না—তাই নাম বদলাইয়া দিতে হইয়াছে। তাহার ঠাকুরমার দেওয়া নাম দুইটি আজ অবলুপ্ত হইয়াছে সত্য (ঠাকুমা নিজেই কি অবলুপ্ত হন নাই?)—কিন্তু সুলীনা নামটি আজ ভারতবিখ্যাত। সুলীনার দৌলতে আমিও আজ পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। সকলে বলিতেছে সিনেমা-সাহিত্য-জগতে আমিই নাকি একাধারে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সকলে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সব লেখা পড়ে নাই, কিন্তু আমার লেখা পড়ে নাই এমন পাঠক-পাঠিকা বিরল। আমাকে প্রণাম জানাইয়া, আশীর্বাদ জানাইয়া, প্রেম নিবেদন করিয়া এত পত্র রোজ আসে যে সে-সবের উত্তর দিবার জন্য একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিতে হইয়াছে। প্রথমে একজন এম. এ. পাস ছোকরাকে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইল। কারণ দেখিলাম সে পরশ্রীকাতর, আমার খ্যাতি ও ঐশ্বর্য তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। সর্বদা মুখটিকে ম্লান করিয়া রাখিত। একদিন খবর পাইলাম আমার সম্বন্ধে নানারকম সত্যমিথ্যা গুজবও সে রটাইয়া বেড়ায়। এবং যদিও আমার অন্নে প্রতিপালিত তবু চেষ্টা করে কি করিয়া আমাকে সে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবে। শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিদায় দিতে হইল। এখন একজন তরুণীকে রাখিয়াছি। মহিলাটি শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের কাজ শেষ করিয়া আমার বাড়িতে আসেন, আমার চিঠিপত্রের উত্তর লেখেন, এবং রাত্রি নয়টার পর প্রত্যহ আমার নূতন লেখা টোকেন। আমি আজকাল লিখি না, লিখিলে তিন মাস অন্তর একখানা করিয়া বড় নভেল লেখা যায় না, আমি আজকাল যাহা লিখি তাহা হয়তো বিদগ্ধ রসিক পাঠক-

পাঠিকার মনে ঘৃণার সঞ্চার করিবে, কিন্তু বহুকাল সৎসাহিত্য রচনা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে সৎসাহিত্য এদেশে বড় একটা বিক্রয় হয় না। মুষ্টিমেয় দুই-চারিজন বিদগ্ধ পাঠক যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সমালোচনাতেই পঞ্চমুখ, বই কিনিবার বেলায় মুক্তহস্ত নহেন। আমার প্রথম যৌবনে যে সব ভালো বই লিখিয়াছিলাম, যাহা অনেক সাহিত্য-রসিকের অনেক প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, সে বই কিন্তু বিক্রয় হয় নাই। সম্ভবত তাহারা এখনও প্রকাশকের দোকানে বা দপ্তরীর বাড়িতে পোকার ভোগ্য হইয়া তাহাদের জীর্ণ জীবন যাপন করিতেছে। ভালো বইয়ের বাজারে চাহিদা নাই। অনেক ধনী অবশ্য রবীন্দ্র রচনাবলী, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থকারদের পুস্তক-সংগ্রহ আলমারিতে সাজাইয়া রাখিবার জন্য কেনেন, কিন্তু পড়েন কি না সন্দেহ। বই কিনিয়া সাজাইয়া রাখাও আজকাল কেতাদুরস্ত ফ্যাশনেব্‌ল সমাজের একটা ঢং মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সাহিত্যপ্রীতির পরিচায়ক নহে। উক্ত গ্রন্থকারদের জীবনী পাঠ করিয়া দেখি জীবদ্দশায় তাঁহাদের বই মোটেই ভালো বিক্রয় হয় নাই। তাঁহাদের সময় সিনেমা-সাহিত্যের প্রলোভন ছিল না, থাকিলে অনেকেই হয়তো এই ফাঁদে পা দিতেন। আমিও এ ফাঁদে পা দিতাম না, আমার দিবার কল্পনাও ছিল না, কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। একদিন এক জাঁদরেল সিনেমা ডিরেকটার আমার অতিসাধারণ একটা ছোটগল্প লইয়া আমার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সমুপস্থিত হইলেন বলিলে আরও ভালো হয়। বলিলেন, আপনার এই গল্পটি আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কিনিতে চাই। গল্পটিতে খুব ভালো একটি ছবি হইবে। আমার তখন একটু টানাটানি চলিতেছিল। অভাবিতরূপে সহসা হাতে স্বর্গ পাইয়া কেমন যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলাম। ঠিক সেই সময় টেঁপি আমাকে এক কাপ চা দিয়া গেল। টেঁপি তখন স্বল্পীনা হয় নাই। টেঁপিকে বলিলাম, "এঁকেও এক পেয়ালা এনে দাও।" টেঁপি ভিতরে চলিয়া যাইবার পর ডিরেকটার মহাশয় ঈষৎ কাশিয়া আর একটি যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমার গ্রীবা প্রায় স্থানচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। বলিলেন, "এটি আপনার কে হয়?"

"ভাইঝি।"

"আমার আর একটি প্রস্তাবও আছে। কিছু মনে করবেন না তো? আপনার গল্পের নায়িকার পার্টে আপনার ভাইঝিকে চমৎকার মানাবে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে একে সেই পার্টে নামাতে পারি। দেখবেন একেবারে হৈ হৈ পড়ে যাবে। পুরোনো মুখ দেখে দেখে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!"

আমি আমার কানকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না।

"ও ছেলেমানুষ, ও কি অভিনয় করতে পারবে?"

"অভিনয় শিখিয়ে নেব। চেহারাটাই আসল। নিউ ফাইণ্ডের জন্যে আমাদের প্রডিউসার দশ হাজার টাকা খরচ করতে রাজি আছেন। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে যে টাকাটাও আমি আপনাকে দিয়ে দিতে পারি।"

দশ হাজার টাকা! কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। যে টেঁপি আমার বাড়িতে চাকরানীর মতো খাটিতেছে, ঘর-মোছা, বাসন-মাজা, ফাইফরমাশ খাটাই যাহার নিত্য কাজ, আমার মেয়েদের ছোট-জামা এবং পুরাতন কাপড়ই যাহার অলঙ্ভূষণ, সেই টেঁপির জন্য এই ডিরেকটার এক কথায় দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত! টেঁপির মা-বাবা দুইজনেই বহুপূর্বে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি খবর পাইয়াছি তাহাদের মৃত্যুও হইয়াছে। একজনের হাসপাতালে, আর একজনের উদ্বন্ধনে। সুতরাং আমিই টেঁপির একমাত্র অভিভাবক। টেঁপির বয়স ছিল তখন মাত্র ষোল বৎসর, অর্থাৎ তখনও সে সাবালিকা হয় নাই। আমি আপত্তি করিলে সে সিনেমায় নামিতে পারিত না। কিন্তু আমি আপত্তি করিতে পারি নাই। আমি জানিতাম যে সিনেমার পথ অতিশয় পিচ্ছিল, যে কোনও মুহূর্তে পদস্খলন হইতে পারে, আমি জানিতাম যে ভদ্র-ঘরের মেয়েরা সিনেমায় নামে না, যাহারা নামে তাহারা ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হয়—তখন তাহাই হইত, কিন্তু তবু সিনেমা পরিচালকের ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই, বলিতে পারি নাই তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, আমাদের মতো উচ্চবংশের মেয়েকে তুমি অভিনেত্রী বানাইতে চাও! না, একথা বলিতে পারি নাই। বরং সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, প্রস্তাবটা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলাম। ওই সামান্য টেঁপির জন্য দশ হাজার টাকা! সত্যই মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল সেদিন। আজকাল আর সেদিন নাই। এখন এরকম প্রস্তাব আসিলে আর মাথা ঘুরিবে না। এখন একজন প্রতি-ভাময়ী সুন্দরীর পারিশ্রমিক খুব কম হইলেও কুড়ি হাজার টাকা। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও আজকাল সিনেমায় নামিয়া নিজেদের কুল পবিত্র করিতেছে, সুতরাং এখন আর আমার লজ্জা বা সংকোচেরও কারণ নাই। তখন কিন্তু হইয়াছিল। তখন টাকার লোভেই কেবল রাজি হইয়াছিলাম। এখন সুলীনারই জয়-জয়কার। নিজের বিবেককেও আর দায়ী করি না। কারণ ইহা পরে জানিয়াছি টেঁপিই পূর্বে উক্ত পরিচালকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া যোগাযোগটা স্থাপন করিয়াছিল। ইহাও এখন আর আমার অবি-দিত নাই যে, সেদিন টেঁপিই আসল লক্ষ্য ছিল এবং আমার গল্পটা ছিল উপলক্ষ মাত্র। টেঁপিই আমার গল্পটা তাঁহাকে পাঠাইয়া লিখিয়াছিল যে আমার গল্পটা যদি তিনি কেনেন তাহা হইলে আমি নাকি তাহার সিনেমা-পথে বাধা সৃষ্টি করিব না। এ খবরটা জানিবার পর অনুভব করিয়াছিলাম যে তখন টেঁপির বয়স যদিও ষোল বৎসর মাত্র ছিল কিন্তু তাহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রবীণ মনস্তাত্ত্বিকের মতো। ওই বয়সেই সে আমার মনের ঠিক মাপটা ধরিতে পারিয়াছিল। আমি যে একজন সুবিধাবাদী মাত্র, টাকার টোপ ফেলিয়া আমাকে যে অনায়াসে গাঁথা যায়, এ কথাটা সে ওই বয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিল। আমি আগেই বলিয়াছি সত্যই আমি সুবিধাবাদী। এ যুগে সুবিধাবাদী না হইয়া উপায় নাই। আগেই বলিয়াছি সৎপথে থাকিলে বাঁচা যায় না, হয়তো কোনক্রমে কৃমি বা কীটের ন্যায় বাঁচা যায় কিন্তু ভদ্র সামাজিক মানুষের মতো

মাথা উঁচু করিয়া বাঁচা যায় না। যাহার ঐশ্বর্য নাই, যশ নাই, প্রতিপত্তি নাই তাহাদের দিকে আমরা ফিরিয়াও চাই না। কিন্তু আমরা সকলেই চাই যে লোকে আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাক, আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হোক। কিন্তু এ যুগে টাকা না থাকিলে সহজে কাহারও দৃষ্টি কাহারও উপর পড়ে না! তাই আমি টাকা রোজগারের দিকেই নজর দিয়াছি। সুলীনা এখন আমাকে হাজার হাজার টাকা আনিয়া দিতেছে। শুধু তাহাই নহে, সিনেমার বাজারে—সম্ভবত সুলীনার দৌলতেই—আমার গল্পও খুব চালু হইয়াছে। বর্তমানে আমি নিম্নলিখিত প্রকার ছাঁচে গল্প লিখিয়া খুব কৃতকার্য হইতেছি। শুধু সিনেমায় নয়, বাজারেও বই বেশ কাটিতেছে। সাধারণতঃ ত্রিভুজোপম প্রেমের গল্পই বেশী জনপ্রিয় হয়। গল্পে প্রেম থাকা চাই, সে প্রেমে বাধাও থাকা চাই, প্রেমটা সমাজবিরোধী হইলে আরো ভালো হয়। ধনীর সন্তানের সঙ্গে গরীব মেয়ের প্রেম, অথবা ইহার বিপরীতটা, ধনীর দুহিতার সঙ্গে গরীবের ছেলের প্রেম সাধারণত বেশ জমে যদি মাঝখানে একটা অনমনীয় পিতা বা দুর্ধর্ষ অসভ্য গোছের দ্বিতীয় প্রেমিক থাকে। এই দ্বিতীয় প্রেমিকটাকে ঠিক প্রেমিক করিলে চলিবে না, তাহাকে লম্পট কামুক করিতে হইবে। তাহার পর নানাভাবে ঝটাপটি মারপিট করিয়া অশ্বযোগে, মোটরযোগে বা ছুটিতে ছুটিতে গিরিদরি বনবাদাড় মাঠ পার হইয়া, ছুরি ছোরা গুলিবন্দুক চালাইয়া, যেখানে সেখানে সঙ্গীত সমন্বিত অশ্রু-বর্ষণ করিয়া প্রেমটিকে শেষে এমন স্থানে আনিতে হইবে যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন অনিবার্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন না করিলে বই চলে না। আমাদের দেশের মেয়েরা এবং মেয়েলী ছেলেরা উহাই চায়। মেয়েদের কল্যাণেই আমাদের সাহিত্য এবং সিনেমা টিঁকিয়া আছে। মেয়েদের খুশী রাখিতে হইবে। এমন কিছু লিখিলে চলিবে না, যাহাতে মেয়েদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তাহারা প্রেম করুক ক্ষতি নাই, যথেচ্ছ প্রেম করুক, কিন্তু সে প্রেমকে এমন ভাবে আঁকিতে হইবে যে মনে হইবে সুন্দরা নায়িকাটি নায়কের সহিত গোপনে দেওয়াল ডিঙাইয়া পলায়ন না করিলেই বুঝি মনুষ্যত্বের শাশ্বত আদর্শ চুরমার হইয়া গেল। ওইখানেই লিখিবার কায়দা। নায়িকা যাহাই করুক তাহাই পবিত্র, মহৎ এবং আদর্শমূলক মনে হওয়া চাই। এই টেকনিকে বই লিখিয়া আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছি। আর একটা টেকনিকও আছে, সেটাও মন্দ নয়। গল্পটা যতদূর সম্ভব অশ্লীল করিয়া শেষে নায়ক বা নায়িকার মুখে ও হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের বুলি সাজাইয়া দেওয়া। কারণ আধুনিক সভ্য মানুষ অশ্লীলতাও চায়, আবার সত্য-শিব-সুন্দরকেও চায়। এই দুই বস্তুকে পাঞ্চ করিয়া পরিবেশন করিতে পারিলে চমৎকার রস জমে। এই টেকনিকে লিখিয়া আমার গোটাকতক বই তো বাজারে খুব নাম করিয়াছে। সেদিন একজন পাঠক বলিতেছিলেন, আপনিই এ যুগের সাহিত্য প্রধানমন্ত্রী, সম্রাটই বলিতাম কিন্তু সম্রাটের যুগ তো চলিয়া গিয়াছে। এই ধরনের আরও অনেক কথা তিনি সেদিন বলিলেন। এমন

কি, ইহাও বলিতে ছাড়িলেন না যে, আমার বইগুলি অনুবাদ করিয়া নোবেল-প্রাইজ প্রতিযোগিতায় পাঠান উচিত। তাঁহার বিশ্বাস নোবেল-প্রাইজ আমাকে বরণ করিয়া ধন্য হইবে। গোঁফে আলতো-আলতো ভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার চাটুবাক্যগুলি সেদিন স্মিতমুখে উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু শেষে তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে সবই যেন বেসুরো হইয়া গেল। বলিলেন, 'আপনার এক সেট বই যদি অটোগ্রাফ ক'রে আমাকে দেন তাহলে—'। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করি নাই, কিন্তু সবই বেসুরো হইয়া গেল। বর্তমানে আমার জীবনে ইহাই ট্র্যাজেডি। সকলেই আমার কাছে আসে স্বার্থের জন্য। যাহারা আমার প্রশংসা করে তাহাদেরও ওই একটিমাত্র উদ্দেশ্য—আমার নিকট হইতে কিছু বাগাইয়া লওয়া। যাহারা বাগাইতে পারে না, তাহারা নিন্দায় ফাটিয়া পড়ে। আমাকে ঘিরিয়া যে সব স্তুতিনিন্দা আবর্তিত হয় তাহার ওই একটি কেন্দ্র—স্বার্থ। নিন্দার আর একটা কেন্দ্রও আছে, সেটা ঈর্ষা, অহেতুক ঈর্ষা। অহেতুকী প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়াছি কিন্তু জীবনে তাহা কখনও অনুভব করি নাই। অহেতুকী ঈর্ষার দৃষ্টান্ত রোজই দেখিতেছি। আমি আজকাল অনেক টাকা রোজগার করিতেছি সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমার টাকা দুই হাতে খরচ করিবার লোকেরও অভাব নাই। আমার নিকট ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে আমার বাড়ি ঠাসা। আমার ছেলে একটা চামারের মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাকে মাসে মাসে মোটা টাকা পাঠাইতে হয়। সে এবং তাহার স্ত্রী দুইজনেই রোজগার করে—আজকাল সকলেই বলে স্ত্রীদের রোজগার না করিলে সংসার চলে না—কিন্তু আমি দেখিতেছি রোজগার করা সত্ত্বেও চলিতেছে না। আমি তাহাকে মাসে দুইশত করিয়া টাকা দিই, আমার স্ত্রীর মনোকষ্ট নিবারণের জন্যই টাকাটা দিতে হয়, কিন্তু শুনিতেছি ইহাতেও তাহাদের টানাটানি ঘুচিতেছে না। তাহাদের আরও টাকা দিতে হইবে। আরও, আরও, আরও—ইহার আর শেষ নাই। তাহাদের আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিতে বলিয়াছিলাম, চামার বউকে ঘরে লইতে গৃহিণীর প্রথমটা সংকোচ ছিল, কিন্তু পুত্র-স্নেহের প্রাবল্যে এখন সে সংকোচও ভাসিয়া গিয়াছে, তিনি এখন উহাদের ঘরে লইতে রাজি আছেন, বউ কিন্তু রাজি নয়। সে নাকি বলিয়াছে চামারেরও একটা আভিজাত্য আছে, সে আভিজাত্য কৃপা এবং অনুকম্পার আবহাওয়ায় ক্ষুণ্ণ হয়, সুতরাং সে আমাদের কাছে আসিবে না। অনাহারে অর্ধাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, তবু আসিবে না। কোনও ভদ্রলোক চাহে না যে তাহার পুত্রবধূ অনাহারে বা অর্ধাহারে প্রাণত্যাগ করুক সুতরাং টাকা পাঠাইতে হয়। আশ্চর্য কাণ্ড, মনি-অর্ডার বা চেক কোনদিন ফেরত আসে না। টাকা লইলে চামারের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় না। বড় মেয়েটাও আমার গলগ্রহ হইয়াছে। বিবাহের কিছুদিন পরেই পাগল হইয়া গিয়াছে সে। জামাই আবার বিবাহ করিয়াছে। মেয়েকে পাগলাগারদে রাখিয়াছি। তাহার ব্যয়ভারও

আমাকে বহন করিতে হয়। দ্বিতীয় কন্যাকে বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ দিতে পারি নাই। আমাদের সমাজে টাকা না থাকিলে ভালো বিবাহ হয় না। আমার তখন টাকা ছিল না; রত্নাকে সামান্য একটি কেরানীর হাতে দিয়াছিলাম। তাহার একঘর ছেলে-মেয়ে হইয়াছে। প্রতিবছরই একটা করিয়া হয়, মাঝে দুইবার যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। আমার জামাইটি বেশ বিনয়ী ভদ্রলোক। মুখে কথা নাই। সামনে যতক্ষণ থাকে মুখে মৃদু হাসি ফুটাইয়া চুপ করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে নীরবে হাত কচলায় খালি। তাহাকেও মাসে মাসে সাহায্য করিতে হয়, মেয়ের নামে প্রতিমাসে কিছু পাঠাইয়া দিই। ছোট মেয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই। সে সোসাইটি গার্ল। সুলীনার এবং আমার খ্যাতির হাওয়ায় সে প্রজাপতির মতো উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই। সে যে কাহাকে বিবাহ করিবে, তাহা আমি জানি না, সে নিজেও বোধহয় জানে না। একপাল নানা আকারের ছোঁড়া তাহার পিছু-পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নিরুপায় হইয়া এই দৃশ্যটাই কেবল দেখি। তাহার হোটেলের এবং পিকনিকের খরচ এবং নিত্যনূতন শাড়ি পোশাকের ব্যয়ভারও আমাকেই বহন করিতে হয়। না করিয়া উপায় নাই। যে সমাজের স্রোতে আমি গা ভাসাইয়াছি সে সমাজে কেহ কাহারও মুখে লাগাম লাগাইতে পারে না। সে সমাজে স্বেচ্ছাচারী হওয়াই নিয়ম। মালিকার (আমার ছোট মেয়ে) সম্বন্ধে আমি একটু রাশ টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার গৃহিণীই তাহাতে বাধা দিলেন। বলিলেন, "তোমার বড় ছেলে যেদিন কুলে কালি দিয়ে চামারের মেয়েকে বিয়ে ক'রে এল, সেই দিনই বুঝেছি আমাদের দেশের গোঁড়া ঘরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চুকে গেল। তারা কেউ জাত খুইয়ে আর আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করবে না। না-ই করুক, আজকাল গোঁড়া ঘরের ভদ্রলোকদের যা অবস্থা, সেখানে তোমার মেয়ে গিয়ে কি টি'কতে পারবে? ওই তো রতির (রত্না, আমার মেজ মেয়ে) বিয়ে দিয়েছ গোঁড়া ভদ্রপরিবারে, হাড়ির দুর্গতি হয়েছে তার। রিকশ' চড়বারও পয়সা জোটে না। মনোর (মনোরমা, আমার বড় মেয়ে) বিয়েও বিরাট বড় ধনী একান্নবর্তী পরিবারে দিয়েছিলে, বিয়ের সময় লাখপতি, কোটিপতি অনেক কথা শুনেছিসুম—এখন পাগলা-গারদের খরচ আমাদেরই জোগাতে হচ্ছে। ঝাঁটা মারি অমন সব ভদ্র গোঁড়া একান্নবর্তী পরিবারদের মুখে। মালি নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করুক। ওকে তুমি কিছু বোলো না। নিজের বর নিজেই পছন্দ করুক। যা দেখছি, সমাজে সবাই ডোম মুচি চামার। গলায় পৈতে থাকলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? ঘেন্না ধ'রে গেছে আমার। ওরা নিজেদের চরকায় নিজেরাই তেল দিতে পারবে, আমাদের চেয়ে ভালো করেই পারবে, ওদের কিছু বোলো না।"

প্রবল বানে ভাসিয়া গিয়া কেহ ভাগাড়ে আশ্রয় পাইলেও সেইখানেই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে। আমার গৃহিণীরও সেই অবস্থা। কিন্তু আমি জানি

গৃহিণী মুখে যদিও ওই সব কথা বলেন, কিন্তু ওটা মুখের কথা মাত্র। তথাকথিত সভ্যতার টানে আমরা যেখানে ভাসিয়া আসিয়াছি সে জায়গাটা তাঁহার মতে ভাগাড়ই, কিন্তু সে কথা বলিতে তাঁহার মাথা কাটা যায়, আত্মসম্মানে বাধে। তাই তিনি বারবার চীৎকার করিয়া বলেন—এই ভালো, এই ভালো। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে। যে গৃহিণীকে আমি লুকাইয়া কাপড় গহনা কিনিয়া দিয়া অসীম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম, যে গৃহিণী আমার স্কুলের ভাত দিবার জন্য খুব ভোরে উঠিয়া আমাকে পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিয়া আমার সামনে পাখা হাতে বসিতেন. যে গৃহিণীকে নির্জন ঘরে পাইবার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অনেক রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, যাহার সামান্য সুখে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না, যাহার সামান্য অসুখে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতাম—আমার সে গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে। এখন তাঁহার স্থানে যে মেদবহুলা বিভীষিকা আমার গৃহে রাজত্ব করিতেছেন তিনি অন্য ব্যক্তি। এখন তিনি আমার ঐশ্বর্যের পাহারাদার, আমার খ্যাতির অংশীদার এবং আমার চরিত্রের সদা-সন্দিহান অভিভাবক। আমার কাছে অনেক যুবতী মেয়ে আসে, অনেক যুবতী মেয়ে চিঠি লেখে, ভদ্রতার খাতিরেই অনেকের সঙ্গে হাসিয়া শিষ্টালাপ করিতে হয়, আমার গৃহিণী এসব মোটেই পছন্দ করেন না। আমার স্ত্রী ছাড়া আমার আর একটি গার্জেন জুটিয়াছেন, তিনি আমার মামা। অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কাছে আনিয়া রাখিয়াছি। আসিয়াই তিনি আমার গার্জেন পদে আসীন হইয়াছেন এবং আমার সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহার বয়স আশী পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি এখনও বেশ তীক্ষ্ণ, দাঁতও পড়ে নাই, কিছু দাঁত ক্ষইয়া গিয়াছে কিন্তু অটুট আছে। চুল, ভুরু পাকিয়াছে অবশ্য। কিন্তু মুখে জরার চিহ্ন প্রকট নয়। কেবল চোখের কোণে সামান্য কুঞ্চন দেখা যায় মাত্র। রোজ গোঁফ দাড়ি কামান। সরু লম্বা গোছের মুখ, চোখের তারা ঈষৎ কটা নাকটি শুকচঞ্চুর মতো। তাঁহাকে দেখিলে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় কোন ধূর্ত প্রৌঢ় বুঝি মাথায় শাদা পরচুলা পরিয়া ছদ্মবেশে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পৃথিবীর হালচাল নিরীক্ষণ করিতেছেন। খুব কম কথা বলেন। কিন্তু যেটি বলেন সেটিই মতলব-পূর্ণ। প্রথমে আসিয়াই একটি প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি একটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি একটি চৈনিক ভদ্রলোকের বিষয়ে। তিনি নাকি একশত কুড়ি বৎসর বয়স অবধি বাঁচিয়া আছেন। এখনও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট আছে, মনে হয় এখনও বেশ কিছুদিন বাঁচিবেন। জনৈক খবরের কাগজের রিপোর্টার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চাহিয়াছিল যে তিনি কি খাইয়া এমন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলেন প্রথম জীবনে যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন। পঞ্চাশের পর দশ বৎসর নিরামিষাশী ছিলেন। কিন্তু ঈষৎ দুর্বলতা বোধ করাতে আবার মাংস ধরিয়াছেন এবং আর ছাড়েন নাই। মাংস খাইয়া তাঁহার

স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। দেখিলাম এই অংশটুকু মামা লাল কালি দিয়া দাগ দিয়াছেন। আমি খবরের কাগজটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলে তিনি বলিলেন, "দেখলে তো। তোমার বাড়িতে মাংস তো রোজই হয়। কিন্তু বউমার কেমন একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে বুড়ো মানুষের মাংস খাওয়া অনুচিত। তাই তিনি নিজেও খান না, আমাকেও খেতে দেন না। তিনি নিজে তো হবিষ্যান্ন খান, কেবল মাত্র সধবার নিয়মরক্ষের জন্য সামান্য একটু মাছ ভেঙে মুখে তোলেন। কিন্তু এরকম ভাবে মাছ-মাংস থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকাটা কি ঠিক ? ওই চীনে ভদ্রলোক যা বলেছেন তা তো নিজের চোখেই দেখলে। বউমার চেহারাটা দেখতেই মোটা, কিন্তু ও স্বাস্থ্যের পুষ্টি নয়, ও থসথসে মোটা। সুনীলার চেহারাটা বেশ টাইট আছে। থাকবে না ? রোজ মাংস খায় কত ?"

মামা সুশীলাকে সুনীলা বলেন।

"তুমি বাবা বউমার স্বাস্থ্যের প্রতি একটু দৃষ্টি রেখ। এটা তোমার কর্তব্য—"

"আপনার বউমা আমার কথা শুনবে না। তবে আপনি যাতে মাংস রোজ পান সে ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

মামার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং গলার ভিতর হইতে খিঁচ্, খিঁচ্, খিঁচ্, খিঁচ্ শব্দ হইতে লাগিল। মামা যখন হাসেন তখন তৈলবিহীন চলন্ত সাইকেল-চাকা-নিঃসৃত শব্দের মতো একটা শব্দ তিনি কণ্ঠ হইতে বাহির করেন। এ শব্দটাও প্রায়ই শোনা যায় না, যখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হন তখনই এটা শোনা যায়। মামার আর একটা কথা মনে পড়িল। একদিন মামা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যোগেন, তুমি কি করছ জান ?"

প্রশ্নটার তাৎপর্য প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। বলিলাম, "কি ?"

"তুমি ফুটো কলসীতে হাঁই হাঁই ক'রে জল ভরে যাচ্ছ। তোমার কলসী শতছিদ্র। যত জলই ভর না কেন এক ফোঁটা জলও সঞ্চয় করতে পারবে না।"

এই হেঁয়ালিপূর্ণ রূপক শুনিয়া তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম না, তিনি ঠিক কি বলিতে চাহিতেছেন। পরমুহূর্তেই কথাটা তিনি খুলিয়া বলিলেন, "তোমার বোনেদের আবার এখানে জুটিয়েছ কেন। সুশীলার না হয় অবস্থা খারাপ ; তার ছেলেমেয়েদের তুমি পড়াচ্ছ সেটা ভালই করছ। কিন্তু কাত্যায়নী আর দুর্গার গুষ্টি এখানে এসে আসর জমিয়েছে তার কোনও মানে হয় ? ওদের প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন ? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, কিন্তু ভাত ছাড়বে কেন তুমি শুধু শুধু ?"

আমি যে উত্তর সকলকে দিই, মামাকেও তাহাই দিলাম।

বলিলাম, "মামা, আমার আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আমি কাউকে নিমন্ত্রণ করেও আনিনি, কাউকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতেও পারব না। ওদের ভাগ্যে ওরা খাচ্ছে পরছে, আমি নিমিত্ত মাত্র।"

মামা তাঁহার সেই হাসিটি হাসিয়া বলিলেন, "খুব উচ্চাঙ্গের দার্শনিক কথা বললে বটে, কিন্তু আমি জানি ওটা তোমার মনের কথা নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে চেয়ে দেখেছ কোনদিন? তোমার চোখ কোটরে ঢুকেছে, সোনার মতো গায়ের রং কালিবর্ণ হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতরে পুড়ছ তুমি; খরচ কমাও, খরচ কমাও। বুড়ো মানুষের কথাটি শোন—"

আমার মামা পূজনীয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিবার স্পর্ধা আমার নাই, তবু একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। আমার গায়ের রং কোনও দিনই গৌরবর্ণ ছিল না। আমাকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও বলা চলে না। সত্যই আমার গায়ের রং বেশ কালো। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, মামার ধারণা অন্যরূপ। মামার আর একদিনের আর একটা কথাও মনে পড়িতেছে। সেদিন অনেকগুলি মেয়ে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহারা চলিয়া গেলে মামা প্রশ্ন করিলেন—"ওরা কে জান?"

"জানি বই কি। কয়েকজন সুলীনার বান্ধবী, আর বাকী ক'জন আমার লেখার ভক্ত। ওরা এসেছিল—"

মামা আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "আহা, ওসব পরিচয় ওদের আসল পরিচয় নয়। ওদের আসল পরিচয় কি তোমার জানা নেই?"

"আসল পরিচয়?"

"হ্যাঁ, আসল পরিচয়। ভুলে গেছ দেখছি। ওদের আসল পরিচয় ওরা প্রত্যেকেই একটি ঘিয়ের ভাঁড়। কেউ গাওয়া ঘি, কেউ ভঁয়সা ঘি, ভেজিটেবল ঘিও থাকতে পারে দু' একজন, কিন্তু সবাই ঘি আর তুমি আগুন। তোমার বয়স হয়েছে, যৌবনের আগুন হয়তো নিস্তেজ হয়েছে খানিকটা। কিন্তু তার বদলে এসেছে পয়সার আগুন। অতি ভয়ংকর আগুন এটা। সুতরাং ঘিয়ের কাছ থেকে সাবধান থেকো!"

মামার কটা চোখ দুটিতে ভৎ'সনার সহিত চাপা হাসি ঝিকমিক করিতে লাগিল। কোনও মামার পক্ষে ভাগ্‌নেকে এসব কথা বলা সমীচীন কি না তাহা আপনারা প্রণিধান করুন, আমি কিন্তু একটা কথা জানি। মামা যে আমার হিতৈষী এই কথাটা তিনি সুযোগ পাইলেই নানা ছুতায় আমার কাছে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পান। সেজন্য আমি তাঁহার এসব কথায় তেমন কিছু মনে করি না।

আমার নিজের কথা এতক্ষণ লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। সুলীনা আসিতেছে। খাতাটা মুড়িয়া রাখিতে হইল। তাহার সহিত যে কথাবার্তা হইবে তাহা পরে টুকিয়া লইব।

সুলীনা বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইতে ভালবাসে। দেশী বিদেশী বাঙালী পাঞ্জাবী কাশ্মিরী রাজস্থানী সব দেশের পোশাকের বিচিত্র সমন্বয় করাও তাহার প্রতিভার একটা লক্ষণ—অন্তত তাহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহাই বলেন। সে যা পরে তাহাই তাহাকে

মানায়, কারণ সে যুবতী এবং সুন্দরী। আমার মাঝে মাঝে বিসদৃশ ঠেকে, কিন্তু আমি সে কথা তাহাকে বলি না। বলিতে ভয় পাই। সে আজকাল মাসে গড়পড়তা চার পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করে, নিজের হাতখরচের জন্য হাজারখানেক টাকা রাখিয়া বাকিটা সে আমার হাতেই দেয়। তাহার আয়ের তুলনায় আমার আয় যৎসামান্য, মাসে হাজার টাকাও সব সময়ে হয় না। বস্তুত সুলীনার উপার্জনেই আমার এই ঠাটবাট বজায় আছে এবং এই চোখ-ধাঁধানো ঠাটবাটকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমিও টিঁকিয়া আছি। সুতরাং তাহার পোশাকের সমালোচনা করিয়া তাহার মনে আঘাত দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সুলীনা আমার নিকট যখন আসিল তখন তাহার পরনে আঁট প্যাণ্টালুন এবং কোমরকাটা ব্লাউস। ব্লাউসের উপর একটি সুদৃশ্য দোপাট্টা। সুলীনা তাহার একটি হাত পিছনের দিকে রাখিয়াছিল। মনে হইল গোপনে কি যেন লইয়া আসিয়াছে।

"জেঠুমণি তুমি চোখ বোজ। আমি আসছি।"

"আয় না, চোখ বুজব কেন।"

সুলীনা ঈষৎ নাকী সুরে আবদার করিয়া বলিল, "না, তুমি চোখ বোজ লক্ষ্মীটি—"

চোখ বুজিলাম। সুলীনা আসিয়া আমার চেয়ারের হাতলটার উপর বসিল।

"এইবার হাঁ কর।"

হাঁ করিলাম। সুলীনা আমার মুখের ভিতর কি যেন একটা ঢুকাইয়া দিল।

"এবার চিবোও। কি বল দেখি—"

"ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু চমৎকার খেতে। ডিম আছে মনে হচ্ছে? ওমলেট?"

বস্তুটা যে কি তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কলকণ্ঠের হাসি শুনিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই ভুল বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুলীনা হাসিয়া উঠিল, মনে হইল একটা কাচের বাসন যেন তাল ছন্দ বজায় রাখিয়া ভাঙিয়া গেল।

"জেঠু তুমি যে কি! এই তো কয়েকদিন আগে তোমাকে খাওয়ালাম। স্যাণ্ডুইচ, স্যাণ্ডুইচ। নিজ হাতে আজ তৈরি করেছি। ডিম অবশ্য আছে ওতে। ঠিকই ধরেছ—"

"হঠাৎ স্যাণ্ডুইচ করতে গেলে যে নিজ হাতে?"

"আজ রমেনের জন্মদিন যে। তাকে নেমন্তন্ন করেছি। গাড়ি নিয়ে একবার বেরুব এখন। কিছু ফাউল কাটলেট আর কিছু চিংড়ির কাটলেট নিয়ে আসব। রমেন খুব ভালবাসে—কিছু পীচ, পীয়র আর ম্যাঙ্গোষ্টীনও আনব।"

"তা তোমার যাবার দরকার কি। ড্রাইভার গিয়েই তো আনতে পারে।"

"না, ও ঠিক পারবে না। আমাকে যেতে হবে।"

বুঝিলাম এই সূত্রে বাহিরে গিয়া সে রমেনের সহিত যোগাযোগ করিবে। বুঝিলাম, কিন্তু মানা করিতে পারিলাম না। তাহার নিজের দামী গাড়ি আছে, নিজেই চালায়। কাহারও তোয়াক্কা করে না।

"কুকুরটাকে কোথা রেখে এলি ?"

"চান করিয়ে ভিতরের বারান্দায় বেঁধে দিয়েছি।"

"বাইরের বারান্দায় বেঁধে দে—"

"কেন—"

"এমনি। বারান্দায় বেঁধে রাখলে বেশ চমৎকার মানায়।"

"বেশ, তাই বেঁধে দিচ্ছি। আমি এখন উঠি তাহলে। ফুলও কিনতে হবে। যদি পাই তোমার জন্তে পদ্মও কিনে আনব কিছু।"

সুলীনা আমার দুই গালে হাত দিয়া এমন ভাবে আদর করিল, যেন আমি একটা ছোট শিশু। তাহার পর ভিতরে চলিয়া গেল। আমি রমেনের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। রমেন খুব ভালো ছেলে। অমন ভালো ছেলে প্রায় দেখা যায় না। নিজের চেষ্টায় কৃতিত্বের শিখরে আরোহণ করিয়াছে। গরীবের ছেলে, আপনজন কেহ নাই, প্রাইভেট ট্যুশনি করিয়া বরাবর পড়িয়াছে এবং বরাবর পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এখন চাকরি করে। চাকরি ভালো, ভবিষ্যতে হয়তো উন্নতি করিবে। কিন্তু এখন বেতন পায় সামান্য, মাত্র দুইশত টাকা, ইহাতে তাহার নিজের কোনরকমে চলিয়া যায়। সুলীনার সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল পত্রযোগে। সুলীনারও অনেক চিঠি আসে রোজ। অধিকাংশ চিঠিই স্তব-স্তুতিতে ভরা। সুলীনা গর্বভরে তাহার সব চিঠিই আমাকে দেখাইত। একদিন সুলীনা আসিয়া বলিল, "দেখ তো জেঠু, এই অসভ্য লোকটা কি বিশ্রী চিঠি লিখেছে।" সেইটি রমেনের প্রথম পত্র। রমেন লিখিয়াছিল, শ্রীমতী সুলীনা দেবী, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন আপনার চেহারা ভালো। আপনার এই চেহারাকে যদি সু-অভিনয়ের কাজে লাগাইতে পারিতেন তাহা হইলে সিনেমা-জগতে আপনি একটা স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি আপনার সেদিকে মন নাই। আপনার অভিনয়ে ন্যাকামি এবং নিতান্ত অকারণে দৈহিক যৌবন-সম্ভার প্রদর্শন করিবার অশোভন প্রবণতা এত বেশী যে মাঝে মাঝে তাহা শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। আপনাকে ভালো লাগিয়াছে বলিয়া এবং আপনার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া এই রূঢ় কথাগুলি কর্তব্যবোধে লিখিলাম। যদি অন্যায় করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করিবেন।

রমেনের এই ছোট চিঠিটি এতো ভাল লাগিয়াছিল এবং এতবার সেটি পড়িয়াছিলাম যে আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। সুলীনার সম্বন্ধে অমন সত্য কথা আর কেহ লেখে নাই। সত্যকথা সর্বদা অপ্রিয় হয় না, কিন্তু যখন হয় তখন তাহা কুইনিনকেও হার মানায়। মনে পড়িতেছে সুলীনার মুখটা।

"কি বিশ্রী চিঠি লিখেছে দেখেছ। সত্যি আমি ওই রকম করি নাকি জেঠু ?"

বলিলাম, "আরে না না। পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়। সবাইয়ের

কথা কি শুনতে আছে ? আমার কাছে মাঝে মাঝে কি রকম খারাপ চিঠি আসে দেখিস নি ? ওসব অগ্রাহ্য করতে হয়।"

স্থলীনা কয়েক মুহূর্ত ছলছল চোখে ঠোঁট ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর একটা নাটকীয় কাণ্ড করিয়া ফেলিল। হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া আমার কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিল, "ও যা লিখেছে সবই সত্যি। আমি ওই রকমই করি। কিন্তু কি করব, ডিরেকটার যে আমাকে ওই রকম করতে বলে—"

আমি কি আর বলিব, আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম

রমেনের সঙ্গে আলাপের এই প্রথম ধাপ। এর পর অনেক ধাপ অতিক্রম করিয়াছে তাহারা। এখন ভাবভঙ্গী হইতে মনে হয় রমেন স্থলীনার প্রণয়ী। মুখে সে প্রণয় প্রকাশ করিয়াছে কি না জানি না, তাহার ব্যবহারে সংযম ও সুরুচির যে সুষ্ঠু প্রকাশ দেখি তাহাতে মনে হয় না বর্তমান যুগের প্রগল্‌ভ যুবকদের মতো সে অসার বাক্যের ফুলঝুরি কাটিয়া স্থলীনার সম্ভ্রমকে বিব্রত করিয়াছে। সন্দেহ হয় মুখে হয়তো সে কিছুই বলে নাই। স্থলীনার অনেক প্রণয়ী, অধিকাংশই ধনীর সন্তান, তাহারা যখন তখন দামী দামী গাড়ি চড়িয়া আমাদের বাড়িতে আসে এবং খানিকক্ষণ স্থলীনার সহিত হাস্য-পরিহাস করিয়া চলিয়া যায়। রমেন কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে কখনও আসে না। স্থলীনা নিজেই অনেক সময় তাহার সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়াছে, ছুটির দিনে অনেক সময় তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইয়া বেড়াইয়া আসিয়াছে। তাহারা পরস্পর কি আলাপ করে জানি না। স্থলীনা তাহার অন্যান্য বন্ধুদের সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে আমার সহিত আলাপ করে। কিন্তু রমেনের কথা বড় একটা বলে না। যতটুকু বলে তাহা সশ্রদ্ধ ও সম্ভ্রমপূর্ণ। তাই মনে হয় স্থলীনাও রমেনকে ভালবাসিয়াছে। প্রকৃত ভালবাসা প্রথমে ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলা হয় শুনিয়াছি। কি যে হইবে, ভয়ে ভয়ে আছি।

স্থলীনা বাহির হইয়া আসিল। ইরানীর বেশে সাজিয়া আসিয়াছে। নানাবর্ণের অপরূপ সমন্বয়ে মহিমময়ী হইয়া উঠিয়াছে যেন। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। আজ এত সাজের ঘটা কেন ?

"জেঠু আমি চললুম। জিমি এখানে বাঁধা রইল—"

দেখিলাম একটা টিফিন বাক্স লইয়া বেয়ারাটা পিছু পিছু আসিল।

"ওটা আমার গাড়িতে তুলে দে—"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওতে কি নিয়ে যাচ্ছিস ?"

"রমেন যদি না আসতে চায়, ওইখানেই খাইয়ে দেব তাকে। যা ছেলে হয়তো বলবে সময় নেই।"

স্থলীনা যখন বাহিরে যায় তখন একটা পুরাতন গাড়িতে পর্দাবৃত হইয়া যাওয়া পছন্দ করে। তাহা না করিলে রাস্তায় তাহাকে দেখিবার জন্য ভিড় জমিয়া যায়।

স্থলীনা চলিয়া গেল।

আমি গেটের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম লোম-ওঠা কুকুরটা কখন আসিবে ?

দ্বিতীয় পক্ষীর কথা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের যে সত্তার কাহিনী আপনারা এতক্ষণ শুনিতেছিলেন আমি সেই সত্তারই দ্বিতীয় অংশ। যোগেন্দ্রনাথের সত্তাটির যে অংশ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে অর্থাৎ সুখে উল্লসিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছে আমি সে অংশ নহি, আমি নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র। যদি কল্পনা করিতে পারেন যে একই ব্যক্তির একটা অংশ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছে এবং আর একটা অংশ প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সে অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে তাহা হইলে ব্যাপারটা হয়তো বুঝিতে পারিবেন। একটু তফাত অবশ্য আছে। আপনারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কিছুক্ষণ মাত্র দেখেন। কিন্তু মানবজীবনের যে অভিনয়ের কথা বলিলাম তাহা সবক্ষণ চলিতেছে। জীবনের বিরাট রঙ্গমঞ্চে একই সত্তার দুইটি অংশ অভিনেতা ও দর্শকরূপে সর্বদা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এ কল্পনাতেও একটু ভুল আছে। আপনাদের রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে দর্শকরাও বিচলিত হন। কিন্তু যে মহানাটকের কথা বলিতেছি সে মহানাটকের দর্শক নির্বিকার। তিনি উচ্ছ্বসিত হন না, অবসন্ন হন না, তিনি কেবল নিরীক্ষণ করেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবন-নাট্যে আমি সেইরূপ নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র। যোগেন্দ্রনাথের জীবনের কোন কার্যকেই আমি ভালো বা মন্দ আখ্যায় চিহ্নিত করি না। ভালো মন্দ আপনাদের সৃষ্টি। স্থান কাল পাত্রভেদে তাহাদের রূপ পরিবর্তন হয়। এদেশে যাহা ভালো অন্য দেশে তাহা মন্দ, একালে যাহা ভালে অন্য কালে তাহা মন্দ, একজনের পক্ষে যাহা ভালো অন্যজনের পক্ষে তাহাই মন্দ। সুতরাং যোগেন্দ্রনাথ জীবনে যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা ভালো কি মন্দ এসব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। বস্তুত কোন বিষয় লইয়াই আমি মাথা ঘামাই না, আমি নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র, বিচারক নহি। কিন্তু যে লেখক যোগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া তাঁহার আত্মকথা বলাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা আমিও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলি। লেখকেরা কবি। কবিদের আদেশে ভগবানও স্বর্গ হইতে নামিয়া আসেন, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইয়া দেখা দেন। আমিও তাঁহার এ আগ্রহ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে যোগেন্দ্রনাথের যতটুকু দেখিয়াছি, যতটুকু বুঝিয়াছি তাহা অকপটে ব্যক্ত করিব। একটা কথা গোড়াতেই বলি। লেখক যোগেন্দ্রনাথের যে আত্মচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে অনেক জিনিসই বাদ পড়িয়াছে। তিনি তাঁহার বাল্যকাল বা কৈশোর সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার বাল্যকালের ও কৈশোরের কয়েকটি ঘটনায় তাঁহার পরবর্তী-জীবন আভাসিত হয়।

শৈশবে তিনি অতিশয় আতুরে এবং একগুঁয়ে ছিলেন। যাহা লইব বলিয়া বায়না ধরিতেন তাহা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার শান্তি থা কত না। তাঁহার বাবা মা এজন্য মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়িতেন। একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। যোগেনের বয়স তখন তিন কি চার হইবে। সেদিন পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। যোগেনের মা যোগেনকে কোলে লইয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া ছড়া বলিতেছিলেন—আয় আয় চাঁদ আয়, আয় আয় আয়রে, যোগেনের কপালেতে টিপ দিয়ে যারে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল—যোগেন হঠাৎ বায়না ধরিল—মা আমি চাঁদ নেব। আমাকে চাঁদটা পেড়ে দাও। তাহার মা তাহাকে কত বুঝাইলেন—চাঁদ কি পাড়া যায় বাবা? কত উঁচুতে আছে দেখছ না? কিন্তু যোগেন এসব স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিলেন। চীৎকার শুনিয়া যোগেনের মামা ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ওকি, যোগেন কাঁদছে কেন? কি চায়?"

মা উত্তর দিলেন, "তোমার ভাগ্নে আকাশের চাঁদ চাইছে। কি করে দিই বল—"

"আচ্ছা, আমি দিচ্ছি—"

যোগেনের মামা ভিতরে গিয়া ছোট একটি হাত-আয়না লইয়া আসিলেন। আয়নার ভিতর চাঁদকে প্রতিফলিত করিয়া সেটি যোগেনের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও চাঁদ। দেখ, দেখ—বাঃ, কেমন সুন্দর চাঁদ।" যোগেনের কান্না থামিল। যোগেন যখন স্কুলে পড়িত তখন তাহার বাতিক ছিল নানারকম প্রজাপতি ও রঙীন ফড়িং ধরা। এজন্য বনেবাদাড়ে ঝোপেঝাড়ে কণ্টক কর্দমকে তুচ্ছ করিয়া সে যে কত প্রজাপতি ও রঙীন ফড়িং ধরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বড় বড় কাচের জার কিনিয়া তাহাদের ভিতর প্রজাপতি ফড়িংদের রাখিত আর স্বপ্ন দেখিত। কত স্বপ্নই যে দেখিত। ছেলেবেলা হইতেই তাহার স্বপ্ন দেখা অভ্যাস ছিল। যে কোনও তুচ্ছ জিনিসকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনে রঙীন স্বপ্ন ঘনাইয়া উঠিত। এই স্বপ্ন দেখার প্রবণতাই তাহাকে লেখক করিয়াছে। আহা, এই স্বপ্নদেখা ব্যাপারটা সে যদি নির্বিকার ভাবে করিতে পারিত। স্বপ্ন যে স্বপ্নই, কিছুক্ষণ পরেই তাহা যে মিলাইয়া যাইবে, তাহাকে যে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহাকে কোনও বন্ধনে বন্দী করা যে অসম্ভব এ বোধটা কিন্তু তাহার জীবনে কখনও জাগিল না। অনিত্য আলেয়াকে নিত্যবস্তু মনে করিয়া সে বার বার তাহাকে খাঁচায় পুরিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে ছেলেবেলায় যখন স্কুলে পড়িত তখন তাহার আর একটা শখও ছিল, ঘুড়ি-ওড়ানো। ছোট বড় নানারঙের ঘুড়ি উড়াইয়াছেন যোগেন্দ্রনাথ। লাটাইও নানারকম ছিল। ঘুড়ির সুতাকে মজবুত করিবার জন্যই নানারকম 'মানজা'ও সংগ্রহ করিতেন তিনি। মানজার উদ্দেশ্য শুধু নিজের ঘুড়ির সুতাকে মজবুত করা নয়, অপরের ঘুড়ির সুতাকে কাটিয়া দেওয়াও। অপরের ঘুড়িকে কাটিয়া দিয়া তিনি অদ্ভুত আনন্দ পাইতেন। তাঁহার নিজের ঘুড়িও বার বার কাটিয়া গিয়া তাঁহার অন্তরকে বিষাদে পরিপূর্ণ করিয়া দিত। তাঁহার জীবনে,

ঘুড়ি-ওড়ানোর যুগে, তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল তাঁহার ঘুড়িটা শুধু যে অপরের ঈর্ষা উৎপাদন করিবে, তাহাই নহে, তাহা সকলের ঘুড়িকে কাটিয়া দিয়া একাকী স-গৌরবে চিরকাল আকাশে উড়িবে। কিন্তু এ অসম্ভব সম্ভব হয় নাই। যোগেন্দ্রনাথের ঘুড়ি বার বার কাটিয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ তখন সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন যে ঘুড়িটা তাঁহারই, যে লাটাই এবং সুতা ঘুড়িটাকে চালাইতেছে তাহাও তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। কিছুই যে তাঁহার নহে, সবই যে প্রকৃতির মায়া মাত্র, ওই ঘুড়ি-ওড়ানোটাই যে প্রকৃতি-পরিকল্পিত ক্ষণিক লীলা মাত্র—এ সব চিন্তা একবারও যোগেন্দ্রনাথের মনে জাগে নাই। আমিই ঘুড়ির মালিক, আমিই ঘুড়ির চালক, বুদ্ধি ও কৌশল সহকারে চালাইতে পারিলে আমার ঘুড়ি বিজয়ী হইয়া চিরকাল আকাশে উড়িবে—এই ধরনের চিন্তায় সম্মোহিত হইয়া যোগেন্দ্রনাথ বাল্যকালে ঘুড়ি উড়াইতেন। এজন্য অনেক মনোকষ্টও তাঁহাকে পাইতে হইয়াছে। উপমার সাহায্য লইতে যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তাহা হইলে বলিব যোগেন্দ্রনাথের বাল্য অবস্থা এখনও কাটে নাই। এখনও তিনি সামান্য দর্পণে প্রতিফলিত চাঁদকে করায়ত্ত করিয়া ভাবিতেছেন আকাশের চাঁদই বুঝি সত্যই তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া গিয়াছে। এখনও তিনি বহুরকম প্রজাপতি ফড়িং ধরিয়া তাহাদের নানাভাবে বন্দী করিয়া ভাবিতেছেন যে তাহারা বুঝি চিরকাল তাঁহার সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। এখনও তাঁহার ঘুড়ি-ওড়ানোর নেশা কাটে নাই। এ ঘুড়ি অবশ্য কাগজের ঘুড়ি নহে, অন্যরকম ঘুড়ি। আগেই বলিয়াছি যোগেন্দ্রনাথের বাল্য-কাল এখনও কাটে নাই, বাল্যকালের খেলনাগুলি তাহাদের রূপ বদলাইয়াছে মাত্র। একটু কিন্তু তফাত আছে। শিশুদের খেলনার সম্বন্ধে আগ্রহ থাকে বটে কিন্তু সেই আগ্রহের পাশাপাশি বৈরাগ্যও থাকে। যে খেলনা পাইবার জন্য শিশু আজ উদ্বাহু, দুইদিন পরে দেখা যায় সে খেলনা সে ধূলায় অবহেলাভরে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আর তাহার মোহ নাই। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মোহ বাড়ে, তখন মানুষ যাহা পায় তাহা আর ছাড়িতে চায় না, একেবারে আঁকড়াইয়া থাকে। যখন সে-সব জিনিসের প্রয়োজনও ফুরাইয়া যায়, তখনও তাহাদের ফেলিতে পারে না। অপ্রয়োজনীয় জিনিসের স্তূপ শ্বাসরোধকর হইয়া ওঠে, তবু পারে না। অধিকাংশ মানুষই অনর্থক সঞ্চয়ী, যোগেন্দ্রনাথও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। যোগেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে একটি খেঁকি কুকুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবে ও কুকুরের কোন অস্তিত্ব নাই। উহা যোগেন্দ্রনাথের কল্পনার সৃষ্টি। আমার মনে হয় কুকুরটি উহার নিজেরই নিষ্পিষ্ট বিবেক। যে সব কথা মানুষ যোগেন্দ্রনাথ সাহস করিয়া সমাজে উচ্চারণ করিতে পারেন নাই সেই সব কথা তিনি কুকুরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। উহা তাঁহার আত্মগ্লানিরই একটা প্রকাশ মাত্র। কুকুর যাহা বলিয়াছে তাহার সত্যাসত্য আপনারা নির্ধারণ করুন, আমি শুধু জানি উহা যোগেন্দ্রনাথের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি মাত্র। নাড়ু বা নাড়ুর স্ত্রীর সম্বন্ধেও সব কথা স্পষ্ট বলা হয় নাই। তাহাদের যে শোচনীয় পরিণতি হইয়াছে তাহা

অবশ্যই তাহাদের কর্মফল। কিন্তু এই কর্মফল কিভাবে তাহাদের অভিভূত করিল তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জানিলে তাহাদের প্রতি ঘৃণা হইবে না, বরং তাহাদের জন্য হৃদয় অনুকম্পায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। অসহায় শিশুকে প্রবল বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলে যে দুঃখ হয় সেই প্রকার দুঃখে হৃদয় বিচলিত হইবে। নাদুর সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা উল্লেখযোগ্য। শৈশবে তাহার প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল ততটা মনোযোগ তাহার পিতামাতা তাহার প্রতি দেন নাই। বাল্যকাল হইতেই যোগেন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে লইয়াই মাতিয়া ছিলেন সবাই। এমন কি উঁহাদের গৃহশিক্ষক পর্যন্ত। স্বল্পবুদ্ধি নাদুর দিকে কেহ তেমন নজর দেয় নাই। যোগেন্দ্রনাথ ক্লাসে প্রত্যেকবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নানাবিধ প্রাইজ লইয়া বাড়িতে আসিতেন, আর নাদু কোনক্রমে পাস করিয়া প্রমোশন পাইত মাত্র। দুই এক বছর তাহাও পাইত না। নাদু যে অতি 'ওঁছা' 'অগা' 'গবেট'— এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাহার দফা যে নিকাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার যে আর উদ্ধারের আশা নাই, একথা সকলের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মনেও এই বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে লেখাপড়ার রাস্তায় চলিয়া আর সে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। সুতরাং ও পথে চলার চেষ্টাও সে কিছুদিন পরে ছাড়িয়া দিল। মানুষের মন কিন্তু কোন-না-কোন ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য সদাই উন্মুখ। সদাসর্বদাই সে সেই জগৎ আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত যেখানে তাহার পটুতা জয়মাল্যে ভূষিত হইবে। এইরূপ একটি ক্ষেত্র নাদু আবিষ্কার করিয়াছিল তাহার বন্ধুমহলে। নাদু পড়াশোনায় ভাল না হইলেও অন্য অনেক গুণ ছিল তাহার। সে ভালো ক্যারিকেচার করিতে পারিত, তাস খেলায় খুব দক্ষ ছিল, চমৎকার ম্যাজিক দেখাইত এবং সর্বোপরি তাহার বাকচাতুর্য এমন হৃদয়গ্রাহী ছিল, এমন অনায়াসে সে সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করিতে পারিত যে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। যদিও সে ম্যাট্রিকুলেশনও পাস করিতে পারে নাই কিন্তু তাহার অনর্গল ইংরেজি শুনিয়া মনে হইত সে বুঝি এম. এ. পাস। চেহারাও চমৎকার ছিল তাহার। তাহার এই সব গুণ তাহার দুইটি বন্ধুকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। দুইজনই অবাঙালী। একজন মাড়োয়ারী—শিউরাম আর একজন আগ্রার মুসলমান—আবদুল লতিফ। দুইজনেই ধনী। দুইজনেরই ফালাও কারবার ছিল। নাদুর কারবার-বিষয়ক জ্ঞানের জন্য নহে, তাহাকে ভালবাসিত বলিয়াই তাহারা তাহাকে তাহাদের ব্যবসায়ে দালাল হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিল। দুইজনের ব্যবসায়ে বিরোধও ছিল না। শিউরামের ছিল ঘিয়ের ব্যবসায় আর লতিফের ছিল কার্পেটের। দালালির কমিশন হিসাবে ঠিক সে কত রোজগার করিত তাহা ঠিক জানি না, যোগেন্দ্রনাথের ধারণা বিশেষ কিছু করিত না। তাহার বন্ধু-মনিবরা তাহাকে মাঝে মাঝে কিছু বখসিস দিত তাহাই তাহার মুখ্য রোজগার ছিল—এই কথাই যোগেন্দ্রনাথ

তাঁহার আত্মকথায় বলিয়াছেন। কিন্তু সব কথা তিনি খুলিয়া বলেন নাই। সম্ভবত চক্ষুলজ্জাবশতই তিনি ঘটনাটা চাপিয়া গিয়াছেন। নাদু যোগেন্দ্রনাথকে মনে মনে খুব ভক্তি করিত। সে ইহা কুণ্ঠার সহিত অনুভব করিত যে সে নিজে একটা অপদার্থ, তাহার নিজের সংসারভার দাদার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছে। এই ভক্তি বা কুণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু অদ্ভুত ধরনের ছিল। সে সর্বদাই যেন একটা বেপরোয়া বিদ্রোহীর ভাব লইয়া ঘোরাফেরা করিত, যাহা উপার্জন করিত তাহার অধিকাংশই নিজের শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যয় করিয়া বাহিরে একটা মেকী আভিজাত্যের ভড়ং জাহির করিবার প্রয়াস পাইত সে। অন্তরে সে দীন ছিল বলিয়াই বাহিরের একটা মুখোশ তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকেরই হয়। নিতান্ত ভিখারীরও একটা সাধুত্বের ভড়ং থাকে। যোগেন্দ্রনাথ কবি, তিনি নাদুর অশোভন আচরণের প্রকৃত অর্থ বুঝিতেন, কিন্তু বাহিরে তিনি নাদুর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। কারণ কবি বা দার্শনিকেরা সব সময়ে কার্যক্ষেত্রে মহৎ হইতে পারেন না। কবি হইলেই যে মহৎ হইবে এমন কোন কথা নাই। যোগেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাই সে সময়ে স্বার্থের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। নাদু তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। ইহার আর একটা কারণ অবশ্য নাদুর বাবা মা। তাঁহারা সব সময়ে এই অপদার্থ নাদুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন বলিয়া যোগেন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা আরও বাড়িয়াছিল। নাদুর বাবা মারও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ পিতামাতারা সাধারণতঃ অসমর্থ সন্তানেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। স্নেহের ইহাই নিয়ম। আর একটি ঘটনাও যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে বলেন নাই। নাদুর মুসলমান বন্ধু আবদুল লতিফ যেদিন প্রথম তাহার স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সেদিন নাদু যোগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিল, "লতিফ ছোটবউকে তার বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ করেছে। বলেছে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। বাবা-মাকে বলেছি, তাঁদের আপত্তি নেই। তাঁরা বরং বললেন—যাওয়াই ভালো। উনি তোমার মনিব আর এমন হিতৈষী বন্ধু, না গেলে অন্যায় হবে। কিন্তু ছোটবউকে নিয়ে যাবার আমার তেমন ইচ্ছে নেই, যদিও মুখে সেটা ওকে বলতে পারছি না। ওদের যদি বলি, তুমি আপত্তি করেছ—।" যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি আপত্তি করতে যাব কেন। তুমি যা ভাল বোঝ কর।" সেদিন যোগেন্দ্রনাথ যদি আপত্তি করিতেন তাহা হইলে ভয়ংকর যোগাযোগটা হয়তো হইত না। নাদুর মনের জোর ছিল না, সে বাধা দিতে পারে নাই। ঘন ঘন নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, শুধু নিমন্ত্রণ নয়, নিমন্ত্রণের সহিত নানারূপ ভেটও। ছোট বউ আবদুল লতিফের বাড়ি হইতে শেষে বাগানবাড়িতে যাইতে শুরু করিল। ইহার কিছুদিন পরে সে আবদুল লতিফের সহিত পলাইয়া যায়। স্ত্রীর খোঁজ করিবার জন্য নাদু বাহির হইয়াছিল। আর ফেরে নাই। তাহাদের শোচনীয় মৃত্যুর কথা যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আর একটি শোচনীয় মৃত্যুর কথা তিনি বলেন

নাই। টেঁপির একটি ছোট ভাই ছিল। বয়স ছয় বৎসর। পিতামাতার আকস্মিক অন্তর্ধানে সে যেন কেমন হইয়া গেল। দিনরাত তাহার চোখ দিয়া জল পড়িত, অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিল। প্রায়ই দেখা যাইত উলঙ্গ হইয়া সে বাড়ির বাহিরের বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, চোখে জল ঝরিতেছে। একমাত্র টেঁপিই তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, খাওয়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু কৃতকার্য হইত না। তখন তাহাকে প্রহার করিত। নিষ্ঠুর সে প্রহার। ছোট ভাইয়ের প্রতি করুণা এবং পিতামাতার কলঙ্কের জন্য লজ্জা নিষ্ফল আক্রোশে ওই হতভাগ্য শিশুটাকেই পীড়ন করিত। ছেলেটা কিছুদিন পরে যক্ষ্মারোগে মারা যায়। যোগেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতে কিছু বলেন নাই, কারণ এজন্য মনে মনে তিনি দোষী হইয়া আছেন। ছেলেটার ভালো চিকিৎসাও হয় নাই। টেঁপির সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ কিছু বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সবটা বলেন নাই। বাল্যকালে টেঁপিকে যে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার ও লাঞ্ছনা বহন করিতে হইয়াছে তাহার যথাযথ চিত্র ভয়ংকর। ওইটুকু মেয়েকে ভোর চারটার সময় উঠিয়া সকলকে চা করিয়া দিতে হইত। শীতকালে গরম জামাও থাকিত না বেচারীর। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতেই সব কাজ করিতে হইত তাহাকে। যোগেন্দ্রনাথ ঝি ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। টেঁপিই ঝিয়ের সমস্ত কাজ করিত। ভোরবেলা হইতে রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত সকলের ফরমাশ খাটিত সে। কাহারও পান হইতে চুন খসিলেই বকুনি খাইতে হইত। সে রূপসী, ইহাও তাহার যেন একটা অপরাধ। যোগেন্দ্রনাথের কুৎসিত মেয়েগুলি ইহা লইয়া তাহাকে যে ভাষায় গঞ্জনা দিত, তাহা মোটেই ভদ্রভাষা নহে। এইভাবেই তাহার দুঃখের দিনগুলি কাটিতেছিল, এমন সময় একদিন পরেশ বিশ্বাস রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিলেন। পরেশ বিশ্বাস একজন আধুনিক কবি, ঝাপসা প্যাচালো ভাষায় প্রেমের কবিতা লেখেন। তিনি লেখক যোগেন্দ্রনাথের ভক্ত হিসাবে একদিন তাঁহার বাড়িতে দেখা করিতে আসিলেন এবং সেখানে মূর্তিমতী আধুনিক কবিতা টেঁপিকে দেখিয়া এমন অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে প্রায় প্রত্যহই আসিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটই টেঁপি উক্ত সিনেমা ডিরেকটারের খবর পাইয়াছিল এবং তাঁহারই প্ররোচনায় তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ একথা জানিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার আত্মচরিতে এমন ভাব দেখাইয়াছেন যে তিনি কিছুই জানিতেন না। উক্ত আধুনিক কবিরও সিনেমা-পটে নায়করূপে অবতীর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষা আরও স্বপ্নমধুর হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে আহা টেঁপিও যদি আমার সহিত নায়িকা হইয়া নামে! তাই তিনি টেঁপির পত্র লইয়া সিনেমা ডিরেকটারের কাছে গিয়াছিলেন, নিজের কথাও সম্ভবত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই খেলা, সিনেমা ডিরেকটার তাঁহাকে নির্বাচন করিলেন না, টেঁপিকেই করিলেন। টেঁপির ভাগ্য পরিবর্তন হইল। টেঁপির সহিত যোগেন্দ্রনাথেরও। গোগেন্দ্রনাথ বড়জোর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক ছিলেন, আজকালকার উন্নাসিক

সমালোচকগণ হয়তো বলিবেন তৃতীয় শ্রেণীর। উন্নাসিক সমালোচকদের আমি তেমন আমল দিই না। তাঁহাদের ওই উন্নাসিকতাটুকুই আছে, ভিতরে বস্তু নাই। তাঁহারা প্রায় যাহা বলেন তাহা ঈর্ষা-প্রসূত পূতিগন্ধময় অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। যোগেন্দ্রনাথ খুব খারাপ লেখক নন। কিন্তু ইদানীং টেঁপির কল্যাণে যতটা খ্যাতি তিনি লাভ করিয়াছেন ততটা খ্যাতি ভবিষ্যতে তাঁহার থাকিবে না, কালের নিকষে যাচাই হইয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য অনেকটা ম্লান হইয়া যাইবে। একথা যোগেন্দ্রনাথও যে না জানেন তাহা নয়। কিন্তু সব সময়ে কথাটা তাঁহার মনে থাকে না। যখন রাশি রাশি টাকা আসে, রাশি রাশি চিঠি আসে, যখন দলে দলে ভক্ত ও প্রকাশকেরা তাঁহার দ্বারে ভিড় করে, যখন কাগজে কাগজে তোষামোদপ্রিয় সমালোচকরা তাঁহার জয়ধ্বনি করে—তখন তাঁহার মনে থাকে না যে তিনি সাধারণ লেখক মাত্র। সাহিত্যের পথে বড়জোর একজন পদাতিক, রথী বা মহারথী নন। সত্যই তখন তাঁহার মতিভ্রম হয়, সত্যই তখন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের পংক্তিতে নিজেকে বসাইয়া অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

লেখক হিসাবে তিনি বড় বা ছোট যা-ই হোন একটা কথা সত্য, লেখনীর জোরেই তাঁহার আধিভৌতিক দুঃখ ঘুচিয়াছে। আর একটা কথাও সত্য। যে অর্থ তিনি উপার্জন করিতেছেন, তাহা তিনি একা ভোগ করেন নাই। শুধু তিনি লেখক বলিয়াই বিখ্যাত নহেন, আত্মীয়-প্রতিপালক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে। কোনও প্রার্থী তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যায় না। সব সময়ে তিনি যে প্রসন্ন মনে দান করেন তাহা নয়, নানারকম আধুনিক কুসংস্কার অনেক সময় তাঁহার দানের মাহাত্ম্যকে মলিন করিয়া দেয়—কিন্তু ইহাও সত্য কথা। কোন প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করেন না। এ ব্যাপারে অবশ্য তাঁহার একটু অহংকার আছে। তাঁহার এক কাকা নাকি খুব ধনী ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের যখন অত্যন্ত দুরবস্থা, প্রথম জীবনে মাস্টারি করিতে করিতে যখন দারিদ্র্যের ভারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেন, তখন এই ধনী কাকার কথা তাঁহার মনে হইত। তাঁহাকে দুই-একবার পত্রও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর আসে নাই। তখন তাঁহার মাঝে মাঝে মনে হইত—হায়রে ভগবান যাহাকে ধন দিয়াছেন, তাহাকে দান করিবার মতো মন দেন নাই। আমার যদি কোনদিন টাকা হয় আমি দেখাইয়া দিব ধনের সদ্ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয়। 'আমি দেখাইয়া দিব'—এই অহংকারই তাঁহাকে বদান্য আত্মীয়-প্রতিপালক করিয়াছে। অহংকারের এটা ভালো দিক। অহংকার নিজেকে চরিতার্থ করিয়াই আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অহং-এর সম্যক উপলব্ধি হইলে ঈশ্বর-দর্শনও হয় শুনিয়াছি। সুতরাং সুখেরও সীমা থাকে না। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মোটেই সুখী নন। একথা নিজেও তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন। হাল-বিহীন নৌকা যেমন স্রোতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে ডুবিয়া যায়, যোগেন্দ্রনাথের আদর্শহীন জীবনও তেমনি নানা ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হইয়া অবশেষে

বিনষ্ট হইবে ইহাই আমার আশঙ্কা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যোগেন্দ্রনাথ আদর্শবান। কিন্তু যে আদর্শ জীবনের সর্বকর্মকে একমুখী করিয়া মালার ন্যায় গাঁথিতে পারে সে আদর্শ যোগেন্দ্রনাথের নাই। সুবিধাবাদী যোগেন্দ্রনাথ যখন যেটাকে নিজের কার্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ মনে করিয়াছেন তখনই সেটা আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় আদর্শ ছিল যেমন করিয়া হোক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাইতে হইবে। এজন্য তিনি রাত জাগিয়া নোট মুখস্থ করিয়াছেন, শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়া প্রশ্নের ধরনটা কিরূপ হইবে জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একবার পরীক্ষার 'হলে' বই হইতে টুকিয়াছেন পর্যন্ত। পরীক্ষায় তিনি ভালো নম্বরই পাইয়াছেন। কিন্তু সুখী হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি যতবার অনুচিত কর্মে রত হইয়াছেন ততবার তাঁহাকে বিবেকের ভ্রূকুটির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মানুষ যত হীন যত নীচই হোক না কেন, তাহার বিবেক কখনও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় না। এই বিবেক কখনও মৃদুকণ্ঠে, কখনও তারস্বরে সর্বদা মানুষকে তাহার দুষ্কর্মের জন্য ভৎ'সনা করে। এই ভৎ'সনাই তাহার অসুখের হেতু। সে মনে মনে অনুভব করে—আমি যাহা করিয়াছি তাহা অন্যায়, তাহা অশিব, তাহা অসুন্দর, তাহা মিথ্যা। এই চিন্তা তাহার সুখের বুকে, তাহার শান্তির মূলে কীটের ন্যায় অহরহ দংশন করে। তিনি কাম্যবস্তু পান বটে, কিন্তু তাঁহার সুখশান্তি অন্তর্হিত হয়। যোগেন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছে। বাহিরে তিনি ধনী বটেন, কিন্তু অন্তরে তিনি নিঃস্ব। এই নিঃস্বতা তিনি প্রতিমুহূর্তে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ যদি চিরকাল আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক থাকিতেন তাহা হইলে তিনি ধনী হইতেন না, কিন্তু সুখী হইতেন। লেখক যোগেন্দ্রনাথ যদি সস্তা খ্যাতি এবং প্রচুর অর্থের মোহে আত্মহারা না হইয়া নিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরূপে থাকিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি এক অসুখী হইতেন না। কেন তিনি সুবিধাবাদী হইয়াছেন ইহার সপক্ষে তিনি এখন নানা যুক্তি খাড়া করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বিবেক তাহাতে নিরস্ত হইতেছে না। সে ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছে, তুমি পাজী, তুমি লোভী, তুমি চোরাকারবারী। শিক্ষা এবং সাহিত্যের পবিত্র মন্দিরে তুমি বাজে অপবিত্র মাল পাচার করিয়া কৌশলে বেশী দাম আদায় করিয়াছ। তুমি অসাধু প্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছু নও। বিবেকের এই তাড়নায় যোগেন্দ্রনাথ সর্বদাই ম্রিয়মাণ। তিনি সাহিত্যিক, বাহিরের সকলে জানে তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক। কিন্তু তিনি নিজে জানেন তিনি ইহার বিপরীত। এই জ্ঞান, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। তিনি জানেন আধুনিক কল-কব্জা-যন্ত্রের যুগের একমাত্র চাহিদা 'আরও, আরও, আরও,' একমাত্র আকাঙ্ক্ষা 'টাকা, টাকা, টাকা', তিনি ইহাও জানেন এই সর্বনাশা কামনা বেড়া-আগুনের মতো সমস্ত মানবসমাজকে লেলিহান শিখা-বিস্তার করিয়া ঘেরিয়া ধরিয়াছে, তিনি অনুভব করেন যে আর্ত নরনারীর দল কেহ সরবে, কেহ নীরবে, কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে, কেহ

হাসিতে হাসিতে বলিতেছে—"শান্তি নাই, শান্তি নাই, কোথা যাই, কি করি, কেন এমন হইল, সুখ কোথায়," তিনি ইহাও জানেন যে এসব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র কবিরাই দিতে পারেন। যোগেন্দ্রনাথ নিজেও জানেন যে লেখক হিসাবে তিনি প্রাচীন ভারতের সেই কবি-ঋষিদেরই সমগোত্র যাঁহারা একদিন উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে, তাঁহারও কর্তব্য আর্ত ভীত সন্ত্রস্ত মানবসমাজকে সান্ত্বনা দেওয়া। কবির কাজই পথ নির্দেশ করা। কিন্তু তিনি তাঁহার সাহিত্যে কোন পথ নির্দেশ করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি নিজেই পথ হারাইয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট কামক্লিন্ন সাহিত্য পাঠ করিয়া অনেকে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, পপুলার হইবেন বলিয়া পশুত্বকেই তিনি মনোহর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, পয়সার লোভে নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায় মন্দ জানিয়াও নিজের ভাইঝিকে তিনি সিনেমায় নামাইয়াছেন। নিজের স্বরূপ তাঁহার নিজের কাছে অবিদিত নাই। মনে মনে নিজেকে তিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিবর্ণমুখে সেদিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার এ দুঃসহ কষ্ট বাহিরের লোকে দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি পাই। আমি তাঁহার রক্তাক্ত হৃদয়ের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া আছি। লোকে মনে করে যোগেন্দ্রনাথ কত সুখী, কিন্তু আমি জানি তিনি মহাদুঃখী। তিনি আদর্শ-ভ্রষ্ট এবং তিনি নিজে তাহা জানেন। বার বার তিনি বলেন বটে যাহা করিয়াছি ঠিক করিয়াছি, পারিপার্শ্বিকের চাপে করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু এ কথায় রুষ্ট বিবেক তুষ্ট হয় না। অন্তরনিবাসী সেই দেবতার অভিশাপ-অগ্নিতে যোগেন্দ্রনাথ অহরহ দগ্ধ হইতেছেন। যোগেন্দ্রনাথের আর একটি চিন্তার কারণ হইয়াছে তাঁহার অর্থসমস্যা। সকলে জানে যোগেন্দ্রনাথ লাখ লাখ টাকা রোজগার করেন, কিন্তু আমি জানি টাকাটা রোজগার করে সুলীনা, যোগেন্দ্রনাথের পুস্তকের জন্য যাহা আয় তাহাও সুলীনার জন্য এবং সে আয় প্রচুর নহে। বিলাসের তপ্তকটাহে তাহা নিমেষে শেষ হইয়া যায়। সুলীনাই এখন তাঁহার একমাত্র ভরসা। সুলীনার টাকাও তিনি দুইহাতে মুঠা মুঠা খরচ করিতেছেন, চাল যে ভাবে বাড়াইয়াছেন তাহাতে খরচ না করিয়া উপায় নাই, তাই এক পয়সাও সঞ্চয় নাই, উপরন্তু বাজারে ধার জমিয়াছে। সুলীনা যদি সারাজীবন কাজ পায় এবং সমানভাবে খাটিতে পারে, এখন বাজারে তাহার যে সুনাম এবং চাহিদা আছে তাহা যদি বরাবর অটুট থাকে তাহা হইলেই যোগেন্দ্রনাথের সংসার-তরণী কোনরূপে তীরে ভিড়িবে। নচেৎ সর্বনাশ। এই চিন্তাও যোগেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন কি করিয়া সুলীনা আরও বেশী কনট্র্যাক্ট পায়। পাব্‌লিসিটি নামক যন্ত্রের বিভিন্ন চাকায় তাঁহাকেই এখন নিপুণভাবে তৈল-নিষেক করিতে হইতেছে। মাসের একাধিকবার প্রসিদ্ধ চিত্রসমালোচকদের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের আপ্যায়িত করেন। বড় বড় হোটেলে নামজাদা প্রযোজক, পরিচালকদের পার্টি দিতে হয়। এসব না করিলে তাঁহার কাহিনী ছবিতে চলে না, সুলীনারও কনট্র্যাক্ট হয় না। যৌবনে

মাস্টারি করাটা তাঁহার অত্যন্ত কষ্টকর মনে হইত। মনে হইত এত পরিশ্রম করি তবু সংসারের অভাব ঘোচে না। এখন মনে হয় এত ঐশ্বর্য, এমন বাড়ি, দুইখানা মোটর, দশজন চাকর-চাকরানী, শিক্ষিতা প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাড়িতে বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রী, লেখক-লেখিকাদের পদার্পণ, স্থলীনাকে ঘিরিয়া লাখপতি কোটিপতিদের গুঞ্জন, কাগজে কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কিন্তু কই অভাব তো মিটিল না, এখনও তো অভাবের বিরাট গহ্বর সম্মুখে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। শুধু টাকার অভাব নহে, সুখেরও অভাব। যোগেন্দ্রনাথ লোক খারাপ নন, তিনি উদার, কিছু সাহিত্যবুদ্ধিও তাঁহার আছে, অন্তরে সত্য-শিব-সুন্দরের আভাস তিনি পাইয়াছেন, পরোপকারী লোক, গরীবের দুঃখে কষ্টে সাড়া দেন, কিন্তু আধুনিক যুগের যে নৃশংস বস্তুতান্ত্রিক বিলাসপ্রবণ স্বার্থপর সভ্যতা দক্ষ শিকারীর মতো সকলকে বিরাট জালে আবদ্ধ করিয়াছে, যাগেন্দ্রনাথও সেই জালে কবলিত হইয়াছেন। যে সংযম, যে তিতিক্ষা, যে বৈরাগ্য, যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানুষকে সুখী করে তাহা এখন যোগেন্দ্রনাথের আয়ত্তাতীত। তাঁহার বস্তুতান্ত্রিক বিবেক এখন খেঁকি কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া পথের ধূলায় নালার কাছে ডাস্টবিনের পাশে লোলুপ কামুকের মতো বসিয়া আছে। তাহার মুখে তিনি মানুষের ভাষা শুনিতেছেন। তাঁহার নিজের চিন্তাই কুকুরের মুখে বাঙ্ময় হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ সত্যই বড় দুঃখী।

প্রথম পক্ষীর কথা

গেটের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। প্রতিমুহূর্তে আশা করিতেছি এখনই রমেনকে লইয়া স্থলীনা আসিয়া উপস্থিত হইবে। ভাবিতেছি রমেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে বাড়িতে যে ভোজের আয়োজন হইবে তাহাতে আমার তরফ হইতে কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। জুপিটার সিনেমার শর্মাকে তো বলিতেই হইবে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে জাহানারা টকির মালিককে নিমন্ত্রণ করা চলিবে কি? ইঁহারা উভয়েই আমাদের হিতৈষী, শর্মা একজন নামজাদা প্রযোজক। তিনি আমার 'স্বর্ণকমল' গল্পটার নাম বদল করিয়া 'রূপ যমুনার তীরে' এই নামে অনেক টাকা খরচ করিয়া একখানি ছবি প্রস্তুত করিতেছেন। স্থলীনা তাহাতে একটি পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছে। আমাদের যে টাকা তিনি দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা যদিও এখনও সবটা দেন নাই, তবু আশা আছে বইটা যদি 'হিট্' করে, বাকি টাকা পাইয়া যাইব। সুতরাং এই পার্টিতে শর্মাকে যদি নিমন্ত্রণ না করা হয় তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইবেন। শর্মা লোকটা চরিত্রহীন তাহা জানি, স্থলীনাকে টাকার লোভ দেখাইয়া তিনি যে নানাভাবে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহাও আমার অজ্ঞাত নাই, কিন্তু তবু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। কারণ আধুনিক ভাষায় যাহাকে 'মালদার' বলে তিনি তাহাই। তাঁহাকে

উপেক্ষা করিবার সাহস নাই। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেই হইবে। কিন্তু জাহানারা টকির বদ্রুদ্দিন খাঁন যদি শোনেন যে সুলীনার পার্টিতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তখন কি হইবে? সুলীনা পার্টি দিয়াছিল লোকমুখে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। বদ্রুদ্দিন খাঁন তাঁহার এক রক্ষিতার ভাইকে দিয়া একটি 'লাচ্ছেদার' গল্প লিখাইয়াছেন, সে গল্পটির চিত্রনাট্য আমি লিখিয়াছি, সেই গল্পে প্রায়-উলঙ্গিনী যে নর্তকীটি পথে পথে নাচিয়া সকলের মনোহরণ করিতেছে এবং অবশেষে যে সহসা একজন বড়লোকের নেকনজরে পড়িয়া তাহার সাহায্যে মস্ত বড় একটা অন্ন-সত্র খুলিয়া দিল—সেই নর্তকীর ভূমিকায় সুলীনা অভিনয় করিবে ইহা ঠিক হইয়াছে। বেশ মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। বদ্রুদ্দিনকে যদি সুলীনার পার্টিতে সমাদরে নিমন্ত্রণ না করা যায়, তাহা হইলে সব ভণ্ডুল হইয়া যাইবে না তো! বদ্রুদ্দিনকে নিমন্ত্রণ করিতে আপত্তি নাই, বরং আগ্রহই আছে আমার। মুশকিল হইয়াছে শর্মাকে লইয়া। তাহার সহিত বদ্রুদ্দিনের অহি-নকুল সম্পর্ক। একবার একটা পার্টিতে তাহারা নাকি ঘুষোঘুষি পর্যন্ত করিয়াছে। · একটা মোটরের শব্দ শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। আমার বাড়ির কাছে আসিয়া মোটরটা গতিবেগ কমাইল। সুলীনা আসিতেছে বোধহয়। নিশ্চিন্ত হইলাম। সুলীনাই ঠিক করুক তাহার পার্টিতে বদ্রুদ্দিন এবং শর্মাকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করা চলিবে কি না, সে উভয়কে একসঙ্গে 'ম্যানেজ' করিতে পারিবে কি না। সুলীনা অসাধ্যসাধনপটিয়সী, সে ইচ্ছা করিলে সবই পারে। কিন্তু একি, এ তো সুলীনার গাড়ি নয়! ঘন নীল রঙের প্রকাণ্ড একটা মিনার্ভা আসিয়া গেটের সামনে দাঁড়াইয়াছে। গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন একজন সুকান্তি সুবেশ দীর্ঘকান্তি পুরুষ। অপরিচিত লোক। পূর্বে কখনও দেখি নাই। তিনি গেট খুলিয়া প্রবেশ করিলেন।

"যোগেনবাবুর কি এইটেই বাড়ি?"

"আসুন, আসুন।"

দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলাম। কাছে আসিতে অবাক হইয়া গেলাম তাঁহার গোঁফ দেখিয়া। সরু গোঁফ, কিন্তু অদ্ভুত। মনে হইল যেন সরু দুইটি সাপ দুই দিকে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখের দৃষ্টিতে চাপা চতুরতা ও স্পর্ধা চকমক করিতেছে।

"সুলীনা দেবী কি আপনারই ওয়ার্ড? আপনিই কি যোগেনবাবু?"

"হ্যাঁ। আপনাকে তো চিনতে পারলাম না!"

"আমার নাম বি. এন. গজপৎ। আমি ব্যবসা করি। তামা, টিন, লোহার কারবার আমার—"

বি. এন. গজপৎ-এর নাম আমি শুনিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম কোটিপতি লোক তিনি। সেই ব্যক্তি আজ আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন! আমি রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া করজোড়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলাম, "আপনার নাম শুনেছি। সৌভাগ্য, আজ দেখাও হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

গজপৎ একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি নিজের গরজেই এসেছি। খুলে বলছি ব্যাপারটা। তার আগে আমার নিজের পরিচয়টা দিই। আমি দিল্লীর লোক; জাতে বেনিয়া। যদিও অবাঙালী কিন্তু বাঙালীর উপর আমার অসীম শ্রদ্ধা, বিশেষ ক'রে তার সাহিত্য, শিল্প আর সংস্কৃতির জন্য। নিজেও আমি বাংলাটা ভাল ক'রে শিখেছি এই জন্যে। আর এই জন্যেই আমার ইচ্ছা এবার সিনেমা ব্যবসাতে নামব। সেই জন্যেই আপনাদের কাছে আসা। এ বিষয়ে আমার মনে নূতন ধরনের একটা প্রেরণা এসেছে। সেটা আপনাদের কাছে খুলে বলতে চাই। সুলীনা দেবী কোথা?"

"সে একটু বাইরে বেরিয়েছে। আমাকে বলতে পারেন কি আপনি করতে চান।"

"আমি একটা ভাল ছবি করতে চাই। নায়িকা-প্রধান ছবি। সুলীনা দেবী হবেন তার নায়িকা। তাঁকে আমি ছবিতে দেখেছি, দূর থেকেও একবার দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে আমার। আমার আর একটা প্ল্যান আছে, আর সেইটিই হচ্ছে আমার 'ওরিজিনালিটি'—যদি অনুমতি করেন সেটাও আমি বলি—"

"বলুন—"

"ছবিওলারা সাধারণতঃ একটা ভুল করেন বাইরে থেকে গল্প নিয়ে। সে গল্প সাহিত্যের বাজারে হয়তো খুব নামী গল্প, ধরুন রবীন্দ্রনাথের গল্প বা শরৎবাবুর গল্প, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ছবিতে সে গল্প ঠিক ওৎরাচ্ছে না। এর কারণ কি জানেন? কারণ সে গল্প নায়ক বা নায়িকার প্রাণের গল্প নয়। সে গল্প যেন জোর ক'রে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি ছবি নায়ক-প্রধান হয় তাহলে সে গল্প নায়কের প্রাণের স্বতোৎসারিত গল্প হওয়া চাই, তবেই তা জমবে। ছবিটি যদি নায়িকা-প্রধান হয় তাহলে নায়িকাকেই সে গল্প লিখতে হবে, অপর লোককে দিয়েও সে গল্প তিনি লেখাতে পারেন কিন্তু সে গল্পের উৎস হওয়া চাই তাঁর প্রাণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব। আমি ছবিটি নায়িকা-প্রধান করতে চাই, তাই আমার ইচ্ছে সুলীনা দেবীকে দিয়েই বইটা লেখাব!"

এরূপ উদ্ভট প্রস্তাব ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। সুলীনা রূপসী এবং যুবতী বটে, অভিনয়ও মন্দ করে না, কিন্তু সে যে মূর্খ, ক-অক্ষর গোমাংস—সে বই লিখিবে কি করিয়া। লোকটা পাগল নাকি! আমার মনের আসল কথাটা অবশ্য খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। একটু দ্বিধাভরে বলিলাম, "সুলীনা কি বই লিখতে পারবে?"

"এই কলকাতা শহরে থাকলে পারবেন না। কিন্তু ওঁকে যদি কাশ্মীরের স্বপ্নময় পরিবেশে রঙীন আবহাওয়ায় নিয়ে গিয়ে আরামে আনন্দে রাখা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই পারবেন। দেখবেন তখন মাস্টারপীস একখানা বেরিয়ে যাবে ওঁর মন থেকে। আর সেটাই হবে ওঁর হিট্ পিকচার।"

কি আর বলিব, নির্বাক হইয়া রহিলাম।

গজপৎ বলিয়া চলিলেন—"কাশ্মীরে আমার একটা ভালো বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে সুলীনা দেবী থাকবেন, আর থাকব আমি। উনি গল্প ডিক্‌টেট করবেন, আমি টুকব! এ একটা নূতন ধরনের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট, আশা করি আপনারা এতে বাধা দেবেন না।"

শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা বলে কি! ইচ্ছা হইল লোকটাকে দূর করিয়া দিই, কিন্তু গজপৎ অত্যন্ত ধনী লোক, তাহাকে সোজা গেট দেখাইয়া দিবার সাহস হইল না। একটু মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "আপনি যা বলছেন তা কি ক'রে হ'তে পারে। সুলীনা কুমারী মেয়ে, আপনি যা বলছেন তা করলে—"

"কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। তাই 'অল্‌টারনেটিভ' প্রস্তাবও ভেবে এসেছি একটা। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সুলীনা দেবীকে আমি বিয়ে করতেও রাজি—"

ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "এ প্রস্তাবে আমার অবশ্য 'না' বলবার মুখ নেই, কারণ আমার ছেলেই অসবর্ণ বিয়ে করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সুলীনারও একটা মতামত আছে। সেটা না জানলে আমি কিছুই বলতে পারছি না। তাছাড়া এর একটা আর্থিক দিকও আছে—"

"হ্যাঁ, আছে বই কি—"গজপৎ আমার কথাটা যেন লুফিয়া লইলেন—"সেটাও আমি ভেবেছি। সুলীনা যদি আমাকে বিয়ে করে তাহলে তাকে আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দেব। আর বিয়ের সময় যৌতুক দেব নগদ এক লাখ টাকা। আমার সম্পত্তির বর্তমান ভ্যালুয়েশন এক কোটি টাকার উপর। আর তিনি যদি আমাকে বিয়ে না করতে চান, তাহলে যতদিন তিনি আমার কাছে থাকবেন ততদিন প্রতিমাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক'রে পাবেন।"

"আমার তাতে কি লাভ—"

শুষ্ক একটা হাসি হাসিয়া কথাটা শেষে বলিয়াই ফেলিলাম।

"আপনিও আমার সিনেমা কোম্পানিতে বাঁধা স্ক্রিপ্‌ট রাইটার হয়ে থাকতে পারেন। আপনাকে এজন্য মাসে হাজার টাকা করে দেব।"

"হাজার টাকায় আমার সংসার চলে না।"

"কত হলে চলে?"

"মাসে তিন হাজার টাকা—"

"বেশ, তাই দেব, আপনি সুলীনাকে রাজি করান।"

আমার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল, কানের দুই প্রান্তে এবং চোখের চারিপাশে আগুনের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম। আনন্দে, ভয়ে না ঘৃণায় তাহা ঠিক বলিতে পারিব না। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আচ্ছা সুলীনা আসুক, তার সঙ্গে কথা বলে দেখি—"

"আচ্ছা, কাল আমি ঠিক এই সময়েই আসব। সুলীনা দেবীও যদি থাকেন সে সময় ভালো হয়। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন—

ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

•

নীল মোটরটা চলিয়া গেলে দেখিতে পাইলাম সেই খেঁকি কুকুরটা বসিয়া আছে। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কথা কহিয়া উঠিল।

"খানিকক্ষণ দার্জিলিং বাস করে এলাম। আমাদের দার্জিলিং নর্দমা। গরম অসহ্য হলে নর্দমায় গা ডুবিয়ে বসে থাকি খানিকক্ষণ। এমনি গরম তো আছেই, তাছাড়া আমার প্রেমের গরমও সারা দেহ-মনকে সরগরম ক'রে তুলেছে। তাই বাধ্য হয়ে নর্দমার দিকে ছুটেছিলাম। আমি অনেকক্ষণ এসেছি। ওই নীল মোটরটা দাঁড়িয়ে ছিল বলে এতক্ষণ আমাকে দেখতে পাওনি। বাঃ, জিমিকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে। ওকে সাবান দিয়ে স্নান করিয়েছ বুঝি? আহা, আমাকেও কেউ যদি সাবান দিয়ে স্নান করাত্তো রোজ, দেখতে আমারও রূপ অমনি ঠিকরে পড়ত। আমি কুৎসিত নই। দুর্দশার কালিমায় আমার আসল রূপ চাপা পড়েছে। সত্যিই আমি রূপবান। শুধু আমি কেন, সব কুকুরই রূপবান। যে কুকুরবংশে ককার্স স্প্যানিয়েল, অ্যালসেশিয়ন, সেণ্ট বার্নার্ড, গোল্ডেন রিট্রিভার্স আছে, যে বংশের গৌরব তোমাদের ওই জিমি, সেই বংশে কেউ কুৎসিত কুরূপ নয়। সবাই সুন্দর। কেবল তোমাদের সংসর্গে এসেই আমাদের কারো কারো দেহে অসুন্দরের ছায়া নেমেছে। তোমরা সাম্য সাম্য নিয়ে চীৎকার কর, কিন্তু তোমরা সাম্যের 'স'ও জান না। যা কিছু কর নিজেদের ভোগের জন্য কর। আর আমাদের তোমরা কি জাদুতে মুগ্ধ করেছ জানি না, আমরা তোমাদের শতদোষ জেনে-শুনেও তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা আমাদের দু'পায়ে থ্যাঁতলাচ্ছ তবু তোমাদের ত্যাগ ক'রে যেতে পারি না। পৃথিবীতে যত রকম দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল বা আছে তার মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে আমাদের দাসত্বটা। তোমরা চিরকাল প্রভু, আমরা চিরকাল তোমাদের দাস। আমরা বিচারবুদ্ধিহীন হতভাগা জীব। আমরা জানতেও চাই না আমাদের প্রভু প্রতিভাবান না সাধারণ লোক, বিদ্বান না মূর্খ, চোর না সাধু—আমরা যেখান থেকেই হোক এক টুকরো রুটি এবং একটু আদর পেলেই কৃতার্থ হয়ে ল্যাজ নাড়ি। আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে অবশ্য, তারা তোমাদের সংস্পর্শে আসেনি, আসতে চায়ও না। তারা বনে থাকে, তোমরা তাদের বন্যকুকুর বল। তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকে, তাই তাদের ভয়ে তোমরা অস্থির। সুযোগ পেলেই গুলি ক'রে তাদের মেরে ফেল তোমরা, কিন্তু এখনও পোষ মানাতে পারনি তাদের। তারা এখনও বিদ্রোহী, তারা এখনও তোমাদের এই পচা সমাজের খাঁচায় ঢোকেনি। দেখ, দেখ, দেখ, তোমার জিমি আমায় দেখতে পেয়েছে, আমার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘনঘন ল্যাজ নাড়ছে। ও ল্যাজ নাড়ার অর্থ আমি বুঝি। সার্থক হয়েছে

আমার সাধনা, আমার প্রণয় নিবেদন ওর মর্মে গিয়ে পৌঁছেছে, 'তোমার ওই শিকল লোহার না হলে এখুনি ওটা ছিঁড়ে ও ছুটে চলে আসত আমার দিকে। আহা খুলে দাও বেচারীকে—খুলে দাও, খুলে দাও—"

আবার একটা মোটরের শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছে স্থলীনার সেই ভাঙা গাড়িটাই আসিতেছে। হ্যাঁ, স্থলীনারই গাড়িটা গেটের সামনে আসিয়া থামিল। কিন্তু কই, স্থলীনা ছুটিয়া নামিয়া আসিল না তো। রমেনও না। একটি চাকর আসিয়া একটি চিঠি দিল। স্থলীনার চিঠি।

শ্রীচরণেষু,

জেঠু, আমি আর ফিরলাম না। আর ফিরবও না বোধহয়। আমি রমেনকে বিয়ে করেছি, ওকে নিয়েই বাকি জীবনটা কাটাব এবার। বিয়েটা আজই হয়েছে। ভেবেছিলাম আজকে রমেনকে ওখানে নিয়ে গিয়ে কথাটা বলব তোমাকে। দুজনে তোমাকে প্রণাম করে আরম্ভ করব আমাদের নূতন জীবন। কিন্তু তা আর হল না। এখানে এসে দেখি রমেন জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। মধুপুরে সে বদলি হয়েছে নাকি। আমিও ওর সঙ্গে মধুপুর চললাম। সেইখানেই কোনও পলাশবনে ওর জন্মোৎসব করব। আমারও আজ নব জন্মদিন। মৃত্যুদিনও বলতে পার। অভিনেত্রী স্থলীনার মৃত্যু হল, জন্মাল নূতন একটি লোক। সে ঠিক আগেকার টেঁপি বা শংকরী নয়, সে একেবারে নূতন লোক ; তার নাম রমেনের গৃহিণী। জেঠু, এতদিন পরে আমি আমার জীবনের সত্যতীর্থে পৌঁছে গেছি, দেখতে পেয়েছি দেবতাকে, আবিষ্কার করেছি নিজের রাজ্য যেখানে আমি সত্যিই রাজরাণী, যেখানে আমি সত্যিই স্বাধীন। এতদিন স্বাধীনতার স্বাদ পাইনি, এতদিন কেবল দাসীবৃত্তি করতে হয়েছে। সিনেমায় নামার আগে আমার কি যে জীবন ছিল তা আর কেউ না জানুক তুমি জানতে। সেই ভোর পাঁচটা থেকে উঠে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমার হাত পায়ের বিরাম থাকত না—সকলের মন রাখা। অত করেও কিন্তু কারো মন পাইনি, একমাত্র তোমার মন ছাড়া। তুমি আমার কষ্ট বুঝতে। জেঠু আমিও তোমার কষ্ট বুঝতাম, বাড়ির আর কেউ তোমার মনের কথা বুঝত না। সবারই লক্ষ্য ছিল কেবল তোমার ব্যাংক ব্যালান্সের দিকে। তারপর আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে সিনেমার যুগ এসে গেল। ভাবলাম বুঝি মুক্তি পেলাম। কিন্তু সিনেমার মধ্যে ঢুকে দেখলাম এ আর এক রকম দাসীবৃত্তি। প্রডিউসার, ডিরেক্টার, পাবলিক, বক্স-অফিস এরাই মালিক, এদের মনে রেখে না চলতে পারলে সিনেমার অভিনেত্রী হিসাবে খ্যাতিলাভ করা যায় না। নিজের মতো ক'রে অভিনয় করবার স্বাধীনতা নেই। এমনি ক'রে দাঁড়াও, এমনি ক'রে চাও, হাতটা তোল, পা টা বাড়াও, এবার একটু মুচকি হাস—এই ধরনের নানা হুকুম মেনে অভিনয় করতে হয়। আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই। নিজস্ব শুধু আমার দেহটা, সেইটেই

নানারকম ভাবে প্রদর্শন করাই ওদের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আরও যে-সব কুমতলবের ষড়যন্ত্রে অহরহ পড়তে হয় এবং নানা কৌশলে তার থেকে বেরিয়ে আসতে হয় তার কাহিনী সবাই জানে, কিংবা আন্দাজ করে। এই সত্য বা মিথ্যা কলঙ্কের কাহিনী প্রত্যেক অভিনেত্রীকে নাগপাশে জড়িয়ে আছে, এর থেকে তাদের মুক্তি নেই, এ-ও একরকম বন্দীত্ব। টাকা অনেক পেয়েছি সত্য, মুঠো মুঠো পেয়েছি, কিন্তু মুঠো মুঠো খরচও করেছি। একটা প্রবল বানের মতো এসেছে আর চলে গেছে, ঘরের যা যৎসামান্য জিনিস ছিল তা-ও ভেসে গেছে তার সঙ্গে। তবে ওই সিনেমা জীবনের কাছে আমি একটি জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ। সিনেমায় নেমেছিলাম বলে রমেনের নাগাল পেয়েছি। দুর্গম পাহাড়ের চড়াই ওৎরাই ভাঙতে পেরেছিলাম বলেই অমরনাথের দেখা পেয়েছি। এতদিন পরে মনে হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান পেলাম। এবার দুজনে মিলে যে জগৎ আমরা সৃষ্টি করব সে জগতের আমরাই অধীশ্বর এবং অধীশ্বরী। আমি আর ও বাড়িতে ফিরে যাব না। ওখান থেকে যে কাপড় গয়নাগুলো পরে এসেছিলাম সেগুলোও ড্রাইভারের হাতে ফেরত পাঠাচ্ছি। রমেন আমাকে টুকটুকে লালপাড় শাড়ি আর কাচের চুড়ি কিনে দিয়েছে। আমার যা কিছু ওখানে আছে, সব তোমাকেই দিয়ে দিলাম জেঠু। ও নিয়ে যা করবার তুমিই কোরো। আমার ব্যাংকে কিছু টাকা এবং 'ভল্টে' কিছু গয়না আছে। সেগুলোও তোমাকে দেব। আমার অতীত জীবনের জের টেনে আমি নূতন জীবন আরম্ভ করতে চাই না। আমার নূতন জীবন হবে সম্পূর্ণ নূতন। ও বাড়ি ছেড়ে আসতে আমার একটুও দুঃখ হচ্ছে না। কেবল একটি দুঃখ, তোমাকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে। তোমার দুঃখ ও বাড়ির কেউ বুঝবে না। আর এ-ও বুঝতে পারছি তুমি এ বয়সে সব ফেলে দিয়ে ও বাড়ি ছেড়ে চলেও আসতে পারবে না। ও বাড়িতে তোমার অনেক বন্ধন। ট্রেনের আর বেশী দেরি নাই। তাই এবার এইখানেই থামি। ইচ্ছে ছিল তোমাকে প্রণাম ক'রে যাব। কিন্তু একই দিনে বিয়ে এবং মধুপুর যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হল বলে সময় পেলুম না। পরে আর একদিন তোমাকে এসে প্রণাম ক'রে যাব। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর এবার যেন সত্যি সুখী হই। আমাদের প্রণাম নাও। ইতি—

প্রণতা টেঁপি।

চিঠিখানা পড়িবার পর মনে হইল আমার দেহভার যেন অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছে। মনে হইল এতক্ষণ যাহা আমাকে মুগ্ধ করিতেছিল, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা উথলিয়া উঠিতেছিল তাহা মরীচিকা মাত্র। যাহাকে সুদৃঢ় পর্বত মনে হইয়াছিল অনুভব করিলাম তাহা মেঘ, পর্বত নয়, দেখিতে দেখিতে তাহা শূন্যে মিলাইয়া গেল। আর আশ্চর্য আমার শরীরের ভারও যেন অনেকটা লাঘব হইল। তাহা হইলে সুলীনাই কি আমার ভার ছিল? কিন্তু সে তো—কথাটা ভালো করিয়া

ভাবিবার অবসর পাইলাম না। ড্রাইভারটা বলিল, "এ জিনিসগুলো কি ভিতরে পাঠিয়ে দেব হুজুর ?"

দেখিলাম সে একটি বড় প্যাকেট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"হ্যাঁ, ওগুলো ভিখনকে দিয়ে দাও—"

ড্রাইভার ভিখনের খোঁজে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। হঠাৎ আমার গেটের দিকে নজর পড়িল। চমকাইয়া উঠিলাম। দেখিলাম খেঁকি কুকুরটার আশ্চর্য রকম পরিবর্তন হইয়াছে। সে আর খেঁকি নাই, সে সুস্থ সবল যুবক কুকুর। তাহার সর্বাঙ্গে ভ্রমরকৃষ্ণ থোকো থোকো লোম, ঝোলা ঝোলা কান দুইটি যেন কালো পশমের অপরূপ কারুকার্যে ভরা, লেজটিও মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও থাকে থাকে যেন কালো মখমল। চোখ দুইটিতে পদ্মরাগমণি জ্বলিতেছে। সেই কাদামাখা খেঁকি কুকুরের এ অদ্ভুত পরিবর্তন হইল কি করিয়া !

কুকুরই উত্তর দিল।

"পরশমণির ছোঁয়া পেলে লোহাও সোনা হয়ে যায়, প্রেমের গুণে শুষ্ক তরুও মঞ্জুরিত হয়—এসব তোমরাই বল। তাহলে আশ্চর্য হচ্ছ কেন এখন ? জিমির প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে আমার সর্বাঙ্গে। তাই আমি জরা-ব্যাধিমুক্ত হয়েছি। জিমি আমাকে তার সারা অন্তর দিয়ে যে ভাবে চেয়েছে সেই ভাবেই আমি আবির্ভূত হয়েছি এখন। আমি এখন প্রথম শ্রেণীর ককার্স স্প্যানিয়েল। জিমির জন্যে এতদিন ধরে যে তপস্যা করছিলাম আমি, তাতে সিদ্ধিলাভ করেছি। জিমিকে আর আটকে রেখ না, খুলে দাও।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং বারান্দায় গিয়া জিমিকে খুলিয়া দিলাম। জিমি ছুটিয়া গেটের বাহিরে চলিয়া গেল, আমার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পক্ষীর কথা

যোগেন্দ্রনাথের ভোগী সত্তা এতক্ষণ যাহা বলিলেন তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্যও নহে। তাহা অর্ধ সত্য। রমেনের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে ভোজের কথা তিনি বলিয়াছেন সে ভোজের আয়োজন তিনিই করিতেছিলেন। সুলীনার তাহাতে আপত্তি ছিল। এ আয়োজন তিনি করিতেছিলেন সুলীনা বা রমেনের প্রতি স্নেহবশতঃ নহে ; রমেনের প্রতি তাঁহার কোন স্নেহ ছিল না বরং বিরূপতাই ছিল। তাহার জন্মদিনে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া উৎসব করিবার আন্তরিক কোনও আগ্রহ তাঁহার ছিল না। তিনি ইহা করিতেছিলেন সেই মনোবৃত্তি লইয়া যে মনোবৃত্তি শিকারীকে ফাঁদ পাতিতে প্ররোচিত করে। কিছুদিন হইতে তিনি অনুভব করিতেছিলেন সুলীনার সহিত তাঁহার বন্ধন ক্রমশ যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। যদিও নিজে তিনি কখনও প্রেমে পড়েন

নাই তবু তিনি জানিতেন ইতিহাস বা কাব্যে প্রেমের যে মহিমা কীর্তিত সে মহিমার দীপ্তিতে পার্থিব সব কিছুই ম্লান হইয়া যায়। ঐশ্বর্য, খ্যাতি, সামাজিক মর্যাদা সবই তুচ্ছ মনে হয় তাহার কাছে। সুলীনা রমেনের প্রেম ঠিক এতটা উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছিল কিনা যোগেন্দ্রনাথ জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা ছিল হয়তো সুলীনা মীরা বা রাধার মতো সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া রমেনকেই শেষে আশ্রয় করিবে। তাই তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এই জন্মোৎসব উপলক্ষে সিনেমা জগতের নামজাদা ডিরেক্টার এবং প্রডিউসারদের নিমন্ত্রণ করিয়া রমেনকেও তাহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন এবং গোপনে তাহাদের বলিবেন যে রমেনকে যেন তাঁহারা ছোটখাটো ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার সুযোগ দেন। না দিলে হয়তো অঘটন ঘটিবে। রমেন হয়তো সুলীনাকে সিনেমা-জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারও যদি জাত মারিয়া দেওয়া যায়, তাহাকেও যদি অভিনয় জগতে টানিয়া আনিতে পারা যায়, তাহা হইলে এ দুর্ভাবনা আর থাকিবে না। জুপিটার সিনেমার শর্মার কাছে কথাটা তিনি আগেই একদিন পাড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন রমেনের চেহারা যদি ভালো হয় এবং সে যদি ভিলেনের পার্ট করিতে রাজী থাকে তাহা হইলে তাহাকে তাঁহার 'তিন টেক্কা' চিত্রে একটি ভূমিকা তিনি দিতে পারেন। তিনি নিজেই 'তিন টেক্কা'র কাহিনীকার এবং নিজেই তিনি বইটির পরিচালকও হইবেন এই রকম একটা বাসনা তাঁহার চিত্তে জাগিয়াছে। অবশ্য ব্যাপারটার রূপ-পরিগ্রহ করিতে এখনও বছর দুই লাগিবে। যোগেন্দ্রনাথ এ আশাও করিয়াছিলেন যে নানা কৌশলে রমেনকে ক্রমশ তিনি ঘর-জামাই করিয়া ফেলিবেন। রমেনও যদি অভিনেতারূপে নাম করিতে পারে তাহা হইলে সুলীনার আয় অনেক বাড়িয়া যাইবে। সুলীনার আয়, মানে, তাঁহারই আয়। এই সব চিন্তার ফলেই তিনি রমেনের জন্মোৎসব ঘটা করিয়া করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুলীনা যখন আসিল না, সুলীনার পরিবর্তে রঙ্গমঞ্চে যখন বি. এন. গজপৎ আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন তখন তিনি একটু হতাশ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই হতাশার মধ্যেও সামান্য একটু আশার আলো যে ছিল না তাহা নয়। গজপৎ-এর উদ্ভট প্রস্তাবটা তাঁহার প্রথমে খুব ভালো লাগে নাই, এ লোকটার আসল উদ্দেশ্য যে কাশ্মীরের স্বপ্নময় পরিবেশে লইয়া গিয়া সুলীনাকে ভোগ করা, একথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। একথা বুঝিবার পর গজপৎ-কে অর্ধচন্দ্র দিয়া দূর করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই, দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। গজপৎ যে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন সে দুইটিই অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে অত্যন্ত লোভজনক। সুলীনা যদি গজপৎকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার বিরাট সম্পত্তির সে-ই অধিশ্বরী হইবে। আর বিবাহ না করিয়া যদি রক্ষিতা হইয়া থাকিতেই সে রাজী হয়, তাহা হইলেও মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা, তাহাও নিতান্ত কম নয়। তা ছাড়া তাঁহাকে মাসে আলাদা তিন হাজার করিয়া দিতে তিনি রাজী হইয়াছেন—যোগেন্দ্রনাথ লোভে আত্মহারা হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। তাই যখন তিনি গজপৎকে বলিলেন, 'আচ্ছা, সুলীনা আসুক, তার সঙ্গে কথা ব'লে দেখি'—তখন গজপৎকে এড়াইবার জন্য তিনি স্তোকবাক্য মাত্র বলেন নাই। তাঁহার নিজেরও ইচ্ছা ছিল এ বিষয় কথা বলিয়া সুলীনাকে রাজী করাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সুলীনা আসিল না। আসিল তাহার মর্মস্পর্শী চিঠিখানা। যোগেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-সৌধ চুরমার হইয়া গেল। তিনি খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর জিমিকে খুলিয়া দিলেন। জিমির প্রণয়ী সেই লোম-ওঠা কুকুরটা তাঁহার চক্ষে সত্যই অপরূপ-কান্তি অভিজাত কুকুরের রূপ পরিগ্রহ করিল। সহসা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী জীবন-দর্শন সব যেন বদলাইতে লাগিল। বহুকাল পূর্বে শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর পাঠ করিয়াছিলেন। তাহারই শ্লোকগুলি আবার তাঁহার কর্ণের কাছে যেন মেঘ-মন্দ্রে বাজিতে লাগিল। তাহার পর বাজিয়া উঠিল 'ফোন'টা। পাওনাদারের তাগাদা! সহসা মনে হইল বাজারে অনেক দেনা জমিয়াছে। ফোনটি নামাইয়া রাখিতে না রাখিতেই আবার সেটা বাজিয়া উঠিল। একজন চরিত্রহীন জমিদার তাঁহার বাগান-বাড়ীর এক পার্টিতে তাঁহাকে এবং সুলীনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথ ফোনটা নামাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন তিনি মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, আর সংসারে থাকিব না। এবার নূতন পথে চলিয়া নূতন জীবন যাপন করিতে হইবে।

যোগেন্দ্রনাথ কাশীতে আসিয়াছেন। তাঁহার বাবা যে বাড়িটাতে ছিলেন দৈবক্রমে সেই বাড়িটাই পাইয়া গিয়াছেন তিনি। বাড়িটার অত্যন্ত দুরবস্থা, কিন্তু তবু এই বাড়িটাই তিনি পছন্দ করিয়াছেন। ঘরের দরজা জানালা ভাঙা, অনায়াসে চোর প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু চোর প্রবেশ করে না, কারণ চুরি করিবার মতো কোন দ্রব্যই তাঁহার নাই। তাঁহার গৃহিণী যদি তাঁহার সহিত আসিতেন তাহা হইলে হয়তো ভালো বাড়ি ভাড়া করিতে হইত। কিন্তু গৃহিণী আসেন নাই। যোগেন্দ্রনাথ যখন তাঁহাকে বলিলেন, "আমার আর সংসার ভাল লাগছে না। আমি কাশীবাস করতে চাই। তুমিও চল!"

"আমরা চলে গেলে সংসার চালাবে কে?"

"সংসার আমরা চালাই না, সংসার আপনি চলে। ছেলেমেয়েদের উপর ভার দিয়ে চল আমরা চলে যাই।"

"টাকা আসবে কোথা থেকে—"

"আমার বই থেকে যে আয় হয় তা ওরা নিক। আমাদের বাড়িটাও বেশ বড়, চারটে ফ্ল্যাট অনায়াসে করা যায়। একটা বা দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে ওরা থাকুক, বাকিটা ভাড়া দিক। তার থেকেও কিছু আয় হবে। তাছাড়া আমরা চলে গেলে বিশু আর তার বউ বোধ হয় এখানে আসতে আপত্তি করবে না। তারাও ভালো রোজগার করে শুনেছি। ওদের চলে যাবেই এরকম ক'রে। চল আমরা কাশী যাই।"

"আর মেয়েরা ? তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ? তোমার মামা ?"

"ওরা নিজেদের বাড়িতে চলে যাক। আমি আর কতদিন ওদের পুষব। যতদিন সামর্থ্য ছিল পুষেছিলাম। এখন আর পাচ্ছি না, চল যে ক'দিন বাঁচি শান্তিতে থাকি গিয়ে।"

গৃহিণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কাশী গিয়ে শান্তি পেতে পার, আমি পাব না। না মরলে আমার শান্তি নেই। তা-ও আছে কিনা জানি না। তোমরা পুরুষরা খেয়াল মতো যখন যা খুশী করতে পার কিন্তু আমরা মেয়েরা তা পারি না। আসছে মাসে রত্নার ছেলে হবে। বৌমাও পোয়াতি শুনেছি। তোমার মামার রোজ ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে, একটা ভালো ডাক্তার ডেকে দেখানো দরকার। চল বললেই কি সংসার ফেলে হুট ক'রে চলে যাওয়া যায়। আর তোমারই বা কাশী গিয়ে কষ্ট ক'রে থাকবার দরকার কি। মহাদেবের মূর্তি সামনে রেখে দোতলায় তোমার ঘরে খিল বন্ধ ক'রে বসে থাক না। আমরা কেউ তোমায় বিরক্ত করব না। মন যদি শুদ্ধ থাকে এইখানেই তুমি বাবা বিশ্বেশ্বরকে পেতে পারবে।"

যোগেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহার সহধর্মিণী নহেন। তিনি তাঁহার মর্মের ভাষা বুঝিতে বরাবরই অপারগ। বলিলেন, "তোমার ওসব বক্তৃতা আমি শুনতে চাই না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি!"

"না। আমি যেতে পারব না।"

"তাহলে আমি আমার বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ি যা আছে তা তোমার নামে লিখে দিয়ে যাচ্ছি। সুলীনার একাউণ্টে দশ হাজার টাকা আছে, তার গয়নাও আছে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার। সে সব আমাকে দিয়ে গেছে। সেগুলোও তুমি নাও—"

দেখা গেল যোগেন্দ্রনাথের গৃহিণী সম্পূর্ণরূপে আত্মসম্মানবিবর্জিতা নহেন। এ কথা শুনিয়া তিনি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুলীনার গয়না টাকা আমি নেব কেন? তোমাকে দিয়ে গেছে তুমি নাও।"

"আমিই তো তোমাকে দিচ্ছি—"

"না, আমি ওর টাকা বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও ছোঁব না।"

যোগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বেশ, তুমি থাক তাহলে। আমি চললুম—। বিশুর উপরই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি তাহলে।"

যৎসামান্য অর্থ লইয়া যোগেন্দ্রনাথ কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস তিনি সঙ্গে আনেন নাই। তাঁহার বাবার সেই ভাঙা ট্রাঙ্কটি তাঁহার কাছে ছিল। সেই ট্রাঙ্কে করিয়াই সামান্য কিছু কাপড়চোপড় আনিয়াছিলেন। চারখানি কাপড়, দুইটি পাঞ্জাবি, দুইটি গামছা এবং দুইটি রুমালের বেশী আর কিছু আনেন নাই। কাশীতে আসিয়া বাবার সেই পুরাতন গৃহটি পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। সেই ঘরেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন

তিনি। নিকটেই একটি ছোট হোটেল ছিল। সৌভাগ্যক্রমে হোটেলের মালিক মোহিত চক্রবর্তী লোকটি ভদ্রলোক। তাঁহাকে গিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি একবেলা আপনার হোটেলে নিরামিষ খাবার খাব। আর রোজ সেরখানেক ক'রে দুধ আমাকে বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। আর আমার কিছু লাগবে না।"

"চা খাবেন না? চাও আমরা ক'রে দিতে পার।"

"চা এখন আর খাই না। আগে খেতাম। সেরখানেক দুধ হলেই আমার চলে যাবে।"

"দুধটা কি আপনার বাসায় পৌঁছে দেব?"

"যদি আপনার হোটেলেই রেখে দেন ক্ষতি কি। আমি এসে খেয়ে যাব। এতে কি আপনার অসুবিধা আছে?"

"না, না, কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। হোটেলের চার্জ কুড়ি টাকা আর দুধের জন্য ত্রিশ টাকা, মাসে এই পঞ্চাশ টাকা আপনার লাগবে। আমি হরি গোয়ালাকে বলে দেব সে সামনে দুধ দুয়ে দেবে। তার গরুর দুধও খুব মিষ্টি।"

"এ মাসের টাকাটা তাহলে অগ্রিম দিয়ে দি—"

"টাকার জন্যে কি আছে, পরেও দিতে পারেন।"

"সঙ্গে যখন রয়েছে নিয়েই নিন না—"

যোগেন্দ্রনাথ টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বাড়িটা সস্তায় পাইয়াছিলেন। ওই ভাঙা বাড়ির ভাড়াটে জুটিত না। বাড়ির মালিক বাড়িটা ভাড়াও দিতে চাহেন নাই। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে শেষে রাজি হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"বেশ মাসে তাহলে টাকা পঁচিশেক দেবেন। মিউনিসিপাল ট্যাক্সটা আমার তাহলে ঘর থেকে লাগবে না।" বাড়ি ভাড়াও তিনি মাসের প্রথমে দিয়া দিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহার মুশকিল হইল এত সময় লইয়া কি করিবেন এই ভাবিয়া। রাত্রে চার পাঁচ ঘন্টার বেশী ঘুম হয় না। দিনে একেবারেই হয় না। কোন কাজ নাই, কোন অবলম্বন নাই, সময় কাটে কি করিয়া! প্রথম প্রথম তিনি খুব বেড়াইতে লাগিলেন। মোটরে চড়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, হাঁটিয়া বেড়াইতে কষ্ট হইত। তবু কষ্ট করিয়াই হাঁটিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত হইলে বসিয়া পড়িতেন। বসিয়া রাস্তার জনস্রোত দেখিতেন। এ দৃশ্য তাঁহার বড় ভালো লাগিত। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। হাঁটিয়া হাঁটিয়াই তিনি কাশীর দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার উপলব্ধি হইল যে মনের ক্ষুধা ইহাতে মিটিতেছে না। জনস্রোত বা মন্দির, প্রাসাদ বা বিশ্ববিদ্যালয়, গঙ্গার ঘাট বা দেবতার মন্দির যত বিচিত্র, যত মহৎ যত পবিত্রই হউক না কেন তাহাদের উপরে একবার মাত্র চোখ বুলাইলে তৃপ্তি হয় না। তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাদের লইয়া মাতিয়া উঠিতে হয়, তাহাদের সত্তার সহিত মিশিয়া যাইতে হয় তবে আনন্দ মেলে, তবে মনের ক্ষুধা মেটে। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ তাহা পারিলেন না, তাঁহার

অবশেষে একদিন মনে হইল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি। সারাজীবন তিনি শিক্ষকতা এবং সাহিত্যচর্চা করিয়া কাটাইয়াছেন। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহাও করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি জানিতেন শিক্ষকতা করিতে চাহিলে তাঁহাকে কোথাও শিক্ষকতার চাকরি করিতে হইবে। চাকরির যে কি মর্ম তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না; তিনি হয়তো চেষ্টা করিলে কোথাও একটা চাকুরি জুটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইল যতটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে চাকুরি করিলে সেটুকুও আর থাকিবে না। সাহিত্যচর্চার ব্যাপারেও তিনি বিশেষ উৎসাহ পাইলেন না। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার যেটুকু ছিল সেটুকু যৌবনেই নিঃশেষিত হইয়াছে, এতদিন ত্রিভুজোপম প্রেমের গল্প লিখিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা হাস্যকর ধাষ্টামি মাত্র। তাঁহার অনেক রসিক বন্ধু তাঁহাকে একথা লিখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেন নাই। তিনি নিজেও জানিতেন নিজের অন্তরের কামনা কলুষকে দু'চারিটি ধর্মকথার ফুল বিল্বপত্র ঢাকা দিয়া মহৎ সাহিত্য করা যায় না। মহৎ সাহিত্যের জন্য মহৎ কল্পনা চাই, মহৎ চরিত্র চাই। সর্বোপরি চাই অলোকসামান্য প্রতিভা। তিনি জানিতেন ওসব তাঁহার কিছুই নাই। লিখিতেন টাকার জন্য। এখন তো আর টাকার প্রয়োজন নাই, আর ওসব কেন। যদি লিখিতেন তাহা হইলে হয়তো প্রকাশক জুটিত, ব্যাঙের ছাতার মতো যে সব পত্রিকাগুলি গলিতে গলিতে নিত্য গজাইতেছে তাহারা হয়তো সে সব ছাপিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থও দিত, কিন্তু তাঁহার আর অর্থের প্রয়োজন ছিল না, লোভেরও অবসান হইয়াছিল, তাই তিনি আর সাহিত্যচর্চা করিবার কোন প্রেরণা পাইলেন না। তিনি আসিয়া তাঁহার গৃহিণীকে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন—'আমি এখানে বেশ সুখে আছি। তোমরা আমার জন্য কোনও চিন্তা করিও না। মাঝে মাঝে তোমাদের খবর দিতে পার, কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু করিও না। আর ফিরিয়া যাইব না। আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তোমরা যদি চেষ্টা কর তাহা হইলে স্থির জানিও তোমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তোমাদের জন্য আমার যদি মন কেমন করে আমি নিজেই যাইব। তোমরা এখানে আসিও না।' ইচ্ছা করিয়াই পত্রে তিনি নিজের ঠিকানা দেন নাই। কিন্তু তথাপি কয়েকদিন পরে সভয়ে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার বড় ছেলে এবং স্ত্রী খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বাসায় আসিয়া হাজির হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ যাহা নিজেদের মোক্ষম অস্ত্র বলিয়া মনে করেন যোগেন্দ্র-গৃহিণী তাহাই প্রয়োগ করিলেন। অর্থাৎ হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্র গুম হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত হইলেন না, তাহাদের বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি এখানে শান্তিতে আছি। কোন কষ্ট নেই। তোমাদের ওই হট্টগোলের ভিতর আমাকে টেনে নিয়ে গেলে আমি হয় পাগল হয়ে যাব, না হয় অকালে মারা যাব। তোমরা সে চেষ্টা কোরো না।" তাহার পর তিনি নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছে কর আমার সঙ্গে থাকতে পার।

তাতে আপত্তি করবার আমার অধিকার নেই।" কিন্তু দেখা গেল তাঁহার স্ত্রী এ প্রস্তাবে সম্মত নহেন। তিনি তাঁহার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের সহিতই বাস করিতে ইচ্ছুক। স্বামীকে তাহার প্রয়োজন নাই। স্বামী চলিয়া আসাতে তাঁহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন, যদিও সরবে সে কথা একবারও তিনি বলেন নাই এবং সম্ভবত নিজের জ্ঞাতসারেও একথা ভাবেন নাই। খবরটা তাহার মগ্ন চৈতন্যলোকের এবং আমারও অনুমান মাত্র। যাই হোক, যখন যোগেন্দ্রনাথ কিছুতেই গেলেন না, তখন অবশ্য তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। যাইবার আগে তিনি হোটেল-ওলা মোহিত চক্রবর্তীর সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "দেখবেন ওঁর যেন খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্ট না হয়। উনি কে জানেন? উনি বিখ্যাত লেখক একজন। ওঁর দশখানা বই সিনেমা হয়েছে। কিন্তু এখন উনি বাবা বিশ্বেশ্বরের আদেশ পেয়ে এখানে এসেছেন গরীবের মতো থাকবেন বলে। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে একথা অবশ্য উনি বলবেন না কাউকে, কিন্তু আমি জানি কেন এসেছেন। যাই হোক, আপনি বাবা দেখবেন ওঁর যেন খাওয়া-থাকার কোনও অসুবিধা না হয়। এই আমার ঠিকনা রইল, যদি বেশী টাকা লাগে, আমাকে লিখলেই আমি আরও টাকা পাঠিয়ে দেব। ওঁকে আপনি কিন্তু এসব কথা যেন কিছু বলবেন না।" সংবাদ শুনিয়া মোহিত চক্রবর্তী এমন ভান করিলেন যেন তিনি আকাশ হইতে পড়িয়াছেন। সাহিত্য-জগতের তিনি তেমন কোনও খবর রাখিতেন না, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে যে একজন লেখক আছেন এ খবর তাঁহার অবিদিত ছিল। কিন্তু তিনি পাকা ব্যবসাদার লোক, এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যেন যোগেন্দ্রনাথ নামক সর্বজনবিদিত লেখক তাঁহার হোটেলে অন্নগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্বতোভাবে চরিতার্থ করিয়াছেন। স্মিতমুখে বার বার ঘাড় নাড়িয়া তিনি কথা দিলেন যে যোগেন্দ্রনাথের খাওয়ার কোনও কষ্ট তিনি হইতে দিবেন না, তাঁহার প্রাণ থাকিতে নয়। সন্তুষ্ট হইয়া যোগেন্দ্র-গৃহিণী সপুত্র ফিরিয়া গেলেন। যোগেন্দ্রনাথের খাওয়া-থাকার কোন সমস্যা রহিল না, কিন্তু তাঁহার সমস্যা হইল সময় লইয়া। একদিন তাঁহার মনে হইল যখন কাশীতেই আসিয়াছি তখন দেখাই যাক না বিশ্বেশ্বরের চরণে মন বসাইতে পারি কিনা। এবম্বিধ প্রেরণা জাগিবার একটা কারণ ছিল অবশ্য। গৃহিণী চলিয়া যাইবার পরই হোটেল-ওলা চক্রবর্তী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং গৃহিণী তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। লোকটা তাঁহাকে মহাপুরুষ মহাকবি তপস্বী বলিয়া বিনা দ্বিধায় প্রণাম করিয়া ফেলিল। প্রথমটা যোগেন্দ্রনাথের বাক্যস্ফূর্তি হইল না! যখন হইল তখন তিনি বলিলেন, "আপনি যা বলছেন তা সত্য নয়। এসব কথা দয়া করে আর কাউকে বলবেন না। বললে, অকারণে লোকের ভিড় হবে, সেটা আমি চাই না। আমি এখানে নির্জনে শান্তিতে থাকতে এসেছি। দয়া ক'রে আমার শান্তির বিঘ্ন করবেন না।"

মোহিতবাবুর ভক্তি আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বেশ তাই হবে। কিন্তু আমার অ্যাসিস্‌টেন্ট ছকু কথাটা শুনে ফেলেছে। তাকেও মানা ক'রে দেব তাহলে কথাটা যেন পাঁচ কান না হয়।"

মোহিতবাবু চলিয়া যাইবার পর তাঁহার মনে হইল, 'দেখাই যাক না বিশ্বেশ্বরের চরণে যদি মন বসাইতে পারি। আমি তপস্বী তো নইই, সামান্য সন্ধ্যাহ্নিকটা পর্যন্ত করি না; কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি। আর কিছু না হউক কিছু সময় তো কাটিবে।' তাহার পরদিনই তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গেলেন এবং সেখানকার এক পাণ্ডার সহিত যোগাযোগ করিয়া সেখানে খানিকক্ষণ পূজাও করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইল আর যেখানেই বিশ্বেশ্বরের চরণে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব হোক, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে তাহা হইবার উপায় নাই। চতুর্দিকে শ্বাসরোধকর ভিড়। নানা জাতের লোকের ভিড়। পাণ্ডার ভিড়, ভণ্ডের ভিড়, ভিখারীর ভিড়, পূজারীর ভিড়—নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে কেবল 'দাও দাও' রব। একটি মুহূর্ত সেখানে নিঃশব্দ নহে। ঘণ্টার শব্দ, শাঁখের শব্দ, ঝাঁঝরের শব্দ, মন্ত্রের শব্দ। যে শক্তি থাকিলে এসব সত্ত্বেও মহাদেবের চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া যায় সে শক্তি যোগেন্দ্রনাথের ছিল না। দিন দুই বৃথা চেষ্টা করিয়া তিনি মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার তখন ধারণা হইল কোন নির্জন স্থানে গেলে হয়তো তিনি সফলকাম হইবেন। নির্জন মনোমত স্থান পাওয়াও সহজ হইল না। নির্জন স্থানের সন্ধানে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। কয়েকদিন পরে একটা মনোমত স্থান পাওয়া গেল—ললিতা ঘাট। ছোট ঘাট এবং নির্জন। দুপুরে সেখানে কেহ থাকে না। যোগেন্দ্রনাথ ললিতা ঘাটেরই একধারে একদিন চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুদিত চক্ষুর সম্মুখে, তাঁহার মানসপটে বার বার যে সব ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাঁহার একটাও মহাদেবের ছবি নহে। তিনি কখনও তাঁহার স্ত্রীকে, কখনও ছেলেমেয়েদের, কখনও বা সুলীনাকে দেখিতে লাগিলেন। জিমির মুখখানাও বারকয়েক উঁকি দিয়া গেল, সেই খেঁকি কুকুরটাও। মহাদেব একবারও দেখা দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইল তিনি যাহাকে ধরিয়া অথবা যে তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার জীবনের ক্লেশ ক্লান্তি অবসাদ আলস্য দূর করিতে পারেন তাহা আর যাই হোক ওই প্রস্তরমূর্তি বিশ্বেশ্বর নন। হয়তো বিশ্বেশ্বরকেই শেষ পর্যন্ত পাইতে হইবে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বেশ্বর অন্যত্র অন্য রূপে আছেন। কোথায়? কোন রূপে? যোগেন্দ্রনাথ মনে মনে ক্রমাগত সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বেশ্বর কোথায় লুকাইয়া আছেন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে এই জেদ তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি প্রত্যহ পথে পথে হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মনে ওই এক চিন্তা—কোথায় তিনি। একদিন বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন সুলীনার একটি চিঠি আসিয়াছে। সুলীনা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু

জেঠু, জ্যাঠাইমার কাছে ঠিকানা পেয়ে এই চিঠি লিখছি। আপনি যে কাশী চলে গেছেন সে খবর আমি শুনেছিলাম কিন্তু ঠিকানা জানতাম না বলে এতদিন আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। দাদার কাছে শুনলাম আপনি নাকি ওখানে একটা হোটেলে খেয়ে খুব গরীবের মতো আছেন। আপনার ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফির দরকার হ'ত, কতরকম খাবারের ফরমাশ করতেন—এখন নাকি সব ছেড়ে দিয়েছেন। শুনে বড়ই কষ্ট হ'ল। উনি ছুটি পাচ্ছেন না, তা না হলে আপনার কাছে আমি চলে যেতাম। আর একটা কথা। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে আমি মাসে ত্রিশ টাকা ক'রে পাঠাতে পারি। আপনি যদি সুখে থাকেন কাশীতেই থাকুন কিন্তু অত কষ্ট ক'রে থাকবার দরকার কি আমরা যখন আছি। দাদাও অনায়াসে আপনাকে মাসে মাসে কিছু পাঠাতে পারেন। দাদা বৌদি দুজনে মিলে মাসে প্রায় হাজার টাকা রোজগার করছেন। বাড়ির দুখানা ফ্লাট ভাড়া দেওয়া হয়েছে তাতেও না কি সাতশ' টাকা ক'রে পাওয়া যায়। আপনার প্রকাশকরাও নাকি দাদাকে মাসে মাসে দু'শ আড়াইশ' ক'রে টাকা পাঠায়। আপনি দাদাকে সে টাকা নাকি সংসারেই খরচ করতে বলেছেন। জেঠু, আপনি কেন এত কষ্ট ক'রে থাকবেন? আপনার চিঠি পেলেই আপনাকে আমি ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দেব। আরও বেশী পাঠাতে পারতুম, কিন্তু আমার একটি খোকা হয়েছে। তার জন্যে খরচ বেড়েছে কিছু। কি সুন্দর যে দেখতে হয়েছে খোকা, মুখের আদল অনেকটা আপনার মতো। উনি ছুটি পেলেই আপনার কাছে যাব ওকে নিয়ে। আর একটা কথা। আপনার সময় কাটে কি ক'রে? চিরকাল তো লেখা নিয়ে কাটালেন, এখন কি করেন? লেখা কি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন? করেন কি সমস্ত দিন? বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যান? বই পড়েন? ওখানে আপনার কাছেপিঠে কি ভালো লাইব্রেরী আছে? সব খবর দিয়ে চিঠি লিখবেন। আপনার জন্যে খুব চিন্তা হয়। আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

প্রণতা শংকরী

যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দিয়া দিলেন।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র পাইলাম। আমার কোন কষ্ট নাই, বেশ সুখে আছি, আমার জন্য একেবারেই ব্যস্ত হইও না। তোমরা ব্যস্ত হইলে তাহাই আমার কষ্টের কারণ হইবে। আমাকে টাকা পাঠাইবার দরকার নাই। আমি ১৭৫·০০ টাকা পেন্সন পাই ৭৫·০০ টাকায় আমার থাকা খাওয়া বেশ ভালো ভাবেই হইয়া যায়। মাসে ১০০·০০ টাকা করিয়া পোস্টাপিসে জমাই। তোমার আপত্তি না থাকে তো তোমার খোকার জন্য আমি মাসে মাসে কিছু পাঠাইতে পারি। তোমরা এখানে কেহ আসিও না। কোলাহলপূর্ণ আড়ম্বরময় জীবনে সুখ-শান্তি কিছুই পাই নাই, স্বার্থের আলেয়াকে অনুসরণ করিয়া

নানাভাবে কেবল বিপন্ন হইয়াছি, যাহা আদর্শ বলিয়া মুখে আস্ফালন করিয়াছি তাহাকে জীবনে রূপায়িত করিতে পারি নাই। তাই এবার ঠিক করিয়াছি অনাড়ম্বর একক জীবন যাপন করিব, দেখি মানবজীবনের যাহা পরম কাম্য তাহা পাই কিনা। তোমরা যদি আবার এখানে আসিয়া হাজির হও আমার সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। তাই অনুরোধ, তোমরা কেহ আসিও না। আমি এখানে সারাদিন প্রায় হাঁটিয়া বেড়াই। লিখিতে আর ইচ্ছা করে না, কারণ বুঝিয়াছি আমার লিখিবার ক্ষমতা নাই। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া ভগবৎচিন্তায় নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এখান হইতে মাইল দুই দূরে একটি ভালো লাইব্রেরী আছে শুনিয়াছি। তোমার চিঠি পাইয়া স্থির করিলাম সেইখানেই গিয়া মেম্বার হইব। বই পড়িয়াই সময় কাটাইতে হইবে। আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে। তোমরা আমার আশীর্বাদ লও। ইতি আশীর্বাদক জেঠু।

তাহার পরদিনই যোগেন্দ্রনাথ লাইব্রেরীতে গিয়া সভ্য হইলেন। ভাবিলেন—যাক্, অকূলে তবু একটা কূল মিলিল। কিন্তু কূলে উঠিয়াও তিনি আশ্বাসজনক কিছু দেখিতে পাইলেন না। লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। সবই প্রায় বাজে ডিটেকটিভ গল্প, না হয় তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা উপন্যাস। তাঁহারও কয়েকটি উপন্যাস আছে দেখিলেন। এই সব পড়িয়া কি তাঁহার মন ভরিবে? একটু হতাশ হইয়া গেলেন। পুস্তক-তালিকার পাতা উলটাইতে উলটাইতে একটা জিনিস তাঁহার নজরে পড়িল। লাইব্রেরীতে বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা অনুবাদ রহিয়াছে। যদিও কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হইবে কিন্তু ইহা সত্যকথা যে যোগেন্দ্রনাথ রামায়ণ ভালো করিয়া পড়েন নাই। লোকের মুখে শুনিয়া ভাসা-ভাসা ভাবে রামায়ণের গল্পটা জানিতেন মাত্র। পুরাপুরি রামায়ণ কখনও পাঠ করেন নাই। হঠাৎ স্থির করিয়া ফেলিলেন রামায়ণটা এবার ভালো করিয়া পড়িতে হইবে, তাহার পর মহাভারত। রামায়ণটা লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন রামায়ণ পড়িতে বসিয়া হঠাৎ একটা নূতন প্রেরণা তাঁহার মনে জাগিল। তাঁহার মনে হইল শুধু পড়িলেই যথেষ্ট হইবে না, বইটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। ছাত্রজীবনে কোন কিছু আয়ত্ত করিতে হইলে তিনি সেটাকে নকল করিতেন। যখন শিক্ষকতা করিতেন তখন অনেক ছাত্রকেও তিনি এই উপদেশ দিয়াছিলেন। ঠিক করিলেন রামায়ণটাকে তিনি টুকিয়া ফেলিবেন। রামায়ণ শেষ হইলে মহাভারত। তাহার পর পুরাণ, তাহার পর উপনিষদ। তিনি সহসা সমস্ত জীবনব্যাপী একটা মহৎ কাজ পাইয়া গেলেন যেন। তাঁহার মনে হইল যে মহাকবিগণ তৃষিত মানব-মানবীর জন্য চিরন্তন সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অমর বাণীধারায় অবগাহন করিয়া তিনিও পবিত্র হইবেন, ধন্য হইবেন। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথমেই আছে, নারদ বাল্মীকিকে রামচরিত বর্ণনা করিয়া শুনাইতেছেন :—"বিশ্ববিশ্রুত ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক প্রসিদ্ধ নরপতি আছেন। তিনি মহাবলবান, সুদর্শন,

ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয় ও নির্বিকার। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শ্রীমান ও শত্রুসংহারকারী তেমনি দেখিতে মহাবাহু, উন্নতস্কন্ধ ও গ্রীবাদেশ শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়-ভূষিত। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, ললাট সুন্দর, মাংসলতাপ্রযুক্ত তাঁহার বক্ষ ও স্কন্ধমধ্যগত অস্থি দৃষ্ট হয় না এবং তিনি পরম শক্তিমান। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, লোচন আকর্ণবিশ্রান্ত। তিনি শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, প্রতাপী, শ্যামবর্ণ, নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব। তিনি প্রজাহিতব্রত, সত্যবাদী, ধার্মিক, যশস্বী ও শুচি…"

যোগেন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে আদর্শ পুরুষ আদর্শ নৃপতি রামের চরিত্র টুকিতে লাগিলেন।

এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ তখন মহাভারত শেষ করিয়া হরিবংশ আরম্ভ করিয়াছেন। সময় লইয়া কি করিবেন তাঁহার এই সমস্যার সমাধান হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি যেন আর একটা ক্ষুধা, আর একটা অতৃপ্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল আমি যাহা করিতেছি তাহাতে আমার কৃতিত্ব কিছু নাই। মহাকবিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন আমি তাহাই আবার লিখিয়া যাইতেছি। ইহা গঠনমূলক কোন কাজ নহে, ইহা পুনরাবৃত্তি মাত্র ; কোন কিছু গঠন বা সৃষ্টি করিতে না পারিলে তৃপ্তি হয় না, মনে হয় মানব-জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। এই অতৃপ্তি লইয়াই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। তাঁহার গৃহিণী আর আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করেন নাই, কারণ তিনি কাশীতে আসিবার কিছুদিন পরেই হৃদরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রকন্যারা মাঝে মাঝে চিঠি লিখিয়াই তাঁহার খবর লইত। তাহারাও আর আসে নাই, কারণ তাহারা বুঝিয়াছিল আসিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড একটা দামী মোটর থামিল। গাড়ি হইতে নামিয়া যে রূপসী নারীটি তাঁহাকে প্রণাম করিল তাহাকে প্রথমে তিনি চিনিতে পারেন নাই।

"কে আপনি ?"

নারীটি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথের মনে হইল এ হাসি আগে কোথায় যেন শুনিয়াছেন। কাচ ভাঙার আওয়াজ।

"ওকি জেঠু, আমাকে চিনতে পারলে না ! আমি টেঁপি—"

যোগেন্দ্রনাথ অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। স্থূলীনার রূপ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং জগদ্ধাত্রী যেন।

"ওঁকে আর খোকনকেও নিয়ে এসেছি। ওগো তোমরা নাম না।"

রমেন একটি পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুকে লইয়া প্রবেশ করিল। রমেন যোগেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিল, কিন্তু শিশুটি করিল না।

"ওকি খোকন, দাদুকে নমো কর—"

খোকন মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মুখের ভিতর বাঁ হাতের আঙুল পুরিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রণাম করিল না।

"নমো কর, নমো কর—"

কিছুতেই করিল না, শেষে ছুটিয়া বাহিরে গিয়া ড্রাইভারের পাশে বসিল।

অনুনাসিক স্বরে টেঁপি বলিল—"কি যে দুষ্টু হয়েছে জেঠু, আমার একটি কথা শোনে না।"

তাহার পর টেঁপি একটু থামিয়া আসল কথাটি পাড়িল।

"খোকন আপনার কাছেই থাক জেঠু। ওকে আপনিই মানুষ করুন।"

রমেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

টেঁপি বলিতে লাগিল—"আপনার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হব।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ছেলেবেলায় সব ছেলেরই মা-বাপের কাছে থাকা উচিত। বিশেষ ক'রে মায়ের কাছে—"

"কিন্তু আমি যে সিনেমায় নাবছি আবার। ওঁর তাই ইচ্ছে। ওঁর ধারণা আমি স্বাধীন ভাবে সিনেমায় নাবলে সিনেমা-শিল্পের একটা নূতন দিক খুলে দিতে পারব। কিন্তু সিনেমায় নাবলে বাড়িতে যে ধরনের লোক ক্রমাগত আসবে আমি চাই না খোকন তাদের সঙ্গে মিশুক। তাই ঠিক করেছি ওকে আপনার কাছে রেখে যাব। আপনি ওকে মানুষ করুন।"

যোগেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"বেশ। আমি রাজি আছি। কিন্তু ওকে আমার কাছে আমার এই বাসায় আমার মতন ক'রে মানুষ করব। ও আমার খাবার খাবে, আমার এই ঘরে দড়ির খাটে শোবে, আমি যা জামা কাপড় দেব তাই পরে থাকবে!"

"ও এখানে এ ভাবে থাকতে পারবে কি? আমি আপনাকে ভাল বাড়ি ভাড়া ক'রে দিচ্ছি। চাকর বামুন রেখে দিচ্ছি—তার যা খরচ লাগে আমিই দেব।"

"না। কারো কাছে আমি হাত পাতব না।"

যোগেন্দ্রনাথের দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া টেঁপি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "খোকন কি এ ভাবে থাকতে পারবে? এ ভাবে থাকতে তো ও অভ্যস্ত নয়। তার চেয়ে ভাল একটা বোর্ডিং হাউসে দি, কি বলেন।"

"তাই দাও।"

কিছুক্ষণ থাকিয়া টেঁপি মোটর হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথের মনে হইল, 'টেঁপি যদি ছেলেটাকে রাখিয়া যাইত, উহাকে মনের মতো করিয়া মানুষ করিতাম।' তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তিনি আবার মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করিলেন যে সুলীনা-রমেন কাহাকেও তিনি চিনিতে পারেন নাই। রমেন যে সুলীনাকে আবার

সিনেমায় নামাইবে ইহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কোন কিছু গঠন বা সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না বলিয়া যে অতৃপ্তি তাঁহার মনে জাগিত তাহাই আবার কিছুক্ষণের জন্ম তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্ম নয়। তিনি আবার হরিবংশ নকল করিতে লাগিলেন :

"হে সুরেশ্বর, আপনি আমাকে পারিজাত নামক বর-তরু প্রদান করুন··।"

ছয় মাস পরে একটা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটিল। একদিন সকালে উঠিয়া যোগেন্দ্রনাথ কপাট খুলিয়া দেখিলেন একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ শিশু তাঁহার দ্বারদেশে মলিন মুখে বসিয়া আছে। বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের বেশী হইবে না।

"কে তুমি ?"

শিশু কোনও উত্তর দিল না। সজল নয়নে যোগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কেবল।

"তোমার বাড়ি কোথা ?"

তবু কোন উত্তর নাই।

"তোমার বাবা মা কোথা ?"

এইবার বালক কথা কহিল। বলিল, "আমার বাবা মা দুজনেই মারা গেছেন "

"আত্মীয়স্বজন কেউ আছে ?"

বালক মাথা নাড়িয়া জানাইল কেহ নাই।

তাঁহার প্রতিবেশী বাহির হইয়া বলিলেন, "ওর বাবা মা এখানেই কলেরায় মারা গেছে। আত্মীয়স্বজনের কোনও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেটা ক'দিন থেকে টং টং ক'রে রাস্তায় ঘুরছে দেখছি। গভর্নমেণ্টের এদিকে নজর দেওয়া উচিত নয় ? অন্তত একটা অনাথালয়ে দিয়ে আসা উচিত ছেলেটাকে। কিন্তু কে দেবে বলুন। দিনকতক পরে দেখবেন রাস্তায় শুকিয়ে মরে প'ড়ে আছে।"

যোগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বালকটিও সজল দৃষ্টি মেলিয়া সোৎসুকে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"ভিতরে এস—তোমার নাম কি ?"

"ভারু।"

যোগেন্দ্রনাথ ভারুকে কিছু মুড়ি খাইতে দিলেন। তাঁহার ঘরে আর কিছু ছিল না। তাহার পর তাহাকে লইয়া বাজারে বাহির হইলেন। জামা কাপড় কিনিয়া দিলেন তাহার। একটা শ্লেট, পেন্সিল এবং একটা বই কিনিলেন। তাহার পর তাহাকে লইয়া গেলেন মোহিত চক্রবর্তীর হোটেলে। বলিলেন, "আজ থেকে এই ছেলেটি আমার সঙ্গে খাবে। কত ক'রে দিতে হবে ?

"হাফ চার্জ দেবেন।"

"ওর জন্তে দুধও নেবেন আধসের ক'রে।"

"বেশ। ছেলেটি কে?"

"আমার আত্মীয়।"

হোটেল হইতে তাহাকে লইয়া গেলেন দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখানে স্বহস্তে তাহাকে ভালো করিয়া স্নান করাইলেন। তখনই তাঁহার মনে হইল—একটা ভুল হইয়া গিয়াছে, ইহার জন্ত একটা গামছাও কেনা উচিত ছিল। নিজের কোঁচা দিয়াই তাহার গা মুছাইয়া দিলেন। একটা অদ্ভুত আনন্দে তাঁহার সারা হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। অনেক কষ্টে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভারু চল এবার হোটেলে যাওয়া যাক—"

দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন। ভারু ভাতটা ডাল দিয়া ভালো করিয়া মাখিতে পারিতেছিল না, নিজেই তিনি মাখিয়া দিলেন। তাহার পর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি আমার খাটে শুয়ে ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি একটু বেরুচ্ছি—"

যোগেন্দ্রনাথ প্রথমে পোস্টাফিসে গেলেন। সেখান হইতে কিছু টাকা তুলিলেন। তাহার পর বাজার হইতে একটা ছোট খাটিয়া, একটা কম্বল, একটা সাধারণ বিছানা এবং একটা গামছা কিনিয়া ফেলিলেন। বাজার করিয়া এত সুখ তিনি জীবনে কখনও পান নাই। সেগুলিকে কুলির মাথায় চাপাইয়া তিনি আবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে গেলেন। সেখানে একজন জ্যোতিষী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার কাছে গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিতজি, বলুন তো বিদ্যারম্ভের পক্ষে আজ দিনটা প্রশস্ত কি না।"

পণ্ডিতজি পাঁজি পুঁথি খুলিয়া বলিলেন, "আজ বৃহস্পতিবার। এমনিতেই বিদ্যারম্ভের পক্ষে শুভ। বেলা তিনটের পর আরও শুভ—"

যোগেন্দ্রনাথ কোন দিন পাঁজি বা জ্যোতিষে বিশ্বাসী নহেন, সেদিন কেন যে তিনি পণ্ডিতজির নিকট গেলেন তাহা নিজেও তিনি বোধহয় বলিতে পারিতেন না।

খবরটা লইয়া দ্রুতপদে তিনি বাড়ি ফিরিতে লাগিলেন। একটা ঘড়িতে দেখিলেন আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া দেখিলেন ভারু অঘোরে ঘুমাইতেছে।

"ভারু ভারু, ওঠ, ওঠ—"

ভারু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"তোমার ভালো নাম কি?"

"ভালো নাম নেই।"

"তাহলে তোমার ভালো নাম হোক ভারতকুমার। এখানে এস, আমার কোলের উপর বস। প্রথম ভাগ থেকেই আরম্ভ করা যাক—"

ভারুকে তিনি টানিয়া কোলের উপর বসাইলেন। প্রথম ভাগ খুলিয়া বলিলেন, "এটা কি ?"

ভারু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

"বল অ"

"অ"

"বাঃ—এই তো শুরু হয়ে গেল !"

সস্নেহে তিনি ভারুকে চুম্বন করিলেন। যে অতৃপ্তি এতদিন তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল তাহা সহসা যেন সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া গেল

যোগেন্দ্রনাথ সত্যই এখন সুখী।

গল্পগুচ্ছ

যোগেন পণ্ডিত

হরিপুরের লোয়ার-প্রাইমারি স্কুলের যোগেন পণ্ডিত বড়ই মর্মাহত হলেন বৃদ্ধ বয়সে। নূতন যুগের নূতন চাল-চলনের সঙ্গে কিছুতেই তিনি মানিয়ে চলতে পারলেন না। এখনও তিনি ছেলেদের পড়া মুখস্থ করতে বলেন, না পারলে শাস্তি দেন। কানমলা, চড়, চাপড়, বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া, কান ধরে হাঁটু-গেড়ে-বসানো এসব তো আছেই, বেতও মারেন। ত্যাঁদড় ছেলেদের মারের চোটে আধমরাও ক'রে ফেলেন।

এসব ছাড়া আর একটা কাজও করেন তিনি। বরাবরই করে এসেছেন। পাঠশালায় এসে ঘণ্টা-দুই ঘুমোন।

প্রায় ক্রোশখানেক দূরে থাকেন তিনি এক সোনার বেনের বাড়িতে। সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগরণ ক'রে তাঁকে হিসাবপত্র লিখতে হয়। এর বিনিময়ে সেখানে তিনি থাকতে পান এবং সিধা পান। নিজের রান্না নিজেই ক'রে নেন। অত্যন্ত রাশভারী লোক। সকলেই ভয় করে তাঁকে। ছাত্ররা আড়ালে বলে মহিষ-পণ্ডিত। যেমন কালো রং, তেমনি বলিষ্ঠ। চোখ দু'টিও লাল। কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না সহসা।

এক ক্রোশ হেঁটে প্রত্যহ বেলা বারোটা-আন্দাজ যখন তিনি পাঠশালায় হাজির হন, তখন তাঁর দুই পা হাঁটু পর্যন্ত ধূলি ধূসরিত। জুতো বা ছাতার বালাই নেই। হাতে একটি ছোট পুঁটুলি থাকে। পুঁটুলির ভিতর একখানি গামছা, কয়েকটি বই, চশমাটি এবং মসলার একটি ছোট কৌটো ছাড়া আর বড় কিছু থাকে না। স্কুলে এসেই তিনি আদেশ করেন—ওরে, জল আন। পাশের পুকুর থেকে ছাত্ররা জল বয়ে এনে দেয়। যোগেন পণ্ডিত পদপ্রক্ষালন করেন। পুঁটুলি থেকে গামছা বের ক'রে পা দুটি ভালো ক'রে মোছেন। তারপর ছাত্রদের সাহায্যে ধরাধরি ক'রে বেঞ্চিগুলি জোড়া দিয়ে নেন। তারপর মসলার কৌটো থেকে একটা লবঙ্গ বা এলাচের দানা মুখে ফেলে দিয়ে পুঁটুলিটি সযত্নে বেঁধে ফেলেন আবার। তারপর ছাত্রদের সম্বোধন ক'রে বলেন—যাও, এইবার তোমরা পড়া মুখস্থ করো গিয়ে। ঘুম থেকে উঠে পড়া নেবো। একটি ভুল যেন না হয় কারো। হ'লে আর আস্ত রাখবো না।

ছাত্ররা বেরিয়ে যায়। পুঁটুলিটি মাথায় দিয়ে যোগেন পণ্ডিত জোড়া-দেওয়া বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়েন।

পাঠশালার সামনে প্রকাণ্ড বটগাছ আছে একটি। তারই তলায় বসে ছাত্ররা পড়াশোনা করে। ঘণ্টা-দুই পরে পণ্ডিতমশায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ছাত্রদের দিয়ে আবার বালতি ক'রে জল আনিয়ে তিনি চোখ-মুখ-নাক-কান ধুয়ে ফেলেন—বিশেষ ক'রে নাক আর কান। তাঁর নাক আর কান দুই-ই বেশ বড়। শুধু বড় নয়, লোমও আছে বেশ।

হাত-মুখ মুছে, বটগাছের একটি ডাল ভেঙে নিয়ে যোগেন পণ্ডিত পড়াতে বসেন তারপর। পড়ানো শেষ ক'রে যখন উঠেন তখন প্রায়ই দেখা যায় যে, ডালটি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে।

এমনি প্রত্যহ '......

কিন্তু একটি ছেলে ফেল হয়নি আজ পর্যন্ত যোগেন পণ্ডিতের স্কুল থেকে। প্রতি বছরই বৃত্তি পায়। বেচালও হয়নি একটি ছেলে। কারণ, শুধু স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরেও তাঁর প্রতাপ কম ছিল না। কারণ, কোনও ছেলে শাসন সত্ত্বেও উপর্যুপরি পড়া না পারলে কিংবা স্বভাব না বদলালে, যোগেন পণ্ডিত তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেন, তার মা বাপকে পর্যন্ত বকেন। ছেলে খারাপ হবে কি? তাঁর স্কুলের প্রত্যেকটি ছেলেকে শায়েস্তা না-করা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।

তিনি ছেলেদের মারতেন বটে, কিন্তু ভালোও বাসতেন। কতই-বা মাইনে পান, কিন্তু তার থেকেই তিনি ভালো ছেলেদের পুরস্কার দিতেন, গরীব-ছেলেদের বই কিনে দিতেন। কারও অসুখ হ'লে, বার-বার গিয়ে খোঁজ নিতেন তার বাড়িতে। দরকার হ'লে সেবা করতেন।

সংসারে তাঁর নিজের বলতে কেউ নেই। প্রথম-জীবনে বিয়ে করেছিলেন, বাঁকুড়ায়। সেইখানেই একটা স্কুলে পণ্ডিতিও করতেন। কিন্তু পত্নী-বিয়োগ হ'লো। আর সেখানে থাকতে পারলেন না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এখানে চলে এলেন। এখানে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এখানকার স্কুলের ছেলেরাই তাঁর সব। তাদের উপর নিজের অধিকারও তাই তিনি অপ্রতিহত রাখতে চান।

কিন্তু, যুগ বদলেছে। তাঁর সাবেক-চাল আর সহ্য করতে পারছে না লোকে। এতদিন মুখ ফুটে সাহস ক'রে কেউ কিছু বলতে পারছিল না, কিন্তু নূতন দারোগা-বাবুর ডেঁপো ছেলেটিকে যোগেন পণ্ডিত যেদিন গো-বেড়েন করলেন, সেইদিন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলতে লাগলো। ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ যোগেন পণ্ডিতের এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে, দারোগাবাবুও সামনাসামনি তাঁকে কিছু বলতে সাহস করলেন না। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। পণ্ডিতের সমস্ত দুষ্কৃতির বর্ণনা দিয়ে গ্রামের সমস্ত লোককে দিয়ে সই করিয়ে এক লম্বা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন তিনি শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে। যোগেন পণ্ডিত ঘুণাক্ষরেও কিছুই জানতে পারলেন না।

কিছুদিন পরে, দরখাস্তকারীদের মুখপাত্র দারোগাবাবুকে কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, তদন্ত করার জন্যে জেলার ইন্‌স্‌পেক্‌টর শীঘ্রই যাবেন। হৃষ্ট হ'লেন দারোগাবাবু।

নির্দিষ্ট দিনে ইন্‌স্‌পেক্‌টার ভূতনাথ ভৌমিক এসে হাজির হ'লেন এবং দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্কুলে। যোগেন পণ্ডিত তখন তাঁর প্রাত্যহিক দিবা-নিদ্রা শেষ ক'রে আরক্ত নয়নে পড়াচ্ছেন ছেলেদের। স্কুলে গিয়েই কিন্তু ভূতনাথ ভৌমিক এমন অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড ক'রে বসলেন যে, দারোগাবাবুর চক্ষুস্থির

হ'য়ে গেল। অত বড় জাঁদরেল একটা লোক, যোগেন পণ্ডিতকে দেখবামাত্র কেঁচোটি হ'য়ে গেল যেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো কাচুমাচু হ'য়ে। দারোগাবাবু জানতেন না যে, ভূতনাথ ভৌমিক যোগেন পণ্ডিতের প্রাক্তন ছাত্র একজন। তিনি যখন বাঁকুড়ায় ছিলেন তখন বালক ভূতনাথকে পড়িয়েছিলেন। যোগেন পণ্ডিতও কম আশ্চর্য হননি। একবার দেখেই তিনি ভূতনাথকে চিনতে পেরেছিলেন।

"আরে, ভূতো না কি! তুই এখানে হঠাৎ কি ক'রে এলি!"

"আমি আজকাল স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার হয়েছি, পণ্ডিত মশায়।"

"তাই না কি! বেশ, বেশ। তা এখানে কেন? ও, ইস্কুল ভিজিট করতে এসেছিস বুঝি?"

যোগেন পণ্ডিতের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হ'যে গেল। চোখ থেকে উপছে পড়তে লাগলো, গর্ব আর স্নেহ।

লজ্জিত ভূতনাথ ভৌমিক বললেন, "না, এমনি একটু দরকারে এসেছি। কয়েকটি কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"কি কথা?"

"স্কুলের ছুটি হয়ে যাক, তারপরে বলবো'খন।"

"ইস্কুলের ছুটি দিয়ে দিলেই তো হ'লো। ওরে, তোরা সব বাড়ি যা আজ। ইন্‌স্‌পেক্‌টারের অনারে ছুটি দিয়ে দিলাম তোদের। এ আমার ছাত্র জানিস? প্রণাম কর সব।"

প্রণাম ক'রে স্কুলের ছেলেরা বাড়ি চলে গেল সব।

গতিক মন্দ বুঝে দারোগাবাবুও সরে পড়লেন। যোগেন পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে একটি বাক্যালাপও করলেন না।

"তারপর, তোর খবর কি সব বল। বিবাহ করেছিস্? ছেলে-পিলে ক'টি?"

"দুটি ছেলে।"

"বেশ, বেশ।"

নানা কথার পর অনেক ইতস্তত: ক'রে অবশেষে আসল কথাটি ভূতনাথ ভাঙলেন। দরখাস্তটিও দেখালেন। দেখিয়ে বললেন, "আমি যখন এসেছি তখন কোনও খারাপ রিপোর্ট দেবো না। কিন্তু—"

যোগেন পণ্ডিতের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন ভূতনাথ ভৌমিক।

যোগেন পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে দরখাস্তখানা দেখছিলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি যেন। যাদের ছেলেদের জন্যে এতকাল ধরে প্রাণপাত করেছেন তিনি, তারা তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে! প্রত্যেকটি সই তাঁর পরিচিত। এদের মধ্যে অনেকে তাঁর ছাত্রও।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে যোগেন পণ্ডিত বললেন, "আমি আর এখানে থাকবো না ভূতনাথ! কালই এখান থেকে চলে যাবো।"

"কোথায়?"

"যেদিকে দু'চোখ যায়।"

ভূতনাথ যোগেন পণ্ডিতকে চিনতেন। বুঝলেন তাঁর কথার নড়চড় হবে না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে তিনি বললেন, "একটা কথা বলতে সাহস হচ্ছে না পণ্ডিতমশায়, যদি অভয় দেন, বলি।"

"কি, বল্।"

"আপনি এখান থেকে চলে যাওয়াই যদি ঠিক ক'রে থাকেন, তাহলে আমার বাড়িতে চলুন না, আমি আপনাকে মাথায় ক'রে রাখবো। আমার ছেলে দুটির ভার আপনি নিন, তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই। ট্যুরে-টুরে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে—"

একটু চুপ ক'রে থেকে যোগেন পণ্ডিত বললেন, "বেশ, তাই হবে!"

তার পরদিন খুব ভোরে হরিপুর ছেড়ে চলে যাবার আগে যোগেন পণ্ডিত গ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন গ্রামটার দিকে।

তারপর চলে গেলেন।

জন বুল

জন বুল থাকতেন বিলেতে আর বিপিন মল্লিকের বাড়ি ছিল বাঙলা দেশে। একজনের লণ্ডনে আর একজনের কোলকাতায়। তবু দু'জনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং সূত্রটা ছিল পাটের। পাটের কারবারী ছিলেন দু'জনেই। বিপিন মল্লিক এখান থেকে পাট কিনে চালান দিতেন এবং জন বুল সেখানে সেটা বেচতেন। লাখ লাখ টাকার কারবার চলতো। দু'জনের কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

হঠাৎ একদিন জন বুলের খেয়াল হলো, বাঙলা দেশটা বেড়িয়ে আসা যাক। তাঁর কাছে বাঙলা দেশ মানে অবশ্য কোলকাতা শহর। চিঠি লিখলেন বিপিন মল্লিককে—মাই ডিয়ার মিস্টার মল্লিক, আমি···তারিখে কোলকাতা পৌঁছুচ্ছি,···নামক স্টীমারে। একটা ভালো হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা কোরো এবং অসুবিধা না হয় স্টীমার-ঘাটে এসো। ব্যবসাটা আরও বাড়ানো সম্ভব কি না সেটাও দেখবো। তোমাদের শহরটাও দেখবো। যা যা ব্যবস্থা করা দরকার তা কোরো। তুমি তো আমাকে চেনো না, আমাদের আপিসের মিস্টার স্টিফেনকে সঙ্গে ক'রে এনো, তাহলে আর কোনও অসুবিধা হবে না। মিস্টার স্টিফেনকেও আমি চিঠি লিখলাম। তোমার যদি কোনও অসুবিধা হয় তাহ'লে আসবার দরকার নেই। মিস্টার স্টিফেনের সহায়তায় আমিই

তোমাকে খুঁজে বার করবো। আশা করি ভালো আছ। আমার শুভেচ্ছা নাও। ইতি—
ভবদীয়

জন বুল।

নির্দিষ্ট দিনে জন বুল এসে পড়লেন। বিপিন মল্লিক এবং মিস্টার ষ্টিফেন ষ্টীমারঘাটে ছিলেন। বিপিন মল্লিকের মনে মনে যথেষ্ট ভয় ছিল—কি জানি কি রকম লোক হবে! খাঁটি বিলিতী সাহেব, তাছাড়া অত বড় লোক! বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠনঠনের কালীতলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম ক'রে মাকে অনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়ে এসেছিলেন তিনি। জন বুলের সঙ্গে আলাপ হয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। চমৎকার লোক! বেশ হাসি-খুশি, একটু দেমাক নেই, কথা বেশ স্পষ্ট, বুঝতে কষ্ট হয় না একটুও। এইটেই তো ভয় ছিল মল্লিক মশায়ের সব চেয়ে বেশি—বিলিতী সায়েব হাঁউ-হাঁউ ক'রে কি বলবে, বোঝাই যাবে না হয়তো! জন বুলের কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি। সমস্ত বোঝা যাচ্ছে!

ষ্টীমার থেকে নেমে জন বুল ট্যাক্সিতে উঠলেন। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। অসংখ্য লোক, সবাই কর্মব্যস্ত, ঘর্মাক্ত-কলেবর।

—খুব পরিশ্রমী তো এখানকার লোক দেখছি, কতক্ষণ কাজ করে?

মল্লিক বললেন,—দিবারাত্রিই খেটে চলেছে।

—তাই নাকি? বাঃ!

মুগ্ধ নয়নে দেখতে দেখতে চললেন জন বুল। মনে হতে লাগলো, খুব ভুল একটা ধারণা ছিল তাঁর। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

জন বুল আবার হঠাৎ জিগেস করলেন,—কি খায় এরা?

—ডাল ভাত তরকারি। তাও পেট ভরে পায় না সব সময়ে—আবার উত্তর দিলেন মল্লিক একটু হেসে।

—আই সি! ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ ক'রে গেলেন জন বুল। তারপর ষ্টিফেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি একটা জিগ্যেস করলেন চুপি-চুপি।

—ও নো, মোটেই না। মাথা নেড়ে ষ্টিফেন বললেন। মল্লিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না ঠিক। চুপ ক'রে রইলেন।

হোটেলে পৌঁছে জন বুল বললেন,—অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মল্লিক। আমি এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করবো একটু। তারপর যাবো আপিসে। আপিসের কাজ-কর্ম সেরে বেলা পাঁচটা নাগাদ বেড়াতে বেরুবো। মিস্টার ষ্টিফেনের আজ কোথায় যেন একটা পার্টি আছে। বিকেলে তিনি যেতে পারবেন না আমার সঙ্গে। আপনি আসতে পারবেন কি?

—হাঁ, খুব পারবো।

—অনেক ধন্যবাদ।

ঠিক পাচটার সময় একটা ট্যাক্সিতে চড়ে জন বুল এবং বিপিন মল্লিক শহর পরিদর্শন করতে বেরুলেন। মনুমেণ্ট, চৌরঙ্গী, লাটসাহেবের বাড়ি, মিউজিয়ম প্রভৃতি নানা জিনিস দেখতে দেখতে অবশেষে ধর্মতলায় পৌছুলেন তাঁরা এসে। জন বুল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, কিছুদূর অন্তর অন্তর ওই যে আলো দিয়ে আয়না দিয়ে সাজানো ছোট ছোট দোকান রয়েছে—কি ওগুলো? দোকানদার দেখছি কোথাও পুরুষ, কোথাও স্ত্রীলোক, কোথাও বালক।

মল্লিক বললেন, ওগুলো পানের দোকান।

—পান! সে আবার কি? মিষ্টান্ন কোনও রকম? সবাই তো কিনে কিনে খাচ্ছে দেখছি।

—না, মিষ্টান্ন নয়, তবে খেতে চমৎকার। আপনি খাবেন?

—বেশ তো।

একটা ভালো পানের দোকানের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে মল্লিক নেমে গেলেন।

—একটা ভালো পান দাও তো, বেশ মসলা-টসলা দিয়ে দিও, সাহেব খাবে।

বেশী দাম দিয়ে রুপোর তবক দেওয়া দু'খিলি পান জন বুলকে এনে দিলেন মল্লিক।

—দুটোই খেয়ে ফেলবো? একটু ইতস্তত: করতে লাগলেন সাহেব।

—হঁ্যা, হঁ্যা, দুটোই খেয়ে ফেলুন। সোৎসাহে বললেন বিপিন মল্লিক।

জন বুল দু'খিলি পানই মুখে পুরে চিবুতে লাগলেন। ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো আবার। একটু পরেই সাহেবের সাদা কস বেয়ে পানের ধারা গড়াতে লাগলো। সাহেব রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। মুছে রুমালের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন তিনি।—এ কি, রক্ত না কি—মল্লিক, একি কাণ্ড!

—ও কিছু নয়, পানের পিক। আপনি চিবিয়ে যান।

জন বুল চিবুতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরেই কি রকম যেন হতে লাগলো তাঁর। মাথাটা বনবন ক'রে ঘুরছে, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, দম বন্ধ হ'য়ে আসছে যেন সর্বনাশ, এ কি হলো!

—মল্লিক, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি। হোটেলে ফিরে চলো। ওয়াক্ ওয়াক্।

বমি ক'রে ফেললেন জন বুল। দামী সুটে পানের ছোপ লেগে গেলো চারদিকে। কস বেয়ে পানের লাল রং ঝরছে—চোখ কপালে উঠেছে। ভয় পেয়ে গেলো মল্লিক।

—হোটেলে চলো শিগ্‌গির।

হু-হু ক'রে ট্যাক্সিখানা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভীত মল্লিক জন বুলকে আস্তে আস্তে ধরে ধরে নামালেন ট্যাক্সি থেকে। তারপর কোনক্রমে লিফ্‌টের সাহায্যে নিয়ে গেলেন তাঁকে ঘরে।

দোতলায় সাহেবের জন্ত আলাদা একটা ঘর ঠিক করাই ছিল। সাহেব ঘরে ঢুকে

ধপাস ক'রে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। তারপর বিহ্বল দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন,—একজন ডাক্তার ডাকো মল্লিক! আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন মল্লিক মশাই। হলো কি! পানে দোক্তা-টোক্তা ছিল না কি? সত্যিই যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে তো সর্বনাশ! পুলিস-কেসে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন তিনি।

ডাক্তার নিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরলেন। এসে দেখেন, জন বুল মদ খাচ্ছেন। হুইস্কির বোতলের ছিপি খোলবারও তর সয় নি তাঁর। বোতলের মুখটা ঠুকে ভেঙেছেন। আধ বোতল শেষ ক'রে ফেলেছেন।

মল্লিককে দেখে তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

—এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। আর কোনও ভয় নেই।

ডাক্তারবাবু তবু তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তিনিও বললেন—না, আর কোনও ভয়ের কারণ নেই। ফী নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

তিনি চলে যাবার পর জন বুল বললেন,—একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেলো। আমি এসে থেকেই ভাবছিলাম।

—কি?

—ভাবছিলাম, তোমরা এত খাটো কিসের জোরে। ষ্টিফেন বললে, আমাদের মতো যখন তখন মদ খাওয়া নিয়ম নয় তোমাদের। আমি ভাবছিলাম, কিসের জোরে খাটছো তাহলে! এখন দেখছি—ও বাবা—আমার মতো পাঁড় মাতালও যা খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়ে, তা অনবরত চিবুচ্ছ তোমরা! গড্!

জন বুল আর এক চুমুক নির্জলা হুইস্কি খেয়ে স্মিত মুখে মল্লিকের মুখের দিকে চাইলেন।

সুরবালা

তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমি আমার এক সহপাঠির বাসায় থাকিতাম। বাসাটি একটি গলির মধ্যে। খুব ছোট বাসা। একটি খোলা ছাদ ছিল। সেই ছাদে বসিয়াই আমরা পড়াশোনা করিতাম। আমাদের বাসার ঠিক পাশেই একটা খোলার ঘর ছিল। আমরা যখন আসিয়াছিলাম তখন ঘরটা ছিল খালি, কিন্তু কিছুদিন পরেই এক ভাড়াটে আসিয়া জুটিল এবং আমরা বিপদে পড়িয়া গেলাম। প্রথম দিন তেমন কোনও গোলমাল হইল না, গোলমাল শুরু হইল দ্বিতীয় দিন হইতে। আমরা সন্ধ্যার সময় পড়িতে বসিয়াছি, হঠাৎ সেই খোলার ঘরে চীৎকার চেঁচামেচি শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, একটি স্ত্রীলোককে কে যেন মারিতেছে। আলিসার উপর ঝুঁকিয়া ব্যাপারটা

কি অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম, কিছুই বুঝা গেল না। চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ কোনও জবাব দিল না। নীচে নামিয়া গেলাম এবং গিয়া দেখিলাম, সামনের কপাট ভিতর হইতে বন্ধ। অনেকক্ষণ কড়া নাড়িবার পর একটি প্রৌঢ়-গোছের লোক বাহির হইয়া আসিলেন।

—"ব্যাপার কি মশাই? এত হল্লা কিসের?"

—"ও কিছু নয়, আমার ভাই বিপিন তার বউকে ঠ্যাঙাচ্ছে।"

—"ঠ্যাঙাচ্ছে! কেন?"

—"মদ খেয়ে, আবার কেন। রোজই এই কাণ্ড করে বোম্বেটেটা।"

—"আপনারা কিছু বলেন না?"

—"বলি বই-কি। এখনি একটা থাপ্পড় দিয়ে এলুম, থেমে যাবে এখুনি, বউমা ঘরে খিল দিয়েছেন।"

কি আর বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম তাহার পর চলিয়া আসিলাম। সেদিন আর পড়ায় মন বসিল না।

তাহার পরদিনও ঠিক ওই কাণ্ড। তাহার পরদিনও। মহা মুশকিলে পড়িয়া গেলাম আমরা। সামনেই পরীক্ষা। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যদি এমন করিয়া পড়া নষ্ট হয় তাহা হইলে তো ফেল হইয়া যাইব। তাছাড়া একটা মাতালের হাতে প্রত্যহ এমনভাবে একটি স্ত্রীলোক নির্যাতিত হইতেছে, ইহা সহ্য করাও তো শক্ত। কিন্তু, কি যে করা যায় তাহা আমাদের মাথায় আসিল না।

একদিন আমরা সকালে হাসপাতালে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি, এমন সময় সেই বিপিনের সহিতই দেখা হইয়া গেল। রোগা পাতলা চেহারা, রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে। মনে হইল, উহাকে গিয়া একটু বুঝাইয়া বলি, স্ত্রীকে প্রত্যহ এমনভাবে নির্যাতন করাটা কি ভাল? বুঝাইয়া বলিলে হয়তো লোকটা সুপথে ফিরিবে। আগাইয়া গেলাম এবং যতদূর ভদ্রভাবে ব্যাপারটা বলা সম্ভব বলিলাম। বিপিন ঘাড় বাঁকাইয়া আমাদের সমস্ত কথা শুনিল। তাহার পর বলিল, "আমার স্ত্রীকে আমি মারি তাতে আপনাদের কি?"

ইহার উত্তরে তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটি চড় মারা ছাড়া আর কিছু করা যায় না, কিন্তু তাহা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমরা গলি হইতে বাহির হইয়া বড়-রাস্তায় গিয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলাম, কি করিয়া লোকটাকে শায়েস্তা করা যায়। আমার বন্ধু শশাঙ্ক বলিল যে বিপিনকে একদিন রাস্তায় ধরিয়া মার দেওয়াই উচিত, আমারও তাহাই ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পাড়ায় প্রতিবেশীর সহিত ছোটলোকের মতো মারামারি করাটা অশোভন হইবে ভাবিয়া পিছাইয়া যাইতেছিলাম।

—"সেলাম হুজুর!"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, দীর্ঘকায় একটি লোক আগাইয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে চিনিতে পারিলাম। কলকাতার গুণ্ডা একজন। ছোরা মারামারি করিয়া মেডিকেল কলেজে গিয়াছিল। উহার বাম বাহুর উপর ছোরার আঘাত বেশ জোরে লাগাতে কিছুদিন হাসপাতালে ছিল। সেই সময় আমি উহার ঘা ড্রেস করিতাম। মাস-দুই পূর্বে হাসপাতাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

—"তোমার হাত বেশ ভাল হয়ে গেছে তো ?"

—"হাঁ, হুজুর !"

তাহার পর ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, সে আমাদের জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া দিবে কি ? তাহার এক দোস্তের ট্যাক্সি মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা হুকুম করিলেই সে আমাদের কলেজে পৌছাইয়া দিবে।

আমি বলিলাম, "না, তার দরকার নেই, তার চেয়ে তুমি যদি একটি কাজ ক'রে দিতে পারো আমাদের খুব উপকার হয়।"

—"ফরমাইয়ে !"

বিপিনের সব কথা তাকে বলিলাম।

শশাঙ্ক বলিল, "লোকটার জ্বালায় আমাদের পড়াশোনা বন্ধ হ'য়ে গেছে। ওকে যদি শিক্ষা দিয়ে দিতে পারো, ভারি ভাল হয়।"

"য়হ্ কৌন বড়ী বাত হ্যায়। চলিয়ে।"

আমরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বিপিন তখনও রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল। দূর হইতে আমরা বিপিনকে চিনাইয়া দিলাম।

গুণ্ডাটা একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর গোঁফে তা দিয়া বলিল, "ঠিক হ্যায়।"

সেদিন সন্ধ্যার সময়ও বিপিনের স্ত্রীর আর্তনাদ আমাদের পাড়াকে সচকিত করিয়া তুলিল। আমরা ভাবিলাম, গুণ্ডাটা তাহা হইলে বোধ হয় কিছুই করিতে পারে নাই। তাহার পরদিন কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিল। বুঝিলাম, নিশ্চয় কিছু করিয়াছে সে। কারণ, খোলার বাড়ি একেবারে চুপচাপ, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নাই। সমস্ত রাত কাহারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরদিন আমরা সকালে যখন কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইতেছি, দেখিলাম, বিপিন রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল। কিছু বলিল না। হাসপাতালে গিয়া দেখি, সেই গুণ্ডা কলেজ-গেটের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল। আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাশের বাড়িতে কাল কোনও গোলমাল হইয়াছিল কি না ?

আমরা সানন্দে উত্তর দিলাম—"না, একেবারে গোলমাল হয়নি। কি করলে বল তো ?"

—"পকড়কে পিটা !"

সে যাহা বলিল তাহা এই :

আমরা বিপিনকে চিনাইয়া দিবার পর সে সমস্ত দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিল, বিপিন সমস্ত দিন কোথায়-কোথায় যায়, কি-কি করে। দেখিল, বিপিন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি করে। দশটার সময় আপিসে যায়। আপিস হইতে তাহাকে বড়বাজারে একটা গোলায় গিয়া মাল ওজন করাইতে হয়। তিনটা নাগাদ সে সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। বাড়ি ফেরে পাঁচটার পর। পরদিন গুণ্ডাটা তাহার বাড়ি ফিরিবার পথে ওত পাতিয়া বসিয়া রহিল। কাছাকাছি আসিতেই তাহাকে গিয়া বলিল—'তোমার বড়সাহেব তোমার সহিত কথা বলিতে চান, এসো।' বিপিন বলিল, 'কোথায় বড়সাহেব ?' গুণ্ডাটা উত্তর দিল, 'ওই যে ট্যাক্সিতে বসিয়া আছেন।' একটু দূরে তাহার দোস্তের সিডানবডি ট্যাক্সিখানা দাঁড়াইয়া ছিল, সেইটা দেখাইয়া দিল। দ্বিতীয় কথা না বলিয়া বিপিন সেদিকে আগাইয়া গেল। গাড়ির ভিতর তাহার আর-এক দোস্ত বসিয়াছিল।

বিপিন কাছাকাছি আসিতেই সে চাপা-গলায় ইংরেজীতে বলিল, 'কাম্ ইন।' বিনা দ্বিধায় বিপিন গাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই তাহার দ্বিতীয় দোস্ত তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহাকে লইয়া ট্যাক্সি হাঁকাইয়া তাহারা চলিয়া গেল তিন নম্বর ব্রিজে। সেখানে গিয়া বেশ করিয়া চাব্‌কাইল তাহাকে। তাহার পর বলিয়া দিল যে, ফের যদি সে মদ খাইয়া আসিয়া বাড়িতে হাল্লা করে, তাহাকে খুন করিয়া ফেলিবে।

আমরা খুব আনন্দিত হইলাম। আমাদের উপকার করিতে পারিয়াছে জানিয়া গুণ্ডাটাও খুব খুশী হইল এবং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার পর প্রায় মাস-দুই কাটিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ি হইতে একদিনও আর কান্নাকাটি শোনা যায় নাই। আমরা মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম—যাক্ লোকটা বোধ হয় মারের ভয়ে ঠিক হইয়া গেল। বিপিনের দাদা নবীনের সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। একদিন রাস্তায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিপিনবাবু আজকাল মদ-টদ খাওয়া ছেড়েছেন মনে হচ্ছে।" নবীনবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ছাড়েনি, তবে কমিয়েছে।"

— কই, একদিনও তো আর গোলমাল শুনিনি ?"

—"শোনেন নি, কারণ বউমা আর চেঁচামেচি করেন না। পরশুই তো এমন নির্মম মেরেছে যে, আমি গিয়ে না পড়লে মেরেই ফেলতো বোধ হয়।"

—"এত মার খেয়েও উনি চুপ ক'রে থাকেন ?"

—"তাই তো থাকছেন ইদানীং।"

কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

— আচ্ছা, উনি মদ খেয়ে স্ত্রীকে মারেন কেন, বলুন তো ?"

—"তখন ভূত চাপে ঘাড়ে একটা। নেশা ছুটে গেলে স্ত্রীর পায়ে ধরে কাঁদেও আবার। ওকি একটা মানুষ মশাই ? জানোয়ার। আচ্ছা, চলি।"

নবীনবাবু পাশের গলিটায় ঢুকিয়া গেলেন। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই রং বদলাইয়া গেল যেন। বিপিনের স্ত্রী সুরবালাকে মাঝে-মাঝে ছাত হইতে দেখিয়াছি। রোগা পাতলা চেহারা। আধময়লা একটা কাপড় পরিয়া, মাথায় আধঘোমটা টানিয়া সারাদিন ঘরের কাজ করিয়া বেড়ায়। বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর মোছে, রান্না করে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত জায়ের সেবাও করে সে-ই। ঘরের ভিতর হইতে 'সুরবালা', 'সুরবালা' বলিয়া তিনি প্রায়ই ডাকাডাকি করেন শুনিতে পাই।

মার খাইয়া কাঁদে না। অবাক্ কাণ্ড!

কিছুদিন পরে আবার একদিন সুরবালার কান্না শুনিতে পাইলাম। তখন কলিকাতায় হিন্দু মোস্লেম দাঙ্গা লাগিয়াছে। সেকালের দাঙ্গা আজকালকার মতো এমন ভয়াবহ হইত না। আমরা স্টেথোস্কোপ ঝুলাইয়া রাস্তায় যাতায়াত করিতাম, আমাদের কেহ কিছু বলিত না। সেদিনও আমরা ছাতে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিলাম। তখন রাত্রি প্রায় দশটা হইবে। অনেকদিন পরে সুরবালার কান্না শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। আলিসায় ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি!" নবীনবাবু ঘরের ভিতর হইতে উঠোনে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"একবার নীচে নেমে আসুন তো!"

তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম। মনে হইল, আজ বোধ হয় প্রহারের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাই সুরবালা কাঁদিতেছে। ডাক্তারী সাহায্য প্রয়োজন বলিয়াই নবীনবাবু আমাদের বোধ হয় ডাকিতেছেন। নামিয়া গিয়া কিন্তু যাহা শুনিলাম, তাহা একেবারে অন্যরকম।

নবীনবাবু বলিলেন, "মহা মুশকিলে পড়েছি মশাই। বিপিন দিন-পাচেক আগে বড়বাজারের সেই গোলায় গিয়ে মাল ওজন করাচ্ছিলো। ওজন-দাঁড়ির লোহার ভারী পাল্লাটা ছিঁড়ে গিয়ে তার পায়ে পড়ে পায়ের একটা হাড় ভেঙ্গে গেছে। সেইখান থেকেই তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভরতি ক'রে দিয়েছে তাকে তার আপিসের লোক। আমিও গিয়ে দেখে এসেছি তাকে। কিন্তু বাড়িতে আমি আর খবরটি ভাঙিনি। ভাঙলেই বৌমা দেখতে যেতে চাইবেন। চারদিকে এখন দাঙ্গা হচ্ছে, তাছাড়া রোজ রোজ গাড়ি ভাড়া ক'রে যাওয়া-আসা কি সোজা খরচ মশাই ? ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলাম তাই। বাড়িতে এসে বলেছিলাম, আপিসের কাজে বিপিন বাইরে গেছে, ফিরতে দেরি হবে কিছু। মাঝে-মাঝে ওকে মাল কিনতে বাইরে যেতেও হয়। এদিকে হয়েছে কি, বৌমার ভাই সুরেন আজ বর্ধমান থেকে এসেছে। সে এসে সোজা বিপিনের আপিসে গেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে শুনেছে, বিপিন হাসপাতালে। হাসপাতালে গিয়ে সে পাঁচটার পর বিপিনের সঙ্গে

দেখা করেছে। তারপর হাসপাতাল থেকে সোজা এসেছে এখানে। আমি বাড়িতে থাকলে টিপে দিতুম তাকেও। কিন্তু আমি বাড়িতে ছিলাম না। বৌমার কাছে কথাটি ফাঁস ক'রে ফেলেছে স্থরেন। বৌমা কেঁদে-কেটে অনর্থ করছেন। বলছেন, তাকে নিশ্চয় মুসলমান গুণ্ডায় ছুরি মেরেছে, আমরা আসল ব্যাপারটা লুকোচ্ছি তার কাছ থেকে। বলছেন, এখনই আমাকে নিয়ে চলুন একবার, আমি শুধু একটিবার দেখবো তাকে। এই রাত্তিরে এখন কি করি বলুন তো, এখন কি হাসপাতালে ঢুকতে দেবে?"

আমরা তুইজনেই তখন মেডিক্যাল ওআর্ডে ছিলাম। সার্জিকাল ওআর্ডের খবর রাখিতাম না। তাই বিপিনবাবুর কোনও খবরই পাই নাই।

শশাঙ্ক উদ্দীপ্ত-চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "চল্ না, আমরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। আমরা গেলে চুপচাপ দেখাটা করিয়ে দিতে পারবো, উনি যদি কোনও গোলমাল না করেন।" আমিও রাজী হইয়া গেলাম। নবীনবাবু একটু আমতা-আমতা করিতে-ছিলেন, কিন্তু আমরা তুইজন দায়িত্ব লওয়াতে শেষটা তাঁহাকেও মত দিতে হইল।

একটা গাড়ি ডাকিয়া স্থরেন ও স্থরবালাকে লইয়া শশাঙ্ক ও আমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাহির হইয়া পড়িলাম। স্থরবালা সমস্ত পথটা মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। আমরা তাঁহাকে বারম্বার বুঝাইয়া বলিলাম যে ওআর্ডের ভিতর ঢুকিয়া তিনি যেন কান্নাকাটি না করেন। গোলমাল করিলে বিপদ হইবে।

হাসপাতালে গিয়া দেখিলাম, নার্স এবং ও. ডি. (অফিসার অন ডিউটি) তুইজনেই আমাদের পরিচিত। সব কথা খুলিয়া বলাতে আমাদের খাতিরে তাঁহারা স্থরবালাকে ওআর্ডে ঢুকিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বারবার করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন কোনও গোলমাল না হয়। আমরাও স্থরবালাকে বারবার সে-কথা বলিয়া দিলাম। কিন্তু স্থরবালা ওআর্ডে ঢুকিয়া কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া তাহার স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে তাহাকে সেদিন হাসপাতাল হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিলাম। স্থরবালার অশোভন আচরণের জন্য সেদিন ও. ডি.-র নিকট আমরা বকুনি খাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কেন জানি না, স্থরবালার উপর সেদিন আমাদের রাগ হয় নাই। আজও তাহার সেই অশ্রুসজল মুখটা মনে আঁকা আছে।

বছর-দশেক পরে। আমি তখন মফস্বলের এক হাসপাতালে ডাক্তার। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে সমস্ত দেশ তখন আলোড়িত। অসহযোগী সত্যাগ্রহীদের মাথায় পুলিসের লাঠি ক্রমাগত পড়িতেছে এবং আমরা ক্রমাগত কাটা ঘায়ে টিঞ্চার আইয়োডিন লাগাইয়া কাটা-মাথা ব্যাণ্ডেজ করিয়া চলিয়াছি।

একদিন একদল আহত সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস হাসপাতালে লইয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে দেখি, বিপিন! পরণে ময়লা খদ্দর। মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

—"আরে, আপনি এখানে কি ক'রে এলেন ?"

—"মদের দোকানে পিকেটিং করছিলাম।"

—"আপনি মদের দোকানে পিকেটিং করছিলেন ?"

—"হ্যাঁ।"

তাহার অকম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম, বিপিন বদলাইয়া গিয়াছে। বন্দীর দলকে লইয়া পুলিস চলিয়া গেল। তাহার পরদিন আর একদল আসিল। তাহাদের মধ্যে ছিল সুরবালা। পুলিসের মার খাইয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

নতুন সিংহ

"এবার পূজো কবে ঠাকুমা ?"

সাত-বছরের খোকন এসে জিজ্ঞেস করল তার ঠাকুমাকে। ঠাকুমা চোখে চশমা দিয়ে সেলাই করছিলেন কি যেন একটা। সেলাই থেকে চোখ না তুলেই জবাব দিলেন—

"এবার পূজো হবে না।"

"হবে না ? কেন !"

"মা দুর্গা আসবেন না।"

"আসবেন না ? কেন !"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না খোকন! পূজোর সময় কত জামা কাপড় হবে, থিয়েটার হবে পাড়ায়—মা দুর্গা আসবেন না, তা কি হতে পারে কখনও।

"মা দুর্গা আসবেন না ? বল কি তুমি ঠাকুমা।"

"কিসে চড়ে আসবেন তিনি ?"

"কেন, সিংহে চড়ে !"

"মাংসর যা দাম আজকাল, সিংহ খাবে কি ? মা দুর্গার অত পয়সা নেই।"

"আমরা চাঁদা দেব সবাই তো।"

"কত চাঁদা দিতে পারিস্ তোরা ! মা দুর্গার সিংহ কি যে-সে সিংহ, অনেক মাংস চাই তার।"

"কত ?"

"অনেক। মা দুর্গা হলেন শক্তি, তাঁকে ব'য়ে আনে যে সিংহ সে কি যে-সে সিংহ ?"

কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে খোকন বললে, "মা দুর্গা এরোপ্লেনে আসতে পারেন না ?"

"না। সিংহ ছাড়া আর কিছুতে চড়েনই না।"

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খোকন।

মহা মুশ্‌কিল তো!

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একছুটে চলে গেল সে পাশের ঘরে।

ঠাকুমা মুখ টিপে হাসলেন একটু।

আধঘণ্টা পরে ফিরে এল খোকন।

"ঠাকুমা, আমি দুর্গাকে পিঠে ক'রে বয়ে আনব। এই দেখ সিংহ সেজেছি!"

ঠাকুমা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন খোকন কালি দিয়ে প্রকাণ্ড গোঁফ করেছে, ঝাঁকড়া উলের টুপিটা মাথায় পরে কেশর করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড়টা উঁচু ক'রে রেখেছে বীর-বিক্রমে।

ঠাকুমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খোকন বলে উঠল—গাঁক্—গাঁক্—গাঁক্!

হেসে ফেললেন ঠাকুমা।

পরমুহূর্তে স্নেহ উথলে উঠল তাঁর দুই চোখে! বললেন, 'হ্যাঁ, তুই যদি মা শক্তিকে পিঠে ক'রে বয়ে আনতে পারিস্‌ নিশ্চয় তিনি আসবেন।"

উৎসাহিত হ'য়ে খোকন বললে, 'আমাকে খেতে দিতে তো কোন খরচই লাগবে না, নয় ঠাকুমা? আমি তো ঘরেই খাব।"

"তাতো ঠিকই।"

আবার সেলায়ে মন দিলেন তিনি।

"আচ্ছা ঠাকুমা, মা, দুর্গাতো কৈলাসে থাকেন, না? কৈলাস কোথায়?"

"হিমালয় পাহাড়ে।"

"অনেক উঁচুতে?"

"হ্যাঁ।"

"অনেক, উঁচুতে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে সেখানে যাব কি ক'রে আমি?"

"ভেবে চিন্তে উপায় বার করলেই হবে একটা। এখন তুমি একটু শোও দেখি।"

নিজের পাশে টেনে নিয়ে শোয়ালেন তাকে।

"আচ্ছা ঠাকুমা—"

"একটি কথা না, আগে ঘুমোও, তারপর কৈলাসে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে।"

খোকন চুপটি ক'রে শুয়ে রইল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, অরণ্যের পর অরণ্য পার হয়ে সে চলেছে মা দুর্গাকে আনতে। সত্যিই যেন সিংহ হ'য়ে গেছে সে। ঘাড়ে গজিয়েছে কেশর, চোখে জ্বলছে আগুন, গায়ে হয়েছে অসীম শক্তি। অরণ্য পর্বত লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে সে। সামনে কোনও বাধা এলেই সিংহগর্জনে ডাক ছাড়ছে—গাঁক্, গাঁক্, গাঁক্।

অসম্ভব গল্প

অভয় হঠাৎ যখন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তখন তার বাড়ির লোকেরা ছাড়া আর সবাই যেন খুশীই হ'ল মনে মনে; পাড়ার থিয়েটার পার্টিতে অভয় অভিনয় করত, তারা অবশ্য দুঃখিত হ'ল খুব। কারণ চমৎকার অভিনয় করত অভয়। নূতন একটা নাটকে গিয়াসুদ্দিন বলবনের ভূমিকা নিয়েছিল সে। পাড়ার অধিকাংশ লোকেই কিন্তু ভাবলেন—ঠিক হয়েছে, যেমন বাহাদুরি করতে যাওয়া। পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা যখন হিন্দুদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করছে, তখন উনি এখানকার মুসলমানদের ওপর দরদ দেখিয়ে তাদের সভায় খাবার বিলি করতে গেছেন। গভর্ণমেণ্ট তো পুলিস পাহারা দিয়ে ওদের ষোড়শোপচারে পুজো করছেনই, তোর আবার বাহাদুরি ক'রে পুলিসের চোখ এড়িয়ে সেখানে খাবার দিতে যাওয়া কেন? ওসমানের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িস বলেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে? পাগল না ক্ষ্যাপা। ওরা যে কি ভয়ানক জাত তা কি অজানা আছে কারও? পাড়ার অধিকাংশ লোকেই প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন। অভয় যেদিন বাড়ি ফিরল না সেদিন সবাই ভাবলে মুসলমান গুণ্ডার ছোরার ঘায়ে শেষ হয়ে গেছে ছোকরা! হয়তো পুঁতে ফেলেছে লাশটা, কিংবা ফেলে দিয়েছে কোথাও, ড্রেনে, পুকুরে, নয়ত গঙ্গায়।

…কাগজে কাগজে নিরুদ্দিষ্ট অভয়ের ছবি বেরুল যথারীতি। পুরস্কার ঘোষণা করে অভয়ের বাবা বেতারে আর কাগজের অফিসে ঘুরলেন, সন্ধান করলেন থানা এবং হাসপাতালে, কিন্তু অভয়ের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। অভয় আর ফিরল না। পাড়ার অভিজ্ঞ লোকেরা, বিশেষ ক'রে কোটপ্যাণ্ট পরা সেই সব চাকুরের দল, যারা ইংরেজ আমলের পরাধীনতার মোহে এখনও মুগ্ধ, 'স্টেট্সম্যান' ছাড়া অন্য কাগজ পছন্দ হয় না যাঁদের, তাঁরা মনে মনে অভিজ্ঞ মুচকি হেসে বাইরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন অভয়ের বাবাকে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের যে গ্রামে দারোগার সামনে হিন্দু নরনারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়ে গেছে, সেই গ্রামে যে ঘটনাটা ঘটল তার খবর কোন কাগজেই প্রকাশিত হল না। এসব খবর নাকি পাকিস্তানী খবরের কাগজে বেরোয়ও না।

মুসলমানের মুখোশ পরা সেই পিশাচ দারোগাটা রাত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছিল বাইরের ঘরে। হ্যাঁ, বেশ নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে একাই শুয়েছিল লোকটা, ভয় আর কাকে করবে, সব কাফের তো শেষ হয়ে গেছে। রক্তের দাগ পর্যন্ত ধুয়ে ফেলা হয়েছে। চাঁদ হাসছিল আকাশে। গভীর রাত্রি। খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে। আরামে নাক ডাকাচ্ছিল দারোগা।

জানালা দিয়ে টপ্ ক'রে ঘরে লাফিয়ে ঢুকল কে যেন! মুখে ঘন কালো গোঁফদাড়ি, হাতে শানিত ছোরা। ঘরে ঢুকেই সে নিমিষের মধ্যে সেই ঘুমন্ত দারোগার বুকে চড়ে বসল। টুঁটি চেপে ধরল বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টি দিয়ে।

আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল ভয়ার্ত দারোগা।

"কে, কে তুমি—"

"আমি দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন, ইসলাম ধর্মের মাথা হেঁট করেছ তুমি কাপুরুষ। তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি—"

পরমুহূর্তে শানিত ছোরা আমূল বসে গেল দারোগার বুকে। তারপরই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, তার গোঁফদাড়ি খুলে গেল। ছুটে এল দারোগার রক্ষীরা।

অভয়ের মৃতদেহটাকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল পিশাচেরা। ষোল বছরের ছেলে অভয়।···সত্যই কি অভয় মরেছে?

একালের রূপকথা

ছুটির দিন। রমেন একটা রূপকথার বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে। সেই পুরাতন চার বন্ধুর গল্পটা। পড়তে পড়তে তার মনে হচ্ছিল, "মনু, হাবুল, গণশা আর আমি, আমরাও তো চার বন্ধু, কিন্তু আমরা তো রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর পাত্রপুত্র নই! আমার বাবা কর্পোরেশনের ক্লার্ক, মনুর বাবা ডাক্তার, হাবুলের বাবা ওভারশিয়ার আর গণশার বাবা দালাল। আমাদের নিয়ে কি আর রূপকথা হয়? তাছাড়া আমরা অমন পক্ষিরাজই বা পাব কোথা? আকাশ-পথে অমন হু-হু ক'রে উড়ে যাওয়া সে কি আর সম্ভব আমাদের পক্ষে? নাঃ, এ যুগে আর রূপকথা হয় না। হাবুলের ইচ্ছে এরোপ্লেনের পাইলট হবার, ও হয়তো কোন দিন আকাশ-পথে হু-হু ক'রে উড়বে। কিন্তু সে ওড়া চাকরির ওড়া, তাতে কি আর রূপকথা হয়?"

এই সব ভাবতে ভাবতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুমের ভিতর রূপকথা এসে দেখা দিল স্বপ্ন হয়ে।

টেলিগ্রাম নয়, একটি ছোট্ট পরী এসে ঢুকল রমেনের পড়ার ঘরের কপাট ঠেলে।

"আপনিই রমেনবাবু?"

"হ্যাঁ।"

"হাবুলবাবু চিঠি দিয়েছেন একখানা। মনুবাবু আর গণেশবাবু থাকেন কোথায় বলুন তো, তাঁদের নামেও চিঠি আছে।"

মনু আর গণেশের ঠিকানাটা বলে দিলে রমেন।

প্রজাপতির মতো ডানা মেলে পরী উড়ে চলে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, রমেন এতে আশ্চর্য হ'ল না একটুও। টেলিগ্রাম, টেলিফোন বা রেডিও দেখে সে কি আশ্চর্য হত? এ দেখেই বা হবে কেন? পরীরা উড়ে উড়ে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেককে চিঠি দিয়ে আসবে এইটাই তো বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার।

হাবুল লিখেছে—"রমেন, ক'দিনের ছুটি পেয়েছি। প্লেন নিয়ে বেড়াতে বেরোব। তোমাদেরও যেতে হবে। পরশু দিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ির ছাতে তৈরি হ'য়ে থেকো। মনু আর গণেশকেও খবর পাঠালাম। তুমিও তাদের বলে দিও নিজে গিয়ে। যেতেই হবে সকলকে। আমি কেমন প্লেন চালাতে শিখেছি, দেখিস্। হিমালয় থেকে কুমারিকা আর গুজরাট থেকে আসাম চক্কোর দিয়ে আসা যাবে!"

আনন্দে নেচে উঠল রমেনের মন। এরোপ্লেনে চড়ে' ভারত-ভ্রমণ!

নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা তিনজনে গিয়ে হাবুলের বাড়ির ছাতে বসে রইল। আজকাল এরোপ্লেনে চড়বার জন্যে এরোড্রোমে যাবার দরকার হয় না।

ছাত একটু বড় হলেই তাতে এরোপ্লেন নামাতে পারে। আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল তিনজনে। ওটা কি চিল? চিল কি অত বড় হয়? বোঁ বোঁ ক'রে ছাতের দিকেই তো ছুটে আসছে! গুররর্, গুররর্...শব্দও পাওয়া গেল ক্রমশ। দেখতে দেখতে এসে পড়ল হাবুল। বাঃ, কি চমৎকার প্লেনটি ওর, যেন জীবন্ত একটি রাজহংস! টুক্ ক'রে এসে নাবল ছাতের উপর। নাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজহংস ডানা দুটি তুলে ধরল। হাবুল বসে আছে। আর তিনটি খালি সীট।

"দেরি করিস্ না, চট্ ক'রে আয়!"

উঠে বসল তারা। রাজহংস ডানা মেলে উড়ল আবার। মাঠ বন নদী পাহাড় সমুদ্র মরুভূমি পার হয়ে উড়ে চলল, কখনও ভোরের আলোয়, কখনও চাঁদের আলোয়, কখনও মেঘের ভিতর দিয়ে, কখনও রামধনুর ভিতর দিয়ে, নক্ষত্রালোকে, সূর্যালোকে —কতদিন কতরাত্রি যে চলল তার ঠিক নেই। রমেনের মনে হতে লাগল, যুগযুগান্ত পার হয়ে গেল বুঝি! কোথায় চলেছে হাবুল?

"কোথায় যাচ্ছি ভাই আমরা?"

"নিরুদ্দেশ যাত্রা আমাদের।"

সামনের দিকে চেয়ে ষ্টিয়ারিং ধরে চুপ ক'রে বসে রইল হাবুল। রমেন চেয়ে দেখলে, একটু নীচে পেঁজা-তুলোর বিরাট একটা স্তূপ শূন্যে ঝুলছে যেন!

"এই রে—"

হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল হাবুল।

"কি হল?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

হু-হু ক'রে নীচের দিকে নামতে লাগল রাজহংস।

"ক্র্যাশ্ হ'ল নাকি ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে !"

আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল চারজনেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, কেউ মরল না। রাজহংস কিছুদূর নেবেই খুব আস্তে আস্তে নাবতে লাগল। শেষে মনে হ'ল কে যেন তাকে কোলে ক'রে নাবিয়ে নিলে ! একটু শব্দ পর্যন্ত হ'ল না।

নেবে পড়ল চারজনেই। নেবে আরও অবাক্ হ'য়ে গেল, চারিদিকে মখমল বিছানো ! অবাক্ কাণ্ড ! এ কোথায় এসে হাজির হ'ল তারা ? চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—কেবল মখমল আর মখমল ! ঘাস নেই, সবুজ মখমলের গদি কেবল ! চুমকি-বসানো, জরি-বসানো, কত রকমের !

হাবুল বললে—"একটা 'নাট্' আলগা হ'য়ে পড়ে গেছে মনে হচ্ছে। এখানে কি পাওয়া যাবে ? চল খোঁজ করা যাক।"

হাঁটতে লাগল চারজন।

মন্টু বললে—"মখমলের উপর দিয়েই হাঁটবি ? যা ময়লা জুতো আমাদের—"

গণেশ বললে—"তাছাড়া হাঁটাই যে যাচ্ছে না ভাল ক'রে। মখমলের গদির উপর দিয়ে হাঁটা যায় কখনও ? শক্ত মাটির উপর হাটা অভ্যেস আমাদের।"

হাবুল বললে—"তবু হাঁটতেই হবে। 'নাট্' চাই একটা।"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। না হলে বাবা বকবে ভাই ! আমি বাড়িতে কিছু বলে আসিনি"—রমেন বললে অপ্রস্তুত হাসি হেসে।

হাঁটতে লাগল তারা। হাঁটতে হাঁটতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল শেষে।

মন্টু বললে—"অনেক দিন আগে একবার বালির চড়া ভাঙতে হয়েছিল আমাকে। কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু এত হয়নি—বাপ্ স্ !"

মখমলের গদি মাড়িয়ে হেঁটে চলল তারা। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড চোখে পড়ল তাদের। বড় বড় হীরের অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'টাকার দেশ'। কি উজ্জ্বল অক্ষরগুলো !

"দেখ দেখ ওটা কি"—মন্টু বলে উঠল হঠাৎ। সকলে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে আকাশচুম্বী বিরাট একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত চকচক করছে যে চাওয়াই যায় না তার দিকে ! মনে হচ্ছে বরফ, রুপো আর চাঁদের আলো গলিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা ! তার উপর পড়েছে সূর্যের কিরণ !

হাবুল বৈজ্ঞানিক লোক। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বললে—"প্ল্যাটিনামের তৈরি। চল, ওই দিকেই যাওয়া যাক। একটা গেটও আছে মনে হচ্ছে—"

"ওপাশে আরও একটা গেট আছে।"

"চল—"

আবার হাঁটতে শুরু করলে চারজনে।

সেই মখমলের তেপান্তর পার হ'য়ে প্ল্যাটিনামের প্রাচীরের কাছে পৌঁছতে যুগ-যুগান্ত কেটে গেল রমেনের মনে হ'ল। প্রাচীরের কাছে এসে তারা যখন পৌঁছল অবশেষে, তখন চারজনেই এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে যে আর কারো পা উঠছে না। মনু, গণেশ, রমেন তিনজনে বসেই পড়ল। হাবুলের বসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সে কাজের লোক, ভাবলে একটা গেটের ভিতরে ঢুকে একটু খোঁজ ক'রে আসা যাক আগে! একটা 'নাট্' না পেলে তো ফেরাই যাবে না এখান থেকে।

"তোরা এখানে বোস, বুঝলি। আমি একবার ভিতরে ঢুকে একটু দেখে আসি কি ব্যাপার! 'নাট্' একটা যোগাড় করতেই হবে কোনও রকমে।"

"বেশী দেরি করিস না যেন!

"আমরা আর পারছি না ভাই, একটু জিরিয়ে নিই।"

"বেশ, বোস্ তাহলে, আমি আসছি।"

হাবুল যখন যাচ্ছে তখন এক টুকরো আলো এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। কিন্তু সেটাকে লক্ষ্যই করলে না কেউ। হাবুল ডান দিকের গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

হাবুল ভিতরে ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। এটা এরোপ্লেনের কারখানা না কি? আশ্চর্য কারখানা! প্রকাণ্ড বড় বড় সোনার থালায় এরোপ্লেনের জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে রাস্তার দু'ধারে! অথচ মানুষ একটিও নেই!

একটু এগিয়ে সে দেখলে, যে 'নাট্' সে খুঁজছিল তা স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে একটা সোনার থালায়। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে একটা তুলে নিলে। তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল একটা। হাবুল নিজেই 'নাট্' হ'য়ে সেই নাটের স্তূপে মিশে গেল!

অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন হাবুল ফিরল না তখন মনু চিন্তিত হ'ল খুব। তার খুব পিপাসা পেয়েছিল। রমেন আর গণেশ মখমলের গদির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গণেশের নাক ডাকছিল।

মনু ভাবলে, "ওদের আর ওঠাব না এখন, বেচারারা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। আমি দেখি ভেতরে যদি শরবত-টরবত পাওয়া যায়।"

মনু উঠে যখন যাচ্ছে তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল। কিন্তু সে গ্রাহ্য করলে না তত। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল ডান দিকের গেটটায়, হাবুল একটু আগে যেটা দিয়ে ঢুকেছিল। ভেতরে ঢুকে সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। তার মনে হ'ল এটা শরবতের দোকান নাকি? বড় বড় সোনার থালায় স্ফটিকের গ্লাসে সারি সারি শরবত সাজানো রয়েছে। কি চমৎকার দেখতে, দেখলেই খেতে ইচ্ছা করে! কিন্তু লোকজন কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আর সে স্থির থাকতে পারলে না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল বেচারার; কিন্তু যেই সে একটি গ্লাসে হাত দিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে এক গ্লাস শরবত হয়ে গেল!

গণেশের ঘুম ভাঙল খিদের চোটে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে—হাবুল মনু নেই, রমেন ঘুমুচ্ছে।

"ওরে ওঠ, ওঠ, মনু আবার কোথায় গেল ? হাবুলও এখনও ফেরেনি দেখছি।"

রমেন উঠে বসল।

গণেশ বলল, "বড্ড খিদে পেয়েছে ভাই ! চল্, ওঠা যাক্। মনু কোথা গেল বলতো !"

"হাবুলকে খুঁজতে গেছে হয়তো !"

"চল, আমরাও যাই।"

দু'জনে উঠে পড়ল। একটু গিয়ে রমেন বলল, "আমাদের একজনের কিন্তু থাকা উচিত ! ওরা যদি ফিরে আসে, আমাদের কাউকে না দেখতে পেলে আবার ভাবনায় পড়বে।"

"বেশ, তুই বোস্ তাহলে। আমি একটু ঘুরে আসি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে, দেখি যদি খাবার পাওয়া যায় কোথাও।"

"বেশ।"

গণেশ যখন যাচ্ছিল তখনও তার পায়ের কাছে সেই আলোর টুকরোটা এসে পড়ল, কিন্তু গণেশ সেটা দেখেও দেখলে না ! গণেশ খাবারের স্বপ্ন দেখছে তখন। অন্য কিছু দেখবার তার অবসর কোথায় ? ডানদিকের গেট লক্ষ্য ক'রে হন হন ক'রে এগিয়ে গেল সে।

গেটে ঢুকেই দেখলে কি আশ্চর্য, চারদিকেই যে খাবার ! সোনার থালায় সাজানো নানা রকম খাবার। সন্দেশ রসগোল্লা তো আছেই, আরও কত রকম মিষ্টান্ন ! যেমন রং তেমনি সুগন্ধ। শুধু কি মিষ্টান্ন ? নিমকি কচুরি সিঙ্গাড়া চপ কাটলেট ডেভিল ফ্রাই—প্রচুর পরিমাণে থরে থরে সাজানো রয়েছে।

গণেশের মুখ লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু দোকানদার কই ? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে টাকা রয়েছে, সামনে খাবার, কিন্তু···। যা থাকে কপালে বলে গণেশ রসগোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু যেই রসগোল্লায় হাত দিয়েছে আর অমনি সে নিজেই রসগোল্লা হয়ে গেল !

রমেন অনেকক্ষণ বসে রইল, কেউ আর ফেরে না। অন্ধকার হ'য়ে এল ক্রমশ। তার মনে হ'ল, আর তো এমন ভাবে অপেক্ষা করা উচিত নয়। খিদে পেয়েছে বেশ। উঠে পড়ল সে, ডান দিকের গেটের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সেই আলোর টুকরোটাও আবার এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। অন্ধকার হয়েছিল বলেই হোক কিংবা যে কারণেই হোক, রমেন ভাল ক'রে চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। টর্চ ফেলছে নাকি কেউ ? চেয়ে দেখলে, একটা আলোর রেখা বাঁ-দিকের ভেতর থেকে আসছে।

আবার আলোর টুকরোটার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলে সে। এবার দেখতে

পেলে, কি যেন লেখা রয়েছে আলোর অক্ষরে! ঝুঁকে দেখলে লেখা আছে—"ডান দিকের গেটে খবরদার ঢুকো না। বাঁ-দিকের গেটে এস।"

রমেন ইতস্ততঃ ক'রে বাঁ-দিকের গেটে ঢুকল গিয়ে। গেটের ভিতর ঢুকে দেখে, সামনেই একটি চমৎকার বাড়ি। সেই বাড়ির ছাতে প্রকাণ্ড টর্চ হাতে ক'রে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি দেখেই ভাল লাগল রমেনের! যেমন চোখ মুখ নাক, তেমনি রং, প্রশস্ত ললাটে যেন মহিমা জ্বলজ্বল করছে!

রমেনকে দেখতে পেয়েই ছেলেটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সে রমেনকে হাতছানি দিয়ে ডেকে ছাত থেকে নেমে এল। রমেন কাছে যেতে আবার সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। একটু অবাক্ হ'ল রমেন। ছেলেটি বোবা নাকি?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকে রমেন দেখতে পেল, ছেলেটি একটি বাংলা টাইপরাইটারে বসে খটাখট্ ক'রে কি যেন লিখে চলেছে! রমেন ঢুকতেই মুচকি হেসে ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললে। বিস্মিত রমেন বসল। ছেলেটি টাইপ করতে লাগল দ্রুতবেগে। টাইপ করা হ'য়ে গেলে কাগজখানা বার ক'রে এনে রমেনের সামনে ধরে দিল সে।

রমেন পড়তে লাগল—"আমার নাম সুবুদ্ধি। আমি বোবা নই, কিন্তু এদেশে আমার কথা কইতে মানা। এ কামনা-যক্ষিণীর দেশ! আমাকে এরা বন্দী ক'রে রেখেছে। হয়তো মেরেই ফেলত, কিন্তু আমি অমর, আমাকে নিঃশেষ করা যায় না। আমাকে ধরে এনে এরা নানা রকম যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে শেষে আমি এদের বললাম—'আমাকে যন্ত্রণা দিও না, আমাকে কি করতে হবে বল।' এরা বললে, 'তুমি শুধু চুপ ক'রে থাক, আর কিছু চাই না।' আমি বললাম, "বেশ, আমি চুপ ক'রে থাকতে রাজী আছি যদি তোমরা আমাকে সময় কাটাবার জন্যে বই খাতা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এনে দাও। চুপ ক'রে বসে থাকব কি ক'রে?" তাতেই তারা রাজী হ'ল। এই বাড়িতে আমার ল্যাবরেটরি আছে; লাইব্রেরিও আছে। ল্যাবরেটরিতে আমি অনেক জিনিস তৈরি করেছি। যে টর্চের আলো ফেলে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, সেটাও আমারই তৈরি। এ ভয়ানক দেশ, এখানে যে যা কামনা ক'রে আসে, তাই হ'য়ে যায়, মানুষ থাকে না আর। হাবুল 'নাট' হ'য়ে গেছে, মন্টু হয়েছে শরবত, গণেশ রসগোল্লা। আলো ফেলে ফেলে ওদের সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ আমার ইশারা বুঝলে না। যাক, তুমি যখন আমার ইঙ্গিত বুঝে এখানে এসে পড়েছ তখন তোমার আর ভয় নেই। এমন কি, হয়তো তুমি এদের সকলকে উদ্ধারও করতে পারবে!"

রমেন কাগজ পড়া শেষ ক'রে সুবুদ্ধির দিকে চাইলে। দেখতে পেলে সে একটা পেন্সিল নিয়ে বসে আছে, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে। তার বিস্ময় যদিও সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল তবু সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়নি!

সে বললে, "সবাইকে না পারি, হাবুল, মন্টু আর গণেশকে তো উদ্ধার করতেই হবে। আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

সুবুদ্ধি লিখে উত্তর দিলে—"দুঃসাধ্য সাধন করতে হবে। কিন্তু সকলে এ দুঃসাধ্য সাধন ত করতে পারবে না! যে মিথ্যুক, যে চোর, যে পরশ্রীকাতর, তার দ্বারা ঐ কাজ হবে না।"

"আমি মিথ্যুক নই, চোরও নই, পরশ্রীকাতরও নই! কি করতে হবে আমাকে বলুন না!"

"অন্যমনস্ক হলেও চলবে না।"

"আমি মোটেই অন্যমনস্ক নই।"

"সাহসীও হওয়া চাই!"

"কি করতে হবে বলেই দেখুন না, আমি পারি কি না!"

"সে খুব শক্ত কাজ—"

"বলুনই না।"

"কামনা-যক্ষিণীর মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে। কোনও সত্যবাদী সচ্চরিত্র লোক যদি তার মুখের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই যক্ষিণীর মৃত্যু হবে। আর তার মৃত্যু হ'লে সবাই বেঁচে উঠবে।"

"তার মুখের মধ্যে লাফাব কি ক'রে?"

"তার মুখ মোটেই ছোটখাটো নয়, বিরাট মুখ, বহু যোজন বিস্তৃত, আর সে মুখ থেকে লকলক ক'রে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে!"

"বলুন, কোন দিকে আছে, আমি এখনই লাফিয়ে পড়ছি তার মধ্যে—"

"তার কাছে যাওয়াও খুব সহজ নয়। খুব সরু একটা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, ক্ষুরের ধারের মতো সরু! খুব একাগ্র না হ'লে সে রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে না।"

"ঠিক পারব"।

"বেশ, যাও তাহলে—"

সুবুদ্ধি টর্চের আলোটা আকাশের দিকে ফেললে। রমেন দেখতে পেল খুব সরু তারের মতো একটা পথ চলে গেছে—টেলিগ্রাফের তারের মতো। চুলের চেয়ে পাতলা সরু তার।

"ওখানে উঠব কি ক'রে?"

"সিঁড়ি আছে।"

"আগুনের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে তোমার ভয় হচ্ছে না? মারা যাও যদি—"

"গেলামই বা। সবাই যদি বেঁচে ওঠে, আমি একলা না হয় মারাই গেলাম।"

"বাঃ, তুমি ঠিক পারবে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখ। তোমাকে অন্যমনস্ক ক'রে দেবার জন্যে তোমার দুপাশে সিনেমা, ক্রিকেট ম্যাচ, রেডিওর গান, ভাল

ভাল ম্যাজিক, বড় বড় নেতার গালভরা বক্তৃতা, ফুটবল ম্যাচ—এই সব নানারকম হবে, একটু অন্যমনস্ক হলেই পড়ে যাবে কিন্তু।"

"না, আমি অন্যমনস্ক হব না।"

সুবুদ্ধি টর্চের আলো ধরে রইল, রমেন এগিয়ে গেল নির্ভয়ে। একটু গিয়ে সিঁড়ি দেখতে পেলে।

সরু তারের উপর দিয়ে রমেন চলেছে। রমেন যেন আর রমেন নেই, সে যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে অশরীরী আগ্রহে! তার চারিদিকে যে তুমুল কোলাহল ঘটছে, তা সে শুনতেই পাচ্ছে না, সরু তারটা ছাড়া দেখতেও পাচ্ছে না কিছু! কিছুক্ষণ পরে সে কামনা-যক্ষিণীর মুখের কাছে হাজির হ'ল এসে।

দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট একটা গহ্বর থেকে লকলক ক'রে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। কত রকমের কত রঙের শিখা! লাল নীল সবুজ হলুদ—শত শত ইন্দ্রধনু যেন শিখায় পরিণত হয়েছে! আর তাতে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ উড়ে উড়ে পড়ছে এসে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

রমেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তাকেও পুড়ে মরতে হবে। তা হোক। লাফিয়ে পড়ল সে।

লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল! আগুন নিবে গেল। তারপর অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। সবাই বেঁচে উঠেছে! ওই যে হাবুল, মনু আর গণেশও আসছে তার দিকে ছুটে।

"রমেন, রমেন, ওঠ, এখনও ঘুমুচ্ছিস? বি-টিমের সঙ্গে আজকে যে ম্যাচ আমাদের, মনে নেই? ওঠ্ ওঠ্।"

হাবুলের ডাকেই রমেনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে মনু আর গণেশও দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাধীনতা

"স্বাধীনতা মানে কি?"—পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞাসা করলেন সুবলকে।

সুবল উত্তর দিলে—"নিজের অধীনতা।"

"নিজের অধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি?"

ঈষৎ মাথা চুলকে সুবল বললে—"মানে, নিজে আমি যা খুশি করব তারই অধিকার।"

"তোমার নিজের যদি খুশি হয় চুরি করব, ডাকাতি করব, মাস্টার ঠ্যাঙাব, পড়াশোনা করব না, সকলের অবাধ্য হব—তাহলে এইসব করবার অধিকার তোমাকে দেওয়ার নামই স্বাধীনতা?"

"না স্যার!"

"তাহলে?"

সুবল চুপ ক'রে রইল। পণ্ডিতমশায় একে একে সব ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ সদুত্তর দিতে পারলে না। সুবলই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে সে-ই যখন পারলে না তখন আর কে পারবে?

পণ্ডিতমশায় বললেন—"এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এখন আমাদের ভাল ক'রে বুঝতে হবে কথাটার মানে কি! সুবল, তুমি ঠিকই বলেছ, কথায় কথায় মানে করলে স্বাধীনতা মানে নিজের অধীনতাই বোঝায়। কিন্তু 'নিজের' কথাটার বিশেষ অর্থ আছে একটা। নিজের বলতে কি বোঝায়? তোমাকে যদি দুটো আম দেওয়া হয়, একটা পচা আর একটা ভালো, আর যদি বলা হয় ওর মধ্যে একটা তুমি নিজের ক'রে নাও, তাহলে কোন্‌টা তুমি নেবে? ভালোটাই নেবে নিশ্চয়! পশুরাও চায় যেটা ভালো সেটা নিজের হোক। মানুষ পশুর চেয়ে অনেক বড়, তাই সে শুধু নিজের ভালো চায় না, নিজেদের ভালো চায়। সকলের ভালো হোক এইটাই সভ্য মানুষের কাম্য এবং সকলের ভালো করবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে। যারা পরাধীন জাতি, তারা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা সাহস ক'রে একটা ভালো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না, যদি সেটা শাসক জাতির স্বার্থ-বিরোধী হয়। তাই স্বাধীনতা যাদের থাকে না, ভালো হবার অধিকারই তাদের থাকে না; কারণ সকলের ভালো হোক—কোনও বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের এ অভিপ্রায় কখনও হতে পারে না। দেশের ভালো হোক, দশের ভালো হোক, সকলের ভালো হোক, এই-ই হলো স্বাধীনতার লক্ষ্য। যখন তোমরা আর একটু বড় হবে তখন বুঝতে পারবে আমাদের সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন, 'স্ব' মানে ভগবান, তাই স্বাধীনতা মানে ভগবানের অধীনতা, যা মঙ্গলময় তারই অধীনতা।"

পণ্ডিতমশায়ের কথা মন দিয়ে সবাই শুনল, কিন্তু তাঁর কথার সমস্তটা বুঝতে পারল না সবাই।

স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল। সুবল পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বাড়ি যাচ্ছিল। পণ্ডিতমশায় যা বললেন, তা যেন বড্ড বেশী ঘোরালো গোছের। ভগবান-টগবান এনে এমন একটা ব্যাপার করলেন যে ঠিক বোঝা গেল না সবটা। সে স্বাধীনতার একটা সোজা মানে খুঁজছিল মনে মনে।

একটু পরেই হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল তার কাছে! যা খুঁজছিল পেয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সুবলের মা বেড়াতে যাচ্ছিলেন একজনের বাড়িতে। দূরসম্পর্কের আত্মীয় হ'ন তাঁরা, তাঁদের বাড়িতে কার যেন অসুখ করেছে! বেরোবার আগে মা সুবলকে বললেন—"ওরে ভাঁড়ার ঘরের তাকে দুটো আম আছে। যদি খিদে পায় তো তুই একটা নিস্ আর মনুকে একটা দিস্।"

মন্টুও তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়—মা-মরা ছেলে—তাদের আশ্রিত।

মা চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খিদে পেয়ে গেল সুবলের। পড়ছিল, তড়াক ক'রে উঠে ভাঁড়ার ঘরে চলে গেল সে। গিয়ে দেখলে দুটো আম রয়েছে বটে, কিন্তু একটা ভালো, আর একটা একটু পচা। পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি এই আমেরই উদাহরণ দিয়েছিলেন। যা ভালো সেটাকেই নিজের ক'রে নেওয়া উচিত এবং সেইটে নেবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। পচা আমটা মন্টুকে দিতে কিছুতেই মন সরছিল না তার। ওকে দিলে ও নেবে; কারণ, ও আশ্রিত। কিন্তু সেটা দেওয়া কি উচিত?

পচা আমটাই নিলে সে, ভালোটা মন্টুকে দিলে।

একটা অদ্ভুত আনন্দে সমস্ত মনটা ভরে উঠল সুবলের। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি সুবলদের বাড়ির কাছে। এক ছুটে সে চলে গেল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

পণ্ডিতমশায় শোওয়ার আয়োজন করছিলেন।

"পণ্ডিতমশায়, স্বাধীনতার আর একটা মানে আমি খুঁজে পেয়েছি। যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে!" সুবলের মুখ উদ্ভাসিত।

পণ্ডিতমশায় হেসে বললেন—"ঠিক বলেছ।"

খোকনের স্বপ্ন

রাত্রে খোকন ছাতে শুয়েছিল। অগণ্য নক্ষত্র উঠেছে আকাশে। অসংখ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে। কি অদ্ভুত সমারোহ! লক্ষ কোটি মণিমাণিক্য কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে কালো মখমলের উপর। অবাক্ হ'য়ে দেখছিল খোকন। পাশে শুয়েছিলেন তার কাকা। এম্. এস্. সি. পাস করেছেন সম্প্রতি। নামকরা ভাল ছেলে। খোকন কাকাকে জিজ্ঞেস করলে—"কাকা, ওই নক্ষত্রগুলো কি?"

"ওরা প্রত্যেকটা এক একটা সূর্য।"

"তাই নাকি! প্রত্যেকটা?"

"চাঁদ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো—এই কটা গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতো। বাকী সব সূর্য। অধিকাংশই আমাদের সূর্যের চেয়ে বড়।"

"ওই সাদা মতন চলে গেছে ওটা কি?"

"ছায়াপথ। ওতেও অনেক নক্ষত্র আছে, তাছাড়া আছে নেবুলা, যার বাংলা নাম নীহারিকা—।"

কাকা বলতে লাগলেন, খোকন শুনতে লাগল অবাক্‌ হয়ে। "আমাদের সূর্য নাকি পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। সূর্যের চেয়েও বড় বড় ওই নক্ষত্রগুলো, অত দূরে আছে বলে ছোট দেখাচ্ছে। বহু দূরে আছে। এত দূরে যে মাইল দিয়ে তা বলা যায় না। কার আলো কতক্ষণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাই দিয়ে ওদের দূরত্ব বলা হয়। আমাদের সূর্যের আলো আসে কয়েক মিনিটে। কোনও নক্ষত্রের আলো দু'বছরে, কারও বা চল্লিশ বছরে, কারও বা তার চেয়ে বেশি! বিরাট বিরাট জলন্ত অগ্নিপিণ্ড সব মহাশূন্যে ছড়ানো রয়েছে অজস্র। দাউ দাউ ক'রে জলছে কতদিন থেকে তা ঠিক কেউ জানে না! প্রত্যেকটাই জলন্ত শিখা লক্‌ লক্‌ করছে।"

খোকনের ভয় করতে লাগল। সে ছাত থেকে নেবে গেল ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমাও শুয়েছিলেন আকাশের দিকে চেয়ে; তাঁর বিছানার পাশে যে খোল জানালাটা ছিল তাই দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশের খানিকটা।

"ওই নক্ষত্রগুলো কি জান ঠাকুমা? কাকা বললে—" কাকা যা যা বলেছিল সবিস্তার বর্ণনা ক'রে গেল সে। সমস্ত শুনে ঠাকুমা মন্তব্য করলেন—"কাকা তো সব জানে!"

"কি তাহলে ওগুলো—"

ঠাকুমা যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

ওই ছায়াপথ দিয়ে আসবে নাকি রাজপুত্র। তাই আলো জ্বালিয়ে রেখেছে দেবতারা।

গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল খোকন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যা স্বপ্ন দেখলে তা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।

·····চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রের মশাল জ্বলছে। অসংখ্য জলন্ত শিখার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। দূরে দূরে কালো মেঘের স্তূপ, তাতে আগুন লেগেছে যেন। বজ্রের বাজনা বাজছে। মেঘের পিছনে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ শাঁখ বাজছে। ······ছায়াপথ দিয়ে রাজপুত্র আসছে··· ওই যে···মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার। নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে রাজপুত্র, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই···ওই আসছে···। কাছে এল যখন, তখন খোকন অবাক্‌ হয়ে গেল। রাজপুত্র অপর কেউ নয়, সে নিজেই। তারই মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার, সে বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে।

যুগল যাত্রী

নিতাই মণ্ডল তেমন চটপটে লোক নন। কোথাও যেতে হ'লে তিনি তাই বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েন। গ্রাম থেকে স্টেশনটি প্রায় মাইল তিনেক দূরে। গরুর গাড়ি ক'রে যেতে হয়। শহরে যাবার ট্রেনও মাত্র একটি—সকাল আটটায় ছেড়ে যায়। এই সব কারণে শহরে তাঁর যাওয়াই হয় না বড় একটা। সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোনো অসম্ভব তাঁর পক্ষে। ছ'টার আগে ঘুমই ভাঙতে চায় না। উঠে পায়খানা সেরে হাত-মুখ ধুতেই প্রায় একঘণ্টা বেরিয়ে যায়। একটি বড় নিমের দাঁতনকে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন না করলে তাঁর তৃপ্তি হয় না। এরপর স্নান! তেল মাখতেই তো আধঘণ্টা লেগে যায়! তারপর পুজো আছে। ঝাড়া একটি ঘণ্টা লাগে। পুজো সেরে জলখাবার নিয়ে বসেন। শুকনো চিঁড়ে আর নারকোল তাঁর প্রিয় খাদ্য। ভাল ক'রে চিবিয়ে এক বাটি চিঁড়ে খেতে খানিকটা সময় লাগে বই কি! এর পর কাপড়-জামা পরা আছে। কাপড়ের কাছা-কোঁচা ঠিক হতে চায় না সহজে। জামার বোতাম লাগাতেও সময় লাগে। দর্জি গর্তগুলো এমন ছোট ছোট করেছে যে বোতামগুলো ঢুকতেই চায় না! তারপর জুতো পরা, ফিতে বাঁধা, তারপর চুল আঁচড়ানো—মানে ভদ্রভাবে কোথাও বেরুতে গেলে এ সব অপরিহার্য। নিতাই চট্‌ ক'রে গুছিয়ে নিতে পারেন না সব, দেরি হয়ে যায়। তিনি বলেন, মানুষ তো আর পাখি নয় যে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে যাবে! এই সব হাঙ্গামার জন্যে বেরুতে চান না তিনি কোথাও। ট্রেন ফেল ক'রে যে ওএটিং রুমে বসে থাকবেন, সে ধাতেরও লোক তিনি নন। কোথায় বসে থাকবেন ওই তেপান্তর মাঠের মাঝখানে!

এবারে কিন্তু যেতেই হবে। একটা জরুরী মোকদ্দমা লেগেছে, না গিয়ে উপায় নেই। আগেই যাওয়া উচিত ছিল। তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছিলেন কিন্তু আর এড়ানো যাবে না, যেতেই হবে। তাঁর উকীল বিশ্বম্ভর চৌধুরী জরুরী তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখেছেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন নিতাই। পুজো সারতেই তো সাতটা বেজে যাবে। তারপর ওই গরুর গাড়ি।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি শেষে ঠিক করলেন যে কিছুদিন আগে থেকেই শুরু করতে হবে। পনরোই মোকদ্দমার দিন। আট তারিখ থেকেই ট্রেন ধরবার চেষ্টা করতে থাকবেন, যেদিন পেয়ে যান। তাছাড়া আর একটা মুশকিল, ঘড়ি নেই! সূর্য দেখে আন্দাজে সময় ঠিক করতে হবে।

প্রথম দিন তো বাড়ি থেকে বেরুতেই সূর্যঠাকুর শিমুলগাছের মাথায় উঠে পড়লেন অর্থাৎ আটটা বেজে গেল। দ্বিতীয় দিন আর একটু সকাল সকাল বেরিয়ে গেলেন; কিন্তু গ্রাম ছাড়াতে না ছাড়াতেই হরু ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি ওই আটটার ট্রেনে

এসেছেন। সুতরাং সেদিনও ট্রেন পাওয়ার আশা নেই। ফিরতেই হলো! নিতাই মণ্ডল গাড়ির বলদ দুটোর পানে এমনভাবে চাইলেন যেন যত দোষ তাদেরই। তৃতীয় দিন আর একটু ভোরে উঠলেন। এমনিভাবে চলতে লাগল।

ত্রৈলোক্য তরফদার বেশ চটপটে লোক। তাঁর কাজ হাতে-পায়ে লাগে না! কোনও কাজ ফেলে রাখা তাঁর স্বভাব নয়। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে চান তিনি। মনে কর, বাড়িতে লোক খাওয়াতে হবে, সন্ধ্যা আটটার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আসবার কথা; ত্রৈলোক্য তরফদার তাড়াহুড়ো ক'রে ছ'টার মধ্যেই রান্নাবান্না প্রস্তুত করিয়ে ফেলবেন। তাঁর চরিত্রে 'হচ্ছে-হবে' বা 'গয়ংগচ্ছ' ভাব মোটেই নেই। তেমন লোক তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। যা করতে হবে তা আগে থাকতেই চটপট সেরে নাও, কাজ সেরে সময় থাকলে দু'দণ্ড না হয় গল্প কর—এই তাঁর আদর্শ।

তাঁকেও ওই দিন ওই আটটার ট্রেন ধরতে হবে। যদিও নিতাই মণ্ডলের গ্রামে তাঁর বাড়ি নয়, কিন্তু তাঁর গ্রামও স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।

তিনি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুলেন। বাইক আছে, সুতরাং ভয় নেই। নিতাই মণ্ডলের মতো নিড়বিড়ে লোক নন তিনি। তাছাড়া পুজো-ফুজোর অত হাঙ্গামাও নেই তাঁর! তিনি উঠবেন আর স্যুট ক'রে বাইক চড়ে বেরিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিতাই মণ্ডলের গরুর গাড়ি যখন স্টেশনের গুমটির কাছে এসেছে, তখন ট্রেনটি হুস হুস ক'রে ছেড়ে গেল। নিতাই অসহায় ভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। মুখে তুবড়ি ছুটতে লাগল। গাড়োয়ানটাকে গাল দিতে লাগলেন! গাড়োয়ান বেচারী কি আর বলবে! সে তো যথাসাধ্য জোরেই হাঁকিয়ে এনেছে। কিন্তু মনিবের সঙ্গে তো তর্ক করা যায় না—ঘাড় নীচু ক'রে বসে রইল সে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি চীৎকার করার পর মণ্ডলমশায় অনুভব করলেন ভয়ঙ্কর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। আজ না খেয়েই বেরিয়েছিলেন তিনি। চিঁড়ে আর নারকোল পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছিলেন।

গাড়োয়ানকে বললেন—জিনিসপত্তর নিয়ে ওএটিং রুমে চ। আগে খেয়ে নি, তারপর যা হয় করা যাবে। তোদের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি আমার।

জিনিসপত্র নিয়ে ওএটিং রুমের দিকে রওনা হলেন তিনি।

নিতাই মণ্ডলের পদশব্দে ত্রৈলোক্য তরফদারের ঘুম ভাঙল। ওএটিং রুমের বেঞ্চির উপর ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন তিনি।

তিনি স্টেশনে এসে পৌঁছেছিলেন ভোর পাঁচটায়। পৌঁছে ওএটিং রুমের বেঞ্চিতে শুনে ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন, হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়াল নেই।

বেচুলাল

অতিশয় জীর্ণশীর্ণ লোক। সারাজীবন ধরে অজীর্ণ রোগে ভুগছে। অথচ সাবধানতারও অন্ত নেই। যে যা বলে তাই করে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হেকিমি, টোটকা—সব রকম ক'রে দেখেছে। গলায় হাতে গোছা গোছা মাতুলি কবচ। দৈবও করেছে নানারকম। একজন বললে—ভূতেশ্বর শিবমন্দিরে অমাবস্যার রাত্রে বেলতলায় একপায়ে দাঁড়িয়ে বাবার কাছে প্রার্থনা জানালে অব্যর্থ ওষুধ পাওয়া যায়। তাই করলে। প্রার্থনার পর গাছ থেকে একটি শুকনো বেলপাতা পড়ল। বাড়ি ফিরে সেইটেই গঙ্গাজলে বেটে ভক্তিভরে খেলে। কিছু হ'ল না। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরনা দিয়েছিল একবার। একটানা তিনদিন তিনরাত্রি নিরম্বু উপবাস ক'রে পড়ে রইল বাবার মন্দিরে। স্বপ্ন দেখলে - একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন তাকে বলছে—ওষুধ টষুধে কিছু হবে না। সকাল সন্ধ্যে পেটে হাত বুলো, তা হ'লেই সেরে যাবে। হাত বুলিয়ে দেখলে কিছুদিন। কিছু হ'ল না। পেট তেমনি দমসম, বিকেলবেলা ঠিক সেই চোঁয়া ঢেঁকুর, বুক সমানে জ্বালা ক'রে চলেইছে। নানাজনে নানা পরামর্শ দেয়। পরামর্শদাতার অভাব নেই। একজনের পরামর্শে তেল খাওয়া বন্ধ করলে, আর একজনের পরামর্শে ঘি খাওয়া, তৃতীয় একজন বললে—মশলাই সব রোগের মূল, ওটাও ছাড়। তিনজনের কথাই শুনলে বেচারা। বিনা তেলে, বিনা ঘিয়ে, বিনা মশলায় অখাদ্য খাওয়া গলধঃকরণ করতে লাগল। অসুখ একটু কমল, কিন্তু অরুচি এসে গেল। খাবার কথা মনে হলেই গা বমি বমি করত। বমি শুনে একজন ডাক্তার বললেন—পেটে বোধ হয় ক্রিমি আছে, মলটা পরীক্ষা করাও। বেচুলাল শহরে গিয়ে মল পরীক্ষা করিয়ে এল। ক্রিমির কিছু পাওয়া গেল না। ডাক্তারবাবু তবু বললেন, অনেক সময় পাওয়া যায় না। না পাওয়া যাক, ক্রিমির ওষুধ খাও তুমি। ক্রিমির ওষুধ খেয়ে আধমরা হ'ল বেচারা। ক্রিমি বেরুলো না। পিসিমা বললেন, "তুই পাঁচজনের কথা শুনে মরবি দেখছি। বাঙালীর ছেলে ভাত ডাল মাছ তরকারি দিয়ে সপাসপ ক'রে কাঁসি ভরতি ভাত খা দিকি দুবেলা পেট ভরে, সব সেরে যাবে।" পিসিমার কথায় বাঙালীর স্বাভাবিক আহার শুরু করতেই আবার সেই পেট দমসম, চোঁয়া ঢেঁকুর! মহা মুশকিল।

অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে পড়ল বেচুলাল। ভাবছিল কি করি, এমন সময় বাল্যবন্ধু শ্রীনাথ সিং একদিন একটি কথা বললে। কথাটি বেচুলালের মনে লাগল। শ্রীনাথ সিং লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত, অনেকরকম জানাশোনা আছে লোকটার।

শ্রীনাথ বললে, "দেখ বেচুলাল, অভিধানে দেখলাম জলের একটি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'জীবন'। জলই জীবন, জীবনই জল। আমার বিশ্বাস তুমি যদি বিশুদ্ধ জল পান করতে পার, তোমার অসুখ সারবে। বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট না ক'রে তুমি বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ

ক'রে পান করবার চেষ্টা কর দিকি। পানাপুকুরের জল বা এঁদো পাতকোর জল কোনটাই বিশুদ্ধ নয়। এমন কি নদীর জলও নয়। নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য থাকে ওসবে।"

"শহর থেকে কলের জল আনাতে বলছ? বাবুদের বাড়ির টিউব ওয়েলের জলও খেয়ে দেখতে পারি যদি বল।"

"আমার বিশ্বাস ওসবও 'বিশুদ্ধ' নয়। বোতলে ক'রে একরকম জল আসে—তাই বিশুদ্ধ জল শুনেছি। তাই খেয়ে দেখ দিকি। আমাদের ছিদাম ডাক্তারের কাছে পেতে পার।"

বেচুলাল গরীব নয়। ছিদাম ডাক্তারের কাছে থেকে একেবারে ত্রিশ বোতল 'ডিসটিল্‌ড্‌ ওআটার' কিনে ফেললে সে। তিনদিন অন্য কোন প্রকার জল স্পর্শ পর্যন্ত করলে না। শৌচাদি কর্মও সারলে বিশুদ্ধ জল দিয়ে, রোগের কিন্তু উপশম নেই। ঘড়ি ধরে চারটের সময় 'ঘেউ' করে চোঁয়া ঢেঁকুরটি ঠিক উঠতে লাগল। শ্রীনাথ সিং বললে,—"পেটে অনেক গরদা জমেছে, তিনদিনে কি হবে, মাসখানেক অন্তত ব্যবহার ক'রে দেখ..."

ছিদাম ডাক্তারের কাছে বিশুদ্ধ জল আর ছিল না। শহরে লোক পাঠাবে কি না ভাবছিল এমন সময় শ্রীনাথ সিংয়ের চেয়ে বেশী বিদ্বান এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে প্ল্যান বদলে ফেলতে হল বেচুকে

ব্যক্তিটি গ্রামে আগন্তুক। রমেশ চৌধুরীদের পরিচিত। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। এম্‌. এস্‌. সি. পড়ে। পালবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে আলাপ হয়ে গেল বেচুর সঙ্গে। বিশুদ্ধ জলের প্রসঙ্গ তুলতে সে বললে—"সাধারণ ডাক্তারখানায় যে-সব ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওআটার থাকে তাকেও ঠিক বিশুদ্ধ জল বলা যায় না। যে-সব সস্তা শিশিতে রাখা থাকে তার কাঁচ ঠিক 'অ্যালক্যালি ফ্রি' নয়। কিছুদিন পরে জলেও অ্যালক্যালি এসে ঢোকে—"

এই আগন্তুকটির কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে অ্যালক্যালি বস্তুটা কি তা জিজ্ঞাসা করতে বেচুর লজ্জা হ'ল! একটু মুচকি হেসে সে এমন ভাবে মাথা নাড়ল যেন অ্যালক্যালি সম্বন্ধে সে সব কথা জানে। মনে মনে কিন্তু সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। সর্বনাশ, না জেনে কি বিষই না জানি সে খেয়েছে। ত্রিশ বোতল! অ্যালক্যালি যে সাধারণ সোডা জাতীয় জিনিস তা জানলে এত ভয় হ'ত না তার। সোডা তো সে কত খেয়েছে!

গোপনে গোপনে সে সন্ধান করতে লাগল বিশুদ্ধ জল কোথায় পাওয়া যায়। একটা দৃঢ় ধারণা ক্রমশ তার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল যে, বিশুদ্ধ জল খেলেই সে ভাল হয়ে যাবে। দুচার ফোঁটা বিশুদ্ধ জলও যদি তার পেটে যায় তাহলেও তার অসুখ কমে যাবে অনেকটা। বিশুদ্ধ জল যোগাড় করতেই হবে যেমন ক'রে হোক।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। শ্রীনাথের

সহায়তায় বহু অনুসন্ধান ক'রে অবশেষে বেচুলাল খবর পেলে যে রাসায়নিকগবেষণাগার ছাড়া বিশুদ্ধ জল অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

…অনেক খরচপত্র ক'রে কোলকাতায় এসে হাজির হ'ল সে। উঠল মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ি শ্যামবাজারে। মাসতুতো বোনের ভাসুর-পো নীলু বেশ চালাক চতুর ছোকরা। তাকেই ধরে পড়ল বেচুলাল। রাসায়নিক গবেষণাগারে নিয়ে যেতে হবে। নীলুও প্রথমটা 'রাসায়নিক গবেষণাগার' কথাটার তাৎপর্য বোঝেনি—(বেচুলাল কথাটা শিখেছিল শ্রীনাথ সিংয়ের কাছ থেকে)—কিন্তু সে চালাক চতুর ছোকরা। দু'চার কথার পরই সে বুঝতে পারল যে কেমিষ্ট্রির ডিমনস্ট্রেটার শিবনাথবাবুর কাছে নিয়ে গেলেই সমস্যাটার সহজ সমাধান হয়ে যাবে।

…শিবনাথবাবু রসায়নে পণ্ডিত লোক। বেচুলালের কাতর নিবেদন শুনে বললেন—"বিশুদ্ধ জল ক'রে দিতে পারি বটে, কিন্তু বেশী তো হবে না। দু'চার ফোঁটা হতে পারে।"

বেচুলাল ঢোঁক গিলে বললেন—"যে আজ্ঞে।"

"ওতেই কাজ হবে আপনার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপাতত্…"

কথা আর সে শেষ করতে পারলে না। তার মনে হ'ল যা পাওয়া যাচ্ছে তাই বা ছাড়ি কেন।

"বেশ, তা যদি হয় তো দেব ক'রে।"

ভয়ে ভয়ে বেচুলাল আর একটি প্রশ্ন করলেন।

"দাম কি এখনই দিয়ে দেব ?"

"দাম ? দাম লাগবে না।"

দাম লাগবে না ! বেচুলালের সন্দেহ হল। ঠিক 'বিশুদ্ধ জল' দেবে তো !

"আজ্ঞে, জলটা ঠিক বিশুদ্ধ হবে তো ?"

"আপনি দুপুরে আমার ল্যাবরেটরিতে আসবেন, আপনার সামনেই ক'রে দেব…"

সেই দিনই দুপুরে নীলু আপিস যাবার মুখে বেচুলালকে শিবনাথবাবুর ল্যাবরেটরিতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বেচুলাল ল্যাবরেটরি দেখেনি। চমৎকৃত হয়ে গেল। কি কাণ্ডকারখানা ! কত রকমের কাঁচের বাসন, সরু মোটা ঘোরানো কত রকমের নল, কি অদ্ভুত রকম উনুন, একটা নলের মুখে আগুন জলছে নীলচে ধরনের, দেখাই যায় না ভাল ক'রে—একটা কাঁচের ভাঁড়ে টগবগ ক'রে ফুটছে লাল মতো কি একটা। সোঁ সোঁ ক'রে শব্দ হচ্ছে পাশের ঘর থেকে। রোগা মানুষ সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠেছে, বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল তার।

শিবনাথবাবু প্রবেশ করলেন।

"দেখুন এইটেতে পিওর হাইড্রোজেন আছে, আর এইটেতে পিওর অক্সিজেন আছে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে জল হয় জানেন তো ?"

দুটো পাত্র দেখালেন শিবনাথবাবু। বেচুলাল কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার মনে হ'ল দুটো পাত্রই খালি।

"এইবার এই দুটোকে মেশাতে হবে। দাঁড়ান পাশের ঘর থেকে মিশিয়ে আনি···"

বেচুলালের আবার সন্দেহ হ'ল ভদ্রলোক ঠকাচ্ছে না তো। কি মেশাবে! কিছুই তো নেই।

শিবনাথবাবু একটা বেঁটে গোছের শিশি নিয়ে পুনঃপ্রবেশ করলেন। "হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশিয়েছি এটাতে। এইবার আগুন দিলেই জল হবে···"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বেচুলাল শুনছিল। আগুন দিলেই জল হবে!

দড়াম্ ক'রে প্রচণ্ড শব্দ হ'ল একটা।

"এই দেখুন শিশির গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। এই হ'ল বিশুদ্ধ জল। উঠে এসে দেখুন···"

বেচুলালের কিন্তু উঠে আসবার মতো অবস্থা ছিল না। প্রচণ্ড শব্দের চোটে তার 'হার্টফেল' করেছিল।

বাবুলের কাণ্ড

বয়স না হয় কিছু কমই হ'ল, কিন্তু তাই বলে কি ছোটরা মানুষ নয়? তারা কি একলাটি কিছুই পারে না? তারই জবাব দিয়েছে বাবুল। যেমন করেই হোক একটা জবাব তো।

বাবুলের বয়স চৌদ্দ বছর হ'য়ে গেল, এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু তার মা তবু তাকে একলা যেতে দেবেন না কোথাও। স্কুল থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসা চাই; একটু দেরি হলেই কুরুক্ষেত্রকাণ্ড করবেন তিনি; বাড়ির সামনের মাঠটাতেই খেলতে হবে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে।

অনেক জোর-জবরদস্তি ক'রে স্কুলের ক্রিকেট-খেলাতে যাবার সে অনুমতি পেয়েছিল, তা-ও পাড়ার হারু মাস্টার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে যে তিনি নিজে মাঠে থাকবেন এবং বাবুলকে নিজে সঙ্গে ক'রে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবেন রোজ সন্ধ্যাবেলা।

সেবার গঙ্গার ঘাটে অর্ধোদয় যোগের অতবড় মেলা হয়ে গেল, পাড়ার সবাই দেখতে গেল, যাওয়া হ'ল না কেবল বাবুলের—বিশ্বাসযোগ্য কোনও সঙ্গী পাওয়া গেল না বলে। বাবুলের বাবা সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত প্র্যাকটিস ক'রে বেড়ান,

বাবুলকে সঙ্গে ক'রে মেলায় যাবার অবসর নেই তাঁর! মা নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরও সময় হ'ল না। এর কোনও মানে হয়?

স্কুল থেকে স্কাউটের দল কতবার কত জায়গায় ঘুরে এল—খড়্গপুর লেক, মন্দারের পাহাড়, গৈবীনাথ, বটেশ্বরনাথ। মা কোথাও যেতে দিলেন না বাবুলকে। তাঁর কেবলি ভয়—যা অন্যমনস্ক ছেলে, কোথায় হারিয়ে যাবে হয়তো, কোথায় পড়ে যাবে ·! সবাই সিনেমা দেখে—সে দেখতে পায় না।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবুল জেদ ধরে বসল এবারে সে বেরুবেই এবং একলা।

মাকে বললে—"মা, আমি মামার বাড়ি ঘুরে আসি।"

"কার সঙ্গে যাবি?"

"একাই যাব।"

"তিন তিনটে স্টেশন একা যাবি কি? সে কি হয় বাবা?"

"না আমি নিশ্চয়ই যাব, তুমি বাধা দিও না।"

"মিঠ্ঠু সঙ্গে যাক না হয়।"

"না, কেউ সঙ্গে যেতে পাবে না। আমি কি একা যেতে পারি না তুমি ভাব?"

"গাড়িতে উঠতে গিয়ে পা-টা ফস্‌কে যদি যায়! যা ভিড় আজকাল বাবা!"

"না, আমি যাব ঠিক।"

"কি দরকার বাবা বিপদের মুখে যাবার?"

"না, আমি যাবই।"

সোরগোল তুলে মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসল বাবুল। মা কিছুতে রাজী হন না তবু। শেষকালে অনশন শুরু করলে সে।

বাবা সকালে উঠেই প্র্যাকটিসে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মা ডেকে বললেন, "তুমি বাবলুকে কিছু বলছ না, দেখ ও কি কাণ্ড শুরু করেছে!'

বাবা বললেন, "যেতে চাইছে, যাক না কি করবে বাড়িতে বসে বসে?—"

"তিন-তিনটে স্টেশন, একা যেতে পারে কখনও ছেলেমানুষ?"

"কতদিন আগলে আগলে থাকবে তুমি ওকে? যাক ঘুরে আসুক।"

"চল না, আমরা সুদ্ধু যাই?"

"আমার সময় কই? তুমিই বা যাবে কি ক'রে, বিনুর পরীক্ষা সামনে। ও যাক। এই নে—"

বাবা হঠাৎ একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে দিয়ে দিলেন বাবুলকে। বাবুল হাতে স্বর্গ পেল যেন!

"ও একলা যাবে?" বিস্মিত মা প্রশ্ন করলেন।

"যাক না। দিনের ট্রেনে যাবে। ঘণ্টাখানেকের তো ব্যাপার!"

বাবুলের বাবা বেরিয়ে গেলেন।

"আমাকে খেতে দাও শিগ্‌গির"—বাবুলের আর তর সইছে না।

"ট্রেনের দেরি কত ?"

"আর ঘণ্টাখানেক আছে মোটে।"

"একা যাবি ? আমার ভয় করছে বাপু!"

"খেতে দেবে তো দাও, তা না হলে চললাম আমি।"

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন বাবুলের মা।

"কাপড়-জামা নিবি কিসে ?"

"পুঁটলি ক'রে বেঁধে দাও না!"

"আর টাকাটা।"

"বুক-পকেটে থাকবে।"

"একটা ছোট মনিব্যাগ নিয়ে যা না হয়। খুচরো পয়সা পকেট থেকে পড়ে যাবে হয় তো—"

বাবুল আর মাকে বেশী কথা বলবার সময় দিলে না। কোন রকমে নাকে-মুখে গুঁজে দৌড় দিলে সে স্টেশনের দিকে। বগলে পুঁটুলি, পকেটে মনিব্যাগ!

"ওরে শোন্ শোন্" মা পিছু ডাকলেন আবার।

"গিয়ে পৌছন-সংবাদ দিস্। এই পোস্টকার্ড নিয়ে যা। আর শোন্!"

"কি আবার ?"

"পুজোর ফুল বেলপাতা নিয়ে যা পকেটে ক'রে!"

ফিরে এল বাবুল। পূজোর ফুল-বেলপাতা মাথায় ঠেকিয়ে তার পকেটে সেগুলো দিয়ে দিলেন মা।

"খুব সাবধানে যেও। গোঁয়ার্তুমি ক'রে যাচ্ছ—"

"ঠিক পৌছে যাব, কিছু ভেব না তুমি।"

বাবুল কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এল। ফিরে এসে মাকে প্রণাম করল একটা ঢিপ ক'রে! তারপর দে ছুট!

স্টেশনে ভয়ানক ভিড়। থার্ড ক্লাস বুকিং-আপিসের সামনে তো একটা দাঙ্গা হচ্ছে যেন। থার্ডক্লাস টিকিট করেই যাবে সে। অনর্থক বেশী পয়সা খরচ করতে যাবে কেন ? দেখাই যাক চেষ্টা করে।

পুঁটুলিটা প্ল্যাটফর্মে একধারে রেখে ঢুকে পড়ল সে ভিড়ের মধ্যে।

জমাট ভিড়। তবু ঠেলে-ঠুলে এগুতে লাগল সে একটু একটু ক'রে। কারও বগলের তলা দিয়ে, কারও পাশ কাটিয়ে, কারও পা মাড়িয়ে হাজির হ'ল সে অবশেষে টিকিট-বিক্রির ঘুলঘুলির কাছে।

"বরিয়াপুরের টিকিট দিন তো একখানা।"

টিকিটের দাম বার করতে গিয়েই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল! পকেটে মনিব্যাগ নেই।

সরে এল ঘুলঘুলির কাছ থেকে। যতটা সম্ভব এদিক্ ওদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখলে. কোথাও নেই ব্যাগটা। প্লাটফর্মে বেরিয়ে দেখে পুঁটুলিটাও নেই।

বাবুলের পৌছন-সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত হ'য়ে বসে আছেন বাবুলের মা। ছেলে চারদিন গেছে, এখনও পর্যন্ত কোনও পৌছন-সংবাদ এল না। সঙ্গে পোস্টকার্ড দিয়ে দিয়েছেন!

"আজকাল ডাকের গোলমাল হচ্ছে"—বাবুলের বাবা বললেন।

"কাল এমন বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি একটা!"

"তুমি চলেই যাওয়া না হয় মিঠ্ঠুকে নিয়ে। পরের ট্রেনে ফিরে এস কাল। বিনুর পরীক্ষার তো দেরি আছে এখনও হপ্তাখানেক। টেলিগ্রাম করতে যা খরচ, তোমাদের যেতে আসতেও তাই! টেলিগ্রামও ঠিক যাচ্ছে না আজকাল।"

মিঠ্ঠুকে নিয়ে চলেই গেলেন শেষে তিনি বাপের বাড়ি। সেখানে গিয়ে কিন্তু অকূল পাথারে পড়লেন! বাবুল আসেনি! বাবুলের মামা-মামী শুনে বললেন—"সে কি!"

হৈ চৈ পড়ে গেল। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ, থানায় খবর, হাসপাতালে খবর,—বাবুলের বাবাও চলে এলেন প্র্যাকটিস স্থগিত রেখে। চারিদিক তোলপাড় হ'তে লাগল, কিন্তু বাবুলের কোনও খবর পাওয়া গেল না।

শেষে সপ্তম দিনে—যখন বাবুলের মামা বাবুলের একটা ফটো-সুদ্ধ বিজ্ঞাপন পাঠাতে যাচ্ছেন কাগজে, তখন বাড়ির ছোট ছেলে খোকন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিলে—"বাবুল-দা এসেছে!"

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন সবাই।

এসে দেখলেন বাবুলচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন উঠোনে—একপা ধুলো,—একমুখ হাসি!

"কি রে, কোথায় ছিলি তুই?"

"হেঁটে এলাম।"

"কেন?"

"স্টেশনেই টাকা পুঁটুলি চুরি হ'য়ে গেল সব।"

"ঐ চল্লিশ মাইল রাস্তা তুই হেঁটে এলি?"—মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"তোমাকে বলে এসেছিলুম যে ঠিক পৌছব। দেখ, ঠিক পৌছেছি কি না!"

হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল বাবুলের মুখ।

প্রদীপ

ঘরের কোণে চকচকে পিলসুজের উপর মাটির প্রদীপটি জ্বলছে। বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে ক্রমাগত।

খোকন প্রদীপের আলোয় বসে পড়ছিল। কাছেই একটি আরামকেদারায় দাদু বসে বসে পা দোলাচ্ছিলেন আর টান দিচ্ছিলেন গড়গড়ায়; অম্বুরী তামাকের গন্ধে ঘর ভরপুর।

পিতৃমাতৃহীন খোকনকে তিনিই মানুষ করেছেন। স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন এবং নিজে গিয়ে নিয়ে আসেন স্কুল থেকে ছুটির পর। তার সঙ্গে খেলাও করেন, বেড়াতেও যান। এমনকি সিনেমাতেও নিয়ে যান। একদণ্ড চোখের আড়াল করেন না। বাড়িতে নিজেই তাকে পড়ান।

বিজ্ঞানের খুব বড় অধ্যাপক ছিলেন তিনি। এখনও মাঝে মাঝে কলেজে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। কিন্তু এখন আর চাকরি করেন না, বছর দুই আগে চাকরির মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেছে। এখন পেনসন ভোগ করেন আর খোকনকে নিয়ে থাকেন। পেনসনের সবটুকু তিনি নিজে ভোগ করেন না, অধিকাংশই দান করে দেন। অনেক গরীব ছেলের স্কুল-কলেজের মাইনে দেন, অনেক গরীব আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করেন। তাই তাঁর বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো নেই, মাটির প্রদীপ।

খোকন একটা গল্পের বই পড়ছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, দাদু, তুমি হাড় থেকে বজ্র তৈরি করতে পার?"

খোকনের ধারণা তার দাদু মস্তবড় একজন বিজ্ঞানী।

"না, আমি কিছুই পারি না, কেবল খেতে আর ঘুমুতে পারি।"

"তুমি খাও ত মোটে এক বেলা আর কখন যে ঘুমোও তাতো দেখতেই পাই না। কলেজে গিয়ে কত রকম এক্‌স্‌পেরিমেন্ট কর—আমি সব জানি। নরেশবাবু আমাকে সব বলেছেন—। বল না, হাড় থেকে বজ্র তৈরি করা যায় কি না! নিশ্চয় যায়, এইতো লিখেছে দধীচি মুনির হাড় থেকে বজ্র তৈরি ক'রে বৃত্রাসুরকে মারা হয়েছিল। অ্যাটম্ বম্ জিনিসটা কি—"

"আর একটু বড় হ'লে বুঝতে পারবে। তবে অ্যাটম্ বম্ আর বজ্র এক জিনিস নয়। অ্যাটম্ বম্ হাড় থেকে হয় না।"

"সেকালে দধীচি মুনির হাড় থেকে যখন বজ্র হয়েছিল, তখন একালেও নিশ্চয় হ'তে পারে,—পারে না?"

"নিশ্চয় পারে। হচ্ছেও।"

"কোথা?"

"সর্বত্র। তোমার চোখের সামনেই হচ্ছে, তুমি দেখতেও পাচ্ছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না—"

"হাড় থেকে আমার চোখের সামনে বজ্র হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না? কি রকম?"

দাদু হাঁটু দোলাতে লাগলেন।

গড়গড়ার মৃদু গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল তারপর। তারপর বাইরের ঝিঁঝির শব্দটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। খোলা জানালা দিয়ে খোকন দেখতে পেল, বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। চাপ চাপ জমাট অন্ধকার।

"দাদু, কিছু বলছ না যে—"

দাদু হয়তো কিছু বলতেন। কিন্তু বাধা পড়ল।

রাঁধুনী এসে বললে, "খোকন, খাবার দিয়েছি তোমার। খেয়ে নাও এসে—"

দাদুও বললেন, "যাও খেয়ে এস—"

খোকনকে উঠে যেতে হ'ল।

খেয়ে এসেই খোকন বললে, "দাদু, বল না কোথায় বজ্র হচ্ছে আজকাল। আমার চোখের সামনে হচ্ছে?"

"হচ্ছে। বড় হলে বুদ্ধি বাড়লে চোখের দৃষ্টি আরও পরিষ্কার হবে, তখন দেখতে পাবি—"

"এখন পাব না?"

"কই পাচ্ছিস?—"

খোকন বুঝতে পারলে, দাদু এখন অন্য কিছু একটা ভাবছেন, বজ্র নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নন। দাদুর মাঝে মাঝে ওরকম হয়। কি যেন ভাবেন বসে বসে। চোখ বুজে পা দোলাচ্ছেন খালি। নিশ্চয় ভাবছেন কিছু। খোকনের হঠাৎ মনে পড়ল, ফোর্থ মাস্টারমশাই চারটে অঙ্ক দিয়েছেন বাড়ি থেকে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। গল্পের বই পেয়ে সেকথা ভুলেই গিয়েছিল সে। তাড়াতাড়ি গিয়ে অঙ্ক কষতে বসল। দাদু চোখ বুজে পা দুলিয়ে যেতে লাগলেন। বজ্র আর দধীচির কথা চাপা পড়ে গেল।

…অঙ্ক কষা শেষ ক'রে বই খাতা গুছিয়ে রেখে খোকন যখন শুতে এল, তখনও দাদু তেমনি ভাবে বসে আছেন।

"দাদু, শুতে যাবে না?"

"চল—"

"আজ কিন্তু তোমার একটা গল্প বলবার কথা ছিল। ভুলে গেছ নিশ্চয়—"

"গল্পই ভাবছিলাম। চল বলছি—"

দাদু বলছিলেন, "কল্পনা কর একটা লোক কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। করেছিস?"

"করেছি—"

"দরদর ক'রে ঘাম পড়ছে তার। হাঁপিয়ে পড়েছে বেচারা। কিন্তু তবু থামছে না, ক্রমাগত কুপিযে চলেছে মাটি কুপিয়ে জমা করছে একধারে। আর তার বউ কুয়া থেকে জল তুলে সেই মাটিতে জল ঢেলে কাদা তৈরি করছে। কল্পনা করেছিস্ ?"

"করেছি—"

"আচ্ছা, এইবার কোদালটার কথা ভাবা যাক। কোদাল কি ক'রে তৈরি হয় জানিস ?"

"হাঁ। লোহা আর কাঠ দিয়ে –"

"লোহা কোথা থেকে আসে ?"

"খনি থেকে—"

"খনির লোহা থেকে কি ক'রে কোদাল হয় ?"

"লোহা গলিয়ে, তারপর—"

খোকন থেমে গেল। লোহা গলাবার পরে আর কি কি করলে কোদাল হয়, তা সে ঠিক জানত না।

"তারপর, ঠিক জানি না। গলানো লোহাটা ছাঁচে ঢালাই করে বোধ হয়—"

"হাঁ। আরও অনেক কিছু করে। লোহাকে যে আগুনে গলাতে হয়, এইটুকুই শুধু মনে রাখ এখন। কোদালের বাঁটের কাঠ আসে কোথা থেকে ?"

"গাছ থেকে কেটে নেয়—"

"ঠিক। এ কথাটাও মনে রেখ, গাছ কেটে তবে কোদালের বাঁট হয়। আচ্ছা, এবার আর একটা কল্পনা কর। ঘুম পাচ্ছে নাকি ?"

খোকন এবার বিরক্ত হল।

"তোমাকে গল্প বলতে বলছি, আর তুমি আমাকে খালি জেরা করছ—"

"ওর থেকেই একটা গল্প গড়ে উঠবে, দেখ না—"

"কি কল্পনা করতে হবে এবার—"

"কল্পনা কর, একজন চাষী মাঠে চাষ করছে। কখনও রোদে পুড়ে, কখনও জলে ভিজে। এক কথায় সমস্ত শরীর পাত ক'রে। ছবিটা মনে মনে দেখ খানিকক্ষণ। দেখছিস ?"

"দেখছি। কিন্তু তোমার গল্প কোথায় ?"

"গল্প তুই নিজে তৈরি করবি। আমি গল্পের মালমসলা তোকে যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। এইবার ভাবতে হবে লাঙলের কথা। আবার সেই কাঠ আর লোহা। গাছ কেটে চিরে ছুলে লাঙ্গল তৈরি হয়েছে, আর খনি থেকে লোহা তুলে আগুনে গলিয়ে ফাল তৈরি হয়েছে। তারপর, তার গরু দুটোর কথা। কত কষ্ট ক'রে লাঙ্গল টানছে তারা। কল্পনা করছিস ?"

"করছি। কিন্তু এসবে গল্পের মালমসলা কি আছে—"

"আছে, আছে। আচ্ছা, এইবার মাটির কথাটা ভাব, যার বুক চিরে লাঙলের ফাল চলেছে ক্রমাগত দিনের পর দিন। ভাবছিস? খুব ভাল ক'রে ভাব, আমি ততক্ষণ দু'চার টান তামাক খেয়ে নি—"

খোকন ভাবতে লাগল।

সত্যিই একটা নূতন কথা তার মনে হতে লাগল—কষ্টের কথা, দুঃখের কথা, মাটির বুক চিরে লাঙল চলছে, লোহা আগুনের তাতে গলে যাচ্ছে, গরু দুটোর কি কষ্ট, ওই চাষীর কষ্টও কি কম?

গড়গড়ার মৃদু গম্ভীর শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। তার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির শব্দ। জানলা দিয়ে চাপ চাপ অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারের ওপারে আকাশ, তাতে তারা জ্বলছে কয়েকটা……

দাদুর তামাক খাওয়া শেষ হ'ল।

বললেন, "এইবার কল্পনা কর মাঠে ফসল হয়েছে। চারিদিকে সবুজে সবুজ—"

"কি ফসল—"

"রেড়ি আর কাপাস। একটা জমিতে রেড়ি আর একটা জমিতে কাপাস—"

"ধান নয়?"

"তোমাকে যে গল্পের মালমসলা দিচ্ছি তাতে ধান দরকার নেই. রেড়ি আর কাপাসের দরকার। তাই এ কল্পনা করতে বলছি। করছ?"

"করছি—"

"তারপর কল্পনা কর, মানুষ জীবন্ত রেড়ি আর কাপাস গাছ থেকে রেড়ির বীজ আর কাপাসের তুলো সংগ্রহ করছে। অসংখ্য জীবন্ত গাছ রেড়ি আর তুলো দিচ্ছে ·····"

আবার দাদু চুপ ক'রে গেলেন।

"তারপর—"

"সেই মাটির কাছে ফিরে যাওয়া যাক এবার।"

"কোন্ মাটি?"

"সেই যে একটা লোক কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখছিল। কল্পনা কর, সে মাটির চেহারা বদলাচ্ছে। তা কুমোরের চাকে উঠে নানারকম বাসনে রূপান্তরিত হচ্ছে। কলসী, হাঁড়ি, সরা, ধুনুচি, প্রদীপ—নানা চেহারার নানারকম বাসন।"

"তারপর?"

"তারপর সেগুলোকেও আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। পুড়ে পুড়ে শক্ত হচ্ছে তারা—"

"তারপর?"

"তারপর এইবার চল সেই রেড়ির বিচিগুলির কাছে। ঘানিতে ফেলে তাদের

পেষা হচ্ছে। চোখে ঠুলি পরে একটা গরু ঘানি ঘোরাচ্ছে। ক্রমাগত ঘুরে চলেছে সে, ক্লান্তি আসছে, পা ব্যথা করছে, কিন্তু থামবার জো নেই। থামলেই পিঠে লাঠি পড়ছে। এইবার ঘানির কথা ভাব। গাছ কেটে যেমন কোদালের বাঁট হয়েছিল, লাঙল হয়েছিল, তেমনি ঘানিও হয়েছে। ঘানিতেও লোহা আছে, যে লোহা আগুনে গলে' তবে মানুষের কাজে লাগে—"

...আবার দাদু চুপ করলেন।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিগুলোও আর ডাকছে না।

খোলা জানালা দিয়ে কালো আকাশটা দেখা যাচ্ছে, আকাশের নক্ষত্রগুলো কি উজ্জ্বল। নক্ষত্রের আলো কি যেন বলতে চাইছে খোকনকে, কিন্তু খোকন বুঝতে পারছে না...

"কল্পনা করেছিস?"

"করেছি।"

"আচ্ছা, এইবার চল কাপাস তুলোর কাছে। তুলোকে ছিন্নভিন্ন ক'রে পেঁজা হচ্ছে, তারপর ধোনা হচ্ছে। তারপর তা পাকিয়ে সুতো হচ্ছে, সেই সুতো থেকে কাপড় হচ্ছে। যে সব যন্ত্র এসব করছে, তা তৈরি হয়েছে লোহা আর কাঠ থেকে। গাছ নিজের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে কাঠ হয়েছে, লোহা আগুনে গলেছে।"

দাদু চুপ করলেন আবার।

"তারপর?"

"এইবার দধীচি আর বৃত্রাসুরের গল্পে ফিরে যাওয়া যাক। অন্ধকারও অসুরের মতোই ভয়ঙ্কর। তাকে নাশ করে আলো। ওই ছোট্ট প্রদীপের আলো অন্ধকার অসুরের মাথায় বজ্র হেনেছে। এইবার ভেবে দেখ দিকি, ওই ছোট্ট প্রদীপের আলো-টুকুকে সম্ভব করবার জন্যে কতগুলি দধীচিকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে। যখন বড় হবে তখন বুঝবে, নানারকম অসুর নানা ভাবে আমাদের বিব্রত করতে চেয়েছে যুগে যুগে, কিন্তু পারেনি, কারণ দধীচিরাও জন্মেছে যুগে যুগে নানারূপে। এখনও জন্মাচ্ছে—"

দাদু চুপ করলেন।

খোকন চেয়ে দেখলে প্রদীপের শিখাটি যেন হাসছে আর আকাশের নক্ষত্রগুলো যেন যোগ দিয়েছে সে হাসিতে।

টিয়া আর চন্দনা, দুই বোন।

একই পিতা-মাতার সন্তান তারা, একই পরিবেশে মানুষ হয়েছিল। একরকম খাবার খেয়ে, একরকম পোশাক পরে, এক বিছানায় শুয়ে, একরকম খেলা খেলে ছেলেবেলাটা কেটেছিল তাদের। এক স্কুলে একই মাস্টারের কাছে পড়াশোনাও করেছিল দু'জন একসঙ্গে। কিন্তু জীবন তাদের একরকম হলো না। কেন হলো না তার বিচার করবেন পণ্ডিতেরা, কি হয়েছিল তা শোনো :

টিয়া ও চন্দনার চেহারা যদিও অনেকটা একরকম ছিল, কিন্তু রং ছিল আলাদা। টিয়া ছিল কালো, আর চন্দনা ছিল ফরসা। কি ক'রে একজনের রং কালো আর একজনের রং ফরসা হয়, আর কেন যে লোকে কালো-ফরসা নিয়ে মাথা ঘামায় তার বিচার করুন পণ্ডিতেরা, কিন্তু রঙের এই সামান্য তারতম্য এদের দু'জনের জীবনে হঠাৎ যে ব্যবধান সৃষ্টি করলো তা বিপুল।

টিয়া-চন্দনার বাবা নিবারণবাবু বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সজ্জন ছিলেন, কিন্তু ধনী ছিলেন না। অল্প বেতনে স্কুলে মাস্টারি করতেন, আর সকাল-সন্ধে করতেন—প্রাইভেট ট্যুশনি। ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত পরিশ্রম করেও কিন্তু তিনি মাসে আড়াইশো টাকার বেশী রোজগার করতে পারতেন না। এতে কোনক্রমে সংসার চলতো তাঁর, বিশেষ কিছু বাঁচাতে পারতেন না। মেয়ে দুটিকে কিছুদূর পড়িয়েছিলেন তবু। নিজে মাস্টার ব'লে পড়াতে পেরেছিলেন। তাও সম্ভব হতো না, যদি তাঁর ছেলে থাকতো। আর ছেলেমেয়ে হয়নি ভদ্রলোকের। ছেলে থাকলে তাকেই পড়াতে হতো আগে।

টিয়া-চন্দনা স্বাভাবিক নিয়মে বড় হ'য়ে উঠতে লাগলো। তাদের বাড়ন্ত গড়ন দেখে, স্বাস্থ্য দেখে আনন্দ হওয়ার কথা। কিন্তু নিবারণবাবু আর তাঁর স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিয়ে দিতে হবে, অনেক টাকা চাই। কোথায় পাবেন অত টাকা! রোজগার থেকে কিছুই তো বাঁচাতে পারেন নি। বরং ধারই আছে বাজারে কিছু।

চন্দনা বড়। তার জন্তেই বিয়ের চেষ্টা হ'তে লাগলো আগে। দু'একজন দেখে গেলেন, একজন বললেন, চন্দনা নাকি খুব সুলক্ষণা, কিন্তু পণের পরিমাণ শুনে পেছিয়ে আসতে হলো নিবারণবাবুকে। দশ হাজার টাকা চায়! কি সর্বনাশ! যতই দিন যায় ততই নিবারণবাবুর চিন্তা বাড়ে। শেষকালে এমন হলো যে, রাত্রে ঘুম হতো না তাঁর। নিবারণবাবুর স্ত্রী একদিন বললেন, "আমার যা দু'একখানা গয়না আছে তা বেচে দাও। দেশের জমিটাও বিক্রি ক'রে ফেল। কি হবে ওসব থেকে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে যেমন ক'রে হোক—"

নিবারণবাবু ইতস্তত: করছিলেন, এমন সময় একদিন অদ্ভুত কাণ্ড হ'য়ে গেল একটা। ঠিক যেন রূপকথার কাণ্ড! রূপকথায় নিশ্চয় পড়েছো, এক রাজাহীন রাজ্যের

রাজহস্তী শূন্ত সিংহাসন পিঠে নিয়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়েছিল, আর এক গরীবের ছেলেকে শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল—এও যেন অনেকটা তেমনি হলো।

রাস্তার কলে জল ভরছিল চন্দনা। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটি ক্ষীণকান্তি লোক ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে তাকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে, একটু বিরক্তও হলো। তাড়াতাড়ি জল ভরে বাড়ির দিকে চলে গেল সে। বাড়িতে এসে দেখে, লোকটি তার পিছু-পিছু আসছে।

—"তোমার নাম কি মা ?"

প্রশ্ন শুনে চন্দনা অবাক্ হয়ে গেল।

—"আমার নাম, চন্দনা।"

—"তোমার বাবা বাড়ি আছেন ?"

—"আছেন।"

—"একবার ডেকে দাও তো—"

নিবারণবাবু বেরিয়ে এলেন। সব শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন তিনি। ক্ষীণকান্তি লোকটি কেউ-কেটা নন্। মধ্যপ্রদেশের এক রাজ-পরিবারের কুল-পুরোহিত। রাজকুমারের বধূপদে বরণ করবার জন্ত তিনি এক সর্বসুলক্ষণা রূপসী কিশোরীর খোঁজে বেরিয়েছেন। চন্দনাকে দেখে পছন্দ হয়েছে তাঁর। তিনি চন্দনার জাতি-বংশ-পরিচয়-গোত্র ইত্যাদি জানবার জন্ত উৎসুক হয়ে এসেছেন। সব যদি মিলে যায় তাহলে চন্দনাকে তিনি রাজবধূ করবার জন্ত নির্বাচিত করবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, সব মিলে গেল। পুরোহিতমশায় চলে গেলেন, বলে গেলেন, চন্দনাকেই নির্বাচন করলেন তিনি। যথাসময়ে চিঠি আসবে।

চিঠি এলো সত্যি-সত্যি। অবাক্ হয়ে গেলেন নিবারণবাবু। আরব্য উপন্তাসের আবু হোসেনও বোধহয় এত অবাক হয়নি।

পর-পর সব ঘটনা ঠিক যেন যাদু-মন্ত্রবলে ঘটতে লাগলো। নিবারণবাবু ছুটি নিয়ে গেলেন বরকে আশীর্বাদ করতে। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড হাতা, হাতী, ঘোড়া, কুকুর, মোটর, সিপাহী-সান্ত্রী—এলাহি কাণ্ড-কারখানা দেখে হকচকিয়ে গেলেন তিনি। রাজকুমারকে যথারীতি আশীর্বাদ করলেন। রাজকুমার সুশ্রী, কিন্তু একটু রোগা বলে মনে হলো।

বিবাহের একসপ্তাহ আগে বরপক্ষের লোকেরা এসে পড়লেন কোলকাতায়। প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া করলেন। তারপর একদিন প্রচুর গয়না, কাপড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন চন্দনাকে। তাঁদের খরচেই চন্দনাদের বাড়ির সামনেও নহবত বসলো বিয়ের তিনদিন আগে থেকেই। বিয়ের দিন যা হলো তা অবর্ণনীয়।

ফুলের, আলোর, রঙের আর সুরের মহোৎসব পড়ে গেল। বহুরকম বাজনা বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে বর এলো—ময়ূরে রূপান্তরিত এক প্রকাণ্ড মিনার্ভা গাড়ি চড়ে।

যে চন্দনা দারিদ্র্যের দুঃসহ শীতে কষ্ট পাচ্ছিলো, অপ্রত্যাশিত ভাবে তার জীবনে বসন্ত এসে গেল হঠাৎ।

চন্দনার বিয়ের কিছুদিন পরে—টিয়ার জীবনেও বসন্ত এলো। কিন্তু এ-বসন্ত ঋতুরাজ বসন্ত নয়, বসন্ত রোগ। যমে-মানুষে টানাটানি চললো কিছুদিন, তারপর বাঁচলো সে কোনক্রমে। না বাঁচলেই বোধ হয় ভালো ছিল; একে কালো রং, তার উপর মুখময় বসন্তের দাগ হ'য়ে সে যেন একটা বিভীষিকার মতো হ'য়ে উঠলো।

নিবারণবাবু আবার বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগলেন।

অনেক কষ্টে টিয়ার বিয়ে হলো অবশেষে। কিন্তু অনেক খুঁজতে হলো, অনেকদিন অপেক্ষা করতে হলো, অনেক লোক এসে টিয়াকে অনেকবার দেখে, অনেকবার অপছন্দ ক'রে গেল, অনেক জলখাবার খাওয়ান হলো অনেক অবাঞ্ছিত লোককে, নিবারণবাবু অনেকের কাছে অনেকবার হাতজোড় করলেন—তারপর ঠিক লোকটি এলো।

লোকটি অবশ্য পাত্র হিসাবে ভালো। দেখতে ভালো, চরিত্র ভালো, বংশ ভালো, লেখাপড়ায়ও ভালো। কিন্তু প্রধান খুঁত—অবস্থা ভালো নয়। পিতৃ-মাতৃহীন সুশীল নিজের চেষ্টাতেই বি. এ. পাশ করেছিল, নিজের চেষ্টাতেই রেলের চাকরি যোগাড় করেছিল। মাথায় বুদ্ধি ছিল, মনে জোর ছিল, কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা ছিল না। এই সুশীলই একদিন এসে বিনা-পণে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেল কুৎসিত টিয়াকে।

চন্দনার স্বামী রাজকুমার গৌরীনাথ অসুস্থ ছিল বলে বিয়ের সময় চন্দনা আসতে পারেনি। কিছু গয়না আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল কেবল।

টিয়া আর চন্দনার বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই নিবারণবাবু সস্ত্রীক মারা গেলেন কলেরায়। সাংসারিক কর্তব্য শেষ হওয়ামাত্রই যেন চলে গেলেন তাঁরা।

টিয়া আর চন্দনার মধ্যে যে যোগসূত্রটুকু ছিল তা ছিঁড়ে গেল।

চন্দনা রইলো মধ্যপ্রদেশে এক ধনীর প্রাসাদে, আর টিয়া রইলো এক অখ্যাত স্টেশনের কোয়ার্টারে মালবাবুর বউ হ'য়ে।

বছর-দুই-কাটলো।

চন্দনা আর টিয়ার কোনো খবর রাখে না, টিয়াও আর চন্দনার কোনো খবর পায় না। আপন আপন সংসার নিয়ে দুজনেই ব্যস্ত। তারা যে এক মায়ের পেটের দুই বোন, একই রক্তধারা যে তাদের শরীরে বইছে, এ-কথা মনে করবার অবকাশই পেতো না কেউ।

চন্দনা ব্যস্ত তার অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে। রাজকুমার গৌরীনাথের রোজ জ্বর হয়, অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হচ্ছে না। বিয়ের আগে থেকেই নাকি জ্বর

হতো। রাজবাড়ির জ্যোতিষী নাকি কোষ্ঠী গণনা ক'রে বলেছিলেন, একটি সর্বসুলক্ষণা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে রাজকুমার সুস্থ হতে পারেন। জ্যোতিষীর ফরমাশ-অনুযায়ী মেয়ে সুলভ হয়নি। দেশ-দেশান্তরে লোক পাঠাতে হয়েছিল। অনেকদিন পরে সন্ধান মিলেছিল চন্দনার. গৌরীনাথ যে চির-রোগী, এ-খবর সযত্নে গোপন ক'রে রাখা হয়েছিল চন্দনার বাবার কাছ থেকে। চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে গৌরীনাথ ভালোও ছিল কিছুদিন। কিন্তু তা কিছুদিন মাত্র। আবার জ্বর শুরু হয়েছে। বড়-বড় ডাক্তার আসছে, হাওয়া বদল করবার জন্যে ভালো-ভালো জায়গায় বাড়ি নেওয়া হচ্ছে, অর্থব্যয় হচ্ছে জলের মতো, জ্বরের কিন্তু উপশম নেই।

টিয়া ব্যস্ত তার গৃহস্থালি সামলাতে। সুশীলের বদলির চাকরি। আজ এ-স্টেশন, কাল ও-স্টেশন। মাইনে বেশী নয়। গ্রামে এক বিধবা পিসী আছেন, প্রতিমাসে মাসোহারা পাঠাতে হয় তাঁকে। সুশীল যদি দুঃশীল হতো—অর্থাৎ অন্যান্য মালবাবুর মতো 'ঘুষ' নিতে পারতো, তাহ'লে টিয়ার সংসারে অসচ্ছলতা থাকতো না। এক-একজন মালবাবুর কি বাড়-বাড়ন্তই দেখেছে টিয়া। মালবাবু তো নয়—যেন লাটসাহেব! রেডিও, গ্রামোফোন, সিঙ্গার মেসিন, দামা-দামী ছিটের জামা, সিল্কের শাড়ি, ভারী-ভারী সোনার গয়না, জড়োয়ার নেকলেস-চুড়ি, ভালো গরু, বিলিতী কুকুর, ময়না, কাকাতুয়া, সিল্কের গেরুয়া-পরা গুরু—কি নেই তাদের! কিন্তু সুশীল কিছুতেই ঘুষ নেবে না। তাই টিয়ার শাড়িতে তালির পর তালি, সুশীলের গেঞ্জি শতছিদ্র সপ্তাহে একদিনের বেশী মাছ খাবার পয়সা জোটে না, দুধের কথা চিন্তা করাও যায় না। রেডিও-গ্রামোফোন তো কল্পনার বাইরে। চাকর-ঠাকুর রাখবার সামর্থ্য নেই। স্টেশনের একটা কুলীর বউ এসে একটু-আধটু কাজ ক'রে দিয়ে যায়। জল ঘেঁটে-ঘেঁটে টিয়ার হাতে পায়ে হাজা হ'য়ে গেছে। অল্প আয়ে সংসার চালাবার ধান্দাতেই ব্যস্ত বেচারী, চন্দনার খবর নেবার অবসরই তার নেই। পাড়াপড়শীর বাড়িতে গিয়ে দু'দণ্ড বসে গল্প করবার সময়ও পায় না সে।

টিয়ারা তখন ভাগলপুরে।

সুশীল এসে বললে, "তোমার দিদি বোধহয় এসেছেন এখানে।"

—"দিদি? কোথা?"

—"স্টেশনে। মনে হচ্ছে, তাঁদেরই ফার্স্ট-ক্লাস গাড়ি কেটে রাখা হয়েছে। এখানে বুঢ়ানাথে স্নান করতে এসেছেন শুনলাম। তারপর নাকি গৈবীনাথে যাবেন।"

—"তুমি দেখা করোনি?"

—"আমার সঙ্গে তো আলাপ নেই! তুমি গিয়ে দেখা ক'রে এসো। ওঁরা বোধ হয় জানেন না যে, আমরা এখানে আছি।"

—"কি ক'রে জানবেন, চিঠিপত্র তো লেখা হয় না। তুমি খবর নিয়েছো ভালো ক'রে?"

—"নিয়েছি। তুমি যাও না।"

—"কার সঙ্গে যাবো ?"

—"কিষুণকে নিয়ে যাও।"

কিষুণ, স্টেশনের কুলী। কিষুণের বউই কাজ করে টিয়ার বাড়িতে।

—"তুমি যাবে না ?"

সুশীল হেসে বললে, "আমি জামাইমানুষ, বিনা নিমন্ত্রণে কি যেতে পারি ?"

সুশীলের আড়-ময়লা শতছিদ্র গেঞ্জিটার দিকে চেয়ে টিয়া মুচকি হাসলে একটু, কিছু বললে না। টিয়ার ছেলে হয়েছিল একটি। হৃষ্টপুষ্ট চমৎকার ছেলে। ছ মাস বয়স, কিন্তু এত ভারী যে, টিয়া ভালো ক'রে কোলে করতে পারে না তাকে। তাকে অতদূর নিয়ে যাওয়া শক্ত। কিষুণ নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু এখন ঘুমের সময় কাঁদবে হয়তো। তাই তাকে ঘুম পাড়িয়ে একাই গেল সে। ছেলেকে চট্ ক'রে ঘুম পাড়াবার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল লখিয়া, কিষুণের বউ।

চন্দনাকে দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল।

চন্দনার মাথায় সিঁদুর নেই, চুলে তেল নেই, পরনে থান ! চন্দনা বিধবা হয়েছে ? খবর পায়নি তো সে !

টিয়ার দিকে চন্দনা নির্নিমেষে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলে, "তুই এখানে কি ক'রে এলি ?"

—"এইখানেই উনি বদলি হ'য়ে এসেছেন কিছুদিন আগে।"

—"ও।"

টিয়া এরপর কি যে বলবে তা ভেবে পেলে না। মনে হতে লাগলো, চন্দনা যেন তার বোন নয়, অপর কেউ। অনেক দূরে নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কবে বিধবা হয়েছে, স্বামীর কি হয়েছিল, এসব কথা পাড়বার সাহস হলো না তার। চন্দনাও কিছু বললে না। নিষ্পলক চোখে টিয়ার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলো সে। টিয়ার মনে হচ্ছিলো পাথর হ'য়ে গেছে সে।

প্রায় মিনিটখানেক পরে (টিয়ার মনে হচ্ছিলো যেন যুগ-যুগান্ত পরে) চন্দনা প্রায় অস্ফুটস্বরে বললে, "আয়, ভেতরে আয়—"

ফার্স্ট-ক্লাস গাড়ির ভিতর টিয়া ঢুকলো।

ঢুকে অবাক্ হয়ে গেল। কি ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে ! দেখলে, চন্দনার ছেলে হয়েছে একটি। ঘুমুচ্ছে। চমৎকার রেশমের বিছানা, নেটের মশারি। কতরকম খেলনা। বড়-বড় থার্মোফ্লাস্কই তিন-চারটে, থরে-থরে ফল সাজানো রয়েছে, ছোট-বড় রূপোর বাসন ছড়ানো রয়েছে, ওষুধের শিশি হরেক-রকমের···দাই, চাকর, আয়া, নার্স। টিয়া হকচকিয়ে গেল।

চন্দনার ছেলেটি কিন্তু রোগা। নেটের মশারির ভিতর রেশমের বিছানায় দামী কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছে বটে, চেহারায় কিন্তু লালিত্য নেই।

—"খোকার অসুখ না কি ?"

—"হ্যাঁ, উনি চলে যাওয়ার পর থেকেই অসুখ হয়েছে। কিছুতেই সারছে না। আমাদের কুলগুরু বশিষ্ঠপ্রসাদ বলেছেন, যেখানে যেখানে শিব আছেন, সেখানে নিয়ে গিয়ে শিবকে গঙ্গাজলে নাইয়ে, সেই জল দিয়ে ছেলেকে নাওয়ালে ভালো হ'য়ে যাবে। তাই তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

দু'বোনের দূরত্ব-ভাবটা কেটে গেল ক্রমশ। আলাপ শুরু হলো আবার। টিয়া শুনে অবাক্ হয়ে গেল, বিয়ের আগেই নাকি গৌরীনাথের যক্ষ্মা হয়েছিল! সুলক্ষণা চন্দনাকে ওরা বউ হিসেবে নিয়ে যাননি, ওষুধ হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। রোগের কিন্তু উপশম হয়নি। গৌরীনাথ মৃত্যুর পূর্বে ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন। উইল ক'রে চন্দনাকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। খোকন যতদিন-না সাবালক হচ্ছে, ততদিন চন্দনাই বিশাল বিষয়ের কর্ত্রী থাকবে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চন্দনা বললে, "তুই ছেলেকে নিয়ে এলি না কেন ?"

—"যা ভারী, আমি তুলতেই পারি না। ঘুমুচ্ছে, তাছাড়া—"

—"তোদের বাসা এখান থেকে কতদূর ?"

—"কাছেই।"

—"চল্, দেখে আসি তোর ছেলেকে।"

টিয়ার সঙ্গে চন্দনা গিয়ে হাজির হলো টিবার বাসায়। সঙ্গে গেল আসাসোটাধারী দু'জন বরকন্দাজ।

—"কই তোর ছেলে ?"

—"ঘুমুচ্ছে।"

—"কোথায় ?"

টিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেল খোকনকে আনতে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে খোকন। কিন্তু এ কি! ঠোঁট নীল, নিশ্বাস পড়ছে না, চোখের তারা উল্টে আছে·। চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো টিয়া।

—"কি হলো ?"

চন্দনা ছুটে এলো তাড়াতাড়ি।

—"খোকন এমন হয়ে গেল কেন ?"

খোকন মারা গিয়েছিল।

দুরন্ত ছেলেকে সামলানো যেতো না, ঘুম পাড়ানো যেতো না বলে লখিয়া টিয়াকে শিখিয়ে দিয়েছিল, দুধের সঙ্গে একটু আফিম খাইয়ে দিলে ছেলে চট্ ক'রে ঘুমিয়ে

পড়বে। রোজ পড়তোও। সেদিনও পড়েছিল. সেদিন কিন্তু ঘুম আর ভাঙলো না। আফিমের মাত্রা বেশী হ'য়ে গিয়েছিল।

নির্বাক টিয়া আর চন্দনা পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একজন স্বামীহারা, আর একজন পুত্রহারা। ঘটনা প্রবাহে এক বোন আর-এক বোনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, গভীর শোকের মধ্যে আবার তাদের মিলন হলো।

সুশীল আপিস থেকে ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চন্দনার বরকন্দাজ দুজন ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, কারণ, বুড়োনাথের মন্দিরে যেতে হবে, খোকার স্নানের সময় নাকি উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

চন্দনা সুশীলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অদ্ভুত প্রশ্ন করলে একটা।

—"সুশীলবাবু, আমি যদি আপনার বাসায় থেকে যাই, আপত্তি আছে আপনার?"

—"সে কি কথা! আপত্তি হবে কেন, খুব খুশী হবো। টিয়ার কাছে কেউ থাকলে, ভালোই হয় এখন। কিন্তু আপনি কি থাকতে পারবেন এখানে?"

—"খুব পারবো। আমার খোকনকে নিয়ে টিয়ার কাছেই থাকবো আমি।"

—"আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি···"

—"আমার শ্বশুরবাড়িতে আমিই কর্ত্রী। আমার উপর হুকুম করবার কারও অধিকার নেই।"

"বেশ, থাকুন, আমার আপত্তি কি।"

আবার সেই রূপকথার কাণ্ড হলো।

চন্দনা আর ঐশ্বর্যের মধ্যে ফিরে গেল না, গরীব বোন টিয়ার কাছেই থেকে গেল। দাই, নার্স আর আয়ার কবলমুক্ত হয়ে, মা-মাসীর স্নেহে খোকনও ভালো হয়ে উঠলো আস্তে-আস্তে। তীর্থে-তীর্থে আর ঘুরতে হলো না।

কল্পনা

অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও আমাদের পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়নি. জনক সূর্যের অগ্নি তখনও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রদীপ্ত হ'য়ে রয়েছে, চতুর্দিক উত্তপ্ত, সবুজের লেশমাত্র নেই কোথাও। কোনও প্রাণীর জন্ম হয়নি তখনও। কোথাও কোন নদী নেই, ঝরনা নেই, হ্রদ নেই, সমুদ্র নেই। পৃথিবী তখন বিশাল একটা উত্তপ্ত গোলকের মতো ঘুরে চলেছে সূর্যের চারিদিকে। যুগ যুগান্তে অবসান হচ্ছে, কল্প কল্পান্তে। কোথাও শান্তি নেই, স্নিগ্ধতা নেই, আনন্দ নেই, জীবনের বৈচিত্র্য নেই। জন্ম-সময়ে সূর্য তার কানে-কানে বলে দিয়েছিলেন—তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে, তোমার মধ্যে অনেক স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে। তপস্যা করো, তপস্যা করো।

পৃথিবী বুঝতেই পারেনি, তপস্যা মানে কি। কি করতে হবে তাকে। সে কেবল ঘুরে চলেছিল সূর্যের চারিদিকে। না ঘুরে উপায়ও ছিল না, একটা অদৃশ্য শক্তি ঘোরাচ্ছিলো তাকে। একটা জিনিস কিন্তু বুঝেছিল পৃথিবী। বুঝেছিল সে অসহায়। তাই হতাশা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো তার বুকের মধ্যে, মাঝে-মাঝে তা প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরিতে মূর্তও হচ্ছিলো বুক ফেটে, তার আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত ক'রে। কিন্তু তাতে কোনও ফল হচ্ছিলো না। যে অদৃশ্য বন্ধন তাকে বন্দী করেছে তা একটুও শিথিল হচ্ছিলো না, জ্বালা একটুও কমছিল না, তার উত্তপ্ত ঊষরতায় শ্যামলতার লেশমাত্রও জাগছিল না। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, আসছিল আর যাচ্ছিলো, কিন্তু তার অন্তরের দাহ কমছিল না একটুও। অবশেষে হঠাৎ একদিন তা কান্নায় রূপান্তরিত হলো। অতি তীক্ষ্ণ, অতি তীব্র সে ক্রন্দন, মহাশূন্য ভেদ ক'রে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে তা কোথায় হারিয়ে যেতে লাগলো তা কেউ জানতো না, সে নিজেও না। তার অন্তরের জ্বালা যে কান্নায় রূপান্তরিত হয়েছে তা-ও সে জানতো না। এই কান্নাই যে তপস্যা, এও তার কল্পনাতীত ছিল। এ-তপস্যার ফল ফলেছিল। কেমন ক'রে ফলেছিল সেই গল্পই তোমাদের আজ বলবো।

দেবকন্যা করুণা স্বর্গের নন্দনকাননে আনমনা হ'য়ে বসেছিল সেদিন। নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গ-সুখ তার ভাল লাগছিল না। স্বর্গে কোন দুঃখ নেই, তাই সুখের কোনও স্বাদ নেই। কোনও বৈচিত্র্য নেই স্বর্গের জীবনে। পারিজাতের রূপ, মন্দাকিনীর কলধ্বনি, অপ্সরার নৃত্য, ইন্দ্রের সভা, দেবদেবীর আমোদ-প্রমোদ—সবই ছিল, কিন্তু করুণার মনে তারা আর সাড়া জাগাতে পারছিল না। করুণা কিছু একটা করতে চাইছিল, কিন্তু স্বর্গে করবার মতো কিছু তো নেই, স্বর্গে সব করা হয়ে গেছে, নূতন কাজ নেই, নূতন কাজের প্রেরণাও নেই। স্বর্গের জীবন—একঘেয়ে বিস্বাদ জীবন। করুণা নন্দনকাননে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, তার অন্তরের নিগূঢ়-লোকে ভাষাহীন একটা আগ্রহ, কিছু একটা করবার আগ্রহ ধীরে-ধীরে জাগছিল কেবল। সেই ভাষাহীন ভাবকে কেমন ক'রে রূপ দেবে সে তাই ভাবছিল একা-একা। ভাবতে-ভাবতে মনে পড়লো বান্ধবী বিজলীর কথা। বিজলী হাসি-খুশিতে ভরা, সারা মুখখানিতে তার হাসি চিকমিক করছে সর্বদা। স্বর্গের সবাই ভালোবাসে ওকে ওর এই হাসির জন্য। হাসি নয়—যেন আলো। ফিক-ফিক ক'রে যখন হাসে, মনে হয়, আলো জ্বলে উঠলো যেন চোখের ভিতর। এই হাসির জন্যই গম্ভীর দেবতারাও ওকে ভালোবাসে। করুণার কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। ও ভেবেই পায় না, কি ক'রে বিজলী এই একঘেয়ে স্বর্গলোকে এমন আনন্দে আছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো তার পিতা বরুণের কথা। তার মা নেই, কোনদিন ছিল কি না তাও সে জানে না। জ্ঞান হয়ে থেকে সে বাবাকেই দেখছে। বাবাকেও সে কচিৎ দেখতে পায়। সৃষ্টির কাজে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। একদিন হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "করুণা, তুমি নূতন ধরনের কিছু শুনতে পেয়েছো কি?"

করুণা অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। নূতন ধরনের কি আবার শুনবে সে! স্বর্গের পাখিদের একঘেয়ে কাকলী, মন্দাকিনীর একঘেয়ে কলতান, নন্দনকাননের একঘেয়ে মর্মরধ্বনি আর অপ্সরীদের একঘেয়ে নূপুর-নিক্বণ, এ ছাড়া আর তো কিছুই শোনা যায় না এখানে। তাই সে উত্তর দিয়েছিল, "না, নূতন ধরনের কিছুই শুনিনি তো—"

"শুনবে…"

আর বেশী কিছু বলেন নি তিনি। করুণা কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি শুনবো?"

"কি শুনবে তা আমিও জানি না। শুধু এইটুকু জানি, তোমার সেই শোনার উপর আমার ছুটি নির্ভর করছে। পিতামহ ব্রহ্মা এইটুকু শুধু বলেছেন আমাকে। দিবারাত্রি খেটে-খেটে আমি পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, সৃষ্টির এ বিশাল ভার আমার উপর দিয়ে পিতামহ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। তাঁর কাছে ছুটি চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, "সেটা তোমার মেয়ে করুণার উপর নির্ভর করছে। সে একদিন নূতন একটা কিছু শুনবে, আর তখনই তোমার ছুটির ব্যবস্থা হবে। এর আগে তোমার ছুটি নেই। তুমি কান পেতে রাখো, শুনবেই নিশ্চয় নূতন কিছু একটা…"

এইটুকু বলেই বরুণ চলে গিয়েছিলেন। কোন্ মহাশূন্যে কোন্ জ্যোতির্ময়লোক সৃষ্টি হচ্ছিলো নাকি। ব্রহ্মা, অগ্নি, বরুণ, মিত্র সকলেই তাই নিয়ে ব্যস্ত। করুণা ভাবতে লাগলো, কি সে শুনবে…কবে শুনবে…

"কি ভাবছো ভাই একা বসে?"

হাসতে-হাসতে বিজলী এসে বসলো।

"জানি না।"

আর একটু হেসে বিজলী বললে, "কি ভাবছো তা জানো না?"

"ঠিক জানি না · তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।"

বিজলী এর উত্তরে কিছু বললে না, কেবল তার চোখদুটি হাসতে লাগলো।

"অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি একটা আজ। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে চলে এলাম তোর কাছে।"

"স্বপ্ন দেখে আমার কাছে ছুটে চলে আসবার মানে?"

"স্বপ্নটা শোন্ আগে, তাহলেই মানে বুঝতে পারবি।"

"বল।"

"স্বপ্নে দেখলাম, আমার বর যেন তোর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। বর যখন ঘুরছে তখন আমাকেও ঘুরতে হচ্ছে। আমরা দু'জনেই যেন তোকে নিয়েই আছি।"

"তোর বর? বিয়ে হলো কবে তোর?"

"বিয়ে হয়নি। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম হয়েছে। বরটির চেহারা—যমদূতের মতো! একটি পাথর যেন মনুষ্যমূর্তি ধরেছে। গলার স্বর শুনলে মনে হয়, পাথরটি বুঝি কাটছে।

তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হলে তোমার কোন ভয় থাকবে না, কিন্তু আমার দশাটা কি হবে ভাবো তো !"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে করুণার গলা জড়িয়ে বললে, "কি ভাবছিলি, বলবি না ?"

"তেমন কিছু ভাবছিলাম না। শোনবার চেষ্টা করছিলাম···"

"উর্বশীর মেয়েটা বেশ বীণা বাজায় আজকাল।···বাজাচ্ছে নাকি কোথাও বসে ?"

"না।"

"তবে কি শোনবার চেষ্টা করছিলি ? আসবার সময় দেখলাম, মেনকা দেবী কি একটা সুর সাধছেন। এতদূর থেকে তা তো শোনা যাবে না !"

"না, ওসব কিছু নয়।"

"তবে ?"

"নূতন ধরনের কিছু একটা। ঠিক জানি না আমি।"

"অদ্ভুত মেয়ে তুই। চল্, মন্দার গাছে একটা দোল্না টাঙিয়ে এসেছি, দুল্বি চল্। নূতন ধরনের কিছুর জন্যে এমন ক'রে কান পেতে রাখলে তা শোনা যাবে না। যখন শোনবার তখন আপনি শুনবি। চল্, এখন দোলা যাক্ !"

অবশেষে একদিন শোনা গেল। কান্নার শব্দ ! তীক্ষ্ণ তীব্র মর্মভেদী কান্নার শব্দ ! করুণা বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলো। তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। কান পেতে শুনলে খানিকক্ষণ। না, এরকম সে আগে কখনও শোনে নি। কিন্তু কি অদ্ভুত শব্দ ! বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে-মুচড়ে উঠতে লাগলো তার। মনে হতে লাগলো, যেন একটা অদৃশ্য ছুঁচ তার কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে, মাথা ভেদ ক'রে অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। মনে হতে লাগলো, সে আর সহ্য করতে পারছে না। দু'কানে আঙুল দিয়ে বসে রইলো সে। কিন্তু তবু শোনা যেতে লাগলো। কিসের শব্দ এ ? এ শব্দ বেশীক্ষণ শুনলে পাগল হয়ে যাবে সে। ছুটে ঘর থেকে সে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়েই দেখা হলো বিজলীর সঙ্গে।

"তুই শুনতে পাচ্ছিস ?"

"কি ?"

"একটা অদ্ভুত শব্দ ! পাচ্ছিস না ? এত জোরে-জোরে হচ্ছে তবু পাচ্ছিস না ? ওই যে, ওই যে···"

বিজলী অবাক্ হ'য়ে করুণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। করুণার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন হ'য়ে গেছে।

"পাচ্ছিস না ?"

"না।"

"শোন্, ভালো ক'রে শোন্।···ওই যে, ওই যে। উঃ, কি করি আমি···"

আবার ছুটে চলে গেল সে। স্বর্গের পথে ফুলের পরাগ, সোনার রেণু ছড়ানো। তারই উপর দিয়ে পাগলিনীর মতো ছুটে চললো করুণা। মহাশূন্য ভেদ ক'রে পৃথিবীর যে কান্না এসে তার মর্মভেদ করছিল, সে কান্নার তীব্রতা অস্থির ক'রে তুললে তাকে। তার মনে হতে লাগলো, এই রোদনের শব্দ যদি বন্ধ না করতে পারে তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে।

দেব-দেবীরা নন্দনকাননে বেড়াচ্ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করতে লাগলো—"শুনতে পাচ্ছো না, শুনতে পাচ্ছো না তোমরা?"

"কি? পাখির গান?"

"না, না…"

"তবে, তরুর মর্মর?"

"না, ওই যে…ওই যে! থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওটাকে আমি আর শুনতে পাচ্ছি না…"

ছুটতে-ছুটতে আবার চলে গেল সে।

অবাক্ হয়ে গেলেন দেব-দেবীরা।

পারিজাতের কুঞ্জে গিয়ে পারিজাতকে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি শুনতে পাচ্ছো না?"

পারিজাত কোনও উত্তর দিলে না, তার পাতাগুলি হাওয়ায় দুলতে লাগলো কেবল, করুণার মনে হ'লো, তারা যেন বলছে—"না, কিছু শুনতে পাচ্ছি না।"

রাগে ক্ষোভে পারিজাতের কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন ক'রে চলে গেল করুণা।

শেষে সত্যিই পাগল হয়ে গেল সে। দেবকন্যা পাগল হ'য়ে যাওয়াতে দেব-দেবীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইন্দ্র বললেন, "করুণা হবে বরুণের মানস-কন্যা। বরুণ ফিরে না-আসা পর্যন্ত ওকে একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হোক। তারপর বরুণ ফিরে এসে যা ভালো বিবেচনা করবেন তাই করা হবে।"

করুণা বন্দিনী হ'য়ে রইলো একটি নির্জন ঘরে।

কান্নার শব্দ কিন্তু একটুও কমেনি। বরং উত্তরোত্তর তা যেন বেড়েই চলেছিল। করুণা পাগল হয়ে গিয়েছিল সত্যি। সত্যি সে দেয়ালে মাথা খুঁড়ছিল, মাথার চুল ছিঁড়ছিল, কানে আঙুল দিয়ে চীৎকার করছিল—'থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও ওই কান্না! আমি আর শুনতে পাচ্ছি না…পাচ্ছি না!"

কান্না কিন্তু থামছিল না। দগ্ধ পৃথিবীর অন্তরের বাণী কান্নার রূপ ধরে বিরাট আকাশ পার হ'য়ে স্বর্গে এসে পৌঁছোচ্ছিলো। তপস্যা অহরহ চলছিল। কান্নার শব্দ তাই থামছিল না। করুণার চীৎকার থামছিল না। সে ক্রমাগত চীৎকার করছিল—থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও, আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।

দেব-দেবীরা কেউ করুণার ঘরের দিকে যেতেন না। পাগলিনীর হাহাকার সহ্য করতে পারতেন না তাঁরা। করুণার হাহাকার স্বর্গের সৌন্দর্যকে ম্লান ক'রে দিয়েছিল। একজন কিন্তু রোজই তার খবর নিতে যেতো : সে হচ্ছে—বিজলী। বদ্ধঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রোজই সে এসে প্রশ্ন করতো—"কেমন আছিস ভাই ?"

"আমি ওই শব্দ কিছুতেই আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। স্বর্গের দেবতারা প্রত্যেকেই শুনেছি শক্তিশালী। তাঁরা কেউ এই শব্দ বন্ধ করতে পারছেন না ? এর প্রতিকার করতেই হবে, করতেই হবে, যেমন ক'রে হোক্ করতেই হবে।"

"পারলে তুই নিজেই পারবি, আর কেউ পারবে না ! দেবতাদের দৌড় কতদূর তা জানা আছে।"

বিজলীর চোখে-মুখে হাসি ঝিকমিক ক'রে উঠতো।

তারপর একদিন অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো একটা। করুণার চীৎকার থেমে গেল। বিজলী এসে দেখলে, তার ঘরের জানলা বন্ধ। করুণার নাম ধরে ডাকলে কয়েকবার, কোন সাড়া এলো না। কি হলো ? স্বর্গে মৃত্যু নেই। করুণা যে মরে গেছে এ-কথা বিজলী ভাবতেই পারলে না। দ্বারে করাঘাত ক'রে বারবার সে ডাকতে লাগলো। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বিজলী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে। তারপর আবার ডাকতে লাগলো। কোন ফল হলো না। বিজলী ছাড়বার পাত্রী নয়, ক্রমাগত ডাকতে লাগলো সে। বহুবার ডেকেও যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তার ভয় হলো। সে ছুটে গিয়ে খবর দিলে সকলকে। ইন্দ্রের আদেশে ঘরের কপাট ভেঙে ফেলা হলো। তারপর যা দেখা গেল তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অপ্রত্যাশিত। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। সমস্ত ঘর তুষারশুভ্র-বাষ্পে পরিপূর্ণ, আর কিছু নেই—করুণা নেই। ঘরের কপাট খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই তুষারশুভ্র বাষ্প ধীরে ধীরে বেরুতে লাগলো। দেব-দেবীরা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে ঘর খালি হয়ে গেল। সবাই ঘরে ঢুকে দেখলেন, করুণা নেই। তারপর দেখলেন, সেই তুষারশুভ্র বাষ্পরাশি আকাশে ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে নামছে ক্রমশ। তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন না করুণাই মেঘ হ'য়ে পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছে।

হাজার হাজার বছর কেটে গেছে তারপর। উত্তপ্ত পৃথিবী শান্ত হয়েছে বিগলিত মেঘের শীতল স্পর্শ লাভ ক'রে। মেঘ—জল হ'য়ে নেমেছে পৃথিবীর বুকে, পৃথিবীর বুকের উত্তাপ আবার তাকে মেঘে পরিণত করেছে। আবার বর্ষাধারায় নেমেছে সে, হাজার হাজার বছর এইভাবে কেটেছে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। পৃথিবীকে ঘিরে জলের জগৎ সৃষ্টি হয়েছে একটা···সমুদ্র, নদী, ঝরনা, উৎস, কত কি হয়েছে। তারপর এসেছে উদ্ভিদ্-জগৎ। যে পৃথিবী উত্তপ্ত উষর ছিল, তার সর্বাঙ্গে শ্যামকান্তি জেগেছে।

যে বন্ধ্যা ছিল সে হয়েছে জননী। প্রাণীদের জন্ম হয়েছে তারপর। ছোট-ছোট

জীবজন্তু থেকে শুরু ক'রে বড়-বড় জীবজন্তু জন্মেছে। অনেক পরে এসেছে দানব, তারপর মানব। আরও কত কি হয়েছে। দানবদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছে। মানুষ সহায়তা করেছে দেবতাদের। বৃত্রাসুরকে বধ করবার জন্য মহামানব দধীচি নিজের অস্থি দিয়েছেন বজ্র নির্মাণের জন্য। ইতিহাসের পর ইতিহাস রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু করুণা যদি মেঘরূপে এসে উত্তপ্ত পৃথিবীর উপর বারিবর্ষণ না করতো এসব কিছুই হতো না।

পিতা বরুণ কিন্তু কন্যা করুণাকে ভোলেন নি।

বিরাট সমুদ্রের বুকে সেদিন বর্ষার ধারা নেমেছে আকাশ থেকে। সমুদ্রের অধিপতি বরুণ, বর্ষাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"কন্যা, তুমি পৃথিবীর কান্না শুনে মেঘ হয়েছিলে বলে সমুদ্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে, আর আমি তাই সমুদ্রের আধিপত্য লাভ ক'রে নির্বিঘ্নে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। তোমাকে ভুলিনি আমি, তোমাকে আমি নিত্য আশীর্বাদ করি। সূর্যের উত্তাপ যখন আমার সর্বাঙ্গে পড়ে তখন আমি আবার তোমাকে সৃষ্টি করি নব রূপে। তোমাকে আমি ভুলিনি…"

ঝরঝর শব্দে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের ঘনঘটায় আকাশ পরিপূর্ণ।

"আমরাও ভুলিনি তোমাকে। এই দেখ, আমার স্বামীটি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। অনেকদিন আগে ঠিক এই স্বপ্নই দেখেছিলাম, মনে নেই?" ··বিজলী চকমক ক'রে উঠলো! বজ্রের গর্জন শোনা গেল! বজ্রের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হয়েছিল। করুণা কোন উত্তর দিলেন না। অসংখ্য বৃষ্টিধারায় সে কেবল নিজেকে বিলিয়ে দিতে লাগলো।

হৃদয়েশ্বর মুখুজ্যে

গৌরবগঞ্জের জমিদার হৃদয়েশ্বর মুখুজ্যে ওরফে রিতুবাবু, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর চেহারাও ছিল অনন্যসাধারণ। প্রকাণ্ড ভারী মুখ, একমাথা কোঁকড়ানো বাবরি চুল, বিরাট গোঁফ, জমকালো জুলফি। চোখ দুটি বড়-বড় লাল-লাল। নাকটা খাঁড়ার মতো। শরীর যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। রিতুবাবুকে সবাই ভয় করতো, আবার ভালোও বাসতো।

আমার সঙ্গে তাঁর দুবার মাত্র দেখা হয়েছিল। প্রথমবার দেখা হয় তাঁর বাড়িতে। আমি তখন সবে ডাক্তারি পাস ক'রে বেরিয়েছি—কোথায় বসবো ঠিক করতে পারিনি তখনও, পয়সার জোর ছিল না তেমন, একটা চাকরির চেষ্টা করছিলাম; এমন সময় রিতুবাবু হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। রিতুবাবুর নামটা শোনা ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখিনি কখনও আমি। বাবার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তাঁর জমিদারিতে কিছু জমিও ছিল আমাদের। যৌবনকালে, আমাদের জন্মের পূর্বে, বাবা গৌরবগঞ্জে বাসও·

করেছিলেন। তারপর চাকরি নিয়ে তিনি কোলকাতায় চলে আসেন। সেই থেকে কোলকাতাতেই আছি আমরা, আর গৌরবগঞ্জে যাওয়া হয়নি।

হঠাৎ রিতুবাবুর চিঠি এসে হাজির হলো। বাবাকেই লিখেছিলেন তিনি—'শুনলাম, তোমার ছেলে এবার ডাক্তারি পাস করেছে। তাকে যদি আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও, খুবই খুশি হবো। আমার একটা অসুখ হয়েছে, তাকে দেখাতে চাই। কবে আসবে, আগে থাকতে একটু জানিও, স্টেশনে লোক রাখবো।'

আগে থাকতে খবর দিয়েই গিয়েছিলাম। স্টেশনে নেবে দেখি, হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। আমার জন্তে হাতী, ঘোড়া, পালকি, ডুলি, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, মোটরকার—সব রকম যান পাঠিয়েছেন রিতুবাবু। স্বয়ং নায়েবমশাই স্টেশনে এসেছেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। তাঁর সঙ্গে এসেছে, আসা-সোটাধারী বারোজন বরকন্দাজ। আমি তো অবাক্।

নায়েবমশাইকে বললাম, "এত সব কাণ্ড কেন! একটা যে-কোনও গাড়ি পাঠিয়ে দিলেই হতো। না পাঠালেও ক্ষতি ছিল না, কতটুকুই-বা পথ।"

নায়েবমশাই মাথা চুলকে বললেন, "হুজুর বললেন, ডাক্তারবাবুর কিসে সুবিধে হবে তা তো জানা নেই, আমাদের যা আছে সবই নিয়ে যাও তুমি"—তারপর একটু হেসে বললেন, "পরিচয় হ'লে বুঝতে পারবেন, ওঁর স্বভাবই এই রকম।"

—"ওঁর কি অসুখ করেছে?"

—"অসুখ? অসুখের কথা শুনিনি তো!"

—"অসুখের জন্তই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

—"তা হবে। আমি কিছু জানি না।"

শাল-প্রাংশু মহাভুজ রিতুবাবুকে দেখে আমারও মনে হলো না যে, তিনি অসুস্থ। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বললেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল একদিন। এখানে যখন ছিল, একসঙ্গে মাছ ধরতাম দু'জনে। তোমার বাবা হয়তো সে-সব কথা ভুলে গেছে, আমি কিন্তু ভুলিনি। আমাদের গোমস্তা রমেনের মুখে শুনলাম, তুমি ডাক্তারি পাস করেছো, খুব আনন্দ হলো শুনে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি অসুখ করেছে?"

—"ফুসকুড়ি বেরিয়েছে একটা পিঠের উপর। এরকম ফুসকুড়ি প্রায়ই হয় আমার। দেখ দিকি, এর যদি কোনও একটা ব্যবস্থা করতে পারো।"

ফুসকুড়িটি দেখলাম। অতি ছোট ঘামাচির মতো, বিশেষ কিছু নয়। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাকে কোলকাতা থেকে ডেকে আনিয়েছেন ভেবে শুধু যে অবাক্ হলাম তা নয়, মনে-মনে একটু অপমানিতও হলাম। তারপর হঠাৎ সন্দেহ হলো, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ নয় তো! স্টেশনে একজন লোককে আনতে অত রকম যানবাহন যিনি পাঠাতে পারেন ··

রিতুবাবু বলে উঠলেন, "থাক্, ফুসকুড়ির কথা পরে চিন্তা কোরো। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রে নাও আগে। নায়েবমশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কাল সকালে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। ক'টার সময় ওঠো তুমি ?"

—"আমার খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস।"

—"বেশ ভালোই তো। কটার সময় ওঠো।"

—"ভোর তিনটেয় আমার ঘুম ভেঙে যায়।"

—"আমি উঠি সাড়ে-পাঁচটায়। ঘুমটা কিছুতেই কমাতে পারছি না। তোমাদের ডাক্তারি-শাস্ত্রে যদি এরও কোনো ওষুধ থাকে, দিও। আচ্ছা, আমি উঠি এখন। সকাল ছ'টা নাগাদ আবার দেখা হবে।"

রিতুবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই নায়েবমশাই হাজির হলেন এসে।

—"রাত্রে কি খাবেন, ডাক্তারবাবু ?"

—"যা আছে, তাই খাবো।"

—"সব রকমই আছে। যা হুকুম করবেন, তাই এনে দেবো।"

—"সব রকম মানে ?"

—"কয়েক রকম ভালো চালের ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, সব রকম ডাল, রুটি, লুচি, পরোটা, ডালপুরী, রাধা-বল্লভী, কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, চার-পাঁচ রকমের মাংস, চার-পাঁচ রকম মাছ, তরি-তরকারি সব রকম, এ ছাড়া দই, ক্ষীর, পায়েস, মিষ্টান্ন, মোরব্বা, চাটনি, এসব তো আছেই—"

—"বলেন কি ! সব আমার জন্যে করিয়েছেন ?"

—"এসব রান্না রোজ হয়।"

—"এত রকম ?"

—"হ্যাঁ, মায় সাবু, বার্লি, হর্লিক্স, ওভালটিন পর্যন্ত।"

—"রিতুবাবু খুব খাইয়ে লোক বুঝি ?"

—"মোটেই না। নিজে খুব সামান্যই খান। কিন্তু কি খাবেন তা আগে থাকতে বলবেন না কিছুতেই। তাই সব রকম তৈরি রাখতে হয়। কোনও জিনিসটা চেয়ে না পেলে কুরুক্ষেত্র করেন।"

—"বলেন কি ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই রান্নার ব্যাপারের জন্যেই জন-কুড়ি রাঁধুনি, আর গোটা-পঞ্চাশেক চাকর রাখতে হয়েছে।"

—"এরকম করবার মানে কি ?"

—"খেয়াল ! সে যাই হোক, আজ রাত্রে আপনি কি খাবেন বলুন।"

—"খানকয়েক লুচি, আর যা হোক দু'একটা তরিতরকারি পাঠিয়ে দেবেন।"

—"মাছ মাংস দুই-ই দেবো তো ?"

—"দেবেন।"

—"মিষ্টান্ন?"

—"আপনার যা খুশি দেবেন মশাই, যা পারবো খাবো।"

—"বেশ। চা খাবেন ক'টায়? হুজুর বলে দিলেন, আপনি তিনটের সময় ওঠেন, আপনাকে ঠিক সময়ে যেন চা দেওয়া হয়। সাড়ে-তিনটেয় দেবো।"

—"কি দরকার অত কষ্ট করে।"

—"কষ্ট আবার কি! দুটো ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে দিলেই হবে। একটা ঘড়ি যজ্ঞেশ্বর গোয়ালার কাছে থাকবে, আর একটা থাকবে হীরু খানসামার কাছে।"

—"গোয়ালার কাছে কেন?"

—"সে আড়াইটের সময় উঠে দুধ দুয়ে আনবে। টাটকা দুধ না হ'লে কি চা ভালো হয়? লিপটনের দার্জিলিং চা আছে, অন্য চা-ও আছে, কোন্‌টা—"

—"কেন অত হাঙ্গামা করছেন। যা আপনার সুবিধে হবে, তাই দেবেন।"

—"অত হাঙ্গামা না করলে আমার চাকরি থাকবে না। হুজুর যদি শোনেন যে আপনি উঠেই চা পাননি, তাহ'লে ভীষণ কাণ্ড হবে। সাড়ে-তিনটেয় চা পাঠিয়ে দেবো তাহ'লে।"

—"বেশ, তাই দেবেন।"

—"পাশের ঘরটাই স্নানের।"

—"ভালোই হয়েছে। ভোরে উঠেই আমার স্নান করা অভ্যেস।"

—"ও, তাহ'লে তো সে ব্যবস্থাও ক'রে রাখতে হয়—।"

নায়েবমশাই ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এসে বললেন, "পাশের ঘরে স্নানের এবং মুখ ধোয়ার সব ব্যবস্থা রইলো।"

—"আচ্ছা।"

বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

ঠিক ভোর তিনটেতেই ঘুম ভাঙলো আমার। বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটি চাকর বসে আছে। আমাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে নমস্কার করলো, তারপর বললো, "এখনই স্নান করবেন কি? গরম জল তৈরি আছে, আনবো?"

—"নিয়ে এসো।"

স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি, সেখানেও এলাহি কাণ্ড। দাঁত মাজবার জন্যে কয়েকরকম দেশী-বিলাতী মাজন, টুথ-পেস্ট, টুথ-ব্রাশ, এমন কি, দাঁতন পর্যন্ত মজুত রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নানারকম তেল, সাবান, তোয়ালে, গামছা, এমন কি, স্নো, পাউডার, আতর-এসেন্স পর্যন্ত।

স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি, হীরু খানসামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেলাম ক'রে বললে, "চা তৈরি হুজুর।"

হাত-ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, ঠিক সাড়ে-তিনটে বেজেছে।

ঠিক ছ'টার সময় রিতুবাবু এলেন।

তাঁর পিঠের ফুসকুড়িটা আর একবার দেখলাম ভালো ক'রে। সত্যিই বিশেষ কিছু নয়। আমার ব্যাগেই একটা মলম ছিল, লাগিয়ে দিলাম সেটা

রিতুবাবু বললেন, "মাছ ধরতে ভালোবাসো তুমি ?"

—"কখনও ধরিনি।"

—"মাছ ধরা দেখবে ?"

—"তা দেখতে পারি।"

—"তাহ'লে বেড়াজালের ব্যবস্থা করতে হয়।"

রিতুবাবু তাঁর জলকরের নায়েবকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি আসতেই বললেন, "জেলেদের খবর দাও। সাগরবিলে জাল ফেলুক তারা, বিকাশকে নিয়ে আমি যাচ্ছি একটু পরে।"

সাগরবিল থেকে দশমণ মাছ উঠলো। বড় বড় রুই-কাৎলা। জল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছিল তারা। এত বড় বড় জীবন্ত মাছ আমি জীবনে কখনও দেখিনি। দেখবার মত দৃশ্য বটে! আমি শহুরে-লোক, কোলকাতার গলিতে বাস করি, দৈনিক একপোয়া মাছ কেনা হয় আমাদের বাড়িতে, একটা কথা বারবার মনে হতে লাগলো আমার—দশমণ মাছ ধরবার কি দরকার ছিল। একি অপচয়! বাড়িতে একটিমাত্র মাছ গেল, বাকী সব মাছ বিলিয়ে দেওয়া হলো!

গৌরবগঞ্জে পাঁচ দিন ছিলাম। এই পাঁচ দিনের প্রতি মুহূর্তে একটি কথাই আমার কেবল মনে হয়েছে—ভদ্রলোক বড় বেশী অপব্যয় করেন। নায়েবমশাইয়ের মুখে শুনলাম, হুজুরের একজোড়া কাপড়ের দরকার হলে বিশজোড়া কাপড় আনাতে হয়। পাঞ্জাবি, কামিজ, গেঞ্জি, সমস্তই ডজন-ডজন করানো চাই, নানারকম ছিটের। এ-বছরের শাল ও-বছরে গায়ে দেন না। নিজে যে খুব বেশী ব্যবহার করেন তা নয়, কিন্তু কেনা চাই সব রকম। ওই ওঁর শখ। একটিমাত্র ছেলে, বিলেতে লেখাপড়া করে। স্ত্রী মারা গেছেন বহুদিন আগে।

শেষকালে নায়েবমশাই হেসে বললেন, 'বড়লোকের একটা নেশা তো চাই। ওই ওঁর নেশা। অপব্যয়ের নেশায় মশগুল হয়ে থাকেন।"

আমি যেদিন চলে আসি, সেদিন রিতুবাবুকে বলেছিলাম, "যদি রাগ না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।"

—"কি বলো।"

—"এত অপচয় কেন করেন আপনি।"

—"অপচয়! অপচয় কোথায় দেখলে তুমি ?"

—"রোজ এত রকম খাবার করবার দরকার কি ? খান তো সামান্য একটু ।"

—"বাকীটা আর পাঁচজনে খায় ।"

—"ওদের খাওয়াবার জন্তে অন্নসত্র খুললেই হয় ।"

—"সেখানে কি এমন খাবার তৈরি হবে ? আমার জন্তে তৈরি হয় বলেই যত্ন ক'রে তৈরি করে সবাই ।"

আমি চুপ ক'রে রইলাম ।

জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো রিদুবাবুর চোখ দুটো ।

বললেন, "তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি এটা জানো যে, পৃথিবীতে কিছুই নষ্ট হয় না ? তুমি হিন্দুর ছেলে, একথাটা শোনোনি যে, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে ! আমি হিন্দু । গৃহস্থ পাঁচজনকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করাই যে আমার কর্তব্য ।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি । খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে রিদুবাবু হেসে বললেন, "দেখ, বলিষ্ঠপ্রাণের বিকাশই প্রাচুর্যে । ওই বটগাছটার দিকে চেয়ে দেখ, সহস্র-সহস্র পাতা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোটি কোটি বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে, শত শত পাখিকে আশ্রয় দিচ্ছে, পথিককে ছায়া দিচ্ছে । এসব না করলেও ওর চলতো, কিন্তু তাহ'লে ও বটগাছ হতো না—"

আমি চুপ ক'রে রইলাম ।

কোলকাতায় ফিরে আসবার দিন-সাতেক পরে রিদুবাবুর চিঠি পেয়েছিলাম একটা । চিঠিখানা এখনও আছে আমার কাছে । লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

আশা করি নিরাপদে পৌঁছিয়াছ । যদিও তুমি আমার ছেলের মতো, তবু তুমি ডাক্তার, তোমাকে 'ফি' না দিলে অন্যায় হইবে । তাই সামান্য কিছু পাঠাইলাম । দ্বিধা করিও না, ইহা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য । তোমার বাবাকে আমার ভালোবাসা দিবে, তুমি আশীর্বাদ জানিবে । ইতি—

শুভার্থী

শ্রীহৃদয়েশ্বর মুখোপাধ্যায়

চিঠির সঙ্গে একটি পাঁচ হাজার টাকার 'চেক' ছিল ।

রিদুবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয় কুড়ি বছর পরে কাশীতে । তখন শীতকাল । বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে বেরুচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়লো, চাতালের একধারে একটি ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ বসে আছেন একজন । গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই । মুখটা চেনা-চেনা ঠেকলো, ক্ষীণভাবে মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি । একটু এগিয়ে গেলাম । বৃদ্ধও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন । তারপর হেসে বললেন, "কে, বিকাশ নাকি !"

হঠাৎ রিদুবাবুকে চিনতে পারলাম । এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম ।

—"একি, আপনি এমনভাবে এখানে !"

— 'আজকাল এখানেই থাকি।"

—"এখানেই ? কেন ?"

—"জীবনের শেষ আশ্রম যে, সন্ন্যাস।"

অবাক্ হ'য়ে গেলাম।

—"কোথায় বাসা আপনার ?"

— 'বাসা নেই। এই মন্দিরে পড়ে থাকি, ভিক্ষা ক'রে খাই।"

মঞ্জরী

যে-গল্পটি তোমাদের আজ বলতে যাচ্ছি, সেটি আমি স্বপ্নে শুনেছিলাম। ঠিক শুনিনি—দেখেছিলাম। চোখের সামনে ঘটনাগুলো পর-পর যেন ঘটে গেল।

…জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। পাহাড়ের উপত্যকাটি সাদা কাশফুলে ভরতি। মৃদু হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে সেই ফুলের সমুদ্রে। কুলকুল ক'রে একটি ঝরনা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ধাপে-ধাপে স্বর চড়িয়ে একটা 'চোখ গেল' পাখি ডাকছে কোথায় যেন। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসছে। চাঁদের একটু দূরে একটা ছোট কালো মেঘ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ধীরে-ধীরে, তার কালো রং-এ লেগেছে জ্যোৎস্নার ঢেউ। কালোই অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ কাশফুলের সাদা সমুদ্রেও ছোট একটি কালো মেঘ দেখা গেল. মনে হ'ল, আকাশের মেঘেরই ছোট্ট একটা টুকরো যেন নেমে এসেছে কাশের বনে। তারও চারপাশ ঘিরে জ্বলছে রুপোর জরি। আকাশের কালো মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল চাঁদের দিকে। হঠাৎ সে চাঁদটাকে ঢেকে ফেলল! চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। তখন কাশের বনে যে ছোট্ট মেঘটি দেখা যাচ্ছিল, সে কথা কয়ে উঠল।

"আকাশের কালো মেঘ. চাঁদকে অমন ক'রে আড়াল কোরো না। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

আকাশের কালো মেঘ বলল, "কে তুমি ?"

"আমি মানিনী রাজকন্যার সখী—মঞ্জরী। মেহেদিনগরে চলেছি—"

তখন বুঝতে পারলাম, কাশের বনে ছোট্ট মেঘের মতো যেটা দেখাচ্ছিল. সেটা মেঘ নয়—মঞ্জরীর খোঁপা।

আকাশের মেঘ জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে মেহেদিনগরে কেন ? সেখানকার লোকগুলো তো সুবিধে নয় !"

"জানি, তবু আমাকে যেতেই হবে। মানিনী রাজকন্যার শখ হয়েছে, তাঁর হাতের চম্পক-অঙ্গুলিতে মেহেদির রং লাগাবেন। তুমি চাঁদের সামনে থেকে সর, আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।"

মেঘ চাঁদের সামনে থেকে সরে গেল।

মঞ্জরী চলল কাশের বন ভেদ ক'রে। কাশের বন পার হয়ে এল পম্পা সরোবরে, অসংখ্য কুমুদ ফুল ফুটেছিল সেখানে। তারা সকলে ডাকাডাকি করতে লাগল মঞ্জরীকে।

"কোথায় চলেছ, মঞ্জরী ?"

"মেহেদিনগরে।"

"আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।"

"সবাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া কি চলে এখন ? আমি লুকিয়ে যাচ্ছি, চুপিসাড়ে মেহেদিবনে ঢুকে চারটি মেহেদি পাতা নিয়ে আসব মানিনীর জন্যে। দলবল নিয়ে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে !"

"তাহলে আমাকে খালি নিয়ে চল, আমি চুপটি ক'রে থাকব। নিয়ে চল আমাকে, মঞ্জরী—"

তীরের কাছটিতে যে কুমুদ-কলিটি ছিল, সে একেবারে নাছোড়বান্দা। মঞ্জরী হেঁট হ'য়ে শেষে তুলে নিল তাকে।

সে বলল, "মাথায় পর আমাকে।"

"ইস্! ভারি আবদার দেখছি যে, মাথায় চড়ে যাবেন !"

মঞ্জরী বলল বটে, কিন্তু খোঁপায় গুঁজে নিল তাকে। কুমুদ-কলি ভারি খুশি, দুলতে দুলতে চলল।

পম্পা সরোবরের পর প্রকাণ্ড মাঠ, সবুজ ঘাসে ঢাকা। রাত্রে কিন্তু সবুজকে দেখাচ্ছিল কালো, মনে হচ্ছিল কালো মখমল যেন। তার উপর ফুটেছিল অসংখ্য ছোট-ছোট সাদা ফুল। মনে হচ্ছিল, আকাশের তারারা লুকিয়ে যেন নেমে এসেছে তেপান্তরের মাঠে।

"কোথায় চলেছ, মঞ্জরী ?"

"মেহেদিনগরের মেহেদিকুঞ্জে।"

"এত রাত্রে একা সেখানে যেও না। জায়গা ভাল নয়।"

"একা যাচ্ছে না, আমি সঙ্গে আছি"—কুমুদ-কলি বলল খোঁপা থেকে মুখ বাড়িয়ে।

মঞ্জরী চলল। মাথার উপর পেঁচা ডাকল, বাদুড়ের সারি উড়ে গেল। টিট্টিভ বলে গেল—কি-যে করিস, কি-যে করিস, কি-যে করিস। মঞ্জরীর ভয় নেই, নির্ভয়ে এগিয়ে চলল সে। চলতে-চলতে চলতে-চলতে মেহেদিনগরের মেহেদির আভাস দেখতে পাওয়া গেল অবশেষে। মনে হ'ল দূরে আকাশের গায়ে লালচে রঙের একটা কুয়াশা জমে আছে।

কুমুদ-কলি জিজ্ঞেস করল, "ভোর হয়ে আসছে নাকি, আকাশের গায়ে ওটা কি ঊষার আলো ?"

"না, ওটা মেহেদিকুঞ্জের আভা। দিনের বেলা দেখা যায় না, গভীর পূর্ণিমা রাতে

চুপি-চুপি ওই আভা মেহেদিকুঞ্জ থেকে ফুটে বেরোয়। আমি কিন্তু আর চলতে পারছি না। এখনও অনেক দূর। একটু বিশ্রাম ক'রে নিই এইখানে—"

"সেই বেশ। ব'স একটু—"

ঘাসের ফুলরা সাদরে অভ্যর্থনা করল তাকে।

"একটু শুই ?"

"শোও না।"

ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জরী। ঘাসের ফুলেরা গুনগুনিয়ে গান গাইতে লাগল :

আকাশ থেকে আসছে নেমে
জ্যোৎস্না-মাখা ঘুমের ঢেউ,
মঞ্জরিণীর ঘুম পেয়েছে
গোল কোরো না তোমরা কেউ।

খানিকক্ষণ পরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল মঞ্জরী। ওমা কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে, রাত যে প্রায় শেষ হয়ে এল ! রাত্রের মধ্যে মেহেদিনগরে পৌঁছতে না পারলে মেহেদিপাতা আনাই যাবে না যে, সবাই জেগে উঠবে।

ঘাসের ফুলেদের দিকে চেয়ে মঞ্জরী বলল, "ছি, ছি, তোমাদের পাল্লায় পড়ে কত দেরি হয়ে গেল আমার! মেহেদিনগরে আজ বোধহয় পৌঁছতেই পারব না—"

"ঠিক পারবে, আমি তোমাকে পিঠে ক'রে পৌঁছে দেব—"

মঞ্জরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রকাণ্ড এক সারস পাখি লম্বা-লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এত বড় আর এমন ধপধপে সাদা সারস পাখি মঞ্জরী আর কখনও দেখেনি।

"তুমি কে ?"

"আমি মহাসারস। পথ চলতে-চলতে কোন ছোট মেয়ে যদি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, আমি তাকে পিঠে ক'রে বয়ে নিয়ে যাই। এস—"

মঞ্জরী চড়ে বসল তার পিঠে। দেখতে দেখতে মেহেদিনগরের মেহেদিকুঞ্জে এসে হাজির হল তারা।

মহাসারস বলল, 'আমি মেহেদিনগরে ঢুকব না। ওরা অভদ্র লোক। তুমি কাজ সেরে চট ক'রে চলে এস। আমি এই মাঠে ততক্ষণ একটু চ'রে নি···"

মঞ্জরী মেহেদিকুঞ্জে ঢুকে পড়ল।

"কে ?"

ভাঙা চেরা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল যে যেন ! মঞ্জরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কে, কে তুমি ?"

লম্বা ক্ষীণকান্তি একটা লোক বেরিয়ে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে। গালের হাড় উঁচু, লম্বা নাক, চোখ দুটো যেন ভাঁটার মতো জ্বলছে।

"কে তুমি?"

ভাঙা চেরা গলায় আবার সে জিজ্ঞেস করল।

"আমি মানিনী রাজকন্তার সখী মঞ্জরী।"

"কি চাও?"

"চারটি মেহেদিপাতা নিতে এসেছি।"

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

"পাতা না নিয়ে আমি যাব না।"

"বেরোও বলছি—" এগিয়ে এসে লোকটা মঞ্জরীর কান ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে তাকে বার করে দিল মেহেদিকুঞ্জ থেকে।

মঞ্জরী বলল, "তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়—মেয়েছেলের গায়ে হাত দাও!"

"যা, যা, তোর মতন মেয়েমানুষের মুখ যে জুতিয়ে ছিঁড়ে দিইনি, এই যথেষ্ট"—বলেই লোকটা আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুমুদ-কলি বলল, "এরা ভারী ছোটলোক তো! চল, এখানে থাকা আর ঠিক নয়।"

মঞ্জরী বলল, "দেখো, এর কি রকম প্রতিশোধ আমি নিই।"

মহাসারসের পিঠে চড়ে মঞ্জরী নিজের দেশে ফিরে এল।

...সাতদিন সাতরাত্রি মানিনীর মুখে অন্ন, চোখে নিদ্রা নেই। রাজকন্তা পণ করেছেন, মেহেদিনগরের ওই অসভ্য লোকটার যতক্ষণ না শাস্তি হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি জলগ্রহণ করবেন না, বিছানায় শোবেন না, গালে হাত দিয়ে গোসা-ঘরে বসে থাকবেন কেবল।

রাজা মহাবিপদে পড়লেন। মঞ্জরীর ডাক পড়ল রাজসভায়।

রাজা প্রশ্ন করলেন, "মঞ্জরী, যে-লোকটি তোমায় অপমান করেছিল, তার চেহারা কেমন?"

মঞ্জরী চেহারার হুবহু বর্ণনা দিল। রাজসভার লেখক সঙ্গে-সঙ্গে টুকে নিল সেটা।

মন্ত্রীমশায় বললেন, "তোমাকে যে অপমান করেছিল, তার প্রমাণ কি?"

"আমি বলছি, এই প্রমাণ।"

মন্ত্রী বললেন, "ও প্রমাণ যথেষ্ট নয়, কেবল তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না। সাক্ষী চাই। তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?"

"কেউ ছিল না। ও হ্যাঁ, ছিল, দাঁড়ান দেখি, সে বেঁচে আছে কিনা।" একছুটে বেরিয়ে গেল মঞ্জরী এবং একটা স্ফটিকের ফুলদানি হাতে ক্'রে ফিরে এল। ফুলদানিতে ছিল সেই কুমুদ-কলি। বেচারী নেতিয়ে পড়েছিল, কিন্তু বেঁচে ছিল তখনও।

মঞ্জরী বলল, "এও আমার সঙ্গে ছিল। কুমুদ-কলি, তুমি মন্ত্রীমশায়কে বল, কি কি শুনেছ আর কি-কি দেখেছ।"

কুমুদ-কলি অনেকবার থেমে-থেমে ক্ষীণকণ্ঠে সমস্ত কথা খুঁটিয়ে বলল।

মন্ত্রীমশায় তবু মাথা নাড়তে লাগলেন।

শেষে বললেন, "একটা শুকনো ফুলের কথায়—"

মন্ত্রীমশায়ের কথা শেষ হল না! শোঁ-শোঁ ক'রে ঝড়ের মতো হাওয়া উঠল একটা, তারপর ঝটপট ঝটপট পাখার শব্দ হ'ল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, রাজসভার জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে মহাসারসের প্রকাণ্ড লম্বা গলাটা ঢুকছে। গলাটা লম্বা হতে-হতে এগিয়ে এল মন্ত্রীমশায়ের কানের কাছ পর্যন্ত। মন্ত্রীমশায় একলাফে উঠে পড়লেন তাঁর আসন থেকে। সভায় সকলেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠল, এমন কি রাজা পর্যন্ত সিংহাসনে বসে থাকতে পারলেন না।

বজ্র-নির্ঘোষে মহাসারস বলল, "মঞ্জরী যা বলছে, কুমুদ-কলি যা বলছে, তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। আমার কথাতেও যদি মন্ত্রীমশায়ের বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি হাজার হাজার ফুল আর ঝিঁঝি পোকাদের এনে হাজির করব। তারাও সব দেখেছে এবং শুনেছে।"

রাজা বললেন, "আর সাক্ষীতে দরকার নেই, আমাদের বিশ্বাস হয়েছে।"

মন্ত্রীও বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছে—হয়েছে—ঢের হয়েছে।"

মহাসারস গলা টেনে নিল, আবার পাখার ঝটপটানি এবং শোঁ-শোঁ শোনা গেল। মহাসারস উড়ে গেল আকাশে।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন. "মন্ত্রীমশায়, মেহেদিনগরে রাজদূতের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে খবর দিন যে, তাঁরা ওই লোকটিকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা। যদি না থাকেন, আমরা স্বয়ং তাকে শাস্তি দেব।"

মঞ্জরী রাজকন্যার কাছে এই খবর নিয়ে যেতে তিনি আঙুরের শরবত এক ঢোঁক খেলেন। তারপর বললেন, "যতক্ষণ ও লোকটার সমুচিত শাস্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অন্নগ্রহণ করব না।"

পরদিন রাজদূত জবাব নিয়ে এল—মেহেদিনগরের রাজা উক্ত অশিষ্ট লোককে শাস্তি দিতে প্রস্তুত নন।

রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, যুদ্ধ ঘোষণা করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "এই সামান্য কারণে যুদ্ধ-ঘোষণা করাটা কি সমীচীন হবে?"

"কারণ মোটেই সামান্য নয়। মানিনীর মান রাখতে আমি সমস্ত রাজত্ব বিসর্জন দিতে পারি। অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করুন।"

এর পর কথা চলে না।

···তিন দিন ধ'রে ঘোর যুদ্ধ হল। কিন্তু যুদ্ধে মেহেদিনগরের দলই জিতল। রাজা এটা প্রত্যাশা করেন নি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি।

মন্ত্রী তখন বললেন, "মহারাজ, আপনি আপনার গুরুদেব শিবসুন্দরের কাছে যান। এমনি যুদ্ধ ক'রে ওদের কাবু করা যাবে না।"

...রাজা কুলগুরু শিবসুন্দরের কাছে গেলেন। তপস্বী শিবসুন্দরকে দেখলেই মনে হয়, যেন তিনি মূর্তিমান বিপত্তারণ। সমস্ত শুনে তিনি বললেন, "তোমার সৈন্যরা যে যুদ্ধে জিততে পারবে না, তা আমি জানতাম। চরিত্রবল না থাকলে কেউ যুদ্ধে জিততে পারে না। তোমার প্রত্যেকটি সৈন্য মিথ্যাবাদী, প্রত্যেকটি সৈন্য ঘুষখোর, এক কথায় প্রত্যেকটি সৈন্য অমানুষ, ওদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়।"

রাজা বললেন, "তাহলে উপায় ?"

"উপায় একটা আছে। আমার কাছে ভাল একখানি তরবারি আছে, কোনও সত্য বীর যদি সেখানি হাতে ক'রে যুদ্ধে যায়, তাকে কেউ হারাতে পারবে না, কেউ মারতে পারবে না। সে-ই একা যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে আসতে পারবে। তোমার রাজ্যে যদি সত্য বীর কেউ থাকে, তাকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে।"

"অধিকাংশ বীরই তো যুদ্ধে মারা গেছে।"

"তারা বীর ছিল না—তাই মারা গেছে, আপদ গেছে। যারা আছে, তাদের মধ্যেই বেছে পাঠাও কাউকে।"

"আচ্ছা।"

রাজা চলে গেলেন।

তারপর শিবসুন্দরের আশ্রমে একে একে আসতে লাগলেন বীরেরা। ইয়া ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা, ইয়া গোঁফ, ইয়া দাড়ি, ইয়া বুকের ছাতি—কিন্তু হায়! সবাইকে ফিরে যেতে হল একে একে। শিবসুন্দরের তরবারিকে কেউ তুলতে পর্যন্ত পারল না! বড় বড় সেনাপতি, বড় বড় সর্দার, মাথা হেঁট ক'রে ফিরে গেলেন সবাই। খবর রটে গেল, শিবসুন্দরের তলোয়ার তুলতে পারে, এমন লোক রাজার রাজ্যে নেই।

মঞ্জরী তখন ছুটে চলে তার কিশোর বন্ধু অনিরুদ্ধের কাছে।

"তুমি যাও শিবসুন্দরের কাছে।"

অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে বলল, "অত বড় বড় বীরেরা যেখানে পালিয়ে এল, সেখানে আমি—"

"আর তো কেউ নেই, তুমিই যাও।"

মঞ্জরীর অনুরোধ উপেক্ষা করা অনিরুদ্ধের পক্ষে শক্ত। গেল সে শিবসুন্দরের আশ্রমে।

শিবসুন্দর তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি মিছে কথা বলেছ কখনও ?

"না।"

"চুরি করেছ ?"

"না।"

"তাহলে তুমি পারবে।"

যা বড় বড় বীরেরা পারেনি, কিশোর অনিরুদ্ধ তাই পারল! তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

তার পর আর দেরি হ'ল না। তপস্বী শিবসুন্দরের কথাই বর্ণে বর্ণে ফলে গেল।

তার পরদিনই অনিরুদ্ধ সেই অসভ্য লোকটার চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে এনে হাজির করল রাজসভায়।

"মহারাজ, এইবার এর বিচার করুন।"

রাজা বললেন, "এর বিচার করবে মঞ্জরী।"

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন, মঞ্জরী গিয়ে বসল সেখানে।

মঞ্জরী বলল, "কান মল, নাক মল।"

লোকটা তাই করল।

তারপর মঞ্জরী বলল, "রাজকুমারী মানিনী, তাঁর সমস্ত সখীরা এবং আমাদের রাজ্যের কিশোরী মেয়েরা হাতে আর পায়ে মেহেদি রং লাগাবে। তার জন্যে যত মেহেদিপাতা লাগবে, তা তোমাকে এনে দিতে হবে, আর নিজের হাতে বেটে দিতে হবে।"

লোকটাকে রাজী হ'তে হ'ল!

মায়া-কানন

তাম্রপুরীর রাজপুত্রের মনে সুখ নেই। তাঁর কেবলই মনে হয়—কি হবে রাজ্য-ঐশ্বর্য নিয়ে, যদি মায়ের দুঃখই না ঘোচাতে পারলাম। মায়ের চোখে ঘুম নেই, মুখে অন্ন নেই, তিনি দিবারাত্রি কেবল কাঁদেন। রাজপুত্র ছেলেবেলা থেকেই এই দৃশ্য দেখছেন, মায়ের হাসিমুখ মনে পড়ে না তাঁর। বাবার চেহারা মনেই নেই। রাজপুত্র যখন শিশু, তখনই তিনি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। তাঁর সৈন্য-সামন্ত্রী, অনুচর-পরিচর, সামন্ত-সেনাপতি, হাতী-ঘোড়া, রথ-রথী কেউ ফেরেনি। তারপর থেকেই রাজ্যে অন্ধকার নেমেছে। অনেকদিন প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে রানী-মা শেষে শয্যা নিয়েছেন।

রাজপুত্র যতদিন ছোট ছিলেন, মন্ত্রীমশায় রাজ্য চালাতেন। রাজপুত্র বড় হ'তেই তিনি রাজাভার তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "রাজপুত্র, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তোমার রাজ্য এবার তুমি বুঝে নাও, আমি বানপ্রস্থে যেতে চাই।"

রাজপুত্র বললেন, 'মন্ত্রীমশায়, আমার বাবা কোথায়?"

'তা'তো জানি না। তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন আর ফেরেন নি, মনে হয় আর ফিরবেন না, তুমিই সিংহাসনে বসে প্রজাপালন কর।"

"—কোন্ দিকে গিয়েছিলেন তিনি, জানেন ?"

"তিনি রজতপুরী জয় করতে গিয়েছিলেন।"

"কোন্ দিকে সে রজতপুরী ?"

"তা জানি না।"

"বাবা যখন ফিরলেন না তখন তাঁকে খেঁাজবার জন্য লোক পাঠান নি ?"

"পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ফল হয়নি। কারণ মহারাজ চ'লে যাবার ঠিক পরেই ভীষণ বর্ষা নামে। বহুদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর যখন বর্ষা থামল, তখন দেখা গেল আমাদের রাজ্যের চারিপাশে সমুদ্র হ'য়ে গেছে। যে সমুদ্র এখন তাম্রপুরীকে ঘিরে আছে, আগে তা ছিল না।"

"তাই না কি !"

"হ্যাঁ। মহারাজের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা ক'রে আমরা আমাদের ময়ূরপঙ্খী নৌকো-গুলি সব একে একে পাঠালাম তাঁকে খোঁজবার জন্য, কিন্তু একটিও ফিরল না।"

মন্ত্রীমশায় চুপ ক'রে রইলেন।

রাজপুত্র বললেন, "কি উপায় হবে তাহলে মন্ত্রীমশায় ? বাবাকে খোঁজবার কোনও চেষ্টাই কি তাহলে আমরা করব না ?"

"কি ক'রে যে করবে, তা তো বুঝতে পারছি না। আমি এতকাল ওই কথাই ভেবেছি কেবল। কিছুই ঠিক করতে পারিনি। ভেবে ভেবে মাথার চুল পেকে গেল, বুড়ো হ'য়ে গেলাম, এখন তো কোনও বুদ্ধিই আমার মাথায় আর খেলে না। আমাদের রাজ্যে আর নৌকো নেই, নৌকো তৈরি করবার লোকও নেই। সকলেই মহারাজের দিগ্বিজয় বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, কেউ ফেরেনি। অথচ নৌকো না হ'লে ওই দুস্তর সাগর পার হওয়ার তো কোন উপায় দেখি না—"

আবার চুপ করলেন মন্ত্রীমশায়।

তারপর বললেন, "আমাকে এবার বিদায় দাও রাজকুমার। আমি অসমর্থ হয়েছি, তোমার রাজ্যের ভার তুমি নাও। আমি বানপ্রস্থে গিয়ে বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাতে যদি কোনও ফল হয়—"

মন্ত্রীমশায় চলে গেলেন।

পরদিন তাম্রপুরীর রাজকুমার তামার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তাম্রপুরীর ঘরবাড়ি, পথঘাট আসবাবপত্র সবই তামার।

রাজপুত্র সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়েছিলেন। সূর্যোদয় হচ্ছিল। উদীয়মান সূর্যের লাল আলোয় সমস্ত তাম্রপুরী জ্বলজ্বল করছিল। মনে হচ্ছিল তাম্রপুরীর অন্তরের আক্ষেপ বুঝি মূর্ত হয়েছে রৌদ্রালোকিত তাম্রবর্ণের রক্তিম আভায়। রাজপুত্রের মনে পড়ল মায়ের চোখ দুটো। কেঁদে কেঁদে ঠিক এই রকমই লাল হয়েছে তারা।

রাজপুত্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

সমুদ্র দিগন্তবিস্তৃত।

"বন্ধু—"

রাজপুত্র ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন শ্রীধর দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজবাগানের মালী ভূধরের ছেলে শ্রীধর। ভূধরও মহারাজের সঙ্গে দিগ্বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিল। সে-ও ফেরেনি। শ্রীধর রাজপুত্রের দুঃখ বুঝত, তাই দু'জনে বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব।

রাজপুত্র বললেন, "কি বলছ বন্ধু ?"

"একটা কথা মনে আছে তোমার ? তুমি বলেছিলে, তুমি যখন রাজা হবে তখন আবার বাগান তৈরি করবে। এইবার তো রাজা হয়েছ, এস এইবার দু'জনে মিলে বাগান তৈরি করি। বাগানের কি দুর্দশা হয়েছে! সমস্ত গাছ শুকিয়ে গেছে, একটি ফুল ফোটে না—"

রাজপুত্র নীরবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজপুত্রের চোখের দিকে চেয়ে শ্রীধর বললে, "বন্ধু, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি, কারণ তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ সমান। কিন্তু আজ আমার মনে হ'ল এমন ভাবে দিনের পর দিন চুপচাপ ব'সে ব'সে দুঃখ ক'রে লাভ কি! তাঁর চেয়ে কিছু কাজ করা ভাল। তাতে দুঃখ খানিকটা কমবে বোধ হয়। তুমিও বাগান ভালবাস, আমিও বাগান ভালবাসি, এস দু'জনে মিলে ভাল বাগান করি একটা।..."

ম্লান হেসে রাজপুত্র বললেন, "বেশ, তাই হোক।"

কিছুদিনের মধ্যে দেখতে দেখতে রাজপুত্রের বাগান তৈরি হ'য়ে উঠল। সে বাগানে কত রকম যে ফুল ফুটল, কত রকম যে ফল ধরল তার আর ইয়ত্তা নেই। সাগরপার থেকে নানারকম পাখি উড়ে উড়ে এসে বসতে লাগল গাছের ডালে ডালে। রাজপুত্র খুশি হলেন। মাকে গিয়ে একদিন বললেন, "মা, শুনেছি বাবা দোলন-চাঁপা ভালবাসতেন, তাই অনেক দোলন-চাঁপা লাগিয়েছি বাগানে। দোলন চাঁপার বন হয়ে গেছে। আমি নিজে জল দিই তাতে। মনে হয় যেন বাবারই সেবা করছি।"

পরদিন রানী-মা নিজে এসে হাজির হলেন বাগানে। হাতে তাঁর তামার ঝারি, ঝারিতে ঝর্নার জল। সেই জল তিনি দোলন-চাঁপার গোড়ায় ঢালতে লাগলেন।

একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রত্যহ।

দোলন-চাঁপার পাতায় পাতায় জাগল উৎসব। গাঁটে গাঁটে কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল অজস্র।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

কাটল কিছুদিন।

তারপর একদিন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা।

রাজপুত্র একা একা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন দোলন-চাঁপা বনে প্রকাণ্ড প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে একটা। মস্ত বড়! অত বড় প্রজাপতি রাজপুত্র আর কখনও দেখেন নি। কি চমৎকার তার রং! সন্ধ্যার মেঘের মতো লাল ডানা দুটি, আর তাতে সোনালি রঙের অসংখ্য ফুটকি। ঠিক যেন লাল মখমলে সোনার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে কেউ।

রাজপুত্র বলে উঠলেন, "বাঃ, এমন সুন্দর প্রজাপতি তো আর কখনও দেখিনি।"

রাজপুত্রের কথা শেষ হতে না হতে প্রজাপতি ঘুরে দাঁড়াল। রাজপুত্র সবিস্ময়ে দেখলেন, প্রজাপতির মানুষের মতো মুখ রয়েছে। ছোট্ট একটি মেয়ের মুখ, মাথাটি কালো কোঁকড়া চুলে ভরা, চোখ দুটি হাসছে!

মেয়েটি হেসে বললে, "আমি প্রজাপতি নই, আমি রাঙা পরী। তোমাদের দোলন-চাঁপা বনে আমার সই থাকে, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

রাজপুত্র বললেন, "কই, দোলন-চাঁপা বনে আর কাউকে তো দেখিনি কোনদিন।"

রাঙা পরী হেসে বললে, "আমার সই বড় লাজুক, মানুষ দেখলেই লুকিয়ে পড়ে।"

তারপর একটি আধফুটন্ত দোলন-চাঁপার দিকে চেয়ে সে বললে, "ওলো সই বেরিয়ে আয় না। রাজপুত্রের সঙ্গে আলাপ কর।"

সঙ্গে সঙ্গে আধফুটন্ত দোলন-চাঁপাটি আর একটি পরীতে রূপান্তরিত হল। এরও চোখ মুখ ঠিক রাঙা পরীর মতো, কেবল ডানা দুটি ধপধপে সাদা। ঠিক যেন দু টুকরো শরতের মেঘ কেটে কেউ বসিয়ে দিয়েছে তার পিঠের উপর।

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে গেলেন।

বললেন, "তুমি এখনই ফুল ছিলে, মানুষ হয়ে গেলে কি করে।"

"আমরা যখন যা খুশী হতে পারি।"

"কি করে?"

"মন্তরের জোরে।"

"আমাকে শিখিয়ে দেবে সে মন্তর?"

"দিতে পারি। সরে এস তাহলে এদিকে, এ মন্তর জোরে বলতে নেই, কানে কানে বলতে হয়।"

রাজপুত্র সরে গেলেন। তাঁর কানের কাছে মুখ এনে রাঙা পরী মন্ত্রটি শিখিয়ে দিলে তাকে।

"এ মন্তর কখ্খনো জোরে বোলো না। যখনি দরকার হবে মনে মনে বলবে।"

"আমি পাখি হতে পারব?"

"নিশ্চয়। মন্তরটি বলে মনে মনে ইচ্ছে করলেই যা ইচ্ছে করবে তাই হয়ে যাবে। পরীক্ষা ক'রে দেখ না।"

রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনি পাখি হ'য়ে গেলেন। মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতে

লাগলেন চারিদিকে, প্রতিটি গাছের ডালে গিয়ে বসলেন। সমুদ্রের দিকে উড়ে গেলেন একবার, ইচ্ছে হ'ল উড়ে সমুদ্রটা পার হয়ে যান, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডানা দুটি। ভয় হতে লাগল যদি পড়ে যান সমুদ্রে। ফিরে এলেন। আবার মানুষ হ'য়ে যখন দোলন-চাঁপা বনে গেলেন তখন পরীরা চলে গেছে। প্রত্যেক দোলন-চাঁপাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "তুমি কি সাদা পরী? কথা কও না।"

দোলন-চাঁপারা নিরুত্তর হয়ে রইল।

দিন কাটে।

পরীর কথা রাজপুত্র কাউকে বলেন নি, এমন কি শ্রীধরকেও না। তাঁর ভয় হ'ত কাউকে বললে যদি মন্ত্রের শক্তি চলে যায়। আর কাউকে বলা চলবে কি না তা পরীদের জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ভাবেন, এবার পরীদের দেখা পেলে কথাটা জেনে নিতে হবে। কিন্তু পরীরা আর আসে না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি প্রত্যেক দোলনচাঁপার কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কি সাদা পরী? এস না গল্প করি একটু।" ফুল কিন্তু ফুলই থাকে, পরী হয় না। যখন কেউ থাকে না, রাজপুত্র পাখি হ'য়ে পাখিদের সঙ্গে গল্প করেন। কত দূর-দূরান্তের পাখি যে আসে! যে সমুদ্র তাম্রপুরীকে ঘিরে রেখেছে সেই সমুদ্রের ওপার থেকে আসে খঞ্জনের দল। তাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে রাজপুত্রের। তারা আসে, কিছুদিন থাকে, আবার চলে যায়।

হঠাৎ নূতন ধরনের একটা পাখি এল একদিন। গায়ের রং তামাটে, বাঁকানো ঠোঁট, মাথার ঝুঁটি সাদায় কালোয়, চোখের দৃষ্টি প্রখর। অনেকটা চিলের মতো হাবভাব, কিন্তু চিল নয়। চিলের চেয়ে বড় দেখতে। উঁচু তালগাছের মগডালে এসে বসল সে, তারপর আকাশের দিকে মুখ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল। রাজপুত্রের মনে হ'ল ঠিক যেন বলছে—"হায় রাজা, হায় রাজা—!"

রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। কি বলছে ও?

রাজপুত্র মনে মনে পরীর মন্ত্র স্মরণ করে ইচ্ছা করলেন যেন তিনি ঠিক ওই রকম পাখি হয়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে হয়েও গেলেন।

তখন তিনিও উড়ে গিয়ে বসলেন তার পাশে।

"কে ভাই তুমি—"

"আমি হিমালয়বাসী ঈগল। তোমার বন্ধু খঞ্জনদের সঙ্গে প্রতিবছর আমার দেখা হয়। এ বছরও হয়েছিল। তাদের মুখে তোমার বাবার কথা শুনলাম। তোমার বাবার কি হয়েছে আমি জানি।"

"জান?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবাকে, তোমার বাবার সৈন্য-সামন্তকে এক বিরাট অজগর গ্রাস করেছে।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ, হিমালয়চূড়ায় বসে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু তোমার বাবাকেই নয়, অনেক রাজা-মহারাজাকে বণিক-সওদাগরকে গ্রাস করেছে ওই অজগর!"

"তুমি স্বচক্ষে দেখেছ গ্রাস করেছে? কি দেখলে?"

"ওই অজগর বিরাট হাঁ ক'রে বসে থাকে। এত বিরাট যে দেখলে মনে হয় না সাপের হাঁ, মনে হয় বুঝি ওটা রজতপুরীর তোরণদ্বার। ভয়ঙ্কর নয়, মনোহর। তার দাঁত থেকে, জিব থেকে, চোখ থেকে অপূর্ব এক রুপোলী আলো বেরুচ্ছে সর্বদা। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, আর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়লেই অজগর মুখ বন্ধ ক'রে দেয়, তখন আর বেরুবার উপায় থাকে না!"

"তাহলে আমার বাবা বেঁচে নেই?"

"তা ঠিক বলা যায় না। শুনেছি ও অনেককে গ্রাস করে বটে কিন্তু সবাইকে হজম করতে পারে না। তোমার বাবা হয়তো ওর পেটের ভেতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। অজগরকে মেরে তার পেট চিরে যদি দেখা যায় তাহলে ঠিক বোঝা যাবে—"

"কোথায় থাকে সে? আমাকে তার ঠিকানা বলে দাও, খড়্গ দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলব তাকে।"

ঈগল হেসে বললে, "খড়্গ দিয়ে তাকে কাটা যায় না। আমরা সাপের শত্রু, সাপকে টুকরো টুকরো করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আমরা ওর কিছু করতে পারিনি। বরং ভয় হয় কাছে গেলে ও-ই আমাদের গিলে ফেলবে। ওর নাম কি জান? লোভ। স্বয়ং গরুড় যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ওকে মারতে পারেন, আর কারও সাধ্য নেই। তবে তিনি বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে এসব ছোটখাটো কাজে মাথা ঘামাতে রাজী হবেন কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করলে হতে পারে—"

ঈগলের মাথার ঝুঁটিটা ফরর্‌ ফরে খুলে গেল।

"কি—"

"গরুড় তো আমাদেরই সম্রাট্। সমস্ত পাখিরা যদি গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে তাহলে তিনি 'না' বলতে পারবেন না। কিন্তু সমস্ত পাখিরা কি তোমার বাবার জন্যে অত করবে? আমি অবশ্য ঈগল সমাজকে বলব, তারা রাজীও হবে হয়তো। তুমি অন্য পাখিদের বলে দেখ তারা যদি রাজী হয়"—

"বেশ, আমি বলে দেখব।"

"আমি এখন চললুম তাহলে। এই কথা বলতেই এসেছিলাম। কি হল আমাকে খবর দিও খঞ্জনদের মুখে। কেমন?"

"আচ্ছা।"

ঈগল পাখি উড়ে গেল।

রাজপুত্র শুনতে লাগলেন ঈগল পাখি উড়তে উড়তে যেন বলছে—"হায় রাজা, হায় রাজা, হায় রাজা—"

চামেলীকুঞ্জে বাসা বেঁধেছিল টুনটুনি দম্পতি। তাদের সঙ্গে আগে থাকতেই ভাব ছিল। রাজকুমারের! প্রায়ই টুনটুনি সেজে তাদের সঙ্গে গিয়ে গল্প করতেন। টুনটুনিরা জানতই না যে আসলে তিনি রাজপুত্র, মন্ত্রবলে টুনটুনি হয়েছেন।

রাজপুত্র ভাবলেন সত্যি কথাটা এইবার ওদের খুলে বলা উচিত।

সব শুনে টুনটুনিরা প্রথমে অবাক্ হ'য়ে গেল, তারপর আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ল।

"সে কি, তুমি আমাদের রাজপুত্র না কি?"—পুরুষ টুনটুনি বলে উঠল।

"কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য"—বলে উঠল টুনটুনি-গিন্নী।

তারপর তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচতে লাগল দুজনে।

রাজপুত্র বললেন, "সব তো শুনলে, এইবার বল তোমরা গরুড়ের কাছে যাবে কি না"—

"নিশ্চয় যাব। আমাদের দলবল সবাইকে নিয়ে যাব।"

রাজপুত্র তখন শালিক সেজে শালিকদের বললেন, টিয়া সেজে গেলেন টিয়াদের কাছে, বুলবুলি সেজে বুলবুলিদের অনুরোধ করলেন। দর্জিপাখি, দোয়েল, বসন্তবউ, বেনেবউ, ফটিকজল, প্রত্যেকের কাছে গেলেন তিনি। ফিঙে, নীলকণ্ঠ, বাদামীকালো, মাছরাঙা, ছাতারে, কাক, বক, চিল, সারস কেউ বাদ রইল না।

সবাই রাজপুত্রকে কথা দিলে যেদিন রাজপুত্র তাদের যেতে বলবেন সেইদিনই তারা গরুড়ের কাছে যাবে।

তারপর আবার এল খঞ্জনের দল।

"ঈগলের মুখে শুনেছ তো সব?"

"শুনেছি। এখানকার সব পাখিদের আমি অনুরোধ করেছি গরুড়ের কাছে যাবার জন্যে। তারা রাজীও হয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের পাখিদের তো আমি চিনি না—"

খঞ্জনের দল বললে, "আমরা চিনি। তোমার হয়ে আমরা গিয়ে তাদের অনুরোধ করব।"

"তাহলে তো খুব ভাল হয়!"

"নিশ্চয় করব।"

মহা-উৎসাহে খঞ্জনের দল উড়ে চলে গেল। বড় বড় গাছ পাহাড় সমুদ্র নদী পেরিয়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল তারা।

আবার কবে তারা ফিরবে ?

রাজপুত্র রোজ প্রতীক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র আর এক কাণ্ড করলেন।

রানী-মা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তামার ঝারিটি নিয়ে বাগানে আসতেন, গাছে গাছে জল দিতেন, কিন্তু তাঁর মুখে হাসি ছিল না। রাজপুত্র মাঝে মাঝে দেখতে পেতেন জল দিতে দিতে তাঁর চোখে জল পড়ছে। রাজপুত্র আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না, মাকে সব কথা খুলে বললেন একদিন। মা-তো বিশ্বাসই করতে চান না প্রথমে। রাজপুত্র তখন বললেন, "এস না আমি তোমার কানে কানে পরীদের সেই মন্ত্র বলে দিচ্ছি। তুমিও ইচ্ছে করলে পাখি হয়ে যেতে পারবে। তুমি যে পাখি হতে চাও, মনে মনে তাই ইচ্ছে কর।"

রানী-মা সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর হ'য়ে গেলেন।

তারপর আবার মানুষ হয়ে বললেন, "পাখিরা যেদিন গরুড়ের কাছে যাবে, আমিও সেদিন ময়ূর সেজে যাব তাদের সঙ্গে। ময়ূরেরা সাপের শত্রু। আমি সে অজগরকে মারতে না পারলেও ক্ষত-বিক্ষত করব।"

"আর আমি ?"

"তুমি কুমার, তুমি আমার পিঠের উপর বসে থাকবে।"

রানী-মার চোখে ফুটে উঠল একটা অপূর্ব দীপ্তি, যে দীপ্তি নিবে গিয়েছিল এতদিন, যে দীপ্তি রাজপুত্র কখনও দেখেন নি।

কিছুদিন পরে ফিরে এল খঞ্জনেরা।

সব শুনে তারা বললে, "তুমি আর তোমার মা যদি যাও তাহলে তো খুব ভাল হয়। গরুড় নিজে যে মাতৃভক্ত ! মাকে সৎমার পীড়ন থেকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। তোমার মা যদি যান, নিশ্চয় রাজী হয়ে যাবেন তিনি, আমরাও এদিকে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। সমস্ত পাখি রাজী হয়েছে। আমরা দিনের পাখি, আমরা সকালে যাব, পেঁচারা যাবে রাত্রে, তাদের দলপতি হুতোম পেঁচা নিয়ে যাবে তাদের। তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যাবে ?"

"নিশ্চয়।"

"তাহলে কাল ভোরে ঠিক হয়ে থেকো। উষার রাঙা আলো যেই আকাশের গায়ে লাগবে, অমনি আমরা বেরিয়ে পড়ব। আমাদের ডাক শুনতে পাবে তোমরা—"

"বেশ।"

খঞ্জনের দল আবার উড়ে চলে গেল মাঠ বন গিরি নদী সমুদ্র মরুভূমি পেরিয়ে।

পরদিন ভোরে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল।

রাত দুপুরে পূর্বাকাশে যে মেঘগুলি জ্যোৎস্নায় টগরফুলের রাশির মতো দেখাচ্ছিল ভোর হতে না হতেই সেগুলি হয়ে গেল যেন রক্তজবার রাশি। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল অপূর্ব এক নহবত—লক্ষ পাখির কাকলী।

রানী-মা ময়ূর সেজে অপেক্ষাই করছিলেন . পাখিদের ডাক শোনামাত্র রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে উড়লেন আকাশে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

ময়ূরের পিঠে চড়ে চলেছেন রাজকুমার! আর তাঁর পিছু-পিছু চলেছে অসংখ্য রকমের অসংখ্য পাখি। চেনা পাখিদের মধ্যে টিয়া, ময়না, বুলবুল, হীরেমন, দোয়েল, হরবোলা, পাপিয়া, চাতক, কোকিল, ফটিকজল, বউ-কথা-কও, পায়রা, হরিয়াল, ঘুঘু, কাক, বক, সারস, চিল, শঙ্খচিল, বাজ, টুনটুনি, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, চোরপাখি, চড়াই, ফিঙে, কাঠঠোকরা, টিট্টিভ, মাছরাঙা, কাদাখোঁচা, ভরত, খঞ্জন, ফুলকি, বসন্তবউ, বাঁশপাতি, সোনাপাখি, মুনিয়া, বাবুই, আবাবিল, শ্যামা, নীল, ময়না, বটের, তিত্তির, বনমুরগী এরা তো ছিলই, অচেনা পাখি কত যে ছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। মানস সরোবর আর মেরুপ্রদেশ থেকে এসেছিল হাঁসের দল। হাঁসেদের পিঠে চড়ে চলেছিল পেঙ্গুইনরা, খঞ্জনরা ছিল সব শেষে।

পাখিদের ডাকে মুখরিত হয়ে গেল দশদিক। তাদের ডানায় সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল।

বিষ্ণুর রথের চূড়ায় গরুড় বসেছিলেন। কি মনোহর তাঁর রূপ। যেমন গম্ভীর, তেমনি সুন্দর। সমস্ত শুনে বললেন, "যারা লোভের বশবর্তী হ'য়ে অপরের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে যায়, তাদের শাস্তি দেবার জন্য ভগবান ওই লোভ-অজগরকে সৃষ্টি করেছেন। ওটা অজগর নয়, আসলে ওটা কারাগার। লোভী-লোকদের ওতে বন্দী ক'রে রাখা হয়। যতক্ষণ না তারা নির্লোভ হচ্ছে ততক্ষণ ও অজগরকে মারা সম্ভব নয়।"

ময়ূরবেশিনী রানী বললেন, "ক্ষত্রিয় রাজার রাজধর্ম অনুসারে আমার স্বামী দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন। তিনি সামান্য লোভী নন। তাছাড়া আমার বিশ্বাস এতদিনে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়েছেন তিনি। আপনারা খবর নিন!"

রথের ভিতর বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ছিলেন।

পাখিদের চীৎকার ও ভিড়ে অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন তাঁরা। রানী-মার কথা শুনে বিষ্ণু বললেন, "আচ্ছা, আমি এখনই খবর নিচ্ছি। ওহে পবন, তোমার তো সর্বত্র গতি, তুমি খবরটা নাও দিকি—"

পবনদেব "যথা আজ্ঞা" বলে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, পবনদেব চট ক'রে ফিরে এলেন।

এসে বললেন, "রাজা তো নির্লোভ হয়েইছেন, ওই অজগরের পেটে যারা যারা ছিল সবাই নির্লোভ হয়েছেন। কারও আর লোভ নেই।"

বিষ্ণু গরুড়কে আদেশ দিলেন, "তাহলে আর দেরি ক'রে লাভ কি! গরুড়, চল তাহলে অজগরটাকে শেষ ক'রে ফেলা যাক।"

বিষ্ণু আর লক্ষ্মীকে পিঠে ক'রে নিয়ে শোঁ ক'রে গরুড় উড়ে গেলেন।

পাখির দলও সঙ্গে চলল।

শ্যামলতাহীন এক বিশাল মরুভূমি জুড়ে পড়েছিল সেই বিরাট অজগর।

দেখতে দেখতে অজগরকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন গরুড়। সৈন্য-সামন্ত অনুচর-পরিচর সবাইকে নিয়ে রাজা বেরিয়ে এলেন। ভূধরও এল। বেরিয়েই দেখেন বিষ্ণু আর লক্ষ্মী।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন রাজা।

লক্ষ্মী বললেন, "রুপোর প্রতি তোমার এত লোভ? আচ্ছা, তার জন্যে আর তোমাকে রজতপুরী জয় করতে হবে না। তোমার তাম্রপুরীকেই আমি রজতপুরী বানিয়ে দেব।"

রাজপুত্র বললেন, "কিন্তু আমরা বাড়ি ফিরব কি ক'রে? আমাদের রাজত্বের চারিদিকে সমুদ্র হয়ে গেছে, সে সমুদ্র আমরা এত লোকজন নিয়ে পার হব কি ক'রে?"

লক্ষ্মী হেসে বললেন, "সে গেলেই দেখতে পাবে।"

সবাই যখন সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা রুপোর সেতু এপার থেকে ওপারে চলে গেছে। কি সুন্দর কারুকার্য তার!

সেই সেতু পার হয়ে তাঁরা এসে দেখলেন তাম্রপুরী সত্যিসত্যিই রজতপুরী হয়ে গেছে। রুপোর তৈরি ঘরবাড়ি ঝকঝক করছে সূর্যালোকে।

শ্রীধর দাঁড়িয়েছিল সেতুর এপারে। রাজপুত্রকে সে চুপি চুপি বললে, "ভাগ্যে বাগান করবার বুদ্ধি দিয়েছিলাম তাই তো এত সব হ'ল!"

"নিশ্চয়। যখন আমরা বাগান তৈরি করেছিলাম তখন ভাবতেই পারিনি যে সাধারণ বাগান মায়া-কানন হয়ে উঠবে।"

শ্রীধর বললে, "ভাল ক'রে তলিয়ে দেখলে সব বাগানই মায়া-কানন। হ্যাঁ, আর একটা মজার ব্যাপার হয়েছে—"

"কি?"

"ওই দেখ না।"

রাজপুত্র দেখলেন রুপোর তৈরি রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের দু'পাশে শাঁখ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রাঙা পরী আর সাদা পরী।

পরিচয়

"আমাকে চিনতে পারছ ?"

"পারছি বই কি।"

"কি ক'রে পারলে, চেনবার তো কথা নয় !"

"বাঃ, আমি দেখেছি যে। একবার নয়, অনেকবার।"

"কি ক'রে দেখলে ? আমি তো এখানকার নই। কোলকাতা থেকে আমাকে এনেছে এখানে। আমাকে ঠিক নয়, আমার মাকে। আজই ফুটেছি আমি। তুমি কি কোলকাতা গিয়েছিলে কখনও ?'

"না। ওই যে ওই গাছে আমার বাসা।"

টুনটুনি উড়ে গিয়ে তার বাসাটির চারপাশে ঘুরে এল একবার। মালতী ফুল সবিস্ময়ে চেয়ে রইল।

টুনটুনি আবার এসে বসল তার কাছে। বলল, "তুমি যাই বল, তোমাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। মাঝে মাঝে আসব তোমার কাছে। কেমন ?"

"এসো—"

ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে চলে গেল সে।

তারপর এল হাওয়া।

"এই যে, ভাল আছ ?"

"আছি। তুমি চেন নাকি আমাকে ?"

"বা, চিনি না ? চিরকাল তোমায় দোলাচ্ছি, চিরকাল তোমার সুরভি, তোমার পরাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি—"

"কিন্তু আমি তো এখানকার লোক নই। ভাবছি, কি ক'রে চিনলে ?"

"আমিই কি এখানকার লোক না কি! কাল রেঙুনে ছিলাম, আজ এখানে এসেছি, তার আগে ছিলাম উড়িষ্যায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই আমি। আমরা কারো নই, অথচ সকলের—"

হাওয়া তাকে দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

"আমিও তোমাকে চিনি।"

যে আলো তাকে ঘিরে ছিল সে কথা ক'য়ে উঠল !

"তুমি কোলকাতার লোক কি ?"

"আমি কোলকাতারও নই, ঢাকারও নই। আমি আকাশের। আর তুমি মাটির। আমি আকাশ থেকে নেমে এসেছি মাটিতে তোমাকে ফোটাব বলে। এই পরিচয়ের বাঁধনেই আমরা চিরকাল বাঁধা। আমাদের অন্য পরিচয় নেই।"

আলোর হাসি আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

নূতন স্বপ্ন জাগল মালতী ফুলের পাপড়িতে। হাওয়া আবার দোল দিয়ে গেল।

টুনটুনি পাখি আবার এসে বসল পাশের ডালটিতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট

একটা রঙীন স্বপ্ন যেন ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

রঙীন প্রজাপতি একটা। ঘর ছেড়ে বার হলাম।

ছুটলাম তার পিছু-পিছু। ওই যে করবী গাছের ডালটায় বসল, কিন্তু কাছে যেতে-না-যেতেই উড়ে গেল আবার। বোসেদের পাঁচিল-ঘেরা বাগানটায় ঢুকেছে, তুঁতগাছের ডালে বসে পাখা দুটি নাড়ছে আস্তে-আস্তে। বাগানের গেটটা পশ্চিম দিকে, অনেক ঘুরে যেতে হবে। তা হোক…ঘুরেই যাব।… চলতে লাগলাম।

কুর্-র-র-র…

কি পাখি ওটা? ফিকে সবুজ রং। বাঃ, কি সুন্দর দেখতে! কি নাম ওর? একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওই পাখিটার নাম কি?" "কী জানি" বলে চলে গেল সে। খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম পাখিটার দিকে। ফুড়ুং ক'রে উড়ে গেল। রাস্তার কোণের দিকে একটা ঝোপ ছিল, তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঝোপটার দিকে চেয়ে কিন্তু মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কি সুন্দর এক রকম লতা দিয়ে ঝোপটা আগাগোড়া ঢাকা! একেই লতা-বিতান বলে নাকি? চমৎকার লতাটি! ঘন সবুজ পাতা, এত ঘন যে প্রায় কালো মনে হচ্ছে! কিন্তু কালো নয়, সবুজের আভা ফুটে বেরুচ্ছে প্রতি পাতাটি থেকে! ছ-কোণা পাতাগুলো, ধারে-ধারে করাতের মতো কাটা-কাটা। গোছা-গোছা ফুল ধরেছে, ফুলও ভারি চমৎকার! কি নাম এ লতার কে জানে?

কালেক্টার সাহেবের কেরানী দ্রুতপদে আপিস যাচ্ছিলেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা, এ লতার নাম কি বলুন তো?"

"কোন্ লতার? ও, ওইটে? ওটা একটা জংলি লতা।"

দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন। বুঝলাম, তিনিও ওর নাম জানেন না।

সত্যি, আমরা কত জিনিসই জানি না! কাল রাত্রে মশারি খাটাবার সময় মনে হচ্ছিল—পেরেক, দড়ি, মশারি এদের আবিষ্কর্তা কারা? এই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের নাম আমরা জানি না। চতুর্দিকে এত ফুল, ফল, লতা, গাছ দেখি—তাদের অধিকাংশেরই নাম আমাদের জানা নেই!

"কে রে ভূতো নাকি?"

দেখলাম আমাদের ক্লাসেরই গোবিন্দ।

গোবিন্দ এগিয়ে এসে একটি চমকপ্রদ খবর দিলে।

"শুনেছিস, রামা কাল ফুটবল-ফিল্ডে মার খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি?"

"ওঃ! টেরটা পাইয়ে দিয়েছি বাছাধনকে 'কাল আমরা। আর কখনও গুণ্ডামি

করতে আসবেন না আমাদের সঙ্গে। হাবুল-দা এইসা এক লাথি ঝেড়েছিল বাছাধনের পেটে যে সঙ্গে-সঙ্গে কাৎ—"

গোবিন্দ সোৎসাহে বর্ণনা করতে লাগল। গোবিন্দ ফুটবল খেলায় উৎসাহী। আমাদের পাশের গাঁয়ে যে স্কুল আছে, রামা সেই স্কুলে পড়ে। এই রামারই জন্যে আমরা কখনও তাদের ফুটবল খেলায় হারাতে পারি না। সে ক্রমাগত ফেল ক'রে-ক'রে কেবল ফুটবল খেলার জন্যে স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছে নাকি! স্কুলের মাস্টাররাও ছাড়তে চান না তাকে। রামার জোরে প্রত্যেক বছর 'কাপ' পাচ্ছে ওদের স্কুল। দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়! ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি। আমি যদিও ফুটবল খেলায় তাদৃশ উৎসাহী নই, তবু বিপক্ষ দলের এত বড় একটা বীরবাহু-পতনের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করতে হ'ল।

গোবিন্দর সঙ্গে গল্প করতে-করতে মল্লিকপাড়ার মোড়টা পর্যন্ত চলে গেলাম। মোড়ে গিয়ে গোবিন্দ বললে—"ওহো, তোকে আসল খবরটা দিতে ভুলে গেছি। আমরা সবাই চাঁদা ক'রে হাবুল-দা'কে আজ খাওয়াচ্ছি। তোকেও দিতে হবে চার আনা। আমি বাজার থেকে মাংসটা আনতে যাচ্ছি। তুমি যদি ভাই গঙ্গার ধার থেকে ইলিশ মাছটা এনে দিস্। তোদের বাড়ির কাছেই তো! ফন্তি মাসি রান্নার ভার নিয়েছে সব। গ্র্যাণ্ড হবে। এনে দিবি তো?"

"আচ্ছা।"

গোবিন্দ চলে গেল। আমিও ফিরছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল মোক্ষদা পিসির বাড়ির কোণটায় যে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটুকু আছে, তাতে বালি পড়ে আছে খানিকটা, আর সেই বালির উপর একটা বেড়াল মনের আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে। ভারি মজা লাগল। দেখতে লাগলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

"ওখানে দাঁড়িয়ে ভূতো নাকি?"

মোক্ষদা পিসির শীর্ণ মুখ দেখা গেল জানালায়। বিধবা মোক্ষদা পিসির কেউ নেই। চির রুগ্ন।

"হ্যাঁ আমি……"

"আমাকে একটু মিছরি এনে দিবি বাবা দোকান থেকে? কাল থেকে জ্বর। উঠতে পারিনি। এনে দে বাবা!"

মোক্ষদা পিসির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে দোকানে গেলাম। দোকানে ভীষণ ভিড়। 'কিউ' ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সব। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম একজনের পিছনে। লোকটি খালি গায়ে ছিল। তার পিঠে দেখলাম আশ্চর্য দুটি তিল। শিরদাঁড়ার ঠিক দু'পাশে, ঠিক সমান দূরে, যেন কম্পাস দিয়ে মেপে কেউ বসিয়ে দিয়েছে দুটিকে। ভারি আশ্চর্য লাগল! কেন এমন হয়, কি ক'রে হয় কে জানে?

ভিড়ের মধ্যে নানারকম কথা হচ্ছে। চালের দাম, কাপড়, গান্ধি, জহরলাল, সুভাষ

বোস, হিন্দু-মোসলেম দাঙ্গা, মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন, বন্যা, ট্রেন-কলিশন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা মেঘ ঠিক কুমিরের মতো দেখাচ্ছে! ঘণ্টা-দুই লাগল মিছরিটুকু কিনতে। মোক্ষদা পিসিকে মিছরি দিয়ে ফিরছি, ন্যাপলার সঙ্গে দেখা। ন্যাপলা বললে, "স্টেশনে যাবি না?"

"কেন, স্টেশনে কেন?"

"বাঃ, শুনিসনি? শাহ নাওয়াজ পাস করবে যে আজ তিনটের ট্রেনে।"

জানতাম না তো! শাহ নাওয়াজকে দেখবার আগ্রহ ছিল। নেপালের সঙ্গে গেলাম স্টেশনে। বিপুল জনতা সমবেত হয়েছে। 'জয় হিন্দ' বলে চীৎকার করছে মাঝে-মাঝে। কত লোক, কত রকম লোক! কিন্তু তাদের দেখে, তাদের কথা শুনে মনে হ'ল না যে তারা ঠিক সেই আকুলতা নিয়ে এসেছে যা মানুষকে স্বদেশপ্রেমিকের পর্যায়ে নিয়ে যায়। মনে হ'ল এরা সব মজা দেখতে এসেছে। বিড়ি টানছে, হো-হো ক'রে হাসছে! হুজুগের দল। মনে হ'ল মানুষ নয়, একরাশ ধুলো—যেদিকে হাওয়া বইছে, সেই দিকেই উড়ছে দল বেঁধে। বিরক্তি ধরে গেল। তবু কিন্তু চলে আসতে পারলাম না। ট্রেনটা আসুক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করায় ট্রেনটা এল। 'জয় হিন্দ' বলে চীৎকার ক'রে উঠল সবাই। কিন্তু আমি শাহ নাওয়াজকে দেখতে পেলাম না। আমার সামনে দুটো লম্বা লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের পিঠ এবং জামার ছিট দেখে ফিরে আসতে হ'ল।

গঙ্গার ধারে ইলিশ মাছের আশায় বসে আছি। ডিঙিগুলো আসেনি এখনও। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, রঙের উৎসব পড়ে গেছে। কি সুন্দর রঙ!

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লাম। রঙীন প্রজাপতির উদ্দেশে বাড়ি থেকে বার হয়েছিলাম, অথচ বসে আছি ইলিশ মাছের আশায়। প্রজাপতির কথা সমস্ত দিন মনেও পড়েনি!

চেহারা বদল

বহুকাল পূর্বে ডাক্তার পতিতপাবন চক্রবর্তী যে গ্রামে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন, সে-গ্রামে তখনও বিদেশী সভ্যতার পত্তন হয়নি ভাল ক'রে। গ্রামে রেলস্টেশন হয়নি, ইংরেজী স্কুল হয়নি। লোকে চা খেতে শেখেনি। অ্যালোপ্যাথি-চিকিৎসার নামই শোনেনি। ডাক্তার পতিতপাবন এই হতচ্ছাড়া গ্রামে এসে বসেছিলেন, অর্থাভাবে। তাঁর এক পিসেমশাই এই অঞ্চলে দারোগা ছিলেন। তাঁরই আনুকূল্যে এবং উৎসাহে অতিশয় স-সঙ্কোচে এসেছিলেন তিনি ভাগ্যপরীক্ষা মানসে। টাকা থাকলে শহরে গিয়ে বসতেন, মুরুব্বি থাকলে চাকরি পেতেন, কিন্তু সে-সব কিছুই ছিল না তাঁর। অতি

কষ্টে সস্তা জিনের কোট-প্যাণ্ট করিয়ে, কাঠের স্টেথস্কোপ কিনে (সেকালে কাঠের স্টেথস্কোপই প্রচলিত ছিল) এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ছুরি-কাঁচিগুলি একটি অতি সাধারণ কাঠের বাক্সে সাজিয়ে খড়ের ছোট একটি ঘরে নিজের ডাক্তারি-জীবন আরম্ভ করেছিলেন পতিতপাবন।

দারোগা পিসেমশায়ের উপদেশ অনুসারে কোট-প্যাণ্ট পরে স্থানীয় হাটে তিনি ঘোরা-ফেরা করতেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। সকলে সবিস্ময়ে সভয়ে চেয়ে দেখত এই নবীন চিকিৎসককে। চিকিৎসা করাবার বেলায় কিন্তু তারা ডাকত হয় হারু ওঝাকে, না হয় যোগেন মণ্ডলকে, না হয় হনুমান ত্রিবেদীকে। এই তিনজনই ও-অঞ্চলে নামজাদা কবিরাজ ছিল। কোট-প্যাণ্ট পরা এই আগন্তুকটির হাতে নিজেদের জীবন সমর্পণ করবার কথা ভাবতেই পারত না কেউ প্রথম-প্রথম। কিন্তু ভাবতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত একদিন। দারোগা পিসেমশাইয়ের জবরদস্তিতে নয়, পতিতপাবনের নিজেরই কৃতিত্বের জোরে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরছেন, হঠাৎ নজরে পড়ল, নির্জন প্রান্তরে কি একটা পড়ে রয়েছে যেন। এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মানুষ একটা অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নাড়ী পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন, মরেনি। কিন্তু মর-মর। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, আশেপাশে কোনও লোক-জন নেই। তখন অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন পতিতপাবন। নিজেই কাঁধে ক'রে তুলে নিয়ে এলেন তাকে নিজের কুঁড়েঘরে। তার গায়ে, কাপড়ে-চোপড়ে বমি আর বিষ্ঠার দুর্গন্ধ। নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন সব। গরম জল ক'রে সেঁক দিলেন তার হাতে-পায়ে। নিজের হাতে ওষুধ তৈরি ক'রে খাওয়ালেন, শুশ্রূষা করলেন সারা রাত জেগে। লোকটা বেঁচে গেল। তার হয়েছিল কলেরা। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে গরুর গাড়ি চেপে সে যাচ্ছিল এক বিয়ের নিমন্ত্রণে। পথে কলেরা হওয়াতে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

খবর রটতে বিলম্ব হ'ল না। কোট-প্যাণ্ট পরে মাসাধিক কাল হাটে ঘোরাঘুরি ক'রে যা হয়নি, ওই একটি ঘটনাতেই তা হ'য়ে গেল। পতিতপাবন যে সার্থকনামা ব্যক্তি, তা জেনে গেল সবাই। ভিড় ক'রে আসতে লাগল রোগীর দল তাঁর কাছে।

তবু কিন্তু মুশকিলে পড়লেন পতিতপাবন। সবাই এত বোকা, এমন সাধারণ-জ্ঞানশূন্য যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদের চিকিৎসা করাই দায়। কথা বললে বোঝে না। অন্ধ-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সব।

একবার একটা রোগী দেখতে গেছেন। হয়েছে নিউমোনিয়া। রোগীর বাবা অর্থবান ব্যক্তি। সুতরাং হারু ওঝা, যোগেন মণ্ডল, হনুমান ত্রিবেদী—তিনজন কবিরাজকে ডেকেছেন তিনি। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পতিতপাবনের ডাক পড়েছে।

পতিতপাবন গিয়ে দেখলেন, তিন জন কবিরাজ তিনরকম সিদ্ধান্ত ক'রে বসে আছেন। হারু ওঝার মতে বায়ু প্রকুপিত হয়েছে, যোগেন মণ্ডলের ধারণা—আসল

কারণ পিত্তাধিক্য, হনুমান ত্রিবেদী কফ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না। পতিতপাবনকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই পতিতপাবন বুঝেছিলেন যে, এ-অঞ্চলে প্র্যাক্‌টিস করতে হ'লে এই কবিরাজদের চটালে চলবে না। এদের হাতে রাখতে হবে। সাধারণ লোকের অগাধ বিশ্বাস এদের উপর। চিকিৎসা-ব্যাপারে এদের পরামর্শ অনুসারেই সবাই চলে। এমন কি, ডাক্তারি-চিকিৎসাও যখন করতে হয়, এরাই ডাক্তার ঠিক ক'রে দেয়। সুতরাং এদের প্রসন্ন রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পৃথক-পৃথক ভাবে এদের প্রসন্ন রাখাটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু পরস্পর-বিরোধী এই তিনজন প্রবীণ কবিরাজকে একসঙ্গে কি ক'রে তুষ্ট করা সম্ভব? হয়েছে তো নিউমোনিয়া। এর কারণ বায়ু, পিত্ত, না কফ তা পতিতপাবনের জানা নেই। কোন্‌টাকে সমর্থন করবেন তিনি? একজনকে সমর্থন করলে বাকি দু'জন চটে যাবে। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন পতিতপাবন। অবশেষে অনেক ভেবে একটা উপায় মাথায় এল তাঁর।

বললেন, "ওঝাজি ঠিকই বলেছে! বায়ু প্রকুপিত হয়েই জ্বরটা আরম্ভ হয়েছিল।"

হারু ওঝার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

পতিতপাবন বললেন, "তারপর কিন্তু রুখে উঠল, পিত্ত। বায়ুর সঙ্গে লাগল তার লড়াই। পিত্ত জিনিসটা কিরকম বিশ্রী তা তো আপনারা জানেন—ভয়ানক তেতো। তেতোর চোটে তিতিবিরক্ত হ'য়ে বায়ুকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হ'ল শেষটা। পিত্ত জয়ী হ'ল—"

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল যোগেন মণ্ডলের চোখ। ঈষৎ গর্বভরে গোঁফে তা দিলেন তিনি।

পতিতপাবন বলে চললেন—"এদের প্রভুত্ব কিন্তু বেশী দিন থাকে না। পিত্তের প্রভাবও বরাবর রইল না। কফ মাথাচাড়া দিলে এবং পিত্তকে চেটে নিলে। এখন কফেরই প্রাধান্য চলছে—"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন হনুমান ত্রিবেদী আনন্দে হাততালি দিয়ে।

তিনজনের মান রক্ষা ক'রে শুরু করলেন পতিতপাবন চিকিৎসা। ভাল হয়ে গেল নিউমোনিয়া রোগী। পসার বাড়তে লাগল পতিতপাবনের।

কিন্তু ও-অঞ্চলের লোকগুলোই এমন বোকা যে বিপদে পড়তে হ'ত প্রায়ই।

একবার হয়েছে কি, একটা লোককে একশিশি ওষুধ দিয়ে তিনি বললেন—তিনঘণ্টা-অন্তর একদাগ করে খাওয়াবে।

লোকটা মহা চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঘণ্টা ঠিক করবে কি করে। তার তো ঘড়ি নেই। একমাত্র ঘড়ি আছে জমিদার-বাড়িতে। পতিতপাবন গিয়ে জমিদারকে অনুরোধ করাতে জমিদার বললেন—আচ্ছা, আমি তিনঘণ্টা-অন্তর লোক পাঠিয়ে সময় জানিয়ে দেব আপনার রোগীকে। জমিদার তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন ঠিক। অসুখ কিন্তু সারল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল বরং। আবার যেতে হ'ল পতিতপাবনকে।

গিয়ে দেখেন, ওষুধ একফোঁটা খাওয়ান হয়নি! শিশিতে কাগজের যে দাগ কাটা ছিল, সেইগুলো জলে ভিজিয়ে তুলে কেটে-কেটে খাইয়েছে!

আর-একবার একটি রোগী বললে, আমার হজম হচ্ছে না, ভাল একটা ওষুধ দিন। পতিতপাবন বললেন, ওষুধ খাবার আগে খাবার নিয়ম ক'রে দেখুন। ভাত-রুটি ছেড়ে দিয়ে ফলটল খেয়ে থাকুন দু'চার দিন।

লোকটি চলে গেল! তারপর দিন তার ভাই ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে।

—"ডাক্তারবাবু, আপনাকে যেতে হবে একবার।"

—"কেন?"

—"দাদার বড্ড পেট নামিয়েছে!"

—"কেন, কি হ'ল?"

—"সে আপনি গিয়েই শুনবেন।"

অন্যদিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। যেতে হ'ল পতিতপাবনকে। গিয়ে দেখেন, রোগী শয্যাগত।

—"কি হে, কি হ'ল?"

—"পেটটা একটু নরম হয়েছে।"

—"খাওয়ার অত্যাচার করেছ নিশ্চয়।"

—"আজ্ঞে না, ফলই খেয়েছিলাম।"

—"কি ফল?"

—"তাল। বেশী নয়, গোটা-পাঁচেক।"

নির্বাক হয়ে রইলেন পতিতপাবন।

বার্লি কাকে বলে তাই জানত না তখন সে-দেশের লোক। বার্লি খাওয়াতে বলে এসেছেন একজনকে, ক্রমাগত 'বালি' খাইয়েছে, গঙ্গার চরের বালি। রোগী পেটের ব্যথায় মরবার যোগাড়।

দুই

তারপর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হয়েছে।

পতিতপাবন ডাক্তারের বয়স ছিল পঁচিশ, এখন হয়েছে পঁচাত্তর। গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামে স্টেশন হয়েছে, 'বাস' হয়েছে, চায়ের দোকান হয়েছে। নিকটবর্তী শহরে সিনেমাও খুলেছে। পাশের বাড়ির রামু পোদ্দার রেডিও কিনেছে একটা ব্যাটারি-সেটের। গাঁক-গাঁক ক'রে বাজাচ্ছে দিনরাত। গ্রামে হাইস্কুল তো হয়েছেই, বালিকা বিদ্যালয়ও হয়েছে। প্রতি পাড়ায় চায়ের দোকান হয়েছে একটা ক'রে!

পতিতপাবনের কাছে লিকলিকে একটি ছোকরা এসে বললে একদিন, "আমার বুকটা এগ্‌জামিন ক'রে দেখুন তো ডাক্তারবাবু। কাসিটা কিছুতে কমছে না…"

ছোকরাটির নাম সুলাল। দুলাল নয়, সুনীলও নয়। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাঁধ-কাটা গেঞ্জি। চোখে রঙিন চশমা। ঘাড় ছাঁটা। প্রথমে দেখলে মনে হয় গোঁফ কামানো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বোঝা যায়, ঠোঁটের উপর দু'টি অতি সূক্ষ্ম কালো রেখার মতো আছে। সযত্নে ক্ষুর দিয়ে করা হয়েছে। দ্বিধা-বিভক্ত কাছা-পায়ে কাবুলী-চপ্‌পল।

পতিতপাবন ভাল ক'রে বুক পরীক্ষা করলেন। তারপর গলাটা দেখলেন। তারপর বললেন—"বুক ঠিক আছে। কাসিটা হচ্ছে গলার জন্যে।"

—"কি করব বলুন তো ডাক্তারবাবু। মেন্‌থল প্যাস্‌টিল খেয়েছি দু'শিশি। পেনিসিলিন লজেন্‌স বেরিয়েছে আজকাল, তাই ব্যবহার করব ?"

পতিতপাবন বললেন, "দরকার নেই ওসব।"

—"কি করব তাহ'লে ?"

—"বাড়িটা ছাড়ো।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপ্রসন্নমুখে চলে গেল সুলাল। দিনবিশেক পরে এল আবার। বগলে একটা কাগজের মোড়ক।

—"ডাক্তারবাবু কোলকাতা গেসলাম। সেখানে ডাক্তার ভট্‌চাজ আমার পিসতুতো দাদার শালা হন, তাঁকে দেখালাম। তাঁরই সাহায্যে বুকটা একস্‌-রে করলাম, গয়েরও পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁরা এইসব ওষুধ লিখে দিয়েছেন।"

পতিতপাবন দেখলেন, একগাদা পেটেন্ট ওষুধের তালিকা লিখিয়ে এনেছে ছোকরা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ডাক্তার পতিতপাবন তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ রোগীদের দিকে চেয়ে যেমন দমে যেতেন, সুলালের দিকে চেয়েও তেমনি দমে গেলেন। তাঁর মনে হ'ল—যথা পূর্বং তথা পরং। বাহিরের চেহারাটা বদলেছে খালি।

মৃন্ময়

মৃন্ময়ের কিছুই ভালো লাগে না আজকাল। তার বয়স বেশী নয়, এই সবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে সে, কিন্তু এরই মধ্যে সে বুঝতে পেরেছে যে ঘরে বাইরে কোথাও যেন শান্তি নেই। খাওয়া-পরার কোনও অভাব নেই তাদের, কিন্তু বাবার মুখ সর্বদাই বিষণ্ণ, মায়ের মুখে হাসি নেই। বাবা যা মাইনে পান তাতে সংসার-খরচ কোনক্রমে চলে। আজকাল বাড়িভাড়াও দিতে পারেন না প্রতিমাসে। বাড়িওলা প্রায়ই এসে তাগাদা দেয়। বাবা তাকে বলেছিলেন যে সে যদি ক্লাসে ফার্স্ট হ'তে পারে তাহলে তাকে ভালো একটা বাঁশী কিনে দেবেন। সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু

বাবা তাকে বাঁশি কিনে দেননি এখনও। মৃন্ময় বুঝতে পারছে যে তাঁর হাতে টাকা নেই বলেই কিনে দিতে পারছেন না। টাকা থাকলে নিশ্চয়ই কিনে দিতেন। সে তাঁর বাঁশের বাঁশিতেই গৎ সাধছে তাই। তার বন্ধু কমলদের নাকি আরও দুরবস্থা। কে একজন বলছিল, তাদের দু'বেলা খাওয়াই নাকি জুটছে না আজকাল। তার বাবার যক্ষ্মা হয়েছে, ছুটি নিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন, পুরো মাইনে পান না। মৃন্ময়ের খুব দুঃখ হয়, কিন্তু কি করবে সে। তার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই সে কমলদের দিতো। আহা, বড় কষ্ট বেচারাদের। কিন্তু, আর একটা কথাও তার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়। টাকা দিলেই কি কমল টাকা নিতো? তাকে যদি কেউ এমন দয়া ক'রে একটা বাঁশী কিনে দেয়, সে কি নেবে? কখ্‌খনো না। কমলদের বাড়ি সে রোজই যায়, কমলের বাবাকে বাঁশী শুনিয়ে আসে। তিনি তার বাঁশী শুনতে খুব ভালোবাসেন! তবু কিন্তু মৃন্ময়ের কিছু ভালো লাগে না! দেশের হাওয়ায় কেমন যেন একটা অশান্তির উত্তাপ সঞ্চারণ ক'রে বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্র তো খোলবার উপায় নেই সংবাদপত্রগুলো আজকাল দুঃসংবাদপত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ডাস্টবিনে যেমন যত-রাজ্যের ময়লা এসে জমা হয়, এই খবরের কাগজগুলোতে তেমনি জমা হয় দুনিয়ার যত দুঃসংবাদ। অথচ না পড়েও উপায় নেই। খেলার খবরগুলোর জন্যেও পড়তে হয়। খেলার মাঠেও কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড হচ্ছে আজকাল। ভদ্রতা কি উঠে গেল নাকি দেশ থেকে! সত্যি, ভারি কষ্ট হয় মৃন্ময়ের। বাঙালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা ক'রে আজকাল। অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস কত গৌরবময়ই-না ছিল! এই সেদিনই তো নেতাজি···নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা ভেবে তার সমস্ত মন স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। সত্যিই কি মারা গেছেন তিনি? আর ফিরবেন না? হয়তো ফিরবেন না, ভারি কষ্ট হয় কিন্তু। মৃন্ময়ের ধারণা, তিনি যদি ফিরে আসেন সব ঠিক হ'য়ে যায় আবার। এই সব ঝগড়া, মারামারি, গণ্ডগোল, এই সব অভাব-অনটন, হাহাকার কিছু থাকে না তাহ'লে। সূর্য উঠলে অন্ধকার কি থাকে কখনও? সূর্য রোজ অস্ত যায়, রোজ আবার ওঠে। মহৎ লোক চলে গেলে আর ফেরে না কেন? সূর্য তো রোজ ফিরে আসে! দেশজোড়া এই অশান্তির মধ্যে কতকাল বাস করতে হবে এমন ক'রে? হিন্দু-মুসলমানের এই ঝগড়া কি মিটবে না কোনও কালে? কুকুরের মতো চিরকাল কি তারা এমনি ঝগড়াই ক'রে যাবে! সত্যি, থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দলে দলে হিন্দুরা এই যে দেশ ছেড়ে চলে আসছে—শিয়ালদ'তে গিয়ে একদিন দেখে এসেছে সে—শখ ক'রে নিশ্চয়ই আসেনি ওরা···কিন্তু, কেন ওদের এই শাস্তি···এর প্রতিকারই-বা কি!

একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে মৃন্ময়ের···এমন একটা কিছু, যাতে দেশের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়। রবিন্সন ক্রুশোর গল্প পড়েছে সে। ওইরকম অবস্থায় যদি পড়ে, সেও কি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। বিরাট একটা সমুদ্রের ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে সে একা রয়েছে। একটুও

ভয় করছে না তার।…জঙ্গলের ডাল-পালা ভেঙে ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করেছে। একটি কাঠবিড়ালী।… স্বপ্ন কিন্তু ভেঙে যায় একটু পরে। কেই বা তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে! ম্যাট্রিকুলেশনটা যদি পাস করতে পারে (পাস অবশ্য করবেই সে, ভালোভাবেই করবে) তাহলে বাবা তাকে একটা আপিসে ঢুকিয়ে দেবেন বলেছেন! কলেজে পড়াবার সামর্থ্য তাঁর নেই। সমুদ্র যাত্রা করা অদৃষ্টে নেই। পালিয়ে গিয়ে অনেকে জাহাজের খালাসী হয়ে সমুদ্র দেখে এসেছে, অনেক দুঃসাহসিক কাজও করেছে। কিন্তু, মা বাবা মন্টুমণিকে ছেড়ে তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তবে এটা সে জানে যে দরকার হলে সে রবিন্সন ক্রুশো হতে পারবে। শুধু রবিন্সন ক্রুশো কেন, রাণা প্রতাপ সিং, যতীন দাস, নেতাজি সব হতে পারে সে। যদি কোনওদিন সে সুযোগ পায় দেখিয়ে দেবে সকলকে যে বাঙালী এখনও অসাধ্যসাধন করতে পারে। ভাবতে ভাবতে, তার সমস্ত মন আবেগে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। মনে হয় সে পারবে, পারবে, ঠিক পারতেই হবে, করতেই হবে কিছু একটা। কিন্তু সুযোগই পাচ্ছে না কিছু করবার। ঘরে বাইরে কেবল গ্লানি, গ্লানি আর গ্লানি। পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা আর গবর্ণমেণ্টকে গালাগাল—এই হয়েছে এখন সকলের আলোচনার বিষয়। একটুও ভালো লাগে না মৃন্ময়ের; তার কেবলই মনে হয়—আহা, যদি একটা সুযোগ পেতাম, দেখিয়ে দিতাম সকলকে, কি ক'রে দেশের কাজ করতে হয়।

…হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেল সে।

রাস্তা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ দেখতে পেলে তার সমবয়সী একটি ছেলে ফুটপাতের একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে জামা নেই। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। হাতে বড়বড় নখ। দেখলে মনে হয় ভিখারী, কিন্তু ভিক্ষা করছে না তো। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে শুধু একধারে। কি করুণ দৃষ্টি চোখে! নিশ্চয় কিছু হয়েছে বেচারার। মৃন্ময় এগিয়ে গেল।

—"কোথায় বাড়ি তোমার ভাই ?"

—"পূর্ববঙ্গে।"

নিমেষের মধ্যে মৃন্ময়ের মনে হলো, উদ্বাস্তু নয় তো!

—"তোমার বাবা মা কোথা ?"

—"বাপ, মা ভাই বুইন কেউ নাই। সব কাইট্যা ফেল্‌সে।"

বলেই কেঁদে ফেললে ছেলেটি। ঝরঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো তার।

—"চলো, ওই পার্কে বসবে চলো।"

পার্কে বসে মৃন্ময় তার মুখে সমস্ত শুনলে। এ রকম কাহিনী খবরের কাগজে সে আরও পড়েছে। মুসলমান গুণ্ডার দল এসে বাড়ি পুড়িয়েছে, সবাইকে মেরে ফেলেছে। খালের ধারে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে এই ছেলেটি প্রাণে বেঁচেছে কোনক্রমে। জঙ্গলেই

লুকিয়ে-লুকিয়ে থেকেছে অনেক দিন। রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে হেঁটে-হেঁটে শেষকালে এক স্টীমার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে চলে এসেছে এখানে। এখানে এক উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু কাল থেকে সেখানে খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

নিস্তব্ধ হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো মৃন্ময়। তার মনে হতে লাগলো, দেশের সমস্ত দুঃখ যেন মূর্তিমান হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে প্রতিকারের প্রত্যাশায়।

—"আমাদের বাড়ি যাবে ?"

ছেলেটি সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে জানালো যে, যাবে।

—"চলো।"

রাস্তায় অনেক কথাই ভেবে নিয়েছিল মৃন্ময়।

বাড়ি গিয়ে মাকে বললে —"মা, এই ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, এ আমাদের বাড়িতে থাকবে।"

—"ছেলেটি কে…"

সমস্ত ঘটনা খুলে বললে মৃন্ময়।

—"আহা, বসো বাবা, বসো। বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা ওকে মিনু।"

ছেলেটিকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে রেখে ফিরে এলো মৃন্ময়।

—"আগে ওকে খেতে দাও। খাবার আছে কিছু ?"

—"তোর জন্যে যে রুটি দু'খানি রেখেছি, তাই আছে।"

—"তাই দাও।"

রুটি দিতে-দিতে মা বললেন—"ও থাকবে বলছিস, কতদিন থাকবে ?"

—"বরাবর থাকুক না।"

মা চুপ ক'রে রইলেন। মায়ের মনের কথা বুঝতে দেরি হলো না মৃন্ময়ের। রাস্তায় আসতে-আসতে তারও একথা মনে হয়েছে। তাদের নিজেদের সংসারই অতি কষ্টে চলছে, তার উপর আর-একজন হলো।

—"আমার খাবার আমি ওর সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে খাবো। এক বিছানায় পাশাপাশি শোবো। আমি যে চৌকিটায় শুই, তাতে তো অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকে। ও ঠিক হয়ে যাবে।"

—'আচ্ছা বেশ, সে-সব ভাবা যাবে এখন পরে। তুই খাবারটা দিয়ে আয় ওকে।"

সেদিন রাত্রে সেই ছেলেটির সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে মৃন্ময়ের সারা বুক যে আনন্দে ভরে উঠলো, তেমন আনন্দ তার জীবনে কখনও হয়নি। এমন কি ভূপেনকে হারিয়ে যেদিন সে ফার্স্ট হয়েছিল, সেদিনও না। একটা জিনিস কেবল খুব খারাপ লাগছিল তার। মা তাকে অর্ধেক খাবার দেননি, সে রোজ যেমন খায়, সেদিনও তাকে তেমনি

খেতে হয়েছিল। সে আপত্তি করাতে মা ধমকে উঠলেন। মা কি যে মনে করেন তাকে সে কি আধপেটা খেয়ে থাকতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে!

যদু

আমি খুব সংক্ষেপে যে ছেলেটির কথা আজ তোমাদের বলব সে অতি গরীবের ছেলে ছিল। যদিও সে বাপমায়ের একমাত্র সন্তান তবু সৌখীন কোন কিছু তার ভাগ্যে কখনও জোটেনি, এমনকি নাম পর্যন্তও নয়। তার নাম ছিল যদু। দেখতেও যে খুব সুশ্রী ছিল তা নয়, হাড়-পাঁজরা সার জীর্ণ বিশ্রী চেহারা, ম্যালেরিয়া জ্বরে আর পেটের অসুখে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্য তার কোনও দিনই ভাল হতে পারেনি। হবে কি ক'রে, দুবেলা পেট ভরে খেতেই পেত না।

তার বাপ কালীমোহনবাবু ছোট ছেলেদের প্রাইভেট টিউশনি ক'রে মাসে গোটা কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন আর এই কটা টাকা রোজগার করবার জন্যে উদয়াস্ত খাটতে হত তাঁকে। পরের ছেলেদের পড়িয়ে রাত্রি দশটা নাগাদ ক্লান্ত শরীরে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন নিজের ছেলেকে আর পড়াবার সামর্থ্য থাকত না তাঁর। কালীমোহনবাবু খুব বেশী লেখাপড়া করতে পারেন নি। গরীবের ছেলে ছিলেন, কোনক্রমে কায়ক্লেশে সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাটি পাস করতে পেরেছিলেন। অর্থাভাবে আর পড়া হয়নি।

যদুরা থাকত একটি স্যাঁতসেঁতে খোলার ঘরে, তার একদিকে মিউনিসিপ্যালিটির একটা পচা নালা, আর একদিকে বড়লোক প্রতিবেশী হীরেন্দ্রবাবুদের গোটা-দুই খাটা পায়খানা। সামনে সরু একটি রাস্তা, আর রাস্তার উপরে দুনিয়ার যত জঞ্জাল জড়ো করা। কেবল পশ্চিম দিকটায় কাদের কপির ক্ষেত ছিল বলে সে দিকটা একটু ফাঁকা ছিল কেবল। এই বাড়িরও মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া। না দিয়ে উপায় ছিল না, কারণ টাকা রোজগার করবার জন্যে শহরে থাকতেই হবে, আর শহরে থাকতে গেলেই এই ভাড়া টানতে হবে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর নিকানো থেকে আরম্ভ ক'রে রান্নাবান্না সেলাই ফোঁড়াই সবই যদুর মাকে নিজের হাতে করতে হ'ত। ওরই মধ্যে যে-দিন একটু সময় পেতেন হীরেন্দ্রবাবুর গোয়াল থেকে গোবর সংগ্রহ ক'রে ঘুঁটে দিতেন। এত ক'রেও তবু তিনি কুলুতে পারতেন না। কি ক'রে পারবেন, মাত্র তো কুড়ি পঁচিশ টাকা আয়, তার মধ্যে বাড়িভাড়া যেত পাঁচ টাকা, দেশে কালীমোহন বাবুর বুড়ো বাবা থাকতেন তাঁকে পাঠাতে হত পাঁচ টাকা। বাকী দশ পনরো টাকার মধ্যে তিনজনের খাওয়া-পরা খুঁটি-নাটি বাসা খরচ। এই খুঁটি-নাটি খরচের মধ্যে একটা প্রধান খরচ ছিল কালীমোহনবাবুর ওষুধ। একদিন ছেলে পড়িয়ে আসবার সময় রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন তিনি। সস্তায় হবে ব'লে পাড়ার একজন হাতুড়ে

হোমিওপ্যাথের কাছে গেলেন, কিন্তু তাঁর ওষুধে কোন ফল হল না। একজন এ্যালোপাথ ডাক্তারবাবু বিনা দক্ষিণায় তাঁকে একদিন দেখল বটে কিন্তু তিনি এমন একটি ওষুধ ফরমাস করলেন যার দাম চার টাকা চৌদ্দ আনা। নিয়মিত খেলে একশিশিতে কুড়ি পঁচিশ দিনের বেশী চলে না, এক শিশি খেয়ে বেশ ফল পেলেন কিন্তু তিনি . ডাক্তারবাবু বললেন আরও তিন চার শিশি খেতে হবে। দ্বিতীয় শিশি কিনতে কিছুদিন সবুর করতে হল। কিনলেন যখন তখন পুরোমাত্রায় খেতে আর সাহস হল না। এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে পেরে উঠবেন কি ক'রে তিনি! যে ওষুধটা কুড়ি পঁচিশ দিনে শেষ করা উচিত, সেটা খেতেন দু'মাস আড়াই মাস ধরে। যতটুকু উপকার হয়!

এই ভাবেই দিন তাদের কাটছিল। তাদের পাড়ার বড়লোক হীরেন্দ্রবাবুর ছেলেরা দামী দামী জামা-কাপড় পরত, সুন্দর সুন্দর খেলনা নিয়ে খেলা করত, সেজেগুজে মোটরে চড়ে সিনেমা দেখতে যেত, যদু দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখত আর ভাবত, ওদের অমন আর আমাদেরই বা এমন কেন। ছেলেমানুষ সে, তখনও বুঝত না যে টাকাকড়ি থাকলেই লোকে বড়লোক হয় না, যার বড় মন সে-ই বড়লোক। বাইরের ঐশ্বর্য নিয়ে যারা মত্ত থাকে প্রায়ই তাদের ছোট মন হয়, গরীবের ঘরেই পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লোক জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশ গরীবের দেশ। এদেশে অনেক লোকই দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, রোগে ভুগে ওষুধ পায় না, শীতকালে কাপড় পায় না, বর্ষার জল গ্রীষ্মের রোদ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। এদেশে গরীব হওয়া খুব একটা লজ্জার কথা নয়, এ দেশই গরীবের দেশ। আমরা সবাই দরিদ্র। যারা মোটরে চড়ে সিনেমা দেখে বাইরে আস্ফালন ক'রে বেড়ায় তারাও দীন দুঃখী। তাদের বাইরের মুখোশটা খুলে ভিতরের চেহারা দেখলে তবে সেটা বোঝা যায়। ছেলেমানুষ যদু অতশত কিছু বুঝত না, নিজেদের দৈন্য দেখে তার ভারী দুঃখ হ'ত কেবল।

যদু যখন একটু বড় হ'ল তখন আর এক সমস্যা দেখা দিল সংসারে। যদুকে স্কুলে পাঠাতে হবে। তার মানেই খরচ বাড়বে। স্কুলের মাইনে, বই খাতা পেন্সিল, আরও নানা রকমের খরচ। এতদিন যদু বাড়িতেই নিজে যতটুকু পারত পড়াশুনা করত তার মায়ের সাহায্যে। রবিবার দিন তার বাবা একটু সাহায্য করতেন তাকে। কিন্তু একদিন কালীমোহনবাবু বললেন - "এইবার যদু স্কুলে ভর্তি হোক, বাড়িতে থেকে সময় নষ্ট হচ্ছে কেবল—"

রাত্রে শোবার সময় এই নিয়ে আলোচনা হ'ল।

—"আমি না হয় এ মাস থেকে ওষুধটা আর কিনবো না, কি বল?"

মা বললেন, "উপকার যখন হয়েছে তখন খাও আরও কিছুদিন। ছেলের স্কুলের পড়ার খরচ হয়েই যাবে কোন রকমে—"

"দেখি"—দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল কালীমোহনবাবুর।

ওঁরা মনে করেছিলেন যদু ঘুমিয়েছে, যদু কিন্তু ঘুমোয়নি, সব শুনছিল সে শুয়ে শুয়ে। তার মনে হচ্ছিল, ঠিক কি যে মনে হচ্ছিল, তা বর্ণনা ক'রে বোঝানো শক্ত—অবর্ণনীয় একটা বেদনা তার সারা বুক জুড়ে টনটন করছিল বিষ-ফোড়ার মত।·· এত দুঃখ কেন তাদের ·

যদু স্কুলে ভর্তি হ'ল।

তার বাবা মা কোনক্রমে পড়ার খরচ চালাতে লাগলেন। প্রধান খরচ স্কুলের মাইনে বই খাতা পেন্সিল কলম। কিছু বই কালীমোহনবাবু চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করতেও পেরেছিলেন। এমনিভাবে অতিশয় দীন আয়োজন নিয়ে যদু বিদ্যামন্দিরে ঢুকলো। বাণী মন্দিরে কিন্তু ধনী দরিদ্রের সমান বিচার, যে গুণী তার ললাটেই জয়টীকা। যদু প্রথম হ'য়ে ক্লাস প্রমোশন পেলে। প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম! পাশের বাড়ির হীরেন্দ্রবাবুর ছেলেরা, যারা শৌখীন জামা-কাপড় পরে মোটরে চড়ে বেড়াত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যাদের প্রাইভেট টিউটাররা পড়িয়ে যেত, তাদের মধ্যে একজন যদুর সঙ্গে পড়ত, তার ঐশ্বর্যের জাঁকজমক সত্ত্বেও তাকে কিন্তু যদুর নিচেই আসন গ্রহণ করতে হ'ল সরস্বতীর দরবারে।

যদু মহা-উৎসাহে পড়াশোনা করতে লাগল। প্রতি বছরই সে ফার্স্ট হয়। সে ভুলে গেল যে সে গরীবের ছেলে, মনুষ্যত্বের বৃহত্তর আদর্শে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তার মন। হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা নিদারুণ আঘাত লাগল।

সেদিন শনিবার ছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসে যদু দেখল যে একটা ফেরিওয়ালা এসে তার মাকে সাধাসাধি করছে কাপড় কেনবার জন্যে। মা যদিও তাকে বার বার বলছেন যে কাপড় কিনবেন না তিনি, তবু সে ছাড়বে না! শেষটা বললে—"দেখুনই না মা ঠাকরুন, দেখতে আর ক্ষতি কি—"

খুলে বসল সে কাপড়ের মোট। নানা রকম চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে সুন্দর সুন্দর পাড়ওলা কাপড়, দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। যদুর মা একটু ঝুঁকে একখানি কাপড়ের জমি দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম এখানার?"

"তিন টাকা মা—"

"তিন টাকা!"

যদুর মা উঠে দাঁড়ালেন, তিন টাকা দিয়ে একখানা কাপড় কেনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব!

"না, আমি কিনব না, তুমি যাও—"

ফেরিওয়ালা চলে গেল। যদুর কিন্তু ভারি কষ্ট হ'ল। সে মাকে বললে—"নাও না মা কাপড়খানা—"

"অত টাকা কোথায় পাব বাবা—"

সত্যিইতো, যদু চুপ ক'রে রইল।

তারপর সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়, অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল। তার কেবলি মনে হতে লাগল কি হবে লেখাপড়া ক'রে, কি হবে ফার্স্ট হ'য়ে, যদি সে মায়ের

দুঃখ ঘোচাতে না পারে। সামান্য তিন টাকা দামের কাপড়, তাও তার মা কিনে পরতে পারে না পয়সার অভাবে। অথচ তার পড়ার জন্যে মাসে মাসে চার পাঁচ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কি হবে এ-অবস্থায় পড়ে শুনে! রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সেই ফেরিওয়ালাটার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'য়ে গেল।

"তোমার দোকানটা কোন্‌খানে বল তো?"

ফেরিওয়ালা বলে দিলে কোন্‌খানে তার দোকানটা।

সেদিন সন্ধ্যার সময়—কালীমোহনবাবু তখনও পড়িয়ে ফেরেননি, যদুর মা রান্নাঘরে ব্যস্ত—যদু চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে। ঘন্টাখানেক পরে ফিরল চোরের মতন, তার বগলে কাগজে মোড়া সেই শাড়িখানা। নিজের বইগুলো পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি ক'রে সেই টাকা দিয়ে সে শাড়ি কিনে এনেছে মায়ের জন্যে। কালীমোহনবাবু তখনও ফেরেন নি, মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বসে ছিলেন।

"কোথা গেছলি তুই?"

যদু কি বলবে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক জেরার পর মার কাছে তাকে সব কথা শেষে বলতে হ'ল। শুনে মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রদীপের ম্লান আলোয় মা আর ছেলে পরস্পরের দিকে নির্বাক হ'য়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের পরনে সেলাই-করা তালি-দেওয়া অর্ধমলিন শাড়ি, ছেলে তার প্রাইজের বই বিক্রি ক'রে মায়ের জন্যে ভাল শাড়ি কিনে এনেছে।···

এর পর যদু আর প্রাইজ পায়নি। কারণ আর সে পরীক্ষা দেবার সুযোগই পায়নি। কিছুদিন পরে কালীমোহনবাবু হঠাৎ মাথা ঘুরে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেলেন। ওষুধ কেনা অনেক দিন আগেই বন্ধ করেছিলেন। কালীমোহনবাবুর যা হ'য়েছিল যদুরও তাই হ'ল, অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল।

পাঁচ টাকার বাড়ি ছেড়ে, দু' টাকার একটি বাড়িতে উঠে গেলেন যদুর মা। যদু চাকরি খুঁজে বেড়াতে লাগল। অনেক খুঁজে কিছু না পেয়ে শেষে রিকৃশা টানার কাজ জুটল একটা। উপায় কি? নইলে যে না-খেয়ে মরতে হয়। যদুর মা একজনের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করতে লাগলেন। যদু রিকৃশা টানতে টানতে স্বপ্ন দেখতে লাগ্‌ল—বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বুকারটি ওয়াশিংটনের।

এইখানেই গল্পটি শেষ ক'রে দিলে গল্পের দিক থেকে বোধহয় ভাল হয়, কিন্তু সবটা বলা হয় না। তোমাদের মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় হবে, দেশের দুঃখ ঘোচাবে, তোমাদের জেনে রাখা দরকার দেশের সত্যিকার দুঃখ কোথায়।

যদুর মত ভাল ছেলে আমাদের দেশে অনেক জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ভাগ্যবলে ছিটকে পড়ে দু'চার জন হয়তো মাথা তুলতে পারে! কিন্তু দারিদ্র্যের নির্মম পেষণে অধিকাংশই মরে যায়। খেতে পায় না, পরতে পায় না, কেউ কিছু সাহায্য করে না, এরা অসহায়ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এমন

রত্নকে আমরা অহরহ হেলায় হারাচ্ছি, এদের দিকে ফিরে তাকাই না পর্যন্ত। এই যে আমাদের দেশ-জোড়া দারিদ্র্য এর কারণ কি, এর প্রতিকারের উপায় কি—তোমরা এখন থেকে জানতে চেষ্টা কর, ভাবতে চেষ্টা কর, তাহলে হয়তো তোমাদের কেউ কেউ সত্যিই দেশের দুঃখ ঘোচাতে পারবে। এই যদুই হয়তো একদিন কত বড় হতে পারতো, কিন্তু পারলে না। খোলার ঘরের কোণে যক্ষায় জীর্ণ হয়ে শেষে তিলে তিলে মরতে হ'ল তাকে অকালে। রুগ্ন অনাহারক্লিষ্ট শরীরে রিকৃশা টানা সইল না।

রাজা

নিপুর মামা বিজয়বাবু এলাহাবাদে থাকেন। সম্প্রতি তিনি কোলকাতায় এসেছেন। গোয়াবাগানে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে, সেইখানে এসেই উঠেছেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিপুদের বাড়িসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে মামার বাড়িতে। মেয়েরা সকলে আগেই চলে গেছেন। কথা আছে, বাবা আপিস থেকে সোজা সেইখানেই চলে যাবেন। নিপুর ঠাকুরদা যাননি। তিনি সন্ধ্যাবেলায় রোজ ঠাকুরঘরে পুজো করেন, আফিং খান। আফিং খাওয়ার ঘণ্টা-দুই পরে তবে ভাত খেতে বসেন। কথা আছে, দশটা-নাগাদ মোটর এসে তাঁকে নিয়ে যাবে। নিপু, মিনু আর জগুও যায়নি। সন্ধ্যাবেলা মাস্টারশাই তাদের পড়াতে আসেন। পড়াশোনা সেরে তারা ঠাকুরদাদার সঙ্গে যাবে এই ঠিক হ'য়ে আছে।

মাস্টারমশাই কিন্তু এলেন না। অগত্যা তারা তখন লুডো নিয়ে বসলো তিনজনে। একঘেয়ে লুডো-খেলা মোটেই ভালো লাগছিল না কারো। কিন্তু কি করা যায়, সময় তো কাটাতে হবে! এমন সময় ঠাকুরদা বেরিয়ে এলেন পুজোর ঘর থেকে।

—"মিনু, এক গ্লাস জল এনে দাও তো দিদি। আফিংটা খেয়ে ফেলি।"

মিনু জল এনে দিলে। ঠাকুরদা আফিঙের বড়িটি টুপ ক'রে খেয়ে ফেললেন।

মিনু বললে—"ঠাকুরদা, যতক্ষণ মোটর না আসে ততক্ষণ একটা গল্প বলুন না—"

নিপু মহা উৎসাহে বললে—"হ্যাঁ, হাঁা, সেই বেশ। লুডো-খেলা একটুও ভালো লাগছে না।"

জগু জিতছিল, তার খেলা বন্ধ করতে ততটা ইচ্ছে ছিল না, তবু সেও রাজী হ'য়ে গেল। ঠাকুরদার মেজাজ যদি ঠিক থাকে, গল্প জমবে ভালো।

—"গল্প?" ...ঠাকুরদা পাকা গোঁফ-জোড়া চুমরে মিনুর দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, "এখন পড়াশোনার সময়, গল্প কেন?"

—"মাস্টারমশাই আসেন নি যে।"

—"ও, আচ্ছা বেশ, এসো তাহলে।"

তিনজনে এসে বসলো ঠাকুরদার কাছে।

ঠাকুরদা বললেন, "আলোটা নিবিয়ে দাও।"

মিনু উঠে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

ঠাকুরদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর শুরু করলেন :

—"এক ছিল রাজা—"

—"কি-রকম রাজা ?" মিনু প্রশ্ন করলে।

—"রাজা যে রকম হয়—"

—"চেহারা কি-রকম বলুন।"

—"রাজার চেহারা যেমন, তেমনি। শালপ্রাংশু মহাভুজ—"

—"তার মানে ?"

—"শাল গাছের মত লম্বা, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হাত, ইয়া বুকের ছাতি, ইয়া গোঁফের গোছা !"

মিনু নাক সিঁটকে বললে—"ও তো দরোয়ানের চেহারা। ওরকম হোঁৎকা রাজা চাই না।"

—"ও বাবা, কি-রকম রাজা তাহলে চাই তোমার !"

—"বেশ ভদ্র-চেহারা হবে। গোঁফের গোছা-টোছা চলবে না।"

ঠাকুরদা জগুর দিকে ফিরে বললেন, "জগুর কি মত ?"

জগু বললে—"আমার মনে হয়, রাজা যখন পুরুষমানুষ, তখন গোঁফ থাকাটা কিছু অন্যায় নয়।"

—"বিমলদা কি পুরুষমানুষ নয় ? ফার্স্ট ক্লাস এম. এ., টেনিস চ্যাম্পিয়ন।"—মিনু ফোঁস ক'রে উঠলো।

—"আচ্ছা, আচ্ছা, ঝগড়া কোরো না। নিপুর মতটা কি শোনা যাক্।"

নিপু বললে—"আমার মনে হয়, রাজার শুধু গোঁফ নয়, গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। ঐতিহাসিক-রাজাদের ছবি মনে করো—শাজাহান, পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড, শিবাজী…"

—"আকবর, জাহাঙ্গীর, রাণাপ্রতাপ, মানসিংহ, এদের কিন্তু দাড়ি ছিল না, কেবল গোঁফ ছিল। গোঁফ-দাড়ি নেই এ-রকম রাজা কল্পনাও করা যায় না।"

মিনুর দিকে চেয়ে জগু টিপ্পনী করলে।

মিনু বললে—"কেন, অষ্টম এডওয়ার্ড ?"

জগু হটবার পাত্র নয়।

সে বললে—"অষ্টম এডওয়ার্ড ? ক'দিন সে রাজত্ব করেছিল, শুনি ? আমার বিশ্বাস, গোঁফ-দাড়ি কিছু ছিল না বলেই রাজ্যটি রাখতে পারলে না সে।"

মিনু বললে—"আমাদের স্বাধীন ভারতের রাজা, পণ্ডিতজী ? তাঁর দেখ গোঁফ-দাড়ি কিচ্ছু নেই।"

জগু বললে—"বোকচন্দ্র, পণ্ডিতজী রাজা নয়, মন্ত্রী। রাজা বরং বলতে পারো, রাজেন্দ্রপ্রসাদকে, তাঁর গোঁফ আছে।"

নিপু এতক্ষণ কিছু বলেনি। জগু থামতেই সে পুনরায় তার মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করলে :

—"আমার মতে, রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা উচিত। পশুদের রাজা সিংহ, তার পর্যন্ত গোঁফ-দাড়ি আছে। মানুষের রাজার থাকবে না?"

"—বেশ, তোমরা তাহলে গুঁপো আর দেড়ে-রাজার গল্প শোনো বসে। আমি অ্যাল্‌জ্যাব্রার অঙ্ক কষি গিয়ে!" মিনু রেগে উঠে যাচ্ছিলো। ঠাকুরদা বললেন, "শোনো, শোনো, অত রাগ কিসের। গল্পটা শুনেই দেখ না শেষপর্যন্ত।"

—"আমার রাজার গোঁফ দাড়ি কিচ্ছু থাকবে না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি আগে থেকে।"

—"বেশ, বেশ, তাই হবে।"

জগু বল'ল—"মিনু তাহলে একাই বসে গল্প শুনুক, আমরা চললুম। আয় রে নিপু, চল্ আমরা লুডোই খেলিগে।"

—"আঃ, তোরা চুপ ক'রে বোস দিকি, গল্পটা শোনই-না শেষ-পর্যন্ত।"

নিপু বললে—"রাজার কিন্তু গোঁফ-দাড়ি দুই-ই থাকা চাই।"

—"বেশ-বেশ, তাই থাকবে। চুপ ক'রে বোস আগে।"

আবার তিনজনে বসলো তারা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ঠাকুরদা শুরু করলেন :

—"এক ছিল রাজা। রাজার গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল—"

নিপু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো—"বাঃ!"

জগু বললে—"দুই-ই? অত্যন্ত সেকেলে রাজা তাহলে।"

মিনু ঠাকুরদাকে শাসিয়ে বললে—"আচ্ছা, দেখবো, এবার কে তোমার আফিঙের কৌটো খুঁজে দেয়।"

ঠাকুরদা মুখে কিছু বললেন না কিন্তু মিনুর গায়ে ছোট্ট একটি চিমটি কেটে যা জানালেন, তার অর্থ—শোন্ না শেষপর্যন্ত, আগে থাকতেই ছট্‌ফট করছিস কেন?

নিপু বললে—"তারপর?"

ঠাকুরদা বললেন—"তুমিই বলো তোমার রাজা কি করবে। শিকার করবে, না ব্যবসা করবে, না অনাথাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করবে?"

নিপু বললে—"শিকার। স্পোর্টস্‌ম্যান না হ'লে আর রাজা?"

ঠাকুরদা শুরু করলেন আবার :

—"এক ছিল রাজা। তাঁর গোঁফ-দাড়ি দুই-ই ছিল। একদিন সকালে উঠে গোঁফে তা দিতে দিতে তাঁর মনটা কেমন হু-হু ক'রে উঠলো। মনে হতে লাগলো, কি

যেন করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। রাজা বিচলিত-চিত্তে অন্দরমহলে গিয়ে বললেন, 'রাণী, আমার কি যেন করবার ছিল একটা, কিছুতেই মনে পড়ছে না, কি করি বলো তো?' রাণী বললেন, 'আমার শুক-পাখীকে জিজ্ঞেস করো, সে উপায় বলে দেবে।' রাণীর ছিল একটি অদ্ভুত ধরনের শুক-পাখী। গায়ে ময়ূরকণ্ঠী রং, ঠোঁট যেন প্রবাল দিয়ে তৈরি, চোখ দুটিতে জ্বলছে চুনি। ল্যাজটি বেশ বড়; শুধু বড় নয়, ল্যাজের প্রত্যেকটি পালকে রামধনুর সাতটি রং ঝলমল করছে! মনে হচ্ছে যেন ময়ূরকণ্ঠী পাহাড় থেকে রামধনু-রঙের ঝরণা নেবেছে। রাণীর মর্মর-মহলে সোনার দাঁড়ে দুলছিল সেই পাখী! রাজা গেলেন তার কাছে। গিয়ে বললেন, 'শুক-পাখী, একটু আগে গোঁফে হাত দিয়ে আমার মনে হলো, কি যেন একটা করবার ছিল, কিন্তু করা হয়নি। মনটা কেমন হু হু করছে, কি করি বলো দেখি?' শুক-পাখী বললে, 'দাড়িতে হাত বোলাও, তাহলেই মনে পড়বে।' রাজা তখন দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, শিকারে বেরুতে হবে। রাজা দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন অন্দরমহল থেকে। এসেই মন্ত্রীকে হুকুম করলেন, 'মন্ত্রিন, আমি শিকারে বেরুবো। সব ব্যবস্থা করো।'...ঠাকুরদা চুপ করলেন।

জগু বললে—"নিতান্ত সেকেলে ধরনের রাজা দেখছি।"

—"তোমার একেলে রাজা কি করতেন, শুনি।"

—"প্রথমতঃ একেলে রাজার দাড়ি থাকতো না, দ্বিতীয়তঃ শিকার করবার জন্যে তাঁর মন হু-হু করতো না। একেলে রাজা প্লেনে চড়ে চলে যেতেন কোরিয়ায় শান্তি স্থাপন করবার জন্যে, কিংবা—"

—"খুব হয়েছে, থাম্।"

নিপু থামিয়ে দিলে জগুকে।

—"তারপর?"...মিনু জিগ্যেস করলে। গল্পটা তার ভালো লাগছিল।

—"তাঁর হাতীশালা থেকে বেরুলো হাতী, ঘোড়াশালা থেকে বেরুলো ঘোড়া। গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ তোপ পড়তে লাগলো। বড় বড় পালোয়ানেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রাজার সঙ্গে শিকারে যাবে বলে। রাজা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীরভাবে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে জলদগম্ভীর-স্বরে মন্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'মন্ত্রিন্, এসব থামিয়ে দাও। আমি বীর, আমি একা শিকারে যাবো। আমার পঞ্চলক্ষণ-কালো ঘোড়াটিকে আনতে বলো কেবল। তার উপর সওয়ার হয়ে আমি একাই বেরুবো। চোলপুর জঙ্গলে ভীষণ একটা বাঘ এসেছে শুনছি। আমি একাই তাকে মারবো।'

পঞ্চলক্ষণ কালো ঘোড়ায় রাজা একাই বেরিয়ে গেলেন। অন্দরমহলে শুক-পক্ষী রাণীকে ডেকে বললেন—'রাণী, রাজা আর ফিরবে না। এইবার তুমি আমার পিঠে চড়ে বোসো। আমি তোমাকে পরজন্মে নিয়ে যাবো। সেইখানেই রাজার সঙ্গে আবার দেখা হবে তোমার। আমি দেহ বাড়াচ্ছি, তুমি একটু ছোট হও।'

শুক-পক্ষী দেখতে দেখতে বিরাট গরুড়-পক্ষী হ'য়ে গেল, আর রাণী হ'য়ে গেলেন ছোট্ট একটি বেণী-দোলানো কিশোরী। অনেকটা আমাদের মিনুর মতো—"

—"ধেৎ!" মিনু ছোট্ট একটি চাপড় মারলে ঠাকুরদাকে।

—"তারপর?" নিপুর সত্যিই এবার ভালো লাগছিল গল্পটা। জগুরও লাগছিল, যদিও সে চুপ করে ছিল।

—"রাণী শুক-পক্ষীর পিঠে চড়ে সোঁ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।"

—"রাজার কি হলো?"

—"রাজা পক্ষলক্ষণ ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগ ক'রে ছুটে চলেছিলেন চোল-জঙ্গলের উদ্দেশে। হাওয়াতে ফুরফুর ক'রে তাঁর দাড়ি উড়ছিল, আর উড়ছিল শিরস্ত্রাণের পালকটি। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছিলেন তিনি। সাত দিন সাত রাত্রি অনবরত ঘোড়া ছুটিয়ে চোল-জঙ্গলের কাছে এলেন যখন তিনি, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। বাইরে থেকে চোল-জঙ্গলের চেহারা দেখে, রাজার মত বীরের বুকটাও কেঁপে উঠলো। আকাশ পর্যন্ত ঠাসা জঙ্গল, কোথাও একটু ফাঁক নেই, মনে হচ্ছে, অন্ধকারের একটা বিরাট পাহাড় যেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রাজা। তারপর পক্ষলক্ষণকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'পক্ষলক্ষণ, এই ভয়ঙ্কর চোল-জঙ্গলে ঢুকতে তোমার ভয় করবে না তো?'

পক্ষলক্ষণ উত্তর দিলে—'আপনার যদি ভয় না করে, আমারও করবে না।'

—'ঢোকা কি উচিত?'

—'আজ না-হয় কাল আমাদের ঢুকতেই হবে, কারণ, আমাদের পরজন্ম অপেক্ষা ক'রে আছে ওই অন্ধকারের ভিতরে।'

—'তাহলে বিলম্ব ক'রে লাভ কি?'

—'কোনো লাভ নেই।'

—'চলো তাহলে।'

ঘাড় বেঁকিয়ে টগবগ-টগবগ করতে করতে ঢুকে পড়লো পক্ষলক্ষণ চোল-জঙ্গলের ভিতর। গভীর অরণ্য, ছোট-ছোট ঝোপে-ঝাড়ে বারবার গতি রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত অস্ফুট শব্দে শিউরে উঠছে অন্ধকার, পক্ষলক্ষণ কিন্তু চলেছে নির্ভয়ে। এইভাবে অনেকক্ষণ চলবার পর আলো দেখা গেল একটু। পক্ষলক্ষণ এগিয়ে চললো সেই দিকে। ঝোপঝাড় ভেদ ক'রে শেষে গিয়ে হাজির হলো ফাঁকা জায়গায়, দেখলে, সেখানে দাউদাউ ক'রে মশাল জ্বলছে একটা। দাঁড়াতেই চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে গর্জন হলো—হালুম! তারপরই একলম্ফে বেরিয়ে এলো এক হাফ-প্যাণ্ট-পরা বিরাট বাঘ। এসেই পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের থাবা দিয়ে গোঁফ চুমরে, রাজাকে সম্বোধন ক'রে বাঘ বললে—'তুমি চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে এসেছো?'

রাজা বললেন—'হ্যাঁ।'

—'মারো আমাকে। এই আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছি।'

বাঘ পিছনের পা দুটোতে ভর দিয়ে সত্যি-সত্যি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। রাজার মনে হলো, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি তাঁর তূণ থেকে সবচেয়ে মারাত্মক তীরটি বার ক'রে ছুঁড়লেন। ঠিক বুকের মাঝখানে লাগলোও গিয়ে তীরটি, কিন্তু হাফ-প্যান্ট-পরা বাঘের কিচ্ছু হলো না। হা-হা ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠলো সে। তারপর থাবা দিয়ে তীরটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলে বুক থেকে, মনে হলো যেন ছোট একটা মাছি তাড়িয়ে দিলে। রাজা আবার একটা তীর ছুঁড়লেন, আবার সেই ব্যাপার! ফের একটা ছুঁড়লেন, ফের সেই কাণ্ড! রাজা তীরের পর তীর ছুঁড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বাঘের কিছু হচ্ছে না। বাঘ প্রত্যেকবারই হা-হা ক'রে হাসছে, আর থাবা দিয়ে তীর ঝেড়ে ফেলছে!

শেষকালে রাজার সব তীর ফুরিয়ে গেল।

হাফ-প্যান্ট-পরা বাঘ আবার অট্টহাস্য ক'রে উঠলো :

—'তোমার তীর ফুরিয়ে গেল, রাজা—এইবার তলোয়ার বার করো। আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—'

রাজা রাগে গরগর করছিল। তাঁর মনে হচ্ছিলো, যে-কামার তীরগুলো বানিয়েছে, সে তীরে শান দেয়নি ভাল ক'রে। এবার ফিরে গিয়ে তাকে শূলে চড়াতে হবে। তলোয়ারটার উপর কিন্তু তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। এক পারসী ফেরিওলার কছে থেকে নিজে পছন্দ ক'রে তিনি কিনেছিলেন তলোয়ারটা। ক্ষুরধার তলোয়ার। খাপ থেকে সড়াৎ ক'রে সেটা বার ক'রে পঞ্চলক্ষণের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন রাজা।

হাফ-প্যান্ট-পরা বাঘ ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল। রাজার মুখের দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে বলল—'চালাও তোমার তলোয়ার। যত জোরে পারো কোপ মারো।'

রাজা মারলেন কোপ।

তলোয়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাজা নির্বাক নিরস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঘ আবার হা হা ক'রে হেসে উঠলো। তারপর রাজার দিকে ফিরে বললে —'রাজা, তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। আমার এ বিশ্বাস আছে বলেই তোমার সামনে আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছি। দোষ তোমার অস্ত্রের নয়।'

—'কিসের তবে?'

—'তোমার দাড়ির।'

—'দাড়ির?'

—'হ্যাঁ, দাড়ির। যতক্ষণ তোমার দাড়ি আছে, ততক্ষণ তুমি আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। মহর্ষি ভণ্ডুর শিষ্য আমি। তিনি তপস্যাবলে জেনেছিলেন যে

দাড়িওলা প্রায়ই বাজে মার্কা হয়, তাই তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, দাড়িওলা কোনও রাজা যদি তোমাকে মারতে আসে তাহলে তুমি নির্ভয়ে গিয়ে তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারো, সে তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

জগু নিপুর কানে ফিসফিস ক'রে বললে—"ঠাকুরদার আফিঙে নেশাটি বেশ জমে এসেছে এবার।"

মিনু রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। সে বললে—'তারপর?"

ঠাকুরদা অর্ধ-নিমীলিত নয়নে বলতে লাগলেন: "হাফ-প্যান্ট-পরা বাঘের মুখে এই কথা শুনে রাজা তো অবাক্ হয়ে গেলেন। তারপর তিনি জিগ্যেস করলেন—'মহর্ষি জগু তো একজন মহাজ্ঞানী লোক। তুমি বাঘ হয়ে কি ক'রে তাঁর শিষ্য হলে?' বাঘ বললে—'আমি বাঘ নই, আমি মানুষ। খাকি হাফ-প্যান্ট পরে আমি চুরি ক'রে বেড়াতাম। মহর্ষি জগু তাই রেগে একদিন অভিশাপ দিয়ে আমাকে বাঘ ক'রে দিয়েছিলেন। আমি বাঘ হ'য়ে গেলাম, কিন্তু আমার খাকি হাফ-প্যান্ট া কিছুতেই খুললো না। সুতরাং বাঘেরাও আমাকে একঘরে করলে। বললে—প্যান্ট-পরা বাঘকে আমরা সমাজে স্থান দেবো না। তখন মহর্ষি জগুকে একদিন গিয়ে মিনতি ক'রে বললাম —প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন এবার। আবার মানুষ ক'রে দিন। এই হাফ-প্যান্টের জন্তে বাঘেরাও আমাকে সমাজে নিচ্ছে না। মহর্ষি জগু তখন বললেন, যদি কোনোদিন কোনো দেড়ে-রাজা চোল-জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে আসে, তাহলে তার সামনে তুমি গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে। আমি বললাম—যদি সে আমাকে মেরে ফেলে? মহর্ষি বললেন—দেড়ে-রাজারা অতিশয় বাজে-মার্কা রাজা হয়, তারা তোমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু যদি কখনও এমন কোনও রাজা আসে, যার গোঁফ আছে অথচ দাড়ি নেই, সেই রাজার যদি দেখা পাও, তাহলে তাঁকে আমার আশ্রমে নিয়ে এসো। তাঁকে দিয়ে আমার একটু কাজ করিয়ে নিতে হবে।'

রাজা প্রশ্ন করলেন—'মহর্ষি জগুর আশ্রম এখান থেকে কত দূর?'

—'কাছেই।'

রাজা একটু ইতস্তত করছিলেন যে সত্য কথাটা প্রকাশ ক'রে বলবেন কি না।

পঞ্চলক্ষণ বললে—'মহারাজ, সত্যকথা প্রকাশ ক'রে বলুন।'

রাজা তখন টান মেরে দাড়িটা খুলে ফেলে বললেন, 'দেখ, এ দাড়ি আমার নিজের দাড়ি নয়। আমার গুরুদেব মহর্ষি নিপুর আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পড়ে থাকতে হয়। রাখবার মতো দাড়ি আমার হয়নি, কিন্তু মহর্ষি নিপুর ধারণা, দাড়ি না থাকলে রাজাকে মানাবে না, তাই তাঁরই আদেশে আমাকে এই দাড়িটা পরে থাকতে হয়েছে।'

বাঘ বললে—'মহারাজ, তাহলে এইবার আমাকে পদধূলি দিন, আমি আবার মানুষ হই।'

রাজা জুতো-মোজা খুলে মাটিতে পা ঘষে পায়ে খানিকটা ধুলো লাগিয়ে নিলেন,

(রাজার পায়ে ধুলো থাকবে কি ক'রে), তারপর সেই ধুলো বাঘের মাথায় দিতেই বাঘ মানুষ হয়ে গেল। ছোট্ট বেঁটে কালো কুচকুচে চেহারার একটি মানুষ।

সে সবিনয়ে বললে—'আমার নাম রংলাল। চলুন, এইবার আপনাকে মহর্ষি জগুর আশ্রমে নিয়ে যাই।'

নিপু মুচকি-মুচকি হাসছিল, এইবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

—"সত্যি দাদু তোমার আফিঙের নেশাটা আজ জমেছে ভালো।"

মিনু বললে—"আঃ, চুপ কর্ না। তারপর কি হলো দাদু?"

ঠাকুরদা বললেন, "মহর্ষি জগুর আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। মহর্ষি জগু তখন ক্রশওয়ার্ড পাজল নিয়ে তন্ময় হ'য়ে বসেছিলেন। রংলালের মুখে সব কথা শুনে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমার মতোই একজন লোক আমি খুঁজছিলাম। কোরিয়াতে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়েছে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে শান্তি স্থাপন করতে। তাদের শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে যে, দেখ বাছারা, দুই আর দুই যোগ করলে চারই হয়, পাঁচ কিংবা ছয় কখনও হয় না। এই কথাটি মেনে নিয়ে তোমরা শান্ত হও।' রাজা বললেন, 'কোরিয়ায় যাবো কি ক'রে?' মহর্ষি উত্তর দিলেন, 'সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি ঘরে ঢুকে ছোট্ট একটি রেডিও নিয়ে এলেন। বাইরের বারান্দায় একটা গামলায় টগবগ ক'রে জল ফুটছিল। মহর্ষি রেডিওটি সেই ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে বললেন—'এই রেডিও-সিদ্ধ জল একটু খেলেই তুমি যে-কোনও ভাষায় কথা কইতে পারবে।' তারপর তিনি রাজার মাথায় ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ পরিয়ে দিলেন। দেখতে-দেখতে রাজার চেহারা গেল বদলে। দেখতে-দেখতে তিনি ছিপছিপে একটি যুবক হয়ে গেলেন। কুচকুচে কালো গোঁফ, চমৎকার টানা-চোখ, কোঁকড়ানো চুল। ঠিক অনেকটা মিনুর বিমলদার মতো—"

—"বাজে কথা বলবেন না, বিমলদার গোঁফ নেই।"

ফোঁস ক'রে উঠলো মিনু—"তারপর কি হলো, বলুন।"

—"তারপর, মহর্ষি জগু পক্ষলক্ষণের কপালেও একটি চন্দনের টিপ দিলেন। পক্ষলক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেল একটি ছোট্ট এরোপ্লেন। মহর্ষি তখন বললেন, 'এই যে রংলালকে দেখছো, এ একজন ভালো পাইলট। কিন্তু গত যুদ্ধে গিয়ে নানারকম কুসঙ্গে পড়ে লোকটা গুলি খেতে শিখলো। ফলে—কিছুদিন পরে চাকরি গেল। গুলির পয়সা জোটে না, লোকের পকেট মেরে বেড়াতে লাগলো শেষটা। মানে, ছিঁচ্‌কে চোর হ'য়ে দাঁড়ালো একটি। একদিন দেখি, আমার গাড়ুটা নিয়ে পালাচ্ছে। রেগে আমি ওকে বাঘ ক'রে দিলুম। তারপর যা-যা হয়েছে তা তো তুমি জানোই। রংলালের পথ-ঘাট সব জানা আছে, সে তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে কোরিয়ায় পৌঁছে দেবে ঠিক। ওর সঙ্গে নির্ভয়ে রওনা হ'য়ে পড়ো তুমি।'

প্লেন আকাশে উড়লো। উড়ছে তো উড়ছেই। কত দিন, কত রাত্রি যে পার হ'য়ে

গেল তার ঠিক নেই। মাথার উপর আকাশ কখনও নক্ষত্র-ভরা, কখনও জ্যোৎস্নাময়, কখনও মেঘে-ছাওয়া, কখনও রোদে উজ্জ্বল—আসছে আর চলে যাচ্ছে। আর পায়ের নীচে পৃথিবীরও রূপ বদলাচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে—নদী, পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, গ্রাম, নগর, শস্য-শ্যামল মাঠ, কত যে এলো আর গেল। গর্র্ গর্র্র্ উড়ে চলেছে প্লেন, যে প্লেন একটু আগে ছিল পঞ্চলক্ষণ ঘোড়া।

হঠাৎ রংলাল প্লেনের মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। রাজা বললেন, 'প্লেনটা ঘোরালে যে ?'

রংলাল কিছু না বলে হাসিমুখে রাজার দিকে চাইলে কেবল একবার। রাজা আর কিছু বললেন না, তাঁর মনে হলো, কোরিয়া যাবার রাস্তাই বুঝি এইটে।

খানিকক্ষণ পরে রংলাল বললে—'ওই যে নীল আকাশের গায়ে কালো মতো একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, দেখতে পেয়েছেন ?'

—'হ্যাঁ। কালো মেঘ একটা।'

—'মেঘ নয়, পাহাড়, আফিঙের পাহাড়।'

—'তাই নাকি ?'

—'ওখান থেকে এক-চাঙড় আফিং তুলে নেবো ভাবছি। কোরিয়ায় ডামাডোল এখন, আফিং পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখাই ভালো।'

বোঁ-বোঁ ক'রে প্লেন উড়ে চললো আফিঙের পাহাড়ের দিকে। কাছাকাছি আসতেই রাজা দেখতে পেলেন, কালো পাহাড়ের নীচে প্রকাণ্ড একটা কার্পেটের মতো কি যেন বিছানো রয়েছে।

রংলাল বললে—'আফিঙের ফুল ফুটেছে। এই পাহাড়ের চারদিক ঘিরে আছে আফিঙের বন। বারো মাস, তিরিশ দিন ফুল ফোটে। মায়াবিনী রাজকন্যার রাজত্ব কিনা এটা। আমি টুক্ ক'রে নেবে, চট্ ক'রে নিয়ে আসি খানিকটা আফিং, তারপর একেবারে সোজা পাড়ি দেবো কোরিয়ার দিকে।'

আফিঙের বনের পাশে নামলো প্লেন। রংলাল প্লেন থেকে নেবে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রাজাও নাবলেন। নেবেই কিন্তু রাজা অপূর্বএকটা গন্ধ পেলেন। চারদিকের বাতাস সেই গন্ধে যেন ভারী হ'য়ে রয়েছে। অদ্ভুত সে গন্ধ, চমৎকার। রাজা আচ্ছন্নের মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগলো, কি সুন্দর! কি অপূর্ব! ক্রমশঃ, তাঁর ঘুম পেতে লাগলো। ভাবলেন, প্লেনের ভিতর ঢুকেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক ঠেস দিয়ে। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, প্লেন নেই, প্রজাপতি হয়ে সেটা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে আফিঙের ফুলে-ফুলে। স্বপ্নাচ্ছন্ন-নয়নে চেয়ে রইলেন রাজা। তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড হলো। আফিঙের ফুলগুলো একটা যেন আর-একটার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো, দেখতে-দেখতে সমস্ত ফুলগুলো এক হ'য়ে গেল, আর তার থেকে বেরিয়ে এলো এক রাঙা পরী, তার হাতে একটি বাঁশী। সে রাজাকে এসে বললে—রাজা, এই বাঁশী নাও, আর বাজাতে বাজাতে চলো আমাদের রাজকন্যার কাছে। রাজা জিগ্যেস

করলেন—কে সেই রাজকন্যা ? পরী বললে—মায়াবিনী রাজকন্যা, নাম তাঁর—মীনাবতী। চলো তার কাছে। রাজা বললেন, বেশ, চলো। পরীর সঙ্গে সঙ্গে রাজা চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে একটা পুকুর দেখা গেল। পুকুরের ধারে এসে পরী বললে—রাজা, এইবার একটি কাজ করতে হবে। এই নাও 'সেফ্‌টি রেজার'। ওই পুকুরের আয়নার সাহায্যে তোমার গোঁফটি কামিয়ে ফেল। মীনাবতী রাজকন্যা গোঁফ পছন্দ করেন না।

পুকুরের পাড়ে ব'সে পুকুরের স্বচ্ছ জলে রাজা নিজের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সেফ্‌টি রেজার দিয়ে গোঁফ কামিয়ে ফেলতে দেরি হলো না।

তারপর রাজা বাঁশী বাজাতে বাজাতে চললেন মীনাবতী রাজকন্যার উদ্দেশে :

মিনু বললে, "ধ্যেৎ!"

এমন সময় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

জগু বললে, "ঐ বোধহয় আমাদের নিতে মোটর এলো।" মোটর থেকে নাবলেন মিনুর বাবা। তিনি ঠাকুরদাকে বললেন, "আপিস থেকে একটা ট্যাক্সি ক'রে সোজা এইখানেই আগে চলে এলাম, ভাবলাম, তোমাকে সুখবরটা দিয়ে যাই। বিমলের সঙ্গে মিনুর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। ওদের মত হয়েছে, বিমলের বাবা টেলিগ্রাম করেছেন. একটু আগে আপিসেই পেলাম টেলিগ্রামটা—"

মিনু উঠে একছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

নবাব সাহেব

নবাব সাহেবকে তিনবার দেখেছিলাম। একবার সামনা-সামনি; আর দু'বার মনে মনে। সামনা-সামনিও বেশীক্ষণ দেখিনি, পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। সেই গল্পটাই আমি বলি।

আমি সেখানে ডাক্তারি করতাম। একদিন খবর পেলাম, কয়েকজন বড়লোক মিলে নবাব সাহেবকে চা খাওয়াবেন ঠিক করেছেন। তাঁকে সঙ্গ দান করবার জন্য স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করা হবে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন থাকব। যিনি আমাকে খবর দিতে এসেছিলেন, তিনি বললেন, "ডাক্তারবাবু, আপনার বাড়িটা ফাঁকা পড়ে রয়েছে, আপনার পরিবার কবে আসবেন ?"

"আসতে এখনও মাসখানেক দেরি আছে।"

"তাহলে নবাব সাহেবের খানা তৈরি করবার জন্তে বাড়িটা যদি ব্যবহার করতে দেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয়। আমাদের কারও বাড়িতে এত ফাঁকা জায়গা নেই, তাছাড়া যা শুনছি—"

এই বলে থেমে গেলেন ভদ্রলোক।

"কি শুনছেন ?"

"আমাদের মতো সাধারণ কোন লোককে চা খাওয়ালে এত হাঙ্গামা কিছুই করতে হ'ত না। কিন্তু নবাব সাহেবের কথা আলাদা। খানা রাঁধবার জন্ত তাঁর নিজের লোকজন আসবে। তিনজন সাধারণ বাবুর্চি, একজন হেড বাবুর্চি। তাঁরা এসে যা যা চাই ফরমাশ করবেন, একদিন আগে এসে রাঁধবার জায়গা, উনুন-টুনুন ঠিক ক'রে যাবেন। তারপর যেদিন খাওয়ানো হবে সেইদিন ভোর থেকে এসে রাঁধবেন। অনেক ঝঞ্ঝাট মশাই। আপনার বাড়িটা বড়ও আছে, ফাঁকাও আছে, তাই বলছি আপনার বাড়িটা যদি দেন—"

বাড়ির ভিতর এত হাঙ্গামা করবার ইচ্ছে আমারও হচ্ছিল না, কিন্তু অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বলতে হল—"বেশ তো, আমার আর আপত্তি কি! আচ্ছা, নবাব সাহেবকে আপনারা হঠাৎ চা খাওয়াচ্ছেন কেন বুঝলাম না।"

ভদ্রলোক ভুরু দুটো কপালের উপর তুলে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ।

"নবাব সাহেবকে চা খাওয়াতে পারা একটা সৌভাগ্য তা জানেন ? উনি কারও বাড়িতে কখনও খেতে যান না, আমরা গত চার বছর ধরে অনুরোধ করছি ওঁকে। এবারে কি জানি কেন রাজী হয়েছেন—"

আমি চুপ ক'রে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি খুব—"

"উনি আমাদের একজন মস্ত বড় খাতক।"

"তার মানে ?"

"আমরা হাজার হাজার টাকা ধার দিই ওঁকে। যখনই দরকার হয় আমাদের খবর দেন, আমরা গিয়ে টাকা পৌঁছে দিয়ে আসি।"

এবার আমি অবাক্ হলাম। চিরকাল জানি, যে টাকা ধার নেয় সে-ই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে থাকে যে টাকা ধার দেয় তার কাছে। এ যে দেখছি উলটো ব্যাপার!

"উনি অনেক টাকা ধার করেন বুঝি ?"

"অনেক!"

"শোধও করেন ঠিক ঠিক ?"

"করেন, কিন্তু ঠিক ঠিক নয়। আমরা ওঁর কাছ থেকে কখনও কোনও হ্যাণ্ডনোট নিই না! এমনি টাকা দিই। তারপর যখন শুনি ওঁর হাতে টাকা আছে তখন একদিন গিয়ে কুর্ণিশ ক'রে বলি যে অমুক দিন আপনার হুকুমে এত টাকা আপনার খিদমতের (সেবার) জন্ম দিয়েছিলাম, এখন যদি সেটা পাই তাহলে বড় উপকার হয়।

সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চিকে হুকুম দিয়ে দেন। যত টাকা চাইব তৎক্ষণাৎ তত টাকাই

পেয়ে যাব। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যদি দশ হাজার টাকা চাই তা-ও পাব। কখনও জিগ্যেস পর্যন্ত করবেন না। সত্যিকার নবাব উনি, বুঝলেন ?"

চুপ ক'রে রইলাম, কি আর বলব! লোকটিকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম একটু।

নবাব সাহেবের কথা শুনেছিলাম আমিও, কিন্তু দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। ডাক্তার হিসাবে সে অঞ্চলে সেই সবে গেছি।

"কবে আসবেন উনি ?"

"দিন চারেক পরে। মানে, আগামী বুধবার বেলা পাঁচটায়। ওঁর বাবুর্চিরা কাল আসবে।"

যথাসময়ে বাবুর্চিরা এল। বাবুর্চিদের দেখে আমার চক্ষুস্থির। আসল নবাব সাহেব কি রকম হবেন জানি না, কিন্তু এঁরা দেখলাম প্রত্যেকেই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব। একজনের দাড়িতে মেহেদী লাগানো, একজনের পায়ে মখমলের জুতো, আদ্দির পাঞ্জাবির উপর মখমলের বান্ডি পরে আছেন একজন; আর একজনের আঙুলে যে আংটিটা রয়েছে, মনে হ'ল তা আসল হীরের। যিনি হেড বাবুর্চি তিনি পড়ে এসেছেন, নিখুঁত সাহেবী পোশাক, কথা বলছেন নিখুঁত ইংরেজীতে। শুনলাম ইনি বিলেত-ফেরত। মোগলাই, পাঠানী, ইংরেজী, ফরাসী, ইটালিয়ান, গোয়ানিজ, জার্মানী, জাপানী, চীনা—নানারকম রান্না জানেন। বেতন পান পাঁচ শ' টাকা।

আমি তো দেখে শুনে ঘাবড়ে গেলাম। প্রত্যেককে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে চেয়ার এগিয়ে দিলাম। তাঁরাও আমাকে সম্ভ্রমসহকারে আদাব করলেন। যিনি হেড বাবুর্চি তিনিই বসলেন চেয়ারে, বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে রইলেন। যে বড়লোকেরা নবাব সাহেবকে খাওয়াবেন তাঁদের মধ্যেও একজন এসেছিলেন সঙ্গে। তিনি একটা চেয়ারে বসলেন। হেড বাবুর্চি তাঁকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "নবাব সাহেবকে কি খাওয়াবেন আপনারা ?"

"চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু শুধু চা কি নবাব সাহেবকে দেওয়া যায় ? ওর সঙ্গে কিছু পোলাও, মাংস, আর আপনি যা যা ভাল মনে করেন তাই থাকবে। আমরা ফিরপোতে পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, জ্যাম জেলির অর্ডার দিয়েছি। কিছু প্লেট, আর চায়ের বাসনপত্র নিয়ে সেখান থেকে লোকও আসবে একজন। চায়ের আর বাসনপত্রের ভার তারা নিয়েছে—"

হেড বাবুর্চি বললেন, "কিন্তু তারা সোনার বাসনপত্র আনতে পারবে কি ? নবাব সাহেবকে যখন খাওয়াচ্ছেন, তখন—"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন তিনি ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখে আমার মনে হ'ল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন।

"ক'জন লোককে খাওয়াচ্ছেন আপনারা ?"

"জন দশেক।"

"মোটে জন দশেক? তাহলে আমিই সোনার প্লেট আর বাসন নিয়ে আসব।"

"ফিরপোকে মানা ক'রে দেব?"

"আসুক তারা। চায়ের কাপ-টাপগুলো দরকার হবে। এইবার আমাকে একটা কাগজ দিন তো। ফর্দ ক'রে ফেলি একটা।"

আমি একটা চিঠি লেখবার প্যাড এগিয়ে দিলাম। হেড বাবুর্চি আবার জিজ্ঞাসা করলেন. "দশজনকে খাওয়াচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

হেড্ বাবুর্চি মিনিট খানেক চোখ বুজে রইলেন। তারপর বললেন, "আমার মনে হয় চায়ের সঙ্গে বেশী কিছু ক'রে দরকার নেই। দু'রকম পোলাও হোক, সফেদ আর জরদা। আর কাবাব হোক চার রকমের। চায়ের সঙ্গে 'কারী' সুবিধে হবে না। আমি সেই অনুসারেই ফর্দ করেছি। কিছু নিমকি, কচুরি, সিঙাড়াও রাখতে পারেন। এখানে ভাল ঘি পাওয়া যাবে কি? যদি না যায় তাহলে আমাকেই সেটা আনতে হবে, ভাল ময়দাও আমি দিতে পারি আমার বাবুর্চিখানা থেকে। নবাব সাহেবের জন্য কাশ্মীরী মেয়েরা নিজের হাতে তৈরি ক'রে পাঠায়। ময়দা আসে পাঞ্জাব থেকে—"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ, ঘি আর ময়দা আপনি আনবেন, দাম যা লাগে দেব।"

"দাম? আমরা মুদী নই বাবু সাহেব!"

হেড বাবুর্চির মুখে সম্ভ্রমপূর্ণ বিনীত হাসি ফুটে উঠল একটা।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন, "মাফ করবেন আমাকে।"

হেড বাবুর্চি বললেন, "যে সব জিনিসের ফর্দ ক'রে দিচ্ছি আপনারা সেইগুলো যোগাড় ক'রে রাখবেন। পরশু সকালে, মানে মঙ্গলবার সকালে আমি আবার আসব। কাল গোটা দুই চাকর চাই. তারা উঠোনটাকে পরিষ্কার করুক; রাজমিস্ত্রীও চাই একজন, উনুন তৈরি করবে। রামজান আলী, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে উনুন তৈরি করাবে—"

"জি হুজুর।"

হীরের আংটি পরা রমজান আলী সেলাম ক'রে গ্রহণ করলে তাঁর হুকুম।

তারপর তিনি গফুর খাঁকে হুকুম করলেন, "তুমি বাবুর্চিখানা সাজাবে। ফুলের টব, ফুলদানি, গলিচা, কুর্সি যা যা তোমার দরকার বাবুসাহেবকে বলে দাও, ইনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

গফুর খাঁ আদাব ক'রে সেই ভদ্রলোককে বললেন, "কুড়ি-বাইশটা ফুলের টব, একটা ভালো ফুলদানি, একটা গালিচা আর একটা আরাম-কুর্সি চাই। আরাম-কুর্সির দুপাশে রাখবার জন্য দুটো ছোট টেবিলও দরকার। একটা আতরদান চাই, সিগারেটের ছাই ফেলবার জন্য একটা ছাই-দানও চাই। আর একটা ভাল চাঁদোয়া—"

আমি একটু অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম।

রান্নার জায়গা সাজাবার জন্য এত সরঞ্জাম চাই না কি!

জিজ্ঞাসা করলাম, "যেখানে রান্না হবে সেখানে এত সব জিনিস লাগবে?"

হেড্ বাবুর্চি নিখুঁত ইংরেজিতে উত্তর দিলেন মৃদু হেসে—"নিশ্চয়। বাবুর্চিদের মেজাজ যদি ভালো না থাকে, চারদিকে আবহাওয়া যদি আনন্দপূর্ণ না হয়, তাহলে রান্না ভাল হবে কি ক'রে? যেখানে নবাব সাহেবের জন্য খানা তৈরি হবে, সেখানে পরিবেশটা ভাল করতে হবে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

সেই ধনী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখ দেখে মনে হ'ল ভিতরে ভিতরে তিনি ঘামছেন বেশ।

"এবার ফর্দটা ক'রে ফেলি। দশজন লোক খাওয়াবেন তো?"

"হ্যাঁ, দশজন।"

হেড্ বাবুর্চি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আচ্ছা, আমি গিয়েই বাড়ি থেকে ফর্দ পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই। এখানে করলে হয়তো বাদ পড়ে যেতে পারে কিছু। একটু পরেই আমার লোক এসে ফর্দ দিয়ে যাবে। আমি এখন উঠি। ফর্দটা পেয়ে আপনি জিনিসগুলি আনিয়ে রেখে দেবেন। আবিদ মিঞা, তুমি কাল এসে নবাব সাহেব যে ঘরে খাবেন, সেই ঘরটা সাজিয়ে ফেলো। ঝাড়লণ্ঠন আছে তো?"

ধনী ভদ্রলোক বললেন, "আছে। ক'টা লাগবে?"

"যদি বড় হল্ হয় তাহলে দশ-বারোটা লাগবে।"

"আচ্ছা। তা সে যোগাড় হয়ে যাবে।"

তৃতীয় বাবুর্চি আবিদ মিঞা সেলাম ক'রে সরে দাঁড়াল। হেড বাবুর্চি উঠে যথারীতি সকলকে আদাব ক'রে বিদায় নিলেন। বাকী তিনজনও তাঁর পিছু-পিছু বেরিয়ে গেল। বলে গেল কাল সকালে আবার আসবে। সেই ধনী ব্যক্তিটি পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কপাল, মুখ, ঘাড় ভাল ক'রে মুছলেন, তারপর বললেন, "আমরা ভেবেছিলাম শ'-দুই টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু যে রকম আঁচ পাচ্ছি আরও বেশী লাগবে। লাগবেই তো, নবাব সাহেবকে খাওয়ানো কি সোজা কথা! আচ্ছা, আমিও এখন উঠি। ফর্দটা যদি এখানে দিয়ে যায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আচ্ছা।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পরে একটি লোক এসে আমার হাতেই ফর্দটি দিয়ে গেল। ফর্দ দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। সন্দেহ হ'ল লোকটা পাগল নয় তো! আমরা মাত্র দশজন খাব, আর ফর্দ দিয়েছে—সাতটা খাসির (প্রত্যেকটির ওজন ৭ থেকে ১০ সেরের মধ্যে হওয়া চাই), সফেদ পোলাওয়ের জন্য সরু আলো চাল (তুলসী মঞ্জরী বা কাটারি ভোগ)

আধমণ, জরদা পোলাওয়ের জন্ত ভাল পেশোয়ারী চাল আধমণ। তাছাড়া পোলাওয়ের মশলা কুড়ি রকম, প্রত্যেকটি পাঁচ সের ক'রে, জাফরান কেবল দু' সের। পেঁয়াজ দশ সের, রসুন দশ সের, আদা পাঁচ সের—কিসমিস, পেস্তা, বাদাম প্রত্যেকটি পাঁচ সের! অবাক কাণ্ড! যাই হোক, ফর্দ সেই ভদ্রলোকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। যাঁরা নবাব সাহেবকে খাওয়াচ্ছেন, তাঁরাই ঠিক করুন কি করবেন। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করব! যথাসময়ে গিয়ে খেয়ে আসব আর দেখে আসব নবাব সাহেবকে। ফর্দ পাঠিয়ে দিলাম। তারপর রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে রমজান আলী, গফুর খাঁ আর আবিদ মিঞা এসে হাজির হ'ল। একজন রাজমিস্ত্রি আর দুটো কুলীও এল। দেখলাম কিছু ইট আর সিমেণ্টও এসেছে। আমার বাড়ির পিছন দিকে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল, সেইটে দেখিয়ে দিয়ে আমি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলাম। ফিরলাম বেলা দুটো নাগাদ। ফিরে দেখি জায়গাটার চেহারাই বদলে দিয়েছে তারা! চেঁছে-ছুলে জায়গাটা পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে, পাকা উনুন তৈরি করেছে চমৎকার, ফুলের টব সাজিয়ে দিয়েছে চারিদিকে, সুন্দর চাঁদোয়া টাঙিয়েছে একটা, চাঁদোয়ায় চমৎকার কাজ করা, চাঁদোয়ার বাঁশগুলো পর্যন্ত জরিবসানো শালু দিয়ে মোড়া। কাছেই দেখলাম একটা ক্যাম্বিসের আরাম-কেদারা আর গোটা দুই তেপায়া রয়েছে! ফুলদানী, আতরদান, ছাইদানও এসে গেছে। একটা গালিচাও পাট করা রয়েছে দেখলাম।

রমজান আলী সসম্ভ্রমে আমাকে বললে, "গালিচা, তেপায়া, চেয়ার বুধবার সকালে কাজে লাগবে হুজুর! আতরদান, ফুলদানী আর ছাইদানও তখনই দরকার হবে। এখন এগুলো আপনার একটা ঘরে রাখিয়ে দিচ্ছি—"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এগুলো দিয়ে কি হবে?"

"নূর মহম্মদ সাহেব, মানে, হেড বাবুর্চি সাহেব, বসবেন। গালিচা পেতে তার উপর আরাম-কুর্সিটা বিছিয়ে দেব, আর কুর্সিটা বিছিয়ে দেব, আর কুর্সির দু'পাশে তেপায়া দুটো থাকবে। একটাতে থাকবে আতরদান, ফুলদানী আর একটাতে ছাইদান।"

কি কাণ্ড! কিছু না বলে জিনিসগুলো ঘরের ভিতর রাখিয়ে দিলাম। তার পরদিন ফর্দ অনুযায়ী অন্তান্ত জিনিসপত্রও এসে পড়ল। সাতটা পুষ্ট খাসী ব্যা ব্যা করতে লাগল আমার বাড়ির সামনে। চাল মশলা সব এসে পড়ল। একটু পরে কাশ্মীরী ঘি আর পাঞ্জাবী ময়দা নিয়ে নূর মহম্মদ সাহেব স্বয়ং এসে গেলেন। সেই ধনী ভদ্রলোকটিও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দেখলাম।

এইবার আর একবার আশ্চর্য হবার পালা। নূর মহম্মদ সাহেব ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি খাসীকে দেখতে লাগলেন ভাল ক'রে। তারপর আবিদ মিঞাকে একটা খাসীর কোমর ধরে তুলতে বললেন। আবিদ মিঞা তুলে ধরলে।

তিনি খাসীটির সর্বাঙ্গ ভাল ক'রে দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "এই খাসীটাই থাক। বাকীগুলো ফেরত দিন। এরও সব মাংসটা লাগবে না। আমি এর থেকেই বেছে বেছে সের তিনেক মাংস বের ক'রে নেব..."

তারপর রমজান আলীর দিকে ফিরে তিনি বললেন—"এইবার তোমরা তিনজন লেগে পড়। দু'রকম চাল, দু'সের ক'রে চাই। কিন্তু প্রত্যেকটি চালের দানা হওয়া চাই গোটা এবং পাকা বেশী ক'রে চাল আনিয়েছি ওই জন্যেই। তোমরা দু'জনে মিলে বেছে ফেল। তারপর মশলাও বাছতে হবে, প্রত্যেক রকম মশলা এক পোয়া ক'রে হলেই হবে। কিন্তু সেটা বাছাই মশলা হওয়া চাই। লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ এগুলো খুব সাবধানে বাছবে, একটিও বাজে দানা যেন না থাকে। মেওয়াগুলোও ভাল ক'রে বেছে নাও; কিসমিস, পেস্তা এসবের মধ্যে অনেক বাজে জিনিস মেশানো থাকে। প্রত্যেকটি দানা বেশ পাকা আর পুষ্ট হওয়া চাই, পচা যেন একটি না থাকে—"

"জি হুজুর।"

সেলাম ক'রে রমজান আলী চালের ঝুড়িটির দিকে এগিয়ে গেল। হেড বাবুর্চি হুকুম দিয়ে চলে গেলেন সেদিন। যাবার আগে বলে গেলেন, এরা চাল আর মশলা আজ বেছে ধুয়ে রাখবে, তিনি কাল সকালে আসবেন। উনি বলে যাবার পর এরা তিনজনে কাজে লেগে পড়ল এবং রাত নটা পর্যন্ত মেহনত ক'রে কাজ শেষ ক'রে ফেললে সব। অধিকাংশ চাল, মশলা আর মেওয়া ফেরত গেল। নিখুঁত জিনিসগুলি রইল কেবল।

পরদিন ভোরে নূর মহম্মদ সাহেব এসে পড়লেন। তাঁর হুকুমমতো রমজান, গফুর আর আবিদই সব করতে লাগল। তিনি গালিচার উপর ইজিচেয়ারে বসে খুব দামী সিগারেট খেতে খেতে হুকুম দিতে লাগলেন শুধু। রান্নার গন্ধে ভরপুর হ'য়ে উঠল চতুর্দিক। পোলাও রান্নার সময় নূর মহম্মদ সাহেবকে একটু শারীরিক মেহনত করতে হচ্ছিল মাঝে মাঝে। পোলাওয়ের চালে মশলা ঘি মেখে আর তাতে আখনির জল মাপ মতো দিয়ে হাঁড়ি দুটোর মুখ একেবারে ময়দার আটা দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। নূর মহম্মদ সাহেব মাঝে মাঝে উঠে হাঁড়ির গায়ে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনছিলেন হাঁড়ির ভিতরকার অবস্থা কি, আঁচ কমাতে হবে, না বাড়াতে হবে। ডাক্তাররা যেমন রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে নানারকম শব্দ থেকে বুঝতে পারেন বুকের অবস্থা কি রকম, নূর মহম্মদ সাহেবও তেমনি ফুটন্ত পোলাওয়ের আওয়াজ থেকে ঠিক করছিলেন, পোলাও হ'তে কত দেরি আছে! আমি তো কাণ্ড দেখে 'থ' হ'য়ে গেলাম।

ঠিক পাঁচটার সময় নবাব সাহেব মোটর থেকে নামলেন এসে। পরিষ্কার ধপধপে সাদা চুড়িদার পাঞ্জাবি আর 'চুস্ত' পায়জামা পরে এসেছিলেন। মাথায় ছিল একটি সাদা মুসলমানী টুপি। তাঁকে দেখে আমার একটি উপমা হঠাৎ মনে হয়েছিল, মানুষ

নয় যেন চকচকে তলোয়ার একখানা! নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি। আমাদের প্রত্যেককে আদাব ক'রে চেয়ারে এসে বসলেন। যাঁরা তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কিছু-না-কিছু বললেন। ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু হেসে তিনি শুনলেন, কখনও বা মাথা নাড়লেন একটু।

খাওয়ার জিনিস সোনার থালায় আসতে লাগল একে একে। তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর চা এল। নবাব সাহেব চায়ের পেয়ালাটা কেবল তুলে নিলেন, এবং দু'চার চুমুক চা খেলেন খালি। কোন খাবার স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না। আধ কাপ চা খেয়ে উঠে পড়লেন তিনি। সবিনয়ে বললেন, "আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।"

সকলকে আদাব ক'রে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দুই

নবাব সাহেবের দ্বিতীয়বার পরিচয় পাই অন্য সূত্রে। এক গরীব পানওয়ালার ছেলের অসুখের চিকিৎসা করেছিলাম। পানওয়ালা গরীব বলে পুরো 'ফি' দিতে পারেনি আমাকে। তার ভাঙা কুঁড়েঘর আর পানের দোকানটি মাত্র সম্বল। ওষুধ কিনতেই জেরবার হয়ে গিয়েছিল বেচারী। মাস কয়েক পরে সে আবার আমাকে ডাকলে একদিন। এবার তার স্ত্রী অসুখে পড়েছে। গিয়ে দেখলাম, এবার তার অবস্থা ফিরেছে, দোতলা পাকা বাড়ি হয়েছে একটি। এবারও সে আমাকে কম 'ফি' দিতে এল।

আমি বললাম, "এখন তো তোমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে। পাকা বাড়ি করেছ—"

সে বললে, "ডাক্তারবাবু, আমার অবস্থা তেমনি আছে। ও বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন নবাব সাহেব।"

"নবাব সাহেব?"

"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। আমার ভাগ্য ভাল, তাই আমার দোকানের সামনে তাঁর মোটর গাড়ির টায়ার ফেটে যায় একদিন। তাঁর ড্রাইভার যখন চাকা বদলাচ্ছিল তখন আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম একটু। নবাব সাহেবকে কুর্নিশও করেছিলাম। নবাব সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইখানে তুমি থাক?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, হুজুর। এই আমার বাড়ি।"

তিনি আমার ভাঙা কুঁড়েটার দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর চলে গেলেন। পরদিন সকালে এক ইঞ্জিনিয়ার এসে হাজির। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, "নবাব সাহেব তোমাকে একটা পাকা বাড়ি করিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন।" সেই দিনই কাজ শুরু

হ'য়ে গেল এবং দেখতে দেখতে আমার কুঁড়েঘরের জায়গায় ওই দোতলা বাড়ি উঠল।

নবাব সাহেবকে আমি যেন দেখতে পেলাম। ধপধপে ফরসা চেহারা, নীল চোখ, মুখে মৃদু হাসি…।

তিন

কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি নবাব সাহেব মারা গেছেন। অসুখে ভুগে নয়, সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে। অনেকে বলছেন ইচ্ছে ক'রে লাফিয়ে পড়েছিলেন তিনি। কারণ তিনি যে উইল ক'রে গেছেন তা অদ্ভুত। তাতে লেখা আছে, "আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি গরীবদের উপকারের জন্য দান ক'রে দিলাম। আমার কাছে আর এক কপর্দকও রইল না, বাকী জীবনটা কি ক'রে কাটাব!"

সেদিন পুরী গিয়েছিলাম। পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, মনে হ'ল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে যেন নবাব সাহেবের মুখটা দেখতে পেলাম! নক্ষত্র-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আছেন, সেই নীল চোখ, মুখে সেই মৃদু হাসি!

দুগ্ধ-সাগর

খোকনের বয়স যখন দেড় বছর ছিল তখন সে পাগল ক'রে তুলতো বাড়িসুদ্ধ সকলকে। এটা ধরছে, ওটা ভাঙছে, বালতির জলে গিয়ে হাত ডোবাচ্ছে, উলটে দিচ্ছে দুধের বাটি, উলটে দিচ্ছে দাদুর কল্‌কে, উনুনের ধারে গিয়ে জলন্ত কাঠ নিয়ে টানাটানি করছে। কেউ কিছু বললেই হয় কেঁদে-কেটে অনর্থ করছে, না হয় তর্জনী আস্ফালন ক'রে শাসন করছে—'তোপ্‌'! যতক্ষণ জেগে থাকত ততক্ষণ তাকে কেন্দ্র ক'রে 'ধর ধর' 'গেল গেল' লেগেই থাকত একটা।

খোকনের অবশ্য এসব কিছুই মনে নেই। সে এখন আর খোকনই নেই। সে এখন অমলেন্দু নন্দী। নূতন চেহারা হয়েছে তার। বয়স সতেরো বছর, আই-এস-সি পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য 'কম্‌পিট্' করতে পারেনি। খুব ভাল নম্বর পেয়েছে কেমিস্ট্রিতে আর অঙ্কে। ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালটা খারাপ না হ'য়ে গেলে ঠিক 'কম্‌পিট্' করতো। নামের আগে যদিও 'শ্রী' লেখে না (লেখাটা আজকাল ফ্যাশন নয় নাকি) কিন্তু ওর চেহারায়, ওর পোশাক-পরিচ্ছদে, ওর মার্জিত হাব-ভাবে, বুদ্ধি-দীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে শ্রী যেন উপছে পড়ছে। সত্যই দেখবার মত চেহারা। যেমন রং,

তেমনি মুখের গড়ন, খুব রোগাও নয়, খুব মোটাও নয়। চোখ, দাঁত, নখ পর্যন্ত নিখুঁত একেবারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করছে। জামা কাপড় গেঞ্জি ধপধপ করছে সর্বদা। নিজের জামা-কাপড় সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন সে। ময়লা জামা-কাপড় পরতে তো পারেই না, ছুঁতে পর্যন্ত পারে না। তার আটটা গেঞ্জি, চারটে গামছা, বারোটা রুমাল, সব সময় পরিষ্কার। নিজেই সাবান দেয়। হস্টেলের বন্ধুরা বলে—ছুঁচিবাই হয়েছে। তা না হ'লে প্রতিদিন বালিশের ওয়াড় আর বিছানার চাদর বদলাবার মানে হয় কোনও! অমলেন্দু কিন্তু বদলাত। তার ধোপার খরচ, সাবানের খরচ, জলখাবারের খরচের চেয়ে বেশী ছিল। কিছুতেই সে ময়লা জিনিস ব্যবহার করতে পারত না।

এই পরিষ্কার-বাতিকের মূলে ছিল কিন্তু ছেলেবেলার একটা ঘটনা। ছেলেবেলার কোন কথাই তার মনে নেই কেবল এইটি ছাড়া। ঘটনাটা এমনভাবে তার মনে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল যে, তার প্রভাব কাটাতে পারেনি সে এখনও।

ঘটনাটা বিশেষ কিছু নয়। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়—একটি চড়, তা-ও মায়ের হাতের।

আর একটু খুলে না বললে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না তোমাদের কাছে।

খোকনের সেদিন জন্মদিন। খোকনকে ঘিরে একটা সাড়া পড়ে গেছে সেদিন বাড়িতে। তার জন্যে কেনা হয়েছে ঝকঝকে নূতন বাসন, কার্পেটের নূতন আসন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার নানা আয়োজন হয়েছে। দিদিমা নিজে পায়েস রাঁধতে বসেছেন। সাজ-সজ্জার আয়োজনও কম হয়নি। উপহার এসেছে একটি গাদা। খেলনা, পুতুল, বাঁশী প্রভৃতি তো কেনাই হয়েছে, তাছাড়া দিদিমা করিয়ে দিয়েছেন দামী গরদের পাঞ্জাবি, মাসীর ফরমাশে করানো হয়েছে ছোট ছোট শান্তিপুরী ধুতি-চাদর, তাতে আসল জরি-বসানো টুকটুকে লাল পাড়, মামা দিয়েছে জরির কাজ-করা লাল মখমলের ছোট্ট নাগরা একজোড়া, দাদু দিয়েছেন সিল্কের গোলাপী ছাতা আর রুপো দিয়ে বাঁধানো ছোট্ট একটি লাঠি; বাবা ছোট্ট সোনার আংটি দিয়েছেন তাতে ছোট্ট একটি হীরে-বসানো, মা দিয়েছে হার। দেড় বছরের ছোট্ট খোকন রাজা হ'য়ে গেছে সেদিন যেন।

মাসী সকাল থেকে ব্যস্ত খোকনকে সাজাতে। ভালো সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার গরম জলে স্নান করানো হ'ল প্রথমে, তারপর ফুলেল তেল মাথায় দিয়ে মাথাটায় আর একবার জল-হাত বুলিয়ে তেড়ি বাগিয়ে দেওয়া হ'ল। সরু কাজলের রেখা আঁকা হ'ল চোখের কোলে। তারপর কপালে গালে শুরু হ'ল চন্দনের কারুকার্য।

বলা বাহুল্য, এত কাণ্ড সহজে হ'ল না, মাসীর দ্বারা হ'ল না। খোকনের বালক ভৃত্য কয়লা, বড় বোন মান্তি আর ছোট মাসী পারুলকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ল।

একদণ্ড কি স্থির হয়ে বসে ছেলে! কেউ ধরলে হাত, কেউ ধরলে পা, কেউ মাথা। বাবা মাঝে মাঝে গর্জন ক'রে ধমকাতে লাগলেন, দিদিমা মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে খোশামোদ করতে লাগলেন, "একটিবার চুপটি ক'রে ব'স দাদু, এক্ষুণি হ'য়ে যাবে!" সে এক কাণ্ড! অনেক কষ্টে সাজ-গোজ যদি শেষ হ'ল, কান্না আর থামে না।

দিদিমা বললেন, "কয়লা, তুই ওকে একটু বাইরে নিয়ে যা দিকিন। এখুনি ভুলে যাবে।"

কয়লা খোকনকে বাইরে নিয়ে গেল। পাশেই ছিল মল্লিকদের বাড়ি, আর সেখানে ছিল কয়লার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ঝমরু, মল্লিক মশায়ের চাকর। সে শুধু বন্ধু নয়, গুরুও। কয়লাকে বিড়ি খেতে শিখিয়েছে, সিনেমার গানও শেখায় মাঝে মাঝে। ডাক দিতেই ঝমরু বেরিয়ে এল। বললে, "খোকাকে বারান্দায় ছেড়ে দে না, বেশ খেলা করবে। সেই গানটা রপ তো হয়েছে অনেকটা, শুনবি?"

খোকনকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে কয়লা আর ঝমরু একটু সরে গিয়ে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসল। বিড়ি বেরুল, দেশলাই বেরুল। জমে উঠল বেশ।

বারান্দায় নেমেই খোকনের কান্না থেমে গিয়েছিল। অত্যন্ত লোভনীয় একটি বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার। বারান্দার কোণে একটি হুঁকো ঠেসান রয়েছে, একটা কল্‌কেও রয়েছে তার মাথায়। সে ঘাড় ফিরিয়ে কয়লার দিকে চেয়ে দেখলে একবার। দেখলে কয়লা আর ঝমরু দুজনেই তার দিকে পিছনে ফিরে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে গান করছে। আপাতত ওদিক থেকে বাধার কোন সম্ভাবনা নেই।

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সে হুঁকোটির দিকে। মনের আনন্দে গালে, কপালে, গরদের পাঞ্জাবিতে, শান্তিপুরী ধুতিতে, কয়লা আর ছাই মেখে হুঁকোর জলে মখমলের জুতোটিকে ভিজিয়ে যখন সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চড়েছে তখন হঠাৎ কয়লার হুঁশ হ'ল!

"এ কি, ছি—ছি—ছি—এ কি করলে—"

কিন্তু তখন আর চারা ছিল না।

ফল যা হ'ল তা নিদারুণ।

মা রেগে ঠাস ক'রে চড় মারলেন, কাপড়-জামা খুলে ফেললেন, আবার স্নান করালেন, আবার কাজল পরালেন। কপালে আবার চন্দনের আল্‌পনা কাটা হ'ল। জামা-কাপড় জুতো সাবান দিয়ে কেচে শুকোতে দেওয়া হ'ল উঠোনে, যতক্ষণ না শুকোল ততক্ষণ অনাহারে থাকতে হ'ল তাকে। কয়লা চাকরটা বাবার কাছে মার খেয়ে সরে পড়ল। এক হৈ-হৈ কাণ্ড!

সেইদিন থেকে ময়লা, বিশেষ ক'রে কয়লার সম্বন্ধে বিশেষ রকম সচেতন হয়ে উঠল

সে। কালো রঙের জিনিসের উপরেই বিতৃষ্ণা এসে গেল তার। কালো ছিটের জামা পরত না, কালো পাড়ের কাপড় পরত না, এমন কি কালো কালিও ব্যবহার করত না লেখবার সময়। বেগুনি আর সবুজ এই দুই রংয়ের কালি ব্যবহার করত কাউণ্টেন পেনে। নিজের কালো চুল, কালো ভুরু আর চোখের কালো তারা বদলানো সম্ভব নয় বলে ছেলেবেলায় তার ক্ষোভও ছিল। যখন পাঠশালায় পড়ে তখন দাদুর সঙ্গে তার আলাপও হয়েছিল এ বিষয়ে। খোকন দাদুকে বলেছিল, "দাদু, তোমার চুল আর ভুরু দেখে হিংসে হয়।"

"কেন ?"

"কেমন চমৎকার ধপধপে সাদা! আমার চুল আর ভুরু বিশ্রী। কুচকুচে কালো, সাবান দিলেও সাদা হয় না। তোমার কি ক'রে সাদা হ'ল বল না!"

দাদু হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"বল না কি ক'রে চুল ভুরু সাদা হ'ল তোমার ?"

দিন দুই আগে দাদু তাকে দুধ-সাগরের গল্পটা বলেছিলেন। হেসে বললেন, "দুধ-সাগরে স্নান ক'রে। সেখানে সব কালো সাদা হয়"

"দুধ-সাগরে স্নান করেছ তুমি! কোথা আছে দুধ সাগর ? আমি ভেবেছিলাম গল্প বুঝি।"

"বড় হ'লে বুঝতে পারবে কোথায় দুধ-সাগর আছে আর তাতে ডুব দিলে কি ক'রে কালো সাদা হ'য়ে যায়।"

"তোমার চোখের তারা তো সাদা হয়নি!"

"ভাল ক'রে ডুব দিতে পারিনি আমি। তুমি হয়তো পারবে।"

এই দুধ-সাগরের স্বপ্নটাও খোকনের কল্পনায় বাসা বেঁধে ছিল অনেক দিন। তারপর হারিয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। সেটা নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করল হঠাৎ একদিন। তখন সে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পড়ছে…।

দুই

সকালে পড়তে বসেছে এমন সময় পুরাতন ভৃত্য কয়লা এসে হাজির। খোকনদের বাড়ির চাকরি যাবার পর সে কোলকাতায় চলে এসেছিল একটা ফ্যাক্টারিতে কাজ পেয়ে। খোকনের খবর কিন্তু সে রাখত বরাবর। খোকন যখন ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছিল, তখন কয়লা এসে দেখা ক'রে বকশিশ নিয়ে গিয়েছিল। তারপর খোকন যখন আই-এস-সি পড়বার জন্যে কোলকাতায় হস্টেলে থাকত লাগল, তখন প্রায়ই এসে দেখা ক'রে যেত কয়লা। খোকনের পুরোনো জামা, কাপড়, গামছা, গেঞ্জি তারই

পাওনা ছিল। খোকনকে নিজের বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিল সে একদিন। তার বাড়ি গিয়ে কিন্তু খোকনের খারাপ লেগেছিল খুব। কি নোংরা বস্তি, কি নোংরা ঘরদোর! কয়লার বউ কি রোগা! পরনে ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, মাথার চুল রুক্ষ, দাঁত অপরিষ্কার, চোখে পিঁচুটি। তার ছেলেটাও জীর্ণ-শীর্ণ। উঠোনের একধারে কয়লা আর ঘুঁটে গাদা করা ছিল, তার উপর বসে খেলা করছে ছেলেটা! আপাদমস্তক ঘিনঘিন ক'রে উঠেছিল খোকনের। আর সে কয়লার বাড়ি যায়নি, কয়লাই আসত মাঝে মাঝে।

"কয়লা, এত সকালে তুই এলি যে আজ?"

"কাল আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা হয়েছিল, তারই 'পরসাদ' তোর জন্তে এনেছি।"

শালপাতা-ঢাকা দেওয়া মাটির খুরিটি টেবিলের উপর রাখলে সে ঠুক ক'রে। খোকন আড়চোখে চেয়ে দেখলে সেটার দিকে। কিছু বললে না।

"খেয়ে নিস, ফেলিস না যেন।"

"ও আমি খাব না।"

"খাবি না! কেন খাবি না?"

"ভারি নোংরা তোরা।"

"আমরা নোংরা হতে পারি, ভগবান তো নোংরা নয়। তার 'পরসাদ' কোথোনও নোংরা হ'তে পারে?"

"ভগবান তোর বাড়িতে এসেছিল?"

"জরুর।"

"দেখেছিস নিজের চোখে?"

"নিজের চোখে আর ক'টা জিনিস দেখতে পাই হামি! গির্জার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে তা-ও আজকাল দেখতে পাই না আর।"

"বোয়ে গেছে ভগবানের তোর বাড়িতে আসতে!"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কয়লা।

"লিখাপড়া শিখে এই বুঝি বিত্তে হচ্ছে তোর?"

খোকন কোন না উত্তর দিয়ে ক্লাসের নোটগুলো টুকতে লাগল।

"খেয়ে নিস, ফেলিস না, ঠাকুরের পরসাদ ফেলতে নেই। আমার কাজে যাবার সময় হ'ল, আমি চললাম।"

কয়লা চলে গেল। খোকন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নোট টুকতে লাগল। মেসের ছোঁড়া চাকরটা এল তারপর।

"এটা নিয়ে যা।"

"কি এতে?"

"কয়লা সত্যনারায়ণের প্রসাদ এনেছিল। খারাপ হ'য়ে গেছে বোধহয়, দেখ তো—"

চাকরটা শুঁকে দেখলে।

"না, খারাপ তো হয়নি।"

"তবে তুই খেয়ে ফেল।"

প্রসাদটা নিয়ে চলে গেল সে। খোকন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে সে প্রসাদটা। মহানন্দে খাচ্ছে। খোকন অবাক্ হ'য়ে গেল। কষ্টও হ'ল তার। মনে হ'ল দেশটা হু-হু ক'রে কোথায় নেবে যাচ্ছে! কয়লায় গাদার উপর উপবিষ্ট কয়লার ছেলেটার ছবি ভেসে উঠল মনে।

একটু পরে নতুন-কেনা কেমিস্ট্রির বইয়ের পাতা উল্টে কিন্তু ভুরু কুঁচকে গেল তার। বলে কি! আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসের ভিতরই কয়লা আছে! শুধু উনুনের ভিতর বা কলকের উপরেই নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসের ভিতরই লুকিয়ে আছে কয়লা। পেট্রোলে, রবারে, কাগজে, তুলোয়, কাপড়ে, ভিনিগারে, এমন কি এসেন্সেও। ডিমে, মাংসে, দুধে, ভাতে, আলুতে কয়লা, ওষুধে কয়লা—অ্যাস্পিরিন, কুইনিন, ইথার, ফর্মালিন, লাইজল্—সকলের মধ্যে কয়লা! সম্প্রতি ফোটো তোলবার শখ হয়েছে তার। দেখলে কয়লা না থাকলে ক্যামেরা তৈরি হ'ত না, ফোটো ডেভালাপ করা যেত না। সমস্ত রংয়ের মূলে কয়লা। সমস্ত সভ্যতাটাই যেন কয়লাকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে! কয়লার ছেলের ছবিটা আবার ফুটে উঠল মনে।

তিন

রাত্রে ঘুমিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলে একটা। অদ্ভুত এবং প্রকাণ্ড। মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার আলোয় তার সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে। চমৎকার আব্ছা নীল আলো! আলোটা যেন চুপি চুপি কথা বলছে—আয়, আয়, আয়। হঠাৎ কোণ থেকে একটা কালো ভূত বেরিয়ে এল। প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দু'দিকে, আর এগিয়ে আসছে তার দিকে। কুচকুচে কালো রং।

কাছে যখন এল তখন ভয়ে শিউরে উঠল খোকন। ভূতটার গলা, মাথা, হাত, পা কিচ্ছু নেই। মনে হচ্ছে, একটা প্রকাণ্ড কালো পাঞ্জাবি দু'দিকে হাত বাড়িয়ে শূন্যে ঝুলে আছে, আর এগিয়ে আসছে তার দিকে। তারপর হা হা ক'রে হেসে উঠল সেটা। পরমুহূর্তেই তার শেলফের উপর থেকে খিলখিল ক'রে হেসে লাফিয়ে বেরিয়ে এল কালো একটা ব্যাঙ্। লাফিয়ে পড়ল কালো পাঞ্জাবিটার উপর আর তার সর্বাঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মেঘ-চাপা জ্যোৎস্না গান ধরে দিলে সঙ্গে সঙ্গে—

যে চাঁদের আমি আলো
তাহারও ভিতরে আছে যে অনেক কালো।
অনেক দুঃখ অনেক মরণ
ফেলেছে সেথায় করাল চরণ
তাই বলে মোরে বাস না কি তুমি ভালো।

তারপর রিমঝিম রিমঝিম ক'রে কি একটা বাজনা বাজতে লাগল। মনে হ'ল সেতার বাজছে অনেক দূরে। তারপর সেটা রূপান্তরিত হল ঝরণার ঝরঝর সঙ্গীতে।

মনে হ'ল সে-ও গান গাইছে :

আমার জলে ভাসছে কত ময়লা
শ্যাওলা, ধুলো, পাতার কুচি
সবাই তারা কয়লা।
তাই ব'লে কি আমার জলে নাইবি না
তেষ্টা পেলে জল খেতে কি চাইবি না
ভাল ক'রে দেখ না চেয়ে
ওরে ও সতৃষ্ণ
সবার মাঝে লুকিয়ে আছেন
বংশীধারী কৃষ্ণ।

তাদের বাড়িতে ঠাকুরঘরে যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন তিনিই যেন মূর্ত হলেন চোখের সামনে! কুচকুচে কালো নিকষ-পাথরে তৈরি, মুখে বাঁশি। খোকনের মনে হ'ল, তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন যেন! সে হাসির আলোয় আস্তে আস্তে সমস্ত ঘরটা ভ'রে উঠল। খোকন দেখলে কালো পাঞ্জাবি সাদা হ'য়ে গেছে।

বলছে, "চিনতে পারছ না, আমি যে তোমার সিল্কের পাঞ্জাবি। আজ সকালেই তো পড়লে, সিল্কের ভিতরও কয়লা আছে—"

কালো ব্যাঙ্‌টাও আর কালো নেই, ব্যাঙ্‌ও নেই। হয়ে গেছে সাদা সাবান। হাসছে আর বলছে, "আমি ময়লা সাফ করি বটে, কিন্তু ভুলো না আমার ভিতরও কয়লা আছে—"

কানের কাছে ফিসফিস ক'রে কে বললে, "অনেক আগেই তো পড়েছ, আমিও কয়লা—"

ডান হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল সে, আংটির হীরেটা কথা বলছে!

ঘুম ভেঙে গেল খোকনের।

উঠে বসল সে।

চার

তার পরদিন সে কেমিস্ট্রির অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। খুলে বললে সব। শুনে তিনি হেসে ফেললেন।

বললেন, "খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছ তুমি। আরও যখন বড় হবে, আরও যখন পড়বে তখন বুঝবে যে বাইরের জগতে নানা জিনিসের যে নানারূপ আমরা দেখি, তা আসলে একই শক্তির নানা রূপ। বিদেশী বিজ্ঞানীরা এই শক্তির নাম দিয়েছেন 'এনার্জি' (Energy)। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হয়তো একেই বলেছিলেন ব্রহ্ম! এই শক্তিই নানারূপে প্রকাশিত হয়েছে বাইরের বিশ্বে। লোহাকে লোহার রূপ দিয়েছে যে শক্তি, সোনাকে সোনার রূপও দিয়েছে সেই শক্তি। লোহার ভিতর শক্তি একটা বিশেষ ধরণে আছে বলে লোহা লোহা, আর সোনার ভিতর সেই একই শক্তি অন্যরকম একটা বিশেষ ধরণে আছে বলে সোনা সোনা। আসলে লোহা আর সোনা একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। কালো সাদাও রংয়ের খেলা খালি। সূর্যালোকের সাতটা রংই যে সব জিনিস বাইরে ফিরিয়ে দেয় তারাই সাদা, অর্থাৎ সাতটা রঙের সম্মিলনই সাদা। যেসব জিনিস লাল রং ফিরিয়ে দেয় তারা লাল, যে নীল ফিরিয়ে দেয় সে নীল। আর সাতটা রংয়ের সবগুলোকেই যে-সব জিনিস নিজেদের ভিতর টেনে নেয় তাদেরই কালো দেখায়। রঙের যেখানে সম্পূর্ণ অভাব সেখানেই কালো—"

"শ্রীকৃষ্ণের রং কালো কেন তাহলে ?"

অধ্যাপক হেসে বললেন, "যেখানে অভাব সেইখানেই তো ভগবান থাকবেন।"

"ও, তাই বুঝি—"

খোকন খানিকটা বুঝলে, খানিকটা বুঝতে পারলে না। কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হ'ল তার। একদিন কয়লার বাড়ি গিয়ে হাজির হ'ল সে। তার বউয়ের হাতের তৈরি রুটি চেয়ে খেলে। তার নোংরা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলে। গা ঘিনঘিন করছিল, কিন্তু তবু নিলে।

পাঁচ

পুজোর ছুটিতে খোকন যখন বাড়ি গেল, সবাই অবাক্ হ'ল তাকে দেখে। ছিমছাম বাবুটি তো আর নেই সে! একটু যেন অন্যরকম হয়ে গেছে!

দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, "আজব শহর কোলকাতা থেকে কি আজব খবর এনেছ, শোনাও।"

"একটা খবর এনেছি।"

"কি ?"

"দুধ-সাগর কোথায় আছে !"

"বল, বল শুনি— "

"পরে বলব।"

মুচকি হেসে চলে গেল সে।

যা হয়

চার বছরের অভি কারও চাকর নয়। সে অনেক বায়না ক'রে অনেক রকম দুষ্টুমি ক'রে তবে দুধটুকু খেল। তারপর জামা-পায়জামা পরবার সময়ও অনেক খোশামোদ করতে হ'ল তাকে। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে, অনেকবার আদর ক'রে অনেক রকম লোভ দেখিয়ে তবে পরানো হ'ল তাকে জামা-পায়জামা। তারপর ঠাকুমা তার চুল আঁচড়ে দিলেন, তাতেও ঘোর আপত্তি। কিছুতেই সে নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবে না। যা করবে নিজে করবে। সাজ-গোজ যখন শেষ হ'য়ে গেল তখন সে নিজের কাঠের ঘোড়াটার উপর চড়ে বসে বলতে লাগল, হেট্ হেট্, চল, চল। আপিসের লেট হ'য়ে যায় যে।

সবাই হাসতে লাগলো।

অভির বাবা চাকুরে। সে সকাল থেকেই তাড়া দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি খেতে দাও। তাড়াহুড়ো ক'রে স্নান সেরে নিলে কোনক্রমে। তারপর গপাগপ ক'রে তপ্ত ভাত ডাল তরকারী গিলতে লাগলো। কোনক্রমে খেয়ে উঠেই কোট প্যান্ট টাই পরতে লাগলো আয়নার সামনে নানারকম মুখভঙ্গী ক'রে। আর অভির মাকে অকারণে ধমকাতে লাগল এটা দাও ওটা দাও বলে। তারপর চীৎকার ক'রে চাকরকে বলল—রাম সিংকে তাড়াতাড়ি মোটরটা স্টার্ট করতে বল। আপিসে লেট হ'য়ে যাবে আজ দেখছি—।

হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে গেল।

কেউ হাসলো না।

কল্পনা সুখ

"ওগো শুনছ ?"

"কি—"

"আমার নতুন স্যুটটা দর্জি দিয়ে যায়নি ?"

"না। তিনবার লোক পাঠিয়েছিলাম।"

স্ত্রী বিছানায় শুয়ে শুয়েই উত্তর দিচ্ছিলেন। কণ্ঠে বিরক্তির আভাস

"মহা মুশকিল হ'ল তো। কি পরে যাব এখন—"

"ওই পুরোনোটা পরেই যাও না, কেউ বুঝতে পারবে না।…"

"বরাবরই তো তাই যাচ্ছি, এবার ভেবেছিলাম নতুন পরে যাব। দর্জি দিলে না কেন ?"

"জানি না। শুনলাম সে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেছে। আমরা নাকি তাদের ন্যায্য মজুরি দিই না—"

স্ত্রী পাশ ফিরে শুলেন।

"আমার গেঞ্জিটা কই—"

"দেখ না, আলনাতেই আছে।"

"মাটি করেছে। কোটের সামনের দুটো বোতাম যে নেই দেখছি। বোতাম আছে বাড়িতে ?"

স্ত্রী নিরুত্তর।

"ওগো শুনছ ?"

"আঃ, তোমার জ্বালায় আর পারি না। সমস্ত রাত কাল ঘুম হয়নি—"

গজ গজ করতে করতে উঠলেন ভদ্রমহিলা। একটা কৌটো থেকে বোতাম বার করলেন, ছুঁচ সুতোও বার করলেন।

"ও-কি, দু'রঙের দুটো বার করলে যে—"

"এক রঙের দুটো নেই। দাও—"

"বিশ্রী দেখাবে না ?"

"ও, কেউ বুঝতে পারবে না। দাও—, দাও না শিগগির—"

দিতে হ'ল।

"চা করবে না ?"

"কাল রাত্রে থারমসে রেখে দিয়েছি খানিকটা। ভেবেছিলাম আজ ভোরে উঠব না। কিন্তু তোমার জ্বালায় তা কি আর হবার জো আছে—"

"পাঁচটা পনরো হ'ল, দাও-দাও শিগগির দাও—"

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, দশটা হাত তো নয়—"

অবশেষে বোতাম বসানো হ'ল। সূর্যদেব পুরোনো স্যুট পরে বাসি 'চা' খেয়ে মেষরাশিতে এসে উদিত হলেন।

সংজ্ঞা দেবী আবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

"এই, তোমার নাচ বন্ধ কর—"

সিংহ সগর্জনে আদেশ করলেন ময়ূরকে। কিন্তু ময়ূর নাচতেই লাগল, মনে হ'ল যেন পশুরাজের আদেশ শুনতেই পায়নি।

"বন্ধ কর তোমার নাচ। আমার রাজকার্যের বিঘ্ন হচ্ছে—"

ময়ূর নাচতে লাগল। কাছেই ময়ূরী রয়েছে, থামবে কি ক'রে।

"বন্ধ কর।"

ময়ূর শোনে না।

সিংহের গর্জনে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল।

"বন্ধ কর—বন্ধ কর—বন্ধ কর—"

ময়ূরের ভ্রূক্ষেপ নেই।

সিংহ এক লম্ফ দিয়ে তেড়ে গেল ময়ূরটাকে। ময়ূর ময়ূরী উড়ে গিয়ে বসল একটা উঁচু গাছের ডালে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল সেখান থেকে। সেই দিকে উড়ে গেল তারা। সেখানে চমৎকার উপত্যকা ছিল একটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের সানুদেশে ঘন সবুজ মেঘ নেমেছে যেন। ময়ূর আবার নাচ শুরু করল। ময়ূরী ঘুরতে লাগল আশে পাশে।

সিংহের আত্মসম্মানে কিন্তু আঘাত লেগেছিল ভয়ানক। মন্ত্রী ব্যাঘ্রকে ডেকে তিনি বললেন, "আমি রাজা, কিন্তু আমার কথা ওই সামান্য ময়ূর গ্রাহ্যই করল না! এতে ভয়ানক অপমানিত হয়েছি আমি। ওকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা কর—"

"নিশ্চয় করব। ওই ময়ূর জাতটাই বড় খারাপ। আমি যখন শিকার করতে বেরুই, চীৎকার ক'রে ক'রে সব প্রাণীদের সাবধান ক'রে দেয়। রাজন, আপনি যখন আদেশ করেছেন তখন এর ব্যবস্থা করব আমি।"

দুই

দিন দুই পরে এক শৃগাল এসে ময়ূরকে নমস্কার করল। ময়ূর মাঠে চরছিল, শৃগালকে দেখে সে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসল।

শৃগাল সবিনয়ে বলল, "আপনি গুণী লোক, আপনার গুণের সমাদর করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবু আমার সঙ্গে আপনাকে একবার আমার বাসায় যেতে হবে।"

"কেন?"

"আমার গৃহিণীর সম্প্রতি সন্তান হয়েছে। সন্তান হবার পর কেমন যেন মাথা খারাপ

হয়ে গেছে তার। কাক আমাদের চিকিৎসক। সে বললে ওকে যদি ময়ূরের নাচ দেখাতে পার তা হলে উনি সেরে উঠবেন।"

ময়ূর কেকারবে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "শৃগাল মহাশয়, আপনাকে এই বনের কে না চেনে? আপনার গৃহিণী অসুস্থ শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু আপনি একটা কথা বোধহয় জানেন না, আমি নাচি কেবল আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্য। অন্য কোন কারণে আমি নাচতে পারি না, আমার নাচ আসেই না।"

শৃগাল ফিরে গেল। তার গর্তের কাছে যে জঙ্গলটি ছিল সেই জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে বসেছিল বাঘ সিংহ দু'জনেই। তারা ভেবেছিল ময়ূর যখন শৃগালের গর্তের সামনে পুচ্ছ বিস্তার ক'রে নাচবে, তখন তারা লাফিয়ে পড়বে তার উপরে। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র বিফল হ'য়ে গেল!

তিন

তার পরদিন গেল একটা সাপ।

সাপ ময়ূরের খাদ্য। তাকে দেখেই ময়ূর উদ্যত-চঞ্চু-নখর হ'য়ে তেড়ে গেল। কিন্তু সাপটি ছিল ক্ষিপ্রগতি। সে ঘাসের ভিতর দিয়ে ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে এগিয়ে যেতে লাগল। সোনার হরিণের পিছু পিছু রামচন্দ্র যেমন ছুটেছিলেন, সাপের পিছু পিছু তেমনি ক'রে ছুটতে লাগল ময়ূর। একটা বনের ধার দিয়ে একাগ্র মনে সে ছুটে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই সিংহ লাফিয়ে পড়ল ময়ূরের উপর। কিন্তু ধরতে পারল না ময়ূরকে। ময়ূর নিমেষের মধ্যে উড়ে গিয়ে বসল একটা গাছের উপর। তারপর সিংহকে সম্বোধন ক'রে বলল—"মহারাজ, আপনার এ রকম দুর্ব্যবহারের কারণ কি বলুন—"

"তুমি আমাকে অপমান করেছ—"

"আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবার জন্যে আমি নেচে থাকি। এতে যদি আপনি অপমানিত বোধ করেন তা হলে তো আমি নাচার। আপনি সিংহিনীকে ভোলাবার জন্য যখন কেশর ফুলিয়ে, ল্যাজ নেড়ে, গর গর গর্‌র্ শব্দ করেন—তখন তো আমি অপমানিত বোধ করি না।"

"আমি তোমাকে নাচতে মানা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার মানা শোননি, তোমার রাজার আদেশ তুমি অমান্য করেছ, সে জন্যই আমি অপমানিত বোধ করছি—"

"কিন্তু মহারাজ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি পশুদের রাজা। আমি পশু নই, পাখী—"

সিংহ স্তম্ভিত হ'য়ে রইল খানিকক্ষণ।

"তাহলে তুমি ভিন্ন দেশের প্রাণী আমার দেশে এসে রয়েছ? তোমার পাসপোর্ট কই, ভিসা কই?"

ময়ূর তার পাখা দুটি নেড়ে দেখাল।

তারপর বলল, "মহারাজ, আমাদের আপনি তাড়াতে পারবেন না। আমরা থাকবই। জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিচরণ করবার বিধিদত্ত অধিকার আমাদের আছে। এ কথা ভুলবেন না। আর একটা কথাও আপনাকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি। আপনি আজ আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন, এর প্রতিশোধ আমি নেব।"

"সামান্য একটা পাখী, তুমি প্রতিশোধ নেবে? হা হা হা—"

সিংহের অট্টহাস্যে বনস্থল প্রকম্পিত হ'তে লাগল।

চার

কয়েকদিন পরে।

সিংহ একটি মেষশাবককে মেরে খাওয়ার যোগাড় করছে, এমন সময় আকাশ থেকে নেমে এল একটা প্রকাণ্ড ঝড়, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল মেষশাবককে। সিংহ সবিস্ময়ে দেখলে বিরাট এক ঈগল পক্ষ-বিস্তার ক'রে স্থির হ'য়ে রয়েছে—আকাশ-পটে। তার পায়ের নখর থেকে ঝুলছে মেষশাবক।

ঈগল বলল, "পশুরাজ সিংহ, তোমরা স্থলচর জীব। অতিশয় সীমাবদ্ধ তোমাদের শক্তি। আমরা আকাশচারী, আমরা শিল্পী, আমরা কবি, আমরা যোদ্ধা। আমার একজন প্রজাকে অপমান ক'রে তুমি সমস্ত পক্ষীজাতিকে অপমান করেছ। তাই তোমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি নীচ নই। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাই না। এই নাও তোমার খাবার—"

শূন্য থেকে মেষশাবকটা ধপাস্ ক'রে এসে পড়ল বিস্মিত সিংহের সম্মুখে। সিংহ নির্বাক হ'য়ে বসে রইল।

ফুলদানীর একটি ফুল

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, ট্রেনের আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি, মনে মনে বেশ উত্তেজিত হ'য়ে আছি, ফুলদানীর কথা মনেও ছিল না, এমন সময় হঠাৎ কার্তিক এসে ঢুকল। হাতে তার ফুলদানী।

'এই যে বৌদি যাচ্ছেন তাহলে, একেবারে রেডি—'

গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন, 'ফুলদানীটা কিনলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আপনি সেদিন আমাদের ফুলদানীটা দেখে বললেন না, যে আমিও যাবার সময় এই রকম একটা কিনে নিয়ে যাব। আমি জগুর কাছে খবর পেয়েছি আপনি কিনতে পারেন নি, কিনতে পারতেনও না, যা ভিড়, তাই আমি বেরিয়ে কিনে ফেললাম। আয়োডিন আছে ?'

'আছে। কেন, আয়োডিন নিয়ে কি করবেন—'

'হাতীবাগানে যা ভিড়। পা-টা মাড়িয়ে দিলে একজন।'

'জুতো খুলুন দেখি—' জুতো খুলল কার্তিক।

'ইস, আঙ্গুলটা থেঁতলে গেছে ! কী দরকার ছিল আপনার ভিড়ে গিয়ে ফুলদানী কেনবার। এঃ, কাপড়টাও ছিঁড়েছেন দেখছি—'

কার্তিক হে হে ক'রে হাসতে লাগল।

'ফুলদানীটা কোথায় নেবেন ? বাক্সের মধ্যে ?'

'না, বাক্স তো শাড়ি কাপড়ে ঠাসা ?'

'তাহলে—'

'ওই বালতিটার মধ্যে নিতে হবে। ওতেও তো জিনিসপত্র ভর্তি একেবারে।'

'আমি দিচ্ছি ঠিক ক'রে।'

বালতির মধ্যে নানা রকম খুঁটিনাটি বিচিত্র আকারের জিনিস। গৃহিণী সমস্ত দুপুর চেষ্টা ক'রে নানা কৌশলে ভরেছেন সেগুলি বালতিতে।

'আপনি আবার ওসব বার করবেন ? তার চেয়ে দিন, হাতে করেই নিয়ে যাব ওটা।'

তারপরই সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল।

'এই তো খালি নতুন কমোডটা যাচ্ছে ওর ভিতর কাপড় মুড়ে বসিয়ে দেওয়া যাক—'

'সেই ভালো।'

কার্তিকই একটা কাপড় দিয়ে মুড়ে কমোডের প্যানে ভালভাবে বসিয়ে দিলে সেটা। তারই দায় যেন।

বাড়ি পৌঁছে দেখি বাগানে নানারকম গোলাপ ফুল ফুটেছে। লাল, সাদা, গোলাপী, হলদে, বাদামি। রংয়ের হাট বসে গেছে যেন। নতুন ফুলদানী আমার মেয়ে মহা উৎসাহে সাজাতে বসল।

বললাম, 'খাবার ঘরের টেবিলে রেখে আয়। আমি আসছি—'

খাবার ঘরের টেবিলের সামনে বসে ফুলদানীর দিকে চেয়ে আমি কিন্তু ভয় খেয়ে গেলাম। চোখে আমার হেমারেজ হ'ল না কি ? হওয়া বিচিত্র নয়, আমি ডায়াবিটিক

লোক, খাওয়া-দাওয়ার কোনও মানা মানি না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ফুলগুলোর দিকে। ফুলগুলোর মাঝখানে কালো মতন ওটা কি ? কাউকে কিছু বললাম না। সোজা চলে গেলাম চোখের ডাক্তারের কাছে। সে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বললে, 'না, চোখ ত আপনার ঠিক আছে।'

'তবে কালো মতো ওটা কি দেখলাম ?'

'চশমায় ময়লা ছিল বোধহয়।'

বাড়ি ফিরে এসে চশমাটা ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে আবার দেখলাম। কিছু পরিবর্তন হয়নি। গোলাপফুলগুলোর মাঝখানে ঠিক সেইরকম একটা কালো জিনিস রয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ সেই কালো জিনিসটা নড়ে উঠল। আরে, এ যে কাত্তিক ! সেই টাক, সেই কালো রং, সেই টেবো গাল, আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে !

তার ওই কালো মুখখানা হঠাৎ গোলাপ ফুলের চেয়ে সুন্দর মনে হ'ল।

দুইটি চিঠি

ভাই নবদ্বীপচন্দ্র,

আশা করি মঙ্গল-মতো আছো। অনেক দিন তোমার খবর পাই নাই। আমিও অবশ্য খবর লইবার চেষ্টা করি নাই। আমাদের আর খবর কি আছে বলো। এখন খবর মানে, পারের খবর। সে খবর তো জানাই আছে, আর যেটুকু অজানা, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা যখন জানিব তখন কাহাকেও জানাইতে পারিব না। বয়স পঁচাত্তর হইল। পারঘাটাতেই তো বসিয়া আছি! কিন্তু নৌকা আসে কই ? চোখে ভাল দেখিতে পাই না। ছানি কাটাইয়াও সুবিধা হয় নাই। একটু ঝাপসাভাব থাকিয়াই গিয়াছে। খাওয়া হজম হয় না। দাঁত নাই। দিনে গলা-গলা ভাতে-ভাত আর রাত্রে খান চারেক সরুচাকলি খাই। অনেকে পাঁউরুটি দুধে ভিজাইয়া খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁউরুটির গন্ধটা আমি বরদাস্ত করিতে পারি না ভাই। খই দুধ খাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও পেটে বায়ু জন্মে। সরুচাকলিটা আমার বেশ সহ্য হইয়া গিয়াছে।

তুমি কি এখনও আগের মতো মাংস খাও ? আমার তো মাছ মাংস ছুঁইবার উপায় নাই। সর্বাঙ্গে বাত। বিশেষত ডান হাঁটুটায় এত ব্যথা যে লাঠি ছাড়া চলিতে পারি না। তোমার শরীর কেমন আছে ? এখনও কি তুমি কবিতা লেখো ? সব খবর দিও।

দিবার মতো একটা খবর অবশ্য আমার আছে এবং সেইটে বলিবার জন্যেই এতক্ষণ ভণিতা করিলাম। আমি আবার দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছি। মেয়েটি খুব গরীবের

মেয়ে। পিতৃমাতৃহীনা হইয়া একেবারে অনাথিনী হইয়া পড়িয়াছিল। ভাই বোন নাই। এক জমিদারের ছেলে তাহার উপর কু-নজর দিয়াছিল। আমি তাহার দাদামশায়ের বন্ধু বলিয়া সে আমার কাছে আসিয়া আশ্রয় লয়। আশ্রিতার মতোই থাকিত। কিন্তু পাড়ার লোকের রসনা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ গজাইয়াছে।

আমার ছেলেমেয়েরাও কড়া-কড়া চিঠি লিখিতে লাগিল। মেয়েটির অবস্থা যাহা হইল তাহা বর্ণনাতীত। শেষটা তাহাকে বিবাহই করিয়া ফেলিলাম। তাহার সমস্যারও সমাধান হইল, আমারও। আমারও সমস্যা অনেক। বৃদ্ধদেরই জীবন সমস্যা-সঙ্কুল, বিশেষত যদি তাঁহারা বিপত্নীক হন।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার শরীর নানাভাবে অপটু হইয়াছে। এ বয়সে সেবার দরকার। কিন্তু সেবা করে কে! ছেলেরা নিজের নিজের বউ লইয়া কর্মস্থলে থাকে। থাকাই উচিত। মেয়েরাও নিজেদের ঘর করিতেছে। সেটাও কাম্য। সুতরাং আমি একা পড়িয়া গিয়াছি। চাকর রাখিয়া সেবা ক্রয় করা যায় অবশ্য। কিন্তু মূল্য এত অধিক যে আমার পেন্সনে কুলায় না। চব্বিশ ঘণ্টা আমার নিকট হামে-হাল হাজির থাকিবে এরকম একটি সমর্থ চাকরের খরচ মাসে প্রায় একশত টাকা। আমি মাত্র দেড়শত টাকা পেন্সন পাই। চাকর রাখিলে অনাহারে থাকিতে হইবে। একটি বুড়ী চাকরানী রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহারই সেবার দরকার, সে আমাকে সেবা করিবে কিরূপে। কমবয়সী চাকরানী রাখিবার উপায় নাই, পাড়ার গার্জেনরা আছেন। এই মেয়েটি আসিয়া আমার বেশ সেবা-যত্ন করিতেছিল, কিন্তু ওই গার্জেনদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই শেষে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

মেয়েটি বেশ নেটিপেটি, আমার খুব সেবা করে। নাম যদিও কালী, কিন্তু দেখিতে বেশ ফরসা, ঠোঁটের উপর ছোট্ট তিল থাকাতে আরও সুন্দর দেখায়। তাছাড়া চোখে সরু করিয়া কাজল পরে বলিয়া রূপ আরও খুলিয়াছে।

আমার ছেলেরা আমাকে তাহাদের কাছে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই বিস্তৃত-পরিসর বাস্তু-ভিটা ছাড়িয়া তাহাদের কোয়ার্টারের পায়রা-খোপে যাইতে ইচ্ছা করে না। আমার বউমারা কেউ খারাপ লোক নন, কিন্তু আমার প্রস্রাবের বোতল পরিষ্কার করিবার সময় তাঁহাদের যে কুঞ্চিত-নাসা মুখভাব দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের ওসব নোংরা কাজ করিতে দিতে ভদ্রতায় বাধে। সর্বদাই যেন তাঁহাদের কাছে অপ্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। আমি নিজেও এসব করিতে পারি না, অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিবার জন্যও একজন লোক দরকার। প্রত্যহ ঘসিয়া ঘসিয়া সর্বাঙ্গে গরম তেল মালিশ না করিয়া দিলে শরীর ভাল থাকে না। রাত্রে সরুচাকলিই চাই। কে এসব করিয়া দিবে বলো?

কালীদাসী হাসিমুখে সব করিতেছে। সমস্যার সমাধান হইয়াছে। চার্লি চ্যাপলিন

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো মনীষীরাও বুড়ো বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। ছেলেরা যদি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইত তাহা হইলে ভালো চাকর রাখিতাম, বিবাহ করিতে হইত না। কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই কুলায় না, আমাকে পাঠাইবে কি করিয়া। মাঝে মাঝে আমার কাছেই তাহারা টাকা চায়।

তুমি বলিবে কালীদাসীর মতো একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমি তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছি। এক হিসাবে তাহা সত্য বটে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কি সকলের প্রতি সুবিচার করা চলে? আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শাস্ত্রেই এ-কথা বলে; মাছ-মাংস, দুধ, শাক-পাতা, ডালভাত যাহাই খাও, অপর প্রাণীকে পীড়ন করিয়া, বঞ্চিত করিয়া অথবা বধ করিয়া খাইতে হইবে। অর্থ দিয়া যতটা ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব তাহা অবশ্য আমি করিব। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে সব কালীদাসীকেই লিখিয়া দিব। আমার মৃত্যুর পর কালীদাসী যদি আবার বিবাহ করিতে চায় তাহাও সে করিতে পারিবে, এ কথাও লিখিয়া দিয়া যাইব। দেশের আইনও এখন তাহার স্বপক্ষে থাকিবে।

তুমি বাল্যবন্ধু বলিয়া অনেক কথাই তোমাকে লিখিলাম। বিবাহ করিয়াছি বলিয়া সমস্বরে সকলেই যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিতেছে। আশা করি তোমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি পাইব।

তুমি এখন কোথায় আছ জানি না। তোমার পুরাতন ঠিকানাতেই পত্রখানা পাঠাইতেছি। যেখানেই থাকো আশা করি ইহা তোমার নিকট পৌঁছিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা লও। ইতি—

তোমার বাল্যবন্ধু
রসিকলাল

বন্ধু,

কল্য তোমার পত্র ঘুরি দিগ্বিদিক
ঠিকানায় অবশেষে পৌঁছিয়াছে ঠিক।
আমারও সমস্যা ছিল তোমারি সমান
হোটেলে আশ্রয় ল'য়ে করিয়াছি তাহা সমাধান।
আমারও গৃহিণী গত,
চারি পুত্র সংসারে বিব্রত।
বৃদ্ধের জরার ভার
হাসিমুখে বহিবার
তাহাদেরও কারও সাধ্য নাই,
কলিকালে যযাতিরে কোথা পাব ভাই।

মোরও কণ্ঠে দুলাইতে মালা
হাজির হইয়াছিল কয়েকটি বালা।
কিন্তু ভাই
পারি নাই।
কণ্ঠটিরে সামালিয়া, চাপি বক্ষে মেলে
আশ্রয় লয়েছি এসে বিদেশী হোটেলে।

তুমি যে দিয়েছ যুক্তি, ঠিক তাহা, সারালো জোরালো,
কিন্তু ভাই মোর চিত্তে বহু পূর্বে যে বালিকা
জ্বেলেছিল আলো,
আজও তার শিখা,
চেয়ে আছে মোর পানে মেলি তার দৃষ্টি অনিমিখা
উজ্জ্বল অম্লান,
দ্বিতীয় শিখার আর নাই সেথা স্থান।

তবু যেন শান্তি নাই, মাঝে মাঝে কি যে হয় মনে
বসন্তে শরতে শীতে, সমুদ্রের তরঙ্গ নর্তনে
চলন্ত মেঘের মুখে কী যে বার্তা পাই অভিনব
উড়ন্ত পাখির কণ্ঠে কী যে শুনি কেমনে তা কব।

যেমন আজিকে ধর
চতুর্দিকে বর্ষা ঝর ঝর
বিব্রত বসিয়া আছি অভিভূত অনির্দিষ্ট প্রেমে
শিরো'পরে পাংখা ঘোরে তবু, সখা, উঠিয়াছি ঘেমে।

দাঁড়ায়ে দ্বারের পাশে ভাদ্র আর্দ্র-বাসা
চোখে মুখে সর্ব-অঙ্গে ভাষা
কৃষ্ণ-আঁখি-তারকায় চমকিছে বিজলী নিদয়
গুরু গুরু গুরু গুরু করিতেছে মেঘ, না, হৃদয়!
ভেক কলরব ও কি? কেকার ক্রেংকার?
অথবা এ আর্তনাদ নিষ্পিষ্ট অবচেতনার?
করিতে পারি না ঠিক তাহা
ব্যাকুল পাপিয়া কণ্ঠে ভেসে আসে—কাঁহা, পিউ কাঁহা!

মনে হয় যাই অভিসারে
খুঁজি তারে এ জীবনে পাইনি যাহারে
চলে যাই চিরন্তন পথ চিনে চিনে
কিন্তু হায় পায়ে বাত, শুগার ইউরিনে!
লজ্জা পাই, দুঃখ পাই, ভেবে সারা হই
হেনকালে শুনিলাম—মাভৈঃ মাভৈঃ।

কালী আমারেও তাই দেখাল সরণী
(নয় তব তিল-ঠোঁটী কাজল-নয়নী)
কালীর দোয়াত মোর,—সে আমারে ডাক দিয়া কহে
"ডুব দাও এই কালীদহে,
কামনা নাগের শিরে দাঁড়াইয়া আপনা পাসরি
কবি তুমি, বাজাও বাঁশরী।"
কবিতায় পত্র তাই লিখিনু নির্ভয়
বাঁশরী বাজিল কি না তুমি তাহা করিও নির্ণয়।
কবিতার সারমর্ম এই
কালী পুজা ভিন্ন জেনো বাঙালীর অন্য গতি নেই!
সে কালী মানবী কভু, লজ্জাবতী, ঘোমটা-টানা, কোমল-রসনা
কভু তিনি লোল-জিহ্বা, খড়্গ-হস্ত দেবী দিগ্বসনা।
কখনও দোয়াতে তিনি যাদুকরী কালী,
কলমের মুখে বসি করেন ঘটকালি,
মিলাইয়া দেন নিত্য কবি ও রসিকে।
নিখিলের মর্মবাণী কাব্যে যান লিখে।

ইতি
তোমার বাল্যবন্ধু
নবদ্বীপচন্দ্র

সতী

"ওটা কার ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন ? চমৎকার চেহারা তো ! আপনার মা ?"

"না, আমার কেউ নয়। আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর ছবি।"

"বন্ধুর স্ত্রীর ছবি আপনি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন ?"

"ও ছবি দুর্লভ ব'লে !"

"কি রকম—"

"তাহ'লে সব খুলে বলতে হয়। আজকাল সতীর কদর নেই। যত কদর অসতীদের। কাগজে পত্রিকায় সমাজে তাদেরই জয়জয়কার। জীবনে ওই একটি সতী দেখেছিলাম, তাই ছবিটি যোগাড় ক'রে রেখেছি। রোজ সকালে উঠেই প্রণাম করি।"

"প্রণাম করেন ?"

"প্রণাম করি। ওই একটি প্রণামই সত্য প্রণাম হয়। তাছাড়া যে-সব প্রণাম রোজ ডাইনে-বাঁয়ে করতে হয় সে-সব মেকি প্রণাম, স্বার্থের জন্যে বা ভদ্রতার খাতিরে। মা বাবাকে অবশ্য সত্যি প্রণাম করতুম, কিন্তু তাঁরা তো অনেকদিন হ'ল গত হয়েছেন। তাঁদের ছবিও নেই, সেকালে ছবি তোলার তত রেওয়াজও ছিল না। তাঁদের আলেখ্য তাই চোখের সামনে নেই। তবে ভাগ্যবলে ওই পুণ্যবতীর ছবিটি পেয়েছি।"

ভবতোষবাবু আবার প্রণাম করলেন ছবিটিকে।

তাঁর বেয়াই ত্রিদিববাবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ছবিটির দিকে। তারপর বললেন, "চেহারাটা খুবই অসাধারণ সত্যি—। ইনি যে সতী ছিলেন তা আপনি জানলেন কি ক'রে—"

"আপনি যে সন্দেহ-প্রকাশ করছেন সেজন্য আমি রাগ করছি না। ওরকম রূপসী যে সতী থাকতে পারে এ বিশ্বাসই আমাদের চলে গেছে। আজকাল সমাজে অসতীদের আমরা মেনে নিয়েছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যেন সতী হওয়াটা একটা কুসংস্কার। যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা এ-কথাও প্রচার করেন, স্ত্রীলোক মাত্রকেই কেনা যায়। তারতম্যটা শুধু দামের। হে হে হে হে—"

গড়গড়ায় টান দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন ভবতোষবাবু। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে চুপ ক'রে গেলেন ভুরু কুঁচকে।

"ওদের দোষ নেই। ওরা দেখছে যারা কবি সাহিত্যিক তাদেরও টাকার জুতো মেরে কেনা যায়, তারাও মঞ্চে দাড়িয়ে 'হাঁ' কে 'না' ব'লে বক্তৃতা দেয়। ওরা দেখছে যে, টাকা দিয়ে অমুকানন্দ তমুকানন্দকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায়. ওরা দেখছে যে টাকার মহিমায় বামপন্থী নেতা দক্ষিণপন্থী হ'য়ে যান, দক্ষিণপন্থীর বামপন্থী হ'তে আটকায় না ; ওরা দেখছে, ঘরের বউ প্রায়-উলঙ্গ হ'য়ে সিনেমায় নাচছে টাকার লোভে, ওদের দোষ কি। তাছাড়া আর একটা কথা আছে—"

গড়গড়ায় টান দিতে দিতে হাঁটু দোলাতে লাগলেন ভবতোষ। ত্রিদিববাবু আগে দক্ষিণপন্থী ছিলেন, এখন বামপন্থী হয়েছেন, তাছাড়া তিনি মেয়ের বাবা, প্রতিবাদ করতে পারলেন না, ভিজা বিড়ালের মতো চাইতে লাগলেন কেবল।

ভবতোষবাবু বললেন, "আর একটা মস্ত কথা আছে এর ভিতর। সবাই ইচ্ছে করলে সতী হ'তে পারে না। সবাই কি ভক্ত হতে পারে? আমরা জগন্নাথদেবের ওই রকম মূর্তি দেখে কি তাঁকে পরম করুণাময় ভগবান বলে মনে করতে পারি, চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন পেরেছিলেন? আমরা সবাই কলম দিয়ে কাগজের উপর লিখি, কিন্তু সবাই কি আমরা লেখক? আমরা বই পেলেই পড়ি, কিন্তু সবাই কি পাঠক হ'তে পেরেছি? মন সেইভাবে তৈরি হওয়া চাই, সকলের তা হয় না। নিজের অন্তরে ঐশ্বর্য থাকা চাই, সেই ঐশ্বর্য বাইরে আরোপ করবার শক্তি থাকা চাই, তবে ওসব হয়। পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের যে গুরুগম্ভীর ভীষণ মূর্তি আছে, শ্রীচৈতন্য কিন্তু ওর মধ্যেই মদনমোহন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ ছিল তাকেই তিনি বাইরে দেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—মূর্তিতে ছিল না, ছিল তাঁর মনে, তাঁর চোখের মণিতে। সতীরাও তাই, স্বামীরা যেমনই হোক, তার মধ্যে তাঁরা দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেন। স্বামীর মধ্যে দেবত্ব নাই, দেবত্ব আছে ওই সতীর মনে। সেরকম মন আর কই, আজকাল তো চোখে পড়ে না। এখন স্ত্রীরা স্বামীর রূপ চায়, ধন চায়, খ্যাতি চায়, মর্যাদা চায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চায়—তবেই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তা-ও হয়তো করেন না। যে স্বামীর রূপ নেই, ধন নেই, খ্যাতি নেই, চরিত্র নেই—এরকম স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করতে পারে এরকম স্ত্রীলোক ওই একটি ছাড়া আর দেখিনি।"

আবার খানিকক্ষণ ছবিটির দিকে চেয়ে রইলেন ভবতোষ। আবার প্রণাম করলেন। ত্রিদিববাবু একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। একটু উসখুস ক'রে বললেন, "হাঁ, আপনি যেরকম বলছেন সে রকম সতী আজকাল আর কই। আমাদের রজনীবাবুর স্ত্রীকে খুব সতীসাধ্বী ব'লে জানতাম, কিন্তু শেষকালে সে-ও একটা ছোঁড়া অ্যাক্টারের সঙ্গে জুটে গেল, সিফিলিসও হ'ল—"

"হ্যাঁ, ঘরে-ঘরেই তো আজকাল ওই ব্যাপার। সেইজন্যেই ওই ছবিটির এত দাম। শুনবেন ওঁর কথা?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে, নিশ্চয় শুনব।"

"আপত্তি কিছুই নেই। দেবীর গুণকীর্তন করলে পুণ্যই হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "আমি নাম-ধাম গোপন করেই বলছি। আমার বন্ধুর অন্য নাম ছিল, আমি তাকে কেষ্ট ব'লে পরিচয় দিচ্ছি আপনার কাছে। কেষ্ট আমার বাল্যবন্ধু ছিল। স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজ পর্যন্ত পড়েছিলাম একসঙ্গে। ওর মাকে আমি মাসীমা বলতাম। কেষ্টও আমার মাকে মাসীমা বলত। রক্তের

সম্পর্ক না থাকলেও প্রাণের সম্পর্ক খুব গভীর ছিল। রক্তের সম্পর্ক ছিল না বলেই বোধহয় প্রাণের সম্পর্কটা এত গভীর হয়েছিল। রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনরা প্রায়ই শত্রু হয়। আমি আই-এ পাশ ক'রে আর পড়লাম না, বাবা বললেন, আর পড়ে সময় নষ্ট করছ কেন, দোকানে এসে বোসো, নিজের ব্যবসা দেখে-শুনে নাও। কেষ্ট গরীবের ছেলে ছিল, সে এম. এ. পাশ ক'রে একজায়গায় চাকরি করতে লাগল। কেষ্ট দেখতে ভালো ছিল না। বেঁটে, কালো, রোগা। মাইনে পেত পঁচাত্তর টাকা। তবু তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল অনেক। আমি তার সঙ্গে প্রায়ই মেয়ে দেখতে যেতাম। অনেক মেয়ে দেখার পর এঁকে দেখলাম। একেবারে যেন দেবীমূর্তি, লক্ষ্মীপ্রতিমা। অপছন্দর প্রশ্নই উঠল না, দেনা-পাওনাতেও আটকালো না, বিয়ে হ'য়ে গেল। আমি ওর বন্ধু, আমার আনন্দিত হওয়া উচিত, কিন্তু আনন্দ না হ'য়ে হিংসে হ'ল। আমার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমার বউও দেখতে নেহাত খারাপ ছিল না, বেঁচে থাকলে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পেতেন। কিন্তু এ-দেবীপ্রতিমার কাছে তার রূপ ম্লান হ'য়ে গেল আমার চোখে। আমি বাইরে যদিও দেঁতো-হাসি হাসতে লাগলাম কিন্তু মনে মনে আমার ঈর্ষার আগুন জ্বলতে লাগল। কিন্তু মনের আগুন মনেই চেপে রাখতে হ'ল, উপায় কি। এইভাবে কাটল কিছুদিন। কেষ্টর বাড়িতে আমার অবাধ গতি ছিল। রোজ যেতাম। কেষ্টর বউ চা জলখাবার পান দেবার জন্যে আমার সামনে বেরুতও। কিন্তু তার মুখ কখনও দেখতে পাইনি। আলতা-রাঙা পা দুটিই দেখতাম কেবল। বন্ধুর বউ, সুতরাং হাসি-ঠাট্টাও করতাম তার সঙ্গে। কিন্তু ও-তরফ থেকে কোনরকম সাড়া পাইনি কোনদিন। ঘোমটা-টানা সেই নীরব মূর্তি আজও আমি দেখতে পাই চোখের সামনে। কেষ্ট তার বউকে ভালোবাসত খুব। অমন বউকে ভালো না বাসাটাই আশ্চর্য। আমিও ভালোবাসতুম। যাকে বলে—লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট—তাই হয়েছিল। মনে মনে দুরভিসন্ধিও ছিল কিছু। বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা যখন আমার হাতে এলো তখন আমার ব্যাঙ্কে পঁচিশ লক্ষ টাকা মজুত। মাথা তখন গগনচুম্বী হয়েছে। ধারণা হয়েছে, টাকার জোরে সব করতে পারি। কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী মারা গেল বিনয়কে রেখে। তখন দড়ি-ছেঁড়া ষাঁড়ের মতো আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম চতুর্দিকে। অনেক বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, অনেক সুন্দরী ধনী-কন্যা এসেছিল, অনেক লেখাপড়াজানা কালচার্ড মেয়ে এসেছিল এই প্রৌঢ় কুদর্শন লোকটার গলায় মালা দেবে বলে। কিন্তু আমি কাউকে আমোল দিইনি। মনের অন্তরীক্ষে দেবীর মত দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টর বউ। আমি তার হাতে একটা মালাও কল্পনা করেছিলাম। ওই ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের অঙ্ক আমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল—"

চুপ করলেন ভবতোষবাবু। ভৃত্য আর-এক কলকে তামাক দিয়ে গেল। তিনি ধীরে ধীরে টান দিতে লাগলেন গড়গড়ায়। অনেকক্ষণ চুপ্ ক'রে রইলেন। মনে হ'ল অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছেন।

তারপর হঠাৎ বললেন, "কেষ্টর বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা বরাবরই অব্যাহত ছিল। আমার মনে যে এ দুরভিসন্ধি আছে তা ওরা কল্পনাও করতে পারত না। আমি যেতাম বটে, কিন্তু কেষ্টর বউ পারতপক্ষে আমার সামনে আসত না। কি রকম ক'রে সে যেন বুঝতে পেরেছিল আমি নর-রূপী রাবণ একটি। মেয়েরা এটা বুঝতে পারে। যেসব মেয়ে খারাপ হয় তারা রাবণটির সামনে শাড়ির এবং দেহের বাহার ফলিয়ে ঘুর-ঘুর করে, আর যারা ভালো হয় তারা দূরে সরে থাকে! আমার মধ্যে যে একটা লোলুপ 'রাবণ' আছে, কেষ্টর বউ সেটা টের পেয়েছিল। রাবণ বীর ছিল, জোর ক'রে সীতাহরণ করেছিল। কিন্তু আমি ছিলাম ভীতু। আড়ালে-আবডালে যেন ফাঁক খুঁজছিলাম। কিন্তু ফাঁক পাচ্ছিলাম না। ওদের দাম্পত্য-প্রণয় ছিল একেবারে রেক্তার গাঁথুনিতে গাঁথা! ছুঁচ প্রবেশের উপায় ছিল না। আমি ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে, ফাল হ'য়ে বেরুব ভেবেছিলাম। কিন্তু ঢোকবারই রাস্তা ছিল না। কেষ্টর কোনও ছেলেপুলে হয়নি। কেষ্টর বউ কেষ্টকে নিয়েই দিনরাত থাকত। নিজে হাতে তার কাপড় জামা কাচত, নিজে হাতে তার জন্যে রান্না করত, নিজে তাকে সাবান মাখিয়ে চান করাত, নিজে তার চিবুক ধরে মাথার চুল আঁচড়ে দিত, নিজে পাখা নিয়ে ব'সে থাকত তার খাবার সময়। দুপুরে কেষ্ট যখন আপিসে চ'লে যেত তখনও সে কেষ্টরই সেবা করত। হয় তার জামায় বোতাম লাগাচ্ছে, নয় তার কাপড়ের কোথায় খোঁচ লেগেছে সেটা সেলাই করছে, নয় তার জন্যে মোজা বা সোয়েটার বুনছে। কেষ্ট যেসব খাবার ভালবাসত তা-ও তৈরি করত দুপুরে ব'সে। আমসত্ত দিত, বড়ি দিত, আচার তৈরি করত, মোরব্বা তৈরি করত। একেবারে নিশ্ছিদ্র ব্যাপার। কোনও দিক দিয়ে প্রবেশের উপায় ছিল না।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর ভগবান একদিন সুযোগ দিলেন আমাকে। সুযোগটা এই—কেষ্টর পদস্খলন হ'ল। খবর পেলাম যে রামবাগানে এক মাগীর ওখানে যাতায়াত করছে। প্রাণে একটু আশা হ'ল। একদিন রাত দশটার সময় কেষ্টর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কেষ্ট তখনও ফেরেনি, তার বউ জানলার গরাদে ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। দেখে চলে এলাম। তারপর তাদের দাইকে হাত করলাম। তার কাজ হ'ল, কেষ্টর সঙ্গে বউয়ের সম্পর্কটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে তার খবর রাখা। দাইটি বেশ ঘাঘি, আড়ি পাততে ওস্তাদ। সে রোজ এসে খবর দিত—কই বাবু, কিছু তো বুঝতে পারি না। আগে যেমন ছিল, এখনও তো তেমনি আছে। তারপর একদিন এসে বললে—আজ ওরা ঘরে অনেকক্ষণ খিল দিয়ে ছিল। আমি বাইরে থেকে আড়ি পেতে সব শুনেছি। বাবু হাউ হাউ ক'রে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি বিপথে গেছি। আর কখনও যাবো না, আমাকে ক্ষমা করো। আমি জিগ্যেস করলুম, কেষ্টর বউ কি বললে? না, কিছু বললেন না, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, তাই তো, এ কি হ'ল। একটিবার শুধু বললেন। তার পরদিন ঝিটা আবার এলো। বললে, আর বিশেষ কিছু হয়নি, মা খালি মাঝে মাঝে

বলছেন, তাই তো, একি হ'ল ! একা একা আপনমনেই এ-কথা বলেন। আমার মনে হ'ল এই সুযোগ। আমি দাইয়ের মারফত একটা চিঠি পাঠালাম সাহস ক'রে। তাতে শুধু লিখলাম—ওই পাপিষ্ঠের কাছে তুমি আর থেকো না। আমার বাড়িতে এসো, তোমাকে রাজরাজেশ্বরী ক'রে রেখে দেবো ! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—

"আমি মহাপাপী, তাই আমার স্বামী বিপথে গেছেন। তাই আপনি (যাঁকে আমি এতকাল দাদার মতো শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি) আমাকে এমন চিঠি লিখতে পারলেন। দোষ আপনাদের কারও নয়, দোষ আমার মধ্যেই আছে নিশ্চয়। তাই এসব ঘটছে। আমি আপনাদের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবো।" তারপর দিনই আপিং খেলে। কেষ্ট মনে করলে, তারই পদস্খলনের কথা শুনে এই কাণ্ড ঘটল বুঝি। কিন্তু আমি জানতাম আসল কারণ কি। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাপত্র ক'রে বাঁচিয়ে তুললাম তাকে, তারপর থেকে আর তাদের বাড়ি যাইনি। যাবার সাহস হয়নি। এ ঘটনার পর কেষ্ট কিন্তু ভেঙে পড়ল। খেতো না, কথা কইত না, বিমর্ষ হ'য়ে বসে থাকত খালি। দিনকতক পরে শয্যা নিলে। দিনরাত কাঁদত খালি। চোখের জলের ধারায় তার নাকের দু'পাশ হেজে গেল। ডাক্তার এসে বললেন, মানসিক ব্যাধি। কেষ্টর বউ দিবারাত্রি তার মাথার শিয়রে বসে সেবা করত। ডাক্তারি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী—সবরকম চিকিৎসাই হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেষ্ট বাঁচল না। কেষ্টকে যখন আমরা শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তখন কেষ্টর বউ তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠল—না, না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। বলেই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হ'ল তার। এক চিতায় দু'জনকে পোড়ানো হ'ল—"

ভবতোষবাবু নির্নিমেষে ছবিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর প্রণাম করলেন আর একবার।

নেপথ্যে

তিনু সেদিন স্টেশন থেকে খুব উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরল। চাপা উত্তেজনা, কারণ কথাটা কাউকে বলা চলবে না। তিনি কাউকে বলতে মানা করেছেন, কিন্তু জনকয়েককে ত বলতেই হবে। বিশেষত মণিকে। একটা মালাও তো গাঁথতে হবে অন্তত, তাদের বাগানেই ফুল আছে। বাজারের কেনা মালা তাঁকে দেওয়া চলবে না। তাছাড়া কাকে কাকে খবরটা বলতে হবে সে-ও একটা সমস্যা। যাকে বাদ দেওয়া যাবে সে-ই চটে যাবে। কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যাবেই। এত বড় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে চাপা দেওয়া শক্ত। তাছাড়া আর একটা কথা, মেয়েদের কাউকে খবর দেওয়া হবে কিনা। তার বোন অঞ্জলি, কিম্বা মণির বোন মুকুলকে

অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ভয়, তাদের পেটে কথা থাকবে কি! অঞ্জলিটা যা বক্তিয়ার খিলিজি! শুধু যে তার পেটে কথা থাকে না তা নয়, কথা বাড়িয়ে বলে। বেড়াল দেখলে বলে বাঘ দেখেছি। মুকুলটাও প্রায় তাই। মণির সঙ্গে পরামর্শ না করলে কিছুই ঠিক করা যাবে না। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল মণির বাড়ির উদ্দেশে। মণির বাড়িতে গিয়ে দেখল মণি নেই। এই আশঙ্কাই করেছিল সে। মণি ক্লাসের ভালো ছেলে, প্রায় প্রতি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে, তাই মাস্টাররা তাকে ভালোবাসেন সবাই। থার্ড মাস্টার আর ফোর্থ মাস্টার তাকে বিনা পয়সায় পড়ান। তাই সে কোনদিন থার্ড মাস্টার, কোনদিন ফোর্থ মাস্টারের বাড়ি যায়। থার্ড মাস্টার তাকে অঙ্ক পড়ান, ফোর্থ মাস্টার ইংরেজী।

দেখা হ'ল মণির বোন মুকুলের সঙ্গে।

"দাদা তো বাড়িতে নেই। থার্ড মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেছে। কেন, এসময় কি দরকার?"

মুকুলের বয়স বছর এগারো। একটু ফাজিল গোছের।

"সিনেমার টিকিট যোগাড় করেছ বুঝি।"

মুচকি হেসে বলল সে।

এ কথার জবাব না দিয়ে তিনু বলল—"তুই একটা বেলফুলের মালা গেঁথে দিতে পারিস?"

"কেন। বেলফুলের মালা নিয়ে কি করবে এখন! বিয়ে নাকি?"

"বিয়ে নয়, অন্য দরকার আছে।"

"কি দরকার?"

"তুই পারবি কি না বল না!"

"পারব। কিন্তু মালা নিয়ে কি করবে তা বলতে হবে।"

"আচ্ছা, সে যখন মালা নেব তখন বলব। তুই গেঁথে রাখিস তাহলে, আমি ঘুরে আসছি।"

"কতক্ষণ পরে আসবে?"

"ঘণ্টাখানেক পরে। আমি যাচ্ছি এখন মণির কাছে। আমরা দু'জনেই আসব এক ঘণ্টা পরে। মালা গেঁথে রাখিস, বুঝলি—"

"আচ্ছা—"

একটু দূর এগিয়ে গেছে, এমন সময় মুকুলের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তিনু দা—শুনে যা-ও।"

"কি—"

"তুমি মাকে বলে যাও, তা না হলে মা আমাকে সন্ধের পর গাছ থেকে ফুল তুলতে দেবে না।"

"কেন, সন্ধের পর গাছ থেকে ফুল তুললে কি হয় ?"

"গাছের ঘুম ভেঙে যায়, কষ্ট হয়।"

মুচকি হেসে মুকুল ছুটে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

একটু বিব্রত হয়ে পড়ল তিনু। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

মুকুলের মা ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন, বাজার-থেকে-আনা জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে তুলে রাখছিলেন। সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল তিনু।

"কাকীমা মুকুলকে বলুন না, বেলফুলের একটা মালা গেঁথে দিক। আপনাদের বাগানে তো প্রচুর বেলফুল।"

"এত রাত্রে মালা নিয়ে কি করবে বাবা ?"

"ভীষণ দরকার।"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনুর মুখের দিকে। তাঁর মনে হ'ল 'ভীষণ' কথাটার মানেটা বদলে দিয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। মুকুলের মা মূর্খ নন, বেথুন থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন। কিন্তু বি-এ পাশ করলে কি হবে, মনটি একেবারে সেকেলে।

"কি এমন ভীষণ দরকার হ'ল এখন ?"

"তা কাল বলব। যাঁর জন্যে মালা দরকার আজ তিনি কথাটা প্রকাশ করতে বারণ করেছেন।"

চুপ ক'রে রইলেন মুকুলের মা।

তারপর বললেন, "কিন্তু রাত্রে যে ফুলগাছে হাত দিতে নেই বাবা! রাত্রে গাছেরা ঘুমোয়—"

"রাত্রে আমরাও ঘুমোই, কিন্তু খুব দরকার হ'লে কি আমাদের আপনি জাগাবেন না ?"

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিনুর মুখের দিকে। মনে মনে বললেন, ছেলেটা বরবারই জেদী। মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি।

এর ঠিক পরেই কিন্তু তিনু যা করলে তাতে কাবু হয়ে পড়তে হ'ল মুকুলের মাকে।

তিনু আবদার-মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, "ওসব কিছু শুনব না কাকীমা। মালা একটা চাইই আজ রাত্রে। না পেলে লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যাবে আমাদের। কাল সব কথা বলব আপনাকে।"

"তবে বলে যা মুকুলকে গেঁথে রাখুক একটা। এত জ্বালাস তোরা!"

দুই

থার্ড মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই তিনু দেখতে পেল থার্ড মাস্টার মশাই মণিকে পড়াচ্ছেন। মণি পেন্সিল হাতে ক'রে একটা খাতার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ব'সে আছে। তিনুর মনে হ'ল খুব সম্ভব শক্ত কোনও অঙ্ক দিয়েছেন। থার্ড মাস্টারমশাইও ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছেন মণির দিকে। পরিবেশটা খুব অনুকূল মনে হ'ল না তিনুর। এ অবস্থায় ও ঘরে ঢোকা আর বাঘের মুখে পড়া একই জিনিস। হয়তো তাকেও দেখলে বসিয়ে দেবেন অঙ্ক কষতে। বলবেন, "মণি এটা পারছে না, দেখ দিকি তুমি পার কিনা।" মণি যে অঙ্ক পারছে না তা সে নিশ্চয়ই পারবে না, মাঝ থেকে সময় নষ্ট হ'য়ে যাবে খানিকটা। হঠাৎ একটা কথা তার মাথায় খেলে গেল, থার্ড মাস্টারমশাইকেও ব্যাপারটা বললে কেমন হয়। নূতন ইন্‌সপেকটারের ভাইপো সম্প্রতি বি-এ. বি-টি পাশ করেছে, তাকে তিনি বসাতে চান থার্ড মাস্টারের জায়গায়। তাই আজকাল তিনি নানা রকমে থার্ড মাস্টারের খুঁত ধরছেন। গতবার এসে তিনি থার্ড মাস্টারকে অপমানই ক'রে গেছেন ক্লাসের সামনে। থার্ড মাস্টারমশাই এই অশিষ্ট ব্যবহারের প্রতিবাদ ক'রে ওপরওলার কাছে চিঠি লিখেছেন কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। তাঁর দরখাস্তের জবাব পর্যন্ত আসেনি। সব নাকি মুখ শোঁকাশুকি আছে। ওপরওলারা নাকি সব অবাঙালী, বাঙালীর কোন নালিশই শুনতে চান না। মাস্টারমশাই ওঁকে যদি সব কথা খুলে বলেন তাহ'লে হয়তো উনি কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। তিনু তার নিজের বাবার কথাটাও বলবে ভেবেছে। কিছুতেই তাঁকে প্রমোশন দিচ্ছে না। তাঁর নীচের লোকেরা কেউ মিনিস্টারের আত্মীয়, কেউ শিডিউল্‌ড্ কাস্ট, কেউ বড়বাবুর ভাগনে বলে প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার বাবার চাকরিতে উন্নতি হচ্ছে না। ওঁকে বললে উনি হয়তো কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন। আর উনি বললে কি না হ'তে পারে।

হঠাৎ থার্ড মাস্টারমশাই চোখ তুলে বারান্দার দিকে চাইলেন।

"কে ওখানে দাঁড়িয়ে?'

"আজ্ঞে, আমি তিনু।"

তিনু এসে ভিতরে ঢুকল।

"ও তুমি। এমন সময় হঠাৎ কি দরকার?"

"আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা আছে সার।"

"আমার সঙ্গে? প্রাইভেটলি; কি কথা—"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল তিনু। তার প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্ছিল এইবার বুঝি মাস্টার মশাই ধমক দিয়ে উঠবেন। কিন্তু মাস্টারমশাই তা করলেন না, খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আচ্ছা, বল, শুনি কি তোমার প্রাইভেট কথা।"

সব শুনে থার্ড মাস্টারমশাইও অবাক হ'য়ে গেলেন। এ যে অবিশ্বাস্য, অথচ একথা বিশ্বাস করবার জন্যে তাঁরও সারা হৃদয় যে উন্মুখ হয়ে আছে।

"তুমি ঠিক দেখেছ ?"

"ঠিক দেখেছি সার। আমার একটুও ভুল হয়নি।"

"স্টেশনে ওয়েটিং রুমে ব'সে আছেন ? এখানে নিয়ে এলে না কেন ?"

"তিনি যে কিছুতেই আসতে চাইলেন না। বললেন খুব জরুরি দরকারে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। রাত্রি দুটোয় তাঁর গাড়ি। আপনি একবার চলুন সার—"

থার্ড মাস্টারমশাই চুপ ক'রে রইলেন।

"তিনি কি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি—"

তাঁর কথা শেষ করতে দিলে না তিনু।

"না, তিনি স্বীকার করেন নি যদিও, কিন্তু অস্বীকারও করেন নি। মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইলেন। আমার ভুল হয়নি সার। তিনি আর একটা কথাও বলেছেন, খুব যেন জানাজানি না হয়—"

থার্ড মাস্টারমশাই ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইলেন আরও কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "বেশ আর কাউকে বোলো না। তুমি, আমি আর মণি স্টেশনে যাব। একটা মালা যোগাড় ক'রে ফেল—"

"মালা গাঁথতে দিয়েছি সার।"

"বেশ, একটা নাগাদ বেরুব বাড়ি থেকে। ঠিক সময়ে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।"

সোৎসাহে তিনু বাড়ি ফিরে গেল।

তিন

স্টেশনের কাছেই এক মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের চূড়ার উপর দপদপ ক'রে জ্বলছিল একটা বড় নক্ষত্র। অন্ধকারে মনে হচ্ছিল যেন কোনও বিরাট পুরুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গগনস্পর্শী ললাটে যেন পরানো হয়েছে এক রহস্যময় অদৃশ্য মুকুট আর সেই মুকুটের মধ্যমণি যেন ওই নক্ষত্র।

তিনু, মণি আর থার্ড মাস্টারমশাই যখন স্টেশনে এসে পৌছল তখন ঠিক একটা বেজেছে। মণির হাতে একটি মালা। মুকুল সত্যিই বেশ চমৎকার ক'রে গেঁথে দিয়েছিল মালাটি। তিনুর হাতে একটি কাগজ। স্টেশনে কোনও লোক নেই বিশেষ। মফস্বলের স্টেশনে লোক থাকেও না বিশেষ এত রাত্রে। স্টেশনের বাবুরা শুধু জেগে কাজ করছেন নিজেদের আপিসে। গোটা কয়েক কুলি একধারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনু, মণি আর মাস্টারমশাই এগিয়ে গেল ওয়েটিং রুমের দিকে। ওয়েটিং রুমেই তাঁর থাকবার কথা, তিনুকে সেই কথাই বলেছিলেন তিনি। তিনু ওয়েটিং রুমে উঁকি দিয়ে দেখল। প্রথমে দেখতে পেল না কাউকে। চেয়ার বেঞ্চি সব খালি। তারপর হঠাৎ দেখতে পেল কোণের দিকে আপাদমস্তক চাদর দিয়ে মুড়ে কে শুয়ে আছে। তিনু আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ে হাত দিতেই তিনি উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। এই যে তিনি। থার্ড মাস্টারও অবাক হয়ে গেলেন। সত্যিই তো।

ভদ্রলোক উঠে বসেছিলেন, তিনি তিনুকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "ও, তুমি এসে গেছ বুঝি। বস, বস। তারপর ওটা কি?"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে তিনু বললে, "ওটা ফুলের মালা, আপনার জন্তই এনেছি।"

মণির হাত থেকে মালাটি নিয়ে তিনু তাঁকে পরিয়ে দিলে সেটি। তারপর প্রণাম করলে। মণিও করলে, থার্ড মাস্টারমশাইও করলেন। ভদ্রলোক হাসিমুখে প্রতি-নমস্কার করলেন কেবল, আর কিছু বললেন না।

তিনু তখন তার অভিনন্দনপত্রখানা খুলে পড়তে লাগল।

"হে নেতাজী, হে ভারতবরেণ্য বাংলাদেশের সুসন্তান, আজ যে এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে আপনার দেখা পাব তা আমাদের সুদূরতম কল্পনারও অতীত ছিল। আপনি যে এখনও জীবিত আছেন, একথা আমাদের দেশের অনেকে বিশ্বাস করেন, আমরাও করতাম। আজ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে কৃতার্থ হলাম।

আজ বাংলাদেশের বড় দুর্দিন। স্বাধীনতা দেবার ছুতোয় ইংরেজ বাংলাদেশকে আবার দ্বিখণ্ডিত ক'রে চলে গেছে। অসংখ্য বাঙালী পথে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, গৃহহীন বাঙালীর হাহাকারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ, কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতার সিংহাসনে আজ সমাসীন তাঁদের কানে এ হাহাকার প্রবেশ করে না। উপরন্তু তাঁদের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে বাঙালীরা যেন দেশের কেউ নয়, বাঙালীরা যেন স্বাধীনতার জন্ত কিছু করেনি, যা করেছে সব অবাঙালীরা। চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান নেই, অন্তায়ভাবে অত্যাচার ক'রে তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। আমার বাবা কখনও ঘুষ নিতেন না, এই জন্তই তাঁর প্রোমোশন হয় না। প্রোমোশন হয়েছে মিনিস্টারের এক ভাইপোর। ওপরওলাদের ইচ্ছে কর্মচারীরা সব ঘুষ নিক এবং টাকাটা সবাই মিলে ভাগাভাগি ক'রে নেওয়া হোক। আমার বাবা তা করতে রাজী হন না বলে তাঁর উপর সবাই চটা। সর্বত্রই এই।

রাষ্ট্রভাষার নামে জোর ক'রে হিন্দী আমাদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আমাদের স্কুলে নতুন যে অবাঙালী হেডমাস্টার এসেছেন, তিনি বাড়িতে তাসের আড্ডা বসিয়ে জুয়ো খেলেন, আমাদের থার্ড মাস্টারমশাই সে আড্ডায় যান না বলে হেডমাস্টার তাঁর উপর অপ্রসন্ন। নানা ছুতোয় ওঁর নামে অভিযোগ করেন ওপরওলার কাছে। বাংলাদেশে যে-সব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাতেও বাঙালীরা চাকরি পায় না,

সেখানেও অবাঙালীদের প্রতাপ। স্বাধীনতার নামে যে জিনিস দেশে চালু হয়েছে, তা বাঙালীদের পক্ষে নির্বাতনের নামান্তর। এ সময় আপনি এমনভাবে আত্মগোপন ক'রে আছেন কেন? ভাস্বর-দীপ্তিতে আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনাকে পুরোভাগে রেখে আবার আমরা জয়-যাত্রায় অগ্রসর হই।

যে অখণ্ড অম্লান পক্ষপাতহীন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে বাঙলার ছেলেমেয়েরা দলে দলে আত্মাহুতি দিয়েছিল, সে স্বাধীনতা আমরা পাইনি। আমাদের ঠকিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে, একদল চতুর লোক ক্ষমতা হস্তগত করেছে। আদর্শবাদী বাঙালীদের তারা নিষ্পিষ্ট ক'রে মেরে ফেলতে চায়, এ বিষয়ে তারা ইংরেজদের চেয়েও নিষ্ঠুর। হে নেতাজী, আপনি আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনি এখুনি আমাদের অনুমতি দিন আমরা দামামা বাজিয়ে প্রচার করি আপনার আবির্ভাবের কথা, আসমুদ্র-হিমাচল আবার জেগে উঠুক নব স্বাধীনতার নব আন্দোলনে। হে নেতাজী, আপনি আমাদের অনুমতি দিন—"

তিনুর গলা কাঁপতে লাগল, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। সে থেমে গেল। অভিনন্দনপত্রে আর একটু লেখা ছিল, কিন্তু সে আর সেটুকু পড়তে পারল না।

তিনি নিবিষ্টচিত্তে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "এটা কি তুমি নিজে লিখেছ?"

"আমি খানিকটা লিখেছিলাম, তারপর মাস্টারমশাই বাকিটা লিখে দিয়েছেন।"

থার্ড মাস্টারমশাই বললেন, "গোড়ার দিকটা ওর লেখা, শেষের দিকটা আমার।"

তিনি তিনুর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যা লিখেছ, তা ঠিক। স্বাধীনতার নামে দেশে নানারকম অনাচার অবিচার চলছে এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমরা একদিকটা মাত্র দেখছ, এর আর একটা দিকও আছে।"

"কি সেটা আমাদের বলে দিন।"

"তোমরা নিজেদের দোষের কথা কিছু বলনি। বলনি যে তোমরা দুর্বল বলেই নানারকম মারাত্মক রোগের বীজাণু তোমাদের আক্রমণ করেছে। তোমরা যদি জীবনী-শক্তিতে বলীয়ান হ'তে, কেউ তোমাদের কিছু করতে পারত না। তোমরা অবিচার অত্যাচারকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছ, প্রতিবাদ নেই, একতা নেই, গুণীকে শ্রদ্ধা করবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, তোমরা সবাই স্ব স্ব প্রধান থাকতে চাও, একজন নেতাকে মুখ বুজে অনুসরণ করবার মতো ধৈর্যও তোমাদের নেই, মনোবৃত্তিও নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তোমরা পিছিয়ে পড়ছ। এরকম অবস্থায় দুর্দশা তো হবেই। তোমরা আগে মানুষের মতো মানুষ হও, বিদ্যায় চরিত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ কর, তাহলেই তোমাদের দুঃখ ঘুচবে।"

একটু থেমে বললেন, "আমাকে তোমরা এখন তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে বলছ। যদি আত্মপ্রকাশ করি তাহলে এর একটিমাত্র ফলই হবে, দলাদলি। আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম তখন আমাকে কেন্দ্র ক'রে যে কি কুৎসিত দলাদলি

হয়েছিল তা তোমরা যখন বড় হয়ে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়বে তখন বুঝতে পারবে। তাই আমি এখন তোমাদের মধ্যে আসতে ইতস্তত করছি, বুঝতে পারছি আমার আদর্শকে রূপ দেবার মতো যথেষ্ট লোক নেই দেশে, তোমরা যেদিন বড় হ'য়ে উপযুক্ত হ'য়ে আমাকে ডাক দেবে, সেই দিনই আমি আসব তোমাদের কাছে। তোমরা নিজেদের তৈরি কর। সেইটেই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। ট্রেনের আর বেশী সময় নেই। আজ তাহলে তোমরা এস। তোমরা সত্যি সত্যি যেদিন বড় হবে সেদিন তোমাদের মহত্ত্বের আকর্ষণেই আবার আসব তোমাদের কাছে। আমি মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে এইবার একা একটু কথা বলব, তোমরা দু'জন বাইরে যাও।"

তিনু আর মণি বাইরে চলে গেল।

তখন তিনি থার্ড মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমি নেতাজী নই। আমি সামান্য লোক। কিন্তু নেতাজীর সঙ্গে আমার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। অনেকেই আমাকে নেতাজী বলে ভুল করে। বয়স্ক লোকেরা যখন করে তখন আমি তাদের ভুল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিই। কিন্তু কিশোর ছেলেরা যখন নেতাজী বলে আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়, তখন আমি আর তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিই না। আপনার ছাত্র দুটিকে যা বললাম তাদের তাই বলি। আপনিও যেন তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেবেন না। নেতাজীকে ফিরে পাবার আশায় তারা নিজেদের ভাল ক'রে গড়ে তুলুক। আর আপনারা তাদের সে গঠনে সহায়তা করুন।"

থার্ড মাস্টারমশাই নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে ট্রেনের হুইস্‌ল্ শোনা গেল।

"আমার ট্রেন এসে গেল। আমি চলি—"

নিজের ছোট পুঁটুলিটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বেরুবার আগে মাথায় একটা টুপি পরলেন আর মুখের নিচের দিকটা চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন যাতে তাঁর মুখটা কেউ না দেখতে পায়।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীঅধর আইচ যে বাড়ির দ্বিতলের ফ্লাটে তখন থাকিতেন সে বাড়িটি অতিশয় জীর্ণ। তাঁহার লোহার দোকানটি বড়বাজারে ছিল। আইচ মহাশয়ের আর্থিক সঙ্গতির সহিত বাড়িটি খাপ খায় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে চৌরঙ্গীতে ঘর লইয়া থাকিতে পারিতেন। পিতার বিপুল সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এখন তিনি যে ঘরটিতে থাকেন তাহার দরজা-জানলা পর্যন্ত ভালো বন্ধ করা যায় না। অধর আইচ এই কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন তাহার কারণ মিস বোস। মিস বোস টেলিফোনে কাজ করেন।

একদা একটি সদ্য-মুক্ত সিনেমা চিত্রের এলাহি কাণ্ডকারখানার মধ্যে মিস বোসের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। মিস বোস স্বল্প মূল্যের টিকিট কিনিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় অধর আইচ হুড়মুড় করিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িলেন।

"সরি, কিছু মনে করবেন না। আজ বড্ড রাশ্—। বেরিয়ে আসুন ভিড় থেকে—"

উভয়ে বাহির হইয়া আসিলে আইচ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "টিকিট কিনতে পেরেছেন—"

"না—হাইয়ার ক্লাসের টিকিট ছাড়া সব টিকিট বিক্রি হ'য়ে গেছে শুনছি—"

"আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি টিকিট কিনে আনছি।"

"আমার টাকাও নিয়ে যান তাহলে—"

"আচ্ছা সে হবে এখন। আগে দেখি টিকিট পাই কি না।"

অধর আইচ চলিয়া গেলেন এবং একটু পরে দুইখানি উচ্চ মূল্যের টিকিট কিনিয়া আনিয়া বলিলেন, "চলুন এবার।"

"পেয়েছেন টিকিট?"

"পেয়েছি। আসুন—"

ভালো গদি-আঁটা চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে সিনেমা দেখিলেন। মাথার উপর পাখা ঘুরিতে লাগিল।

সেই সময়ই অধর আইচ কায়দা করিয়া মিস বোসের বাড়ির ঠিকানা জানিয়া লইয়াছিলেন। কয়েক দিন যাতায়াত করিয়া অবশেষে তিনি সেই ঠিকানাতেই উঠিয়া গেলেন। নোনাধরা নড়বড়ে বাড়িটা দেখিয়া প্রথমটা একটু ইতস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল, ওই বাড়িতেই তিনি উঠিয়া গেলেন।

শ্রীঅধর আইচ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী, শ্রীমতী যূথিকা বসু ক্রিশ্চান। কিন্তু প্রেমের দেবতার অফিসে যে-সব হিসাব রাখা হয় ধর্মের হিসাব তাহার মধ্যে নাই। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপনে, নেপথ্যে। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার সাহস কাহারও হইল না। আইচ মহাশয়ের সহিত মিস বোসের দেখা রোজই হইত। কিন্তু প্রত্যহই তিনি সে সুযোগ মামুলি কুশল প্রশ্ন করিয়া, প্রসঙ্গ তুলিয়া অথবা রাজনৈতিক কথা বলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। যে কথাটি হীরকের মতো মনের অন্ধকারে জ্বলিতেছিল তাহা কিছুতেই তিনি মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। মিস বোসেরও ঠিক ওই অবস্থা।

দুই

একদিন কিন্তু বরফ ফাটিল এক অদ্ভুত উপায়ে।

অধর আইচ অধীর হইয়া অবশেষে ঠিক করিলেন যে পত্রযোগেই মনোভাব ব্যক্ত করিবেন। ফিকে নীল রঙের একটি কাগজে তিনি নিম্নলিখিত পত্রটি ফাঁদিলেন—

সুচরিতাসু,

ভগবানের অসীম কৃপায় কিছুদিন পূর্বে আপনার সহিত সিনেমায় দেখা হইয়াছিল। আপনাকে দেখিবামাত্র মনে হইয়াছিল, এই তো সেই যাহাকে এতকাল ধরিয়া খুঁজিতেছি, যাহার আশায় এতদিন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছি···

এই পর্যন্ত লিখিয়াই আইচ মহাশয়ের মনে হইল কাজটা ঠিক হইতেছে না। প্যাড হইতে কাগজটি ছিঁড়িয়া গুলি পাকাইয়া সেটি ঘরের কোণে ফেলিয়া দিলেন।

পরদিন আবার তাঁহার মনে হইল, না, লিখিয়াই ফেলি। বিবাহের প্রস্তাব করিব ইহাতে লজ্জার কি আছে। আগের দিন কি লিখিয়াছিলেন তাহা দেখিবার জন্য কাগজের পাকানো গুলিটি ঘরের কোণে খুঁজিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন নীল কাগজের গুলি নাই, গোলাপী কাগজের একটি গুলি রহিয়াছে। গোলাপী রঙের কাগজ তো তিনি ব্যবহার করেন না। গুলিটি তুলিয়া লইয়া খুলিয়া পড়িলেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অধরবাবু, আপনাকে যে কথা আজ বলতে যাচ্ছি তা বলতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। লজ্জার মাথা খেয়ে তবু বলছি। সেদিন সিনেমায় আপনি আমার টিকিট কিনে দিলেন, দাম নিলেন না, তারপর আমি যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়িতে উঠে এসে অসীম কষ্টভোগ করছেন, আমার সামান্য উপকার করবার জন্য আপনি সর্বদাই ব্যস্ত। এ সবের অর্থ কি তা আমি বুঝি। মেয়েরা এসব কথা বুঝতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা কি আপনি বুঝতে পারেন নি? সেটা কি আমাকে খুলে বলতে হবে? বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু বড্ড লজ্জা করছে যে—

চিঠি এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

তিন

পরদিন তিনি বড়বাজারে তাঁহার লোহার দোকানে গিয়া প্রধান কর্মচারীকে একটি আদেশ দিলেন।

"ইঁদুর-ধরা কল আর বিক্রি কোরো না। আর চেনা-শোনা কাছাকাছি দোকানে যত ইঁদুর-ধরা কল আছে—সব কিনে গুদোমে পুরে ফেল।"

কর্মচারী প্রশ্ন করলেন, "দাম চড়বে না কি—"

"না। ইঁদুর-ধরা কল আর বিক্রি করব না। কাউকে বিক্রি করতে দেবও না। বাজারে যত কল আছে কিনে ফেল—"

"যে আজ্ঞে।"

তাহার পর তিনি ফোন করিলেন তাঁহার হিন্দু বন্ধু হরিপ্রসাদকে।

"হ্যালো, হরি? হরি কথা বলছ? ভাই, তোমাকে এক কাজ করতে হবে।

গণেশ পুজোটা তোমাকে করতে হবে। শুধু তাই নয়, সমারোহ সহকারে করতে হবে। যা খরচ লাগে আমি দেব। ঠাকুরের জন্ম কুমোরটুলিতে এখুনি অর্ডারটা দিয়ে দাও। ইঁদুরটি যেন বেশ বড় এবং ভাল ক'রে করে। হ্যাঁ হে ইঁদুরটি। ওই ইঁদুরের দৌলতেই আমাদের বিয়ে হচ্ছে। ইঁদুরই আমার চিঠি ওঁর কাছে এবং ওঁর চিঠি আমার কাছে নিয়ে এসেছে। হা, হা, হা, ঠিক বলেছ, এখন মেঘদূতের যুগ চলে গেছে, এখন মুষিকদূতের যুগ। আমার ঠিক পাশের ঘরেই থাকেন উনি। আর বাড়িটায় প্রচুর ইঁদুর। গণেশ পুজোটি ভাল ক'রে করবার ব্যবস্থা কোরো। আমিই করতে পারতুম, কিন্তু আমি ব্রাহ্ম, উনি ক্রিশ্চান। একটু দৃষ্টিকটু হবে না? তাই তোমার বেনামীতে করতে চাই। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা জিনিস আছে। ঠাকুরের অর্ডারটা এখুনি দিয়ে দাও। শ' দুই টাকা আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। না, না, সে কি কথা, টাকা নিতে হবে বই কি! আচ্ছা, আচ্ছা—"

স্বরূপ

থার্ড ক্লাস কামরায় অসম্ভব ভিড় সেদিন। অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার ভাগ্য ভালো ছিল, কারণ আমি একটা বেঞ্চির এককোণে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। কিন্তু জীবনে কোন সৌভাগ্যই অবিমিশ্র হয় না, গোলাপ ফুলেও কাঁটা থাকে। আমার পাশেই যে লোকটি বসেছিল তার সান্নিধ্য বিষবৎ মনে হচ্ছিল। মাথা ভরতি বড় বড় চুল, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতগুলো হলদে, চোখের কোণে পিঁচুটি। সর্বাঙ্গ থেকে ঘামের একটা ভ্যাপসা গন্ধও ছাড়ছিল। পরনের জামা-কাপড় বেশ ময়লা। অত্যন্ত নোংরা লোকটা। এর উপর আর এক বিপদ, ক্রমাগত ঢুলছিল সে। ঢুলে ঢুলে আমার দিকে ঢলে পড়ছিল। মাথা ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেল দু'-একবার। কামরায় জায়গা থাকলে অন্য জায়গায় সরে যেতুম। কিন্তু সরবার উপায় ছিল না। নিরুপায় হ'য়ে বসে রইলুম। রাগে ক্ষোভে সর্বাঙ্গ রি রি করছিল। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি! হঠাৎ একটা উপায় মিলে গেল অবশেষে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এতক্ষণ লোকটাকে জানোয়ার, অসভ্য মনে হচ্ছিল, মনে মনে তাকে জীবন্ত আস্তাকুঁড়ের সঙ্গে উপমিত করছিলুম। কিন্তু তার মুখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার পরই সব বদলে গেল। মনে হ'ল লোকটি অত্যন্ত ক্লান্ত, বোধহয় গরীবও খুব। বয়সও হয়েছে, কারণ দাড়ির অনেক চুল পাকা, চুলও কাঁচাপাকা। চোখে মুখে কেমন একটা অসহায় অবসন্ন ভাব। হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বুড়ো বয়সে আপিঙ ধরেছিলেন, সন্ধ্যার সময় এমনি ঢুলতেন বসে বসে। মা খুব বকতেন তাঁকে। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে কোনও প্রতিবাদ বেরুত না কখনও, অপরাধীর মতো চুপ ক'রে থাকতেন। মাঝে মাঝে শঙ্কিত মৃদু হাসি হাসতেন অপ্রতিভের মতো।

'শুনছেন ?"

"কি।"

"আপনি এক কাজ করুন। আমার কাঁধের উপর মাথাটা রেখে ঘুমোন।"

"অমন সুন্দর জামাটা মাটি হয়ে যাবে যে আমার মাথার তেল লেগে।"

"তা যাক। আপনি ঘুমিয়ে নিন খানিকক্ষণ।"

বেশী অনুরোধ করতে হ'ল না, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুমোল সে। ইতিমধ্যে যাত্রীও নেমে গেল অনেক, একটা বেঞ্চ প্রায় খালিই হয়ে গেল। ইঞ্জিনের একটা হ্যাঁচকা টানেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

"অনেকক্ষণ ঘুমুলুম। কষ্ট হয়নি তো।"

"না, তেমন আর কি।"

"এইবার তুমি শুয়ে পড়। তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। আমার বড় ছেলের বয়সী তুমি। কত বয়স হয়েছে তোমার ?"

"কুড়ি বছর—"

"আমার বিনুর বয়সও কুড়ি বছর হবে। তুমি এবার লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড় ওই বেঞ্চিটাতে। আমি তোমার জিনিসপত্রগুলো পাহারা দিচ্ছি। কোনগুলো তোমার জিনিস ?"

"ওই ট্রাঙ্কটা। আর কিছু নেই।"

"বেশ আমি পাহারা দিচ্ছি ওটা। তুমি শোও।"

আমারও ঘুম পাচ্ছিল বেশ। শুয়ে পড়লাম সামনের বেঞ্চিটায়। আমার ঘুম খুব গাঢ়, তাই সাধারণতঃ আমি ঘুমুই না ট্রেনে। কিন্তু লোকটির উপর কেমন বিশ্বাস হ'ল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা বড় স্টেশনের গোলমালে ঘুমটা ভেঙে গেল। সামনেই দেখি একটা খাবারওলা খাবার ফেরি করছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কিছু লুচি, তরকারি আর মিষ্টি কিনলাম। ক্ষিধে পেয়েছিল খুব। ট্রেনটাও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলে।

কামরায় তখন আর কোনও লোক নেই।

লোকটি আমার দিকে চেয়ে বললে, "বেশীক্ষণ তো ঘুমুলে না। আমার উপর বিশ্বাস হ'ল না বুঝি !"

খাবার একটু বেশী ক'রেই কিনেছিলাম। অর্ধেকটা তাঁকে দিয়ে বললুম— 'খান—"

"আমার জন্যেও কিনেছ না কি ?"—তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে হেসে বললে— 'ভালই করেছ। খুব ক্ষিধে পেয়েছে আমারও।"

অভদ্রের মতো গাঁউ গাঁউ ক'রে খেতে লাগল। দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে গেল সব।

"আর একটু নেবেন ?"

"না। ওটা তুমি খাও।"

খাওয়া-দাওয়া চুকে যাবার পর মুখ হাত ধুয়ে বসলাম দুজনে মুখোমুখি।

"কোথা থেকে আসছ ?"

"হাজারিবাগ থেকে।"

"কি কর সেখানে ?"

"কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।"

তখন আমিও পরিচয় নিতে অগ্রসর হলাম।

"আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"হাজারিবাগ থেকেই। আমারও ছুটি হয়েছে, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।"

"আপনি কি ওখানে চাকরি করেন ?"

"না। আমি জেলে ছিলাম। কাল ছাড়া পেয়েছি।"

হঠাৎ মনে হ'ল কোনও দেশ-নেতা বোধহয়। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও অশোভন আচরণ ক'রে ফেলেছি ভেবে মনে মনে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম একটু।

"জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ? জেলে গিয়েছিলেন কেন ?"

"চুরি ক'রে। আমি চোর।"

"চোর ?"

বজ্রাহতবৎ বসে রইলাম তার দিকে চেয়ে। পর্বতের উচ্চ শিখর থেকে গভীর গহ্বরে পতন হ'লে মনের যে অবস্থা হয়, আমারও তাই হ'ল। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না, নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম কেবল।

"হ্যাঁ, আমি চোর। ওই আমার পেশা। সবশুদ্ধ তিনবার এই নিয়ে আমার জেল হয়েছে। ছাড়া পেয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিই, তার পর চুরি করি, আবার জেল খাটি। এই আমার জীবন।"

"চুরি করেন কেন ?"

"প্রথমবার সঙ্গদোষে পড়ে করেছিলাম। মেয়ের বিয়ের জন্য টাকারও দরকার পড়েছিল কিছু। হাজার বিশেক টাকা চুরি করেছিলুম। আমার বখরায় পাঁচ হাজার পড়েছিল। মেয়ের বিয়েটা দিতে পেরেছিলুম। দু'বছর জেল হয়েছিল এজন্যে। জেলে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আর চুরি করব না কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখলুম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা শক্ত। আমি দাগী হ'য়ে গেছি, ভদ্রলোকের সমাজ আমাকে এক-ঘরে করেছে। কেউ কাজ দেয় না, কথা বলে না পর্যন্ত। এ রকম বেকার এক-ঘরে হ'য়ে মানুষ কতদিন থাকতে পারে। সুতরাং আবার চুরি করতে হ'ল। চুরি ক'রে যা পেলুম পরিবারের হাতে দিয়ে জেলে চলে এলুম। বাইরেও খেটে খেতে হয়, জেলেও তাই।

বসিয়ে কেউ খেতে দেয় না। জেলখাটার সুবিধেও আছে অনেক। চাকরির জন্যে 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন দেখতে হয় না। সেখানে বাঁধা কাজ রোজ করতে হয়। নানা রকম কাজ শেখাও যায়। নানা দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। অসুখ হ'লে ডাক্তার আসে, বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। পাকা ঘরে শুতে পাই। আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থাও আছে, নাচ গান থিয়েটার সব হয়। আর ভালভাবে থাকলে জেলারবাবুরা বেশ ভালো ব্যবহার করেন। জেলে কোনও কষ্ট হয় না। তাছাড়া বাইরে থাকবার উপায় তো নেই, একবার পা পিছলে গেলে সমাজ আর ক্ষমা করে না। স্পষ্ট ক'রে মুখে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, তুমি চোর, তফাতে থাক।"

একটানা বলে গেল লোকটা। মনে হ'ল যেন মুখস্থ বলে গেল। আমি নির্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। একটি কথাও বেরুল না আমার মুখ দিয়ে। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। যদিও সে নিজের সম্বন্ধে যা যা বললে এতক্ষণ, তাতে তার প্রতি আমার ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু ঘৃণা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল লোকটা চোর! চোর! কতক্ষণ এমনভাবে বসে থাকবে আমার সামনে!

"তুমি আমাকে তোমার খাবারের ভাগ দিলে, আমারও তোমাকে কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে, তুমি আমার বিনুর বয়সী। জেল থেকে বেরুবার সময় কয়েকটা টাকা পেয়েছিলাম। কিন্তু টিকিটের পয়সাটি রেখে বাকি পয়সার মদ খেয়েছি, জেল থেকে বেরিয়ে প্রত্যেক বারই আমি মদ খাই, তখন তো জানতাম না যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হলে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে রাখতুম।"

করুণ মর্মান্তিক একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

চুপ ক'রে রইলাম। কি আর বলব। সে-ও ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন ছুটে চলেছে, আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে নীরবে বসে আছি।

"একটা উপকার কিন্তু তোমার করতে পারি"—হঠাৎ বলে উঠল সে—"আমি যা যা বলছি তা যদি কর তাহলে তোমার বাড়িতে চুরি হবে না কখনও। আমি পাকা চোর হ'য়ে গেছি তো, এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দেবার অধিকার আমার হয়েছে।"

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

"বলব?"

"বলুন।"

"আমি অবশ্য সিঁধেল চোর। সিঁধেল চোরদের কথাই বলব। আমরা যে বাড়িতে সিঁধ দিই সে বাড়িটি দশ-পনরো দিন আগে থেকে ওয়াচ করি। বাড়ির আলো কখন নেবে, বাড়িতে রাত বারোটার পর লোকের যাওয়া-আগা আছে কি না, অনেক বাড়িতে নাইট-ডিউটির লোক থাকে কি না। তার পর লক্ষ্য করি সে-বাড়িতে কুকুর আছে কি না, থাকলে কি রকম কুকুর আছে, খাবার দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা যায় কি

না। কুকুর থাকলে আমরা প্রায় তার সঙ্গে দিনের বেলাই ভাব করতে চেষ্টা করি খাবার দিয়ে দিয়ে। তিন-চার দিন খাবার খাওয়ালেই ভাব হয়ে যায়। তার পর দেখি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে বাড়িতে এলার্ম ঘড়ি বাজে কি না। অনেক বাড়িতে লেখকরা বা পড়ুয়ারা রাত দুপুরে উঠে পড়াশোনা করে। সে-সব বাড়িতে সিঁধ দেওয়া অসম্ভব। তারপর আর একটা জিনিসও দেখতে হয় আমাদের। যদি দেখি গেরস্ত খুব সাবধানী লোক, শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারদিক দেখে দেখে বেড়াচ্ছে তাহলে সে বাড়িতেও আমরা পারতপক্ষে যাই না। সুতরাং তুমি এই কটি জিনিস রোজ কোরো। নম্বর ওয়ান—শুতে যাবার আগে টর্চ ফেলে ফেলে বাড়ির চারদিকটা দেখে তবে শুয়ো। নম্বর টু—এলার্ম ঘড়িতে রাত একটার সময় এলার্ম দিয়ে শুয়ো। নম্বর তিন—যদি কুকুর থাকে তাহলে তাকে বেঁধে রেখো, আর নিজের হাতে খেতে দিও। কিছুতেই বাইরে ছেড়ে দিও না তাকে। কেবল শুতে যাবার আগে খুলে দিও। মনে থাকবে তো?"

"থাকবে—"

একটু পরেই একটা স্টেশনে এসে ট্রেন থামল।

"এই স্টেশনে নামব আমি। আচ্ছা চলি।"

মাস খানেক পরে। তখনও গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়নি। রাত্রে শুয়ে ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার মুখে টর্চের আলো পড়েছে। তড়াক ক'রে উঠে বসে বেড সুইচটা টিপলুম। দেখি সেই লোকটা। ফিসফিস ক'রে বললে, "আরে, এ তোমার বাড়ি না কি! তাতো জানতুম না। আর তুমিতো আমার একটি কথাও শোননি দেখছি। মিছিমিছি সিঁধ কেটে হয়রান হলাম। চেঁচামেচি কোরো না। চললুম—"

নিমেষে অন্তর্ধান করল। হতভম্ব হ'য়ে বসে রইলাম আমি। তারপর উঠে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা সিঁধ কেটেছে আমারই ঘরের দেওয়ালে। বাবা মা উপরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁদের আর জাগালাম না। কারণ দেখলাম ঘরের একটি জিনিসও চুরি যায়নি।

দিন সাতেক পরে একটি লোক এসে একখানি চিঠি দিয়ে চলে গেল। চিঠির মধ্যে দেখি দুটো দশ টাকার নোট রয়েছে। আর ছোট্ট একটা চিঠি—'দেওয়ালের ফুটোটা সারিয়ে নিও। অন্য জায়গায় বেশ কিছু হাতিয়েছি। ইতি—স্বরূপ।"

মাস খানেক পরে আবার তার সঙ্গে দেখা। ট্রেনেই। তখন তার হাতে হাতকড়ি, সঙ্গে কনেস্টবল। আমাকে দেখে মুচকি হাসল।

"টাকা পেয়েছিলে?"

"একজন স্বরূপ কুড়ি টাকা পাঠিয়েছিল।"

"আমার নামই স্বরূপ।"

"এই রোকো—"

ট্যাক্সি-ওলা থেমে গেল, নেমে গেল শ্যামল ভদ্র। ফুটপাথের ধারে ডাস্টবিনের কাছে যে ভিখারিনীটা পিছু-ফিরে দাঁড়িয়েছিল, তার সামনে গিয়ে একটু ঝুঁকে মুখটা দেখল তার। তারপর আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে নয়।

ভিখারিনী নাকিস্বরে বলল, "একটা পয়সা দাও না বাবু। দু'দিন খাইনি।"

শ্যামল ট্যাক্সিতে ফিরে এসে টাকার থলিতে হাত ঢুকিয়ে দু'টো টাকা বার ক'রে দিয়ে এল তাকে। অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল মেয়েটা। সত্যিই অবাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। দু'টাকা ভিক্ষে এর আগে সে কখনও পায়নি।

"সিধা চল—"

এগিয়ে চলল ট্যাক্সি।

"এ-ও সে নয় —আমার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বললে শ্যামল।

এই নিয়ে সবসুদ্ধ কুড়িটি ভিখারিনী দেখা হ'ল।

আমি বললাম, "তাকে আর পাবি না।"

"পেতেই হবে, সমস্ত কোলকাতা শহর আমি তোলপাড় ক'রে ফেলব।" উদ্‌ভ্রান্ত একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে বাইরের দিকে। পাগলের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ভেবে আমি চুপ ক'রে রইলাম। শিল্পীরা পাগলই। তার ওপর মদ খেয়েছে।

"এই রোকো—"

আবার গাড়ি দাঁড়াল। আবার নেমে গেল শ্যামল। একটা গলির মোড়ে দু'-তিনটে ভিখারিনী জটলা করছিল। দু'টো বুড়ী, আর একটা কমবয়সী, সেটার কোলে আবার শিশু একটা। শ্যামল প্রত্যেকটির মুখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে দেখল, আবার মাথা নেড়ে ফিরে এল গাড়ির ভিতর। তারপর এক মুঠো টাকা দিয়ে এল ওদের! থলিতে কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছে কে জানে!

"সিধা চল—"

সকাল থেকেই এইভাবে চলছে। হু হু ক'রে মিটার উঠছে, শ্যামলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন সে তো রাজা। 'বিবস্ত্রা বাণী' ছবিটা বিক্রি ক'রে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে সে। কালই পেয়েছে।

সকাল থেকেই এই কাণ্ড।

এর পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে একটু। বছর দুই আগেকার ঘটনা। হঠাৎ কার কাছে যেন খবর পেলাম শ্যামল কলকাতায় এসেছে। সে কলকাতার বাইরে থাকে। ছবি আঁকাই তার নেশা এবং পেশা। নেশাটা যতটা জমেছিল পেশাটা ততটা জমেনি। শিল্পী শ্যামল ভদ্রের নাম তখন খুব বেশি লোকে জানত না। কিন্তু আমি বরাবরই তার

গুণগ্রাহী ছিলাম। তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম। দেখলাম, বাইরের ঘরটার চারিদিকে নিজের আঁকা ছবি টাঙিয়ে বসে আছে। আর মদ খাচ্ছে।

"কি রে এসেছিস, খবর দিসনি ?"

"কাল তোর বাড়ি যাব। পিসিমা কেমন আছেন ?"

"ভালই আছেন।"

"তাঁর হাতের রান্না খেয়ে আসব কাল।"

"খুব খুশি হবেন পিসিমা। কিন্তু ভুলে যেও না যেন।"

"না, ভুলব না।"

"আমি কাল দু'-চারজনকে নিমন্ত্রণও করি তা হ'লে।"

"ওসব ঝামেলা আবার করছ কেন ?"

"ঝামেলা কিছুই নয়। অনেকে তোর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক। ওই কথা রইল তা হ'লে—"

"বেশ।"

চ'লে এলাম।

তার পরদিন আশা করেছিলাম সে আটটা-ন'টা নাগাদ এসে পড়বে। কিন্তু এগারোটা পর্যন্ত যখন এল না, তখন চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম একটু। ট্যাক্সি নিয়ে নিজেই গেলাম আবার তার বাড়িতে। গিয়ে দেখি তন্ময় হ'য়ে ছবি আঁকছে একটা।

আমাকে দেখেই হেসে বলল, "চল যাচ্ছি এবার। দেরি হয়ে গেছে, না ?"

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। একটা চটি পায়ে দিয়ে বললে—"চল—"

"স্নান করেছিস ?"

"কাল করব।"

কিছুদূর এসেছি, হঠাৎ ব'লে উঠল, "ওহো, বড় ভুল হয়ে গেল তো।"

"কি ?"

"হুইস্কির বোতলটা আনলাম না। হাতে এখন পয়সার বড় টানাটানি, তা না হ'লে রাস্তা থেকেই কিনে নিতাম এক বোতল। চল, নিয়ে আসি, ওটা পিসিমাকে লুকিয়ে দু'-এক ঢোঁক খেতে হবে। ও জিনিস পেটে না পড়লে কিছুই জমবে না।"

ঘোরাতে হ'ল ট্যাক্সি। একটু পরে মদের বোতল নিয়ে ফিরছি, এমন সময় আবার শ্যামল ব'লে উঠল—"এই রোকো—"

ট্যাক্সি থামল।

"আবার কি—"

"দাঁড়া ওইটেকে একটু দেখে আসি।"

টপ্‌ ক'রে নেমে গেল ট্যাক্সি থেকে। একটু দূরে ফুটপাথের ধারে একটা ডাস্টবিন ছিল, তার ভিতর থেকে এক ছিন্নবসনা প্রায়-উলঙ্গিনী ভিখারিনী কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে

খাচ্ছিল। শ্যামল গিয়ে সেইখানে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘুরে ঘুরে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে লাগল তাকে। অধীর হ'য়ে পড়েছিলাম আমি, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বোধহয় এসে গেছেন এতক্ষণ। আমিও নেমে গেলাম।

"কি দেখছিস অত ক'রে?"

"ছবি।"

ভিখারিনী মেয়েটা একটু সলজ্জভাবে চাইছিল শ্যামলের দিকে। তার স্বভাবতই মনে হচ্ছিল তার প্রায়-উলঙ্গিনী চেহারাই বোধহয় আকৃষ্ট করেছে শ্যামলকে। ছেঁড়া আঁচলটা গায়ে টেনে দিয়ে করুণকণ্ঠে সে বললে—"একটা কাপড় দাও না আমাকে রাজাবাবু। পরবার কাপড় একেবারে ছিঁড়ে গেছে। অনেককে চেয়েছি, কেউ দেয় না।"

শ্যামল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে তাকে দিয়ে দিলে, তারপর গম্ভীরভাবে এসে গাড়িতে উঠে বসল।

বললাম, "এই বলছিলি হাতে পয়সা নেই, আর ওই ভিখিরী মেয়েটাকে দশ টাকা দিয়ে দিলি?"

"ও আমাকে কত দিয়েছে জানিস? অন্তত হাজার টাকা—"

বস্তুত, তার পাঁচগুণ দিয়েছে সে। 'বিবস্ত্রা বাণী' ছবিটা পাচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। একটি প্রায়-উলঙ্গিনী মেয়ে ঝুঁকে একটা ডাস্টবিন ঘাঁটছে—এই হ'ল ছবির বিষয়। সেই মেয়েটার ছবি। অপূর্ব হয়েছে ছবিখানা। কাল রাত্রে ছবির পুরো দামটা পাওয়া মাত্রই কিন্তু ক্ষেপে গেছে শ্যামল।

আজ সকালে এসে আমাকে বলছে, "চল, সেই ভিখিরী মেয়েটাকে খুঁজে বার করি। এ টাকার অর্ধেক তাকে আমি দিয়ে দেব—"

আমি অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পাগলকে নিরস্ত করা শক্ত।

সকাল থেকে ঘুরছি।

"আচ্ছা, ছবিখানার নাম 'বিবস্ত্রা বাণী' দিলি কেন"—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

"চমৎকার সংস্কৃত শ্লোক পড়েছিলাম একটা। শ্লোকটা মনে নেই, কিন্তু ভাবটা মনে আছে। এক রাজার সভায় বহু গুণী-মানী লোক সমবেত হয়েছিলেন একবার। কেউ রাজার স্তুতিগান করছিলেন, কেউ-বা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কেউ নিবেদন করছিলেন নিজের দুঃখ, কেউ কবিতা শোনাচ্ছিলেন। রাজা মন দিয়ে শুনছিলেন সকলের কথা এবং পুরস্কৃত করছিলেন সকলকে। সভা শেষ হ'য়ে গেলে রাজা লক্ষ্য করলেন, সভার শেষ প্রান্তে সঙ্কুচিতভাবে যে ব্রাহ্মণটি বসেছিলেন তিনি কিছু না ব'লেই উঠে যাচ্ছেন। রাজা তাঁকে ডাকলেন। বললেন, 'আপনি কেন এসেছিলেন?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজ-

দর্শন ক'রে পুণ্যসঞ্চয় করতে।' রাজা প্রশ্ন করলেন, 'সবাই এত কবিতা, বক্তৃতা শোনাল, আপনি তো কিছুই বললেন না, আপনার কি বলবার কিছুই নেই?' ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে উত্তর দিলেন—'মহারাজ, দারিদ্র্যের অনলে আমার অন্তরবাসিনী বাণীর বসন দগ্ধ হ'য়ে গেছে। তিনি বিবস্ত্রা, তাই রাজসভায় তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি।' রাজা তার দারিদ্র্য মোচন করেছিলেন—"

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্যামল বলল, "সেদিন ফুটপাথে ডাস্টবিনের ধারে এই বিবস্ত্রা বাণীকেই মূর্তিমতী দেখেছিলাম আমি। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে—"

সমস্ত দিন ঘুরেও কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে। শ্যামলের ট্যাক্সিভাড়া লেগেছিল প্রায় দু'শো টাকা। আর ভিখারীদের বিলিয়েছিল সে পাঁচশো টাকা।

যে ধনীর সন্তানটি ছবিখানি কিনেছিলেন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম একদিন, ছবিখানি আর-একবার ভাল ক'রে দেখব ব'লে। শ্যামলের বন্ধু শুনে তিনি নিজেই বেরিয়ে এলেন এবং খুব খাতির ক'রে বসালেন আমাকে। দেখলাম ঘাড়ের চুল ক্ষুর দিয়ে চাঁচা, বাটারফ্লাই গোঁফ, চোখের কোলে কালি। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নিচেই মনে হ'ল। আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর ড্রয়িংরুমে। সেইখানে ছবিখানাও টাঙানো ছিল।

আমাকে বললেন, "সার্থক তুলি ধরেছেন আপনার বন্ধু। মেয়েটার যৌবন কি দারুণভাবে ফুটিয়েছেন দেখুন দিকি—"

লোলুপভাবে চেয়ে রইলেন তিনি ভিখারিনীটির অনাবৃত দেহ-মহিমার দিকে।

আমি চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

বুড়ীটা

"একঠো পয়সা দে নি বাবু—"

এই তাহার ভিক্ষা চাহিবার ভাষা। আমার কাছে রোজ আসে। হাতে একটা শুক্‌নো ডাল, তাহার সাহায্যেই পথ হাঁটে। ভিখারিনী বুড়ীকে কে আর লাঠি কিনিয়া দিবে? শুক্‌নো গাছের ডালটা কোথাও বোধহয় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পরনের কাপড়খানি শতছিন্ন, বহুবার সেলাই-করা আর খুব পাতলা। একটু গোলাপী-রঙের আভা আছে। এককালে বোধহয় কোনও বিলাসিনীর দেহ-শোভা বর্ধন করিয়াছিল। বুড়ীর গায়ে কিন্তু অত্যন্ত বেমানান। বেচারার শীত পর্যন্ত নিবারিত হয় না।

আমার কাছে প্রায় রোজই আসে বুড়ী। আর আসিয়া একটি ওই প্রার্থনাই জানায়—"একঠো পয়সা দে নি বাবু—"। তাহাকে রোজ একটি করিয়া পয়সা দিই। মনে মনে তাহার একটা নামও রাখিয়াছি—পি. পি.—পার্মানেন্ট পাওনাদার।

যখন আমার ক্লিনিকে লোকের ভিড় থাকে, তখন তাহাকে আসিবামাত্র একটা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিই। যখন কেহ থাকে না তখন মাঝে মাঝে তাহার সহিত আলাপ করি। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে ভিক্ষাবৃত্তি কেন অবলম্বন করিয়াছে। বলিল, "ছেলে বউ আর খাইতে দেয় না, আশ্রয় দেয় না, তাড়াইয়া দিয়াছে। যতদিন গতর খাটাইয়া রোজগার করিয়াছিলাম, খাইতে থাকিতে দিত। এখন আর দেয় না। তাহার কম্পিত বাম হাতটি কপালে ঠেকাইয়া বলিয়াছিল— "সভই কপার ছে বাবু—।"

আর একদিন পয়সাটি দিবার পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আর কি চাস বুড়ী—"

উত্তর দিয়াছিল, "মরণ!"

এ রকম দার্শনিক উত্তর আশা করি নাই। তাহার জরা-বিধ্বস্ত মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম, দেখিলাম সত্যই একটা আর্ত আকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আবার একদিন একা বসিয়া আছি। বুড়ী আসিয়া তাহার প্রাত্যহিক নিবেদনটি জানাইল। দেখিলাম, চোখ উঠিয়াছে। ভালো করিয়া চাহিতে পারিতেছে না। চোখের দুই কোণে পিঁচুটি। একটু ঔষধ দিয়া দিলাম।

"আঁখো মে কি ভেলে বুঢ়িয়া?"

"ঠান্ঢা লাগি গেল্‌ছে বাবু। একঠো কাপড়া দে নি। বড্‌ডি জাড়।"

"য়ঁহা কাপড়া কাঁহা ছে, ঘরো পর যা, মিলতৈ।"

বুড়ী বলিল, সে আমার ঘর চেনে না, আমি যেন দয়া করিয়া একখানা কাপড় তাহার জন্য লইয়া আসি। প্রতিশ্রুতি দিলাম—আসিব। ভাবিলাম, ভালই হইবে, আমি মোটা খদ্দর পরি, শীতে বুড়ী একটু আরাম পাইবে। পরদিন বুড়ী যথারীতি আসিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম। খদ্দর আনিতে মনে ছিল না। পরদিনও ভুলিলাম, তাহার পরদিনও। নিজের বিস্মৃতির জন্য তৃতীয় দিন সত্যই অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তখন আমার মোটর ড্রাইভারকে বলিলাম সে যেন আমাকে মনে করাইয়া দেয়। সেও উপর্যুপরি ভুলিতে লাগিল। তৃতীয় দিনের পর বুড়ীটা আর কিন্তু কাপড়ের কথা বলে নাই। কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইলেই কাপড়ের কথাটা মনে পড়িত। অবশেষে ড্রাইভারের একদিন বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। গৃহিণীও বেশ মোটা একটি খদ্দরের কাপড় তাহার জন্য বাহির করিয়া দিলেন। ড্রাইভার সেটি আমার ক্লিনিকের একটা তাকে পাট করিয়া রাখিয়া দিল, বুড়ী আসিলেই তাহাকে দিবে।

বুড়ী কিন্তু আর আসিল না। সে যে আর আসিতেছে না ইহাও প্রথম দুই তিন দিন লক্ষ্য করি নাই, কয়দিন রোগীর বেশ ভিড় ছিল। তাকের কোণে কাপড়টা দেখিয়া হঠাৎ একদিন মনে হইল, তাই তো, বুড়ীটা তো আর আসিতেছে না।

আরও দিন দশেক কাটিল, বুড়ী আসিল না। শেষে বুড়ীর কথা আর মনেও পড়িত না। ভিড়ের সময়ে মনে পড়িত না বটে, কিন্তু একা থাকিলে মাঝে মাঝে মনে হইত

বুড়ীর কি হইল। কিন্তু উপর্যুপরি কয়েকদিন একা থাকিবার সুযোগ পাইলাম না। নিজের কাজকর্ম তো ছিলই, তাহার উপর শহরে একটা চাঞ্চল্যও জাগিয়াছিল। সংবাদ রটিয়া গিয়াছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসিতেছেন, মাঠে বক্তৃতা দিবেন। চতুর্দিকে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল।

যেদিন পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা দেবার কথা, সেদিন আমাকে একটা দূরের গ্রামে কলে যাইতে হইয়াছিল। খুব ভোরে গিয়াছিলাম, যাহাতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি শুনিতে পারি। কিন্তু রোগী দেখিতে এবং তাহার পরিবারবর্গের সহিত আলাপ করিতে করিতে বেশ একটু দেরি হইয়া গেল। আশঙ্কা হইতে লাগিল পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটি বোধহয় আর শোনা হইল না। রোগীর বাড়ির লোকেরা বলিল, মাঠামাঠি একটা শর্টকাট রাস্তা আছে, সেটা দিয়ে গেলে ঠিক সময়ে নাকি পৌছিতে পারিব। সে রাস্তাতে মোটরও চলিবে। সুতরাং সেই মাঠামাঠি রাস্তাই ধরিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতজীর বক্তৃতাটা শোনা হইল না। একটা গ্রামের কাছে ড্রাইভার সজোরে ব্রেক্ কষিয়া গাড়িটা থামাইয়া দিল। পথের উপরই একটা মড়া, তাহাকে ঘিরিয়া শকুনি আর কাক। তাহার চোখ-মুখ ছিঁড়িয়া খাইয়াছে, চেনা যায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গাছের শুকনো ডালটা পাশে পড়িয়া আছে। তখনই মনে হইল—এ তো সেই বুড়ীটা! গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। ড্রাইভার শকুনি তাড়াইতে লাগিল, আমি হাঁটিয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। খোঁজ করিতে করিতে অবশেষে আমারই চেনা একজন লোক বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মুখে শুনিলাম, শীতেই কাল রাত্রে বুড়ী মারা গিয়াছে। তাহার গায়ে একেবারে কাপড় ছিল না।

"বুড়ী কি এইখানেই থাকত?"

"না, আগে তো দেখিনি কখনও।"

আর একজন লোক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "বুড়ী দুই দিন আগে এই গ্রামে আসিয়াছিল। কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল তাহার ছেলে এই গ্রামে আছে। কিন্তু খবরটি ভুল। লাটুলাল বলিয়া কেহ এ গ্রামে নাই।" বলিলাম, "একটা মানুষকে শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে, তোমরা একটা ব্যবস্থা করতে পার নি?"

লোক দুইটি অপ্রতিভ হইল।

তাহার পর বলিল, "দাহ করতে অন্তত দশটা টাকা খরচ হবে। কে দেবে ডাক্তারবাবু টাকা। যা দুরবস্থা আমাদের আজকাল। অনেকের দুবেলা অন্নই জোটে না। কার কাছে চাঁদা চাইব বলুন—"

"বেশ, তোমরা ব্যবস্থা কর, আমিই টাকা দেব।"

কুড়িটা টাকা দিলাম। লোকটা বলিল, "এতে তো একদল কীর্তনীয়াও হয়ে যাবে। শালুও হবে।" তাহাই হইল। কীর্তন করিতে করিতে গ্রামের লোকেরা বুড়ীকে শালু ঢাকা দিয়া মহাসমারোহে গঙ্গার ধারে লইয়া গেল। —

ফিরিয়া শুনিলাম বক্তৃতায় নেহেরুজী বলিয়াছেন, দরিদ্র জন-সাধারণের উন্নতির জন্য তাঁহার গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ করিতেছেন। বক্তৃতা দিয়া বিমানযোগে পাটনা চলিয়া গিয়াছেন, সেখানে আর একটি বক্তৃতা দিবেন। তাহার পরদিন কাগজে তাঁহার বক্তৃতাটাই পড়িতেছিলাম।

"একৃঠো পয়সা দে নি বাবু—" চমকাইয়া দেখিলাম দ্বারপ্রান্তে সেই বুড়ীটা দাঁড়াইয়া আছে। হাতে সেই শুকনো ডালটা।

"কি বুঢ়িয়া আভিতক্ জিন্দী হ্যায় ?"

"মরণ কাঁহা আবৈছে বাবু।"

"তোরা কাপ্ড়া রাখ্লো ছে। লে যা। কাঁহা ছেলে এত্না দিন—"

"পয়ের মে কাঁটি গড়ি গেল্ছেলো। থোড়া দাবাই দে নি—"

পায়ে পেরেক ফুটিয়াছিল তাই আসিতে পারে নাই। একটু টিঞ্চার আইয়োডিন্ লাগাইয়া দিলাম। তাহার প্রাত্যহিক পাওনা পয়সাটিও দিলাম। বুড়ী ছেঁড়া খদ্দরটা গায়ে দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। অনুভব করিলাম সেদিন আমার ভুল হইয়াছিল। শুকনো-ডাল হাতে বুড়ী আমাদের দেশে অনেক আছে।

তিমির-সেতু

গোপাল সেন সেকেলে সাব-অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন ছিলেন। বলিষ্ঠগঠন, স্বল্পভাষী, দুঃসাহসী ব্যক্তিটিকে অনেকে ভয় করত, অনেকে শ্রদ্ধাও করত। তখন ইংরেজদের আমল, জেলার সিভিল সার্জন প্রায় সাহেবরাই হতেন। গোপাল সেন সাহেব সিভিল সার্জনদের স্নেহভাজন ছিলেন। এর কারণ ভাল খেলোয়াড় এবং ভাল শিকারীও ছিলেন তিনি। ফুটবল হকি দুটোই চমৎকার খেলতেন। আর শিকারে এমন হাত পাকিয়েছিলেন যে, বড় বড় শিকারীরাও খাতির করতেন তাঁকে। বাঘ, ভালুক, হরিণ, হাতী এমন কি বাইসনও মেরেছেন তিনি এবং অধিকাংশই পায়ে হেঁটে। তাই সাহেবরা তাঁকে খাতির করতেন খুব। আর একটা কারণও ছিল। যে-সব ডিস্পেন্-সারিতে গেলে বেশী পসার হবার সম্ভাবনা, সে-সব ডিস্পেন্সারিতে যাওয়ার জন্য সব ডাক্তারই উৎসুক হতেন, এজন্য পৈরবী করতেও কসুর করতেন না; কিন্তু ডাক্তার গোপাল সেন এর ব্যতিক্রম ছিলেন। উপরওয়ালাদের কখনও খোসামদ করতেন না তিনি, বরং তাঁদের বলতেন যেখানে কেউ যেতে চায় না সেখানেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। তাই বাজে ডিস্পেন্সারিতে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে তাঁকে। শিকার করেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাজও করতেন। যে-সব জন্তু-জানোয়ার শিকার করতেন তিনি, তা বাঘ হরিণ শেয়াল খরগোশ যা-ই হোক, তাদের চোখের উপর অপারেশন করতেন। তাদের চোখের লেন্স নিখুঁতভাবে

বার করবার চেষ্টা করতেন। এই ক'রে ক'রে তাঁর ছানি কাটবার অদ্ভুত দক্ষতা হয়েছিল একটা। যে ডিস্পেন্সারিতেই থাকতেন, সেখানে গরীব লোকদের ছানি কেটে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন। শিকার ক'রে আর ছানি কেটেই বেশিরভাগ সময় কাটত তাঁর। এইভাবেই চলছিল, এমন সময় মফঃস্বলের এক ডিস্পেন্সারিতে বদলি হয়ে এলেন তিনি। গুণী লোক, দেখতে দেখতে প্র্যাক্টিস জমে উঠল তার। বিশেষ ক'রে ছানি-কাটায় এবং অন্যান্য সার্জিক্যাল অপারেশনে খুব খ্যাতি হ'ল। দলে দলে রোগী জুটতে লাগল হাসপাতালে। হাসপাতালে ষোলটি বিছানা ছিল, সবগুলিই প্রায় ছানির রোগীতে ভরতি হ'য়ে গেল। এমন সময় সিভিল সার্জন এলেন হঠাৎ একদিন। সাহেব নন, পাঞ্জাবী। নাম ক্যাপ্টেন সরদার সিং। মিলিটারিতে ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে সিভিল-সার্জন হ'য়ে এসেছেন। সার্জারির 'স' জানেন না, কিন্তু অপারেশন করার সখ খুব। হাসপাতালের বে-ওয়ারিশ গরিব রোগীদের উপর ছুরি চালিয়ে হাত পাকাবার ইচ্ছা। গোপাল সেনের হাসপাতালে এসে ক্যাপ্টেন সিং যুগপৎ বিস্মিত এবং ঈর্ষান্বিত হলেন। করেছে কি লোকটা। সামান্য একজন সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন হ'য়ে এতগুলো ছানি কেটেছে। একটা হার্নিয়া-কেসও রয়েছে দেখলেন।

তিনি উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "আপনি খুবই অন্যায় কাজ করছেন ডক্টর সেন। এসব মেজর অপারেশন মফঃস্বল হাসপাতালে করা ঠিক নয়, সবরকম ব্যবস্থা এখানে নেই, কেস খারাপ হ'য়ে যেতে পারে—"

"এখনও পর্যন্ত ত হয়নি। আপনি আমার রেকর্ড দেখুন—"

চটে গেলেন পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন।

"আই অর্ডার য়ু নট টু ডু ইট। মেজর অপারেশন করবেন না আর।"

নির্বিকার গোপাল সেন বললেন, "আপনার অর্ডারটা লিখে দিন তাহলে।"

ক্যাপ্টেন সাহেব অর্ডার লিখে দিলেন, তারপর বললেন, "মেজর অপারেশনের কেশ যত আসবে, সদরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

এ কথাটাও লিখে দিলেন তিনি।

গোপাল সেন তখনও বিয়ে করেননি। তিনি নিজের কোয়ার্টারটিকে হাসপাতালে রূপান্তরিত ক'রে ফেললেন। দশটি রোগী রাখবার জায়গা হ'য়ে গেল সেখানে। যারা তাঁর কাছে ছাড়া অন্য জায়গায় অপারেশন করাতে রাজী হ'ল না, তাদের তিনি নিজের কোয়ার্টারে রেখে অপারেশন করতে লাগলেন। আর বাকী রোগীদের তিনি পাঠাতে লাগলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের কাছে। এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হাসপাতালের সেক্রেটারির ছেলে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল, হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তার হাঁটুতে খুব চোট লাগল। হাড় ভেঙে বেরিয়ে গেল, জোড়ও খুলে গেল হাঁটুর। ডাক্তার সেন বললেন, "আমি ফার্স্ট এড্ দিয়ে দিচ্ছি, ওকে সদরে নিয়ে যান—"

সেক্রেটারি বললেন, "সদরে কেন! আপনিই যা করবার করুন।"

"সিভিল সার্জনের হুকুম অনুসারে আমি করতে পারি না। এই দেখুন তাঁর অর্ডার।"

অর্ডারটা দেখালেন।

তারপর বললেন, "আমার কোয়ার্টারের সব বেড ভরতি। তাছাড়া, সদরে যাওয়াই ভাল। এখানে ওসব কেসে হাত দেওয়া রিস্‌কি।"

সদরে গিয়ে মারা গেল ছেলেটি। সেক্রেটারি মর্মান্তিক চটে গেলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের উপর। পয়সা-ওলা লোক ছিলেন তিনি, দিলেন এক মকদ্দমা ঠুকে। গোপাল সেন গুটি কয়েক ছানির রোগীও পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের কাছে। পাঁচজন অন্ধ হ'য়ে ফিরে এল। ষষ্ঠটি ফিরলই না। মেনিনজাইটিস হ'য়ে মরে গেল সে। সেক্রেটারি এদের দিয়েও মকদ্দমা রুজু করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন সিংয়ের নামে। তাছাড়া, ওপর-ওলার কাছে বহু লোকের সই-সমন্বিত এক প্রকাণ্ড দরখাস্তও গেল। তার সংক্ষিপ্ত মর্ম—সিং সবাইকে গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছে, ওকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া হোক। তদন্ত করবার জন্যে আই. জি. এলেন। খাঁটি সাহেব তিনি। প্রথমেই ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে গেলেন। সব শুনলেন, সিভিল সার্জনের অর্ডারটাও দেখলেন। সিভিল সার্জন ক্যাপ্টেন সিংও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। আই. জি. গোপাল সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তাহলে ছানি-কাটা ছেড়ে দিয়েছ?"

"না। আমার প্রাইভেট কেসগুলো আমি আমার বাড়িতেই করি। সেখানেই দশটা বেড করেছি আমি।"

"কই, চল ত দেখি।"

আই. জি. গোপাল সেনের কেসগুলো দেখলেন।

তারপর ক্যাপ্টেন সিংয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমার যদি কখনও ছানি হয়, আমি কাকে দিয়ে অপারেশন করাব জান? তোমাকে দিয়ে নয়, ডাক্তার সেনকে দিয়ে। কেমন চমৎকার অপারেশন করেছে দেখ দিকি—"

ডাক্তার সেনের মধ্যস্থতায় মকদ্দমাগুলো মিটে গেল।

আই. জি. অর্ডার দিয়ে গেলেন যে ডাক্তার সেন যে-কোন অপারেশন হাসপাতালে করতে পারবেন। ক্যাপ্টেন সরদার সিং বদলি হ'য়ে গেলেন।

বছর পাঁচেক পরে দুটি পুরু-কাচের চশমা-পরা লোক এসে হাজির হ'ল ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে। ছাপরা জেলা থেকে এসেছে, ক্যাপ্টেন সিংয়ের চিঠি নিয়ে।

ক্যাপ্টেন সিং লিখেছেন, "তোমাদের চক্রান্তে আমি বদলি হয়ে এসেছি বটে, কিন্তু ছানি-কাটা বন্ধ করিনি। অনেক ছানি কেটেছি তারপর, অন্তত হাজারখানেক হবে, তার মধ্যে শতকরা নব্বইজন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। এই দুজনকে পাঠালুম তোমার কাছে, দেখলেই বুঝতে পারবে, কী ধরনের কাজ করছি। আশা করি, ভাল আছ। ইতি—"

গোপাল সেন পরীক্ষা ক'রে দেখলেন দুটি রোগীকে। অপারেশন সত্যিই ভাল

করেছে। কিন্তু রোগী দুটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে মনোভাব নিহিত আছে, তা অস্পষ্ট রইল না তাঁর কাছে। মনে মনে তিনি শুধু বললেন, ব্যাটা চাষা!

ক্যাপ্টেন সিং কিন্তু সুযোগ পেলেই তাঁর অপারেশন-করা ছানি-রোগী পাঠিয়ে দিতেন ডাক্তার গোপাল সেনের কাছে।

গোপাল সেনের মনে হ'ত তাঁকে ব্যঙ্গ করবার জন্তেই লোকটা এভাবে রোগীর পর রোগী পাঠিয়ে যাচ্ছে। কিছু করবার উপায় ছিল না। একটা নীরব ক্রোধ ঘনীভূত হচ্ছিল কেবল তাঁর মনে।

এইভাবে আরও দশ পনর বছর কেটে গেল। ক্যাপ্টেন সিংয়ের রোগী আসাও বন্ধ হ'য়ে গেল ক্রমশ। ডাক্তার সেন চাকরি থেকে অবসর নিলেন। ক্রমে তাঁর চোখেও ছানি পড়তে লাগল। তাঁর বন্ধুরা বললেন, "চলুন আপনাকে কলকাতা নিয়ে যাই।"

ডাক্তার সেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "না, কলকাতা যাব না। সেখানে ভদ্দরলোক নেই। আমার বাল্যবন্ধুকে চিঠি লিখেছিলাম, সে-ও ডাক্তার, চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি। টাকার গরমে সেখানে ভদ্রতা-বোধ পর্যন্ত লোপ পায়। যাব না সেখানে। আর ক'টা দিনই বা বাঁচব, না-ই বা দেখতে পেলাম। আমার ওই মধু চাকরটা যদি টিকে থাকে, চোখের দৃষ্টি না থাকলেও চলবে—"

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "একটি লোকের নাগাল পেলে তাকে দিয়ে কাটাতাম, কিন্তু সে যে এখন কোথায় আছে তা তো জানি না। বছর দুই আগে রিটায়ার করেছে—"

"কে—"

"ক্যাপ্টেন সিং।"

আরও বছরখানেক কেটেছে।

একদিন সকালে মধু এসে ডাক্তার সেনকে বলল, "একটি রোগী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।"

"বল, দেখা হবে না।"

"বলেছি, কিন্তু সে ছাড়ছে না। আপনি একবার দেখা করুন।"

মধুর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন গোপাল সেন।

"গুড্ মর্নিং ডক্টর সেন—"

"গুড্ মর্নিং, কে আপনি?"

"চিনতে পারছেন না? আমি ক্যাপ্টেন সিং। আমার চোখে ছানি হয়েছে—আমি আপনাকে দিয়ে কাটাতে চাই। প্লীজ ডু ইট।"

"আমার চোখেও যে ছানি—। আমিও আপনাকে দিয়ে কাটাব ভাবছিলাম।"

"ও—!"

ক্যাপ্টেন সিং অন্ধ দৃষ্টি মেলে ডাক্তার সেনের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁদের মনে হ'ল এক অদৃশ্য তিমির-সেতু পার হ'য়ে দুজনে দুজনের কাছে এসে পড়লেন যেন।

দুধের দাম

ট্রেন আসিয়াছিল। কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আশে পাশে জনকয়েক বাঙালী ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহ বা জ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। সকলে অবশ্য যুবতীদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যস্ত ছিল না। যাঁহার হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া বুড়ী পড়িয়া গেলেন, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, কাছেই ছিলেন। তিনি বুড়ীকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।

"পথ দেখে চলতে পার না ? আর-একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে !"

বুড়ীর ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল। তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্লাটফর্মময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে। অসম্ভব। ট্রেন বেশীক্ষণ থামিবেও না। হুড়মুড় করিয়া শেষে তিনি একটা সেকেলে ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া পড়িলেন। যথারীতি সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। বর্তমানে অবশ্য ইণ্টার ক্লাসের নাম বদলাইয়া সেকেণ্ড ক্লাস হইয়াছে।

একজন বাঙালী ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে একটু সরিয়া বসিয়া জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন, তিনি জিনিসপত্র সমেত বেশ একটু ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সরিয়া বসিলেন না, উপদেশ দিলেন।

"উঠলে ত, এখন বসবে কোথায় বাছা ?"

"আমি নিচে তোমাদের পায়ের কাছে বসব বাবা। দুটো স্টেশন মাত্র, তারপরই নেমে যাব। বেশীক্ষণ অসুবিধা করব না তোমাদের।"

বুড়ী তাঁহার পায়ের কাছেই তাঁহার জুতা জোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আকারের মানুষ, গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিলেন। একটু পরেই কিন্তু তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলেন, পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া। আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর-একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানই যাইবে না যে। ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালী রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সী, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইহারা যে তাঁহার সাহায্য

করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়তো ইহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কি!

বৃদ্ধা যে-স্টেশনে নামিবেন, সে-স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল। প্যাসেঞ্জাররা হুড়-মুড় করিয়া সবাই নামিতে লাগিলেন, বুড়ীর দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"আমাকে একটু নাবিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি।"

বুড়ীর এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশই ভান করিলেন যেন কিছুই শুনিতে পান নাই।

একজন বলিলেন, "ভিখিরী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে ত উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার--"

তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিনীই মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভিখারিনী নন, তাঁহার টিকিটও ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট ছিল।

আর একজন বিজ্ঞ মন্তব্য করিলেন, "এই সব হেল্পলেস বুড়ীকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!"

সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন। গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ীর কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।

বৃদ্ধা তখন দুই হাতে ভর দিয়া ঘ্যাসটাইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নামিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

"এই বুড়ী, হটো দরোয়াজাসে—"

এক মারোয়াড়ী যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে এক বলিষ্ঠকায় কুলী। তাহার মাথায় স্যুটকেশ হোল্ড-অল। কুলীর পিছনে চপ্পল-পায়ে নীল-চশমা-পরা লক্কা গোছের এক ছোকরা। সে ভদ্রতাভরে বলিল, "দয়াময়ি, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!"

"পায় লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।"

"ও দেখি, যদি একটা স্ট্রেচার আনতে পারি।"

ছোকরা ভিড়ে অন্তর্ধান করিল, আর ফিরিল না।

যে-বলিষ্ঠ কুলীটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মাইজি কিরপা করকে থোড়া হাট্‌কে বৈঠিয়ে। আনে-যানেকা রাস্তা পর কাহে বৈঠ্‌ গ্যয়ে?"

বৃদ্ধা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, পায়ে চোট্ লেগেছে—"

"আপ কাঁহা যাইয়ে গা—?"

"গয়া—"

"চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।"

বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলীটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল। সোজা লইয়া গেল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে।

"আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চঢ়া দেঙ্গে।"

বৃদ্ধা ওয়েটিং রুমের মেঝেতেই উপবেশন করিলেন।

যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে-দুইটিতেই সাহেবী পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন। একজন পড়িতেছিলেন খবরের কাগজ, আর-একজন একখানি ইংরেজী বই। বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।

সম্ভবতঃ আলোচনাটা আগেই হইতেছিল। পুনরায় আরম্ভ হইল।

"শিভালরি আমাদের দেশেও ছিল। নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, একথা আমাদের মনুতেই লেখা আছে মশাই।"

যিনি নারী-মূর্তি-সম্বলিত ইংরেজী মাসিক পড়িতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ এ খবর জানিতেন না। উঠিয়া বসিলেন।

"বলেন কি! এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম না কি! মনুর যুগেও যে আমাদের দেশে শিভ্যল্‌রি ছিল, আমরা যে বর্বর ছিলুম না, এ কথা ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—"

বৃদ্ধা অনুভব করিলেন ইতিপূর্বে কোন সাহেবের সঙ্গে বোধহয় লোকটির তর্ক হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবতঃ এই সাহেবী পোশাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গ-সুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, "তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যলরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা।"

বৃদ্ধার বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ দখল ছিল। সেকালের বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন।

"আরে, এ আবার কোত্থেকে জুটল এসে এখানে?"

"কোন ভিখিরী-টিকিরী বোধহয়।"

প্রথম ভদ্রলোক আন্দাজ করিলেন।

"সত্যি, ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখ ফুটে চাইতেও পারে না।"

দেখা গেল, ভদ্রলোকটি একটি পয়সা বাহির করিয়া বুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন বৃদ্ধা।

"পয়সাটা তুলে নাও, তোমাকেই দিলাম।"

বৃদ্ধা তবু কোন কথা বলিলেন না।

দাতা ভদ্রলোকের সন্দেহ হইল বোধহয় বুড়ী বাঙালী নয়। তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন।

"পয়সা উঠা লেও। তুম্‌হী কো দিয়া।"

তখন বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, "আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদেরই মত একজন প্যাসেঞ্জার।"

"এখানে কেন। এটা যে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম।"

"আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।"

পরমুহূর্তেই সেই বলিষ্ঠ কুলীটি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"চলিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।"

তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গয়া প্যাসেঞ্জারে একটু ভিড় ছিল। কিন্তু কুলীটি বলিষ্ঠ। শক্তির জয় সর্বত্র। সে ধমক-ধামক দিয়া বুড়ীকে একটা বেঞ্চের কোণে স্থান করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

এই প্রসঙ্গে কুলীর সহিত হিন্দীতে যে কথাবার্তা হইল তাহার সারমর্ম এই :

"আমার মজুরি আট আনা। দু টাকা দিচ্ছেন কেন?"

"তুমি আমার জন্যে এত করলে বাবা, তাই বেশী দিলুম।"

"না মাইজি, আমাকে মাপ করবেন। আমি ধর্ম বিক্রি করি না।"

"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি ত তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

বৃদ্ধার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

কুলী ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল।

বল্ মা তারা

সেকেলে লম্বা থার্ড ক্লাস কামরা, প্রচুর জায়গা। ভিড় একেবারে নেই। কামরার একধারে বসিয়া আছেন প্রকাশবাবু, প্রকাশবাবুর স্ত্রী সুলোচনা এবং তাঁহাদের কন্যা উমা। উমার বয়স ষোল কি ছাব্বিশ তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বা চেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা সম্ভব নয়। রোগা ছিপছিপে চেহারা। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। গালের হাড় দুটি একটু বেশী উঁচু। তবু মোটের উপর দেখিতে মন্দ নয়। দেখিতে আরও হয়তো ভালো হইত যদি মুখে আর একটু সজীবতার ছাপ থাকিত। মুখের ভাবটি বড় ম্রিয়মাণ। প্রকাশবাবু বেঁটে বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি। কালো রং। গোঁফ দাড়ি কামানো। মুখটি চতুষ্কোণ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। মুখভাব উপর্যুপরি সাত-গোল-খাওয়া-ফুটবল-টিমের ক্যাপ্টেনের মতো মরীয়া। সাতটি কন্যার পিতা তিনি। উমা তৃতীয়া কন্যা। তাহাকেই দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন। টকটকে লালপেড়ে শাড়ি-পরা সুলোচনা, মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া সসঙ্কোচে বসিয়া আছেন একধারে। সাতটি কন্যা প্রসব করিয়া চোরের দায়ে ধরা পড়িয়া গিয়াছেন যেন। মুখের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের নিচে ফোলাফোলা ভাব এবং কোণে জরার চিহ্ন। মাথার সামনের দিকটা টাক। টাকেরই উপর খানিকটা সিঁদুর থ্যাবড়ানো। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় তিনি স্থবিরা। প্রকাশবাবুর স্ত্রী বলিয়া মনেই হয় না, মনে হয় তাঁহার দিদি বুঝি। তাঁহার মুখের আত্মসমাহিত ভাবটি কিন্তু মুগ্ধ করে। তিনি যেন অদৃষ্টের উপরই হোক বা ভগবানের উপরই হোক সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। যাহা হইবে তাহাই মানিয়া লইবেন।

কামরার অপর প্রান্তে কোণের দিক ঘেঁষিয়া আর একটি মেয়ে বসিয়াছিল। ইহারও বয়স কত তাহা বলা শক্ত, তবে বুড়ী নয়। ত্রিশের কাছাকাছিই হইবে। এই মেয়েটিও রোগা, কালো। কিন্তু চোখেমুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি আছে। পোশাক-পরিচ্ছদেও বেশ একটু ছিমছাম ভাব। বাঁ হাতের কব্জিতে রিস্ট-ওয়াচ। অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কানে ফুল, হাতে একগাছা করিয়া চুড়ি। পাশে যে ভ্যানিটি ব্যাগটি রহিয়াছে তাহাও সুরুচির পরিচয় বহন করিতেছে।

মেয়েটি নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া বই পড়িতেছে একটি। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে প্রকাশবাবুদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সাধারণ মেয়ে হইলে হয়তো আলাপ করিত। কিন্তু অপরিচিতের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করা আধুনিক কায়দা নয়, আর মঞ্জুশ্রী তেমন মিশুক প্রকৃতির মেয়েও নয়। অপরের সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল অবশ্য আছে, কিন্তু অযাচিতভাবে আলাপ করিয়া তাহা সে চরিতার্থ করিতে চায় না। আড়চোখে চাহিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া যতটা জানা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে সে। তাহার উপরই কল্পনার রং চড়ায় একটু-আধটু।

দুই

প্রকাশবাবু সহসা বেঞ্চির উপর চাপ-টালি খাইয়া বসিলেন এবং বাম জানুটি নাচাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন, "যাই বল, লোকটা ছোটলোক। অত ক'রে যেতে লিখলুম, কানই দিলে না সে কথায়।"

সুলোচনা বলিলেন, "ছুটি নেই, কি করবে বল।"

"রোববারেও ছুটি নেই? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি!"

"ছেলের ঠাকুমাও না কি দেখতে চায়। বুড়োমানুষ কি অতদূর যেতে পারে?"

"বুড়ো মানুষ কেদারবদরি যেতে পারে, আর এই পাঁচ ছ ঘণ্টার রাস্তা যেতে পারে না? কাকে বোঝাচ্ছ তুমি!"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখে একটু হাসির ঝলক ফুটিয়া উঠিল।

"গরজ তো তোমাদেরই। তুমি মেয়ের বাপ একথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

"তোমার বাবাও মেয়ের বাপ ছিল। কিন্তু তাঁকে আমরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে টেনে আনিনি। তোমার বাপের বাড়ি ধাপধাড়া গোবিন্দপুর খুরশিদ্‌গঞ্জেই গিয়েছিলাম আমরা। জাত হিসাবে সত্যিই অত্যন্ত নেবে গেছি আমরা। হু হু ক'রে নেবে যাচ্ছি, ছি, ছি, ছি, ছি—"

পুনরায় জানু নাচাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ উমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি রঙের শাড়ি এনেছিস?"

"মা বললে লাইট্ গোলাপীটা আনতে। সেইটেই এনেছি।"

"তাহলেই হয়েছে! সেদিন যে সবুজ শাড়িটা কেনা হ'ল সেইটে আনলে না কেন—"

"ডীপ ডগমগে রঙের শাড়ি কি তোমার কালো মেয়েকে মানায়? আমার ও শাড়িটা কেনবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সবুজ রং দেখলে তো তোমার আর জ্ঞান থাকে না। বাড়ির দরজা জানলা সব সবুজ রং করিয়েছ, পর্দা বেড্-কভার সব সবুজ, ফুলদানী সবুজ, কুশনের ছিটগুলো সবুজ। হাঁড়িকুড়ি তাওয়া খুন্তিগুলো সবুজ রঙের পাওয়া যায় না তাই ওগুলো—"

সুলোচনার আত্মসমাহিত মুখভাব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বামীর দোষ-কীর্তনের সুযোগ পাইলে কোন সতী স্ত্রী হর্ষোৎফুল্ল না হন!

প্রকাশবাবু জানলা দিয়া বহির্দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কোন মন্তব্য করিলেন না। পূর্বে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত "উঃ, কি কুক্ষণে যে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম,"—এখন আর হয় না। কোন খঞ্জ যদি আচমকা কোন গর্তে পড়িয়া যায় তখন গর্তটা হইতে কোনরকমে উঠিবার জন্য যেমন তাহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে, প্রকাশচন্দ্রেরও তাহাই করিতেছিল। গর্তে কেন পড়িলাম, পড়া উচিত ছিল কি না, এসব প্রশ্ন তাঁহার নিকট এখন অবান্তর।

একটু পরে তিনি প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"কে জানে ওয়েটিং রুমটা খালি পাওয়া যাবে কি না। ভিড় হলেই তো মুশকিল। অবশ্য বারোটার পর ওখানে আর গাড়ি নেই পাঁচটার আগে। ওদের সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আসতে বলেছি। আচ্ছা, ওরা এলে ওদের সম্বর্ধনা করা যাবে কি ক'রে? বাজার থেকে কিছু খাবার নেওয়া যাবে, কি বল?"

সুলোচনা বলিলেন, "আমি ঘর থেকে কিছু সন্দেশ আর নিমকি ক'রে এনেছি। ওসব যেন কিনো না, ভাল রসগোল্লা পাও তো তাই কিনো—"

"খাবে কিসে—"

"আমি প্লেট গ্লাস সব এনেছি—"

সুলোচনা সুগৃহিণী এবং একটু চাপা স্বভাবের। এসব যে করিয়াছেন তাহা স্বামীকে জানিতে দেন নাই।

প্রকাশবাবু পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

"উঃ মেয়ে ঘাড়ে ক'রে দেখাতে আসা, তা-ও আবার ওয়েটিং রুমে! পূর্বজন্মে কত পাপই যে করেছিলাম।"

পুনরায় জানু আন্দোলিত হইতে লাগিল।

উমা আর সহ্য করিতে পারিল না।

"আমি তো তোমাকে বলেছিলাম বাবা, আমাকে পড়াও, কিন্তু তুমি ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে। আমাদের সঙ্গে যারা পড়ত তারা সবাই কলেজে পড়ে এখন। চাকরি ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।"

"হুঃ, পড়াও বললেই কি পড়ানো যায়। খরচ কত। আর পড়ালেই কি নিস্তার আছে? ওই যে আমাদের হালদার, মেয়েকে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েছিল, একটি কাঁড়ি টাকা দিয়ে বিয়ে দিতে হ'ল শেষপর্যন্ত।"

তিন

ট্রেন যথাসময়ে স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। প্রকাশবাবু সপরিবারে গিয়া ওয়েটিং রুমটি দখল করিয়া বসিলেন। ওয়েটিং রুমে ভাগ্যক্রমে আর কোন যাত্রী ছিল না। বেশ প্রকাণ্ড ঘর। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি আয়না বাথরুম সব আছে। প্রায় সব ঘরটাই দখল করিয়া বসিলেন তাঁহারা।

একটু পরে সেই মেয়েটি আসিলেন, ইঁহাদের সহযাত্রিণী, যিনি কামরায় অপর প্রান্তে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোকও রহিয়াছেন। প্রকাশবাবু বিরক্তমুখে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ইহাদের দিকে চাহিলেন, ভাবটা, এ আবার কি আপদ জুটল। আপদ কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "তুমি এইবার ঠিকঠাক হয়ে নাও। আমি রিকশ ডাকি। মাইল দেড়েক যেতে হবে। সাড়ে তিনটের সময় টাইম দিয়েছে—"

তিনি রিকশ ডাকিতে গেলেন, মেয়েটি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া ঠিকঠাক হইতে লাগিল ; অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে পাউডার বাহির করিয়া মুখে ঘাড়ে গলায় মাখিল, ক্রীমও লাগাইল একটু, ঠোঁটে একটু লিপস্টিকও ঘষিয়া লইল। তাহার পর সাধারণ ব্রোচটি খুলিয়া শৌখিন গোছের একটি ব্রোচ কাঁধের পাশটিতে লাগাইয়া লইল। ঘাড় ফিরাইয়া নিজের মুখখানিই নানাভাবে দেখিল। তাহার পর ছোট একটি আতরের শিশি বাহির করিয়া কাপড়ে জামায় শিশির ছিপিটা ঘষিল। চিরুনি বাহির করিয়া মাথার চুলটাও ঠিক করিয়া লইল একটু।

দ্বারপ্রান্তে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার। "কই হ'ল, চল এবার—"

"চলুন।"

তাঁহারা চলিয়া গেলে সুলোচনা বলিলেন, "এই মেয়েটাই আমাদের গাড়িতে ছিল না?"

প্রকাশ বলিলেন, "হ্যাঁ—"

"তখন তো এ বুড়োটাকে দেখিনি।"

"না। অন্য গাড়িতে ছিল বোধহয়।"

"কোথা গেল ওরা?"

"কে জানে। তোমার মেয়েকেও সাজাও এবার। ওদের আসবার সময় হ'ল। গা টা যা ধোবার এই সময় ধুয়ে নে, কোন লোক এসে গেলে মুশকিল হবে—"

উমা সাবান তোয়ালে লইয়া বাথরুমে ঢুকিল।

চার

ঘণ্টা তিনেক পরে।

পাত্র-পক্ষ হইতে আসিয়াছিলেন পাত্রের ঠাকুমা, বৌদিদি, বড় বোন এবং ছোট ভাই। হাতের লেখা কেমন, গান গাহিতে জানে কিনা, সেতার এস্রাজ শিখিয়াছে কিনা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া, একটি সিনেমার গান শুনিয়া, প্রায় টাকা পাঁচেকের মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ করিয়া যখন তাঁহারা উঠিলেন, তখন প্রকাশবাবুও ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাদের পিছু-পিছু গেলেন কিছুদূর। আসল কথাটি তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বলিলেন না, তখন প্রকাশবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

"কেমন লাগল আপনাদের? মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো?"

"পরে জানাব আপনাকে।"

প্রকাশবাবু বুঝিলেন পছন্দ হয় নাই।

যাইতে যাইতে বৌদিদি বলিলেন, "এর আগে যে মেয়েটি দেখেছি সে এর চেয়ে ঢের ফরসা, নাক চোখ মুখও ভালো—"

ছোট ভাই মন্তব্য করিলেন, "ফিগারও বেশ টল—"

প্রকাশবাবু ফিরিয়া আসিয়া উমাকে বলিতেছিলেন, "চল এবার তোকে স্কুলেই ভর্তি ক'রে দি—"

পাঁচ

একটু পরে তাঁহাদের সহযাত্রিণী মঞ্জুশ্রীও ফিরিলেন। সঙ্গে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মেয়েটির মুখ শুষ্ক।

"আপনি কি ক'রে বুঝলেন যে, আমার হয়নি—"

"কন্‌ফিডেনশাল ক্লার্ক হরিবাবু চুপি চুপি বললেন আমাকে; জ্যোৎস্না রায় মেয়েটিকে নিয়েছেন ডি. এম.।"

"জ্যোৎস্না রায় তো বি-এ পাশ নয় শুনলাম।"

"না। আই-এ পাশ।"

"ওর স্পীড্‌ কি আমার চেয়ে বেশী?"

"না। কিছু কম। কিন্তু মেয়েটি বেশ স্মার্ট যে। দেখতেও ভালো। ফরসা রং, টল ফিগার—"

মঞ্জুশ্রী শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রৌঢ় আশ্বাস দিলেন, "ভয় কি, কোথাও না কোথাও লেগে যাবেই। ক্রমাগত দরখাস্ত ক'রে যাও। আচ্ছা চললুম।"

প্রৌঢ় চলিয়া গেলেন। মঞ্জুশ্রীর দুই চোখ সহসা জলে ভরিয়া গেল। এই চেহারার জন্য তাহার আর এক জায়গাতেও হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আপিসে একজন লেডি স্টেনোর প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মঞ্জুশ্রী বোস দরখাস্ত করিয়াছিলেন। আজ ইণ্টারভিউ ছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাহার পিতৃবন্ধু। ওই আপিসেই কাজ করেন।

ছয়

প্ল্যাটফর্মের একধারে বসিয়া একটি অন্ধ ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল—

—"বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা—"

জীবন-পথে যুক্তি-চালিত হ'য়ে চলাটাই আমরা গৌরবের মনে করি। কিন্তু এই চালক যুক্তির চেহারাটা সব মানুষের একরকম নয়। অনেক সময় তা এত বিভিন্ন যে, ঠিক করা কঠিন হয় কোন্‌টা যুক্তি আর কোন্‌টা অযুক্তি। খদ্দরপরা অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন. আবার আর একদল লোক আছেন যাঁরা খদ্দর না-পরাটাই জীবনের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ লোকেরই এই ধরনের যুক্তিযুক্ত জীবন-নীতি আছে। কেউ জুতো পরেন, কেউ বা পরেন না, কারো মতে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হওয়াই গৌরবজনক, কারো মত আবার ঠিক উল্‌টো। তাঁরা বলেন, পয়সা না থাকলে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে, কিন্তু যদি যথেষ্ট পয়সা হাতে থাকে তাহলে তৃতীয় শ্রেণীতে কষ্ট ক'রে যাবার দরকার কি।

আমি যে নগেন চৌধুরীর গল্পটা আজ আপনাদের বলছি তাঁরও এই ধরনের একটা জীবন-নীতি ছিল। তিনি ছিলেন ঘোর মাংসাশী এবং উঁচুদরের শিকারী। আর দুটো ব্যাপারকেই তিনি জীবনের নীতি (ইংরেজিতে যাকে বালে 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌') হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মাংস, বিশেষ ক'রে পাখীর মাংস, যে খাদ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ খাদ্য এ কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং প্রমাণ প্রয়োগ ক'রে অপরকে বোঝাতেও চেষ্টা করতেন বিদ্বান লোক ছিলেন। ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, খাদ্য-তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব প্রভৃতি নানারকম তত্ত্ব আহরণ করেছিলেন তিনি তাঁর এই নীতির সমর্থন-কল্পে। আর বিজ্ঞান জিনিসটা এমনই অদ্ভুত জিনিস যে, খুঁজলে যে-কোনও মতের স্বপক্ষে কিছু-না-কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। আফিং খাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি আছে, মদ খাওয়ার স্বপক্ষেও আছে। ব্রহ্মচর্যের স্বপক্ষে যেমন জোরালো যুক্তি আছে, বহুবিবাহের স্বপক্ষেও তেমনি আছে। পাখীর মাংস খাওয়ার সমর্থনেও অনেক যুক্তি দেখাতেন নগেনবাবু। শিকার করাটাও যে অবসর বিনোদনের একটা উৎকৃষ্ট উপায় এ বিষয়ে নিজে তো তিনি নিঃসংশয় ছিলেনই অপরকেও নিঃসংশয় করবার চেষ্টা করতেন। বলতেন—"একঘেয়ে জীবনের খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে বন-জঙ্গল নদ-নদীর সংস্পর্শে এলে যে মনের চেহারা বদলে যায় এ কথা তো সবাই জানেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, বন্দুক ঘাড়ে ক'রে বন-জঙ্গল নদ-নদীর সংস্পর্শ লাভ করবার বিশেষ শিক্ষা যদি কেউ পান তা হ'লে তিনি যে বিশেষ রকম একটা আনন্দ পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে ব্যাধ-জীবন আমরা যাপন করেছি সেই জীবনের উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ সাহস-ধৈর্য একাগ্রতা-সাবধানতার স্বাদ যদি পেতে চান, বন্দুক ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে পড়ুন। প্রাচীন সাহিত্য রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপনিষদ পড়ে যে সুখ পান সেই সুখ পাবেন।"

নগেন চৌধুরীর এ ধরনের বক্তৃতা অনেক শুনেছি। তাঁর এ বিশেষ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিনি কখনও। কারণ তিনি এই নীতি মানতেন বলে আমাদের মতো

কুঁড়ে বৈঠকখানা-বিহারীরা নি-খরচায় বুনো-হাঁস প্রভৃতির রসাস্বাদন ক'রে ধন্য হতাম মাঝে মাঝে। ওসব হাঁস শিকার ক'রে আনবার সামর্থ্য তো আমাদের ছিলই না, কিনে খাবারও উপায় ছিল না, কারণ বাজারে কুম্-ডাক, মিউস, পিন্-টেল প্রভৃতি সুলভ নয়। আর নগেন চৌধুরী যখন শিকারে বেরুতেন তখন গাড়ি গাড়ি হাঁস মেরে আনতেন। বিতরণও করতেন অকৃপণভাবে।

এইভাবে বেশ চলছিল। কিন্তু চিরকাল একভাবে চলে না। সর্বনাশা প্লেগ এসে দেখা দিল শহরে। সাতদিনের মধ্যে নগেন চৌধুরীর স্ত্রী, দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে মারা গেল। নগেন চৌধুরী বাড়ি ছিলেন না, শিকার করবার জন্য তিনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে গেলেন।

উক্ত ঘটনার পর বছর খানেক কেটেছে। একদিন সকালবেলা বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজের মাধ্যমে পর-চর্চা আর পর-নিন্দা করছি, এমন সময় নগেন চৌধুরী প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছনে একটি চাকরের মাথায় সুদৃশ্য একটি বাক্স। মনে হ'ল চন্দনকাঠের ওপর হাতীর দাঁতের কাজ-করা।

"আসুন। বাক্সে কি আছে—"

"হাঁস।"

"মরা হাঁস ?"

"হ্যাঁ।"

"অমন চমৎকার বাক্সে ক'রে মরা হাঁস এনেছেন!"

"আগে সব শুনুন। ওটা ওই কোণে রেখে দে—"

চাকর বাক্স রেখে চলে গেল।

নগেন চৌধুরী বললেন, "পরশু রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। একটা অচেনা দেশে যেন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি পায়ে হেঁটে। হাঁটতে হাঁটতে এক মাঠের ধারে এসে পড়লাম। দেখলাম মাঠের মাঝখানে একটা বাড়ি রয়েছে, মানে বাড়ির দেয়ালগুলো রয়েছে, চাল বা ছাদ নেই। কাছে গিয়ে দেখি আমার বাল্যবন্ধু হরিচরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কি হে হরিচরণ এখানে কেন—'

'এখানেই তো আমার বাড়ি। হঠাৎ আগুন লেগে বাড়িটা পুড়ে গেছে ভাই। এবার ভাবছি পাকা করিয়ে নেব—'

'তোমার পরিবার ছেলে-মেয়েরা কোথায়—'

'ওই যে। সব হাঁস ক'রে রেখে দিয়েছি। ওই গাছটায় থাকে। বাড়ি তৈরী হ'লে আবার মানুষ ক'রে নেব—। এ বিদ্যেটা শিখেছি।'

পাশেই যে আমগাছটা ছিল তার ডালে দেখি, পাঁচটি হাঁস বসে আছে। দু'টি সাদা, দু'টি কালো, আর একটি বড় রাজহাঁস,—ঘুমটা ভেঙে গেল। হরিচরণ বহুদিন

পূর্বে মারা গেছে। তার কথা ভাবিও নি, হঠাৎ এ স্বপ্ন দেখবার মানে কি বুঝতে পারলাম না।

আজ সকালে শিকারে বেরিয়েছিলাম। একটা গাছে হরিয়াল বসে ছিল একঝাঁক। ফায়ার করলাম, হরিয়ালগুলো উড়ে গেল। এগিয়ে দেখি গাছতলায় পাঁচটি মরা হাঁস পড়ে আছে। দুটি সাদা, দুটি কালো আর একটি বড় রাজহাঁস। ঠিক যেমন স্বপ্নে দেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। আমারও তো ঘরে আগুন লেগেছিল, দুই ছেলে, দুই মেয়ে আর স্ত্রী মরে গেছে—তারাই কি—? আমার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে দু'জন ফরসা আর দু'জন কালো ছিল। আর আশ্চর্য বড় রাজহাঁসটার মুখের ভাবটা যেন আমার স্ত্রীর মুখের মতো। আপনি তো দেখেছেন ওদের, হাঁসগুলো দেখুন তো। ওগুলোকে স্টাফ্ করিয়ে ঘরে রেখে দেব। নিজেই ওগুলো নিয়ে কানপুর যাব ভাবছি। আপনার তো একটা ভালো ফার্মের ঠিকানা জানা ছিল।"

"হ্যাঁ, লেখা আছে ঠিকানাটা—"

"দিন তো। আমি নিজেই যাব। হাঁসগুলো দেখুন আগে—"

সসম্ভ্রমে বাক্সটা খুলে হাঁসগুলো আমার বড় টেবিলটার উপর সারি সারি রাখলেন।

আমি অবাক হয়ে বসে রইলাম।

নগেন চৌধুরীর জীবন-নীতি বদলে গেছে। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়েছেন, শিকারও করতে যান না।

ছবি

প্রকাশবাবুর জীবনের বর্তমান ধারা অনেকটা এই রকম। সকালে সাতটার সময় ওঠেন, উঠিয়া মুখ ধুইয়া চা পান করিতে করিতে খবরের কাগজটা পড়েন। খবরের কাগজে সাধারণতঃ দুঃসংবাদ থাকে। প্রতিটি দুঃসংবাদ পাড়িয়া তিনি যে-সব মন্তব্য করেন, তাহার একটিও শ্রুতিসুখকর নহে। দেশের নেতা, উপনেতা, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া ধনী-শ্রমিক সকলেই যে চোর, চোর না হইলে যে এদেশে বড়লোক হইবার উপায় নাই, যথেষ্ট টাকা থাকিলে যে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করিয়া ফেলা যায়, বস্তুতঃ টাকাই যে বর্তমান যুগের একমাত্র উপাস্য দেবতা—তাঁহার মন্তব্যগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়।

অন্তত, তাঁহার দশবৎসর বয়স্ক পুত্র ছবি তাহাই বোঝে। সে-ও বাবার সহিত এক টেবিলে বসিয়া চা-পান করে। মা-ও যে সব আলোচনা করেন তাহাও উন্নত ধরনের কিছু নহে। প্রথমতঃ তিনি বাজারে কি কি কিনিতে হইবে তাহারই একটা ফর্দ দাখিল করেন। চাল ডাল তরিতরকারি মশলা, যখন যেদিন যেমন প্রয়োজন, তাহারই

ফর্দ। প্রকাশবাবু তাহা হইতে কিছু কিছু কমাইবার চেষ্টা করেন, তর্ক হয়, তর্ক শেষটা কলহে পরিণতি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, মৃন্ময়ী (ছবির মা) যে সব প্রস্তাব স্বামীর নিকট পেশ করেন সেগুলি আরও ব্যয়সাধ্য। অর্থাৎ সিনেমা, শাড়ি বা গহনার ব্যাপার। প্রতিদিনই অবশ্য এসব আলোচনা হয় না; কিন্তু মাঝে মাঝে হয় এবং যখন হয় তখন যে কাণ্ড হয় তাহা শোভনতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। প্রকাশবাবুর ধারণা ওগুলি অনাবশ্যক ব্যয়, মৃন্ময়ীর মতে একটুও অনাবশ্যক নয়, সংসারে থাকিতে গেলে সিনেমাও দেখিতে হয়, ভালো শাড়িও পরিতে হয়, গহনাও কিনিতে হয়। তাহা না হইলে মান থাকে না। প্রকাশবাবু ইহার প্রত্যুত্তর দেন। মৃন্ময়ীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, উত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহা প্রকাশবাবুর আত্মসম্মানকে আঘাত করে। তিনি টেবিল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন—"আমি পাব কোথা। চুরি ক'রব, না ডাকাতি ক'রব—!"

ছবি বুঝিতে পারে মূল কারণ অর্থ। বাবার যদি প্রচুর অর্থ থাকিত, তাহা হইলে এসব সমস্যাই থাকিত না! কি মজা হইত! কিন্তু মজা হইবে না, কারণ বাবা সামান্য কেরানী।

তবু মাঝে মাঝে সিনেমা দেখাও হয়, শাড়ি গয়নাও কেনা হয়।

ছবি দেখে স্কুলে বড় লোকের ছেলেরা দামী জামা জুতা পরিয়া আসে। কাহারও হাতে রিস্টওয়াচ, কেহ ফাউণ্টেন পেন কিনিয়াছে, কেহ রঙীন চশমা পরিয়া আসিয়াছে।

মাকে আসিয়া বলে—"মা, আমাকে একটা ফাউণ্টেন পেন কিনে দাও না। পেন্সিলে ভালো লেখা যায় না—"

মা বলেন—"আমি কি কিনে দেবার মালিক। বাবাকে বল—"

বাবাকে বলিতে সাহস হয় না। তবু সাহস করিয়া একদিন বলিল। বাবা কিনিয়া দিলেন না, ধমক দিলেন।

একদিন সে শুনিতে পাইল বাবা বলিতেছেন—"উঃ ভাগ্য বটে যতীনবাবুর। লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে—"

মৃন্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাই নাকি! কি ক'রে?"

"চুরি! আবার কি ক'রে? চুরি না করলে কি টাকা হয়?"

দিনকতক পরে ছবি সবিস্ময়ে দেখিল, ওই চোর যতীনবাবুকেই বাবা একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সসম্ভ্রমে খাতির করিতেছেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার ছেলে সুধীরের সহিত তাহার দিদির বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। সুধীর রূপে বা গুণে এমন কিছু ভালো নয়, কিন্তু ছবির ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সুধীরের বাবা বড় লোক, লাখ লাখ টাকা রোজগার করিতেছেন, তাই তাহাকে জামাই করিবার জন্য বাবার এত আগ্রহ। বিবাহ অবশ্য হইল না, কারণ যতীনবাবুর পুত্র আরও বড় ঘরে বধূ-নির্বাচনের সুযোগ পাইল।

আর একদিন ছবি হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া অবাক হইয়া গেল, বাবা মায়ের জন্ত একছড়া দামী সোনার হার আনিয়াছেন। কি করিয়া তিনি এই অসাধ্যসাধন করিলেন তাহা তিনি গোপনও করিলেন না।

বলিলেন, "গুপ্তবাবুকে অনেক টাকার পারমিট পাইয়ে দিয়েছি আপিসে তদ্বির ক'রে। তিনি কিনে দিয়েছেন। আরও দেবেন। আর একটা পারমিট যদি পাইয়ে দিতে পারি, তপুর বিয়ের খরচটা উঠে আসবে—"

বাড়িতে যে-সব আলোচনা হয় তাহা হয় বাবার অফিস লইয়া, কিংবা পাড়া-পড়শীদের নিন্দা। ইহার বাহিরে যে-সব আলোচনা হয় তাহার বিষয় সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী, কিংবা দেশের নেতাগণ। প্রকাশবাবুর মতে দেশের একটি নেতাও সৎ নহেন, সকলেই চোর।

ছবি ক্লাস প্রমোশন পাইল না।

ইহা শুনিয়া বাবা মন্তব্য করিলেন, "অতগুলো পয়সা নষ্ট করলে তো? পরীক্ষায় খারাপ করেছ আগে বললেই পারতে। তোমাদের হেডমাস্টারের ছেলে আমাদের আপিসে আমার আণ্ডারেই কাজ করে। তার উপর একটু চাপ দিলেই তার বাবা বাপ বাপ ক'রে প্রমোশন দিয়ে দিত তোমাকে—"

ছবি চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা সে আড়াল হইতে শুনিতে পাইল—"আরে লেখাপড়া শিখে হবে কি! গণ্ডা গণ্ডা এম-এ, বি-এ ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে অলিতে-গলিতে—!" —বাবা মাকে বলিতেছেন।

এই ভাবেই চলিতেছে।

দুই

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাজার হইতে ফিরিতেছি রাস্তার মাঝখানে দেখি বিরাট ভিড় জমিয়াছে একটা দোকানের সামনে। ভিড়ের ভিতর একটা ছেলে আর্তনাদ করিতেছে. সঙ্গে সঙ্গে পরুষ কণ্ঠে তর্জন গর্জন করিতেছে আর একজন। তর্জন গর্জন শুধু নয়, প্রহারও চলিতেছে বুঝিতে পারিলাম। কৌতূহল হইল, ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম একটি ভোজপুরী দরোয়ান তাহার মহিষ-চর্ম-নির্মিত জুতা দিয়া ছবিকে প্রহার করিতেছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে, একে মারছ কেন—"

বিহারী দোকানদারটি আমার পূর্বপরিচিত।

বলিল, "হুজুর, এ বাঙালী লৌণ্ডা (ছোঁড়া) চোর আমাদের শো কেস থেকে দেখুন এতগুলো জিনিস চুরি করেছে—"

দেখিলাম, ফাউন্টেন পেন, রিস্টওয়াচ, রঙীন চশমা এবং আরও দুই একটা শৌখিন জিনিস একধারে জড়ো করা রহিয়াছে।

"কি ক'রে চুরি করেছে এতগুলো জিনিস—"

"আমাদের শো কেসের কাছে রোজই এসে ঘুরে ঘুরে দেখে। আমরা ভাবতাম এমনি দেখছে দেখুক। আজ হঠাৎ নজরে পড়ল একটা শো কেস থেকে কি যেন একটা তুলে কাপড়ের ভিতর কোমরের নীচে ঢুকিয়ে ফেলল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, ও বাবা, শুধু একটা জিনিস নয়, অনেক জিনিস সরিয়েছে। করেছে কি জানেন? একটা ইল্যাস্টিক্-ওলা হাফপ্যাণ্ট পরেছে কাপড়ের নিচে। আর হাফপ্যাণ্টের পা দুটো দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বেঁধে দিয়েছে নিজের উরুর সঙ্গে। ইল্যাস্টিক্ গলিয়ে প্যাণ্টের ভিতর যা ঢুকিয়ে দিচ্ছে তা আর নিচে পড়ে যাচ্ছে না, পড়বার উপায় নেই। শালার বুদ্ধি দেখুন কি রকম!"

বুদ্ধি দেখিয়া আমিও অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

"কার ছেলে জানেন?"

আমি জানিতাম, কিন্তু স্বীকার করিতে লজ্জা হইল। ছবিও চোখের ইশারায় যেন আমাকে বারণ করিল তাহার পরিচয়টা যেন না দিই।

বলিলাম, "না, আমি চিনি না—"

"কার ছেলে তুমি? বাপের নাম কি?"

"শিশিরবাবু।"

"কোন্ শিশিরবাবু?"

"শিশির গুপ্ত—"

"এস. পি. শিশির গুপ্ত?"

অকম্পিত কণ্ঠে ছবি বলিল, "হ্যাঁ—"

আমি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। ছোকরা বলে কি!

এইবার দোকানদার ঘাবড়াইয়া গেল। এস.-পি.র ছেলেকে এমনভাবে প্রহার করিয়া শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়িয়া যাইবে না তো! বলিল, "এ কথা আগে বললেই পারতে। আমি এমনিই তোমাকে দিয়ে দিতাম জিনিসগুলো, চুরি করতে গেলে কেন! নাও, নিয়ে যাও এগুলো—"

অম্লান বদনে ছবি জিনিসগুলি লইয়া চলিয়া গেল। কে বলে বাঙালীর ছেলের বুদ্ধি নাই।

তিন

আড্ডায় গিয়া শুনিতে পাইলাম, "আজকালকার ছেলেরা যা হয়েছে মশাই—" ভাদুড়ী মহাশয় বলিতেছেন!

আমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল ছেলের বাপ-মায়েরা আজকাল যাহা হইয়াছেন, ছেলেরাও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু কিছু বলিলাম না। জমাটি আড্ডায় রসভঙ্গ করিয়া কি হইবে!

আর এক দিক

"রক্তটা কী রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু—"

"ভাল নয়। হিমোগ্লোবিন বড্ড কম। আর. বি. সি. ডব্লিউ বি. সি.-ও কম।"

"তাহ'লে, কী করব—"

"কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। দুটো খাবার, আর একটা ইনজেকশনের—"

"রক্ত পরীক্ষার জন্য কত দিতে হবে?"

"আপনার কাছে কিছু নেব না। ইনজেকশনটা কিনে আনুন, আমি দিয়ে দেব, কি দিতে হবে না।"

"রক্তে কী দোষ বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"রক্তটা পাতলা হয়ে গেছে আর কি। যে-সব জিনিস যে পরিমাণে থাকা উচিত, তা নেই।"

"ও তাই নাকি! রক্ত পাতলা হয়ে যাবার কারণ কি?"

"অনেক কারণ থাকতে পারে। এক কথায় বলা যায় কি চট ক'রে? এখন যা বললুম, তাই করুন।"

"আমার বুক ধড়ফড়টা ওই জন্যেই তাহ'লে?"

"হ্যাঁ। তাই ত মনে হচ্ছে।"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"ওষুধগুলোর দাম কি রকম পড়বে বলতে পারেন—"

"ঠিক বলতে পারব না, আমার ত ওষুধের দোকান নেই। দেখুন না খোঁজ ক'রে।"

"আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।"

অতুল রায় আমাদেরই পাড়ার লোক। বয়স হইয়াছে, কিছুদিন পরেই রিটায়ার করিতে হইবে। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। বড় ছেলেটির বয়স আঠার বৎসর। উপর্যুপরি দুইবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়াছে।

অতুলবাবু বলেন, "ছেলের দোষ নেই মশাই। স্কুলে আজকাল পড়াশোনা কিছু হয় না। প্রত্যেকটি মাস্টার টিউশনি ক'রে বেড়ায়, স্কুলে এসে ঘুম মারে। তার উপর পড়ানো হয় হিন্দীতে। ওরা অর্ধেক বুঝতেই পারে না। তা ছাড়া বাঙালী ছেলে বলে প্রত্যেক বিহারী মাস্টারের বিষদৃষ্টি তার উপর। সুযোগ পেলেই কম নম্বর দিয়ে দেয়। যে দু-একজন বাঙালী মাস্টার আছেন, তাঁরা ভরসা ক'রে বাঙালী ছেলেদের দিকে ভাল ক'রে নজর দিতে পারেন না, পাছে বিহারী মনিবরা চটে যান। এ অবস্থায় ছেলে কখনও পাস করতে পারে? ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত যে উঠতে পেরেছে এই যথেষ্ট।"

তাহার পর একটু থামিয়া অতুলবাবু বলিয়াছিলেন, "সিংজীকে তেল দিচ্ছি রোজ। তিনি ভরসা দিয়েছেন, ম্যাট্রিকটা পাস করলে তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি যা করতে বলছেন, তা করব কিনা এখনও ঠিক করতে পারিনি—"

"কি করতে বলছেন তিনি?"

"বলছেন, আপনার ছেলের নাম বদলে দিন অ্যাফিডেবিট ক'রে। কানন কুমার বদলে খুবলাল ক'রে দিন। রায় উপাধি ঠিক আছে। অনেক বিহারী ভুঁইহারদের উপাধি 'রায়' হয়। কায়স্থও রায় আছে। সিংজী বলছেন, বাঙালী নাম দেখলে উপর থেকে কেটে দেবে। কি করব তাই ভাবছি। ওর ঠাকুমা অনেক শখ ক'রে নামটা রেখেছিলেন—"

অতুলবাবুর প্রথম সন্তান কন্যা, ডাকনাম রিনি। তাহার দূরসম্পর্কের এক মাসী শান্তিনিকেতনে পড়িতেন। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নির্ভুল সুর এবং নানারকম নাচের নিখুঁত মুদ্রা, পদবিন্যাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া বায়ুপরিবর্তন-মানসে অতুলবাবুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেনও। সেই সময় রিনি নাচ-গানে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল। ভাগ্যিস লইয়াছিল, তাই সে এখন মাসে পঁচাত্তর টাকা রোজগার করিয়া বৃদ্ধ বাবার সংসারভার লাঘব করিতেছে। তাহার মাসী তাহাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার চর্চা সে ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে অনেকের খোশামোদ করিয়া এখন বেশ নৃত্য-গীত-পটীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে নেকনজরে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারই সুপারিশের জোরে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে নাচ-গানের শিক্ষয়িত্রী হইয়া বহাল হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নেকনজর যাহাতে আরও কৃপাকোমল হয়, সেজন্য তাহাকে সপ্তাহে দুই-তিন দিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় গিয়া হাজিরা দিতে হয়। অতুলবাবু নিজে গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন।

তাঁহার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেহই সুস্থ নয়। নানারকম ব্যাধি লাগিয়াই আছে। আমি পাড়ার ডাক্তার, বিনা পয়সাতেই দেখি। তবু মাঝে মাঝে খবর পাই, তিনি আমার ঔষধ না খাওয়াইয়া হোমিওপ্যাথি করিতেছেন। তাঁহার নিজেরই ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে, দুই-একখানা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বাংলা

বইও আছে। অনেক সময় নিজেই চিকিৎসা চালান। নিজের বুক-ধড়ফড়ানির চিকিৎসা নিজেই করিতেছিলেন, কিন্তু হালে পানি না পাইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন।

বৈকালবেলা অতুলবাবু আবার দেখা দিলেন।

"আপনি যে প্রেসক্রপশান লিখে দিয়েছেন, তার দাম কত জানেন? দু শিশি ট্যাবলেটের দাম সাড়ে ন টাকা। আর ইনজেকশনের দাম প্রতিটি অ্যামপুল আড়াই টাকা। আপনি ছটা ইনজেকশন দিতে চাইছেন। তার মানে পনর টাকা। পনের আর সাড়ে নয়ে সাড়ে চব্বিশ টাকা। সাত দিনেই শেষ হয়ে যাবে। এ চিকিৎসা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। যাহার ঔষধ কিনিবারই সামর্থ্য নাই, তাহার চিকিৎসা করিব কি করিয়া?

"হাসপাতালে চেষ্টা ক'রে দেখুন না, যদি পান—"

"কোথায় আছেন আপনি স্যার। হাসপাতাল গরিবদের জন্ত নয়, হোমরা-চোমরা অফিসারদের জন্তে। ভাল ভাল দামী ওষুধ বিনা পয়সায় ওঁরাই পান। গরিবদের কাছে ঘুষ চায়। বিনা পয়সায় কিছু হয় না ওখানে। কোন্‌খানেই বা হয়! ওই যে গভর্ণমেণ্ট পোলট্রি খুলেছে, ওর একটি ডিম, কি একটা মুরগী কি বাইরের লোকের পাবার উপায় আছে? সব ওই অফিসারদের পেটে যাচ্ছে—"

অতুলবাবু যখন কথা বলেন, তখন একটানা খানিকটা বলিয়া যান, তাহার পর হঠাৎ থামিয়া নির্নিমেষে মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। তাহাই করিলেন।

বলিলাম, "তাহ'লে খাওয়াটা একটু ভাল করুন। দুধ, মাছ—"

"বাজারে চুনো মাছের সের কত ক'রে জানেন? পাকা মাছের দিকে ত চাওয়াই যায় না। দুধ টাকায় পাঁচ পো, মাংস আড়াই টাকা তিন টাকা সের। আলু এগার আনা, পটল আট আনা, ধুঁদুল আট আনা, সেদিন একটা ছোট্ট লাউ কিনতে গেলুম, দাম বললে আট আনা। ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম। খাওয়া ভাল করব কি ক'রে? কনট্রোল দোকানগুলোতে গমও পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। সব ব্ল্যাক মার্কেটে। অথচ রোজই একটা ক'রে মিনিস্টার এরোপ্লেনে উড়ে এসে বক্তৃতা মেরে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসক কে জানেন? মরণ। তাঁকে 'কল'ও দিচ্ছি রোজ, কিন্তু আসছেন কই—"

আবার তিনি তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা চললুম। থ্যাংক ইউ—"

'থ্যাংক ইউ'টা দিতে তিনি কখনও ভুলিতেন না।

দিন সাতেক পরে একটি নূতন সমস্তায় জড়িত হইতে হইল। ভাষা-সমস্তা। বিহার

বিশ্ববিদ্যালয় নোটিশ জারি করিয়াছেন, এইবার সকলকে হিন্দীর মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হইবে। মাতৃভাষা চলিবে না। রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সংবিধানবিরোধী এ কি কাণ্ড! এই সেদিনই ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ হায়দরাবাদে বলিয়াছেন যে, জোর করিয়া কাহারও উপর হিন্দী চাপানো হইবে না। অথচ তাঁহার নিজের প্রদেশই তাঁহার কথা অমান্য করিতেছে! কিছুতেই ইহা সহ্য করা হইবে না। দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম। তাহার পর একটি হুজুগে ছোকরাকে ধরিয়া বলিলাম, "বাঙালীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এস। তারপর মুসলমানদের বাড়িতে যেতে হবে—এই খাতাটাও নাও, কিছু কিছু চাঁদাও আদায় কর।"

ছোকরা বলিল, "আচ্ছা।"

বলিয়া কিন্তু সে কুঞ্চিতমুখে দাঁড়াইল রহিল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"আমার সাইকেলটার পিছনের চাকাটা একটু জখম হয়েছে। ভাবছি হেঁটে পারব কি—"

"পিছনের চাকা সারিয়ে নাও এক্ষুণি।"

যুবকটি আরও কুণ্ঠিত হইল। তাহার পর মাথা চুলকাইয়া বলিল, "হাতে এখন পয়সা নেই ডাক্তারবাবু। চার পাঁচ টাকা লেগে যাবে—"

রোক চড়িয়া গিয়াছিল।

তুমি সারিয়ে নাও। যা লাগে আমিই দেব।"

যুবক দরখাস্ত লইয়া সোৎসাহে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার একটু পরেই অতুলবাবুর গলা শোনা গেল।

"ডাক্তারবাবু, এই দেখুন—"

দেখিলাম, তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাজারের থলেটি আমাকে তুলিয়া দেখাইতেছেন। থলির ভিতর হইতে একগোছা লাল শাকের পাতা দেখা যাইতেছে। কি দেখাইতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিলাম না।

"কি দেখাচ্ছেন? আসুন না—"

অতুলবাবু রাস্তা পার হইয়া আমার ক্লিনিকে ঢুকিলেন।

"লাল শাক মশাই। জিতেনবাবু বলছিলেন, এ খেলেও নাকি হিমোগ্লোবিন বাড়ে। এ-ও চার আনা সের—"

অতুলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন।

বলিলাম, "শুনুন, একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছি। সই ক'রে দেবেন তাতে। আর পারেন ত কিছু চাঁদাও দেবেন।"

"কি ব্যাপার?"

"দেখবেন, দরখাস্ততেই লেখা আছে সব।"

দিন তিনেক পরে অতুলবাবু পুনরায় দেখা দিলেন।

"আপনার দরখাস্তে সই করিনি ডাক্তারবাবু। আমাদের মাতৃভাষার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে, তা আমি জানি। কিন্তু সই করতে পারলাম না। ওপরওলাকে চটাবার সাহস নেই। সিংজী ঘোর হিন্দীওলা। ওঁর সুনজরে থাকলে রিটায়ার করবার পর একস্‌টেনশনও পেতে পারি। এ-সব দরখাস্তে সই করলে আমার আখের মাটি হ'য়ে যাবে। আপনার বাংলা দেশ আর বাংলা আমাকে খেতে দেবে, না পরতে দেবে? কোন বাঙালী কোন বাঙালীকে সাহায্য করবে? কেউ করবে না। সুতরাং যারা আমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে, তাদের মন রেখে চলতে হবে। আগে ইংরেজদের সেলাম করতুম, এখন এদের করি। বাঁচতে হবে ত আগে, তারপর ভাষা।"

তাহার পর তিনি কোমরের গেঁজে হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্যমত চাঁদা আমি কিছু দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন আমার নামটা যেন খাতায় লিখবেন না। যদি কিছু লিখতে চান, এক্স ওয়াই জেড লিখে দেবেন।"

সিকিটি টেবিলের উপর রাখিয়া অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা, চললুম। যাই হোক, আপনি যে এসব করছেন, এটা খুবই ভাল কথা। থ্যাংক ইউ।"

অতুলবাবু চলিয়া গেলেন।

বাংলার বাহিরে যে সব নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাকুরে বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের জীবন-সমস্যার আর একটা দিক সহসা যেন দেখিতে পাইলাম।

দমিয়া গেলাম একটু। সই করেন নাই বলিয়া অতুলবাবুর উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

মেঘলা দিনে

মোটরে চলেছি। মোটরেই আজকাল সর্বদা থাকি। বাড়ি আছে একটা কিন্তু বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। বাড়ি মানে সিমেণ্ট ইঁট লোহা কাঠের জগদ্দল সমন্বয় একটা। বাড়িকে যারা গৃহ ক'রে তোলে, তারা আসেনি আমার কাছে এ জন্মে। একজন এসেছিল। সে কিন্তু আমার বাড়িতে আসেনি। বাড়ির বাইরে থেকেই সে আমার জীবন মধুর ক'রে তুলেছিল। সে-ও আমার নাগালের বাইরে চ'লে গেছে। তাকেই খুঁজে বেড়াই। জানি পাব না, তবু খুঁজি। খোঁজাটা নেশার মত হ'য়ে গেছে। ওইটেই জীবনের উদ্দেশ্য হ'য়ে গেছে আজকাল। এ বিশ্বাস হ'য়ে গেছে, পাব তাকে কোথাও না কোথাও। কোনও অচেনা শহরের গলির মোড়ে কিংবা কোনও পথের বাঁকে কিংবা কোনও বনের ধারে বা পাহাড়ের ঝরনা তলায় কিংবা আর কোথাও।

যেখানে মনে হয় তাকে পাব, সেখানেই অপেক্ষা করি, দিনের পর দিন, অনেক সময় মাসের পর মাস। কিন্তু পাইনি। আশা ছাড়িনি কিন্তু। যতবার ব্যর্থকাম হয়েছি. ততবারই বিশ্বাস যেন বেড়ে গেছে, মনে হয়েছে পদ্ম আসবে, একবার অন্তত আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

একবার মনে হয়েছিল এই এলো বুঝি। শরতের সোনালী রোদে ঝলমল করছে নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শ্যাম-শোভায় আভাসিত হয়েছে যৌবনের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী. দূরে অনেক দূরে, কোথায় যেন শানাই বাজছে আগমনী সুরে। সেদিন আকাশে বাতাসে সঙ্গীতে কল্পনাই সর্বত্রই আমন্ত্রণের আগ্রহ মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, এ-আগ্রহ সে কি উপেক্ষা করতে পারবে? কিন্তু করেছিল। আসেনি।

আর একদিনের কথা। সেদিন পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার পাথারে আত্মহারা হ'য়ে মিশে গিয়েছিল গঙ্গার ধারা। যে মৃদু কলধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, তা জোৎস্নার, না গঙ্গার, তা বোঝবার উপায় ছিল না। জ্যোৎস্নার পাথারে যে কলধ্বনি হ'তে পারে না, একথাও মনে হচ্ছিল না তখন। মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোনও কিছু অসম্ভব বলে মনে করাই অসম্ভব ছিল তখন আমার পক্ষে। আকাশের চাঁদ যদি নেমে এসে আলাপ করত আমার সঙ্গে, একটুও আশ্চর্য হতুম না। হয়তো এক পেগ হুইস্কি এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়িত করতাম তাকে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ঘনিয়ে এসেছিল। রূপালী-আলোয়-মাখা স্বপ্ন, শুভ্র কোমল মেঘমণ্ডিত স্বপ্ন। সেদিন যে হুইস্কি চুমুকে চুমুকে পান করেছিলাম—যা রোজই করি—তা মনে হচ্ছিল যেন অমৃত। হঠাৎ সেদিন নতুন ক'রে মনে পড়ল, আমার জন্যে হুইস্কি আনতে গিয়েই পদ্ম আর ফেরেনি। তাকে মানা করেছিলুম যেতে। কিন্তু সে শুনলে না। হুইস্কি না হ'লে আমার সন্ধ্যা যে বন্ধ্যা হ'য়ে যায়, একথা তার চেয়ে আর বেশী কে জানত? আমার হুইস্কির বোতলটা হাত থেকে অসাবধানে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাকে বললুম, ভালই হয়েছে, বিনা সুরায় সুরলোকে পৌঁছতে পারা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা হোক আজ। কিন্তু সে শুনল না। হুইস্কি আনতে চলে গেল। পায়ে হেঁটে গেল। মোটরটা সেদিন বিগড়েছিল। চাকরকে দিয়েও আনাতে পারত, কিন্তু আমার কোনও কাজ চাকরকে দিয়ে করিয়ে তৃপ্তি হ'ত না তার। সেদিনও এমনি পূর্ণিমা ছিল, এমনি জ্যোৎস্নালোকে অবগাহন করেছিল প্রকৃতি। কিন্তু সে যে সেই গেল আর ফেরেনি। আশা করছিলুম, কোনও জোৎস্না রাত্রেই হয়তো সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল মধ্যরাত্রে, চাঁপার গন্ধ মদির থেকে মদিরতর হ'ল, রজনীগন্ধার গন্ধ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর মিলিয়ে গেল ভোরের হাওয়ায়। পদ্ম এল না।

আর একদিনের কথা।

পাহাড়ের পাশে ঘন বনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল আমার গাড়ি। হেমন্তের প্রসন্ন প্রভাত। শিশিরবিন্দুর সমারোহ চতুর্দিকে। প্রত্যেকটি শিশিরবিন্দু থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে

সূর্যের আলো। মনে হচ্ছে, অসংখ্য মণি-মাণিক্য ছড়িয়ে দিয়ে গেছে যেন কেউ। বন্য কুক্কুটের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আহ্বান করছে কুক্কুটিকে। অচেনা নাম-না জানা ফুলের তীব্র গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরপুর। আমার মদিরাচ্ছন্ন চেতনা সহসা সজাগ হ'য়ে উঠল কেন, জানি না। কেমন যেন দৃঢ়বিশ্বাস হ'ল সে নিশ্চয় আসবে আজ। বিশ্বাসের ভিত্তির উপর গড়ে তুললাম প্রত্যাশার দুর্গ। তার মধ্যে বসে রইলাম একাগ্র হ'য়ে, কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙল। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকারে স্তব্ধতা বিদীর্ণ হ'য়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। সমস্ত দিন এই নির্জন বনের ধারে কেটে গেল, মনে হ'ল যেন কয়েকটা মুহূর্ত।

ড্রাইভার স্বরূপৎ সিং কাছেই রান্না করছিল। তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতেই সে বললে, "ময়ূর ডাকছে হুজুর। বোধহয় বাঘ বেরুবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে এখান থেকে শহরের দিকে চলে যাওয়াই ভালো।"

বললাম, "যাব না। এইখানেই থাকব সমস্ত রাত। বন্দুক দুটো লোড ক'রে রাখ।"

সমস্ত রাত বসে রইলাম সেই নির্জন বনের ধারে। একাধিকবার বাঘের গর্জন শোনা গেল। মনে হলো যেন আমারই অন্তরের ক্ষোভ গর্জন করছে এই গভীর জঙ্গলে। বাঘ কাছে এল না। সে-ও এলো না। সকাল বেলা অন্য জায়গায় চলে গেলাম।

সে এল অবশেষে, এক মেঘলা দিনে। ঘড়ি অনুসারে সেটা দিন বটে, কিন্তু আসলে রাত্রিই নেবেছিল সেদিন দিনকে আচ্ছন্ন ক'রে। অমন ঘন কালো মেঘ আমি আর কখনও দেখিনি। মেঘে বিদ্যুৎ ছিল না। মনে হচ্ছিল, একরাশ ঘন কালো চুল যেন দিগদিগন্ত আবৃত ক'রে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। মনে হচ্ছিল ওই নিবিড় কুন্তলের অন্তরালে হয়তো কারও মুখও লুকিয়ে আছে, কিন্তু সে মুখ দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকার ক্রমশ: ঘন থেকে ঘনতর হ'তে লাগল। এত ঘন যে, কাছের জিনিসও আর দেখা যায় না। আমার অত বড় মোটরটাও হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে। আমি আর মোটরের ভিতর বসে থাকতে পারলাম না। দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মোটরের কপাটটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। স্বরূপৎ ছিল না, হুইস্কি আনতে এলাহাবাদে পাঠিয়েছিলাম আমার মোটরটা দাঁড়িয়েছিল যমুনার ধারে। নিস্তরঙ্গ যমুনাকে দেখে সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, কেন ওর নাম কালিন্দী হয়েছে। মনে হচ্ছিল, সে-ও যেন গভীর বিরহে স্থির হ'য়ে গেছে, আশার সমীরে আর তরঙ্গ তোলে না, কালো হ'য়ে গেছে তার নীল রং। বাইরে এসে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম যমুনারই দিকে। তারপর খট ক'রে শব্দ হ'ল একটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার মোটরের খোলা দরজার পাশে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ পদ্ম। যদিও তখন ঘন অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়েছিল, তবু আমার ভুল হয়নি। স্পষ্ট দেখলাম, পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে হুইস্কির বোতল। তারপর ধীরে ধীরে সে মোটরের ভিতর ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা উঠল। আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মনে হ'ল, আমি যেন পাথর হয়ে গেছি, আমার পা দুটো মাটিতে পুঁতে গেছে। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ক'রে যে তুমুল ঝড় উঠেছে তা যেন স্পর্শও করছে না আমাকে। যমুনার স্রোত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে তরঙ্গে তরঙ্গে। তারপর আমি ছুটে গেলাম মোটরের দিকে সম্ভবত প্রচণ্ড ঝড়ের বেগই ঠেলে নিয়ে গেল আমাকে। মোটরের দিকে, এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। তারপর কি হয়েছে মনে নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখি, স্বরপৎ আমাকে তুলছে। ঝড় থেমে গেছে। মোটরে ঢুকে দেখলাম পদ্ম নেই, কেউ নেই। মোটরের সিটের উপর বোতল রয়েছে একটা।

স্বরপৎকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পেয়েছ দেখছি। কত দাম নিলে—"

স্বরপৎ বললে, "পেলাম না হুজুর। সব দোকান বন্ধ।"

সীট থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে দেখলাম—হুইস্কি নয়। বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'খাঁটি পদ্মমধু'।

পদ্মর পুরো নাম পদ্মাবতী কি পদ্মলোচনা, তা আমি বলব না। একটা কথা বলব, তার মৃতদেহ আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। আমার জন্য হুইস্কি আনতে গিয়ে একটা লরীর তলায় চাপা পড়েছিল সে। সেদিন কিন্তু এসেছিল সে. সেই মেঘলা দিনের অন্ধকারে। ইঙ্গিতময় অনুরোধ অবহেলা করিনি। মদ ছেড়ে দিয়েছি। এখন মধুই খাই। পদ্মমধু।

বেহুলা

মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই একটু যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কেন যে হয়েছিল তা তখন অত বিশ্লেষণ করবার সময় ছিল না। চারিদিকে রোগী ঘিরে ছিল আমাকে। যে-সব রোগী-রোগিণী প্রায়ই আসে আমার কাছে, মেয়েটি সে দলের নয়। অচেনা মুখ। দেখেই একটু চমক লেগেছিল, সে সুন্দরী বলে নয়, কমবয়সী বলেও নয়, তার চোখে-মুখে কি যেন একটা ছিল যা অস্বাভাবিক, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে জেনেছি চাপা প্রতিহিংসার আগুন ওর অন্তরে জ্বলছিল। তারই হলকা আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওর চোখে মুখে। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে তা গোপন করা যায় না।

মেয়েটি রোগারোগা, রঙ কালো, চোখ-মুখের হাব-ভাব মন্দ না হলেও নিখুঁত নয়। একটা বন্য বর্বরতার ছাপ যেন আছে। চুলে তেল নেই, রুক্ষ চুলগুলো কোঁকড়ান। এত কোঁকড়ান যে মনে হয় অসংখ্য সর্পশিশু যেন জড়াজড়ি ক'রে ফণা তুলে আছে! অধরে অতি সামান্য একটু মুচকি হাসি তা বাড়েও না, কমেও না। মনে হয় হাসিটা যেন বন্দিনী হয়ে আছে।

আমার কাছে মেয়েটি এসেছিল ঘায়ের ওষুধ নিতে। মাথার ঘায়ের ওষুধ। মেয়েরা যেখানে সিঁদুর পরে ঠিক সেইখানে একজিমার মত হয়েছিল, সমস্ত সীমন্তটা জুড়ে। পরীক্ষা ক'রে দেখলাম কালো-কালো চাপড়া-চাপড়া মামড়ির মত একটা জিনিস একজিমাটাকে ঢেকে রেখেছে। সেটা পরিষ্কার ক'রে তলার ঘা-টাকে পরীক্ষা করলাম। একজিমার মত চুলকানিই একটা, কিন্তু তার চেহারাটা বেশ রাগী-রাগী, আমাদের ডাক্তারী ভাষায় অ্যাংগ্রি লুকিং। আমার সন্দেহ হ'ল আলকাতরা জাতীয় কোন জিনিস মেয়েটি ওর ওপর লাগিয়েছে বোধহয়। একজিমা সারাবার জন্যে অনেকে লাগায়।

বললাম, "ঘায়ের উপর আলকাতরা লাগিও না।"

মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি কমলও না, বাড়লও না। চোখের পাতা দুটি কেবল বার কয়েক ঘন ঘন নড়ল। একটি কথা বলল না সে। যে মলমটা দিলাম সেইটে নিয়ে চলে গেল।

চার-পাঁচদিন মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন বিকেলবেলা গঙ্গার ধার দিয়ে অতি সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে আসছি, রাস্তাটা খুব খারাপ, আশে পাশে ঝোপ-ঝাড়ও প্রচুর, হঠাৎ দেখতে পেলুম মেয়েটি অশ্বত্থগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশে। জেলেরা যখন মাছ ধরতে আসে, তখন ওই কুঁড়েঘরে থাকে। এখন খালি, ভেঙেচুরেও গিয়েছে।

ওকে দেখে গাড়ি থামালাম আমি। মনে হ'ল ওর মাথার ঘা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"এখানেই থাক না কি তুমি ?"

মাথা নেড়ে ভাঙা কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে দিলে।

বললাম, "ওই ভাঙা ঘরে থাক কি ক'রে ?"

কোন উত্তর দিলে না। মুখের মুচকি হাসি তেমনি স্থির হ'য়েই রইল।

"তোমার বাড়ি কোথা ?"

চুপ ক'রে রইল। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক যেন দেখতে পেলাম একটু। ভাবটা—আমার সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন তোমার, যেখানে যাচ্ছ যাও না। একটু চুপ ক'রে থেকে কিন্তু জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে।"

"সে আবার কোথা ?"

"আমদাবাদের কাছে।"

"কোন জেলা ?"

"পূর্ণিয়া।"

"মাথার ঘায়ে মলম লাগিয়েছিলে ?"

"রোজ লাগাই।"

"তবু ত রক্ত পড়ছে দেখছি।"

চুপ ক'রে রইল।

"আবার এসো আমার ডিসপেন্সারিতে। ভাল ক'রে দেখব। ঠিক সিঁদুর পরবার জায়গায় একজিমা হ'ল কী ক'রে? আশ্চর্য ত! চুলকেছিলে নাকি? রক্ত পড়ছে।"

মেয়েটি কিছু বলল না। হঠাৎ আমার মনে হ'ল রক্তটাই সিন্দূরের স্থান অধিকার করেছে যেন। মনে হ'ল, যে জেলেরা প্রতিবার এখানে মাছ ধরতে আসে, মেয়েটি তাদেরই বোধহয় আত্মীয়া। তাই ওই কুঁড়েটা অসঙ্কোচে দখল করেছে। যদিও মেয়েটির চোখে মুখে একটা বিরুদ্ধভাব সজাগ হ'য়ে ছিল, তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা কি? জেলে না কি?"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, "না, আমরা সাপুড়ে।"

মেয়েটি মলম নিতে আমার কাছে আর আসেনি। দিন সাতেক পরে একটি ছেলে এসে আমায় খবর দিলে গঙ্গার ধারে অশ্বত্থতলায় একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে আসব কি? আমি নিজেই গেলুম। গিয়ে দেখি, সেই মেয়েটি! খুব জ্বর হয়েছে। মাথায় ঘা-টা দগদগে হ'য়ে উঠেছে আরও। হাসপাতালে খোঁজ করলাম, বেড খালি নেই। তখন ছেলেদের বললাম, "ওই কুঁড়েঘরটাতেই নিয়ে যাও ওকে। খড় পেতে বিছানা ক'রে দাও। তোমাদের ছাত্র-সমিতি ফাণ্ডে টাকা আছে?"

ছেলেটি ছাত্র-সমিতির একজন সভ্য। দুর্গত দুঃখীদের সাহায্য করাই তাদের ব্রত।

"খড় কেনবার টাকা আছে, কিন্তু ওষুধ কেনবার টাকা নেই।"

ওষুধের ভার আমিই নিলাম।

খড় কিনে বিছানা করবার জন্যে দুটি ছেলে ঘরের ভিতর ঢুকল। আমিও ছিলাম সে-সময়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর বিছানাপত্র কিছু নেই ভিতরে?"

"কিছু না। একটা কাপড়ে বাঁধা ঝুলি শুধু ঝুলছে চাল থেকে।"

"আর কিছু নেই?"

"না।"

প্রায় মাসখানেক ভুগে মেয়েটির জ্বর ছাড়ল। অবশ্য ছেলেরা তার নিয়মিত শুশ্রূষা করতে পারত না। কেবল পথ্য দিয়ে আসত। আমি প্রায় প্রতিদিন কিংবা একদিন অন্তর তাকে গিয়ে দেখে আসতুম। একদিন একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে যে খবর দিলে তা অবিশ্বাস্য। এরকম যে হ'তে পারে তা কল্পনাতীত।

ছেলেটি বললে, "সর্বনাশ হ'য়ে গেছে ডাক্তারবাবু। মেয়েটিকে গোখরো সাপে কামড়েছে। আর বোধহয় বাঁচবে না।"

"সাপে কামড়েছে? কি ক'রে বুঝলে তুমি?"

"আমি স্বচক্ষে দেখলুম যে। আমি সাবু দিতে গেছি, গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা

গোখরো সাপ ওর গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আর তার গালে মুখে ছোবলাচ্ছে। কী প্রকাণ্ড ফণা সাপটার! আমি ভয়ে পালিয়ে এলুম। বাদল আর কানাইকে ডাকলাম, তারা বাড়ি নেই। আপনি যাবেন একবার আপনার বন্দুকটা নিয়ে?"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, গলায় নয়, সাপটা তার ডান বাহুতে জড়িয়ে রয়েছে। সাপের ফণাটা খুব জোরে চেপে রয়েছে মেয়েটি হাত দিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি খানিকক্ষণের জন্য। বন্দুক কোথায় ছুঁড়ব? তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল লেজের খানিকটা কাটা। রক্ত পড়ছে।

মেয়েটির তখনও জ্ঞান ছিল।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "আজকে ও জো পেয়েছে। মাস খানেক বিছানায় পড়ে আছি, ওকে কামাতে পারিনি। বিষদাঁত উঠেছে ওর।"

"সাপ কি তোমার ওই ঝুড়িতে ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার বিয়ের দিন বাসরঘরে ঢুকে আমার স্বামীকে কামড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম ওকে আমি। বেহুলা যেমন যমের সঙ্গ ছাড়েনি, আমিও তেমনি ওর সঙ্গ ছাড়িনি। রোজ ওকে বলেছি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, আর এই গঙ্গার তীরে তীরে হেঁটে হেঁটে আসছি। গঙ্গার জলেই তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—"

"সাপের ল্যাজটা কাটা দেখছি।"

"ওরই রক্ত দিয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরি যে রোজ। আজও পরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ ওকে সামলাতে পারলাম না।"

দেখলাম মাথায় রক্ত-সিঁদুরের রেখা। বাঁ হাতের তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে রক্তাক্ত লেজের টুকরোটাও দেখতে পেলাম।

একটু পরেই তার মৃত্যু হ'ল। সাপটারও হ'ল, কারণ যে বজ্রমুষ্টিতে সে সাপের মাথাটা চেপে ধরেছিল মৃত্যুও তা শিথিল করতে পারেনি।

স্নেহ-প্রসঙ্গ

তখনও মোটর কিনিনি, রিক্‌শা চড়েই যাতায়াত করতাম বাড়ি থেকে। হেঁটে যেতে পারতুম, কিন্তু শরীরে কুলোত না। তাই রিক্‌শার ব্যবস্থা করেছিলাম।

ভদ্রলোক তখন মুচকি হেসে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, "বুঝেছি, এইজন্যেই আপনার ভুঁড়ি হয়েছে—। একসারসাইজ করাটা খুব দরকার।"

"খুব। আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন। আমার দিকে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকুন।"

"কেন বলুন তো?"

"রাস্তায় যেসব মোটা লোক হেঁটে যাচ্ছে তাদের দু' একজনকে ডাকুন।"

"ডাকব ? এখানে ?"

"ক্ষতি কি। ডেকেই দেখুন না—"

"আসবে ?"

"আসতেও পারে দু' একজন।"

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত ক'রে শেষকালে আমার দিকে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসলেন। একটু পরেই ব্রজবিহারীকে দেখা গেল। বেশ মোটা লোক, হন হন ক'রে হেঁটে যাচ্ছে। ভদ্রলোক ব্রজবিহারীকে চিনতেন না, আমি চিনতুম।

"শুনুন—"

"আমাকে ডাকছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ও, ডাক্তারবাবু, নমস্কার।"

এগিয়ে এসে ঢুকল আমার ক্লিনিকে।

"কি বলছেন।"

"আমি বলছি না কিছু। উনি জানতে চাইছেন তুমি পায়ে হেঁটেই বরাবর চলাফেরা কর, না রিক্‌শা চড়।"

"রিক্‌শা চড়বার পয়সা কই। নিদেন পক্ষে দু' আনা পয়সা চাই রিক্‌শা চড়তে হ'লে। কিন্তু দু' আনা বাজে খরচ করবার সামর্থ্যও যে আমার নেই, তা আপনার তো জানা উচিত ডাক্তারবাবু।"

ব্রজবিহারী সত্যিই গরীব ছা-পোষা গৃহস্থ। একশ টাকা মাইনে পায়। ছেলেমেয়ে আটটি। বউ চিররুগ্ন। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকা।

তারপর ব্রজবিহারী সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে, "হঠাৎ একথা জানতে চাইছেন কেন উনি ?"

বললুম, "উনি একটা থিওরি খাড়া করেছেন যে, যারা রিক্‌শা চড়ে তারা মোটা হ'য়ে যায়, আর যারা হাঁটে তাদের এক্‌সারসাইজ হয় বলে মোটা হয় না। এই কথা হচ্ছিল এমন সময় তুমি এসে পড়লে, তোমাকে রোগা বলা যায় না।"

"রোগা মোটেই নয়, বেশ মোটা লোক আমি। কারণটা কি জানেন ? হাঁটি বলে খুব খিদে পায়, ভাত খেয়ে পেট ভরাতে হয়, প্রায় আধ সের চালের ভাত খাই, ফ্যানটাও ফেলি না। তাই বোধহয় মুটিয়ে যাচ্ছি, না ? আপনি তো ডাক্তার মানুষ, আপনি তো সবই বোঝেন, আপনাকে আমি আর বলব কি। আচ্ছা চলি।"

কপালের ঘামটা আঙুল দিয়ে চেঁছে ফেলে ব্রজবিহারী চলে গেল।

ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললুম, "দেখলেন তো, আপনার থিয়োরি টিকল না। এক্‌সারসাইজ করলে সব সময়ে ভুঁড়ি কমে না, বড় বড় পালোয়ানদের মধ্যেও অনেকের

বেশ ভুঁড়ি আছে। কোন একটা নিয়মে সব মানুষকে ফেলা শক্ত। তবে একটা নিয়ম অনেক সময় খাটে—"

"কি নিয়ম ?"

"হাতীর বাচ্চা সাধারণতঃ টিকটিকির মতো রোগা হয় না। অর্থাৎ প্রায়ই দেখা যায় ছেলেরা শেষ পর্যন্ত বাপ-মায়ের মতোই হয়। আমার বাবাকে তো আপনি দেখেছেন, আড়াই মন ওজন ছিল তাঁর। আমার ঠাকুরদাও বেশ স্থূলকায় লম্বা চওড়া লোক ছিলেন। তাই আমি আর আমার ভাইরা সবাই মোটাসোটা।"

"তা না হয় হ'ল। কিন্তু প্রায় বছর চল্লিশ আগে যখন আমি আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন তো আপনি বেশ রোগা ছিলেন।"

ভদ্রলোক প্রথমেই এসে আমাকে বলেছিলেন যে, আমি তাঁকে চিনতে পারছি না। অকপটে স্বীকার করেছিলাম, পারছি না। তখন তিনি আমার বাবার কথা তুললেন, বাড়ির অন্যান্য লোকদের কথাও বললেন। বুঝলাম ১৯১৮ সালের কোনো সময়ে তিনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন সত্যিই আমি রোগা ছিলুম।

"আপনি যখন গিয়েছিলেন তার কিছুদিন আগেই আমি ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগেছিলাম। তাই হয়তো রোগা দেখেছিলেন।"

"তা হবে। আজ কিন্তু সত্যিই আপনার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেছি। এখন আপনার ওজন কত ?"

"চোদ্দ স্টোন।"

"হাইট্ ?"

"পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।"

"হাইট্ অনুসারে বেশ বেশী ওজন আপনার। কিছু কমানো দরকার। আপনি ডাক্তার, আপনাকে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।"

তারপর একটু হেসে তিনি আসল কথাটি প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন বোধহয়, এমন সময় বাধা পড়ল, লাখপতিয়া এসে হাজির হ'ল। তার মাথায় প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড এক পিতলের হাঁড়ি। তার পরনের শাড়িখানি লাল আর হলুদ রঙের এক বিচিত্র লীলা, আঁটসাঁট ক'রে পরা, আঁচলটি কোমরে জড়ানো। দুহাতে কাঁসার চুড়ি, পায়ে কাঁসার মল। বলিষ্ঠা। প্রৌঢ়া আহিরিণী গোয়ালিনী লাখপতিয়া। গলার স্বরটিও কনকনে; কাঁসার বাসনে আঘাত লাগলে যে ঝঙ্কার ওঠে, সে ঝঙ্কার ওর গলায়। ভাষাটি মধুমাখা।

এসেই বললে, "বাবুয়া, ঘি কব চাহি ?"

"কাল—"

"আচ্ছা।"

চলে গেল।

ভদ্রলোককে বললাম, "আমার মেদ বহুলতার আর একটা কারণ মনে পড়ছে। তার সঙ্গেও কিন্তু রিক্‌শা জড়িত।"

"কি রকম ?"

"অনেক দিন আগেকার কথা। থাক···শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না—"

"না, না বিশ্বাস করব না কেন ?"

"পৃথিবীতে এখনও যে খাঁটি জিনিস আছে একথা বিশ্বাস ক'রে না কেউ। ও কথা বলে হাস্যাস্পদ হ'য়ে লাভ কি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আজকাল প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে যে মাতৃস্নেহও খাঁটি নয়, তাতেও স্বার্থের ভেজাল আছে। সুতরাং—"

"না না আপনি বলুন। আমি বিশ্বাস করব—"

"তবে শুনুন। বছর তিনেক আগেকার ঘটনা। তখন যে রিক্‌শাওয়ালাটা আমাকে নিয়ে যেত তার নাম মদন বা পুলক বা ওই জাতীয় কিছু একটা হ'লে মানাতো ভালো। দশ আনা ছ' আনা চুল ছাঁটা, গোঁফটি বাটার-ফ্লাই, মুখে সর্বদাই মুচকি হাসি ; বিকেলের দিকে প্রায়ই দেখা যেত এক ছড়া বেল ফুলের মালা গলায় দিয়েছে, কিংবা হাতে জড়িয়ে রেখেছে। নাম ছিল ঝক্‌সু। প্রিয়দর্শন ছোকরা, মিষ্টি কথা, চোখে মুখে এমন একটা ভাব যেন সে আপনার জন্যে যে কোনও কৃচ্ছ্রসাধন করতে সর্বদাই প্রস্তুত। এইসব কারণে তাকে বাহাল করেছিলুম। তারই রিক্‌শাতে যাতায়াত করতাম। আর সে রোজ এসে ঠিক সময়মতো হাজির হতো আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। এই ভাবেই বেশ চলছিল, এমন সময় হঠাৎ একদিন ছন্দপতন হ'ল। দুপুরবেলা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি ক্লিনিক বন্ধ ক'রে বাড়ি যাই, রিক্‌শাও ঠিক সেই সময় আসে সেদিনও এসেছিল। কিন্তু বেরিয়ে দেখি রিক্‌শাটা রয়েছে, ঝক্‌সু নেই। রাস্তায় নেবে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম, দেখতে পেলাম না। কি করব ভাবছি এমন সময় তার চীৎকার শুনতে পেলাম—বাঁচাও, বাঁচাও। সামনে একটা গলি ছিল সেই গলির ভিতর থেকে চীৎকারটা আসছে। এগিয়ে গিয়ে ঢুকলাম গলিটার মধ্যে। ঢুকে যা দেখলাম তা অপ্রত্যাশিত। একটা বলিষ্ঠ মেয়ে ঝক্‌সুর গলায় গামছা দিয়ে তাকে ঠাস ঠাস ক'রে চড়াচ্ছে। জাঁতিকলে পড়লে নেংটি ইঁদুরের যে দুর্দশা হয়, ঝক্‌সুর তাই হয়েছে। চড়ের চোটে দুটি গালই লাল হ'য়ে উঠেছে, নাক দিয়ে রক্তও পড়ছে। সম্ভবত নাকের উপর ঘুষিও চালিয়েছে মেয়েটি। এ অবস্থায় প্রথমেই যে কথা মনে হওয়া উচিত, আমারও তাই হ'ল। নিশ্চয়ই অবৈধ প্রণয়ঘটিত ব্যাপার কিছু। এসব ব্যাপারে নাক-গলানো সমীচীন হবে কি না ভাবছি, এমন সময় ঝক্‌সু আর্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠল—জান গিয়া, বাঁচাইয়ে হুজুর। মেয়েটি তখন তার বাটার-ফ্লাই গোঁফের উপরই ঘুঁষি চালিয়েছে একটা। নাক-গলাতে হ'ল।

"এই ঠহরো। ক্যা হুয়া হ্যায়—"

তখন সেই মেয়েটি আভীর-ভাষায় খনখনে গলায় যা বললে তার সারমর্ম এই যে,

ঝকৃম্নু একদা তার প্রতিবেশী ছিল। তার রোগা চেহারা দেখে তার প্রতি তার একটা অপত্য স্নেহ হয়। ফলে, যে গরুর দুধ বেচে তাকে সংসার চালাতে হয় সেই গরুর দুধ নির্জলা সে ঝকৃম্নুকে দিতে লাগল। মানে কোন লাভ না নিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল তাকে। ঝকৃম্নু তখন রিক্শা চালাত না, মজুর খাটত। ইঁট মাথায় নিয়ে ভারা বেয়ে উপরে উঠতে হ'ত তাকে। ঝকৃম্নু বলেছিল মজুরি থেকে কিছু কিছু জমিয়ে মাসের শেষে দুধের ন্যায্য দামটা সে দিয়ে দেবে। কিন্তু দুমাস কেটে গেল ঝকৃম্নু একটি পয়সাও দিলে না। তারপর হঠাৎ একদিন সরে পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে যেখানে ও কাজ করত সেখান থেকে সমস্ত মজুরী পাই পয়সা নিয়ে নিয়েছে। তারপর একদিন দেখা গেল ও রিক্শা চালাচ্ছে। গয়লানীর সঙ্গে দেখা হলেই জোরে সাইকেল চালিয়ে সরে পড়ে। ছ'মাস ধরে এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ঝকৃম্নু। আজ ধরা পড়ে গেছে। আজ পয়সা আদায় না ক'রে কিছুতে ছাড়বে না সে। মারতে মারতে ওর 'থোৎনা' চুর ক'রে দেবে।

জিগ্যেস করলুম, "কত পাবে ওর কাছ থেকে ?"

সে আহীর ভাষায় জবাব দিলে, "টাকায় পাচ পোয়া করে দুধ বেচি আমি। কিন্তু ওকে টাকায় দেড় সের ক'রে দেব বলেছিলুম। তাই দেব। ও বারো সের দুধ খেয়েছে। আট টাকা পাওনা আমার।"

বললাম, "আচ্ছা, আমি দাম দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ছেড়ে দাও তুমি।"

"তুমি দেবে ? তুমি দেবে কেন ? দিলে ওর কাছ থেকে আর আদায় করতে পারবে না। বড় বদমাস ছে—"

"আমি ওর রিক্শা চড়ে রোজ যাই। আমি ভাড়া থেকে কেটে নেব।"

টাকাটা ঝকৃম্নুর কাছ থেকে আদায় করেছিলাম কি না সে কথা এ গল্পের পক্ষে অবান্তর হ'ত যদি না সেই গয়লানী একদিন এসে আমাকে প্রণাম ক'রে আমার সামনে ছোট একটি ঘটি নামিয়ে রাখত।

"খুব ভাল ঘি ডাক্তারবাবু, খেয়ে দেখবেন। আপনার জন্যে এনেছি।"

"আমার তো ঘিয়ের দরকার নেই এখন।"

লাখপতিয়া প্রথমে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ল, তারপর ধমকের সুরে বলল, "আমি কি তোমার কাছে দাম চাইছি না কি। খেয়ে দেখো এমন খাঁটি ঘি এ তল্লাটে পাবে না।"

"আমাকে বিনা পয়সায় ঘি দিচ্ছ কেন ?"

মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বললে, "এইসেই—"

বুঝলাম আমার প্রতিও ওর স্নেহ সঞ্চার হয়েছে।

বললাম, "ঘি নিতে পারি, কিন্তু দাম নিতে হবে, এমনি নেব না।"

"বেশ দামই দিও। তোমার পয়সা আছে দাম দেবে বই কি" কণ্ঠস্বরে অভিমানের

সুর। দাম দিয়ে ঘিটুকু নিয়ে নিলুম। ওরকম ভাল ঘি বহুদিন খাইনি। সেই থেকে লাখপতিয়া বরাবর আমাকে ঘি খাওয়াচ্ছে। আমার ভুঁড়ির এ-ও একটা কারণ।"

পরমুহূর্তেই লাখপতিয়া এসে প্রবেশ করল আবার।

"আমি বাবু, কাল আসতে পারব না, আমার বেটি শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবে, তোমার ঘি আজই দিয়ে গেলুম।"

চকচকে মাজা একটি ঘটিতে এক ঘটি ঘি দিয়ে লাখপতিয়া চলে গেল। খাঁটি ঘিয়ের গন্ধে ঘর ভরে উঠল।

ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম, "আপনার কি কোন কাজ আছে আমার কাছে? না, এমনিই দেখা করতে এসেছিলেন?"

তিনি বললেন, "অ্যান্টি ফ্যাট ট্যাবলেট বলে একরকম ট্যাবলেট বেরিয়েছে জার্মানী থেকে। চর্বি কমাবে। আমি তার এজেন্সি নিয়েছি। আপনাকে কিছু স্যাম্পল দিয়ে যাচ্ছি, ব্যবহার ক'রে দেখবেন।"

"আপনার ট্যাবলেট কি লাখপতিয়ার ঘিকে ঠেকাতে পারবে? কারণ ওর ঘি আমাকে খেতেই হবে। না খাইয়ে ও ছাড়বে না।"

লাখপতিয়া আবার এল। খনখনে গলায় বলল, "বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ঘি এক সের এক ছটাক আছে। তুমি একসেরের দামই দিও।"

আত্মহত্যা

চন্দ্রমাধব আশ্চর্য লোক। সে ঘোর শীতে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে, আবার ঘোর গ্রীষ্মে গরম জামা পরতেও তার আপত্তি নেই। উচ্ছে দিয়ে মাংস খেতে এবং হার্ড পেন্সিলে লিখতে ভালবাসে। কথা খুব কম বলে। প্রায়ই গম্ভীর হ'য়ে থাকে। যখন হাসে তখনও নীরবে হাসে, হাসলে টেবো গাল দুটি ফুলে ওঠে, চোখ বুজে যায়। সুপুষ্ট গোঁফের প্রান্ত দু'টি ভুরুর কোণে গিয়ে খোঁচা মারে। আশ্চর্য ওর গোঁফ জোড়া। ওরকম গোঁফ কারো দেখিনি। এক জোড়া জীবন্ত ফিঙে পাখী যেন ওর ওপরের ঠোঁটে মুখোমুখি বসে আছে। যখন চন্দ্রমাধব রেগে যায় তখন যুগল ফিঙে পাখীর দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ দুটি খাড়া হ'য়ে উঠে কাঁপতে থাকে। সুক্ষ্ম পাকানো গোঁফের প্রান্ত অনেক দেখেছি কিন্তু এমন দ্বিধাবিভক্ত ব্যঞ্জন-ভরা ভাষাময় গুম্ফপ্রান্ত আর কারও দেখিনি। অদ্ভুত ওর গোঁফ। ওর মনের ভাব ও গোঁফ দিয়েই প্রকাশ করত। যখন কারো সঙ্গে ওর অমিল হত তখন গোঁফের ডগা দুটি নড়ে নড়ে যেন বলত না, না, না।

একদিন সকালে এসে হাজির। দেখলাম গোঁফের ডগা দুটি ঝুলে পড়েছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। সম্ভবত আমার দৃষ্টিতে প্রশ্নও ফুটে উঠেছিল একটা।

চন্দ্রমাধব পকেট থেকে একটি টাকা বার ক'রে বললে, "এক টাকার জিলিপি আনিয়ে খা—"

"কেন, হঠাৎ ?"

"মা মারা গেছেন। তিনি জিলিপি খেতে এবং জিলিপি খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন।"

আমার কাছ থেকে আর কয়েকজন বন্ধুর খবর নিয়ে গেল তারা কোলকাতায় আছে কি না। শুনলাম প্রত্যেককে গিয়ে জিলিপি খাইয়েছে।

আর একদিন দেখি তার গোঁফের ফিঙে দুটি যেন উন্মনা, উড়ু উড়ু করছে। 'মেকি কি' 'মেকি কি' বলে ডেকে উঠল বুঝি।

"কি ব্যাপার চন্দ্রমাধব—"

চন্দ্রমাধব কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর হাসল। চোখ বুজে গেল, গোঁফের আলুলায়িত পুচ্ছ গিয়ে মিলল ঘন ভ্রূর সঙ্গে।

প্রায় চুপিচুপি বললে, "প্রেমে পড়েছি—"

"সে কি ! কার সঙ্গে ?"

"রমলার।"

মাসখানেক কেটে গেছে তারপর।

একদিন ঘরে ফিরে দেখি আমার বিছানায় আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে কে যেন ঘুমোচ্ছে।

"কে—"

মুখের ঢাকা খুলতেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠলাম। চন্দ্রমাধব। কিন্তু গোঁফ নেই। পরিষ্কার কামানো।

"এ কি করলি !"

"রমলার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

একই বারান্দায়

আমার ডিসপেন্সারির সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দা আছে। তার উপরে দিনে ধুলো জমে, রাত্রে কুলি আর রিক্শাওলারা শোয়। গভীর রাত্রে সেখানে মাঝে মাঝে জুয়ারও আড্ডা বসে শুনেছি। একদিন ডিসপেন্সারিতে বসে আছি এমন সময় সেই বারান্দায় আর একরকম সম্ভাবনা আভাষিত হ'ল হঠাৎ।

একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে এসে ডিসপেন্সারিতে প্রবেশ করল এবং নমস্কার ক'রে কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। রোগী নয়, সাহায্যপ্রার্থী। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু।

পূর্ববঙ্গের ভাষায় সসঙ্কোচে বললে, "বড় দুরবস্থায় পড়েছি। কিছু সাহায্য চাই।" এর আগে এরকম সাহায্য আরও অনেক করেছি। দু' এক টাকা দিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমার মনে এক উদ্ভট প্রেরণা এল।

বললাম, "সামান্য দু' এক টাকা নিয়ে কি আপনার অভাব মিটবে? এরকম ভিক্ষে করেই বা চলবে কতদিন?"

"আমাকে একটা চাকরী জুটিয়ে দিন কোথাও।"

"লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"ম্যাট্রিক পাশ করেছি।"

"ম্যাট্রিক পাশ ছেলের তো কোথাও ভাল চাকরি জুটবে না। তার চেয়ে তুমি ছোটখাটো দোকান কর না কোথাও।"

"ক্যাপিট্যাল কে দেবে আমাকে!"

"বেশী ক্যাপিটাল দিয়ে কি হবে। খুব কম ক্যাপিটাল নিয়ে আরম্ভ কর কিছু, দোকানদারি করবার অভিজ্ঞতাটা হোক আগে। তারপর বেশী ক্যাপিট্যাল নিয়ে বড় কিছু করবার যোগ্যতা হবে।"

"কি করব বলুন—"

"আমার এই ডিসপেন্সারির সামনে দিয়ে এই বড় রাস্তা চলে গেছে। কত লোক যাচ্ছে আসছে। তুমি কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি দেশলাই নিয়েই বসে যাও না। অনেক ছেলেমেয়েও রোজ স্কুলে যায় এদিক দিয়ে, খাতা, পেন্সিল, কালির বড়ি—এসবও কিছু কিছু রাখতে পার। আমার এই চওড়া বারান্দা রয়েছে, এরই ওপর বসে যাও কাল থেকে—"

"ওসব জিনিস কেনবারও টাকা নেই আমার কাছে।"

"আচ্ছা আমি দিচ্ছি তোমায় দশটা টাকা।"

দশটা টাকা দিলাম। টাকা নিয়ে সে জিনিসপত্রও কিনে আনল। একটা মাদুর দিলাম, সেটা বারান্দায় বিছিয়ে হর্ষকুমার দোকান সাজিয়ে বসল। লজেন্সও এনেছিল কিছু। তাই ছেলেমেয়েরা আসতে লাগল। প্রথম মুশকিল হ'ল ভাষা নিয়ে। হর্ষকুমারের ভাষা বিহারী ছেলেমেয়েরা বোঝে না, তাদের ভাষা হর্ষকুমার বুঝতে পারে না। তারপর লক্ষ্য করলাম হর্ষকুমারের কথা বলবার ধরনটাও মোলায়েম নয়, মুখভাবও স্নিগ্ধ নয়। সে সকলের সঙ্গে যেন খেঁকিয়ে কথা বলছে। যদিও সে মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে বসে আছে এবং তার পুঁজি মাত্র দশ টাকা, কিন্তু তার হাবভাব যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর মতো। সম্ভ্রমাত্মক হিন্দী 'আপ' শব্দটা তার জানা ছিল না। কোন ছেলে তাই তার দোকানে এসে জিনিসে হাত দিলেই সে মাতৃভাষায় খিঁচিয়ে উঠত—"এই ছ্যামড়া, ও কি করস।" তার ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেগুলো প্রথম প্রথম হাসত খুব। তারপর ছেলেদের যা স্বভাব ক্যাপাতে শুরু করলে তাকে। নামই বার ব'রে ফেললে তার

একটা—করসবাবু। 'এ করসবাবু' 'এ করসবাবু' বলে রোজ এসে চীৎকার করত তারা তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আমি শুদ্ধ অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়লুম। বিক্রি অবশ্য হ'ত কিছু-কিছু রোজই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হর্ষকুমার দোকান টিকিয়ে রাখতে পারল না। একদিন এসে বলল আমাকে যে দেশে তার জমিদারি ছিল, সে জমিদারের ছেলে, এরকম উঞ্ছবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। পরদিনই আমার বারান্দা থেকে উঠে গেল। দিন কয়েক পরে আমার দশটা টাকাও ফেরত দিয়ে গেল। এইখানেই যবনিকাপাত হ'ল—এই আমার মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু যবনিকাপাত হ'ল মাস তিনেক পরে। হর্ষকুমার আর একদিন এসেছিল। একেবারে ফুলবাবু সেজে এসেছিল। মাথায় ঢেউ-খেলানো তেড়ি, কব্জিতে রিস্টওয়াচ, পরনে হাওয়াই কোট আর ছিটের প্যান্ট। বললে—চাকরি পেয়েছি একটা। জিজ্ঞাসা করলাম মাইনে কত। বললে, পঁয়তাল্লিশ টাকা। পরে আরও বাড়বে। দেখলাম এইতেই সে খুব খুশী।

উক্ত ঘটনার মাস ছয়েক পরে একদিন আর একটি সৌম্যদর্শন যুবক হাজির হ'ল আমার বারান্দায়। এ-ও উদ্বাস্তু। পাঞ্জাব থেকে এসেছে। তার সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে সবিনয়ে নমস্কার ক'রে এগিয়ে এল। হিন্দী ভাষায় জানাল তার একটি প্রার্থনা আছে আমার কাছে।

"কি প্রার্থনা ?"

সে বললে যে, আমার বারান্দায় সে ছোটখাটো একটা চায়ের দোকান করতে চায়। সে গরীব উদ্বাস্তু, মাসে পাঁচ টাকার বেশী 'কেরায়া' (ভাড়া) দিতে পারবে না। আমি যদি মেহেরবানি করি তাহলে বড়ই উপকৃত হয় সে।

তাকে বললাম, "বেশ দোকান কর। ভাড়া দিতে হবে না।"

কৃতার্থ হয়ে গেল সে যেন।

পরের দিনই যজ্ঞদত্ত তার দোকান ফেঁদে ফেললে। তার সম্বল একটা তোলা কয়লার উনান, কিছু পিরিচ পেয়ালা, এক বালতি জল, কিছু চা, দুধ আর চিনি। উনুনটা বাইরে থেকেই ধরিয়ে আনত। ধোঁয়ার জন্য আমাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি।

উপরন্তু আমার নানারকম সুবিধা ক'রে দিয়েছিল সে। আমাকে এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের বিনা পয়সায় চা খাওয়াতো। রোজ সকালে এসেই আমার ডিসপেন্সারি ঘরটি ঝাড়ু দিত, টেবিল চেয়ার ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কারভাবে জল ভরে আনত। একদিন বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনার জুতোয় অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি, যদি হুকুম করেন কালি বুরুশ ক'রে দিই।" নিজের জুতোর দিকে চেয়ে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যিই অনেক দিন কালি দেওয়া হয়নি।

বললাম, "থাক। তোমাকে করতে হবে না। ভুটুয়া ক'রে দেবে'খন।"

"আমি দিচ্ছি হুজুর। ভুটুয়ার চেয়ে আমি অনেক ভাল পারব। আপনি দেখুন—"

জোর ক'রে আমার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল। আর সত্যিই এমন চমৎকার বুরুশ ক'রে দিলে যে, তাক লেগে গেল আমার। কোন মুচিও বোধহয় এমন চমৎকার ক'রে করতে পারত না।

আমি খুব খুশী হলাম তার উপর। শুধু আমি নয়, আমার গৃহিণীও হলেন। কারণ গৃহিণীর প্রধান সমস্যা ছিল সকাল বেলার বাজার। আমার ডিসপেন্সারির চাকর ভুটুয়া ডিসপেন্সারির কাজকর্ম সেরে তবে বাজার করতে যেত। যজ্ঞদত্ত তার কাজের ভার নেওয়াতে সে সকাল সকাল ছুটি পেত, বাজারও পৌছত ঠিক সময়ে। যজ্ঞদত্তের দোকানও বেশ জে'কে উঠল।

তার ভদ্র ব্যবহারে আর সুন্দর চেহারায় সবাই আকৃষ্ট হ'ত তার দোকানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেয়ে যেত অনেকে। ক্রমশ সে বিস্কুট আর কেকও আমদানি করলে। বেশ চলতে লাগল দোকান।

দিনকতক পরে রাস্তার ওপারে একটি ঘর খালি হল। যজ্ঞদত্ত তার দোকান উঠিয়ে নিয়ে গেল সেখানে। টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজাল দোকানটিকে। তারপর একদিন দেখলাম চপ কাটলেটও ভাজা হচ্ছে সেখানে।

যজ্ঞদত্ত দোকান অন্য জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আগে যেমন ছিল, তখনও তেমনি রইল। আমার ডিসপেন্সারি ঝাড়ু দেওয়া, চেয়ার টেবিল ঝাড়া, কুঁজোয় জল ভরা এবং মাঝে মাঝে জুতো বুরুশ করা—ঠিক আগের মতোই চলতে লাগল। যজ্ঞদত্ত আমার নির্ভরযোগ্য আপনজন হয়ে উঠল ক্রমশ।

একদিন সে এসে একখানি চিঠি আমাকে দিলে। বললে, "আমি ইংরেজী পড়তে পারি না, চিঠিটাতে কি আছে মেহেরবানি ক'রে পড়ে দিন।" দেখলাম চিঠিখানা দিল্লী থেকে এসেছে। তাতে যা লেখা আছে, তা পড়ে বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে গেলাম আমি। লেখা আছে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে যে সম্পত্তি ছিল তা বিক্রি করা হয়েছে এবং তার অংশের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সরকারের কাছে জমা করা হয়েছে। যজ্ঞদত্ত যেন আইন অনুসারে সে টাকাটা নেবার ব্যবস্থা করে। যজ্ঞদত্তকে চিঠির মর্ম বললাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সম্পত্তি ছিল তোমার?"

"জমিদারি ছিল হুজুর। জুয়েলারির কারবার ছিল। হাতি বাঁধা থাকত আমাদের দুয়ারে—"

ইচ্ছে হ'ল যজ্ঞদত্তকে প্রণাম করি একটা। কিন্তু তা আর পারলাম না।

বিনতা দস্তিদার

শ্রীবিরূপাক্ষ ভৌমিক যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বৎসর। তাঁর বন্ধু—একমাত্র বন্ধু—ত্রিপুরা সেন বলেন তিনি প্রেমে পড়ে বিনতাকে বিয়ে করেছিলেন। ত্রিপুরা সেন মানা করা সত্ত্বেও করেছিলেন—প্রেমে পড়লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে বিরূপাক্ষ ভৌমিকের আলাপ প্রায় বছর দশেকের। আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল ক্রমশ। প্রথম আলাপ হয়েছিল কারণ দু'জনেরই পেশা ছিল এক, দু'জনেই ইন্‌শিওরেন্সের দালাল। অন্তরঙ্গতা হবার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল—দু'জনেই বেশ অশ্লীলতাপ্রিয় ছিলেন। দু'জনের কাছেই পর্নোগ্রাফির অনেক বই ছিল এবং দু'জনেই মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধরনের আলোচনা করতেন তা ভদ্রলোকের পক্ষে অশ্রাব্য। এই প্রবৃত্তিই তাঁদের বন্ধুত্বকে নিবিড়তর করেছিল। বিরূপাক্ষবাবু বিপত্নীক এবং ত্রিপুরাবাবু অবিবাহিত, সেজন্য আরও জমেছিল অন্তরঙ্গতাটা। ভালবাসার ভাগীদার ছিল না কেউ। এক বাড়িতে বাস করতেন দু'জনে। এক গলিতে দোতলার উপর ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন তাঁরা। পাশাপাশি দুটি শোবার ঘর, তাছাড়া একটি বসবার ঘর এবং রান্নাঘর। দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট।

পর্নোগ্রাফি পড়া ছাড়া দুজনের অবসর বিনোদনের আর একটি উপায় ছিল। সন্ধ্যার পর দুজনে যখন মিলিত হতেন তখন আলোচনা করতেন কার চোখে সেদিন কি রকম মেয়ে পড়েছে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাব-ভাবের বর্ণনায় মশগুল হ'য়ে যেতেন তাঁরা।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন ত্রিপুরা এসে বললেন, "বুকে ছুরি মেরে দিয়েছে দাদা আজ। একেবারে ঘায়েল হয়ে গেছি!"

উৎসুক বিরূপাক্ষ বললেন, "কি রকম? কে মারল বুকে ছুরি—"

"বিনতা দস্তিদার!"

"সে আবার কে—"

"আমাদেরই কম্পানির একটি এজেন্ট। আজই বাহাল হয়েছে। আপিসে এসেছিল আজ। তুমি তো গেলে না, গেলে দেখতে পেতে কি মাল একটি। চোখের চাউনি যেন চাকু ছুরি। ঘ্যাচ ক'রে বুকে বসে যায়।"

লালায়িত হয়ে উঠলেন বিরূপাক্ষ।

"ওফ্, বড্ড মিস করেছি তো!

"মিস করনি। আবার সে আসবে কাল। সে তোমাকে চেনে বোধহয়। তোমার খোঁজ করছিল। আমি তাকে বলেছি কাল তুমি আপিসে আসবে।"

"আমাকে চেনে ? বিনতা দস্তিদার ? মনে পড়ছে না তো। বয়স কত হবে—"

"কুড়ির নীচেই। অর্ধস্ফুট গোলাপ—"

বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের যখন দেখা হ'ল তখন একটা জিনিস দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তার মুখের নিচের দিকটা ওড়না দিয়ে ঢাকা। থুতনিও ভাল ক'রে দেখা যায় না। মনে হয় যেন কোনও বোরখা-পরা মেয়ে মুখের উপরার্ধটা খুলে দিয়েছে। আলাপ হবার পরই বিরূপাক্ষ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনার পোশাকের একটু নতুন রকমের বৈচিত্র্য আছে দেখছি। এদেশে হিন্দু মেয়েদের এরকমটা প্রায় দেখা যায় না—।"

বিনতা উত্তর দিয়েছিল, "না, এদেশের পোশাক নয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলাম। সেখানে এই রকম পোশাক অনেক মেয়ে পরত। খু-উ-ব ভাল লাগত আমার। সেই জন্যে যখনই বাইরে বেরুই এই পোশাক পরি! দেখতে ভালো নয় ?"

"চমৎকার।"

..বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষের ঘনিষ্ঠতা হ'তে বিলম্ব হয়নি। বিরূপাক্ষকে সেজন্য বেশী চেষ্টাও করতে হয়নি। বিনতাই বিরূপাক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে বেশী উৎসুক এই কথা মনে হয়েছিল ত্রিপুরা সেনের। বিনতাই হোটেলে নিমন্ত্রণ করত বারবার তাকে। সিনেমার টিকিট কিনে আনত তার জন্যে। তাকে একলা ডেকে নিয়ে যেত ইডেন গার্ডেনে, চিড়িয়াখানায়, হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে উধাও হয়ে যেত দু'জনে মাঠের দিকে। বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন বিরূপাক্ষ, লোলুপ হ'য়ে উঠলেন ত্রিপুরা সেন। স্বাভাবিক নিয়মে ত্রিপুরা সেনের ঈর্ষাও হ'তে লাগল খুব। কিন্তু চতুর লোক ছিলেন ত্রিপুরা, মনের ভাব গোপন করার দক্ষতাও ছিল তাঁর। তিনি যে ঈর্ষাক্লিষ্ট বা লোলুপ, এটা ঘুণাক্ষরে জানতে দিলেন না বিরূপাক্ষকে। মাঝে মাঝে কেবল ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, "কি ভায়া, গাঁথতে পারলে ?"

বিরূপাক্ষ বলতেন, "আমারই গলায় বঁড়শি আটকে গেছে। ছটফট করছি।"

"থুতনির সামনের পরদা নেবেছে ?"

"না। সেটা ও সহজে নাবাবে না।"

"কেন ?"

"নাবাবে না তার খুশি।"

দিন কয়েক পরে বিরূপাক্ষ একদিন বললেন, "এইবার বোধহয় যবনিকা পতন হবে মনে হচ্ছে।"

"কি রকম—"

"ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বলছে বিয়ের পর ও থুতনির পরদা সরিয়ে ফেলবে। ফুলশয্যার রাত্রেই ফেলবে বলছে।"

"একটা অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিয়ে করবে ? সেটা কি বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে ?"

"হবে না তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে আমার চাইই। ওর কালো চোখের চাউনি পাগল করেছে আমাকে। ও স্পষ্ট বলে দিয়েছে বিয়ে না করলে ও ধরা দেবে না।"

"কিন্তু তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। মূল্যের ইতরবিশেষ হ'তে পারে কিন্তু কেনা যায়। এ লাইনে চেষ্টা ক'রে দেখ না।"

"দেখেছি। বিনতাও বিক্রীত হতে রাজী, কিন্তু তার মূল্য ওই—বিবাহ করতে হবে।"

বিনতার সঙ্গে বিরূপাক্ষ ভৌমিকের বিবাহ হয়েছিল অনতিবিলম্বে। ঠিক তার পরের ঘটনাটা খবরের কাগজে অনেকে হয়তো পড়েছেন। ফুলশয্যার রাত্রেই বিরূপাক্ষ ভৌমিকের মৃত্যু হয়েছিল। ডাক্তার ঘোষালের মতে হার্টফেল ক'রে মারা গিয়েছিলেন ভৌমিকমশাই। কাগজে এর বেশী খবর আর বেরোয়নি।

ত্রিপুরা সেন তাঁর ডায়েরিতে কিন্তু এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা বিস্ময়কর।

তিনি লিখছেন—"বিরূপাক্ষবাবুর ফুলশয্যার রাত্রে আমি আড়ি পেতে ছিলাম, তির্যকভাবে আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। ইংরেজীতে যাকে বলে Vicarious pleasure. ঠিক আমার পাশের ঘরেই ফুলশয্যা হয়েছিল, আমাকে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি এজন্য। একটা জানলার ফুটো দিয়ে আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। বিনতা শেষ পর্যন্ত তার গলার সামনে সেই নীল ওড়না টাঙিয়ে রেখেছিল। বিয়ে হয়েছিল তিন আইন অনুসারে। সুতরাং সে ওড়না সরাবার প্রয়োজন হয়নি। বিনতা যখন ফুলশয্যার খাটে উঠল তখনও তার গলার সামনে নীল-ওড়না। বিরূপাক্ষ বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। একটু অধীরকণ্ঠে বলল—"এইবার ওটা সরিয়ে দাও না বিনতা।" "এই যে দিচ্ছি"—বলে বিনতা ওড়নাটা খুলে ফেলে দিয়ে এমন গ্রীবাভঙ্গি ক'রে বসে রইল যে আমি চমকে গেলাম। আমার মনে হ'ল ঠিক যেন একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। অনেক সাপের গলায় কালো কালো ডোরা থাকে। বিনতার গলাতেও ছিল। চার-পাঁচটা ঘন-কালো রেখা। হঠাৎ মনে হয় চামড়ার নিচে বুঝি রক্ত জমে আছে। চীৎকার ক'রে উঠল বিরূপাক্ষ—"কে, কে, কে তুমি ? তুমি কি—?" খিলখিল ক'রে হেসে উঠল বিনতা। তারপর একেবারে অন্যরকম কণ্ঠে জবাব দিল—'হ্যাঁ, আমি সেই।" আর্তনাদ ক'রে অজ্ঞান হয়ে গেল বিরূপাক্ষবাবু। বিনতা বিছানা থেকে নেবে এসে ঘরের খিল খুলল। খুলেই আমাকে দেখতে পেল সে। সহজকণ্ঠে বলল—"ডাক্তার ঘোষালকে একবার খবর দিন তো। উনি অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন।" ডাক্তার ঘোষাল এসে ভৌমিকমশাইকে আর জীবিত দেখেননি। বিনতা ঠিক তারপরই চলে গেল। ঠিক যেন উপে গেল। শবানুগমনও সে করেনি। আশ্চর্য মেয়ে—"

বিরূপাক্ষবাবুর মৃত্যুর এক বছর পরে সি. আই. ডি. বিভাগের একটি কর্মচারী একদিন বিরূপাক্ষবাবুদের অফিসে এলেন। তিনি একটি ফোটো ত্রিপুরা সেনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—"এই চেহারার কোনও লোক কি আপনাদের আপিসে কাজ করেন ?" ত্রিপুরা সেন অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন ফোটোটার দিকে। চেনা-চেনা মনে হচ্ছে অথচ ঠিক চিনতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ পারলেন। বিরূপাক্ষবাবুর ফোটো, কিন্তু অনেকদিন আগের, সম্ভবত তাঁর যৌবনকালের।

বললেন, "বিরূপাক্ষবাবুর ফোটো মনে হচ্ছে—"

"হ্যাঁ, তিনি ওই ছদ্মনামেই আপনাদের আপিসে কাজ করেন শুনেছি। তিনি কোথায় ?"

"তিনি তো বছরখানেক আগে মারা গেছেন।"

"ও।"

"তাঁকে কেন খুঁজছেন ?"

"তিনি একজন ফেরারি আসামী। প্রায় একুশ বছর আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন—"

"বলেন কি—!"

ত্রিপুরা সেনের চোখের সামনে বিনতার গলার কাল দাগগুলো সহসা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বোবা

মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূর-সম্পর্কীয় পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এই বয়সেই সব রকম কাজ করতে পারে সে। সব রকম কাজই করতে হয়। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মহৎ হ'য়ে সুবিধাই হয়েছে যোগেন বসাকের। পেটভাতায় এমন সর্বগুণান্বিতা চব্বিশঘণ্টার চাকরানী পাওয়া শক্ত হ'ত তাঁর পক্ষে। বোবা হওয়াতে আরও সুবিধা হয়েছে, নীরবে কাজ করে। মিনু শুধু বোবা নয়, ঈষৎ কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে, তবে শুনতে পায়। সব কথা শোনার দরকারও হয় না তার। ঠোঁটনাড়া আর মুখের ভাব দেখেই সব বুঝতে পারে। এছাড়া তার আর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে সে এমন সব জিনিস বুঝতে পারে, এমন সব জিনিস মনে মনে সৃষ্টি করে, সাধারণ বুদ্ধিতে যার মানে হয় না। মিনুর জগৎ চোখের জগৎ, দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে। শুধু গ্রহণ করেনি, নূতন রূপ, নূতন রং আরোপ করেছে তাতে।

খুব ভোরে ওঠে সে। ভোর চারটের সময়। উঠেই দেখতে পায় পুব আকাশে দপ দপ ক'রে জলছে শুকতারা। পরিচিত বন্ধুকে দেখলে মুখে যেমন মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, তেমনি হাসি ফুটে ওঠে মিনুর মুখেও। মিনু মনে মনে বলে—সই ঠিকসময়ে উঠেছ দেখছি বৈজ্ঞানিকের চোখে শুকতারা বিরাট বিশাল বাষ্পমণ্ডিত প্রকাণ্ড গ্রহ, কবির চোখে নিশাবসানের আলোক দূত, কিন্তু মিনুর চোখে সে সই। মিনুর বিশ্বাস সে-ও তার মতো কয়লা ভাঙতে উঠেছে ভোর বেলায়, আকাশবাসী তার কোন পিসেমশায়ের গৃহস্থালিতে উনুন ধরাবার জন্যে। আকাশের পিসেমশায়ও হয়তো ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে তার নিজের পিসেমশাইয়ের মতো। শুকতারার আশেপাশে কালো মেঘের টুকরো যখন দেখতে পায়, তখন ভাবে ওই যে কয়লা। কি বিচ্ছিরি ক'রে ছড়িয়ে রেখেছে আজ। মাঝে মাঝে এমন নুংরুট্টি হয় ও। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে। তারপর নিজে যায় সে কয়লা ভাঙতে। কয়লাগুলো ওর শত্রু। শত্রুর উপর হাতুড়ি চালিয়ে ভারি তৃপ্তি হয় ওর। হাতুড়িটার নাম রেখেছে গদাই, আর যে পাথরটার উপর রেখে কয়লা ভাঙে তার নাম দিয়েছে শানু। শানের সঙ্গে মিল আছে বলে বোধহয়। কয়লা-গাদার কাছে গিয়ে রোজ সে ওদের মনে মনে ডাকে—ও গদাই, ও শানু, ওঠ এবার, রাত যে পুইয়ে গেছে। সই এসে কয়লা ভাঙছে। তোমরাও ওঠ। কয়লা ভাঙতে ভাঙতে সে অস্পষ্ট হিসহিস শব্দ করে একটা। মনের ঝাল মিটিয়ে শত্রুর মাথা ভাঙছে যেন। কয়লা ভেঙে তারপর যায় সে ঘুঁটের কাছে। ঘুঁটে তার কাছে ঘুঁটে নয়, তরকারি। উনুনের নাম রাক্ষসী। উনুন রাক্ষসী কেরোসিন তেল-দেওয়া ঘুঁটের তরকারি দিয়ে শত্রুদের মানে কয়লাদের, খাবে! আঁচটা যখন গনগন ক'রে ধরে ওঠে তখন ভারি আনন্দ হয় মিনুর। জলন্ত কয়লাগুলোকে তার মনে হয় রক্তাক্ত মাংস, আর আগুনের লাল আভাকে মনে হয় রাক্ষসীর তৃপ্তি। বিস্ফারিত-নয়নে সে চেয়ে থাকে। তারপর ছুটে চলে যায় উঠোনে; আকাশের দিকে চেয়ে দেখে সেখানে ঊষার লাল আভা ফুটেছে কি না। ঊষার লাল আভা যেদিন ভাল ক'রে ফোটে, সেদিন সে ভাবে, সইয়ের উনুনে চমৎকার আঁচ এসেছে। যেদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন ভাবে, ছাই পরিষ্কার করেনি, তাই আঁচ ওঠেনি আজ। এই ভাবে নিজের একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেছে সে মনে মনে। সে জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের মিল নেই। সে জগতে তার শত্রু মিত্র সব আছে। আগেই বলেছি কয়লা তার শত্রু। তার আর একদল শত্রু আছে, বোলতা ভীমরুল। একবার কামড়েছিল তাকে। সে যন্ত্রণা সে ভোলেনি। প্রতিশোধ নিতেও ছাড়ে না। দুপুরে যখন পিসিমা ঘুমোয় তখন সে ঘুরে বেড়ায় কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর গামছায় একটা প্রকাণ্ড গেরো বেঁধে। বোলতা বা ভীমরুল দেখতে পেলেই সাঁ ক'রে গামছাটা ঘুরিয়ে মারে। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় মাটিতে। অনেক সময় মরে যায়, অনেক সময় মরে না। না মরলে ঝাঁটা-পেটা ক'রে মারে তাকে। আর হিসহিস শব্দ করে। বোলতা বা ভীমরুল মেরে সে,

খেতে দেয় পিঁপড়েদের। পিঁপড়েরা তার বন্ধু। মরা বোলতাটাকে নিয়ে যাবার জন্যে শত শত পিঁপড়ে ভিড় ক'রে আসে। তারা কেমন ক'রে খবর পায় কে জানে। বোলতাটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় যখন তারা, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে মিনু। কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরোয় তার মুখ থেকে. এটা তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের অভিব্যক্তি। পিঁপড়েরা ছাড়া আরও অনেক বন্ধু আছে তার। রান্নাঘরের বাসনগুলি সব তার বন্ধু। তাদের নাম রেখেছে সে আলাদা আলাদা। ঘটিটার নাম পুঁটি। ঘটিটা একদিন হাত থেকে পড়ে গিয়ে তুবড়ে গেল। মিনুর সে কি কান্না! তোবড়ানো জায়গাটায় রোজ হাত বুলিয়ে দেয়. গেলাস চারটের নাম হারু, বারু, তারু আর কারু। চারটে গেলাসই একরকম। কিন্তু মিনুর চোখে তাদের পার্থক্য ধরা পড়ে। গেলাসগুলোকে যখন মাজে বা ধোয় তখন মনে হয় সে যেন ছোট ছেলেদের স্নান করাচ্ছে। মিটসেফ-টা ওর শত্রু। ওটার নাম দিয়েছে গপগপা। গপগপ ক'রে সব জিনিস পেটে পুরে নেয়। মাঝে মাঝে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মীটসেফের চকচকে তালাটার দিকে, আর মনে মনে বলে—আ মর, মুখপোড়া সব জিনিস পেটে পুরে বসে আছে। মিনুর আর একটি দৈনন্দিন কর্তব্য আছে। যখন অবসর পায় টুক্ ক'রে চলে যায় ছাতে. ছাত থেকে একটা বড় কাঁটাল গাছ দেখা যায়। কাঁটাল গাছের মাথার দিক থেকে একটা সরু শুকনো ডাল বেরিয়ে আছে। সেই ডালটার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে মিনু। মনে হয় তার সমস্ত অন্তর যেন তার দৃষ্টিপথে বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় করেছে ওই ডালটাকে। এর কারণ আছে। তার জন্মের পূর্বেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বাবাকে সে দেখেনি। অনেকদিন আগে তার মাসিমা তার কানের কাছে চীৎকার ক'রে একটা বিস্ময়কর খবর বলেছিল তাকে। তার বাবা নাকি বিদেশ গেছে, অনেক দূর বিদেশ, মিনু বড় হ'লে তার কাছে ফিরে আসবে, হয়তো তার কোলেই আসবে। মিনু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা ভাল ক'রে। একটা জিনিস কেবল তার মনে গাঁথা হ'য়ে ছিল—বাবা ফিরে আসবে। কবে আসবে? মিনু কত বড় হলে আসবে? কথাটা মাঝে মাঝে ভাবত সে। এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সে সেদিনও ছাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেল পাশের বাড়ির টুনুর বাবা এল বিদেশ থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে তার নজরে পড়ল ওই সরু ডালটায় একটা হলদে পাখিও এসে বসল। সেইদিন থেকে তার বদ্ধ ধারণা হ'য়ে গেছে ওই সরু ডালে যেদিন হলদে পাখি এসে আবার বসবে, সেইদিনই তার বাবা আসবে বিদেশ থেকে। তাই ফাঁক পেলেই সে ছাতে উঠে কাঁঠাল গাছের ওই সরু ডালটার দিকে চেয়ে থাকে। হলদে পাখি কিন্তু আর এসে বসে না। তবু রোজ একবার ছাতে ওঠে মিনু। এটা তার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে একটা। ছাতে উঠে উঠে আর একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। রাস্তার কালো কুকুরটার পায়ের থাবার উপরে ঘা হয়েছিল একটা. মিনু দেখত কুকুরটা রোজ সেটাকে চাটে।

নিবিষ্ট মনে চেটে যায় খালি। তারপর মিনু সবিস্ময়ে একদিন লক্ষ্য করল ঘা-টা সেরে গেছে। কেবল চেটে চেটে ঘা-টাকে সারিয়ে ফেলেছে কুকুরটা। অবাক হয়ে গেল মিনু। তার মনে হ'ল ঘা-টা বোধহয় আমসত্ত্বের মতো। তাই চাটতে পেরেছে। তাক লেগে গেল ওর ডাক্তারি দেখে। আর একটা জিনিসও বসে গেল ওর মনে—ঘা নিশ্চয় আমসত্ত্ব, তা না হ'লে চাটতে পারে কেউ?......দিন কয়েক পরে পিসিমার বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলটা ছেঁচে গেল শিল পড়ে। পিসেমশাই কি একটা ওষুধ দিলেন। বোধহয় হোমিওপ্যাথিক। বললেন, সাতদিন পরে আর এক দাগ দেবেন। এই সাতদিনে ঘা কিন্তু খুব বেড়ে গেল। যন্ত্রণায় পিসিমার চোখে জল পড়তে লাগল। পাড়ার হারু ডাক্তার সকালে এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলেন। ঘুমের ওষুধ খেয়ে পিসিমা ঘুমুচ্ছেন, পায়ের পটিটা আলগা হ'য়ে সরে গেছে, ঘা-টা দেখা যাচ্ছে। মিনুর মনে হল আমসত্ত্ব, আমসত্ত্বের মতোই তো কালচে দেখতে। তার ইচ্ছে হ'ল চেটে দিই একটু, হয়তো সেরে যাবে, কুকুরটা তো চেটে চেটেই সারিয়েছে ঘা-টা। মিনু জিব বার ক'রে চেটে দিলে ঘা-টা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল পিসিমার, আঁৎকে চীৎকার ক'রে উঠলেন তিনি—কি করলি পোড়ামুখী। পাখাটা ছুড়ে মারলেন তিনি মিনুকে। মিনু পালিয়ে গেল। লুকিয়ে রইল সমস্ত দিন। সেইদিনই রাত্রে কম্প দিয়ে জ্বর এল তার। কাউকে কিছু বললে না। মনে হ'ল জ্বর হওয়াটাও বুঝি অপরাধ একটা।......ভোরে ঘুম ভেঙে গেল, রোজ যেমন কয়লা ভাঙতে যায় সেদিনও তেমনি গেল, সেদিনও চোখে পড়ল শুকতারাটা দপদপ ক'রে জ্বলছে। মনে মনে বলল—সই এসেছিস। আমার শরীরটা আজ ভাল নেই ভাই। তুই ভাল আছিস তো? উনুনে আঁচ দিয়ে কিন্তু সে আর জল ভরতে পারলে না সেদিন। শরীরটা বড্ড বেশী খারাপ হতে লাগল। আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। কেমন যেন ঘোর-ঘোর মনে হতে লাগল।......চাটবার পর থেকে পিসিমার ঘা-টাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। মিনু টের পায়নি, কারণ পিসিমার কাছে আর সে ঘেঁষেনি। এ-ও জানত না যে পিসেমশায় পাশের গাঁয়ে তাঁর শালাকে খবর পাঠিয়েছিলেন পিসিমাকে দেখে যাবার জন্য। পাশের গাঁয়ে পিসিমার যে ভাই আছে একথাও মিনু জানত না। নিজের ছোট্ট ঘরটিতে মিনু জ্বরের ঘোরে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। জ্বরের ঘোরেই হঠাৎ তার মনে হ'ল একটা দরকারী কাজ করা হয়নি কিন্তু। আস্তে আস্তে উঠল সে বিছানা থেকে, তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ছাতের সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল ছাতে। কেউ দেখতে পেল না। পিসিমা পিসেমশাই তখনও ঘুমুচ্ছেন। ছাতে উঠেই চোখে পড়ল লালে লাল হয়ে গেছে পূর্বাকাশ। বাঃ চমৎকার আঁচ উঠেছে তো সইয়ের। একটু হাসল সে। তারপর চাইল সেই সরু ডালটার দিকে। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার। একটা হলদে পাখি এসে বসেছে! তাহলে তো বাবা নিশ্চয় এসেছে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ছাতে যদিও পা টলছিল তবু সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে।

এসেই দেখতে পেল বাইরের বারান্দায় একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরল, তার মুখ থেকে কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরুতে লাগল। ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই বেরিয়ে এলেন কপাট খুলে।

"কে এই মেয়েটা আমার পায়ে মুখ ঘষছে এমন করে!"

"তোমার পায়েও মুখ ঘষছে! তোমার দিদির পায়ে কাল কামড়ে দিয়েছে ও! পাগল হ'য়ে গেছে বোধহয়।"

চুলের ঝুটি ধরে হিড় হিড় করে সরিয়ে দিলেন তিনি মিনুকে।

সাতদিন পরে হাসপাতালে মৃত্যু হ'ল মিনুর। তার সমস্ত মুখ ঘা-য়ে ভরে গিয়েছিল। সেপ্‌টিসিমিয়া হয়েছিল, ডাক্তাররা বললেন। সমস্তক্ষণই সে প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে ছিল। মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগে জ্ঞান হ'ল কয়েক মিনিটের জন্য। চোখ খুলে দেখল সামনে একটা খোলা জানালা দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দপদপ ক'রে জ্বলছে শুকতারাটা। মুখে মৃদু হাসি ফুটল মিনুর। মনে মনে বলল—সই এবার তোর কাছে যাচ্ছি।

কে জানে শুকতারার দেশের লোকেরা বোবা মিনুর মনের কথা বুঝতে পেরেছে কি না।

ভিখু দি গ্রেট

ভিখু লেখাপড়া শেখেনি। সভ্যতার যে সব বাহ্যিক প্রকাশকে আমরা সম্ভ্রমের চোখে দেখি তা-ও তার ছিল না। মাথার চুল রুক্ষ, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পরনে ময়লা কাপড়; পেটে অন্ন নেই। কিন্তু তবু মুখে একটি সদাপ্রসন্ন হাসি। আমার চাকর হ'য়ে বাহাল হয়েছিল সে। তার কাজ ছিল বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় কাচা—এই সব। পারত না ভালো ক'রে। আমি নটার সময় আপিস চলে যেতাম, ফিরতাম সন্ধ্যার পর। ফিরে এসেই শুনতে পেতাম গৃহিণীর নানা রঙের নালিশ। ভিখু এটা পারেনি, ওটা করেনি, পেয়ালা ভেঙেছে, বাজারে গিয়ে পয়সা হারিয়েছে, কাজকর্মে অত্যন্ত 'মাটো,'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভিখু এসবের কোন প্রতিবাদ করত না, মৃদু হেসে একটু অপ্রস্তুতমুখে দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনত, কিছু বলত না নিজে থেকে। জিজ্ঞাসা করলে বলত —মাইজি যা বলছেন তা ঠিকই। আমি এসব কাজ ভাল ক'রে করতে পারি না। আমি 'ক্ষেতি-গিরস্তি'র কাজ বরাবর করেছি, তাই করতে পারি। এসব আমার তেমন আসে না। 'ক্ষেতি-গিরস্তি' মানে, চাষবাস। জিগ্যেস করলাম কি ধরনের চাষবাস ছিল তার? নিজের জমি ছিল কি? ভিখু বললে নিজের বিঘে দুই জমি ছিল তার।

"জমি আছে তাহলে চাকরি করতে বেরিয়েছ কেন?"

ভিখু কুণ্ঠিতভাবে চুপ ক'রে রইল একটু।

তারপর বললে, "জমি এখন আর নেই, ছিল এককালে। বোনের বিয়েতে আর আমার নিজের বিয়েতে অনেক ধার করতে হয়েছিল। সেই দেনার দায়ে জমি বিকিয়ে গেছে। মহাজন যদি সুদের সুদ না নিত তাহলে বিকোত না, কিন্তু মহাজন ছাড়লে না।"

ভিকু কাজ করতে লাগল প্রচুর বকুনি খাওয়া সত্ত্বেও। বস্তুত কাজ না ক'রে তার উপায় ছিল না। আমার মাঝে মাঝে কষ্ট হ'ত, লজ্জাও হ'ত একটু। মনে হ'ত একটা অসহায় জীবকে কোণঠাসা ক'রে আমরা যেন নির্যাতন করছি। অথচ সমাজে আমরা নিজেদের সভ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাকি। আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারি না, যে অসহায় লোকটা নিরুপায় হ'য়ে আমাদের কাজ ক'রে দেবার জন্তে বাহাল হয় সামান্ত বেতনের পরিবর্তে, তাকে অহরহ গাল-মন্দ করি।

সমাজের এই রেওয়াজ। তা উলটে দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, সুতরাং এই ভাবেই চলতে লাগল। গৃহিণীর অসন্তোষ এবং গালাগালির লক্ষ্যস্থল হয়ে ভিখু কাজ ক'রে যেতে লাগল অপটু হস্তে।

একদিন গৃহিণী এসে বললেন, "তোমার ভিখু আজ আসেনি। তোমার সংসার কিভাবে চালাবে চালাও। আমি ওই এককাঁড়ি বাসন মাজতে পারব না।"

যদিও আমার এবং গৃহিণীর সহযোগেই একদা এই সংসার স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু গৃহিণী এটাকে অভিহিত করতেন 'তোমার সংসার' বলে। পতিব্রতা রমণীদের এইটেই কায়দা বোধহয়।

সংবাদটা শুনে বিব্রত হ'য়ে পড়লাম। কি করব ভাবছি এমন সময় আমাদের পাশের বাড়ির ছায়ালু মিত্তির এসে হাজির হলেন। ছায়ালু মিত্রের নামটি যত মিষ্টি, ছায়ালু মিত্র লোকটি তত মিষ্টি নন। তাঁকে দেখলেই আমার আপাদমস্তক জ্বলে যেত। কেমন যেন ভিজা-বিড়াল-গোছ ভাব। মুচকি মুচকি হাসেন, মিটি-মিটি চান, আস্তে আস্তে কথা বলেন। অতি পাজি।

"ইমিজেট্‌লি একটা ব্যবস্থা না করলে সিসির ভারি মুশকিল হবে।"

মিটি-মিটি চাইতে লাগলেন। তারপর ফিক্ ক'রে মুচকি হাসলেন একটু। ইচ্ছে হ'ল লোকটার কান ধরে টানতে টানতে বার ক'রে দি। ইচ্ছে হ'ল বলি—তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে, সিসির মুশকিল নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার নিয়ম যা ইচ্ছে হয় তা করা যায় না সব সময়ে। ভণ্ডামির মুখোশ পরে থাকতে হয়। তাই আমিও একটু মুচকি হেসে বললাম—"দেখি।"

ছায়ালু মিত্রকে খাতির করার বিশেষ কারণও ছিল একটু। ছায়ালু আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু। ওরা তিন ভাই, দয়ালু, মায়ালু, ছায়ালু। এককালে আমার শ্বশুরের প্রতিবেশী ছিলেন ওঁরা। আমার বউ সিসি ছেলেবেলায় ছায়ালুদা'র কাছে গীটার শিখতেন।

বিয়ের পর গীটার শেখা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। আমি এখানে বদলি হ'য়ে আসার পর আবার হঠাৎ একদিন সমুদিত হলেন ছায়ালু। এ শহরে তিনি নাকি লাইক্ ইন-সিওরেন্সের দালালি করতে এসেছেন। শহরের একপ্রান্তে একটা মেসে থাকতেন। সিসির সান্নিধ্য লাভ করবার জন্যে যোগাড়-যন্ত্র ক'রে ঠিক আমার পাশের বাড়িতে উঠে এসেছেন। সেটাও একটা মেস। সুতরাং আমার বাড়িতে গীটারবাদ্যের চর্চা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে ইদানীং। এর মধ্যে বাসন মাজা বা ঘর ঝাড়ু দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না। সংস্কৃতি বাদ দিয়ে বাঙালীর বাঁচা তো অসম্ভব। সুতরাং চাকরের চেষ্টায় আমাকে উঠতে হ'ল। উঠে বাইরে এসেই দেখি ভিখু উঠোনের একপ্রান্তে কাচুমাচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পনর ষোল বছরের একটি মেয়ে।

ভিখু হাত কচলে সবিনয়ে বললে, "হুজুর, আমি আপনাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারছি না, আমার কাজ মাইজির একটুও 'পসন্দ' হয় না। তাই আমি আমার বদলে আমার বউকে নিয়ে এসেছি। সে চৌকা-বরতনের কাজ (রান্না-বাসনের কাজ) ভাল জানে। ঘর ঝাড়ু দেবে, কাপড়ও কাচবে। ও আমার চেয়ে ঢের বেশী কাজের। ওকে যদি আপনারা রাখেন তাহলে ও আপনাদের খুশী করতে পারবে।"

ভিখুর বউ দেখলাম ঘাড় নীচু ক'রে আছে, মুচকি মুচকি হাসছে। ছায়ালুও আমার পিছু-পিছু বেরিয়ে এসেছিলেন। বললেন, "ওই আপাতত থাক. আজকের প্রব্লেমটা তো মিটুক।"

ভিখুকে জিগ্যেস করলাম, "তুই কি করবি ?"

"একটা ফেরি-ওলার কাজ পেয়েছি, হুজুর।"

ভিখুর বউ সিমিয়া থেকে গেল। সিসি বেরিয়ে এসে তাকে তার কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে গীটার নিয়ে চলে গেল নতুন একটা গৎ শিখতে। আমিও একটু পরে আপিসে বেরিয়ে গেলাম।

দুই

সমস্যার সমাধান কিন্তু হ'ল না। আরও জটিল সমস্যার সূত্রপাত হ'ল সিমিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। আমাদের বাড়িতে দু'চার দিন খাওয়ার পর সিমিয়ার শ্রী ফিরে গেল। আমরা সবাই আবিষ্কার করলুম সে পরমাসুন্দরী, নবোদ্ভিন্নযৌবনা কামিনী। একদিন শুনলাম আমার স্ত্রী তাকে ভৎর্সনা করছেন।

"সোমত্ত মেয়ে, ওই ছেঁড়া কাপড় পরে তোর সবার সামনে বসে বাসন মাজতে লজ্জা করে না ? বেহায়া কোথাকার—"

আপিসে বসে কাজ করছি চাপরাশি এসে খবর দিলে, "এক জেনানি আপসে মুলাকাত্ মাংতী হ্যায়।"

বললাম, "ডেকে নিয়ে এস।"

সিমিয়া এসে প্রবেশ করল এবং বেশ সপ্রতিভভাবে বলল, "পাঁচটা টাকা দিন, শাড়ি কিনতে হবে। নতুন শাড়ি পরে না গেলে মাইজি কাজ করতে দেবে না। আজ খুব বকছিলেন। আর শাড়িটা তো সত্যিই ছিঁড়ে গেছে।"

বলে সে নিজের দেহখানাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল শাড়ির কোন্ কোন্ অংশ ছেঁড়া। আমি একটু ধমকের সুরে বললাম, "এখানে এসেছিস কেন। মাইজির কাছে শাড়ির দাম চেয়ে নি গে যা—"

মাইজি বাড়িতে নেই। ছায়ালু বাবুর সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছেন।"

তখন মনে পড়ল ওদের আজ একটা পিক্‌নিকে যাবার কথা ছিল। ছায়ালু আর সিসি ডুয়েট বাজাবে সেখানে।

আর অধিক বাক্যব্যয় না ক'রে পাঁচটা টাকা সিমিয়াকে দিয়ে দিলাম। সে আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে একটা মিষ্টি হাসি হেসে চলে গেল।

পাঁচ টাকায় যে অমন সুন্দর ফুল-পাড় গোলাপী শাড়ি পাওয়া যায় এমন ধারণা আমার ছিল না। পরদিন সকালে দেখলাম শাড়ির বাহার দিয়ে সিমিয়া ছাইগাদার পাশে বসে বাসন মাজছে। ছাইগাদায় পদ্মফুল ফুটেছে যেন। আমি যে তাকে ওই শাড়ি কেনার টাকা দিয়েছি একথা অবিদিত রইল না। ছায়ালুও এ আলোচনায় মুচকি হেসে হেসে যোগ দিল। গৃহিণী যে সব ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ উক্তি করলেন তাতে যুক্তি ছিল না। ছিল জ্বালা। এর চেয়ে তুচ্ছতর কারণেও গৃহিণী ইদানীং জ্বালাময়ী হ'য়ে উঠছিলেন। সামান্য সামান্য কারণে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল আমাদের সংসারের উপর দিয়ে। সিমিয়ার ব্যাপারটায় আমি আর বাদ-প্রতিবাদ করলাম না, চুপ ক'রে থাকাটাই উচিত মনে হ'ল! কিন্তু কষ্ট হ'তে লাগল গৃহিণীর ব্যবহারে। তিনি যেন আমাকে এবং সিমিয়াকে পাহারা দিতে লাগলেন। এইভাবে দিন কতক কাটল। হঠাৎ একদিন দেখি ভিখু এসে কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার বৈঠকখানার দরজার সামনে।

"কি খবর ভিখু?"

ভিখু বললে যে সিমিয়া আমার বাড়িতে আর কাজ করতে চায় না। মাইজি ওকে বড্ড বেশী বকেন। অত বকুনি সহ্য করা ওর অভ্যাস নেই। তারপর ট্যাঁক থেকে পাঁচটি টাকা বার ক'রে বললে, "ওকে যে শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন তার দামটা আমি ফেরত দিচ্ছি। আপনি ওর মাইনের হিসাবটা ক'রে দিন।"

দিতে হ'ল। কারণ সিমিয়া আর কিছুতেই আমার বাড়িতে কাজ করতে রাজী হ'ল না।

কয়েকদিন পরে দেখলাম সে লাডুরাম মাড়োয়ারীর বাড়িতে বাহাল হয়েছে।

লাছুরাম মাড়োয়ারীর বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই। তার বাড়ির সামনেই রাস্তার একটি কল আছে। সেই কলের ধারে আমার গোলাপী শাড়ি পরে সিমিয়া প্রায় অসীমা হ'য়ে উঠল। নানা জাতের ছোকরা নানারকম পোশাক পরে নানা ধাঁচে আলাপ করতে লাগল তার সঙ্গে। সিমিয়া বাসন মাজতে মাজতে এক মুখ হেসে তাদের সঙ্গে জুড়ে দিত গল্প। কলতলার আসর বেশ জমে উঠতে লাগল। এইভাবে কাটল কিছুদিন। তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম সিমিয়া আর কলতলায় বসছে না। মনে হ'ল, স্রোতের ফুল অন্য কোন ঘাটে গিয়ে ভিড়েছে সম্ভবত।

দিন দুই পরে ভিখু এসে হাজির হ'ল আমার আপিসে। সেলাম ক'রে বললে— সিমিয়ার খুব অসুখ। আমি যদি আমার বন্ধু ডাক্তার সেনকে একটু অনুরোধ করি তাহলে সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। সে গরীব মানুষ, চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করবার সামর্থ্য তার নেই। ডাক্তারবাবু যেন একটু দয়া করেন। ডাক্তার সুশীল সেন আমার বাল্যবন্ধু, লিখে দিলাম তাকে একখানা চিঠি। দিন পনরো পরে তার সঙ্গে দেখা হ'ল একটা পার্টিতে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সিমিয়ার কি হয়েছিল। মুচকি হেসে সে বললে, "গনোরিয়া। তুই ওর সম্বন্ধে অত ইন্‌টারেস্ট নিচ্ছিস যে—?"

"ওর স্বামী আমার চাকর ছিল, এসে ধরলে, তাই লিখে দিলাম তোকে।"

"ওর সম্বন্ধে আর ইন্‌টারেস্ট নিও না। শি ইজ রট্‌ন।"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সুশীল।

ভিখুকে মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখতাম। চানাচুর তৈরি করছে। আমাকে দেখে একদিন সেলাম ক'রে বললে, "আমার জেনানি বেশ ভাল আছে—"

"তাকে তো আর দেখি না, অন্য কোথাও চাকরি করছে না কি?"

"না, হুজুর তাকে আর চাকরি করতে দিই না। বাইরে বেরুলে লোকে তাকে বড় জ্বালাতন করে। ছেলেমানুষ তো, নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এখন ও বাড়িতে বসেই চানা-ভাজা, ফুলুরি, খাবুনি তৈরি ক'রে দেয়, আমি বিক্রি করি। আগে আমাকেই করতে হ'ত সব নিজের হাতে, এখন ও সাহায্য করে। ভালই হয়েছে—"

কিন্তু মাসখানেক পরেই দেখা গেল বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রেখেও সিমিয়াকে কায়দা করতে পারেনি ভিখু। একদিন এক ডুলি ক'রে প্রায় অর্ধ-মৃতা সিমিয়াকে নিয়ে ভিখু হাজির হ'ল আমার বাড়িতে। সঙ্গে প্রায় দশ পনরো জন লোক। সবাই কলরব করছে। তাদের কথাবার্তা থেকে বুঝলাম সিমিয়া তাদের পাশের বাড়ির এক ছোকরার সঙ্গে কি যেন 'লট্‌পট্' করেছে। ছোকরাটি বাবু হর্চন্দ সিং জমিদারের ছেলে। কিন্তু ছোকরার বউও ছোট ঘরের মেয়ে নয়, তার বাবা সিংহেশ্বর সিং আরও বড় জমিদার। বউ তার বাপকে খবর দিয়ে বাপের বাড়ি থেকে লাঠিয়াল আনিয়েছিল। তারা সিমিয়াকে চুলের ঝুঁটি ধরে রাস্তায় এনে খুব ঠেঙিয়েছে। মেরেই ফেলত, পাড়ার

লোকেরা কোনরকমে বাঁচিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে দেখলাম ভিখু কুণ্ঠিত অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সমস্ত দোষ তারই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল।

"হুজুর, বাঁচান ওকে আপনি। ওর কোনও দোষ নেই। ওর একমাত্র দোষ ও মেয়েমানুষ। মেয়েদের দোষটাই সকলের চোখে পড়ে। হর্চন্দবাবুর ছেলে যে কাণ্ড করত রোজ, তা যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন। কিন্তু ও বড়লোকের ছেলে, বড়লোকের জামাই, ওর দোষ তো কেউ দেখবে না। আপনার বন্ধু সেই ডাক্তারবাবুকে একটা চিঠি লিখে দিন দয়া ক'রে হুজুর। চিকিৎসার খরচ যা লাগে আমি দেব—"

সিসি ঘরের ভিতর থেকে তর্জন ক'রে উঠল, "ওসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে তুমি থেকো না।"

বললাম, "আমি থাকব না। ওকে সুশীলের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সুশীলকে লিখে দিলাম একটা চিঠি। সুশীলের মুচকি হাসিটা মনে পড়ল, তবু লিখে দিলাম।

মাসখানেক পরে ভিখুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে ফেরি করছিল। বললে সিমিয়া সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে গেছে, যদিও চোট লেগেছিল অনেক জায়গায়। ডাক্তারবাবু বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাকে।

"হর্চন্দবাবুর ছেলে আর উৎপাত করছে না তো? যদি ক'রে বোলো আমাকে। এখানে আজকাল যিনি এস. পি. তিনি আমার বন্ধু। তাঁকে বললে তিনি শায়েস্তা ক'রে দেবেন ছোকরাকে—"

"ওকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি হুজুর। এই শহরের আবহাওয়া ওর সহ্য হ'ল না। গাঁয়ে নিজের মায়ের কাছে গিয়ে আছে এখন। আমি মাসে দশ টাকা ক'রে পাঠিয়ে দিই।"

আরও বছর পাঁচেক কেটে গেছে।

ভিখুর দেখা অনেক দিন পাইনি। তার খোঁজ খবরও করিনি। কারণ আমারও জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে এই ক'বছরে। মাথার-ঘায়ে-পাগল কুকুরের মতো আমিও ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি চারিদিকে।

হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। দেখলাম রিক্শা টানছে। ডাকলাম। রিক্শাই খুঁজছিলাম একটা।

"ভিখু, আজকাল রিক্শা চালাচ্ছ বুঝি—"

"হাঁ হুজুর।"

"চল তাহ'লে তোমার রিক্শাতেই যাই। আমাকে কোর্টে নিয়ে চল।"

ভিখুর রিক্‌শাতেই উঠে বসলাম।

"আপিস না গিয়ে কোর্টে যাচ্ছেন কেন হুজুর? কোন মকোর্দমা আছে না কি—"

"হাঁ—"

কি মকোর্দমা তা আর তাকে তখন বললাম না।

ভিখু একটু পরে আবার জিগ্যেস করল, "মাইজি ভাল আছেন?"

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলাম। তারপর বললাম, "না, মাইজির খবর ভাল নয়। তোর বউ সিমিয়া কেমন আছে?"

ভিখু বলল, "সিমিয়া পালিয়ে গেছে হুজুর।"

"পালিয়ে গেছে? পুলিশে খবর দিসনি?"

"না হুজুর। পুলিশে খবর দিয়ে কি হবে? পুলিশে খবর দিলে মন পাওয়া যায় না। রূপে গুণে সব দিক দিয়েই আমার চেয়ে সিমিয়া অনেক ভালো। সে স্বর্গের দেবী, সে আমার মতো লোকের সঙ্গে থেকে নরক-ভোগ করবে কেন—"

ভিখুর গলার স্বরটা শেষের দিকে কেঁপে গেল। তার কথা শুনে আমার হঠাৎ চৈতন্য হ'ল যেন। কিছুদিন আগে সিসি পালিয়েছিল ছায়ালুর সঙ্গে। আমি কেস করেছিলাম। সেদিনই মকোর্দমার শুনানি ছিল। ঠিক করলাম আর মকোর্দমা করব না। ভিখুর সহজ জীবন-দর্শনে সহজ সত্যটা যেন দেখতে পেলাম।

আরও বছর খানেক কেটেছে।

সিসি অনুতপ্তচিত্তে ফিরে এসেছে আবার আমার কাছে। শুধু তাই নয়, একজন বিখ্যাত গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে ধর্মে-কর্মে মনও দিয়েছে।

ভিখু আবার একদিন এসে হাজির।

"হুজুর, আপনার বন্ধু ডাক্তারবাবুকে আর একটা চিঠি লিখে দিন। সিমিয়া ফিরে এসেছে কাল। কিন্তু তার বড় অসুখ। পক্ষাঘাত হয়েছে, দুটো পা ই পড়ে গেছে—

ভিখু হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

সুশীলকে আর একটা চিঠি দিলাম।

গিরিবালা

অমাবস্যা রাত্রি। সূচীভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে। একটা নামহীন আশঙ্কায় সমস্ত প্রকৃতি যেন আচ্ছন্ন। নির্মেঘ আকাশে অগণ্য তারা। সেগুলোও যেন কাঁপছিল। শিয়ালগুলো তারস্বরে চীৎকার করছিল মাঝে মাঝে। ডাকতে ডাকতে হঠাৎ থেমেও যাচ্ছিল, নৈশ-নীরবতা তখন আরও যেন ঘন হয়ে উঠছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ছিন্নভিন্ন হয়েও যাচ্ছিল তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ নৈশ-পতঙ্গের তীব্র হাহাকারে। হাহাকারের মতোই শোনাচ্ছিল তা,

বুক-ফাটা কান্নার মতো। হু-হু ক'রে হাওয়া বইছিল একটা, মনে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ অন্তিম নিঃশ্বাস যেন লক্ষ লক্ষ বুক থেকে বেরিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে চলেছে। বৃহৎলাল হন-হন ক'রে মাঠামাঠি আসছিল। অনেকগুলো মাঠ পার হয়েছে সে, দুটো ঘাটও। ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিল সে, তবু কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল এই মাঠটা পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছলেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তবে পরনে খদ্দর, মাথায় গান্ধি টুপি তাগড়া বলিষ্ঠ চেহারা। শেয়ালগুলো আবার ডেকে উঠল। আবার থেমে গেল হঠাৎ। নৈশ-পতঙ্গের তীব্র চীৎকারটা একটা প্রকাণ্ড ছোরার মতো আবার বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে গেল অন্ধকারকে। খদ্দর ধারী বৃহৎলাল কিন্তু এসব শুনছিল না এসব কানেই যাচ্ছিল না তার। সে কেবল শুনতে পাচ্ছিল এই সব শব্দ—

"মা, মা, মা-গো—"

"বাঁচাও বাঁচাও—"

"ঘরে আগুন দিয়েছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে—"

"বাবাকে মেরে ফেল্‌ছে—"

"মায়ের ঝুঁটি ধরে নিয়ে যাচ্ছে—"

"খবরদার বলছি গায়ে হাত দিও না—দিও না—দিও না—দিও না—"

ছুটতে ছুটতে অবশেষে বাড়িতে এসে পৌঁছল বৃহৎলাল।

বাড়িতে তার কেউ নেই। বিয়ে করেনি। মা-বাবা-ভাই-বোন সব মরে গেছে। আছে শুধু বসতবাটি, আর কালী মন্দিরটি। পূর্বপুরুষদের স্থাপিত প্রতিমা। খুব জাগ্রত।

বৃহৎলালের মনে হ'ল মাকে একটা প্রণাম ক'রে যাই। দেখল মন্দিরের কপাট খোলা রয়েছে। পুরুত মশাই কি কপাট বন্ধ করতে ভুলে গেছেন? আলো নেই কেন? কালী মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে রইল বৃহৎলাল। মনে হ'ল মন্দিরের ভিতর অন্ধকার যেন আরও জমাট। পর মুহূর্তেই চমকে উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। মন্দিরের ভিতর কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুকুর? শেয়াল? কিন্তু না, এ-কি—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কে। চাপা কান্না—। বৃহৎলালের পকেটে টর্চ ছিল। টর্চটা জ্বেলেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মন্দিরে প্রতিমা নেই, মায়ের আসন শূন্য। তারপরই সে শিউরে উঠল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলল। পরক্ষণেই মনে হ'ল ভ্রম বুঝি। ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল আবার। না, ভ্রম নয়। গিরিবালাই। সেই গিরিবালা। তেমনি কালো, তেমনি এক পিঠ চুল। সম্পূর্ণ উলঙ্গিনি, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, উরু বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে। গিরিবালা এখানে কি ক'রে এল? দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে!

"গিরিবালা—গিরি—"

হঠাৎ গিরিবালা মিলিয়ে গেল।

বৃহৎলাল টর্চ হাতে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছুটে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে।

"সৌদামিনি—মোহন—"

ঝি-চাকর কারো সাড়া নেই। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। আলোটা জ্বালল। জ্বালতেই চোখে পড়ল রেডিওটা। আফশোষ হল। ওটার ভাল্‌ভ খারাপ হয়ে গেছে, সারানো হয়নি। ঠিক থাকলে শোনা যেত, সময় কাটত, দেশের হালচাল বোঝা যেত কিছু। রেডিওটার দিকে চেয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগল, গিরিবালা এখানে এলো কি করে; তাকে তো—!

হঠাৎ ঘরের আলোটা নিবে গেল। পাওয়ার হাউসের গোলমাল না কি? না, তার কেটে দিল কেউ! অন্ধকারে আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বৃহৎলাল। তার পকেটে টে টর্চ আছে তা ভুলেই গেল কয়েক মুহূর্ত। একটু পরে মনে পড়ল। টর্চ জ্বেলে দেখলে বিছানা করাই আছে। গিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে যেন আরাম পেল একটু। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। তড়াক ক'রে উঠে বসতে হ'ল আবার। মুখের উপর কার চুল এসে লাগছে। একরাশ চুল। মুখের উপর হাত বুলিয়ে দেখলে কিছু নেই। মাকড়শার জাল নয় তো? আবার শুয়ে পড়ল সে। আবার চুল টর্চটা জ্বেলে এবার সে কেরোসিনের একটা লণ্ঠন জ্বালল বাইরে গিয়ে। লণ্ঠনটা খুঁজতে দেরী হ'ল একটু। লণ্ঠনটা নিয়ে সে যখন আসছে তখন তার মনে হ'ল ঘরের ভিতর পিল পিল ক'রে কারা সব ঢুকছে যেন। বাইরে যেন অপেক্ষা করছিল, কপাট খুলতেই ঢুকে পড়ছে।

"কে—কে তোমরা—"

কোন সাড়া নেই। লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকল বৃহৎলাল।

ঘরে কেউ নেই! খিল দিয়ে লণ্ঠনটি একধারে কমিয়ে রেখে আবার শুয়ে পড়ল সে। আবার চোখ বুজল। মনে মনে রাম নাম করতে লাগল। তার ইচ্ছে হ'ল মহাত্মাজির প্রিয় গান রামধুনটা গাই। গাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। প্রতিবারেই কে যেন হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরছে তার। হাত দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু চাপটা অনুভব করছে। মনে মনে রামনাম করতে লাগল। তার পরই একটা শব্দ হ'ল কড়-কড়-কড়-কড়। চোখ চেয়ে প্রথমটা বুঝতে পারল না কিছু। হঠাৎ তারপর দেখতে পেলে মেঝেতে সারি-সারি বসে আছেন যেন কারা। পুরুষ-নারী-শিশুর দল, সবাই যেন মুখোস পরে আছে, কারও চোখে পলক পড়ছে না, কারও নিশ্বাস পড়ছে না। তাদের পিছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখে শিউরে উঠল বৃহৎলাল। একটা লোকের হাত নেই, দুটো লোকের চোখ বেরিয়ে ঝুলছে, একটা কবন্ধ, একটা লোকের দাঁতগুলো সব বেরিয়ে আছে, মনে হচ্ছে ঠোঁট নেই। আবার কড়-কড় ক'রে শব্দ হ'ল। বৃহৎলাল সবিস্ময়ে শুনল রেডিওটা বাজছে, দেখল মাঝখানের সেই সবুজ আলোটা সবুজ নয়, লাল হয়ে উঠেছে, টকটকে লাল!

রেডিও বলতে লাগল :--আমি হতভাগিনী বঙ্গনারী। আজ ভারতবর্ষের কোনও রেডিও স্টেশন থেকে আমার বার্তা শোনা যাবে না। তাই আমি এই ভাঙা রেডিও আশ্রয় ক'রে আমার কথা শোনাচ্ছি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল এটা সভ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ! এখন বুঝেছি সেটা মিথ্যে কথা। এটা গুণ্ডারাজ, এখানে ভদ্রলোকের ধন-প্রাণ-মান-ভাষা-সাহিত্য কিছুই নিরাপদ নয়। আমার বাবা দেশের সেবা করবেন বলে দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন, আমার ভাইরা জেল খেটেছিল, স্বদেশী আমলে একজনের ফাঁসিও হয়েছিল। এত কৃচ্ছ্র সাধন করবার পর যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম তাতে আমাদেরই স্থান নেই। কোথাও স্থান নেই। বড় বড় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছি—সব ভুয়ো, সব ফেনা, সব বুদ্বুদ, সব রেকর্ডের গান, থিয়েটারের অভিনয়। ওঁদের কথায় আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। জিন্না সাহেবের কথাই ঠিক—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা স্বাধীন ভারতে অসহায়, ব্রুট মেজরিটি তাদের পিষে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা বারবার উদ্বাস্তু হব। বারবার গুণ্ডায় এসে আমাদের ধর্ষণ করবে, নেতারা প্লেনে উড়ে উড়ে নির্লজ্জের মত বারবার ভুয়ো শান্তির বাণী আওড়াবেন। এই হবে বারবার, যদি আমরা আত্মরক্ষার জন্যে এখনও সজাগ না হই। আমি প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্ষিত হয়েছি, শিয়াল-কুকুরে আমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে, আমার বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ বেঁচে নেই, আমাদের বসত-বাড়ি পুড়ে গেছে। আমি এখন আর ভারতবাসী নই, পরলোকবাসী, কিন্তু তবু আমার দেশকে ভুলতে পারছি না। ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে-জিঘাংসায় জ্বলে মরছি। কামার্ত-দানবকে শাস্তি দেবার জন্য চণ্ডী নগ্নিকা হয়েছিলেন, লজ্জা বিসর্জন দিয়েছিলেন, খড়্গ ধারণ করেছিলেন। মহামেঘ রূপ ধারণ করে রণরঙ্গিনী হয়েছিলেন তিনি। তোমরা যারা এখনও বেঁচে আছ, আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে তোমাদেরও তাই হতে হবে। তোমাদের মধ্যে যে চণ্ডী আছেন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমার মধ্যে তিনি আজ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁর এক হাতে সদ্য-ছিন্ন শির, কণ্ঠে নরমুণ্ডের মালা, পরিধানে শব-হস্তের কাঞ্চী, পদতলে শিব। আমাকে তিনি বলছেন : ওই যে কামুক পশুটা বসে আছে, বলি দাও ওকে। অমোঘ অস্ত্র দিয়েছেন তিনি আমাকে। হা-হা-হা-হা। অমোঘ অস্ত্র—"

হঠাৎ ফেটে গেল রেডিওটা। আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কালো একখানা হাত, আর সেই হাতে বিরাট একটা শাণিত খড়্গ। পর মুহূর্তেই আর্তনাদ ক'রে উঠল বৃহৎলাল। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব। আলো নিবে গেল, রেডিও থেমে গেল।

তারপর দিন বৃহৎলালের কবন্ধটা তার ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। কিন্তু মুণ্ডটা পাওয়া গেল না। সবাই ভাবল কুকুর বা শেয়ালে নিয়ে গেছে বোধহয় সেটা। কিন্তু পরে জানা গেল তা নয়। যা জানা গেল তা ভয়ানক। পুরুতমশাই কালী পুজো করতে এসেছিলেন! তিনি ছুটে এসে খবর দিলেন—মুণ্ডু এখানে রয়েছে। সবাই গিয়ে দেখল মা কালীর হাতে মুণ্ডটা ঝুলছে। তাঁর হাতে আগে যে পাথরের মুণ্ডটা ছিল সেটা মাটিতে পড়ে আছে।

প্রতীক্ষা

রাজেন তখন কলেজে পড়তো। থাকতো বহুবাজারের একটা বোর্ডিং হাউসে। ছাত্রজীবনের নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে অর্থাভাব। রাজেনের বাবা দিল-দরিয়া লোক ছিলেন ব'লে অর্থশালী ছিলেন না। যা রোজগার করতেন তা দু'হাতে খরচ ক'রে ফেলতেন। তাঁর মেয়ে দুর্গার বিয়েতে যেভাবে খরচ করেছিলেন, বরযাত্রীদের যেভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন তা ও-অঞ্চলের বহু লোকের এখনও মনে আছে। সুতরাং তিনি তাঁর ছেলে রাজেনকে নিতান্ত প্রয়োজনের বেশী টাকা দিতে পারতেন না। মাসের শেষে রাজেনের প্রায়ই হাত খালি হয়ে যেতো এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ধার চাইতে হতো। ধার দেবার মতো ধনী বন্ধুও ছিল তার একাধিক। রাজেনকে ভালবাসতো অনেকেই। এর কারণ সে-ও তার বাবার দিল-দরিয়া স্বভাবটা পেয়েছিল। যখন হাতে পয়সা থাকতো তখন বেপরোয়া খরচ করতো, বন্ধুদের খাওয়াতো, সিনেমা দেখাতো। মৌমাছি বা পিঁপড়ের কাছে সে শিক্ষালাভ করেনি, প্রজাপতিই ছিল তার আদর্শ। এজন্য মাঝে মাঝে কষ্টে পড়তো, কিন্তু তার স্বভাব বদলাতো না। বন্ধুরাই—বিশেষ ক'রে কুমার অলকেন্দ্র মৌলি—তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতো। বেশ বদান্য ব্যক্তি ছিল সে। টাকা দিয়ে কখনও ফেরত চাইতো না। তবে একটা অসুবিধাও ছিল। সে লম্বা লম্বা আধুনিক কবিতা লিখতো। সেগুলো যে শুধু মন দিয়ে শুনতে হতো তাই নয়, সেগুলোর তারিফও করতে হতো। অর্থাভাবে পড়লে এ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হতো রাজেনকে।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন একটু বেশী টাকার দরকার প'ড়ে গেল। তার বোনের এক পিসশ্বশুর হাজির হলো এসে। ভদ্রলোক দেহাতী এবং কোলকাতা শহরের পক্ষে বেখাপ্পারকম বেমানান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি যখন রাজেনের বাসা আবিষ্কার করলেন তখন বোর্ডিংয়ের দ্বারবানকে তিনি প্রশ্ন করলেন—"হাঁ হে বাপু, নেত্য মোক্তারের ছেলে কি এখানে থাকে?" ছাপরাবাসী দ্বারবান উত্তর দিয়ে দিলে…"নেহি মালুম"। তখন তিনি বোর্ডিংয়েরই একটি লোককে ওই একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিলে—"সকলের বাপের নাম তো আমি জানি না। তাঁর নাম যদি বলতে পারেন তাহলে বলতে পারবো তিনি এখানে থাকেন কিনা।"

"তার নাম রাজেন। কলেজে পড়ে।"

"রাজেন দাস কি?"

"হ্যাঁ দাসই বটে।"

"তাহ'লে চারতলায় চলে যান। তাঁর ঘরের নম্বর হচ্ছে—তিন।" পিসশ্বশুর মশায় সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে চারতলায় উঠলেন।

সেদিন রবিবার, রাজেন ঘরেই ছিল। পিস্‌শ্বশুর মশায় তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে একবার গলা-খাঁকারি দিলেন। রাজেন দেখলে একটি নাতিদীর্ঘ আজানুলম্বিত-বাহু লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গোঁফ-জোড়া বেশ পুষ্ট, চোখ দুটি বড় বড় এবং রক্তাভ। নীচের ঠোঁটটি বেশ পুরু।

"রাজেন আছো নাকি?"

"হ্যাঁ এই যে, আমিই রাজেন।"

"আমাকে চিনতে পারছো?"

"আজ্ঞে না! কে আপনি?"

"আমি বটুক-ভৈরব ঘোষ। তোমার বোনের পিস্‌শ্বশুর গো। আমাকে তো তোমার মনে থাকা উচিত ছিল। আমি তোমার বোনের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম, ভরপেট খাওয়ার পর সত্তরটা ল্যাংড়া আম খেয়েছিলাম, আমাকে ভুলে যাওয়াটা উচিত হয়নি তোমার। মনে পড়লো?"

"পড়েছে। আসুন, বসুন।"

বটুক-ভৈরবকে রাজেন চিনতে পারলে না। কিন্তু সত্তরটা ল্যাংড়া আম খাওয়ার কাহিনীটা মনে পড়লো।

ঘরের ভিতর ঢুকে রাজেনের চৌকির উপর ব'সে ঘোষমশায় আবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন—"ডাগর-দীঘি অঞ্চলের ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাই এক-ডাকে আমাকে চেনে। আর তুমি আমার আত্মীয় হয়ে আমাকে চিনতে পারলে না হে!"

"সেই একবার মাত্র দেখেছিলাম তো বছর-পাঁচেক আগে। তাই চিনতে পারিনি। আপনি এসেছেন কোথায়?"

"তোমারই কাছে এলাম।"

রাজেন একটু বিস্মিত হলো।

"কেন, কোন দরকার আছে?"

"দরকার আছে বই কি। বিনা দরকারে কি কেউ কারো কাছে আসে? সে কাল কি আর আছে এখন! এখন সবাই দরকারেরই দাস" এই ভূমিকা শুনে রাজেন আর একটু বিস্মিত হলো। কিছু না ব'লে চুপ করেই রইলো সে। বটুক-ভৈরবও চুপ ক'রে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—"আমার দরকারের কথাটা শুনে তুমি হাসবে হয়তো, আজকালকার নব্য ছোকরা তো তোমরা! পূর্বজন্ম পরজন্ম কিছুই বিশ্বাস করো না। কিন্তু আমি করি। আমার বিশ্বাস, এজন্মে কোনও সাধ যদি অপূর্ণ থাকে তাহ'লে তা পূর্ণ করবার জন্যে ফের জন্মগ্রহণ করতে হয়। সব কামনা পূর্ণ না হ'লে নিষ্কাম হওয়া যায় না, আর নিষ্কাম না হ'লে মুক্তি হয় না। এ-কথা তোমরা হয়তো মানো না, কিন্তু আমি মানি। আমার ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো তাহ'লে তোমার কাছে আসতাম না, কিংবা হাতে যদি প্রচুর টাকা থাকতো তাহ'লেও আসতাম না। বেশী টাকা

থাকলে ওই ভাগর-দীঘিতে ব'সেই আমার সাধ মেটাতে পারতাম। কিন্তু আমি গরীব। পুরুলিয়া স্টেশনের কাছে একটা খাবারের দোকান আছে, সেইটে থেকে সংসার চলে। মনের সাধ মেটাবার মতো টাকা বাঁচে না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম কার কাছে মনের কথাটা বলি। ছেলেটা তো চলে গেল, সে বেঁচে থাকলে আমার সাধ সে মেটাতো, যেমন ক'রে হোক মেটাতো। বড় ভাল ছেলে ছিল গো—"

বটুক-ভৈরব হঠাৎ থেমে গেলেন। রাজেন দেখলে তাঁর মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে। নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে থর থর ক'রে। কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাব রইলো না, আবার শুরু করলেন তিনি :

"আমি অনেকদিন থেকেই এ-কথা ভাবছিলাম। সকলের কাছে বলাও যায় না। বললে ভাববে, বুড়োটার ভীমরতী ধরেছে। তারপর হঠাৎ একদিন তোমার বোন দুর্গার সঙ্গে দেখা এক বিয়েবাড়িতে। ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি। তার কাছেই শুনলাম তুমি কোলকাতায় আছো। তার কাছেই তোমার ঠিকানাটাও পেয়ে গেলাম। আমার কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল, তোমাকে বললেই আমার কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। তুমি যখন নেতা মোক্তারের ছেলে তখন আশা করা যায়, তুমিও তোমার বাপের মতন দিল-দরিয়া, আর তুমি কোলকাতাতেই আছো, অসুবিধা নেই কোনও—"

"কাজটা কি ?"

একটু ইতস্তত ক'রে বটুক-ভৈরব বললেন, "কাজটা যে খুব শক্ত তা নয়, কেবল নবলগ কিছু টাকার দরকার।"

"শুনিই না কি কাজ।"

"আমি নামজাদা একটা বিলিতি হোটেলে খেতে চাই! দিশী খাবার অনেক খেয়েছি, কিন্তু বিলিতী খাবার খাইনি কখনও। শুনেছি সেসব নাকি অপূর্ব। একদিন পেট ভ'রে খেতে চাই সেসব।"

"আপনি গোঁড়া নন্ তো ?"

"মোটেই না। আমি মুরগী-টুরগী সব খাই। আজকাল তো সবাই খাচ্ছে—"

"আর একটা মুশকিলও আছে।"

"কি ?"

"ভালো বিলিতী হোটেলে সাহেবী-পোষাক না প'রে গেলে ঢুকতে দেয় না।"

"তাই পরেই যাবো। দাও কিনে একটা সাহেবী পোষাক—"

"শুধু আপনার পোষাক হলেই তো হবে না—আমারও চাই। আমাকে তো থাকতে হবে আপনার সঙ্গে।"

"তা হবে বইকি। বেশ, দুটো পোষাকই কিনে ফ্যালো। গাড়িভাড়া বাদে আমার কাছে যা আছে সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।"

ট্যাঁক থেকে একটি অর্ধমলিন দশটাকার নোট বার করলেন বটুক-ভৈরব।

রাজেনের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—"থাক, থাক, আপনাকে কিছু দিতে হবে না। দেখি আমি কি করতে পারি।"

মনে মনে কিন্তু ভাবনায় প'ড়ে গেল সে। অনেক টাকার মামলা।

"আপনি এখন এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিশ্রাম করুন। আমি একটু বেরুচ্ছি।"

ছুটল সে অলকেন্দ্র মৌলির কাছে। এ অকূল-পাথারে ওই একমাত্র ভরসা। দরকার হ'লে সে ওর সব কবিতা শুনবে, যা থাকে কপালে।

দেড়শো টাকার উপর খরচ হলো। বটুক-ভৈরব তিনজনের খাবার একা খেলেন। যাবার সময় তিনি স্যুটটা দিয়ে গেলেন রাজেনকে। বললেন—"ওটা কেটে-ছেঁটে তোমার মাপের ক'রে নিও। খুব খুশী হলাম। বেঁচে থাকো। বাপের মুখ রেখেছো তুমি বাপ-কা বেটা হয়েছো—এই তো চাই। আমি গরীব মানুষ, সামান্য মানুষ, কি আর আশীর্বাদ করবো তোমায়। দীর্ঘজীবি হও, রাজরাজেশ্বর হও। পুরুলিয়ায় কিন্তু যেও বাবা একবার। নিশ্চয় যেও। সেখানে প্রাণ ভ'রে খাওয়াবো তোমাকে। যেও, যেও—যাবে তো ?"

"যাবো।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় যেও। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকবো।"

"আচ্ছা। কোনও একটা ছুটিতে যাবো।"

রাজেন বটুক-ভৈরবকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো। যাবার সময় তিনি কেঁদে ফেললেন এবং অশ্রুসজল-কণ্ঠে আবার অনুরোধ করলেন—"আমার ওখানে এসো একবার। এসো, নিশ্চয় এসো।"

রাজেন পুরুলিয়া গেল দশ বছর পরে। চাকরির চেষ্টায়। পুরুলিয়ার একজন নামজাদা উকিল তাকে ডেকেছিলেন, ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিয়ে যাবেন ব'লে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হাতেই চাকরি।

রাজেন যে ট্রেনটায় যাচ্ছিলো সেটা পৌঁছোবার কথা সন্ধ্যা সাতটায় কিন্তু সামনের স্টেশনে একটা ইন্‌জিন ডিরেলড্ হয়ে গিয়েছিল বলে একটা স্টেশনে পাঁচঘণ্টা আটকে থেকে গেল তার ট্রেনটা। পৌঁছলো রাত বারোটায়। রাজেন অবশ্য পেট ভ'রে খেয়ে নিয়েছিল। জিনিসপত্রও বিশেষ ছিল না সঙ্গে। রাতটা হয়তো সে স্টেশনে ওয়েটিংরুমেই কাটিয়ে দিতো। কিন্তু তার মনে হলো উকিলবাবুটির বাসাতেই যাওয়া উচিত। সে যে ঠিক দিনে এসেছে এবং দেরিটা যে তার ইচ্ছাকৃত নয় এটা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। চাকরির ব্যাপার তো !

স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখা হয়ে গেল বটুক-ভৈরবের সঙ্গে। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি।

"আরে আরে—রাজেন যে! এতদিনে তোমার সময় হলো? এসো, এসো—আমার দোকানে এসো। এই সামনেই আমার দোকান—ছি, ছি, বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছো।"

রাজেন স্টেশনের বাইরের মাঠে একটি সুসজ্জিত খাবারের দোকান দেখতে পেলে।

"চলো, বেশ পেট ভ'রে খাওয়াবো তোমাকে—"

"এখন আর খেতে পারবো না। একটু আগেই পেট ভ'রে খেয়েছি। কাল আসবো। এখন আমাকে একবার নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। বড় জরুরী দরকার—"

"একবার যাবে না দোকানে?"

"এখন নয়। কাল আসবো।"

পরদিন সে গেল সেখানে। গিয়ে কিন্তু বটুক-ভৈরবকে দেখতে পেলে না। যেখানে দোকানটা দেখেছিল, সেখানে দেখলে ফাঁকা মাঠ। কিচ্ছু নেই।

একটু দূরে আর-একটা দোকান ছিল।

সেখানে গিয়ে রাজেন জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা, বটুকবাবুর খাবারের দোকানটা কোথায় বলুন তো?"

"সে দোকান তো পাঁচ বছর আগে উঠে গেছে। বটুকবাবুও মারা গেছেন।"

"কি যে বলেন! আমি কাল রাত্রে তাঁকে দেখেছি।"

দোকানদার মুচকি হেসে বললে—"ভুল দেখেছেন।"

আর-একটি লোক সেখানে বসেছিলেন। বুড়ো লোক। তিনি বললেন—"ভুল না-ও হতে পারে। আরও অনেক লোক দেখেছে বটুকবাবুকে! কোনও ট্রেন এলেই স্টেশনে তিনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। যতীনবাবু দু'দিন দেখেছেন, রমেন একদিন দেখেছে, কালু দেখেছে। তুমি জানতে না খবরটা এতদিন?...পাঁচ বছর ধ'রে এই কাণ্ড!"

দোকানদারটি তখন বললে—"আমিও দেখেছি। ভদ্রলোক ভয় পাবেন বলে চেপে যাচ্ছিলুম।"

বুড়ো বললেন—"বটুক-ভৈরবের মুক্তি হয়নি। কোনও সাধ অপূর্ণ আছে হয়তো।"

পাখীদের মধ্যে

আমগাছের সবুজ পত্রপুঞ্জের মাঝখানে কালো মতো কি একটা যেন রয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ল। কি ওটা? একটু বিস্মিত হয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম কোকিল। একটা নয়, দুটো। একটা বড়, আর একটা ছোট। বড়টা ধাড়ি, ছোটটা বাচ্চা। দুটোই পুরুষ, যদিও ঠোঁটে ঠোঁটে ঠেকিয়ে মুখোমুখি বসে আছে দু'জনে। ব্যাপার কি? বিস্মিত হয়ে রইলাম।

কুক্, কুক্ কুক্—বড় কোকিলটা বললে।

ছোটটা নীরব।

কুক্ কুক্—আবার বললে বড়টা।

ছোট তবু নীরব।

এই রকম চলল মিনিট দশেক। মনে হ'ল বড়টা যেন ছোটটার কানে মন্ত্র দিচ্ছে। ছোটটা নীরব হ'য়ে আছে বটে কিন্তু শুনছে একাগ্র হ'য়ে।

কুক্ কুক্ কুক্—আবার শুরু হ'ল। আবার চলল খানিকক্ষণ। বাচ্চাটা নড়ে চড়ে বসল। তারপর উঠে গিয়ে বসল আর একটা ডালে। বড়টাও গিয়ে বসল তার পাশে। একেবারে ঘেঁষে। তারপর তার মুখের কাছে মুখ এনে আবার বলল—কুক্, কুক্। মনে হ'ল স্নেহ, অনুনয়, মিনতি যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল ওই ডাকে।

অনেকক্ষণ পরে অবশেষে বাচ্চাটা বলল—কুক্।

সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল ধাড়িটা—কুক্ কুক্ কুক্ কুহু, কুহু, কুহু, কুহু—।

মুখরিত হ'য়ে উঠল চারিদিক। একটা সাড়া পড়ে গেল।

আশপাশের গাছ থেকেও ডেকে উঠল অনেক কোকিল। ভাবটা যেন—এসেছে, এসেছে. এসেছে, এসেছে। আমাদের ডাক ডেকেছে।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল একটু দূরে একটা কাক বসে আছে। করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কোকিল বাচ্চাটার দিকে। সে দৃষ্টির আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না বাচ্চাটা। উড়ে গেল কাকের কাছে। উড়ে গিয়ে তার পাশে বসে মুখটা হাঁ করল। কাকটা খাইয়ে দিতে লাগল তাকে। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে কোকিল-বাচ্চাটা আবার গিয়ে মিশল কোকিলের দলে।

রোজই দেখতাম এই কাণ্ড। কাক-মাতা কোকিল-বাচ্চাকে রোজ খাইয়ে যাচ্ছে। এতে কোকিলরাও আপত্তি করেনি, কাকেরাও না। পাখীদের মধ্যে পলিটিক্স্ নেই।

"প্রেম, প্রেম, প্রেম! এদিকে ভিটেয় যে ঘুঘু চরবে সেদিকে খেয়াল নেই ব্যাটার—"

একা একা নিজের ঘরে বসিয়া উচ্চ কণ্ঠেই উক্ত উক্তিটি করিলেন বিনয়বাবু। তাহার পর বিস্ফারিত আরক্ত নয়নে সামনের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেওয়ালে একটি হাস্যমুখ যুবকের ছবি টাঙানো ছিল। বিনয়বাবুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার হাসি এতটুকু ম্লান হইল না। বিনয়বাবু নির্নিমেষে ছবিটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ড্রয়ার টানিয়া কাগজ বাহির করিলেন একটা; সেটা লম্বা খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিলেন। তাহার পর হাঁক দিলেন—"জগদীশ, জগদীশ—"।

জগদীশ নামক ভৃত্যটি প্রবেশ করিল।

"এই চিঠিখানা রেজেস্ট্রী ক'রে পাঠাতে হবে। রেজেস্ট্রী উইথ একনলেজমেণ্ট ডিউ। বুঝলি? খুব দরকারি চিঠি। কই সুখন তো আমাকে কফি দিয়ে গেল না এখনও"

"দেখি—"

চিঠি লইয়া জগদীশ চলিয়া গেল।

একটু পরে সুখন প্রবেশ করিল কফির ট্রে লইয়া। ট্রে-তে শুধু কফিরই সরঞ্জাম নাই—একটা প্লেটে কিছু আঙুরও রহিয়াছে, ব্রাণ্ডিতে-ভিজানো গরম আঙুর। জনৈক বিলাত ফেরত হেকিম তাঁহাকে আঙুর-ভোজনের এই বিশেষ কৌশলটি শিখাইয়াছিলেন। ব্যাপারটি ব্যয়সাধ্য, কিন্তু ইহা খাইবার পর হইতে বিনয়বাবুর স্নায়বিক দৌর্বল্য অনেকটা কমিয়াছে, খাইতেও বেশ। সুতরাং গত ছয় মাস হইতে ইহা তিনি চালাইয়া যাইতেছেন।

আঙুর সহযোগে কফি-পান শেষ করিয়া তিনি সুখনকে বলিলেন, "এইবার জিতুকে পাঠিয়ে দে—"

মিনিট দশেক পরে জিতু নামক কালো বালক ভৃত্যটি প্রবেশ করিল। কিছুকাল পূর্বে কোন এক যাত্রার দলে সে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করিত। এখন বেশী মাহিনার লোভে বিনয়বাবুর পদ-সেবা করে। শুধু পদ নয়, সমস্ত অঙ্গেরই সেবা করে সে, ইংরেজিতে যাহাকে 'মাসাজ' বলে। তিন রকম তেল দিয়ে অঙ্গ মর্দনের পর বিনয়বাবু স্নান করেন। সুরু করেন খুব গরম জল দিয়া, তাহার পর ধীরে ধীরে জলের উত্তাপ কমাইতে থাকেন, শেষে খুব শীতলজলে অবগাহন করিয়া স্নান সমাপন করেন তেল মাখিয়া স্নান করিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। যে চালের ভাত খান তাহা ভালো পেশোয়ারী চাল। ব্যঞ্জন সম্বন্ধেও বিলাসিতা কম নহে। মাছের ঝোল, ফ্রাই এবং অম্বল তাহার প্রত্যহ চাইই। এ সব ছাড়া দুই রকম ডাল ও নানারকম শাকসব্‌জি। রাত্রে সামান্য পোলাও, একটি গোটা মুর্গির রোস্ট এবং একটি আপেল

সিদ্ধ আহার করেন। চা-কফি সম্বন্ধেও তিনি খুব খুঁতখুঁতে। খুব উৎকৃষ্ট জিনিস ছাড়া ব্যবহার করেন না। গ্রীষ্মকাল পড়িতে না পড়িতেই তাঁহাকে প্রতি বৎসর হয় দার্জিলিং না হয় সিমলা, না হয় মুসৌরি, না হয় রাণীক্ষেত যাইতে হয়। চৈত্র মাসের পর আর কলিকাতায় টিকিতে পারেন না।

সংক্ষেপে, তাঁহার জীবন যাপনের প্রণালীটি বেশ ব্যয়সাধ্য। চাকুরি করিতে হয় না, বড় ব্যবসা আছে। চট্টো-গঙ্গো নামক বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ইনি মালিক। কিন্তু তবু তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি বেশ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার মূলে আছে প্রেম।

গোড়া হইতে ব্যাপারটি খুলিয়া না বলিলে আপনাদের বুঝিতে অসুবিধা হইবে। তাই গোড়ার কথাটাই আগে বলি।

দুই

বহু পূর্বে বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক সঙ্গে এক কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তাঁহাদের। এক মেসে এক ঘরে থাকিতেন, এক সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধূলা, ওঠা-বসা সব হইত। একজন আর একজনকে ছাড়িয়া বেশীক্ষণ কোথাও থাকিতে পারিতেন না। লম্বা ছুটির সময় দুইজনেই বাড়িতে আধাআধি করিয়া অবকাশটা ভোগ করিতেন।

কলেজ জীবন এইভাবে অতিবাহিত করিয়া যখন তাঁহারা কর্মজীবনে উত্তীর্ণ হইলেন তখন বিচ্ছেদ আসন্ন হইয়া উঠিল। বিনয়কুমার একটা কলেজে চাকুরি লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। মণীন্দ্রকুমার তখনও চাকরি জুটাইতে পারেন নাই, তিনিও বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মাস দুই পরে সেই কলেজের বার্ষিক উৎসবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আসিলেন সভাপতিরূপে। তিনি যে বক্তৃতাটি দিলেন তাহার সার মর্ম, ব্যবসা না করিলে বাঙালীর বাঁচিবার আশা নাই। বলিলেন, এম-এ পাশ করিয়া স্বল্প বেতনে প্রফেসারি করা অপেক্ষা, অথবা বি-এল পাশ করিয়া কাছারির গাছতলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়ানো অপেক্ষা, বিড়ির দোকান করাও তিনি অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করেন। বলিলেন, বাঙালীর ছেলের বুদ্ধি আছে, সে যদি তাহার সহিত চরিত্রবল যুক্ত করিতে পারে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সে অজেয় হইবে। অল্প মূলধনে কত রকম ব্যবসা করা সম্ভব তাহারও আভাস দিলেন তিনি। পরিশেষে বলিলেন, ব্যবসায়ে আসল মূলধন টাকা নয়, আসল মূলধন চরিত্র।

ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে মণীন্দ্রকুমারের এক নিঃসন্তান মাতুল মারা গিয়াছিলেন। উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রকুমার হাজার পাঁচেক টাকা পাইয়া গেলেন। তখন দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন গোলামী না করিয়া ব্যবসাই করা যাক। দুইজনে এক

সঙ্গে থাকাও যাইবে, রোজগারও করা যাইবে। বিনয় যদি মূলধনস্বরূপ কিছু না-ও দিতে পারেন ক্ষতি নাই। তাঁহার চরিত্র-মূলধন যদি তিনি ব্যবসায়ে পুরাপুরি নিয়োগ করেন তাহা হইলেই লাভের অর্ধাংশ তাঁহাকে দিতে মণীন্দ্রকুমার আপত্তি করিবেন না। এইভাবেই চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের প্রথম পত্তন হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর বিনয়কুমারও ব্যবসায়ে পাঁচ হাজার টাকা মূলধনস্বরূপ দিয়াছিলেন।

কাপড়ের ব্যবসাই শুরু করিয়াছিলেন তাঁহারা। আচার্য রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, ব্যবসায়টি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুই বন্ধু বিবাহ করিয়াছিলেন। বিনয়কুমারের বিবাহ প্রথম হয়। মণীন্দ্রকুমার বিবাহ করেন বিনয়ের বিবাহের বছর চারেক পরে। স্বাস্থ্য অনুকূল ছিল না বলিয়া তিনি বিলম্বে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিনয়কুমারের একটি পুত্র হয়, মণীন্দ্রকুমারের একটি কন্যা। দৈবাৎ এই যোগাযোগ হওয়াতে আর একটি সম্ভাবনার কথা তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। মণীন্দ্রকুমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে তাঁহার কন্যা দেবীর সহিত বিনয়ের পুত্র উন্মেষের বিবাহ দিবেন। বিনয়কুমারও সাগ্রহে সম্মতি দিয়াছিলেন ইহাতে। ইহা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়াবেগ এত প্রবল হইয়া উঠে যে, শেষকালে তাঁহারা স্থির করিয়া ফেলেন যে তাঁহাদের এই শুভ বাসনাকে আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। বাল্যবিবাহের বিরোধী বলিয়া তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিলেন না কিন্তু উভয়ে মিলিয়া এমন একটি উইল করিবেন ঠিক করিলেন যাহাতে তাঁহাদের অবর্তমানেও তাঁহাদের পুত্রকন্যা তাঁহাদের এই সদিচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। ঠিক হইল এমন উইল হইবে যে দেবী এবং উন্মেষ যদি আইনত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা হইলেই তাহারা সমান ভাবে চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার লাভ করিবে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ অপরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন অংশ পাইবে না। উভয়েই যদি বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহা হইলে উভয়েই বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে। তখন বিষয়ের মালিক হইবে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। ব্যবসায়লব্ধ অর্থ মিশনের কাজেই ব্যয়িত হইবে। ইহাদের উকিল রজনীভূষণ কানুনগো দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের ছেলেমেয়েদের পছন্দ অপছন্দের উপর এতখানি জবরদস্তি করা ঠিক হবে না। তাদের খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তোমাদের বাবার নাম কি—"

বিনয়কুমার বলিলেন—"স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।"

মণীন্দ্রকুমার বলিলেন—"স্বর্গীয় শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"আমার মতে যা হওয়া উচিত এবং সঙ্গত সেটা তাহলে লিখে দিচ্ছি দেখ—"

কানুনগো মহাশয় একটা কাগজে খস-খস করিয়া লিখিয়া ফেলিলেন "শ্রীমতী দেবী গাঙ্গুলী যদি স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশের কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজী না

হয় তাহা হইলে সে বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রীমান উন্মেষ চট্টোপাধ্যায়ও যদি স্বর্গীয় শ্রীনাথ গাঙ্গুলীর বংশের কোন কন্যাকে বিবাহ না করে তাহা হইলে বিষয়ের কোন অংশ পাইবে না। চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠান তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হাতে চলিয়া যাইবে।"

বিনয় এবং মণীন্দ্র ইহাতে আপত্তির কিছু দেখিলেন না, কারণ তাঁহারা উভয়েই পিতার এক পুত্র এবং তাঁহাদের পিতারাও তাঁহাদের পিতাদের এক পুত্র ছিলেন। সুতরাং এই উইল দ্বারা কার্যত দেবী এবং উন্মেষ আইনত আবদ্ধই থাকিবে।

কানুনগো মহাশয় তখন আইনের ভাষায় উক্ত উইলটি লিখিয়া ফেলিলেন এবং যথাসময়ে তাহা আইনত রেজেস্ট্রী হইয়া গেল। উইল করিবার এক বৎসর পরে মণীন্দ্র-কুমার হঠাৎ মারা গেলেন। দেবীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর। মণীন্দ্রের আর কোন সন্তান হয় নাই। বিনয়কুমারেরও আর কোন সন্তান হয় নাই, কারণ উন্মেষকে প্রসব করিবার কিছুদিন পরেই উন্মেষের মা মারা যান। বিনয়কুমার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। নিজের পুত্র উন্মেষ এবং বন্ধুকন্যা দেবীকে ভালোভাবে মানুষ করিবার কাজে তিনি লাগিয়া পড়িলেন।

তিন

ষোল বৎসর পরে পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইল।

দেবী এম-এ পড়িতেছে, উন্মেষ এখানকার পড়া শেষ করিয়া লণ্ডনে গিয়াছে। বিনয়কুমার ব্যবসায়ের সুনিশ্চিত লাভ অনায়াসে ভোগ করিতে করিতে ঘোর বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু বিলাসে নয়, কোনও কোনও ব্যসনেও তাঁহার মতি গিয়াছে। ফাটকা খেলাতে, নানারূপ কাজে কোম্পানির শেয়ার কেনাতে, প্রচুর অর্থ নষ্ট করিয়াছেন তিনি। তাঁহার পুত্র উন্মেষও খরচ সম্বন্ধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা আশঙ্কাজনক। চট্টো-গঙ্গো প্রতিষ্ঠানের অডিটার কিছুদিন পূর্বে বিনয়কুমারকে জানাইয়াছেন ব্যবসায়ে তাঁহার লভ্যাংশের অতিরিক্ত টাকা তিনি প্রতি বৎসরই লইয়াছেন। তাঁহার ঋণের পরিমাণ এখন এত বেশী যে, তাঁহার অপর অংশীদার মণীন্দ্র-কুমারের বিধবা পত্নী নীহারবালাই কার্যত ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ মালিক হইয়া পড়িয়াছেন। বিনয়কুমার এখন যাহা খরচ করিতেছেন তাহা নীহারবালার অংশ হইতেই ঋণস্বরূপ তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। বিনয়কুমার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হইবারই কথা, কারণ খরচ করিবার সময় বোঝা যায় না, হিসাব করিবার পরই স্তম্ভিত হইতে হয়।

বিনয়কুমার আত্মসম্মানী লোক ছিলেন। বন্ধুর বিধবার নিকট তিনি প্রত্যহই ঋণী হইতেছেন ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মানে বড়ই আঘাত লাগিতে লাগিল। না-জানি নীহারবালা কি মনে করিতেছে এই চিন্তায় তাঁহার দুই রাত্রি ঘুম হইল না। শেষে ঠিক

করিলেন একদিন তাঁহার সহিত এ বিষয়ে মুখোমুখি আলাপ করিবেন। উইলের কথাটাও তাঁহাকে বলিবেন। এতদিন উইলের কথা তিনি কাহাকেও জানান নাই। আজ যাইব কাল যাইব করিয়া কিন্তু তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নীহারবালা হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। নীহারবালার একমাত্র কন্যা দেবীই তখন বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া পড়িল।

বিনয়কুমার একদিন গিয়া তাহার নিকটেই উইলের কথাটি পাড়িবার চেষ্টা করিলেন।

দেবী বলিল, "আমি কাকাবাবু এখন পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। উইল-টুইল নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। আমাকে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে—"

"এক মিনিট। উন্মেষকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে?"

"উনু দা'কে?"

হঠাৎ সে হাসিয়া ফেলিল।

"একথা জিজ্ঞেস করবার মানে?"

"মানে আছে। উনুকে তুমি যদি বিয়ে করতে রাজী না হও, তাহলে মণির উইল অনুসারে তুমি চট্টো-গঙ্গোর কোন অংশ পাবে না।"

"কে পাবে তাহলে?"

"উনু। সে যদি অবশ্য তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়—"

"আর সেও যদি না হয়? হবেই এমন কোন কথা নেই, আমি তো দেখতে কালো। উনুদা আমাকে কি বলত জানেন? তাড়কা। খুব সম্ভব সে রাজী হবে না। তাহলে কি হবে?"

"সে-ও পাবে না কিছু। বিষয় রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে চলে যাবে আমার মৃত্যুর পর।"

"যাক গে। ও নিয়ে অত ভাবছেন কেন এখন থেকে—"

"ভাবছি, কারণ আমার অংশের সব লাভ আমি খরচ ক'রে ফেলেছি। এখন তোমার অংশ থেকে আমাকে টাকা নিতে হচ্ছে। বিবেকে বাধছে সেটা। তুমি যদি আমার পুত্রবধূ হও তাহলে বাধবে না। আর মণির সেইটিই ইচ্ছে ছিল—"

"বেশ আমার আপত্তি নেই। উনুদার কি মত আছে?"

"সেটা এখনও জানি না। তাকে চিঠি লিখেছি।"

চার

উন্মেষের উত্তর পাইয়া বিনয়কুমারের মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। উন্মেষ লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। বিষয়ের লোভে আমি দেবীকে বিয়ে করতে পারব না। আমি লুসি নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। মেয়েটি খুব ভালো, দেখে আপনার নিশ্চয় পছন্দ হবে। তবে বিয়ের এখনও দেরী আছে। কারণ এর আগে তার আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর বনছে না। ডিভোর্সের জন্য দরখাস্ত করেছে। ডিভোর্স হয়ে যাবে ঠিক। তখন আমি তাকে বিয়ে করব ঠিক করেছি। আর মাসখানেকের মধ্যেই আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমি বাড়ি ফিরে যাব। ডিভোর্সের ব্যাপার মিটে গেলে লুসিও আমার কাছে চলে যাবে বলেছে। ভারতবর্ষেই বিয়ে হবে। আপনার সম্মতি ও আশীর্বাদের অপেক্ষায় রইলাম। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

প্রণত

উন্মেষ

উন্মেষের পত্র পাইয়া বিনয়কুমার কয়েকদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। একটি কথাই বারবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—শেষে কি ওই মেয়েটার নিকটই তাহাকে সারা জীবন ঋণী হইয়া থাকিতে হইবে? উন্মেষ কাপড়ের ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজ শিখিতেই বিলাতে গিয়াছিল, যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু দেবীকে বিবাহ না করিলে ব্যবসায়ই তো তাহার থাকিবে না। সে অবশ্য অক্সফোর্ডের কি একটা পরীক্ষা দিতেছে। ফিরিয়া আসিলে কোথাও একটা চাকুরি পাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কি ওই লুসির সংসারে থাকিতে পারিবেন? অসম্ভব। অনেক ভাবিয়া তিনি অবশেষে পরামর্শ চাহিয়া তাঁহাদের উকিল রজনী ভূষণ কানুনগোকে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন একটি। সব কথা খুলিয়া লিখিলেন। লিখিয়া মনে হইল বাহিরের লোককে পারিবারিক সব খবর জানানো কি ভালো? বিশেষতঃ নিজের অসংযত বিলাস-ব্যসনের কাহিনী কানুনগোকে জানাইয়া লাভ কি! কয়েকদিন মনঃস্থির করিতে পারিলেন না, পত্রটি ড্রয়ারেই রাখিয়া দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মনঃস্থির করিতেই হইল, ভাবিয়া দেখিলেন আইন-কানুন সংক্রান্ত ব্যাপারে কানুনগো ছাড়া গতি নাই। জগদীশ চিঠিটি রেজেস্ট্রী করিয়া তাঁহার হাতে রসিদটি আনিয়া দিল। তিনি অধীর আগ্রহে কানুনগোর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাঁচ

দেবীর পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। খুব ভাল পরীক্ষা দিয়াছে সে। অপ্রত্যাশিত রকম ভালো। ঠিক করিয়াছে এইবার বেশ লম্বা একটা বেড়াইয়া আসিবে। কাশ্মীর যাইতে হইলে কোথায় কি করিতে হয় এইসব লইয়াই সে মাথা ঘামাইতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন উন্মেষের খবরটা শুনিল। উন্মেষ নাকি দেশে ফিরিয়াছে এবং বিনয়কুমার নাকি তাহাকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। দূর করিয়া দিবার কারণ সে বিলাতী এক মেমসাহেবকে বিবাহ করিবে ঠিক করিয়াছে। খবরটা শুনিয়া সে মুচকি হাসিল একটু। সেই তাহা হইলে এখন চট্টো-গঙ্গোর সম্পূর্ণ মালিক। তাহার পর সহসা উন্মেষের মুখখানা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। টকটকে ফরসা রং, সরু গোঁফ, জেদি-জেদি মুখের ভাব। বেশ অহঙ্কারী। এম-এস-সিতে ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিল বলিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিত! সে-ও এবার ফার্স্ট ক্লাস পাইয়া দেখাইয়া দিবে সে-ও কম নয়। শুধু ফার্স্ট ক্লাস নয়, সে হয়তো ফার্স্ট হইবে। উন্দা কোথায় আছে এখন? তাহার কাছে একবারও তো আসিতে পারিত! দুয়ারের কড়াটা খুব জোরে জোরে নড়িয়া উঠিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল উন্দা আসিল নাকি। তাড়াতাড়ি গিয়া কপাট খুলিয়া দেখিল, উন্দা নয়, পিওন। একটি চিঠি লইয়া আসিয়াছে, রেজেস্ট্রী চিঠি, উইথ্ একনলেজমেন্ট ডিউ। বিনয়কুমারের চিঠি। অবাক হইয়া গেল সে। রেজেস্ট্রী চিঠিতে কি লিখিয়াছেন কাকাবাবু? তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িল।

"কল্যাণীয়াবু,

তুমি এ চিঠি পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক ভেবেও এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ দেখতে পেলাম না। উন্মেষ বিলেত থেকে ফিরেছে। সে ঠিক করেছে এক মেমসাহেবকে বিয়ে করবে। তোমাকে বিয়ে করবে না। তাকে আমি বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিয়েছি। তোমার বাবা আর আমি দুজনে মিলে যে উইল করেছিলাম তার কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। পড়ে দেখলে বুঝতে পারবে আমার পিতা স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বংশের যে কোনও লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে আমাদের বিষয়টা রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে যাবে না। আমার ইচ্ছে নয়, যে প্রতিষ্ঠান আমরা দুই বন্ধুতে গড়ে তুলেছিলাম তা আমাদের পরিবারের বাইরে চলে যায়। উন্মেষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে সব দিক থেকেই সুখের হ'ত। কিন্তু সে কুলাঙ্গার, বংশের মান মর্যাদার কোন মূল্য নেই তার কাছে। আমাকে এখন কতদিন বেঁচে থাকতে হবে জানি না। অডিটারের হিসাব থেকে এটা বোঝা গেছে আমি যে পরিমাণ খরচ ক'রে ফেলেছি তাতে কার্যতঃ এখন তোমার কৃপার ভিখারী হয়েই আমাকে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে। খুব হিসেব করে দীনভাবে থাকলে হয়তো শেষ জীবনে আমার ঋণটা শোধ হ'তে পারে। কিন্তু এ বয়সে আমার জীবনের ধারা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যে সব বিলাসে আমি এতদিন অভ্যস্ত হয়েছি তা বর্জন করা আমার পক্ষে এখন খুবই শক্ত। এইসব নানাদিক ভেবে আমি আমাদের উকিল কানুনগো মশাইকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি আমাকে লিখেছেন—আমিই যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়। তাই আমি এই পত্র দ্বারা তোমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করছি।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলেও বে-আইনী নয়। তুমি যদি রাজী হও তাহলে সবদিক রক্ষা হয়। এটাও মনে রেখ রাজী না হলে বিষয়ে তোমার আর কোন অধিকার থাকবে না।

ব্যাপারটা ভালো ক'রে ভেবে আমাকে একটা উত্তর যত শীঘ্র সম্ভব দিও। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—"

দিন সাতেক পরে বিনয়কুমার দেবীর উত্তর পাইলেন। দেবী লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আপনি যা লিখেছেন তাতে রাজী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, আপনি যে সমস্যার কথা লিখেছেন তা আমি অন্যভাবে সমাধান করে দিলাম। সমস্ত বিষয়টা আপনাকেই দান করে দিচ্ছি। ডীড্ অফ্ গিফ্ট্ রেজেস্ট্রী ক'রে পাঠালাম। উনুদাকে বিয়ে করতে আমি রাজী ছিলাম, এখনও আছি সুতরাং ভবিষ্যতে আমিই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী উইল অনুসারে। আমার সেই উত্তরাধিকারের সমস্ত স্বত্ব আপনাকে দান ক'রে দিলাম। আমার বাড়িটা আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি ওটার যা হয় ব্যবস্থা করবেন। আমার প্রণাম নিন। ইতি—

প্রণতা

দেবী

ছয়

দুই বৎসর পরে বিনয়কুমার দেবীর নিকট হইতে আর একটি পত্র পাইলেন।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, আশা করি আপনি ভালো আছেন। একটি সুখবর দেবার জন্যে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমি এখানকার কলেজে প্রফেসারি নিয়ে এসেছিলাম। দিনকতক পরে উনুদা-ও এই কলেজে এসে হাজির হলেন ফিজিক্সের প্রফেসার হ'য়ে। লুসির সঙ্গে উনুদার বিয়ে হয়নি। কারণ তার স্বামীর সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, ডিভোর্স হয়নি। মাস ছয়েক আগে উনুদা আমাকে কি বললে জানেন? 'দেখ দেবী তোমাকে আমি ঠিক বিয়ে করতুম,কিন্তু বিষয়ের লোভে বাধ্য হয়ে তোমাকে বিয়ে করতে হবে এইটে আমার খুব খারাপ লেগেছিল! লুসি মেয়েটাকেও ভালো লেগেছিল তখন। তাই তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হইনি। এখন আর তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার মুখ নেই আমার। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে পেলে জীবনে আমি সুখী হতাম।' কি কাণ্ড দেখুন! আমি প্রথমে কিছুতেই রাজী হইনি। কিন্তু ও কি রকম জেদি ছেলে তা জানেন তো? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রোজই ওই এক কথা বলতে লাগল। শেষটা আমি

রাজী হয়ে গেলুম। মাস তিনেক আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। নদীর ধারে যে বাংলোটা আমরা ভাড়া করেছি সেটা চমৎকার। আপনি একবার এসে বেড়িয়ে যাবেন ? আপনার আসবার খবর পেলে দোতলার ফ্ল্যাটটা আপনার জন্যে ঠিক করিয়ে রাখব। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি— প্রণতা

দেবী

তবে কি ?

হরিসেবক আর বিলাসকুমার বাল্যকাল থেকেই নিবিড় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। ছেলেবেলায় পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েছিল, স্কুলেও একসঙ্গে ছিল কিছুদিন। তারপর দুজনে দু'জায়গায় কলেজে পড়ে। হরিসেবক কাশীতে আর বিলাসকুমার হাজারিবাগে। কর্মক্ষেত্রও বিভিন্ন স্থানে। হরিসেবক একটি কলেজের অধ্যাপক, বিলাস একটি আপিসের কেরাণী। বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে দুজনের মধ্যে আরও অনেক পার্থক্য আছে। হরিসেবক ধার্মিক প্রকৃতির লোক, বেশ গোঁড়াই বলা চলে। এযুগেও ত্রিসন্ধ্যা করে, জাতিভেদ মানে বা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আঙুলে অষ্ট ধাতুর আংটি আছে। বিলাস বিপরীত প্রকৃতির। একটু বিলাসী গোছের। মাথার চুলটি সুবিন্যস্ত, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিমছাম। চেহারাটিও সুন্দর। বেহালা বাজাবার শখ আছে। হরিসেবক সকাল সন্ধ্যা পূজা করে, বিলাস বেহালা বাজায়। সাহিত্য, সিনেমা এসব শখও আছে। ভগবান বা দেবদেবী নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না কখনও।

এত অমিল সত্ত্বেও কিন্তু দুজনের ভাব খুব।

একবার পুজোর সময় হরিসেবক বিলাসকে লিখল—"এবার পুজোটা মান্দার পাহাড়ে কাটাব ঠিক করেছি। তুমি তো দুমকায় আছ, দুমকা মান্দার থেকে বেশী দূরে নয়। যদি দু'চার দিনের ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে যাও বড় আনন্দের হবে। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি। তোমার কোন অসুবিধা হবে না..."

বিলাস সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

এসে দেখল হরিসেবক কেবল বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে মান্দারে আসেনি। তার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। হরিসেবকের মেয়ে দীপু (দীপালি) কিছুদিন থেকে মূর্ছা রোগে ভুগছে। ডাক্তারি কবিরাজী কোন রকম চিকিৎসাতেই কোন রকম ফল হয়নি। হরিসেবক শেষে দৈব করেছিল। অনেক জায়গা থেকে মাদুলী আনিয়ে পরিয়েছিল, অনেক জায়গার পাদোদক আনিয়ে খাইয়েছিল, তবু কিছু হচ্ছিল না। এমন সময় সে একদিন স্বপ্ন দেখলে একটা। অদ্ভুত স্বপ্ন। স্বপ্নে কে একজন দিব্যকান্তি পুরুষ এসে যেন

হরিসেবককে বলছে তুমি আগামী লক্ষ্মী পূর্ণিমা রাত্রিতে মান্দার পাহাড়ে যেও। সেখানে মধুসূদন আছেন। তিনি সেদিন একটি সভ্য লোককে তাঁর অভীষ্ট বর দেবেন। হরিসেবক সেইজন্মেই এখানে এসেছে। ঠিক করেছে পূর্ণিমা রাত্রে মান্দার পাহাড়ে মধুসূদনের মন্দিরে যাবে। বিলাসকে দেখে হরিসেবক উল্লসিত হ'য়ে উঠল। সব কথা তাকে খুলে বলল।

"তুই যাবি আমার সঙ্গে ?"

বিলাস বিস্মিত হ'ল।

"আমি! আমি গিয়ে কি করব ওসব দেব-দেবীতে আমার বিশ্বাস নেই ভাই। তা ছাড়া ওসব ব্যাপার একা একা করাই ভালো। কি জানি মধুসূদন হয়তো আমার মতো লোকের সামনে আবির্ভূতই হবেন না।"

"কিন্তু একা একা রাত্রে ওই পাহাড়ে উঠতে ভয় করে। শুনেছি ওখানে বাঘ-টাঘ বেরোয়। আচ্ছা, তুমি না যাও পণ্ডিতজীকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি খুব উঁচুদরের সাধকও একজন। রোজ চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে পূজো করেন। তাঁকে বললে তিনি আপত্তি করবেন না।"

"তুমি সঙ্গে লোক জোটাতে চাইছ কেন? এ সব জিনিস একা একা করাই ভালো—"

"কিন্তু ওই যে একটা শর্ত আছে—সভ্য লোককেই মধুসূদন অভীষ্ট জিনিসটি দেবেন। মধুসূদনের বিচারে আমি যদি ঠিক সভ্য না হই তাহলে তো আর পাব না। তাই আরও দু'একজন শিক্ষিত লোককে নিয়ে যেতে চাই। আমাকে না দিলে তাকে দিতে পারেন হয়তো—"

"তাহলে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ কোন ভরসায়? আমি ম্লেচ্ছ লোক, অশাস্ত্রীয় ভোজন করি, মাঝে মাঝে মদ-টদও খেয়েছি। আমি সঙ্গে থাকলে তো মধুসূদন তোমার ত্রিসীমানায় আসবেন না।"

"বেশ আমি পণ্ডিতজীকেই নিয়ে যাব—"

দুই

লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত্রি। চারিদিকে স্বপ্নের পাথার। হরিসেবক আর পণ্ডিতজী অনেকক্ষণ আগে মান্দার পাহাড়ের উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। বিলাস বাড়ির বাইরে একা চুপ ক'রে বসেছিল। রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। হঠাৎ বিলাসের মনে হ'ল—আমিও পাহাড়টায় ঘুরে আসি একটু। এই জ্যোৎস্না রাত্রি পাহাড় থেকে নিশ্চয়ই অপরূপ দেখাচ্ছে। দেখে আসি।

নিজে বেহালাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। সত্যই স্বপ্নের পাথার চারিদিকে। কিছুক্ষণ পরে বিলাসও স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তার মনে হতে লাগল সে যেন কোন অজানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে মান্দারকে সে দিনের আলোয় দেখেছে এ যেন সে মান্দার নয়। এ যেন একটা নূতন আবির্ভাব। সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ অত্যন্ত পরিচিত। যে স্বপ্ন মনের গহনতম প্রদেশে সুপ্ত ছিল তা যেন সহসা রূপ নিয়েছে আজ রাত্রে।

··বিলাস পাহাড়ে উঠছিল। এর আগে সে উঁচু পাহাড়ে ওঠেনি কখনও। পাহাড়ে ওঠবার রাস্তাও তার জানা ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে হোঁচট খেতে খেতে তবু সে উঠেছিল। পাহাড়ের উপর থেকে এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি কেমন দেখায় এই আগ্রহ তাকে পেয়ে বসেছিল যেন। আরও ওপরে চল, আরও আরও··। অনেক দূর ওপরে উঠে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইল সে। তার মনে হতে লাগল শব্দহীন একটা মন্ত্রই যেন অপার্থিব সৌন্দর্যে রূপায়িত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এও যেন সে সহসা আবিষ্কার করল এই মন্ত্রের সাধনাই তো সে করেছে সারাজীবন ধরে অজ্ঞাতসারে, আজ সত্যটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার কাছে। অনাবিল এই সৌন্দর্যের দিকে নির্নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সে। বারবার তার মনে হ'তে লাগল, ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম।

···কাছেই একটা প্রকাণ্ড পাথরের টুকরো পড়েছিল—মসৃণ, সমতল এবং প্রকাণ্ড। অনেকটা চৌকির মতো। তার উপর বসে বেহালা বাজাতে লাগল বিলাস। সুরে আর সৌন্দর্যে সত্যই স্বর্গলোক মূর্ত হয়ে উঠল।

···কতক্ষণ কেটেছিল তা খেয়াল ছিল না বিলাসের। হঠাৎ তার মনে হ'ল তার বেহালার সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছে কে যেন। বিলাস বেহালা থামিয়ে বাঁশী শুনতে লাগল। অপূর্ব সুর, দরবারী কানাড়ার এমন অপূর্ব আলাপ আর কখনও শোনেনি সে। বিলাস উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল, কাছেই একটু নীচে আর একটি চাতালের উপর বসে একটি কিশোর বাঁশী বাজাচ্ছে। আস্তে আস্তে নেমে গেল বিলাস। কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। বিলাসের মনে হ'ল কোন সাঁওতালের ছেলে বুঝি। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা, তার উপর একটি ময়ূরের পালক গোঁজা।

"খুব চমৎকার বাঁশী বাজাও তো তুমি··বাঃ।"

"আপনার বেহালাও চমৎকার। আপনার বেহালা শুনেই আমি বাঁশী নিয়ে বেরুলাম—"

"তুমি এখানেই থাক?"

"হ্যাঁ। আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"এমনিই বেড়াতে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে যা পেলাম তা পাব আশা করিনি।"

"কি এমন পেলেন—"

"পেলাম না? এই জ্যোৎস্না রাত্রির রূপ দেখলাম, তোমার বাঁশী শুনলাম—"

"এখানে অনেকে মধুসূদনের কাছে বর প্রার্থনা করতে আসেন। আপনার তেমন কোন প্রার্থনা নেই ?"

"প্রার্থনা না করেই যা পেলাম তাই তো আমার আশাতীত। আর কি চাইব !"

মুচকি হেসে ছেলেটি বললে, "আচ্ছা তাহলে যাই এখন—"

তরতর ক'রে ছেলেটি নেমে যেতে লাগল। বিলাসের মনে হ'ল তার অন্তরতম প্রিয়জন যেন চলে যাচ্ছে।

"শোন শোন, তোমার পরিচয়ই তো নেওয়া হ'ল না। কি নাম তোমার ?"

ছেলেটি কিছু বলল না, ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে মিলিয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে।

তিন

হরিসেবক ও পণ্ডিতজীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। হরিসেবক সমস্ত রাত ভাগবত পাঠ করেছিলেন, পণ্ডিতজী উপনিষদ। তাঁরা কোন প্রত্যাদেশ পাননি, কোন ওষুধও পাননি। হতাশ হয়েই ফিরেছিলেন তাঁরা। বিলাসের ছুটিও ফুরিয়ে গেল, সে আবার ফিরে গেল ডুমকায়। মাস কয়েক পরে সে হরিসেবকের চিঠি পেল একটি।

ভাই বিলাস,

আশা করি ভাল আছ। গত লক্ষ্মী পূর্ণিমায় আমি পণ্ডিতজীকে নিয়ে মান্দার পাহাড়ে মধুসূদনের মন্দিরে গিয়েছিলাম, তা তো তুমি জানই। তখন কোন প্রত্যাদেশ বা ওষুধ পাইনি যদিও, কিন্তু তারপর থেকে দীপু ভাল আছে, আর একদিনও মূর্ছা হয়নি। মাঝে মাঝে খবর দিও। ভালবাসা জেন। ইতি

তোমারই
হরিসেবক

চিঠিটা পেয়ে বিলাস একটু বিস্মিত হ'ল। দিন কতক আগে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল। জ্যোৎস্না-বিধৌত মান্দার পাহাড়ে সে যেন বসে আছে কার প্রত্যাশায়। হঠাৎ একটা পাথরের পিছন থেকে সেই শ্যামবর্ণ কিশোরটি এসে দাঁড়াল। মুচকি মুচকি হাসছে, হাতে বাঁশি। বিলাসের দিকে চেয়ে যেন বললে, "সেদিন আপনি আমার নাম জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলা হয়নি। আমার নাম মধুসূদন।"

হরিসেবকের চিঠিটার দিকে চেয়ে বিলাসের মনে হ'ল তবে কি—? এর বেশী আর সে ভাবতে পারলে না। সেই শ্যামবর্ণ কিশোর ছেলেটির ছবি তার মানসপটে ফুটে উঠল কেবল। মাথার চুল চূড়া ক'রে বাঁধা, তাতে গোঁজা রয়েছে একটি ময়ূরের পালক। হাতে বেণু, মুখে হাসি।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল শোভনলাল। তার ধারণা হয়েছিল টেলিফোনটাও খারাপ হয়ে গেছে। সে মাঠে বসে ছিল। মাঠ থেকেই শুনতে পাচ্ছিল টেলিফোনটা বাজছে। কে এ সময় টেলিফোন করছে? তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, ঘরের ভিতর ঢুকতে ভয়ও করছিল। এ সময় কে টেলিফোন করতে পারে? তাকে টেলিফোন করবার মতো কে-ই বা আছে এ শহরে। সুজাতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইবার লোভেই সে অনেক খরচ ক'রে ফোনটা নিয়েছে। ওই ফোনেই সুজাতার সঙ্গে সামান্য যা একটু যোগাযোগ হয় কচিৎ। তা-ও সুজাতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনও কথা বলে না। সুশোভন ফোন করলে তবে এসে ফোনটা ধরে। যখন কথা বলে, তখন পাশে নাকি তার মা দাঁড়িয়ে থাকে। তবু তার কথা শোনা যায় তো।

এইটুকুই শোভনলালের তৃপ্তি। সুজাতার জন্যেই এই বিহারে এসে পড়ে আছে সে। সুজাতার কাছাকাছি আছে এই সান্ত্বনা।

…ফোনটা বেজেই চলেছে।

হঠাৎ শোভনলালের মনে হ'ল সুজাতা ফোন করছে না কি? কিন্তু সুজাতা নিজের থেকে কখনও ফোন করে না। তাছাড়া সে তো এখানে নেই, কাল মুঙ্গেরে গেছে। ফিরেছে কি এর মধ্যে? বলেছিল সাত আট দিন পরে ফিরবে। হয়তো ফিরেছে।

শোভনলাল মাঠ থেকে উঠে ভিতরে গেল। ভিতরে যেতেই থেমে গেল ফোনটা। তবু তুলে নিল সে রিসিভারটা।

'হ্যালো—কে—'

কোন সাড়া নেই।

'হ্যালো—হ্যালো—'

কোন সাড়া নেই।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার মাঠে এসে বসল।

সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল। ছেলেবেলা থেকে সুজাতার সঙ্গে আলাপ। বাল্যকালে একই স্কুলে পড়েছিল দুজনে। একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। তারপর সে কলেজে পড়বার জন্যে কোলকাতা চলে গেল। সুজাতাকে চিঠি লিখত সেখান থেকে। সুজাতা কি সে চিঠিগুলি রেখে দিয়েছে এখনও? ফোনে একদিন বলেছিল পুড়িয়ে দিয়েছি। সুজাতার কয়েকখানা চিঠিও তার কাছে আছে। অতি সংযত সাধারণ চিঠি, কিন্তু তার মধ্যেই, ওই সহজ অনাড়ম্বর কথাগুলোর মধ্যেই শোভনলাল নূতন মানে খুঁজে পেত। সে কখনও লিখত না 'আমি ভাল আছি'। লিখত, 'আমার শরীরটা ভাল আছে'। এর মধ্যে অনেক নিগূঢ় ইঙ্গিত পেত

শোভনলাল। 'শরীরটা ভাল আছে' মানেই মনটা ভাল নেই, মন কেমন করছে। একথা তো খোলাখুলি লেখা যায় না। লিখত, 'আপনি কোলকাতার কলেজে অনেক বন্ধুবান্ধব পেয়ে আনন্দেই আছেন নিশ্চয়'। কখনও লেখেনি, 'আমাকে বোধহয় ভুলে গেছেন' ওটুকু উহ্য থাকত, কিন্তু তা বুঝতে শোভনলালের অসুবিধা হ'ত না। সুজাতার অনুক্ত কথাগুলিই বেশী অর্থ বহন করত শোভনলালের কাছে। শোভনলালের মনে হ'ত যেটুকু ও বলেনি সেটুকু যেন আরও ভাল ক'রে বলা হয়েছে। বললে, সব ফুরিয়ে যেত। না বলাতে অসীম অনন্তের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে সেটা। সীমা নেই; শেষ নেই। সুজাতার ছোট ছোট চিঠিগুলো কতবার যে পড়েছে শোভনলাল তার ঠিক নেই। প্রতিবারেই নূতন একটা অর্থ আবিষ্কার করেছে। একটা চিঠিতে লিখেছিল—'পড়াশোনার কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না আশা করি'। এর মধ্যে যে নীরব ব্যঙ্গটা ছিল তা খুব উপভোগ করেছিল শোভনলাল। সুজাতার চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে গেল শোভনলাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকার অশ্রান্ত ঝনৎকার, আকাশের কালো কালো মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু একটা তারা, স্তূপীকৃত অন্ধকারের মতো ওই বিরাট বটগাছটা, সব যেন সুজাতা-ময় হয়ে উঠল। শোভনলালের মনে হতে লাগল—এই যে অন্ধকার এ তো সুজাতারই জীবনব্যাপী অন্ধকারের মতো। এই অশ্রান্ত ঝিল্লীর ঝঙ্কার—এ তো আমরা রোজই শুনি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত আকুতি অনুভব করি কি? সমস্ত অন্ধকারকে যে বাণী স্পন্দিত করছে তার মর্মন্তুদ মর্ম কি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি? সুজাতাকে কি আমরা বুঝেছি? মেঘের মাঝে মাঝে দু' একটি উজ্জ্বল তারার মতো তার ক্বচিৎ-দীপ্ত আনন্দ-প্রকাশকে কি আমরা মূল্য দিতে পেরেছি? ওই ঘনীভূত অন্ধকারের ভিতর যে একটা প্রাণবন্ত বটগাছ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যার শিরায়-উপশিরায় প্রাণ-প্রবাহ, যার পাতায় কিশলয়ে আনন্দের উন্মুখতা, যার নীরব সত্তার প্রচ্ছন্ন উৎসবের সমারোহ তাকে আমরা চিনেছি কি? চিনিনি। সুজাতাকেও চিনিনি। সুজাতা একবার বলেছিল, 'আমাদের স্বাধীনতা কাগজে কলমে। আমাদের চারিধারে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে, তার রংটা মাঝে মাঝে বদলেছে হয়তো, কিন্তু দেওয়ালটা ভাঙেনি। তা আগেকার মতোই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে আছে।' সুজাতার মা মারা যাওয়াতে প্রাচীরটা আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। সুজাতার মা শোভনলালকে ভালবাসতেন। তাঁকে বললে, তিনি হয়তো রাজী হতেন। বৈদ্য ব্রাহ্মণে বিয়ে তো আজকাল কত হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে বলবারই সুযোগ পায়নি শোভনলাল। হঠাৎ মারা গেলেন তিনি হার্টফেল ক'রে। তারপর সুজাতার বাবা বদলি হয়ে এলেন বিহারে। শোভনলালও চেষ্টাচরিত্র ক'রে বিহারে এল। কারণ সুজাতার কাছ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব ছিল তার পক্ষে। কোলকাতাতেও বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতে হ'ত, এখানেও বাড়ি ভাড়া করেছে। এখানে বাড়ি ভাড়া কম। বেশী হলেও শোভনলাল আসত। আসার কোন বাধা নেই, কারণ কোনও বন্ধনই নেই তার। বাপ মা ভাই বোন তো

নেই-ই, পেশা বা চাকরির বন্ধনও নেই। সে কবি, লেখক। বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকলে অকূল পাথারে পড়ত। কিন্তু পড়েনি। সুজাতার বাবা বিহারে আসবার ছ' মাস পরে শোভনলাল এসেছিল। এসেই গিয়েছিল সে সুজাতাদের বাড়ি। গিয়ে দেখল সুজাতার বাবা বিয়ে করেছেন। আর বিয়ে করেছেন অমিতাকে। অমিতা শোভনলালের সহপাঠিনী ছিল। শুধু তাই নয়, তার প্রেমে পড়েছিল তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অমিতার লেখা অনেক চিঠি অনেক দিন সে রেখে দিয়েছিল সুজাতাকে দেখাবে বলে কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। পুড়িয়ে দিয়েছে চিঠিগুলো। সেই অমিতা যে সুজাতার সৎমা এবং অভিভাবিকা হয়ে দাঁড়াবে তা কে কল্পনা করেছিল! এখানে এসে প্রথমে যখন সে সুজাতার বাড়ি গিয়েছিল, তখন অমিতাকে দেখে চমকে উঠেছিল। অমিতাও উঠেছিল নিশ্চয়। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করেনি। শোভনলালকে দেখে আধ-ঘোমটা দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গিয়েছিল সে। যেন চেনে না, যেন কখনও দেখেনি। শোভনলালও আর বেশীক্ষণ থাকতে পারেনি সেখানে। সুজাতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা সে করেছিল পত্রযোগে। যে উত্তরটা এসেছিল, তা এখনও মনে আছে শোভনলালের—

প্রিয় শোভনলাল,

তুমি শিক্ষিত। তোমার নিকট এ পত্র প্রত্যাশা করি নাই। তোমাকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করি, সুজাতাকেও তুমি নিজের ভগ্নীর মতো দেখিবে ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাছাড়া সুজাতা ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি বৈদ্য। বৈদ্যরা নিজেদের আজকাল ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সমাজে এখনও তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সুজাতার মা যদিও তাহার সৎমা, কিন্তু সে প্রকৃতই তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী, সে এ বিবাহে কিছুতেই রাজী হইবে না। তাহাকে তোমার পত্র দেখাইয়াছিলাম, সে বলিল, যদি এ বিবাহ দাও আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। সুজাতার-মা আর একটা কথাও বলিয়াছে। তোমার মনের ভাব যখন এইরূপ তখন তোমার আমাদের বাড়িতে না আসাই ভালো। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীহরানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সত্যিই প্রাচীরটা দুর্লঙ্ঘ্য। অমিতা আসাতে আরও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। অমিতা যে কেন এত হিতাকাঙ্ক্ষিণী হয়েছে তা শোভনলালের বুঝতে দেরি হয়নি। অমিত যদি না থাকত তাহলে হরানন্দবাবুকে হয়তো শোভনলাল রাজী করাতে পারত। হরানন্দ-বাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুঠির মাঠের ধারে। ওই নির্জন জায়গাটায় শোভনলাল রোজ বেড়াতে যায়। ঝাউ-কুঠি একটা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ি। খাপরায় ছাওয়া, বাংলো ধরনের। চারদিকে বড় বারান্দা, লম্বা লম্বা সিঁড়ির সারি। আর চারিদিকে প্রকাণ্ড হাতা। জায়গাটায় বড় ভালো লাগে শোভনলালের। রোজ

বিকেলে বেড়াতে যায় সেখানে। সুজাতাকে একদিন ফোনে সে বলেছিল 'আমার তো তোমার বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। তুমি একদিন কোন ছুতো ক'রে ঝাউ-কুঠিতে এস না, তোমাকে অনেক দিন দেখিনি।' সুজাতা আসতে রাজী হয়নি। তার দিন দুই পরে হরানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঝাউ-কুঠির মাঠে। গভর্ণমেন্ট নাকি বাড়িটা কিনতে চান, গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে তিনি বাড়িটা দেখতে এসেছিলেন।

'কি শোভন এখানেই আছ এখনও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'কতদিন থাকবে?'

'বরাবরই থাকব।'

উত্তরটা শুনে একটু থমকে গেলেন হরানন্দবাবু।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মাথা ঠিক হলো?'

সবিনয়ে উত্তর দিয়েছিল শোভনলাল, 'আমার মাথা তো কখনও খারাপ হয়নি। যা আমি আপনাকে লিখেছিলাম তা বাজে কথা নয়। আমি সুজাতার জন্যে সারাজীবন অপেক্ষা করব। আপনারা যদি সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতেন আমার উপর রাগ করতেন না।'

হরানন্দবাবু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'সুজাতাকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তার অমত নেই। যা যুগের হাওয়া তাতে আমিও শেষ পর্যন্ত হয়তো রাজী হতুম, কিন্তু মুশকিল হয়েছে সুজাতার মাকে নিয়ে। তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা ওঁরই ডিক্‌টেশনে। ও বলেছে এ বিয়ে হলে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, না হয় গলায় দড়ি দেবে। এ অবস্থায় কি করি বল। অপেক্ষা কর, দেখা যাক যদি ওর মত বদলায়।'

শোভনলাল জানে মত বদলাবে না। আর এ ও জানে হরানন্দবাবু বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন না।

······সুজাতার কথাই ভাবতে লাগল শোভনলাল। হঠাৎ একবার তার মনে হ'ল পিছন দিকে কে এসে দাঁড়াল যেন। সে-ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কই, কেউ নেই। আবার বসল। হু হু ক'রে কনকনে হাওয়া বইছে। তবু বসে রইল সে। একটু পরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল। আবার উঠে দাঁড়াল শোভনলাল। টর্চ ফেলে ফেলে দেখল চারদিকে। কেউ নেই। কুকুরটা খানিকক্ষণ ডেকে থেমে গেল। তারপর ডাকতে লাগল পেঁচাগুলো। কর্কশকণ্ঠে কি একটা যেন বলতে চাইছে তারা, শোভনলাল বুঝতে পারল না। একটু পরে মনে হ'ল ওরা যেন বলছে—দেখছ না, দেখছ না, দেখছ না? কি দেখবে? অন্ধকার ছাড়া কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিলে সে ইজিচেয়ারটার উপর। কিন্তু তার মনে হতে লাগল কে যেন তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিঃশব্দ সঞ্চরণে কার আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে, চুলের মৃদু

গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন. আবার সব থেমে গেল। অসাড়ের মত পড়ে রইলো শোভনলাল।

······ফোনটা বেজে উঠল আবার।

তাড়াতাড়ি ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেল শোভনলাল।

'হ্যালো, কে, সুজাতা ? ও, সুজাতা—কি খবর ?'

'আপনি একবার আসুন। এবার এলে দেখা হবে—'

কোন সুদূর থেকে যেন ভেসে আসছে সুজাতার স্বর।

'তোমাদের বাড়িতে যাব ?'

'না, ঝাউ-কুঠিতে। আপনি একদিন যেতে বলেছিলেন, তখন যেতে পারিনি। আজ এসেছি। আপনি আসুন—'

'এত রাত্রে ঝাউ কুঠিতে কি ক'রে গেলে—'

'আসুন, এলে বলব।'

ঝাউ-কুঠিতে গিয়ে শোভনলাল দেখল, সিঁড়ির উপর সুজাতা বসে আছে। একা। প্রথমে দেখতে পায়নি। টর্চ জ্বালবার পর দেখা গেল।

'সুজাতা ?'

'হ্যাঁ। এইবার আমার চারদিকের দেওয়ালগুলো ভেঙে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি—আর কোন বাধা নেই।'

টর্চের আলোতে শোভনলাল দেখতে পেল সুজাতার চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে উঠেছে।

'মুক্তি পেয়েছ মানে ?'

'মুঙ্গেরে গিয়েছিলাম। একটু আগে মারা গেছি বাড়ি চাপা পড়ে। এখানে ভূমিকম্প হয়নি ?'

'হয়েছিল—'

'আপনি, তাহলে—'

'না, আমার কিছু হয়নি। আমি বেঁচে গেছি—'

'তাহলে তো আপনার দেওয়াল ভাঙেনি। আমরা তাহলে মিলব কি ক'রে ?'

হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সুজাতা। শোভনলাল ধরতে গেল, কিন্তু ধরা গেল না। সব হাওয়া, সুজাতা অশরীরী।

'আমরা তাহলে মিলব কি ক'রে ? আমার সব দেওয়াল তো ভেঙে গেছে। কিন্তু আপনার তো ভাঙেনি। মিলব কি ক'রে—'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুজাতা।

'তুমিই বল কি ক'রে মিলব। তুমিই আমাকে বলে দাও সুজাতা—'

'ওই যে। লাফিয়ে পড়ুন ওর মধ্যে। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল—'

সুজাতা আঙুল দিয়ে প্রকাণ্ড বড় সেকেলে ইঁদারাটা দেখিয়ে দিলে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শোভনলাল।

'আসুন—'

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সুজাতা ইঁদারাটার দিকে। শোভনলালও অনুসরণ করতে লাগল তাকে যন্ত্রচালিতবৎ।

ইঁদারার ধারে এসে সুজাতা বললে, 'লাফিয়ে পড়ুন। ভেঙে ফেলুন দেওয়াল, দূর ক'রে দিন সব বাধা—'

শোভনলাল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফিয়ে পড়ল।

পালানো যায় না

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন সমস্ত প্রকৃতি যেন রুদ্ধ-শ্বাসে প্রলয়ের প্রতীক্ষা করছে। শাখা-প্রশাখাময় একটা বিদ্যুৎ আকাশকে দীর্ণ-বিদীর্ণ ক'রে দেবার পরই প্রচণ্ড শব্দ ক'রে বজ্রপাত হ'ল তারপর আবার সব চুপচাপ। তারপরই সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে ঝড় এল। কামানগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল যেন। সোনাটুপি গ্রামের প্রান্তে যে অরণ্যটা আছে তার গাছগুলো হাহাকার করতে লাগল। অরণ্যের পাশেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। দুটো শেয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কাক বক উড়তে লাগল বিভ্রান্ত হয়ে তারপর বৃষ্টি নামল। বেশ মুষল-ধারে। ঝড়-বৃষ্টি দুটোই সমানে চলতে লাগল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এল ক্রমশঃ। গাছের ডালপালা ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাঠে মনে হ'ল মৃত সৈনিকের দল আছড়ে আছড়ে পড়ছে যেন। ঝড়-বৃষ্টি আর অরণ্য মিলে শব্দেরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল একটা। কখনও মনে হচ্ছিল কেউ যেন অট্টহাস্য করছে, পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কাঁদছে। আর্তনাদের সঙ্গে খিকখিক হাসি, হাসির সঙ্গে হাততালি, হাততালির সঙ্গে ডম্বরু নিনাদ যে পরিবেশ সৃষ্টি করল তা আতঙ্কজনক। এতক্ষণ কোনও মানুষ দেখা যায়নি। কিন্তু এইবার দেখা গেল। বনোয়ারী বেরুল জঙ্গল থেকে ছুটে বেরুল। যেন পালাচ্ছে অদ্ভুত তার চেহারা। মুখময় গোঁফ-দাড়ি। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। কাঁধে প্রকাণ্ড বোঁচকা। হাতে ব্যাগ। ফুল প্যাণ্টের উপর লম্বা ঝোলা কোট পরেছে একটা, পায়ে বুট জুতো। মাঠের মধ্যে পড়ে সে ছুটতে লাগল আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চাইতে লাগল। তার পিছনে কেউ ছুটছিল না, কিন্তু বনোয়ারির ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, তার যেন আশঙ্কা হচ্ছে কেউ তাড়া ক'রে আসছে তাকে পিছু পিছু। মাঠের অপরপ্রান্তে ঘর ছিল একটা। পোড়ো বাড়ি। বনোয়ারি সেইদিকে দৌড়োতে লাগল।

পোড়ো-বাড়িটা নীলকুঠি ছিল এককালে। এখন ওটা স্থানীয় জমিদারের

সম্পত্তি। জমিদার কলিকাতায় থাকেন, সুতরাং বাড়িটা পোড়ো-বাড়িই হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালের বাড়ি, রেকতার গাঁথুনি, একেবারে পড়ে যায়নি। দেওয়ালগুলো খাড়া আছে। কপাট-জানালা গুলোও আছে। পশ্চিমদিকের ঘরের কপাট-জানালা চোরে খুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু উত্তর-দিকের ঘরটা, দক্ষিণদিকের ঘাট আর পূবদিকের ঘরটা ঠিক আছে। পূবদিকের ঘরটাই বড়। হলের মতো, তার সামনে একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দার উত্তরে আর দক্ষিণে ঘর।

বনোয়ারী ছুটতে ছুটতে এসে পূবদিকের ঘরের সামনে চওড়া বারান্দাতে উঠে হাঁপাতে লাগল। আর একবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল, তারপর ঢুকে পড়ল পূবদিকের বড় ঘরটাতে। ঢুকেই ঘরের কপাট বন্ধ ক'রে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে ঝড় বৃষ্টির তুমুল গর্জন হচ্ছিল, কিন্তু বনোয়ারি তা শুনছিল না, সে শোনবার চেষ্টা করছিল, কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। গত সাত দিন ধরে সে ওই পায়ের শব্দটাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না সোনা-টুপির জঙ্গলে ঢোকবার পর আর সে শব্দটা শুনতে পায়নি কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়েই সে ছপছপ শব্দ শুনেছিল। নির্ঘাত শুনেছিল, তার ভুল হয়নি। কিন্তু একবার মাত্রই শুনেছিল, আর শোনেনি। সে আশা করবার চেষ্টা করছিল, তবে কি হাড়-গিলা তাকে রেহাই দিলে?

খুট খুট ক'রে শব্দ হ'ল বারান্দায়। চমকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলো বনোয়ারি, তার শরীরের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল! কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শব্দ শোনা গেল না। কেবল ঝড় জলের দাপাদাপি, আর কোন শব্দ নেই। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল বনোয়ারি, ছরছর ক'রে পড়ছে বারান্দায়, আর কোন শব্দ নেই। ছাগলের ডাকের মতো ওটা কি শোনা যাচ্ছে? এই ঝড়ে বৃষ্টিতে কারো ছাগল মাঠে বেরিয়ে পড়েছে নাকি! কিন্তু একটা ছাগল তো নয়। অনেক ছাগলের ডাক। তারপর বনোয়ারি বুঝতে পারল ব্যাং ডাকছে! আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর তার মনে হ'ল সমস্ত রাত তো কপাটে পিঠ দিয়ে দাড়িয়ে থাকা যাবে না।

ভিতরে ঢুকে সে পিঠের বোঁচকা আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম ক'রে খুলে গেল কপাটটা আর ছপ ছপ ছপ ছপ শব্দও হ'ল একটা বাইরে। বনোয়ারি দৌড়ে গিয়ে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলে আবার। আবার কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হাড়গিলার চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠল তার মনে। ওর আসল নাম দন্দন্। ভাল নাম ছিল দন্নুজারি। কিন্তু তার চেহারার জন্যে সবাই ওকে হাড়গিলা বলে ডাকত। হাড়গিলার মতোই দেখতে। লম্বা লিকৃলিকে, কোমরের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত এক সরলরেখায় নয়। দুবার বেঁকেছে। কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা বাঁক, হঠাৎ মনে হয় কুঁজো (এই বাঁকটার উপরেই ছুরি মেরেছিল বনোয়ারি), আর দ্বিতীয় বাঁকটা ঘাড়

থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু এ বাঁকটা উল্টো রকম। লম্বাঘাড়টা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে আর গলার দিকটা বেরিয়ে পড়েছে সামনের দিকে। মনে হয় কেউ যেন ওর ঘাড়ে লাথি মেরে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে গলাটা। গলাটা অসম্ভব লম্বাও। সাঁকিটাও বেশ উঁচু। খাঁড়ার মতো নাকের সঙ্গে সেটা যেন পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছে। গায়ের রং ফরসা, ঠিক ফরসা নয়, হলদে। কপাল উঁচু, চোখ দুটো কটা, মনে হয় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভুরু নেই। চোখ মুখে কেমন যেন একটা বকের ভাব। এরকম লোক যে কি ক'রে ঝুমকোর মতো মেয়েকে পটাতে পেরেছিল, তা বনোয়ারি বুঝতে পারেনি। হাড়গিলা অবশ্য ঝুমকোর প্রেমে পড়েনি, সে ঝুমকোর সঙ্গে ভাব করেছিল তার গয়না আর গিনিগুলো হাতাবার জন্যে, কিন্তু ঝুমকো তো পড়েছিল। তা না পড়লে ভিতরের অত খবর কি হাড়গিলা জানতে পারত? সে কোন বাক্সে গিনিগুলো রাখত, আলমারির কোনখানটার তার গয়নাগুলো আছে সব কি বলত হাড়গিলাকে? ভাল না বাসলে বলত না। হাড়গিলাই বনোয়ারিকে নিয়ে গিয়েছিল ঝুমকোর কাছে। একা তো অতবড় জোয়ান মেয়েকে খুন করা যায় না, এক-জন সহকারী চাই। আর হাড়গিলা ছোরাছুরি বা গোলাগুলির পক্ষপাতি ছিল না। সে বলত ও সব বড় গোলমেলে জিনিস, ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। তার চেয়ে টুঁটি টিপে শেষ ক'রে দেওয়াই নিরাপদ। বনোয়ারি জাপটে ধরেছিল ঝুমকোকে, আর হাড়গিলে টুঁটি টিপেছিল··· বনোয়ারির চিন্তাধারা বিঘ্নিত হ'ল। বারান্দায় কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল · ঠিক এমনি শব্দ ঝুমকোর গলা থেকেও বেরিয়েছিল!

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বনোয়ারি। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল তার পকেটে টর্চ আছে। তার ঝোলার মধ্যে লণ্ঠনও আছে একটা। টর্চটা ভিতরের পকেটে ছিল। খুব বেশী ভেজেনি। জ্বালা গেল। জ্বেলেই নিশ্চিন্ত হ'ল বনোয়ারি। কপাটে খিল ছিটকিনি দুই আছে। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিলে দুটোই। তারপর ঝোলাটার ভিতর থেকে লণ্ঠনটা বার করল। আলাদা একটা বোতলে কেরোসিন তেলও ছিল। গত পনেরো দিন থেকে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কত অজানা জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে, আরও কত রাত কাটাতে হবে তার ঠিক নেই, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি, বিশেষ লণ্ঠন আর কেরোসিন তেল, টর্চ দেশলাই আর মোমবাতি সে সংগ্রহ ক'রে রেখেছে। কপাট বন্ধ ক'রে সে লণ্ঠন, তেলের শিশি বার করলে, টর্চের আলো জ্বেলে। দেশলাইটা খুঁজে বার করতে একটু দেরী হ'ল। নানাবিধ কাপড়-জামার জটিলতায় হারিয়ে গিয়েছিল। সব বার ক'রে ফেললে সে বোঁচকাটা থেকে। অনেক রকম কাপড় জামা ছিল। প্যাণ্ট, হাফ-প্যাণ্ট, ঝোলা-পাজামা, ধুতি, শার্ট, কোট, হাওয়াই-শার্ট হরেক রকমের, রঙীন চশমা দু'তিন জোড়া। বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজে গিয়েছিল। বনোয়ারি ক্রমাগত পোষাক বদলে বদলে বেড়াচ্ছিল। তার ধারণা হয়েছিল পুলিশ তো বটেই হাড়গিলার প্রেতাত্মাও পোশাক বদল করলে বোধহয় তাকে চিনতে পারবে না। যদিও সে বারবার নিজের সঙ্গে তর্ক

করছিল যে ভূতটুত সব কুসংস্কার, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না, কিন্তু তবু সে সাবধানতা অবলম্বন করতে ছাড়েনি। তার্কিক বনোয়ারির পিছনে বসে আর একজন কানে কানে বলছিল—সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি একটা শব্দ যখন শুনেছ, তা যাই হোক, সাবধান হও। বনোয়ারি ক্রমাগত পালাচ্ছিল আর পোশাক বদলাচ্ছিল। কখনও সাহেবী পোশাক, কখনও পেশোয়ারী, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও মিলিটারি। চোখে কখনও গগলস, কখনও সাদা চশমা, কখনও নীল···ভিজে কাপড়-জামার মধ্যে দেশলাইটা পাওয়া গেল অবশেষে। একদম ভিজে গেছে। টর্চের আলোতেই তাড়াতাড়ি তেল ভরে ফেলল সে। টর্চের আলোটাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। টর্চটা নিবিয়ে রেখে দিল। একটু আলোর সম্বল রাখা ভাল। দেশলাইটা জ্বলবে কি? বড্ড ভিজে গেছে। তবু সে চেষ্টা করতে ছাড়ল না। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। একটা কাঠিও জ্বলল না। আবার শুরু করল সে। খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্, অন্ধকারে শব্দটা অদ্ভুত শোনাতে লাগল, কেউ যেন হাঁচছে। হাঁচছে? না, হাসছে? পাগলের মতো কাঠির পর কাঠি ঘসতে লাগল বনোয়ারি। একটাও জ্বলল না। সব কাঠি ফুরিয়ে গেল। টর্চটা জ্বেলে ছড়ানো কাঠিগুলোর দিকে সভয়ে চেয়ে রইল সে। আলোর টর্চটাও বেশ লাল হয়ে গেছে। আর বেশীক্ষণ টিকবে না। আবার নিবিয়ে দিলে টর্চটা।

চতুর্দিক কাঁপিয়ে বজ্র পড়ল একটা। মনে হল এই বাড়িতেই পড়ল। থর থর ক'রে কেঁপে উঠল বাড়িটা। বনোয়ারির মনে হ'ল সমস্ত রাত অন্ধকারে কি ক'রে কাটাব এখানে? আলোটা যদি জ্বালাতে পারতুম! আলো থাকলে কারো পরোয়া করতাম না। হঠাৎ ডান দিকে খিক্ খিক্ খিক্ ক'রে শব্দ হ'ল। তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলো বনোয়ারি। ঠিক যেন ব্যঙ্গ ক'রে কে হাসল। যেদিক থেকে হাসিটা এল টর্চটা জ্বেলে সেই দিকে দেখল চেয়ে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এইবার দেখতে পেল একটা খোলা জানালা রয়েছে, ওদিকের দেওয়ালে। এগিয়ে গেল সে-দিকে। টর্চ ফেলে দেখল বাইরের বারান্দায় দু'তিনটে শেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরাই খ্যাক খ্যাক শব্দ করছে সম্ভবত। ফিরে এল আবার। টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গোঁফ-দাড়িগুলো খুলে ফেললে। জলে ভিজে পরচুলাগুলো থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল একটা! তারপর ব্যাগের ভিতর হাত পুরে একটা পাঁউরুটি বার ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। ভাগ্যে পাঁউরুটিটা সঙ্গে এনেছিল! খেতে খেতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গেই কথা শুরু ক'রে দিল। নিজের কণ্ঠস্বরই যেন সঙ্গী হ'ল তার সেই নির্জন অন্ধকার ঘরে। "হাড়গিলে এ তুই কি করলি বল তো? তোর সঙ্গে কথা ছিল তুই আধা-আধি বখরা দিবি আমাকে। ছিল না? কিন্তু মাত্র কুড়িটি টাকা দিয়ে আমাকে তুই বিদেয় করে দিলি কোন আক্কেলে? আমি কি কুলী? আমি সাপটে না ধরলে তুই ওর গলা টিপতে পারতিস? আর আমাকেই কলা দেখালি। কেমন মজাটি টের পাইয়ে

দিলুম। ছুরির একটা ঘায়ে তো কাৎ হয়ে পড়লি। আমার সঙ্গে চালাকি! গয়না গিনি সব পুঁতে রেখে এসেছি। পুলিশ ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে না। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে ফিরে যাব আবার।"

বাইরে আবার ছপ্, ছপ্, শব্দ শোনা গেল, তার সঙ্গে সেই খিক্ খিক্ হাসি।

"আঃ, শেয়ালগুলো জ্বালালে তো! হাড়গিলে, তুই ভাবছিস আমি ভূতের ভয়ে কাঁপছি? মোটেও না। তুই শেষ হয়ে গেছিস। তোকে আর ভয় নেই। লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারলে কারো পরোয়া করতাম না। অন্ধকার বলেই গাটা ছমছম করছে—"

টক্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

মেঝেতে কি যেন পড়ল একটা উপর থেকে।

টর্চটা মুঠোয় চেপে ধরে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল বনোয়ারি। তারপর জ্বালল টর্চটা। যা দেখল তাতে তার মুখটা 'হাঁ' হয়ে গেল একটু। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার মতন হ'ল। মেঝের মাঝখানে একটা দেশলায়ের বাক্স পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তুলে নিলে সেটাকে। শুকনো খট্‌খটে নতুন দেশলাই একবাক্স, দু'দিকের কাগজ পর্যন্ত ঠিক আছে। কোত্থেকে এল এটা? কে দিলে? টর্চটা ছাতের উপর ফেলে দেখবার চেষ্টা করল একটু। কিচ্ছু দেখা গেল না। খিক্ খিক্ হাসিটা আবার শোনা গেল বাইরে। আর সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা নিবে গেল। তার ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনোয়ারি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে তুলে নিলে দেশলাইটা। প্রথম কাঠিটাই জ্বলে উঠল।

……লণ্ঠনটা জ্বেলে বেশ ক'রে গুছিয়ে বসেছিল বনোয়ারি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধ্বনি, আকাশের গুরু গুরু শব্দ আর ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল। আর তার মধ্যে মাঝে মাঝে সেই ছপ্ ছপ্, ছপ্, ছপ্, শব্দ আর খিক্ খিক্ হাসি। এইটেই শুনেছিল বনোয়ারি একাগ্র হয়ে। শেয়ালগুলো ও রকম করছে? তাই নিশ্চয়। এই বিশ্বাসেই অনড় হয়ে বসেছিল সে। কিন্তু একটু পরেই এ বিশ্বাস আর টিকল না। খিক্ খিক্ শব্দটা কানের খুব কাছে শোনা গেল। নিঃশ্বাসের স্পর্শও যেন গালে লাগল। আর মনে হতে লাগল ঘরের ভিতরই যেন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চোপরাও, খবরদার—"

টপ্ ক'রে ব্যাগ থেকে ছোরাটা বার ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল বনোয়ারি। শব্দটা থেমে গেল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ক'রে বসে রইল সে। অনেকক্ষণ কোন শব্দ হ'ল না। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেল ঘরের কোণে ছায়ামূর্তির মতো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। ঠিক যেন হাড়গিলার ছায়া পড়েছে। বোঁ ক'রে ছোরাটা সেই দিকে ছুঁড়ে দিলে সে। ছায়াটা সট্ ক'রে যেন উপরের দিকে মিলিয়ে গেল, আর গেঁথে গেল দেওয়ালে। বনোয়ারি উঠে গেল দেওয়াল থেকে ছোরাটা খুলে নেবার জন্যে। কিন্তু পারলে না। ছোরাটা দেওয়ালে এমন গেঁথে বসে গিয়েছিল যে খোলা গেল না।

টানাটানি ধ্বস্তাধ্বস্তির চরম করল বনোয়ারি, কিন্তু কিছুতেই তুলে নিতে পারলে না ছোরাটা। মনে হ'ল ভিতর থেকে ছোরাটাকে কে যেন শক্ত ক'রে ধরে রেখেছে। ছোরাটা ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল বনোয়ারি। ছোরার বাঁটটা কাঁপতে লাগল, বনোয়ারির মনে হ'ল যেন বলছে—না, না, পারবে না। ছেড়ে দাও। ঠিক এই সময়ে খিক্ খিক্ হাসিটা আবার কানের পাশে শুনতে পেল সে। লাফিয়ে সরে গেল একধারে। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ছোরাটার দিকে। আর একবার চেষ্টা করল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে টানতে লাগল। টানতে টানতে হঠাৎ হাত ফসকে গেল তার, দড়াম্ ক'রে নিজেই পড়ে গেল মেঝের উপর। ছোরার বাঁটটা দুলে দুলে বলতে লাগল—না, না, না। আর সঙ্গে সঙ্গে খিক্ খিক্ হাসি। মেঝে থেকে উঠে কপাট খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল বনোয়ারি বাইরে। দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে তার কাপড়-চোপড় উড়িয়ে ছড়িয়ে দিলে ঘরের মেঝের চারদিকে! লণ্ঠনের শিখাটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু নিবল না। তার আগেই বনোয়ারি ঘরে এসে ঢুকল প্রকাণ্ড লম্বা একটা গাছের ডাল টানতে টানতে।

"পিটিয়ে লম্বা ক'রে দেব হারামজাদকে—" উচ্চকণ্ঠে এই স্বগতোক্তি ক'রে কপাটটা আবার ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে সে। তারপর লম্বা ডালটা রাখল একধারে। কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে বোঁচকায় পুরে ফেললে। তারপর ঘরের মাঝখানে গুম্ হয়ে বসে রইল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ক্রমশ ঘুম পেতে লাগল তার। ঢুলতে লাগল। হঠাৎ চমকে উঠল একবার। মনে হ'ল ঘরের আর একটা কোণে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা কইছে যেন কারা। লম্বা ডালটা তুলে তেড়ে গেল সেদিকে। কেউ নেই। তারপর তার মনে হ'ল সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে তার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে বোধহয়। তাই ও-সব আজগুবি জিনিস দেখছে আর শুনছে। একটু ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভূত? হুঁঃ যত সব বাজে কথা। বোঁচকাটা মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝের উপর। চোখ বুঁজে রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু ঘুম এলো না। তবু চোখ বুঁজে রইল। তারপর একটা অদ্ভুত ছোট্ট শব্দ হ'ল। চু-চু-চু। বনোয়ারি চোখ খুলে দেখলে ছাতের উপর থেকে কালো মতন কি একটা ঝুলছে। ঝুল না কি? পুরোনো বাড়িতে ঝুল থাকা অসম্ভব নয়। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে দিকে। মনে হতে লাগল ক্রমশ সেটা বড় হচ্ছে। নীচের দিকে লম্বা হচ্ছে। সাপ নয় তো? বনোয়ারি উঠে সেই লম্বা ডালটা তুলে সেটার নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। ডালটা খুব লম্বা, নাগাল অনায়াসেই পাওয়া যেত। কিন্তু ওটা ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল। আর ক্রমশঃ লম্বা হয়ে নামতে লাগল মেঝের দিকে। বনোয়ারি শেষে পাগলের মতো ঘোরাতে লাগল ডালটা। তারপর অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড হ'ল। হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে জাপটে ধরল তাকে। নরম দুটো হাত, ঠিক যেন মেয়েমানুষের হাত, পিঠের উপর স্তনের স্পর্শও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছু। বনোয়ারির হাত থেকে ডালটা পড়ে

গেল। আর ছাত থেকে সেই কালো বস্তুটা নামতে লাগল ক্রমশঃ। বনোয়ারি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল সে দিকে। দেখতে দেখতে সেটা তার চোখের সামনে নেমে এল। বনোয়ারি দেখলে সেটা ঝুল নয়, সাপও নয়, আঙুল একটা : বিরাট মোটা রোমশ আঙুল, প্রকাণ্ড নখ রয়েছে তাতে। আঙুলটা মেঝের কাছে আসতেই চড়াৎ ক'রে শব্দ হ'ল একটা, মেঝেটা ফেটে গেল। সেই ফাটলের ভিতর থেকে বেরুল হাড়গিলার মুণ্ডটা।

'কে, বনোয়ারি এস, এস, ভয় পাচ্ছ কেন ? ঝুমকো এবার ছেড়ে দাও ওকে। ও আসবে এবার। ঝুমকো আমার গলাটাকে কামড়ে ছ্যাত্‌রাখ্যাত্‌রা ক'রে দিয়েছে একেবারে। দেখতে পাচ্ছ ?"

বনোয়ারি দেখতে পেয়েছিল : হাড়গিলার গলার সাঁকিটা নেই তার জায়গায় একটা গর্ত। গর্তের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের হাড় দেখা যাচ্ছে।

"ঝুমকো ছেড়ে দাও ওকে। ও এইবার আসবে। বন্ধু এস —" অদৃশ্য হাতের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। অদৃশ্য এবার দৃশ্যও হ'ল। বনোয়ারি ঘাড় ফিরিলে এবার দেখতে পেল ঝুমকো দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘাড়টা ওদিকে বেঁকে গেছে, জিবটা বেরিয়ে ঝুলছে, মুখময় ফেনা, চুলগুলো এলোমেলো। তারপর বনোয়ারি অনুভব করল হাড়গিলা তার হাত ধরে টানছে আর ঝুমকো ঠেলছে তাকে পিছন থেকে। বনোয়ারি গর্তে ঢুকে পড়ল।

ফেরারি আসামি বনোয়ারির মৃতদেহ সাতদিন পরে পুলিশ আবিষ্কার করল ওই ঘরের মধ্যে। মৃতদেহটি ঘরের মেঝেতে একটা ফাটলের মধ্যে আটকে ছিল।

হাওয়া

ঘরের মধ্যে একটুও হাওয়া নেই। দমবন্ধ হ'য়ে আসছে। অথচ বাইরে দেখতে পাচ্ছি ঝড় হচ্চে। গাছপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। আকাশে মেঘের দল উড়ে চলেছে মহানন্দে। অথচ ঘরে একটুও হাওয়া নেই কেন। ঘরের বাইরে হাওয়া প্রবল বেগে বইছে, অথচ ঘরের ভিতর সে ঢুকছে না কেন।

হঠাৎ মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথকে। বহুকাল আগে তাঁকে একবার মাত্র দেখেছিলাম এক সভায় অনেক দূর থেকে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি হাসছিলেন, হেসে হেসে গল্প করছিলেন কার সঙ্গে যেন। তাঁর চোখের অপরূপ দৃষ্টি, তাঁর মুখভাবের প্রদীপ্ত প্রকাশ, তাঁর প্রতিভার দিব্যদ্যুতি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু দূর থেকে। তাঁকে কাছে পাইনি। অপরিচয়ের বিরাট ব্যবধান ছিল। তাঁর স্পর্শ পাইনি তখন।

আজ হাওয়ার এই কাণ্ড দেখে তাঁকে মনে পড়ল। তিনিও তো হাওয়ার মতোই

ছিলেন সর্বত্রবিহারী। কখনও দখিণে হাওয়া, কখনও ঝড়। কখনও আকাশে, কখনও গৃহকোণে। তাঁকে সেদিন পাইনি, আজ হাওয়াকেও পাচ্ছি না।

হঠাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। জানলা বন্ধ আছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি সেটা। জানালার কাচ দিয়ে বাইরের ঝড় দেখা যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দিলাম। ভাল ক'রে খুলে দিলাম।

অবাক কাণ্ড। তবু হাওয়া ঘরে ঢুকল না। ঢুকল কায়াহীন কতকগুলো কথা।

"তোমার নাক বন্ধ, তাই নিশ্বাস নিতে পারছ না।"

"তোমার ফুসফুস নেই, তাই দমবন্ধ হ'য়ে আসছে।"

"তোমার চামড়া অসাড় হয়ে গেছে, তাই হাওয়ার স্পর্শ পাচ্ছ না।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কে যেন।

"আরে তুমি যে সিনেমা দেখছ—ও সত্যি ঝড় নয়, সিনেমার ঝড়!"

আসল সত্যটা কিন্তু স্পষ্ট হ'ল আর একটু পরে।

হাওয়া, কাচের জানলা, সিনেমা সবই মিথ্যা।

একটা বন্ধ ঘরে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—হাওয়ার স্বপ্ন। বাইরে প্রচুর হাওয়া, কিন্তু আমি বঞ্চিত হয়ে আছি। তারপর যা ঘটল তা অলৌকিক, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। বন্ধ ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়ল। হু হু ক'রে হাওয়া ঢুকল ঘরে। গান শুনতে পেলাম।

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।

দেখি সামনেই রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন।

হাওয়ার বেগে কাঁপছেন তিনি।

দূরবীনের দেখা

শীতকাল। পৌষের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ সামনের বাড়ির আলসেতে চোখ পড়তেই উঠে পড়লাম। দূরবীনটা নিয়ে এলাম ঘরের ভিতর থেকে। শীতের অতিথি 'থির-থিরা' পাখীটা এসেছে। প্রতিবছরই আসে। দূরবীনের ভিতর দিয়ে দেখলাম মাথাটি একটু ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানালে যেমন প্রতিবারেই জানায়। লেজটি পাশাপাশি নাড়ছে যেমন প্রতিবারেই নাড়ায় ছটফটে চঞ্চল পাখী। কালচে রং। কিন্তু উড়তেই ডানার নীচে লাল ঝলক দেখা গেল। আগুনের আভা বেরিয়ে এল যেন। ইংরেজি নাম রেড স্টার্ট (Red Start) এই জন্যেই। আলসেতে বেশীক্ষণ রইল

না। চট্‌ ক'রে নেমে এল ঘাসের উপর। তারপর একটা পোকা ধরে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেল আবার। জানি না আবার কখন আসবে।

পরদিন চিঠি নিয়ে এক চাকর এসে হাজির। বড় বড় অক্ষরে কাঁচা হাতের লেখা রুল-টানা একসারসাইজ বুকের ছেঁড়া পাতার উপর।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, কাল আপনি দূরবীন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমায় দেখছিলেন সকাল বেলায়। আমি তখন দোতলার জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। কেন দেখছিলেন তা কি জানাবেন? ইতি

পারুল

চাকরটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম পাশের বাড়িতে ওরা দিন দুই আগে এসেছে।

"পারুলের বয়স কত?"

"ন' বছর—"

বলাবাহুল্য আমি কাল পাখীটাকেই দেখেছিলাম, পারুলকে দেখতেই পাইনি। কিন্তু ওর মতো একটা দ্রষ্টব্য প্রাণী আমার নজরেই পড়েনি একথা কি লেখা যায়? ওরও একটা আত্মসম্মান আছে তো। তাই লিখলাম—

প্রিয় পারুল,

কাল তোমাকেই দেখছিলাম। তোমাকে দেখে আমার নাতনী টুলটুলের কথা মনে পড়ছিল। সে এখানে থাকে না, মাঝে মাঝে আসে আবার চলে যায়। তোমার ভিতর তাকেই দেখছিলাম কাল। আমাদের বাড়িতে এসো। ইতি

তোমার নতুন দাদু

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে মনে হল আমার নাতনী টুলটুল ঠিক ওই খিরখিরা পাখীটার মতো। ক্ষণিকের অতিথি। কিছুক্ষণের জন্যে আসে, ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়ায়, রঙের চমক দেখিয়ে মুগ্ধ করে। তারপর আবার ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে চলে যায় স্বস্থানে। তাকেও তো দূরবীনের ভিতর দিয়ে দেখছি। বয়সের দূরবীন।

আবার দূরবীন চোখে দিয়ে বসলাম। দেখি পারুল জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। শৌখীন লাল রঙের ফ্রক পরেছে একটা। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। কি মিষ্টি হাসি! গালে টোল পড়েছে!



বনফুল

রচনাবলী ১৩